যোগিকথামৃত

तपस्विभ्योऽधिको योगी
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद्योगी भवार्जुन ॥
श्रीमद्भगवद्गीता ६:४६

—প্রকাশক—

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া
যোগদা সৎসঙ্গ মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৭৬

প্রকাশক :
যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া,
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৭০০০৭৬

প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৩৫৯ (1953)

মুদ্রক :
শ্রীনির্মল মিত্র
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯৩এ লেনিন সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

উৎসর্গ

মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব—

শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে—

অর্পিত হইল।

পরমহংস যোগানন্দজীর আশীর্ব্বাদ



মৎপ্রণীত ইংরাজী 'অটোবাইওগ্রাফি অফ্ এ যোগী'র বঙ্গানুবাদে শ্রীমান্ ইন্দ্রনাথ শেঠের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়াস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাই।

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাল
সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপ
লস্ এইন্জেলস্, ক্যালিফোর্ণিয়া, ইউ, এস, এ,

পরমহংস যোগানন্দ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

[স্বর্গীয় শ্রীসরোজ কুমার দাস, এম-এ, পি-এইচ, ডি, (লণ্ডন), অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক লিখিত]

—:*:—

পরমহংস যোগানন্দ বিরচিত "অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী" বহু ভাষায় ইতিমধ্যে অনূদিত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই "আত্মজীবনী"র প্রচার-ব্রত-উদ্‌যাপনে ভূমিকা-লেখকের স্থান অতি গৌণ এবং নগণ্য। এক্ষেত্রে লেখক তাঁর দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তদধিক নিজ অযোগ্যতাবিষয়ে। বলা বাহুল্য, অনেক সময় এই দৈন্যনিবেদনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহমিকার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে অহং প্রদীপমাত্র আর আত্মা নিরপেক্ষ, নিরবচ্ছিন্ন আলোক। প্রদীপের পরিচয় তৈলাধার বা তৈলবর্তিকায় নয়, কিন্তু দীপ-শিখার উজ্জ্বলতায়। সেইজন্যই ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ-বাণী ছিল—"আত্মদীপো ভব" অর্থাৎ আপনাকে প্রদীপ করিয়া তুলিবে। এই অহমিকার আবরণ, যাকে কবির ভাষায় বলা যায়—"আপনারে দিয়ে রচিলিরে এ কি এ আপনারই আবরণ"—যখন অপসৃত হয় তখনই প্রকাশিত হয়, উপনিষদ্-বর্ণিত সেই "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ", সেই আলোর আলো, যাঁকে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কেবল জানতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সেণ্ট্ জনের দিব্যদৃষ্টি-উজ্জ্বলিত ও মধ্যযুগীয় মরমী সাধক ও ভক্ত ঋষি অগষ্টিনের বাণী—"যে জ্যোতির্মণ্ডলের দীপ্তি প্রতিভাত হয় এই মর্ত্যলোকবাসী প্রতি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে।"

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আলোচ্যবিষয় এমন একটি স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, সুসম্পূর্ণ নিবেদিতজীবন, যার পূর্ণ পরিচয় পাই যোগানন্দজীর পরম প্রিয় রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে :—

"আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে।

পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি,
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ককালো ।"

যে আত্মানুভূতির প্রেরণা, যোগানন্দজী পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে গুরু-পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারক্রমে লাভ করেছিলেন কৈশোরে, আকৈশোর-যৌবন যার সাধনা করেছিলেন অতন্দ্র, অনলস, অনন্যপর "ক্রিয়াযোগ" মাধ্যমে এবং যার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি সম্ভাবিত হয়েছে তাঁর বিশ্বব্যাপী "সেলফ্-রিয়্যালাইজেসন্ ফেলোশিপ্" মহাসঙ্ঘের বহু শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায়, সেই প্রেরণার ছায়াপাত হয়েছিল তাঁর শৈশবে এক স্মরণীয় ঘটনায় ।

পরমহংস যোগানন্দজীর ভক্তপ্রাণা ক্রিয়াযোগদীক্ষিতা মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে, মৃত্যুশয্যায় কথিত এবং জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্তের নিকট সুরক্ষিত বিবরণী হ'তে আমরা জানতে পারি যে তাঁর পরমগুরু (এবং মাতৃদেবীর গুরুদেব যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়) শিশু যোগানন্দকে কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত কপালে হাত রেখে বলেছিলেন তাঁকে—"মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহুলোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরে আর একবার এই নিবেদিতজীবনের এক পরম সন্ধিক্ষণে, আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে, যখন সমস্তই নৈরাশ্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তখন পেলেন সেই প্রত্যাদেশ, সেই ভবিষ্যদ্বাণী, সেই মন্ত্রধারা, যা সকল বাধাবিঘ্ন ভাসিয়ে দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের "ক্রিয়াযোগ"-উন্মুখীন মহামিলন-তীর্থে এই স্বামী যোগানন্দকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল। সেই যুগবাণীর যেমন তদানীন্তন, তথা চিরন্তন মূল্যও আছে, এবং সেই কারণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

"আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে আমেরিকার কোন্ অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্যে যখন তৈরী হতে লাগলুম—মন যে ভয়ে একটুও কাঁপেনি তা নয়।......অবশ্য অ্যামেরিকায় যাবার জন্যে মন পূর্ব হতেই স্থির করে ফেলেছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অনুমতি আর তাঁর আশ্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। প্রার্থনা চলতে লাগল—বিরাম নেই। বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণ-ভাবে নিবেদন করতে লাগলুম......আরও গভীর ভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে হচ্ছিল যেন মাথা বুঝিবা এখুনিই ফেটে যায়। সেই মুহূর্তে আমাদের বসত বাড়ীর সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম। দরজা খুলে

দেখি, কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসী...অতি মধুর হিন্দীতে বললেন, "আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমেরিকায় যাও, ভয় কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন।...... তোমাকেই আমি পশ্চিমে "ক্রিয়াযোগে"র বাণী প্রচার করবার জন্যে নির্বাচিত করেছি। বহুদিন পূর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি তাঁকে বলেছিলুম যে তোমাকেই আমি তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে পাঠাব।......ঈশ্বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ তা সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে—আর মানুষের সেই অনন্ত করুণাময় পরমপিতার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই জাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে।' " (৩৭শ পরিচ্ছেদ ; পৃঃ ৪০৯-৪১০)। বত্রিশ বৎসর পূর্বে শহরতলীর সাধারণ পরিবেশের মধ্যে যে অসাধারণ মানসিক পরিস্থিতিতে এই দিব্যদৃষ্টিসূচক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তার একমাত্র ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক নিদর্শন দেখি ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনপ্রকরণে। যোগানন্দজীর চিত্তে তাৎকালিক ভাবাবেশ যে তাই হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই ভাবাবেগ বর্ণনাকল্পে দ্বাদশ শ্লোকে উদ্ধৃত ভাষণে ঃ—

"নভোমণ্ডলে যদি সহস্র তপনের দীপ্তি একই সময়ে উত্থিত হয়, তবেই সেই ভাস্বতী প্রভার সহিত বিশ্বাত্মরূপী এই দৃষ্টিভাতির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য মিলিতে পারে।"

এই বিশ্বাত্মদৃষ্টিপ্রভাবের ছন্দানুবর্তনে যোগানন্দজীর সাক্ষাৎ গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে এই সূত্রভাষ্যকল্প নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ—

"ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছ আর মার্কিনদেরও জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সব চেয়ে ভাল তাই গ্রহণ কোরো। অমৃতের পুত্র তুমি—তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হ'য়ো। আর পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার যে সব ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে যা' কিছু সব সদ্গুণ তা নিয়ে নিজেকে গড়ে' তুলো।"

এই বিশ্বতোমুখী দৃষ্টির বীজ যখন উপ্ত হ'ল সুদূর পশ্চিমে আমেরিকার ক্রিয়ামূলক মননশীলতার চিত্তক্ষেত্রে, তখনই অঙ্কুরিত হ'ল অনতিকালমধ্যে শাখাপ্রশাখাবিসর্পী "যোগদা সেলফ্-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ"। ঋষিসুলভ

ধ্যানচক্ষুতে এই গুরুত্রিতয় দেখেছিলেন যে এই প্রণালীতেই চিরপ্রবহমান ভারতের সনাতনধর্ম ও কৃষ্টি জগতে প্রচার করতে হবে এবং তার জন্য চাই যুগোপযোগী মনোবৃত্তি ও প্রচার-পরিকল্পনা। এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে পরকীয়া কৃষ্টির শরণাপন্ন হ'তে হবে আমাদের এই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও। দূরাবগাহী মননশক্তিতে এই সাধকত্রয় দেখেছিলেন যে, "সনাতন বলা যায় তাকেই, যা আজ এখানেই নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।" ("সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ—" অথর্ববেদ)।

ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই চিরন্তনবাণী যে অদ্যতন জীবনে বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায়, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঋগ্বেদীয় শাখার ঐতরেয়ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই জীবনদর্শনের নজীর ও নিদর্শন পাই রূপকের ভাষায়, রাজপুত্র রোহিতের বিরামবিহীন পর্যটনের মধ্যে। "চলাটাতেই হয় অমৃতত্বলাভ, চলাতেই লাভ হয় তার স্বাদুসুমিষ্ট ফল, চেয়ে দেখ সূর্যের কি আলোকসম্ভার—যে সূর্য সৃষ্টির প্রথমতম মুহূর্ত থেকে অতন্দ্রিত চলার পথে এগিয়ে চলেছে। অতএব চল, এগিয়ে চল।"

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণম্ যো ন তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি চরৈবেতি ॥"

এরই কি প্রতিধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি না আমেরিকার গহন-গোপন আধ্যাত্মিক জীবনের বাণীতে যা স্ফুরিত হয়েছে ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের (দি সঙ্গ্ অফ্ দি ওপন্ রোড) "উন্মুক্ত রাজপথের উদাত্ত সঙ্গীতে" :—

"হে পথিক বন্ধু মোর! যে কেহ হওনা তুমি,
এস আজি, চল মোর সাথে ;
ভ্রমিলে আমার সাথে, পাইবে খুঁজিয়া যাহে
ক্লান্তি কভু স্পর্শে না তোমাতে।

হতাশ হয়োনা কভু, অগ্রসর হয়ে চল,
এস তুমি মোর পাশে আজ ;
ছড়ায়ে রয়েছে জেনো দৈবীসম্পদ্ভার,
চলিবার এ পথেরি মাঝ!"

কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই যে এই জীবন-দর্শনের সমাধি হয়েছে, তা নয় —সম্প্রদায়নির্বিশেষে এই গতিশীল জীবন-দর্শন, "অর্থক্রিয়াকারিত্ব"

(প্র্যাগম্যাটিক্, প্র্যাক্টিক্যাল এফিসিয়েন্সি)-কেই সত্যাবধারণ বা সত্তার মানদণ্ডরূপে স্বীকার করে এসেছে।

ক্রিয়াযোগের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এ যুগে দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়েছে চল্লিশ বছরের উপর এবং এখনও যা পূর্ণতরভাবে সক্রিয় রয়েছে, তাই এই "আত্মজীবনী"র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। "ভূমিকা"য় এর অবতারণা সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। সুধী পাঠকবর্গের এটাই লক্ষ্য করবার বিষয় যে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের ফ্রয়েডের মনোবিকলন বা বিশ্লেষণ ("সাইকো-এনালিসিস্") -পদ্ধতি অবলম্বনে যে উন্মাদনা চলেছে, তা যে এই মানসধর্মশাস্ত্রের শেষ কথা নয়, তা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রমাণপর্য্যায়সহ প্রতিপাদিত হয়েছে যোগানন্দজীর জীবনভাষ্যোজ্জ্বলিত এই জীবন-বেদে। মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিকলনের ঊর্ধ্বে যে মনঃসঙ্কলন বা মনঃসংশ্লেষ ("সাইকো-সিন্থেসিস্") এর স্থান, ফ্রয়েডের অবচেতন ("আন্কন্সাস্"), প্রাক্চেতন ("প্রি-কন্সাস্") এবং চেতন ("কন্সাস্") অন্তঃকরণের এই সর্ববাদিসম্মত প্রবিভাগের ঊর্ধ্বে যে প্রত্যগাত্মার ("সুপার-এগো") বা উন্মনী আত্মশক্তির স্বীকৃতি রয়েছে, তারই পরিপূর্ণ-বিকাশ-পদ্ধতি নির্দেশকল্পে এই "আত্মজীবনী", এই যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। "যোগ" যে কেবলমাত্র "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" নয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তি-বিকাশ-পরিকল্পনা-পদ্ধতি—এই যুগবাণী প্রচার আজ সার্থক হয়েছে।

হে যোগিবর! তোমাকে আজ আহ্বান করি তোমার চির-অভীপ্সিত ব্রত-উদ্‌যাপনক্ষেত্রে। তুমি যে সেই উপনিষদ্-বর্ণিত "প্রাণো বিরাট্", বিরাট্ প্রাণেরই অংশীভূত, তাই তোমার অনুপ্রাণনা আজও সমভাবেই সক্রিয়। তোমার মত পরিপূর্ণপ্রাণ ব্যক্তির কখনও প্রয়াণ সম্ভবপর নয়—"ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি"। তাই তোমায় আহ্বান করি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যরচিত হৃদয়াসনে, নব নব রূপে তুমি জন্মপরিগ্রহ কর দৈহিকসম্পর্কবিরহিত আমাদের চিত্তলোকে :—

"উদ্যতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ ॥"

"উদিত হইবে যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদীয়মান যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদিত যে তুমি তোমায় করি নমস্কার। বিরাজিত যে তুমি তোমায় নমস্কার, স্বয়ংপ্রকাশ স্বরাট্ তোমায় নমস্কার, স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত সম্রাট্ তোমাকে করি নমস্কার।"

১ম পরিচ্ছেদ

আমার পিতামাতা ও বাল্যজীবন

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান ও তার আনুষঙ্গিক গুরুশিষ্যবাদের ভিতর দিয়ে তা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা। ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে এমন এক ঈশ্বরকোটিক ঋষিগুরুকে এনে দিয়েছিল, যাঁর অপূর্ব সুন্দর জীবন সকল যুগেরই আদর্শরূপে গঠিত। ভারতের একমাত্র প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে—তার সাধু-ঋষিগণ। আমার গুরুদেব হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ—জ্ঞানাবতার, তাই যুগে যুগে এঁদের আবির্ভাব ভারতবর্ষকে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের মত ভাগ্যবিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করে এসেছে।

পূর্বজন্মের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশে আমার বাল্যস্মৃতি আচ্ছন্ন। বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে যে অতীত জীবনে আমি হিমালয়ের তুষারময় প্রদেশে যোগিরূপেই* ঈশ্বরলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলুম। অতীতের এই সব ক্ষণদীপ্ত স্মৃতি কোন অদৃশ্য যোগসূত্রে আমায় ভবিষ্যৎ জীবনেরও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছিল।

ছেলেবেলাকার অসহায় অবস্থার দীনতা আমার এখনও স্মরণে আছে। চলতে না পেরে বা আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে না পেরে আমি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করতাম। আমার শিশু দেহের অপটুতার কথা স্মরণ হলে মনের মধ্যে প্রার্থনার তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠত। আমার গভীর ভাবপ্রবণ জীবন বিভিন্ন ভাষার নীরব বাণীতে রূপ পেয়েছিল। আমার হৃদয়ের ভাব মনের মধ্যে নানাভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। অন্তরের নীরব ভাষাবিভ্রাটের মধ্যে আমার কান আত্মীয়স্বজনের অবিরাম বাংলা ভাষা শুনে শুনে ক্রমশঃ সেই ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। গুরুজনেরা আমায় দেখে মনে করতেন যে আমার আনন্দ-তরল শিশুমন কেবলমাত্র খেলনা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠলেহনেই নিমগ্ন!

মনের নানা অকারণ উদ্বেগ ও উত্তেজনা, অজানা উচ্ছ্বাস আর অপরিণত মস্তিষ্কের অসামর্থ্য আমার মধ্যে বহু অদম্য ক্রন্দনবেগের সৃষ্টি করত।

* যোগ সাধক ; প্রাচীন ভারতীয় ঈশ্বরাধনার পদ্ধতি। (২৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আত্মীয়স্বজনেরা এই অযথা ক্রন্দনের কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে বিস্মিত ও ব্যথিত হতেন। সুখের স্মৃতিগুলিও অতীতের অন্ধকার হতে বেরিয়ে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ায়ঃ মায়ের আদর, ভাষার অস্ফুট উচ্চারণে আমার প্রথম প্রচেষ্টা, আর হাঁটি হাঁটি পা পা বুলির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার চেষ্টা—এ সবই স্মৃতির আলোকে দেখতে পেতুম। বাল্যজীবনের এই সব প্রথম সাফল্য যদিও সাধারণতঃ শীঘ্রই ভুলে গিয়েছি, তবুও তারা পরে আত্মবিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক আর সুদৃঢ় ভিত্তি হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

আমার সুদূরপ্রসারী স্মৃতির ব্যাপারগুলি যে একেবারে অলৌকিক তা নয়। অনেক যোগীদের সম্বন্ধে জানা গিয়েছে যে, এই জগৎ-নাট্যশালায় তাঁদের এক জীবন হতে উৎক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথে পরবর্তী জীবনে আবির্ভাবে তাঁরা তাঁদের আত্মচেতনা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। মানুষের যদি কেবল দেহমাত্রই সার হতো, তা হলে সেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই ত তার ব্যক্তিত্বও সব হারিয়ে যেতো। কিন্তু শতশত বর্ষ ধরে মহাপুরুষ ও অবতারগণ যদি সত্য বাণীই প্রচার করে গিয়ে থাকেন, তা হলে মানুষ হচ্ছে মূলতঃ একটি জীবাত্মা, বিদেহী ও সর্বব্যাপী।

আশ্চর্য আর দুর্লভ হলেও শৈশবের সুস্পষ্ট স্মৃতির কথা একান্ত বিরল নয়। নানা দেশবিদেশে বেড়াবার সময় আমি সত্যনিষ্ঠ নরনারীদের মুখ থেকে অতি শৈশবকালের বহু স্মৃতিকাহিনী শুনেছি।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের নিকট গোরক্ষপুরে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি তারিখে আমার জন্ম। সেখানেই আমার বাল্যজীবনের প্রথম আট বৎসর অতিবাহিত হয়। ভাই-বোন মিলে আমরা আটজন। চার ভাই ও চার ভগিনী। সংসার জীবনে আমি মুকুন্দলাল ঘোষ* নামে পরিচিত। পিতা-মাতার আমি দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তান।

আমার পিতামাতা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বাঙালী। উভয়েই সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন। তাঁদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি প্রশান্ত মহিমময় প্রীতি কখনও চপলতার দ্বারা লঘু হতে দেখিনি। পিতামাতার সুসমঞ্জস জীবনই হ'ল আমাদের আটটি তরুণজীবনের চপল আবর্তনের শান্তিময় কেন্দ্র।

পিতা ভগবতী চরণ ঘোষ—দয়ালু, গম্ভীর, কিন্তু সময় সময় কঠোরভাব অবলম্বন করতেন। তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসলেও আমরা শিশুর দল

---

*১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তখনই আমার নাম পরিবর্তিত হয়ে যোগানন্দ হয়। ১৯৩৫ সালে আমার গুরুদেব আমায় 'পরমহংস' এই উপাধি দান করেন। (২৪শ ও ৪২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে বেশ একটা সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করেই চলতাম। তিনি একজন সুবিদিত গণিতজ্ঞ ও যুক্তিবাদী ছিলেন বলে প্রধানতঃ নিজের বুদ্ধিবলেই চালিত হতেন। কিন্তু মা ছিলেন আমাদের অন্তর্লোকের দেবী। তিনি কেবল ভালবাসার দ্বারাই আমাদের শিক্ষা দিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর পিতা তাঁর অন্তরের কোমলতা আরও বেশী করে প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর চোখে তখন মায়ের স্নেহকোমল আঁখির ছায়া ভাসতে দেখতে পেতাম।

মায়ের কাছে সর্বপ্রথম আমরা শাস্ত্রাদির সঙ্গে তিক্ত-মধুর পরিচয় লাভ করি। রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী ও উদাহরণ বেছে নিয়ে মা আমাদের উপর সেই সব শাসন, উপদেশ আর নীতিশিক্ষার বিষয় সুচতুর ভাবে প্রয়োগ করতেন। এইসব উপলক্ষ্যে শিক্ষা আর শাসন পাশাপাশি চলত।

প্রত্যহ বৈকালে মা, আমাদের সযত্নে পরিপাটিরূপে সাজিয়ে দিয়ে বাড়ীর বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতেন—পিতাকে অফিস হতে বাড়ী ফেরবার সময় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আমার পিতা "বেঙ্গল নাগপুর রেল্ওয়ে" নামক তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানীর সহ-সভাপতির সমতুল্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্যোপলক্ষে তাঁকে নানা দেশ ভ্রমণ করতে হত। এতে করে আমার শৈশবকালে আমাদের পরিবারবর্গকে বিভিন্ন শহরে বাস করতে হয়েছিল।

দুঃস্থ লোকেদের অভাব মোচনে মা সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। পিতার অন্তঃকরণও দয়ালু ছিল ; কিন্তু তাঁর সংসারখরচ, দানধ্যান প্রভৃতি ব্যয়ের একটা নির্দিষ্ট ধারা বেয়েই চলত। মা একবার দরিদ্রনারায়ণের সেবায় পক্ষকালের মধ্যেই পিতার একমাসের আয়ের চেয়েও বেশী খরচ করে ফেলে-ছিলেন। তাই একদিন তিনি মাকে ডেকে বললেন, "দেখ, তোমায় আমি শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, তোমার দানধ্যানগুলো যেন একটু ন্যায়সঙ্গতভাবে চলে।" পিতার এই মৃদু ভর্ৎসনাটুকুও মায়ের অন্তরে প্রবল আঘাত দিয়েছিল। ছেলেদের কাছে পিতার সঙ্গে মনান্তরের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে মা তখনই এক ভাড়াটে গাড়ী ডাকালেন। তারপরে একেবারে সেই সুপ্রাচীন চরমপত্র,—"আজ আমি বাপের বাড়ী চললুম।"

আমরা ত অবাক হয়ে কান্না জুড়ে দিলুম। মাতুল মহাশয়ও অকস্মাৎ সেখানে ঠিক সময়মত এসে উপস্থিত হলেন, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবার উদ্দেশে কিঞ্চিৎ সুপ্রাচীন উপদেশও পিতার কর্ণে চুপে চুপে প্রয়োগ করলেন। ফল এই হল যে, পিতার সঙ্গে কতকগুলো আপোসসূচক কথা-বার্তার পর মা প্রসন্নচিত্তে গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। যাই হোক, পিতামাতার এই রকম মতান্তরের বিভ্রাট যা আমি কেবল একটিবার মাত্র ঘটতে দেখেছিলুম,

তার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হল। কিন্তু আর একবার উভয়ের মধ্যে এক বিশেষ বাদানুবাদের একটা কথা আজ মনে পড়ছে। সেইটা এবার বলি।

পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলুম মা বাবাকে বলছেন, "দেখ, একটি বড় দুঃখিনী মেয়ে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে। বেচারীর বড্ডই অভাব। গোটা দশেক টাকা তার এখন নিতান্তই দরকার।" মেয়েটির দুঃখ দূর করবার চেষ্টায় মায়ের হাসিমুখে আরজি পেশ করাতে পিতার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করল। তবুও পিতা বললেন, "দশটাকা কেন? এক টাকাই ত যথেষ্ট।" তারপর আত্মপক্ষসমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি শুরু করলেন, "দেখ, যখন আমার বাবা আর ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা হঠাৎ মারা যান, তখন আমার দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একটি মাত্র ছোট্ট কলা খেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে স্কুলে যেতুম। শেষে বহুকষ্টে ইস্কুল থেকে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করি। পড়াশুনা চালাবার জন্য অর্থের অভাবে এক ধনী জজের কাছে মাসিক একটি মাত্র করে টাকা সাহায্য চাইতে যাই। 'একটা টাকাই কি কিছু কম না কি?' বলে কিছু না দিয়েই তিনি আমায় বিদায় করে দেন।"

মায়ের করুণার্দ্র হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল যুক্তির উদয় হওয়াতে প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "সেই একটি মাত্র টাকা হতে বঞ্চিত হবার তিক্ত স্মৃতি আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছ! আর তুমিও কি মেয়েটির এই দারুণ অভাবে তাকে দশটি টাকা সাহায্য না করে ফিরিয়ে দিয়ে সেই রকম তার মনে আঘাত দিতে চাও?"

"নাঃ, তুমিই জিতলে দেখছি,"—এই বলে বাক্যযুদ্ধে স্বামীদের সনাতন পরাজয়ের মুখভাব অবলম্বন করে মনিব্যাগ খুলে পিতা বললেন, "এই নাও দশ টাকা। আমার শুভেচ্ছাও এই সঙ্গে তাকে দিয়ে এস।"

নতুন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হলেই পিতার প্রথমতঃ, 'না' বলে বসার দিকে ঝোঁক ছিল। এই দুঃখিনী অপরিচিতা নারীটির প্রতি মায়ের হৃদয় স্নেহ-বিগলিত হওয়া সত্ত্বেও পিতার আচরণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাবধানতার পরিচায়ক। কোন বিষয়ে হঠাৎ সম্মতি প্রদান করার প্রতিকূলতা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, "যথোচিত বিবেচনা" নীতির অনুসরণ মাত্র। পিতার আচরণ সর্বদাই ন্যায়-সঙ্গত এবং তাঁকে বিচারবিবেচনায় সর্বত্র সমদর্শী দেখতুম। যদি আমি আমার নানারকমের আবদার-অনুরোধ তাঁর কাছে বেশ একটা প্রবল যুক্তির সঙ্গে সমর্থন করে দেখাতে পারতুম, তা হলেই তিনি আমায় সেই বাঞ্ছিত বস্তুটি পাবার সুযোগ ঘটিয়ে দিতেন—তা, সে ছুটিতে দেশ ভ্রমণই হোক আর একটা নতুন মোটর সাইকেলই হোক্।

পিতৃদেব তাঁর সন্তানদের শৈশবকালে কঠিন নিয়মনিষ্ঠা পালন করাতেন। তাঁর নিজের আচার ব্যবহারও অতি কঠোর তপস্বীর ন্যায় ছিল। তার প্রমাণ এই যে, জীবনে তিনি কখনও থিয়েটার দেখেন নাই। তাঁর আমোদ-প্রমোদ বা অবসরবিনোদনের জন্য তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা বা গীতাপাঠেই আনন্দ লাভ করতেন। সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিহার করে তিনি একজোড়া পুরান জুতো যতদিন পর্যন্ত না একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত, ততদিন পর্যন্ত তাই দিয়ে চালাতেন। মোটরগাড়ী জনপ্রিয় হয়ে উঠলে ছেলেরা একটা গাড়ী কেনে। কিন্তু তিনি রোজ ট্রামে চড়েই অফিসে যাতায়াত করে সন্তুষ্ট থাকতেন।

ক্ষমতালাভের জন্য ধনসঞ্চয়ে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। একবার কলকাতা আরবান ব্যাংক গড়ে তুলতে সাহায্য করার পর তিনি নিজের লাভের জন্য তার শেয়ার কেনা বা তা ধরে রাখা সমীচীন বোধ না করে, তা প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন। অবসরকালে তিনি জনকল্যাণের জন্য এইরূপ পৌরকর্তব্য পালন করেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

পিতা চাকরি হতে অবসর ও পেন্সন নেবার বহু বৎসর পরে বিলাত থেকে একজন ইংরেজ হিসাব পরীক্ষক বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করতে এলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, পিতা তাঁর বহুদিনের প্রাপ্য বোনাসের জন্যে কোম্পানীর কাছে কখনও কোন আবেদনই করেন নি।

পিতা তিনজন লোকের কাজ একাই চালাতেন বলে হিসাব পরীক্ষক সাহেব রেলকর্তৃপক্ষের নিকট মন্তব্য করেন। তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, তাঁর বাকী বেতনের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। কোষাধ্যক্ষ পিতাকে ঐ পরিমাণ টাকার একটি চেক পাঠিয়ে দেন। এ বিষয়ে এত অল্পই তিনি মনে ঠাঁই দিয়েছিলেন যে, সংসারে এর কথা উল্লেখ করতে ভুলেই গিয়েছিলেন। পরে বহুদিন বাদে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণু ব্যাঙ্কে এতগুলো টাকার একটা বড় রকমের জমার হিসাব পেয়ে তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে।

পিতা বিষ্ণুকে উপদেশচ্ছলে বললেন, "পার্থিব লাভে উল্লসিত হও কেন? সুখে দুঃখে মন যার অবিচলিত, সে লাভে উল্লসিত বা ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হয় না। সে জানে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আসে কপর্দকহীন হয়ে আর যায়ও কপর্দকহীন হয়ে।"

বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভেই পিতামাতা কাশীর যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই যোগাযোগ পিতার স্বাভাবিক তাপস স্বভাবকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। মা আমার বড়দিদি রমার নিকট এক অদ্ভুত

কথা প্রকাশ করেছিলেন, "তোমার বাবা ও আমি বৎসরে কেবল একবার মাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পালন করি, তাও বংশরক্ষাকারী সন্তানলাভের জন্য।"

লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে পিতার প্রথম সাক্ষাৎলাভ হয় অবিনাশবাবুর সাহায্যে। ইনি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। অবিনাশবাবু আমার কিশোর বয়সে ভারতের বহু সাধুসন্তের চিত্তগ্রাহী নানা কাহিনী শোনাতেন। সে সব কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটাবার সময় তিনি সর্বদাই তাঁর নিজগুরু লাহিড়ী মহাশয়ের মহত্তর মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গল্প শেষ করতেন।

গ্রীষ্মের এক অলস অপরাহ্নে অবিনাশবাবু আর আমি যখন বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে গল্পগুজব করছি তখন তিনি এই কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নটি করে বসলেন, "মুকুন্দ, তোমার বাবা কি আশ্চর্য পরিস্থিতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য হয়েছিলেন তা কি কখনও শুনেছ?" আমি হেসে মাথা নেড়ে তাঁর এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

অবিনাশবাবু বলতে শুরু করলেন, "তোমার জন্মাবার অনেক বছর আগে আমাদের উপরওয়ালা অর্থাৎ তোমার বাবার কাছে, কাশীতে আমার গুরুদেবকে দর্শনের জন্যে অফিস হতে এক সপ্তাহের ছুটি চাইলুম। তোমার বাবা ত আমার মতলবটি হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'ধর্ম ধর্ম করে পাগল হবে নাকি? চাকরিতে যদি উন্নতি করতে চাও ত অফিসের কাজকর্মে ভাল করে মন দাও।'"

"অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সেদিন অফিস হতে বাড়ী ফিরছি। দুধারে গাছে ঘেরা ছায়ায় ঢাকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে দেখি যে, তোমার বাবা পালকি চড়ে চলেছেন। চোখে চোখ পড়তেই তিনি পালকি থেকে নেমে পড়লেন আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবার জন্যে। পালকি আর বেহারাগুলোকে বিদায় করে দিয়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। সান্ত্বনা দেবার ছলে তোমার বাবা পার্থিব উন্নতির চেষ্টাতে যে নানা সুবিধা আছে সে কথা আমায় বুঝাতে লাগলেন। উদাসীনভাবে তাঁর কথাগুলো শুনে চলেছিলুম। অন্তর কিন্তু বারবার কেঁদে উঠে বলতে লাগল, 'লাহিড়ী মশায়, লাহিড়ী মশায়, আপনাকে না দেখতে পেলে আমি আর বাঁচব না।'

"তোমার বাবা আর আমি হেঁটেই বাড়ীর দিকে ফিরতে শুরু করলুম। রাস্তা ধরে আমরা একটি প্রশস্ত মাঠের ধারে এসে পড়লুম। শেষ অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ তখনও দীর্ঘ তরঙ্গায়িত বন্য তৃণদলের অগ্রভাগগুলি রঞ্জিত করে তুলছিল। অবাক বিস্ময়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম সেই মনোরম শোভা দেখবার জন্যে। সেই শূন্য মাঠের মাঝখানে মাত্র কয়েকগজ দূরেই আমার

পরমারাধ্য গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ সশরীরে আবির্ভূত হলেন !* তাঁর বাণী আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ শ্রবণে এসে ধ্বনিত হল, 'ভগবতী, তুমি তোমার কর্মচারীদের উপর বড়ই নির্দয় ।' যেমনি অদ্ভুতভাবে তিনি আবির্ভূত হলেন, তেমনি আশ্চর্যভাবে তিনি অন্তর্ধানও করলেন। তখনই নতজানু হয়ে আমি প্রাণভরে ডাকতে লাগলুম, 'লাহিড়ী মশায়, লাহিড়ী মশায় ।' তোমার বাবা স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"তোমার বাবা তখন বললেন, 'অবিনাশ, তোমাকেই শুধু ছুটি দিচ্ছি তা নয়, কালই তোমার সঙ্গে কাশী যাবার জন্য আমি নিজেও ছুটি নিচ্ছি। তোমার সাহায্যের জন্য যিনি ইচ্ছামাত্রই মূর্তিপরিগ্রহ করে আবির্ভূত হতে পারেন, সেই যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়কে আমি দেখবই। আমি সস্ত্রীক এই মহান্ গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর সাধনপথে দীক্ষা নেব। তুমি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবে কি ?"

"আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই ভগবতীবাবু, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব ।' আমার প্রার্থনা এই রকম অলৌকিকভাবে পূরণ হয়ে যাওয়াতে এবং ঘটনার দ্রুত আর অনুকূল পরিবর্তনে মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ।"

"পরদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বাবা, মা আর আমি কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসলুম। তার পরের দিনই কাশীতে পেঁছে ঘোড়ার গাড়ী করে অনেকটা দূরে গিয়ে এক জায়গায় এসে নেমে পড়লুম। তারপর একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে এসে গুরুদেবের নিরালা বসতবাটিতে গিয়ে পেঁছিলুম। তাঁর ছোট বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখা গেল যে, যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অভ্যস্ত পদ্মাসনে বসে আছেন ; ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। অর্ধোন্মীলিত চক্ষুদুটি খুলে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তোমার পিতার উপর স্থাপন করে লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'ভগবতী, তুমি তোমার কর্ম্মচারীদের উপর বড়ই নির্দয় ।"

"দুদিন আগে রেল অফিস হতে ফিরবার সময় সেই ঘাসে ঢাকা মাঠে আবির্ভূত হয়ে তিনি ঠিক এই কথাগুলো দিয়ে ঠিক এমনিভাবেই তোমার বাবাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আজ আমার বড় আনন্দ যে, তুমি অবিনাশকে আমার কাছে আসতে দিয়েছ, আর তুমি নিজেও সস্ত্রীক এখানে এসেছ ।"

---

* মহান্ গুরুদের অলৌকিক শক্তির বিষয় ৩০শ পরিচ্ছেদ "অলৌকিক ঘটনার নিয়ম"তে বর্ণিত হয়েছে।

"তোমার বাবা ও মা সেই মহান্ গুরুর কাছে ক্রিয়াযোগের* আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষা লাভ করে অপারিসীম আনন্দ লাভ করলেন। তোমার বাবা আর আমি—দুই গুরুভাই, লাহিড়ী মহাশয়ের সেই অবিস্মরণীয় আবির্ভাবের দিন হতেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হলুম। তোমার নিজের জন্মবিষয়েও লাহিড়ী মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তোমার জীবন নিশ্চয়ই সেই মহান্ গুরুর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকবে। সদ্‌গুরুর আশীর্বাদ কখনও বিফল হয় না।"

আমার এ সংসারে আসবার কিছুকাল পরেই লাহিড়ী মহাশয় ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। পিতা যখন যে সব শহরে বদলি হতেন, সেই সব শহরে আমাদের বাড়ীর ঠাকুর ঘরে অলঙ্কৃত ফ্রেমে বাঁধান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি নিত্যপূজার জন্য রাখা থাকত। প্রায় প্রত্যহই সকাল ও সন্ধ্যায়—মা আর আমি, একটি সদ্যোরচিত বেদীর উপর লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি চন্দনসিক্ত পুষ্পে সজ্জিত করে ধ্যানে বসতুম। ধূপ ধুনা আর গুগ্‌গুলের সঙ্গে মাতা ও পুত্রের মিলিত ভক্তিধারায় আমরা দেবত্বের পূর্ণবিকাশ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি আমাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম।

লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিটি কিন্তু আমার জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে যোগিরাজের বিষয়ে চিন্তাও আমার বাড়তে লাগল। ধ্যানে বসে আমি প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, তাঁর ফটোগ্রাফের মূর্তি ছবির ছোট ফ্রেম থেকে বেরিয়ে একটি জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করে আমার সামনে এসে বসেছে। যেমনি সেই জ্যোতির্ময় দেহের চরণ স্পর্শ করতে হাত বাড়াতুম, অমনি তখনিই তা বদলে গিয়ে আবার ফটোগ্রাফের ছবি হয়ে দাঁড়াত। শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হয়ে দেখলুম যে, লাহিড়ী মহাশয় আমার মনে ফ্রেমে আঁটা একটা ছোট ছবি থেকে একটি জীবন্ত ভাবসঞ্চারী সত্তায় পরিণত হয়েছেন। সঙ্কটকালে ও বুদ্ধিবিপর্যয়ে আমি প্রায়ই তাঁর নিকট প্রার্থনা করতুম আর অন্তরে তাঁর সান্ত্বনাদায়ক অভয়বাণীর নির্দেশ পেতুম।

তিনি সশরীরে বর্তমান না থাকাতে প্রথম প্রথম বড়ই দুঃখ বোধ করতুম। কিন্তু পরে যখন তাঁর গূঢ় সর্বব্যাপিত্ব আমার কাছে প্রকাশ হতে শুরু হল, তখন আর আমার ক্ষোভের কোন কারণ রইল না। তাঁর দর্শনের জন্য অতি

---

* ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে মানবকে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাতীত চৈতন্যের সহিত সাযুজ্য-লাভের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য লাহিড়ী মহাশয় নির্দেশিত যৌগিক প্রণালী। (২৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উৎসুক শিষ্যদিগকে তিনি প্রায়ই লিখতেন, "দেখ, তোমাদের কূটস্থের (আধ্যাত্মিক দর্শন) মধ্যেই যখন আমি সর্বদা রয়েছি,তখন এই হাড়মাংসের খাঁচাটা আর দেখতে আসা কেন ?"

প্রায় আটবছর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোগ্রাফের কৃপায় আমার একবার অত্যাশ্চর্যভাবে রোগমুক্তি ঘটেছিল। এই ঘটনা আমার ভক্তিকে আরও গাঢ়তর করে তুলেছিল। বাংলা দেশে একবার আমাদের পৈতৃক ইছাপুরের বাড়ীতে থাকার সময় আমি দারুণ এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হই। জীবনের আর কোন আশাই রইল না। ডাক্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। রোগশয্যার পাশে বসে মা আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির দিকে ইঙ্গিতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য প্রাণপণে উন্মত্তের মত চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি জানতেন, আমি এত দুর্বল যে প্রণাম করবার মত হাত তোলবার ক্ষমতাও আমার নাই। তাই বললেন, "মনে মনে প্রণাম কর। যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি থাকে, আর মনে মনে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, তা হলেই তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে।"

আমি ফটোগ্রাফের দিকে চেয়েই রইলুম। হঠাৎ দেখলুম, সেখানে এক চোখঝলসান উজ্জ্বল আলো, আমার সমস্ত শরীর আর ঘর ছেয়ে ফেললে। আমার বমির ভাব আর অন্যান্য প্রবল উপসর্গসকল একেবারে অন্তর্হিত হল। আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলুম। গুরুর প্রতি মায়ের অপরিমেয় বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে যথেষ্ট শক্তিও আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলুম। মা বারম্বার সেই ক্ষুদ্র ছবিটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, "হে সর্বব্যাপি গুরুদেব, আপনার জ্যোতিঃই আমার সন্তানকে রক্ষা করেছে, আপনাকে প্রণাম, আপনাকে প্রণাম।" আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, তিনিও সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন, যার দ্বারা আমি সেই সাংঘাতিক করাল ব্যাধি হতে সদ্যসদ্য মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলুম।

আমার সর্বাপেক্ষা অমূল্য সঞ্চয়গুলির মধ্যে হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফটি। পুণ্যস্পন্দ সেই প্রতিকৃতিটি লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং পিতাকে দিয়েছিলেন। ছবিটির একটি অলৌকিক কাহিনী ছিল। পিতার গুরুভাই শ্রীকালীকুমার রায় মহাশয়ের কাছ থেকে আমি গল্পটি শুনেছি।

মনে হয়, লাহিড়ী মহাশয় তাঁর কোন ফটোগ্রাফ তুলতে দিতে একান্ত বিরূপ ছিলেন। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীকালীকুমার রায় সমেত একদল শিষ্যের সঙ্গে

তাঁর একটা গ্রুপ ছবি একবার তোলা হয়। ফটোগ্রাফার মহাশয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে, প্লেটে যদিও অন্যান্য শিষ্যদের ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু মাঝখানে যে স্থানে তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতি স্বভাবতই দেখবেন বলে আশা করেছিলেন, সে স্থানটি একেবারে শূন্য, কিছুই নেই। এই অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ত বহু সোরগোল চলল।

গঙ্গাধর বাবু ছিলেন তাঁর শিষ্য এবং একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের পলাতক মূর্তি এবার আর তাঁর হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না। তার পরদিন সকাল বেলায় গুরুদেব যখন পিছনে পরদা টাঙান একটা কাঠের বেঞ্চিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, গঙ্গাধরবাবু তখন তাঁর সাজসরঞ্জাম সমেত এসে উপস্থিত হলেন। সাফল্যলাভের জন্য সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করে সোৎসাহে তিনি বারটি প্লেট একে একে এক্সপোজার দিলেন। আশ্চর্য! প্রত্যেকটাতেই তিনি দেখলেন যে, কাঠের বেঞ্চ ও পরদার ছাপ উঠেছে, কিন্তু এবারেও তাদের কোনটাতেই গুরুদেবের মূর্তি নাই।

দর্পচূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাধর বাবু ত সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে লাহিড়ী মহাশয় অর্থপূর্ণ বাণীতে বললেন, "আমিই সেই আত্মা। তোমার ক্যামেরা কি যা সর্বব্যাপী আর যা দৃষ্টিরও অগোচর, তার ছবি তুলতে পারে?"

"তাইত দেখছি—পারে না'ইত বটে! কিন্তু ঠাকুর, আপনার দেহ-মন্দিরটির একটি ছবি পেতে যে আমার বড্ডই ইচ্ছে করছে। সত্যিই আমার দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষুদ্র—যদি না আজ বুঝতে পারতুম যে সেই বিরাট আত্মা পরিপূর্ণভাবেই আপনার মধ্যে বিরাজমান।"

"তাহলে কাল সকালে এসো, তোমার জন্য আমি বসব্।" আবার ফটোগ্রাফার মহাশয় ছবি তুললেন। এবার কিন্তু সেই পুণ্যমূর্তি রহস্যময় অদৃশ্যাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে প্লেটের উপর অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল।

ফটোগ্রাফটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। সর্বজনোচিত সুঠাম গঠন, লাহিড়ী মহাশয়ের গৌরবর্ণ সুন্দর আকৃতি কোন্ জাতির, তা সহসা বুঝে উঠা কঠিন। ঈশ্বরসঙ্গলাভের আনন্দ তাঁর রহস্যময় মৃদু হাসিতে ঈষৎ প্রকাশিত। তাঁর নয়ন দুটি অর্ধোন্মীলিত অবস্থায় বহির্জগতের দিকে নাম মাত্র নিবন্ধ, আবার ভূমানন্দলাভের গভীর অনুভবের দ্যোতক—অর্ধনিমীলিতও বটে। পার্থিব জগতের তুচ্ছ আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে, তাঁর কৃপাপ্রার্থী সমাগত নরনারীদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে তিনি কিন্তু সর্বদাই জাগরূক ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতির অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আরোগ্যলাভের অল্পকাল পরেই আমার এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ হয়।

একদিন সকাল বেলায় বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই এক জাগর স্বপ্নে মগ্ন হলুম। "বন্ধ চক্ষুর অন্ধকারের অন্তরালে কি আছে", এই মর্মসন্ধানী প্রশ্নই মনের গহনে প্রবল ভাবে উদয় হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চক্ষুর সামনে এক বিরাট জ্যোতির স্ফুরণ হল। পর্ব্বতগুহার মধ্যে ধ্যানে উপবিষ্ট সাধু-সন্তদিগের দিব্যমূর্তিসকল আমার ললাটের ভিতর প্রশস্ত জ্যোতিঃপটে সিনেমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মত প্রতিভাত হল।

উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলুম, "আপনারা কে?" উত্তর এল, "আমরা সব হিমালয়ের যোগী।" সে স্বর্গীয় বাণী বর্ণনা করা কঠিন। হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল।

বললুম, "আমারও অন্তরের একান্ত বাসনা যে, হিমালয়ে গিয়ে আপনাদের মত যোগী হই।" দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রজতরশ্মিরেখা ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে পড়তে লাগল।

প্রশ্ন করলুম, "এই অপূর্ব আলোর ছটা কিসের?" মেঘমন্দ্রধ্বনিতে উত্তর এল, "আমিই ঈশ্বর,* আমিই জ্যোতিঃ!" বললুম "আমি তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই!" তারপর সেই স্বর্গীয় আনন্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। তার ভিতর থেকে আমি ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রেরণা লাভ করবার চির উত্তরাধিকার খুঁজে পেলুম। "তিনি শাশ্বত, তিনি চিরনবীন আনন্দ!" —এই স্মৃতি, সেই পরমানন্দ লাভের দিন হতে বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল।

* * * *

আর একটি কৈশোরের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান, কারণ আজ পর্যন্তও তার ক্ষতচিহ্ন আমি অঙ্গে বহন করে বেড়াচ্ছি।

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদিদি আর আমি একদিন সকালে আমাদের গোরক্ষপুরের বাড়ীর উঠানে এক নিমগাছের তলায় বসে আছি। নিকটস্থ টিয়াপাখীদের পাকা নিমফল খাওয়া দেখার ফাঁকে ফাঁকে একটা বাংলা শিশুপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে তার কাছে আমার পাঠাভ্যাস চলছিল। পায়ে ফোড়া হয়েছে বলে উমাদিদি একটা মলমের শিশি আনলো। মলমের খানিকটা আঙ্গুলে নিয়ে আমিও আমার হাতের উপর লাগিয়ে দিলুম। উমাদিদি বললে,

---

* ঈশ্বর—ঈশ্ (আধিপত্য করা)—বর। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্তা। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের হাজার নাম আছে, প্রত্যেকটাই বিভিন্ন দার্শনিক অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি, যাঁর ইচ্ছায় কালচক্রে আবর্তিত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সংঘটিত হয়।

"শুধু শুধু সুস্থ হাতে মলম লাগান হচ্ছে কেন?" বললুম, "দেখ দিদি, আমার মনে হচ্ছে কাল আমার হাতে একটা ফোড়া বের হবে। যে জায়গায় ফোড়াটা বেরোবে, সেইখানে তোমার মলমটা লাগিয়ে দেখ্‌ছি!"

"ধ্যেৎ, মিথ্যুক কোথাকার!"

"দিদি, খবরদার আমায় মিথ্যুক বোলো না; আগে দেখ যে, কাল সকাল বেলা কি হয়।" ক্রোধে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

উমাদিদির মনে কিন্তু কোন রেখাপাত হল না। উপরন্তু বার তিনেক ত আমায় টিট্‌কারি দিলে। স্বরে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে ধীরে ধীরে বললুম, "আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই আমি বলছি যে, কাল আমার হাতে ঠিক এই জায়গাটিতেই বেশ বড়গোছের একটি ফোড়া বেরোবে, আর তোমার ফোড়াটি এই সাইজের ঠিক ডবল হয়ে ফুলে উঠবে, দেখো।"

সকাল বেলায় দেখা গেল, ঠিক নির্দিষ্ট স্থানটিতে আমার একটি সুপুষ্ট ফোড়া উঠেছে আর উমাদিদির ফোড়াটির আকার দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে দিদি ত মাকে বলতে ছুট্‌ল যে, মুকুন্দ একটি যাদুকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা সব দেখে শুনে গম্ভীরভাবে আমায় বারণ করলেন যাতে করে আমি কারও কোন ক্ষতি করবার জন্য যেন বাক্যের শক্তির কখনও অপব্যবহার না করি। আমিও তাঁর উপদেশ সর্বদা স্মরণে রেখে আজ পর্যন্ত তা পালন করে এসেছি।

আমার ফোড়াটিতে অস্ত্রোপচার করতে হল। ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগের সুস্পষ্ট চিহ্ন আজ পর্যন্তও আছে। মানুষের কেবল মাত্র বাক্যের শক্তির নিত্য-স্মারক স্বরূপ সেই ক্ষতচিহ্ন আমার দক্ষিণহস্তের উপর বিরাজমান।

উমাদিদির প্রতি ঐ সব সরল আর আপাতনির্দোষ কথাগুলি গভীর একাগ্রতার সঙ্গে উচ্চারিত হবার সময় অন্তর্নিহিত শক্তিবলে বোমার মতন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, ক্ষতিকর অথচ নিশ্চিত ফল প্রসব করেছিল। পরে অবশ্য আমি বুঝেছিলুম যে, বাক্যের ভিতরকার বিস্ফোরক স্পন্দনশক্তি, সুবিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষের জীবনকে আপন্মুক্ত করতে পারা যায়, আর তার ক্রিয়াপ্রকাশের জন্য ক্ষতচিহ্ন উৎপাদন বা তার জন্য ভর্ৎসনালাভ, কিছুরই প্রয়োজন হয় না।*

---

* ওংকারধ্বনি হতেই শব্দের অসীম শক্তির উৎপত্তি। এই প্রণব ঝংকারই হচ্ছে সকল আণবিক শক্তির মধ্যে নিহিত মহাব্যোমের স্পন্দনশক্তি। কোন বাক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধি আর গভীর একাগ্রতা বলে উচ্চারিত হলে—তার একটা প্রত্যক্ষ ফললাভ দেখা যায়। কোন ভাবোদ্দীপক বাক্যের উচ্চৈঃস্বরে বা নীরব আবৃত্তি যে ফলপ্রসূ, তা মানসচিকিৎসা প্রণালীতে দেখা গেছে। এর গুপ্তরহস্য হচ্ছে মনের স্পন্দনশক্তির গতিবেগের ক্রমবিবর্ধন।

আমাদের পরিবারের সকলে পাঞ্জাবের লাহোর শহরে চলে গেল। সেখানে আমি মা কালীর* একখানি পট সংগ্রহ করে নিলুম। সেটিকে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় কুলুঙ্গির মত ছোট একটী পূজার জায়গায় স্থাপন করলুম। আমার মনে তখন এই অখণ্ড বিশ্বাস হল যে, সেই পুণ্যপীঠে যে প্রার্থনাই উচ্চারণ করি না কেন, তা নিশ্চয়ই সফল হবে।

একদিন সেখানে উমাদিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলুম যে, সামনের খুব সরু গলির বিপরীত দিকের বাড়ীগুলোর ছাদের উপর দুটো ছেলে ঘুঁড়ি উড়াচ্ছে।

উমাদিদি আমায় একটা ঠোনা দিয়ে বললে, "কিগো, তুমি এত চুপচাপ কেন ?" বললুম, "আমি কেবল ভাবছি যে কি আশ্চর্য্য বল দেখি, মা কালীর কাছে আমি যা-ই চাই না কেন তাই পাব।"

ভগিনী ত ঠাট্টার হাসি হেসে বললে, "মা কালী তোমায় বোধহয় ঐ ঘুঁড়ি দুটিও পাইয়ে দেবেন।"

"তাই বা হবে না কেন ?" বলে ঘুঁড়ি দুটি পাবার জন্যে নীরবে প্রার্থনা শুরু করে দিলুম।

ভারতবর্ষে ঘুঁড়ির সুতায় বোতলচূর আর সিরিশের মাঞ্জা দিয়ে প্যাঁচ কাটাকাটি খেলা হয়। একপক্ষ অপরপক্ষের ঘুঁড়ি প্যাঁচ কেটে ফেলে দিতে চেষ্টা করে। সুতাকাটা ঘুঁড়ি, ছাদের উপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যায় আর তা ধরে ফেলাতে প্রচুর আমোদ। যেহেতু উমাদিদি আর আমি ছাদে ঢাকা একটা বারান্দার কোণে ছিলুম, সেহেতু প্যাঁচকাটা ঘুঁড়ি যে আমাদের হাতে এসে পড়বে, তা একরকম অসম্ভব বলেই বোধ হল—কারণ স্বভাবতঃই তার সুতা ছাদের উপরই ঝুলতে থাকবে।

গলির ওপাশের লোকগুলো ঘুঁড়ির প্যাঁচ কাটাকাটি শুরু করে দিলে। একটার সুতা কাটা যেতে তৎক্ষণাৎ সেটা আমাদের দিকে ভেসে এল। হঠাৎ হাওয়া থেমে যাওয়াতে সেটা মুহূর্ত্তেক স্থির হয়ে বিপরীত দিকের বাড়ীর ছাদের উপর একটা ফণীমনসা গাছে তার সুতা বেশ শক্তভাবে জড়িয়ে গেল, আর আমার ধরবার জন্য বেশ চমৎকার একটা লম্বা ফাঁসও তৈরী হয়ে গেল। উমাদিদিকে ঘুঁড়িটি উপহার দিলুম।

উমাদিদি বললে, "এ একটা অদ্ভুত দৈব ঘটনা, এ তোমার প্রার্থনার ফল নয়। ঐ ঘুঁড়িটাও যদি তোমার কাছে আসে তবেই আমি তা বিশ্বাস করতে

* কালী—অনন্তরূপিণী প্রকৃতির মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রতীক।

পারব।" কথার চেয়ে তার কালো চোখ দুটিতে আরও গভীরতর বিস্ময় ফুটে উঠল।

আমি গভীরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম। অপর লোকটি সজোরে টান দিতেই হঠাৎ তার ঘুঁড়িটার সুতো ছিঁড়ে গেল। হাওয়ায় নাচতে নাচতে ঘুঁড়িটা আমার দিকেই ভেসে এল। আমার সহায় সেই ফণীমনসার গাছটি, যাতে করে আমি ধরে ফেলতে পারি, এমন ভাবে ঘুঁড়ির সুতোয় ফাঁসটি বানিয়ে সেটাকে গাছে আটকে ফেললে। এবারেও আমার দ্বিতীয় বিজয়চিহ্নটি উমাদিদিকে উপহার দিলুম।

"সত্যিই ত মা কালী তোমার কথা শোনেন! ওরে বাবা, এসব যেন ভেল্কি-বাজি!" বলে ভয়ত্রস্তা হরিণীর মতই দিদি ছুটে পালাল।

২য় পরিচ্ছেদ

আমার মাতৃবিয়োগ ও মন্ত্রপূত কবচ

মায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেন। "হায় রে, কবে অনন্তর বৌয়ের মুখ দেখে মর্ত্যে স্বর্গসুখ দেখতে পাব!" বংশরক্ষার প্রবল আগ্রহে মাকে প্রায়ই এই রকম করে খেদ প্রকাশ করতে দেখতুম।

অনন্তদার পাকা-দেখার সময় আমার বয়স বছর এগার। মা কলকাতার পরমানন্দে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। কেবল পিতা আর আমি তখন উত্তর ভারতের বেরিলী সহরে আমাদের বাড়ীতে ছিলুম। বছর দুই আগে পিতা ওখানে লাহোর থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

পূর্বে আমি আমার দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী রমা ও উমাদিদির বিবাহে খুব ঘটা দেখেছিলুম। কিন্তু বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র বলে অনন্তদার বিবাহের আয়োজন সত্যই খুব বিরাট গোছের হয়েছিল। প্রত্যহই দূরদূরান্তর হতে নানা আত্মীয়কুটুম্ব পরিজনেরা সব এসে পড়ছেন। তাঁদের আদর আপ্যায়নে মা খুবই ব্যস্ত। ৫০নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে সদ্যসংগৃহীত একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁদের আরামে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরাট ভোজের নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, দাদা যে চতুর্দোলায় চড়ে কনের বাড়ী যাবেন—সেই চতুর্দোলা, রঙীন আলোর সারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজের হাতী ও উট প্রভৃতি, ইংরেজী, স্কটিশ ও দেশী ব্যাণ্ড বাজনা, পেশাদারী গাইয়ে বাজিয়ের দল, বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণাদি সবই প্রস্তুত।

পিতা ও আমি উৎফুল্ল মনে, বিবাহ উৎসবে ঠিক সময়মত বাড়ীতে গিয়ে হাজির হব বলে স্থির করেছিলুম। কিন্তু সেই বিবাহ দিবসের অব্যবহিত পূর্বেই আমি একটা অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখলুম।

বেরিলীর বাংলো বাড়ীর বারান্দায় পিতার কাছে ঘুমচ্ছি। রাত তখন দুপুর। বিছানার উপর মশারির গায়ে তখন একটা অদ্ভুত ঝটপটানির শব্দ শুনে জেগে উঠলুম। মশারির পাতলা কাপড় সরে গেল, দেখতে পেলুম, সেখানে মায়ের স্নেহময় মুখখানি!

ফিস্ ফিস্ করে তিনি বললেন,—"মুকুন্দ, তোমার বাবাকে এক্ষুণি ডেকে তোল—আর আমায় যদি শেষ দেখা দেখতে চাও তো ভোর চারটের গাড়ী ধরে কলকাতায় শীগ্গির রওনা হয়ে পড়।" বলেই ছায়ার মত মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

"বাবা, বাবা, মা যে মারা যাচ্ছেন!" আমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর তাঁকে তখনই জাগিয়ে তুললো। কাঁদতে কাঁদতে আমি তাঁকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ জানালুম।

এই নূতন পরিস্থিতিকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অগ্রাহ্য করে তিনি বললেন, "ও তোমার মনের ভুল, কিচ্ছু ভেব না, তোমার মা বেশ ভালই আছেন। যদিই বা কোন খারাপ খবর আসে, তবে কালই আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

"এক্ষুণি না বেরোলে আপনি নিজেকে কোন কালেও ক্ষমা করতে পারবেন না।" মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষোভে আমি রাগের চোটে বলে ফেললুম, "আমিও আপনাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না।"

বিষাদাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল সুস্পষ্ট সংবাদ বহন করে এসে উপস্থিত—"মাতা সাংঘাতিক পীড়িত, বিবাহ স্থগিত, এখনই চলে আসুন।"

পিতা আর আমি পাগলের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। পথে গাড়ী বদল করবার সময় আমার এক খুল্লতাত মহাশয় দেখা করতে এলেন। দেখি যে, একটা ট্রেন একটি ক্ষীণ বিন্দু হতে বিরাট আকার ধারণ করতে করতে বজ্রগর্জনে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। মনের ভিতর দারুণ বিপ্লবের মধ্যে হঠাৎ একটা দৃঢ় সংকল্পের উদয় হল যে, এবার রেল লাইনের উপর লাফিয়ে পড়ি। আমার মনে হতে লাগল যে, মাকে হারিয়ে মরুভূমির মত এই হঠাৎ অন্তঃসার-শূন্য পৃথিবী আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। এ জগতে মাকেই আমি আমার সবার চেয়ে প্রিয় সাথী বলে ভাবতুম। তাঁর স্নেহকোমল সান্ত্বনামধুর কালো চোখ দুটি আমার শৈশবের তুচ্ছ ব্যথাবেদনার পরম আশ্রয়স্থল ছিল।

খুড়োমহাশয়কে একটি মাত্র শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য দাঁড়িয়ে বললুম, "মা কি এখনও বেঁচে আছেন?" আমার মুখে দারুণ হতাশার ভাব লক্ষ্য করতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় নি। তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনাচ্ছলেই বললেন, "নিশ্চয়ই, তিনি বেঁচে আছেন বই কি।" আমি কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলুম না।

কলকাতার বাড়ীতে পা দিতেই হৃদয়স্তম্ভক মৃত্যুরহস্যের সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালুম। আমি ত একেবারে অবসন্ন হয়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লুম। মনের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য আবার ফিরে আসতে আমার বহুবৎসর কেটে গিয়েছিল।

স্বর্গের দুয়ার ভেদ করেই যেন আমার আর্তক্রন্দন অবশেষে জগন্মাতার চরণপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছাল। মনের রক্তঝরা ক্ষতস্থানে কে যেন পরম শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। জগজ্জননীর অভয়বাণী কানে এসে পৌঁছাল—

"বহু জনমের বহু জননীর স্নেহের ভিতর দিয়েই আমি তোমার উপর দৃষ্টি রেখে এসেছি। এ জনমের তোমার মায়ের সুন্দর কালো চোখ দুটি, যা তুমি আজ হারিয়ে ফেলেছ, চেয়ে দেখ, আমারই দৃষ্টিতে তুমি তাকে আবার খুঁজে পাবে !"

পরম স্নেহময়ী জননীর শ্রাদ্ধশান্তির পর, পিতা আর আমি আবার বেরিলীতে ফিরে গেলুম। আমাদের বাংলোর সামনে যেখানে সোনালী সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল মাঠের উপর একটি বড় শিউলি গাছ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে, প্রত্যহ সকালে সেখানে যেতুম শোকের পুণ্যস্মৃতিতীর্থ দর্শনের জন্য। কবিকল্পনায় মনে হত, যেন শুভ্র শেফালিগুচ্ছ স্বতঃ উৎসারিত ভক্তি নিবেদনে নিজেদের উৎসর্গ করে তৃণবেদীর উপর ছড়িয়ে পড়ছে ! শিশিরের সঙ্গে অশ্রুকণার মিলনে আমি দেখতে পেতুম যে, অন্য জগতের একটি অপরূপ আলো যেন উষার অরুণাঞ্চল হতে ঝরে পড়ছে। ঈশ্বরলাভের দারুণ আকাঙ্ক্ষার গভীর আকুলতা আমায় অভিভূত করে ফেলত। হিমালয় যেন আরও প্রবলভাবে আমায় আকর্ষণ করছে অনুভব করতুম।

পুণ্য হিমাচলপ্রদেশ ভ্রমণ শেষ করে, আমার এক জ্ঞাতিভাই বেরিলীতে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। যোগি-স্বামীদের* আবাসস্থল তুঙ্গশীর্ষ সেই সব পার্বত্য প্রদেশের অপরূপ কাহিনী সকল আমি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই শুনতুম।

আমাদের বেরিলীর বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে দ্বারকাপ্রসাদের কাছে একদিন প্রস্তাব করলুম, "চল, হিমালয়ে পালান যাক্।" কিন্তু সেতো সে কথা কানে তুললেই না, বরং উলটে বড়দার কাছে আমার সব মতলব ফাঁস করে দিলে। বড়দাদা তখন পিতাকে দেখতে বেরিলীতে এসেছেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র বালকের এইসব অসম্ভব পরিকল্পনা একটু লঘুভাবে হেসে উড়িয়ে দেবার পরিবর্তে অনন্তদা আমাকে ঠাট্টা করবার মতলবেই বললেন, "তোমার গেরুয়া বসন কোথায় হে ? এ্যাঁ,—ওছাড়া ত' তুমি আর সন্ন্যাসী হতে পার না !"

কিন্তু কি আশ্চর্য ! তাঁর এই কথাগুলোতে আমিকিন্তু এক অবর্ণনীয় আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলুম। কথাগুলো একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুললে ; আমি যেন সন্ন্যাসীবেশে ভারত পরিভ্রমণে রত। বোধ হয় তাতেই আমার অতীত জীবনের একটা হারানো স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। যাই হোক আমি দেখতে পেলুম যে, কত সহজে আর কত শীঘ্র আমি প্রাচীন সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন গৈরিকবসন ধারণ করবার সুযোগ পাব।

---

* স্বামী—স্ব (আত্মা) + মিন্, যিনি আত্মার সহিত এক।

একদিন সকালে দ্বারকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পেলুম যে, ঈশ্বর-প্রেমের বন্যা যেন আমার অন্তরে মহাপ্লাবনের বেগে নেমে আসছে। বাক্যালাপের উচ্ছ্বাসে আমার সঙ্গীর মন তখন আংশিক সন্নিবিষ্ট—আমি কিন্তু সে সময় অন্তরে কান পেতে কার যেন নীরব বাণী শুনছিলুম।

সেই দিন বৈকালেই আমি হিমালয়ের পাদদেশে নৈনিতাল শহরে পলায়ন করলুম। অনন্তদাও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমার পিছু পিছু এসে আমায় ধরে ফেললেন। বিষণ্ণচিত্তে বেরিলীতে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলুম। একমাত্র তীর্থভ্রমণের সুযোগ ছিল, আমার সেই অভ্যস্ত শিউলিতলায় ভোর-বেলায় বেড়াতে যাওয়া। আপন জননী আর জগজ্জননী এ দুজনকেই আজ হারিয়ে আমার অন্তর কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল।

মায়ের মৃত্যুতে পারিবারিক বন্ধনে যে শূন্যতা এল তা অপূরণীয়। পিতা তাঁর জীবনের অবশিষ্ট প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর দারপরিগ্রহ করলেন না। দেখা গেল যে, তাঁর ক্ষুদ্র সন্তানদলের একাধারে পিতামাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তিনি আরও স্নেহকোমল, আরও সহজলভ্য হয়ে উঠলেন। ধীরতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বহু পারিবারিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন। অফিস হতে ফিরবার পর তিনি নিজের ঘরে ঢুকে কঠিনব্রত তাপসের মত একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে ক্রিয়াযোগানুশীলনে রত হতেন। মায়ের মৃত্যুর বহুকাল পরে পিতা যাতে জীবনে আর একটু আরাম পান, আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেন, সে জন্য তাঁর সুখসুবিধার খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় একটু লক্ষ্য রাখবার জন্য একজন ইংরেজ নার্স রেখে দেবার চেষ্টা করেছিলুম। পিতা কিন্তু মাথা নেড়ে তা বারণ করলেন।

জীবনব্যাপী সুগভীর প্রীতিতে স্নিগ্ধ তাঁর দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত করে তিনি বললেন, "তোমার মায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমারও সেবা যত্ন নেবার আগ্রহ সব ঘুচে গেছে। আর আমি অন্য কোন স্ত্রীলোকের পরিচর্যা গ্রহণ করব না।"

মায়ের স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে জানতে পারলুম যে, মা আমার জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলে গেছেন। অনন্তদা তাঁর মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই সেই কথাগুলো লিখে রেখেছেন। যদিও মা বছরখানেকের মধ্যেই আমার কাছে ঐ কথাগুলো প্রকাশ করে বলতে বলে-ছিলেন, কিন্তু অনন্তদা তা করেন নি, দেরি করছিলেন। কিন্তু এবার তাঁকে শীঘ্রই বেরিলী ছেড়ে কলকাতায় যেতে হবে—মায়ের সেই পছন্দকরা মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য; কাজেই একদিন সন্ধ্যার সময় আমায় কাছে ডেকে বললেন,

"মুকুন্দ, আমি তোমায় এ অদ্ভুত খবরটা দিতে অনিচ্ছুকই ছিলুম।" তাঁর স্বরে হতাশা ও নিরুপায়ের ভাব,—"আমার বড় ভয় ছিল যে, এতে তোমার বাড়ী থেকে পালানর মতলব আবার জেগে উঠবে। কিন্তু যাই হোক, মন তোমার এখন দৈব উদ্দীপনায় পূর্ণ। হিমালয়ের রাস্তা থেকে সম্প্রতি তোমায় যখন পাকড়ে আনলুম, তখনই মন একেবারে স্থির করে ফেললুম। এবার আমি আমার গুরু প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে আর বেশী দেরী করব না।" এই বলে অনন্তদা আমার হাতে একটি ছোট বাক্স দিলেন। মায়ের কথিত বিবরণের সম্পূর্ণ লেখাটি তার মধ্যে ছিল।

মা বলেছিলেন, "আমার প্রিয় পুত্র মুকুন্দ! এই কথাগুলোই তোমার কাছে আমার শেষ আশীর্বাদ। তোমার জন্মের পর কতকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, তা বলবার এখনই সময় এসেছে। আমার কোলে যখন তুমি নিতান্ত ছোট্ট শিশুটি ছিল তখনই তোমার জন্যে নির্দিষ্ট পথ যে কি, তা আমি প্রথম জানতে পারি। সে সময় আমি তোমায় একবার কাশীতে আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই।

"যোগিরাজ লাহিড়ী মশায় তখন গভীর ধ্যানে বসে আছেন। চারিদিকে বহু শিষ্য তাঁকে ঘিরে আড়াল করে,—অতি অল্পই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। কোলে শুইয়ে তোমায় চাপড়াচ্ছি আর মনে মনে নিবেদন করছি, গুরুদেব যেন তোমায় দেখতে পেয়ে তোমায় তাঁর আশীর্বাদ দেন। আমার নীরব প্রার্থনা গভীর থেকে গভীরতর হতে তিনি চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন আর তাঁর কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সকলে তখন আমায় রাস্তা করে দিতে, আমি গিয়ে তাঁর সেই পুণ্যপদতলে প্রণাম করলুম। আমার গুরুদেব তখন তোমায় কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত তোমার কপালে হাত রেখে বললেন,—'মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে।"

"সর্বদর্শী গুরুদেব আমার গোপন প্রার্থনা পূর্ণ করায় আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। তোমার জন্মাবার কিছু আগেই কিন্তু তিনি আমায় বলেছিলেন যে, তুমি তাঁরই পথ অনুসরণ করবে।

"তারপর বাছা, তোমার দিদি রমা আর আমি তোমার সেই বিরাট জ্যোতিঃদর্শনের কথা জানতে পারি। কারণ পাশের ঘর থেকে তোমায় বিছানার উপর নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেলুম; তোমার ছোট্ট মুখখানি স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। ঈশ্বরলাভের জন্য হিমালয়ে যাবার কথা বলবার সময়, দেখলুম যে, তোমার কণ্ঠস্বরে লৌহকঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ় প্রকাশ!

"এই সব কারণে বাছা, আমি টের পেয়েছিলুম যে, তোমার জীবনের পথ এই সব পার্থিব বাসনাকামনা হতে বহুদূরে। আর তা ছাড়া আমার জীবনে সবচেয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা এ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। ঘটনাটি এমনই অলৌকিক যে, আমি আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তোমায় তা জানাতে বাধ্য হচ্ছি!

"সেটা হচ্ছে পাঞ্জাবে থাকতে একটি সাধুর দর্শনলাভ। লাহোরে তখন আমাদের পরিবারের সকলেই রয়েছেন। একদিন সকালে বাড়ীর চাকরটা হঠাৎ আমার ঘরে এসে বললে, 'গিন্নিমা, এক অদ্ভুত গোছের সাধু* আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তিনি বলছেন যে, তিনি মুকুন্দর মা'র সঙ্গে দেখা করতে চান।'

"এই নিতান্ত সরল আর সোজা কথাগুলো কিন্তু আমার হৃদয়তন্ত্রীতে গভীর ভাবে আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ আমি সাধুটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেলুম। পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতেই টের পেলুম—আমার সামনে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে।

"তিনি বললেন, 'মা, সিদ্ধপুরুষ মহাগুরুগণ তোমায় জানিয়ে দিতে চান যে, পৃথিবীতে তোমার অবস্থান আর বেশীদিন নয়। এর পরের অসুখই হবে তোমার শেষ অসুখ।'** তারপর এল এক গভীর নিস্তব্ধতা, তার মাঝে আমি এক প্রগাঢ় শান্তির স্পন্দন ছাড়া কোন ভয়ই আর টের পেলুম না। অবশেষে তিনি পুনরায় আমায় বললেন,—'তোমার কাছে একটি রুপোর কবচ গচ্ছিত থাকবে। এ কিন্তু তোমায় আমি আজ দিয়ে যাব না। আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য, কাল যখন পুজোয় বসবে, কবচটি তখন আপনাআপনিই তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। তোমার মৃত্যুশয্যায় তোমার বড়ছেলে অনন্তকে কিন্তু অতি অবশ্য বলে যাবে যে, কবচটি এক বছর তার কাছে রাখবার পর সে যেন তোমার দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দকে সেটি দিয়ে দেয়। মুকুন্দ এর মর্ম মহাপুরুষদের কাছ হতেই জানতে পারবে। পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা সব ত্যাগ করে সে যখন ঈশ্বরানুসন্ধানের জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত, প্রায় সেই

* সাধু—সন্ন্যাসী, যিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অবলম্বন করেন।

** এই কথাগুলির মধ্যে যখন আমি আবিষ্কার করলুম যে, মা তাঁর স্বল্পায়ুর কথা গোপনে জানতে পেরেছিলেন, তখনই আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারলুম যে, কেন তিনি অনন্তদার বিবাহের সব আয়োজন তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। যদিও বিবাহের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবুও তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল—বিবাহ উৎসবটি দেখবার জন্য।

সময় নাগাদ সে এটা পেয়ে যাবে। কবচটি কিছুকাল ধারণ করবার পর, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই কবচটিও অন্তর্ধান করবে। যতদূরে গোপনীয় স্থানেই লুকিয়ে রাখা হোক্ না কেন, কবচটি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই আবার ঠিক ফিরে যাবে।'

"আমি সাধুটিকে ভিক্ষাদান করে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করলুম। কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ না করেই তিনি আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন। তার পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়, হাত জোড় করে ধ্যানে বসেছি, এমন সময় ঠিক সেই সাধুটির কথামত একটি রূপোর কবচ আমার হাতের মাঝখানে এসে গেল,—তা টের পেলুম, বেশ একটা ঠাণ্ডা আর মোলায়েম স্পর্শে। দু'বছরেরও বেশী আমি কবচটিকে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করে এসেছি। এখন অনন্তর হাতে দিলুম। আমার জন্য শোক কোরোনা মুকুন্দ। গুরুমহারাজ আমায় অনন্তের কোলে নিয়ে যাবেন। চললুম বাবা, মা জগদম্বাই তোমায় রক্ষা করবেন।"

কবচটি পেয়ে যেন অন্তরে জ্ঞানাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। বহু সুপ্ত স্মৃতি জাগরিত হল। গোলমত পুরান সেই অদ্ভুতধরণের সুন্দর কবচটির উপর সংস্কৃত অক্ষরে কি সব খোদাই করা ছিল। আমি জানতে পেরেছিলুম যে, যাঁরা অদৃশ্যভাবে আমার জীবনপথে আমায় পরিচালিত করছিলেন, সেই সব পূর্বজীবনের গুরুমহারাজদের কাছ থেকেই সেটি এসেছিল। এর অন্য একটা উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবচের* ভিতর যে কি আছে তা কেউ সম্পূর্ণ প্রকাশ করে বলে না।

---

* কবচটি অলৌকিক উপায়ে প্রস্তুত হয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী পদার্থে গঠিত এরূপ দ্রব্য-সকল আমাদের এ পৃথিবী হতে শেষ পর্যন্ত অদৃশ্যই হয়ে যায়। (৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কবচটির উপর কতকগুলি মন্ত্র খোদিত ছিল। শব্দ এবং বাক্ অর্থাৎ মানব কণ্ঠস্বরের শক্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা হয়েছিল, এমন আর কোথাও হয় নি। মহাবিশ্বের মধ্যে নিয়ত ঝঙ্কৃত প্রণবধ্বনির (বাইবেলের "শব্দ" অথবা "বহু সমুদ্রের গর্জন") মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনগুণের প্রকাশ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১:৮)। মানবের প্রত্যেকবার শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রণবধ্বনির এই তিনটি গুণের একটি ক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষ যে সর্বদা সত্যকথা বলবে, সকল শাস্ত্রবিধির এই হচ্ছে বিধিসঙ্গত কারণ।

কবচের উপর খোদিত সংস্কৃত মন্ত্র, শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হলে আধ্যাত্মিক হিতকর স্পন্দন-শক্তিবিশিষ্ট হয়। আদর্শগঠন পঞ্চাশটি বর্ণের সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের একটি করে সুনির্দিষ্ট, আর অপরিবর্তনীয় উচ্চারণ আছে। ল্যাটিন উদ্ভূত ইংরেজী বর্ণমালা, যাতে ছাব্বিশটি অক্ষরের শব্দভার বহনের নিস্ফল চেষ্টা দেখা যায়, তার শব্দগত দৈন্যের উপর জর্জ বার্ণার্ড শ একটি সুচিন্তিত ও সরস প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মিঃ শ তাঁর অভ্যস্ত

কেমন করে কবচটি অবশেষে আমার জীবনের গভীর দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে অন্তর্ধান করলে, আর কেমন করেই বা এটি হারানতে আমার গুরুলাভের সূচনা হল, এই পরিচ্ছেদে তার কথা এখন বলা যায় না। আর তা বলবার সময়ও এখন আসে নি।

কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কিশোরটি হিমালয়ে পলায়নের চেষ্টায় বারম্বার বাধা পেলেও, কবচের পক্ষবিস্তারের সাহায্যে প্রত্যহ সে বহু দূরদূরান্তেই উড়ে বেড়িয়ে আসত।

নির্মম পরিহাসের সঙ্গে ("ইংরেজী ভাষার জন্য একটি ইংরেজী বর্ণমালার প্রচলনে যদি গৃহ-বিবাদ শুরু হয়......তা হলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই") বলেন যে বিয়াল্লিশ বর্ণের একটি বর্ণমালা গ্রহণ করা উচিত (উইলসন সাহেব লিখিত "দি মিরাকিউলাস্ বার্থ অফ্ ল্যাঙ্গোয়েজ" নামক পুস্তকে তাঁর লেখা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এরূপ একটি বর্ণমালা সংস্কৃতের স্বরসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পেঁছিতে পারে···যার পঞ্চাশটি বিভিন্ন বর্ণে ভুল উচ্চারণের কোন সম্ভাবনা নাই।

সিন্ধু উপত্যকায় কয়েকটি শীলমোহর আবিষ্কারে কয়েকজন পণ্ডিত, ভারতবর্ষ যে তার সংস্কৃত বর্ণমালা সেমিটিক মূল থেকে "ঋণগ্রহণ" করেছে, বর্ত্তমানে প্রচলিত এই মতবাদ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছেন। মহেঞ্জো-দাড়ো ও হরপ্পার কাছে কয়েকটি বিরাট হিন্দুনগর আবিষ্কৃত হওয়াতে এমন একটি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যার "ভারত-ভূমিতে এমন একটি সুদীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস ছিল যা আমাদের সেই যুগে পেঁছে দেয়, যে যুগের বিষয় কেবলমাত্র ক্ষীণভাবে অনুমান করা যেতে পারে।" (স্যর জন্ মার্শাল কৃত 'মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধু সভ্যতা', ১৯৩১)।

এই পৃথিবীতে মানবজাতির সভ্যতার নিরতিশয় সুপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যদি হিন্দু মতবাদ সত্য বলে গৃহীত হয়, তা হলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত সর্বাঙ্গসুন্দর কেন, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, স্যর উইলিয়াম জোন্স্ বলেন, "সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন এর গঠন অতি অদ্ভুত—গ্রীকভাষা অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, ল্যাটিন অপেক্ষা শব্দসমৃদ্ধ, আর উভয়ের অপেক্ষা অতি সুষ্ঠুরূপে সুমার্জিত।"

এন্সাইক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানাতে লিখিত আছে, সর্বোত্তম শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের দ্বারা) সংস্কৃতভাষার পুনরাবিষ্কারের মত এত বড় একটা ঘটনা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। ভাষা-বিজ্ঞান, তুলনাত্মক ব্যাকরণ অথবা পুরাণতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান····· হয় তাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই সংস্কৃতভাষার পুনরাবিষ্কারের উপর নির্ভর করে অথবা এর চর্চার দ্বারা তারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে।"

৩য় পরিচ্ছেদ

দুই দেহধারী সাধু

পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা বাবা, আমি যদি বিনা ধরপাকড়ে বাড়ী ফিরবার কথা দিই তা হলে কি একবার কাশী বেড়িয়ে আসতে পারি ?"

পিতা অবশ্য আমার দেশভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিতেন না। অল্পবয়স্ক বালক হলেও তিনি আমায় বহু শহর, তীর্থস্থান প্রভৃতি বেড়াতে অনুমতি দিতেন। প্রায়ই দুচার জন বন্ধু আমার সঙ্গে যেত। পিতারই সংগৃহীত প্রথম শ্রেণীর পাসে আমরা আরামে বেড়াতুম। পিতা একজন রেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হওয়াতে আমাদের পরিবারের ভ্রমণবিলাসীদের খুবই সুবিধা হয়েছিল।

পিতা আমার অনুরোধ যথোচিত বিবেচনা করে দেখবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। তার পরদিন পিতা আমাকে ডেকে বেরেলী হতে কাশী যাতায়াতের একখানি পাস, কিছু টাকা আর দুখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "কাশীতে গিয়ে আমার বন্ধু কেদারনাথবাবুকে একটি কাজের কথা বলতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দের মারফতে তুমি এই চিঠিখানা তাঁর কাছে পেঁছতে পারবে। স্বামীজী—আমার গুরুভাই, খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গলাভ করে তোমার উপকারই হবে। আর এই দ্বিতীয় চিঠিখানি হচ্ছে তোমার পরিচয়পত্র।" পিতা তারপর একটু হাঁসি হাঁসি চোখে বললেন, "কিন্তু মনে থাকে যেন, বাড়ী থেকে তোমার আর পালান হচ্ছে না, বুঝলে ?"

দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রবল উৎসাহ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম (যদিও কালে আমার নতুন দৃশ্য, নতুন মুখ দেখবার আনন্দ ও উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস করতে পারে নি)। বেনারসে পেঁছেই আমি স্বামীজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলুম। সামনের দরজা খোলাই ছিল ; সেখান দিয়ে তেতলার একটি লম্বা হলের মতন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, কটিবাসমাত্রপরিহিত স্বামীজী ঈষদুচ্চ এক চৌকির উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁর মাথা আর বলিরেখাহীন মুখমণ্ডল বেশ পরিষ্কারভাবে কামান। স্বর্গীয় হাঁসি তাঁর

ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করছে। আমার অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচ দূর করবার জন্য তিনি চিরপরিচিতের মত আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন, "বাবা, আনন্দ!" শিশুসুলভ স্বরে তাঁর আন্তরিক স্নেহসম্ভাষণ। নতজানু হয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করলুম,—"আপনিই কি স্বামী প্রণবানন্দজী?" তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ"। তারপর পকেট থেকে পিতার চিঠিখানি বার করবার পূর্বেই তিনি বললেন, "তুমি কি ভগবতীবাবুর ছেলে?" অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাঁকে আমার পরিচয়পত্রটি দিলুম, কিন্তু তা তখন একেবারে নিরর্থক বলে বোধ হল।

স্বামীজী তখন তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির সাহায্যে আমাকে পুনরায় আশ্চর্যান্বিত করে দিয়ে বললেন—"দাঁড়াও, কেদারনাথবাবুকে তোমার জন্য খুঁজে বার করছি।" তারপর চিঠিখানার দিকে একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করে পিতার বিষয় কয়েকবার প্রীতিভরে উল্লেখ করে বললেন, "জান, এখন আমি দুটি পেন্সন ভোগ করছি। একটি তোমার বাবার সুপারিশে, যাঁর জন্য এককালে আমি রেল অফিসে চাকরি পেয়েছিলুম; আর একটি বিশ্বেশ্বরের কৃপায়, যাঁর জন্য আমি এ সংসারে জীবনের কর্তব্যসকল ঠিকভাবে শেষ করতে পেরেছি।"

আমার কাছে তাঁর এ উক্তি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ্ঞে, কি রকম পেন্‌সন আপনি বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে পা'ন মশায়? তিনি কি আপনার কোলে টাকার তোড়া এনে ফেলে দেন?" শুনে তিনি হেসে উঠে বললেন, "আমার পেন্সন্ মানে সুগভীর শান্তি। আমার বহুবছরের গভীর ধ্যানধারণার পুরস্কার। এখন আমার অর্থের প্রতি আর কোন লালসা নাই। আমার সাংসারিক প্রয়োজন অতি অল্পই,—তা পর্যাপ্ত ভাবেই মিটে যায়। এখন নয়, পরে তুমি দ্বিতীয় পেন্‌সনের মানে বুঝতে পারবে।"

হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীজী গম্ভীর ও নিস্পন্দ হয়ে পড়লেন। একটা গূঢ় রহস্যময় ভাব যেন তাঁকে ঘিরে রইল। প্রথমতঃ তাঁর চোখ দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, যেন দূরে আগ্রহোদ্দীপক কোন কিছু দেখছেন, তারপরেই তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। আমি তাঁর বাক্‌স্বল্পতাতে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লুম। এখনও পর্যন্ত তিনি আমায় এমন কিছুই বলেন নি, যাতে করে পিতার বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'তে পারে। ঈষৎ চঞ্চল হয়ে আমি সেই ফাঁকা ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, ঘরে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই নেই। আমার অলস দৃষ্টি তক্তাপোষের নীচে তাঁর খড়ম জোড়ার উপর গিয়ে নিবদ্ধ হল।

বললেন, "ছোটো মহাশয়,* কিছু ভেবো না। তুমি যাঁকে দেখতে চাও, তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই তোমার কাছে এসে হাজির হচ্ছেন।" যোগিবর আমার মনের কথা সব যেন পড়ে নিচ্ছিলেন ; যদিও তা সে সময় বিশেষ কিছু কঠিন ছিল না।

আবার তিনি এক দুর্জ্ঞেয় স্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। ঘড়িতে দেখলুম তখন আধ ঘন্টাটাক মাত্র কেটেছে।

স্বামীজী জেগে উঠে বললেন, "কেদারনাথবাবু বুঝি দরজার কাছে এলেন ?" সিঁড়ি দিয়ে কেউ যেন উপরে উঠে আসছে শুনতে পেলুম। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাসের ভাব হঠাৎ মনের মধ্যে উদয় হল। বিক্ষিপ্ত চিন্তা সকল মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ধাবিত হতে লাগল। ভাবলুম, "লোক না পাঠিয়ে পিতার বন্ধুকে এখানে কেমন করে ডেকে আনা সম্ভব হল ? আমার আসার পর স্বামীজী ত আমি ছাড়া আর কাউকে কোন কথাই বলেন নি !"

বিনা লৌকিকতায় সেই ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লুম। অর্ধপথে একটি ক্ষীণদেহ গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। দেখে বোধ হল অতি দ্রুতবেগেই তিনি আসছেন।

"আপনিই কি কেদারনাথবাবু ?" উত্তেজনায় আমার স্বর তখন কাঁপছে।

তিনি সস্নেহে হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তুমিই না ভগবতীবাবুর ছেলে ; আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু মশায়, আপনি এখানে এলেন কি করে ? এঁ্যা ?" তাঁর রহস্যময় উপস্থিতিতে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলুম।

তিনি তখন বলতে লাগলেন, "আজ দেখছি যে সবই অদ্ভুত ! ঘণ্টা খানেকেরও কিছু কম হবে এই খানিকক্ষণ আগে, গঙ্গায় সবেমাত্র স্নানটি সেরে উঠেছি, এমন সময় স্বামী প্রণবানন্দজী আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত। আমি ত কল্পনাই করতে পারি নি, আমি যে তখন সেখানে ছিলুম, তা তিনি জানলেন কেমন করে ? প্রণবানন্দজী বললেন, 'ভগবতী বাবুর ছেলে তোমার জন্য আমার ঘরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে আসবে না কি ?' আমি সানন্দে রাজী হলুম। হাত ধরাধরি করে চলেছি ; খড়মপায়েই কিন্তু স্বামীজী আমায় আশ্চর্যভাবে ছাড়িয়ে এগিয়ে চললেন, পায়ে যদিও আমার তখন এই মজবুত জুতোজোড়াটা পরা।"

প্রণবানন্দজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ওখানে পৌঁছতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?"

* বহু ভারতীয় সাধুসন্ন্যাসী আমায় এই বলেই সম্বোধন করতেন।

" 'প্রায় আধঘণ্টা।' 'আমার এখন একটু কাজ আছে।' বলে তিনি একটি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'তোমায় ফেলেই আমায় এখন এগোতে হবে। তুমি আমার বাড়ীতে এসো, সেখানে ভগবতীবাবুর ছেলে আর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

"আমি কোন কিছু আপত্তি তোলবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েই ভিড়ের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তারপর এখানে যত শীগগির সম্ভব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।"

এই কৈফিয়তে আমি ত আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি স্বামীজীকে কতদিন ধরে জানেন।

বললেন, "গেল বছরে বারকতক দেখা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সম্প্রতি নয়। যাই হোক স্নানের ঘাটে তাঁকে আজ আবার দেখতে পেয়ে ভারি আনন্দ হল।"

শুনে বললুম, "কানকে ত বিশ্বাস করা যায় না! আমার মাথা কি গুলিয়ে যাচ্ছে, এ্যাঁ? আপনি কি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, না সত্যি সত্যিই তাঁকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তাঁর হাত ধরে ছিলেন বা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?"

তিনি এবার একেবারে চটে উঠে বললেন, "তুমি কি যে বলছ, তা বুঝতে পারিনে! তোমার কাছে মিথ্যা বলছিনে, তা জেনো। আর এও কি তুমি বুঝতে পারছ না যে, একমাত্র স্বামীজী মারফত না হলে কি আমি কখনো জানতে পারতুম যে তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ?"

"কি আশ্চর্য! উনি, স্বামী প্রণবানন্দজী কিন্তু আমার এখানে ঘণ্টা খানেক আগে আসার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও নড়েন নি বা আমার চোখের আড়াল হন নি।" বলে ত আমি সব ব্যাপারটা এবং স্বামীজীর সঙ্গে আমার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে ফেললুম।

তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "এ্যাঁ, আমরা কি এই পৃথিবীতে বাস করছি, না স্বপ্ন দেখছি? জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনা দেখব বলে ত কখনও আশা করি নি! ভেবেছিলুম যে স্বামীজী নিতান্তই একজন সাধারণ-গোছের মানুষ মাত্র! এখন দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি আর একটি স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করতে পারেন আর তা দিয়ে কাজও করতে পারেন।" দুজনে আমরা সাধুজীর ঘরে প্রবেশ করলুম। কেদারনাথবাবু তক্তাপোষের তলায় খড়ম জোড়াটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "দেখ, দেখ, ঐ খড়মজোড়াটাই পরে

তিনি ঘাটে গিয়েছিলেন। আর এখন ওঁকে যেমন দেখছি, ঠিক তেমনিই তাঁর কৌপীন পরা ছিল।"

কেদারনাথবাবু তাঁর সামনে এসে প্রণাম করতেই তিনি হেঁয়ালির হাসি হেসে আমায় বললেন, "তোমাদের এতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাবার কি আছে, বল ত? সত্যিকারের যোগীদের কাছে প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে সূক্ষ্ম ঐক্যের সম্বন্ধ কিছুমাত্র লুকোন নেই। আমি এখান থেকে মুহূর্তমধ্যে সুদূর কলকাতায় গিয়ে আমার শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসতে পারি, আর তারাও ইচ্ছামাত্র এইভাবে সব রকম জড়বাধা অতিক্রম করতে পারে।"

সম্ভবতঃ স্বামীজী আমার তরুণ হৃদয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলবার জন্যেই তাঁর যোগবলে দূরদর্শন আর দূরশ্রবণের শক্তির বিষয় অনুগ্রহ করে প্রকাশ করে বলেছিলেন।* কিন্তু উৎসাহবোধের পরিবর্তে আমার ভক্তির সঙ্গে ভয়েরও সঞ্চার হল। যেহেতু আমার ভাগ্যলিপি ছিল যে, আমার ঈশ্বর-লাভের সাধনায় সহায় হবেন এক বিশেষ গুরু—শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজ, যাঁর দর্শনলাভ আমার এখনও ঘটেনি, সেই হেতু প্রণবানন্দজীকে গুরুরূপে বরণ করতে তখন আমার মনে কোনরূপ ইচ্ছার উদয় হল না। আমি সন্দিগ্ধনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলুম যে, সত্য সত্যই তিনি স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতি-রূপ আমার সামনে রয়েছে।

স্বামীজী তাঁর প্রাণজাগান দৃষ্টিতে আর তাঁর গুরুর বিষয় উদ্দীপনাময়ী

*যোগীরা মনোবিজ্ঞান বলে যে সমস্ত বিধিনিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, জড়বিজ্ঞান নিজেই সে সমস্ত সত্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষের যে দূরদর্শনের শক্তি আছে, সে বিষয় ১৯৩৪ সালের ২৬শে নভেম্বর রোমের রয়্যাল ইউনিভার্সিটিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। স্নায়বিক-মনোবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ গ্যিসেপ ক্যালিগারিস, একটি লোকের শরীরের কতকগুলি স্থান টিপে ধরলে লোকটি একটি দেওয়ালের বিপরীত দিকে অবস্থিত অন্যান্য লোক বা জিনিষ সকলের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে। ডাঃ ক্যালিগারিস অন্যান্য অধ্যাপকদের বলেছিলেন যে চর্মের উপর যদি স্থানবিশেষ বিক্ষোভিত করা যায়, তা হলে তার এক রকম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি হয়, যাতে করে সে এমন সব জিনিষের দর্শন পায়, যা সে অন্য কোন উপায়েই পেতে পারে না। দেওয়ালের ওপিঠে সব জিনিষ দেখতে পাবার জন্যে অধ্যাপক ক্যালিগারিস তাঁর পরীক্ষার বিষয়ীভূত কোন ব্যক্তির দেহের দক্ষিণ দিকে একটি জায়গা পনের মিনিট ধরে টিপে ধরেছিলেন। ডাঃ ক্যালিগারিস বলেছিলেন যে, যদি শরীরের কোন কোন স্থান ঐরকম ভাবে টিপে ধরা যায় তা হলে সে আগে কখনও কোন জিনিষ দেখে না থাকলেও, যে কোনও দূরত্ব হতে সেই সব জিনিষই দেখতে পায়।

ভাষায় অবতারণা করে আমার অস্বস্তি দূরে করবার চেষ্টায় বললেন, "লাহিড়ী মশায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগী আর আমার জানা নেই। তিনি নরদেহে দেবতা।"

ভাবলুম—শিষ্যই যদি ইচ্ছামাত্র একটি স্বতন্ত্র রক্তমাংসের দেহ ধারণ করতে পারেন, তবে তাঁর গুরুর কাছে অলৌকিক ব্যাপারের সত্যিই আর কি বাধা থাকতে পারে ?

তিনি বলতে লাগলেন, "গুরুর সাহায্য যে কি অমূল্য, তা আর তোমায় কি বলব। তাঁর অপর একটি শিষ্যের সঙ্গে রোজ রাত্তিরে আমি ধ্যানে বসতুম। ধ্যান চলত আট ঘণ্টা ধরে। দিনের বেলায় রেল অফিসে আমরা কাজ করতুম। কেরাণীর কাজে আমার অসুবিধা হয় দেখে, আমি সব সময়টাই ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করব বলে মনস্থ করলুম। আটবছর ধরে খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে অর্ধেক রাত পর্যন্ত ধ্যান করতুম। ফল পেলুম অদ্ভুত! বিরাট আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আর আমার মাঝখানে বরাবরই একটা ছোট্ট আড়াল রয়ে গেল। এমন কি অতিমানবিক প্রচণ্ড চেষ্টার পরও দেখলুম যে, সাযুজ্যলাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে উঠল না।

"একদিন সন্ধ্যাবেলা লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দৈবীকৃপা প্রার্থনা করলুম। সনির্বন্ধ অনুরোধ আমার সারারাত ধরেই চলল। বললুম, 'গুরুদেবতা, ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনের যন্ত্রণা এত বেশী দাঁড়িয়েছে যে, সেই প্রাণের ঠাকুরকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে, আর আমি বাঁচতে পারব না !'

"বললেন, 'তা আর আমি কি করব বল ? তুমি আরও গভীরভাবে ধ্যান কর।' বললুম, 'তোমার চরণে নিবেদন করছি, হে মহাগুরো ভগবান, তুমিই যে জড়দেহে আমার সামনে বর্তমান ; এই আশীর্বাদ কর ঠাকুর, যেন তোমাকেই আমি তোমার অনন্তরূপে দেখতে পাই।'

"লাহিড়ী মহাশয় প্রসন্নভাবে অভয় হস্ত প্রসারিত করে বললেন, 'যাও, এখন ধ্যান কর গিয়ে। তোমার হয়ে আমি ব্রহ্মের* কাছে জানিয়েছি।'

---

*ব্রহ্ম—বৃহ+মন্—অতি মহৎ বা বৃহৎ, ঈশ্বরের সৃষ্টা রূপ। ১৮৫৭ সালে "আট্‌লাণ্টিক মন্থলি" নামক পত্রিকায় যখন ইমার্সনের "ব্রহ্ম" নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন অধিকাংশ পাঠকই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইমার্সন মনে মনে একটু হেসে বলেছিলেন, ওদের 'ব্রহ্মের' পরিবর্তে 'জিহোভা' বলতে বল, তাহলেই বুঝতে আর কোন গোলমাল হবে না।"

"মনের বিরাট প্রসন্নতায় অপরিমেয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে বাড়ী ফিরলুম। ধ্যানে বসে সেই রাত্রে আমি সারাজীবনের সাধনার চরম সিদ্ধি লাভ করলুম। এখন আমি আধ্যাত্মিক সাধনার নিরবচ্ছিন্ন পেন্‌সন্‌ ভোগ করছি। সেই দিন থেকে পরমানন্দময় জগৎস্রষ্টা আমার চোখের আড়ালে আর কোন মায়ার আবরণে লুকিয়ে রইলেন না।"

প্রণবানন্দজীর বদনমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন অন্য এক জগতের শান্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করল। সব ভয় দূর হয়ে গেল। প্রণবানন্দজী আর একটি গোপন কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেটি এই,—

"মাসকতক পরে আমি লাহিড়ী মশায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর অপরিসীম দানের কথা স্মরণ করে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলুম। সে সময় কিন্তু আমার আর একটি ব্যাপারের উল্লেখ করতে হল।

" 'গুরুদেব, আমি যে আর অফিসের কাজকর্ম করতে পারিনে। দয়া করে আমায় রেহাই দিন। ব্রহ্মানন্দপানে মন সদাই বিভোর।'

" 'তোমার অফিস থেকে পেন্‌সন্‌ নাও।'

" 'এত অল্পদিনের চাকরী, কি কারণ দেখাব, বলুন।'

" 'যা মনে হয়, তাই বোলো।'

"তার পরদিন ত দরখাস্ত করে দিলুম। ডাক্তার আমার অসময়ে অবসর গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললুম, 'কাজ করতে করতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে কেমন যেন একটা প্রচণ্ড টান উপর দিকে ঠেলে উঠছে বলে মনে হয়, আর সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আমায় একেবারে অকেজো করে দেয়।'*

"আমায় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে ডাক্তার খুব ভালভাবে আমার জন্য পেন্‌সনের সুপারিস করে দিলেন। আর তা শীগগিরই পেয়ে গেলুম। আমি

---

*গভীর ধ্যানেতে প্রথম ব্রহ্মানুভূতির আবির্ভাব হয় মেরুদণ্ডের বেদীতে, তারপর হয় মস্তিষ্কের ভিতর। সে পরমানন্দের মহাপ্লাবনের বেগ দুর্নিবার কিন্তু যোগী তার বহিঃপ্রকাশের সংযম শিক্ষা করেন।

আমাদের সাক্ষাতের সময় প্রণবানন্দজী প্রকৃতই একজন পূর্ণজ্ঞানী সদ্‌গুরু ছিলেন কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের অবসান বহুবছর পূর্বেই ঘটেছিল। তখনও তিনি 'নির্বিকল্প সমাধি'তে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। পূর্ণজ্ঞানের সেই অবিচলিত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকে যোগী তাঁর যে কোন জাগতিক কর্তব্যপালনে কোনই অসুবিধা ভোগ করেন না।

অবসর গ্রহণের পর প্রণবানন্দজী "প্রণবগীতা"-নামে শ্রীমদ্ভগবদগীতার একখানি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। বাংলা আর হিন্দীতে প্রাপ্তব্য।

জানি যে লাহিড়ী মহাশয়ের দৈব ইচ্ছাই ডাক্তারের ভিতর আর তোমার পিতা প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীদের ভিতর দিয়ে কাজ করছিল। তাঁরা সেই মহাগুরুর দৈবনির্দেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পালন করে, সেই প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে অখণ্ড মিলনানন্দ সম্ভোগের জন্যে আমার জীবনে মুক্তি এনে দিলেন।"

এই অপূর্ব ঘটনা প্রকাশ করবার পর প্রণবানন্দজী সুদীর্ঘকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে বসে রইলেন। ভক্তিভরে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণামান্তে বিদায় নেবার সময় তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমার জীবন ত্যাগ ও যোগমার্গ অবলম্বন করবার জন্য। তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে পরে আবার আমার দেখা হবে।" কিছুকাল পরে তাঁর এ দুটি ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছিল।

কেদারনাথবাবু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলেন। পিতার পত্রখানি তাঁর হাতে দিতে, তিনি সেটি রাস্তার আলোয় পড়ে বললেন, "তোমার বাবা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের রেল কোম্পানীর কলকাতার অফিসে আমি একটি পদ গ্রহণ করি। স্বামী প্রণবানন্দজী যে সব পেন্‌সন্‌ ভোগ করছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা হলেও তা কত না আরামের হত, বল ত! কিন্তু তা ত আর হবার নয়, সে যে অসম্ভব, আমি যে বেনারস ছেড়ে যেতে পারি না। হায় রে, আমার ত আর দুটো শরীর এখনও হয় নি।"

একাধিক শরীরে আবির্ভূত হওয়া একপ্রকার সিদ্ধি (যোগ শক্তি) যা পতঞ্জলির যোগসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। উভয়ত্র প্রকাশের ঘটনা যুগযুগান্তর ধরে বহু সাধুসন্তদের জীবনেই প্রদর্শিত হয়েছে।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

আমার হিমালয় পলায়নে বাধা

"যা হোক একটা তুচ্ছ অছিলা করে ক্লাস থেকে সরে পড়বে, আর একটা ঠিকে গাড়ী ভাড়া করে এনে গলির মধ্যে এমন জায়গায় দাঁড়াবে যাতে আমাদের বাড়ীর কেউ যেন না তোমায় দেখতে পায়, বুঝলে ?"

এই বলে ত অমর মিত্রকে আমার পাকা মতলব বাতলে দিলুম। সে ছিল আমার স্কুলের বন্ধু আর হিমালয়ে পলায়নের আমার সঙ্গী হবারও মতলব এঁটেছিল। স্থির হয়েছিল পরের দিন আমরা দুজনে পলায়ন করব।

সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ অনন্তদার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। পালাবার মতলব যে আমার মনে অত্যন্ত প্রবল, তা ঠিকই তিনি সন্দেহ করেছিলেন। তাই সেটাকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। কবচটির প্রভাব, আধ্যাত্মিক বীজের মত নীরবে আমার মধ্যে কাজ করে চলেছিল। স্বপ্নে যাঁর মুখ প্রায়ই দেখতে পেতুম, সেই গুরুকে হিমালয়ের তুষারের মধ্যেই খুঁজে পাব বলে মনে আশা হয়েছিল।

পরিবারের সকলেই এখন কলকাতায় বাস করছেন, কারণ পিতা এখন পাকাপাকিভাবে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। আমাদের ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীতে থাকবার জন্য অনন্তদা তাঁর নতুন বৌকে নিয়ে এলেন। সেখানে একটি চিলেকোঠায় আমি নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যানধারণা আর ঈশ্বরলাভের সাধনায় মনকে নিয়োজিত করে রাখতুম।

অশুভ বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্মরণীয় প্রভাত এসে উপস্থিত হল। রাস্তায় অমরের গাড়ীর চাকার শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি একটা কম্বল, একজোড়া খড়ম, লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, একছড়া জপের মালা আর গোটাদুই কৌপীন একটা পুঁটলিতে বেঁধে নিলুম। পুঁটলিটা তিন তলার জানালা গলিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লুম। যাবার সময় খুড়োমশায়ের পাশ কাটিয়ে যেতে হল, দেখলুম তিনি মৎস্য ক্রয়ে ব্যস্ত।

"আরে এত তাড়া কিসের, এঁ্যা ?" বলতে বলতে তিনি তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমার সর্বশরীরের উপর একবার বুলিয়ে নিলেন।

কিছু না বলে আমি নিতান্ত নিরীহভাবে হেসে গলির দিকে এগিয়ে পড়লুম। পঁটুলিটি সংগ্রহ করে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অমরের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তারপর গাড়ীতে করে ধর্মতলায় নানা বিক্রয়পণ্যের কেন্দ্র চাঁদনী চকে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

মাসের পর মাস ধরে আমরা সাহেবী পোষাক কেনবার জন্য জল খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আসছিলুম, কারণ আমার অত্যন্ত চালাক জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পাকা ডিটেকটিভের মত আমাদের ধরে ফেলবেন ভেবে মনে করেছিলুম যে, সাহেবী পোষাকেই তাঁকে ঠকান যাবে।

ষ্টেশনে যাবার পথে আমার খুড়তুতো ভাই, যতীন ঘোষের জন্য দাঁড়ালুম। তাঁকে যতীনদা বলে ডাকতুম। তিনিও এ পথে নূতন এসেছেন, হিমালয়ে গুরু খোঁজবার জন্য তাঁরও বাসনা। আমাদের সদ্যসংগৃহীত নূতন সুট একটী তিনি পরিধান করলেন—আশা হল, ছদ্মবেশ খুব ভালই হয়েছে। একটা গভীর তৃপ্তি আর উল্লাসের মলয় বাতাস মনের মধ্যে বইতে লাগল।

"এখন চাই কেবল একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো" এই বলে তাদের একটা রবারের জুতোর দোকানে নিয়ে গেলুম। "চামড়ার জিনিষ, যা সব কেবল জীবহত্যা করেই তৈরী করা হয়, সে সব এ পুণ্যযাত্রায় সঙ্গে থাকা উচিত নয়," বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে গীতা হতে চামড়ার মলাট আর বিলিতী তৈরী সোলার টুপীগুলো হতে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ সব খুলে রাস্তায় ফেলে দিলুম।

স্টেশনে গিয়ে বর্ধমানের টিকিট কেনা হল; সেখানে হিমাচলপদাশ্রিত হরিদ্বার যাবার জন্যে গাড়ী বদল করবার মতলব করেছিলুম। ট্রেন যখন আমাদের মনের গতির মতই দৌড়তে আরম্ভ করলে, সুযোগ বুঝে তখন আমি সঙ্গীদের কাছে আমার মনের ভিতরকার গুটিকতক উজ্জ্বল আশা ব্যক্ত করতে শুরু করলুম। বললুম,—"ভাব দেখি, গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমরা কেমন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করব! আর আমাদের দেহের মধ্যে এমন একটা চৌম্বকশক্তি জন্মাবে, যাতে করে হিমালয়ের জঙ্গলের হিংস্র পশুগুলো পর্যন্ত নিতান্ত পোষমানা জন্তুদেরই মত আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। বাঘগুলো বাড়ীর নিরীহ বিড়ালদের মত আদরের লোভে আমাদের কাছে এসে বসবে।"

এই রকম মন্তব্যে, বাস্তব ও রূপকের একটি লোভনীয় আশার মনোরম চিত্র অঙ্কনে, অমরের মুখে একটা উৎসাহব্যঞ্জক হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু যতীনদা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে দ্রুত অপস্রিয়মাণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপচাপ বসে রইলেন।

সুদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে যতীনদা কিছুক্ষণ বাদে এই প্রস্তাবটি করে

বসলেন,—"এস, এখন টাকাটা তিনভাগে ভাগ করে ফেলা যাক্ ! বর্ধমানে প্রত্যেকেই নিজের নিজের টিকিট কিনব, তা হলে স্টেশনে কেউ আর সন্দেহ করতে পারবে না যে, আমরা একসঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি।"

বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে আমি তখনই রাজী হয়ে গেলুম। সন্ধ্যার সময় আমাদের ট্রেন বর্ধমানে এসে থামল। যতীনদা টিকিট ঘরে ঢুকলেন ; অমর আর আমি প্ল্যাটফর্মেই বসে রইলুম। মিনিট পনের অপেক্ষা করবার পর যতীনদাকে আর ফিরতে না দেখে তাঁর বিস্তর খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। চারিদিক খোঁজবার পর নিষ্ফল হয়ে আমরা ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে যতীনদার নাম ধরে বার বার চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম। আর যতীনদা ! যতীনদা ততক্ষণে সেই স্টেশনের অন্ধকার অজানার মধ্যে একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ব্যাপার দেখে ত আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে অবশ হয়ে এল। হায় রে, ভগবান পর্যন্ত এরকম চালাকির ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন, তা কি আর জানি ? তাঁর জন্যই ত আমার এই প্রথম বিচিত্র পলায়ন, আর সেই উদ্দেশ্যে আমার সযত্নরচিত এই প্রথম পলায়নের রোমাঞ্চকর উপলক্ষ্য এই রকম নিষ্ঠুর-ভাবেই মাঠে মারা গেল !

ছোট ছেলেদের মতন তখন কান্না জুড়ে দিয়েছি, বললুম,—"অমর, চল, আর কি হবে, বাড়ী ফেরা যাক্ ! যতীনদার এ রকম নিষ্ঠুরভাবে সরে পড়াটা একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। এবারকার যাত্রা নিষ্ফল হতে বাধ্য।"

"এই বুঝি তোমার ভগবানের উপর টান ? একটা বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীর এই ছোট্ট পরীক্ষাটুকু আর বরদাস্ত করতে পার না ?"

অমর এই ব্যাপারটাকে ভগবানের একটা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করাতে আমার মন কতকটা শান্ত আর স্থির হল। বর্ধমানের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন সীতাভোগ আর মিহিদানা সংযোগে ত জলযোগটা তখন সেরে নেওয়া গেল। ঘণ্টা কতকের ভিতরেই আমরা বেরিলী হয়ে হরিদ্বারে যাবার গাড়ীতে চড়ে বসলুম। তার পরদিন মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল করতে হল। নেমে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবার সময় একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

বললুম, "অমর, শীগ্গিরই হয়ত রেলের লোকেরা আমাদের ধরে দারুণ জেরা শুরু করে দিতে পারে। দাদার বুদ্ধির দৌড় যে খুব খাট, তা আমি আদৌ মনে করি না ! তা যা হয় হোক্, মিথ্যে আমি কিছুতেই বলছিনে।"

"মুকুন্দ, যা বলি তা শোন, তুমি চুপ করে থেকো। আমি যখন কথাবার্তা চালাব, খবরদার তুমি যেন তখন হেসে ফেল না বা দাঁত বের কোরো না, বুঝলে ?" সঙ্গে সঙ্গেই এক ইউরোপীয় রেল কর্মচারীর সেখানে আবির্ভাব

হ'ল। হাত নেড়ে একটা টেলিগ্রাম দেখাতে তার মানে বুঝতে আর বাকী রইল না।

প্রশ্ন হ'ল, "তোমরা কি রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?" তার ঠিক ঐ কথাগুলোর উত্তরে সজোরে "না" বলতে পেরে অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলুম। কারণ আমি ত জানি যে, "রাগ" নয়, "সংসার বিরাগ"ই আমার এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ!

কর্মচারীটি অমরের দিকে ফিরল। তাদের বুদ্ধির যুদ্ধ এখন যা শুরু হল, তাতে করে আমার বহু-উপদিষ্ট উদাসীন গাম্ভীর্য বজায় রাখা নিতান্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, "দেখ, যা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে সব বলবে, বুঝলে? আচ্ছা, তৃতীয় ছেলেটি কোথায় এখন বল দেখি?"

"মশায়, আপনি ত দেখছি চশমা পরে রয়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন না কি যে, আমরা কেবল মাত্র দুজন?" অমর একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "আমি ত আর যাদুকর নই যে, ভেল্কির জোরে তৃতীয় জনটিকে এনে হাজির করে দেবো?"

এই ঔদ্ধত্যপ্রকাশে সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে কর্মচারীটি আক্রমণের আর একটি নতুন পন্থা আবিষ্কার করে বললে,—

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম টমাস, মা ইংরেজ, বাপ দীক্ষিত ভারতীয় খ্রিস্টান।"

"তোমার বন্ধুটির নাম কি?"

"ওকে টমসন বলে ডাকি!"

এই সময় মনের মধ্যে আমার হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল। সৌভাগ্য-ক্রমে ট্রেন তখন ছাড়বার জন্য বাঁশী দিচ্ছে দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে ট্রেনের দিকে সোজা এগিয়ে গেলুম। অমর কর্মচারীটির পিছু পিছু চলল। লোকটা কিন্তু সব কিছু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ভদ্রতাসহকারে আমাদের একটা ইউরোপীয় কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল। দুজন ফিরিঙ্গী ছেলে নেটিভদের কামরায় যাচ্ছে দেখে, তার মনে হয়ত ক্ষোভেরই সঞ্চার হয়ে থাকবে। তার সবিনয় বিদায়গ্রহণের পর আমি তো বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে বসে এক চোট প্রাণভরে খুব হেসে নিলুম। অমরও একজন পাকা ইউরোপীয় কর্মচারীকে বুদ্ধির জোরে হারিয়ে দিয়েছে ভেবে বেশ একটা সানন্দ পরিতৃপ্তির ভাব প্রকাশ করলে।

প্ল্যাটফর্মের উপর আমি টেলিগ্রামটি লুকিয়ে পড়ে নেবার চেষ্টা করে-ছিলুম। দাদার কাছ থেকে এসেছে—তাতে লেখা ছিল, "মোগলসরাই হয়ে

হরিদ্বারের দিকে সাহেবী পোষাকপরা তিনটি বাঙ্গালী ছেলে বাড়ী থেকে পালাচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমার না পেঁছান পর্যন্ত তাদের আটকে রাখুন। আপনার কাজের জন্যে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।"

সকোপকটাক্ষে আমি বললুম, "অমর, তোমায় না বাড়ীতে দাগদেওয়া টাইম টেবলগুলো ফেলে রেখে আসতে বারণ করেছিলুম? দাদা নিশ্চয়ই সেখানে একটা পেয়ে থাকবেন।"

বন্ধুবর নিতান্ত নিরীহভাবে আঘাতটি পরিপাক করলে। বেরিলীতে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল, কিন্তু সেখানেও দাদার টেলিগ্রাম নিয়ে দ্বারকা প্রসাদ* আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দ্বারকা খুব সাহস করে আমাদের আটকে রাখতে চেষ্টা করলে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে, ছেলেমানুষি করবার জন্য নয়। তাকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধও করলুম। কিন্তু আগের মতন এবারও দ্বারকা হিমালয় পলায়নে আমাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল।

সেই রাত্রে একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আর আমিও আধঘুমে। একটা রেলের কর্মচারী অমরকে জাগিয়ে তুলে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে দিলে। সেও 'টমাস' 'টমসনের' বর্ণসঙ্করের ভাঁওতায় পড়ে ঠকে গেল। ট্রেনটি বিজয়গর্বে আমাদের বহন করে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে পেঁছিল ভোর বেলায়। আমাদের সাদর আহ্বান জানাবার জন্যেই যেন দূরে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা আত্মপ্রকাশ করলে। ষ্টেশন হতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েই আমরা সহরের স্বচ্ছন্দবিহারী জনতার মধ্যে মিশে গেলুম। তারপর আমাদের প্রথম কাজ হল, দেশী পোষাক পরে ফেলা, কেননা অনন্তদা কোনও রকমে আমাদের সাহেবী পোষাকে ছদ্মবেশের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিলেন। ধরা পড়বার একটা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা কিন্তু বরাবর ভারী হয়েই রইল।

হরিদ্বার অবিলম্বে পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত ভেবে, আমরা আরও উত্তরে যোগিঋষিপদরজঃপূত হৃষীকেশ যাবার জন্য টিকিট কিনে ফেললুম। আমি ইতিমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসেছি, আর অমর প্লাটফর্মের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পুলিশের লোকের চিৎকারে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাঞ্ছিত খবরদার সেই পুলিসের কর্মচারীটি আমাদের সটান থানাতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি আর যা কিছু সব কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। অত্যন্ত বিনয়সহকারে তিনি জানালেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আমার বড়দাদা সেখানে না পেঁছান পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখা।

*১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

এই পলাতক দুটি কিশোরের গম্যস্থল হিমালয় শুনে তিনি তখন এক অদ্ভুত কাহিনী শোনাতে বসলেন—

"তোমরা দেখছি যে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছ। তবে একটা ব্যাপার বলি শোন। এই সবে মাত্র কালকে আমি যা দেখেছি তার চেয়ে বড় সাধু আর তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না, বুঝলে? আমার এক সহকর্মী আর আমি এই দিন পাঁচেক আগে তাঁর দর্শন পাই। এক খুনী আসামীকে পাকড়াবার জন্য গঙ্গার ধারে খুব কড়া নজর রেখে আমরা পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আমাদের উপর হুকুম ছিল, জ্যান্ত কি মরা যেমনই হোক, তাকে ধরবার জন্য। লোকটা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চুরি করবার উদ্দেশ্যে সাধুর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেবল এইটুকুমাত্র জানা ছিল। আমাদের ঠিক সামনেই অল্পদূরে একটা চেহারা দেখা গেল, যা সেই আসামীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে। চিৎকার করে তাকে দাঁড়াতে বললুম। লোকটা কিন্তু আমাদের থামবার হুকুম না মেনেই হন্ হন্ করে চলতে লাগল। আমরা তাকে পাকড়াবার জন্যে দৌড়তে শুরু করলুম। ধরতে না পেরে তার পিছন দিক দিয়ে গিয়েই প্রচন্ড জোরে তার উপর কুড়ুলের এক কোপ বসিয়ে দিলুম। ব্যাস্! লোকটির ডান হাতটি তার ধড় হতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এল।

"কিছুমাত্র চিৎকার বা সেই ভীষণভাবে কাটা হাতের উপর দৃক্‌পাতমাত্র না করেই সেই অজানা লোকটি আশ্চর্যভাবে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলে। আমরা ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম। আসামী ভেগে যায় দেখে লাফিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই অত্যন্ত নিরীহ আর শান্তভাবে সে বললে, 'তোমরা যে খুনীকে খুঁজছ আমি সে লোক নই।'

আমি ত এক দেবপ্রতিম সাধুর অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলেছি দেখে, অন্তরে গভীর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণতলে দন্ডবৎ হয়ে পড়ে তাঁর কাছে কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলুম, আর তাঁর ফিন্‌কি দিয়ে পড়া রক্তস্রোতে বন্ধ করবার জন্যে পাগড়ীর কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ক্ষত-স্থানটি বাঁধতে গেলুম।

"সাধুটি তখন অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে বললেন, 'বেটা, দেখছি যে তোমার একটা সত্যি সত্যি ভুল হয়ে গেছে। তা যাক, তুমি যাও, মনে কিছু ক্ষোভ কোরো না। মা জগদম্বাই আমায় দেখছেন।' তারপর তিনি ঝুলে পড়া সেই কাটা হাতটি ঠুঁটা জায়গার উপর বসিয়ে দিতেই—আশ্চর্য! সেটা একেবারে বেমালুম জুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়াও আশ্চর্যভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

"সাধুটি বললেন, 'তিন দিন বাদে ঐ গাছতলায় আমার কাছে এসো, দেখবে

আমি একদম সেরে গেছি। তা হলে তোমায় আর কোন রকম অনুশোচনা করতে হবে না।'

"কালকে আমি আর আমার সেই সহকর্মীটি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সাধুটি সেখানে বসেছিলেন, হাতটি বাড়িয়ে আমাদের দেখতে দিলেন—তাতে কোন রকম কাটা বা আঘাতের চিহ্ন পর্যন্তও নাই! তারপর তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে বললেন, 'এবার আমি হৃষীকেশ হয়ে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে চলে যাব', বলেই তাড়াতাড়ি তিনি প্রস্থান করলেন। আমি নিশ্চয়ই জেনেছি যে, তাঁরই পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবন উন্নত হয়ে গেছে।" আন্তরিক ভক্তিভরে এই কথাগুলি বলে তিনি তাঁর কাহিনী শেষ করলেন।

এটা ঠিকই যে, এই অভিজ্ঞতা প্রকৃতই তাঁর মনের গভীরতর স্তর আলোড়িত করে তুলেছিল। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই অলৌকিক ব্যাপারের একটা "কাটিং" আমার হাতে দিলেন। সংবাদপত্রে লোমহর্ষণ ব্যাপারের বর্ণনা সব সাধারণতঃ যেমন অঙ্গহীন বা বিকৃতরূপে প্রকাশিত হয়, (হায় রে! ভারতবর্ষেও এর অভাব নেই!), সংবাদদাতার এ বিবরণটিও সেই রকম কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ছিল যে, সাধুটির মাথা ধড় হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

অমর আর আমি, সেই পরম যোগীর—যিনি তাঁর উৎপীড়ককেও মহাপুরুষ যীশুখ্রিস্টেরই মত ক্ষমা করতে পারেন—দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলুম। গত দুইশত বৎসর ধরে ঐহিক বিষয়ে দারিদ্র হয়ে পড়লেও, ভারতবর্ষে এখনও দৈব সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। নেহাতই সংসারের কীট এই সব পুলিস কর্মচারীর মত লোকেদের এখনও মাঝে মাঝে পথের ধারেই আধ্যাত্মিক জগতের গগনচুম্বী বিরাট ব্যক্তিত্বের দর্শন মেলে।

এই অপূর্ব কাহিনীটি শুনিয়ে আমাদের সময় কাটানর একঘেয়েমি দূর করবার জন্য আমরা পুলিস কর্মচারীটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম। খুব সম্ভবতঃ তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান। সম্ভবতঃ বিনা আয়াসে তিনি এক পরমজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সাধুর দর্শন লাভ করতে পেরেছেন, আর আজ আমাদের ব্যাকুল অনুসন্ধান শেষ হয়েছে কোনো সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে নয়, নিতান্তই স্থূল এক পুলিশের থানায়!

হিমালয় এত কাছে অথচ আটক থেকে আজ তা থেকে আমরা কত দূরে! অমরকে জানালুম, মুক্তিলাভের জন্য মনে এখন দ্বিগুণ জোর এসে গিয়েছে।

উৎসাহসূচক হাসির সঙ্গে বললুম, "দেখ, সুযোগ পেলেই এবার সরে পড়া

যাক্, কি বল? আর পুণ্যতীর্থ হৃষীকেশে আমরা পায়ে হেঁটেই যেতে পারব।"

আমার সঙ্গীটি কিন্তু আমাদের কাছ হতে অর্থবল অপসারিত হতে দেখে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল, বললে, "যদি আজ আমরা এই বিপজ্জনক জঙ্গলের দেশে যাত্রা শুরু করি, তা হলে আমরা সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানায় না পেঁছে, পেঁছব একেবারে সটান বাঘের পেটের ভিতর গিয়ে।"

অনন্তদা আর অমরের দাদা তিনদিন বাদে এসে পেঁছলেন। অমর ত মুক্তির আনন্দে কলকণ্ঠে তার দাদাকে অভ্যর্থনা করলে। আমার কিন্তু মতলব টল্‌ল না। অনন্তদার আমার কাছ থেকে দারুণ ভৎসনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হল না।

"তোমার মনে যে কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পাচ্ছি।" দাদা সান্ত্বনাকোমল স্বরে বলতে লাগলেন, "শুধু তুমি একটিবার কাশীতে চল। সেখানে আমার সঙ্গে গেলে তোমার একটি সত্যিকারের সাধুর দর্শন লাভ হবে। তারপর কলকাতায় গিয়ে দিনকতকের জন্য বাবাকে দেখে আসবে; মনে মনে তিনি বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন। তারপর না হয়, আবার এখানে এসে গুরু অন্বেষণ শুরু করে দিও।"

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে অমর এই সময়ে প্রবেশ করে বললে যে, আমার সঙ্গে হরিদ্বারে ফিরবার আর তার কোনই ইচ্ছা নাই। পারিবারিক স্নেহরসের মধুর উষ্ণতা সে তখন অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছিল। আমার মনে কিন্তু বরাবরই ঠিক ছিল যে, গুরু অন্বেষণ আমি কখনই পরিত্যাগ করব না।

যাই হোক আমাদের দলটি ত অবশেষে কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসল। কাশীতে পেঁছে, আমি আমার প্রার্থনার একটি অদ্ভুত আর প্রত্যক্ষ ফল সদ্য-সদ্যই পেয়ে গেলুম।

অনন্তদার কিন্তু একটি অতি সুচতুর ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। হরিদ্বারে এসে আমাকে পাকড়াবার আগেই তিনি কাশীতে নেমে জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা করবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর এবং তস্যপুত্র আমাকে সন্ন্যাসের* পথ হতে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টার নাকি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

---

* সন্ন্যাস—সম্+নি+অস্ (ক্ষেপণ করা)। সর্বকর্ম ও কর্মফল ভগবানে অর্পণ।

যাক্, অনন্তদা ত আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। পুত্ররত্নটি অল্পবয়সের আর কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসপ্রবণ। উঠানে দাঁড়িয়েই আমাদের অভ্যর্থনা করলে। তারপরে আমার সঙ্গে এক লম্বা দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিলে। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিব্যজ্ঞান তাঁর আছে এই ভাণ করে সে আমার সন্ন্যাসী হওয়ার মতলব দমিয়ে দেবার জন্য শুরু করলে, "দেখ, তোমার সংসারের কর্তব্য সব ছেড়েছুড়ে দেবার জন্যে যদি জিদ কর, তা হলে তোমায় অনবরত দুঃখই পেতে হবে, আর তা ছাড়া ভগবানকেও পাবে না, বুঝলে? সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন না করলে কখনও তোমার প্রাক্তন কর্মক্ষয়* হবে না, তা জেনে রেখো।"

প্রত্যুত্তরে শ্রীমদ্ভগবগীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের অমরবাণী আমার মুখে এসে পড়ল—

"যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সে সাধু বলিয়াই পরিগণিত হয়; কারণ তাহার অধ্যবসায় অতি শোভন। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্যশান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয়ই জানিও যে, আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"†

কিন্তু সেই যুবকটির প্রবল ভবিষ্যদ্বাণী আমার বিশ্বাসের মূলে তখন কিঞ্চিৎ শিথিল করে দিয়েছিল। অন্তরে অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে আমি নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, "দয়াময়, আমার মনের সকল সংশয় ছিন্ন করে, সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে, এখানে এখনই উত্তর দাও যে, তোমার ইচ্ছা কি,—সন্ন্যাসজীবন যাপন করব, না সংসারে প্রবেশ করব?"

দেখলুম যে একটি সৌম্যমূর্ত্তি সাধু পণ্ডিতজীর বাড়ীর সীমানার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সেই স্বয়ংসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা আর আমার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে যে সব কথাবার্তা চলছিল, তা বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন, কারণ অপরিচিত হলেও তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। দেখলুম, তাঁর প্রশান্ত নয়নদ্বয় হতে এক প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হচ্ছে।

বললেন, "বৎস, এই পণ্ডিতমূর্খের কথা কখনো শুনো না। তোমার প্রার্থনার উত্তরে ঠাকুর তোমায় এই বলে আমায় আশ্বাস দিতে বললেন যে,

*কর্ম—ইহজন্ম বা পূর্বজন্মের কর্মফল। সংস্কৃত কৃ ধাতু হতে উৎপন্ন।

† ৯ ৩০-৩১

সন্ন্যাসই তোমার এ জীবনে একমাত্র পথ।" বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় এই পরম আশ্বাসবাণীতে আমি স্বস্তির আনন্দে তখন হাসলুম।

উঠান হতে তখন পণ্ডিতমূর্খটি আমায় ডাকছিলেন, "চলে এসো, চলে এসো, ও লোকটার কাছ থেকে সরে এসো।" আমার জীবনের পথপ্রদর্শক সেই সাধুব্যক্তিটি হাত তুলে আমায় আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। পক্ককেশ পণ্ডিতপ্রবর তখন এই চমৎকার মন্তব্যটি প্রকাশ করলেন যে, "ঐ সাধুটি তোমারই মত মাথাপাগলা।" তিনি ও তাঁর পুত্ররত্নটি তখন আমার দিকে সখেদে তাকাচ্ছিলেন, বললেন, "শুনেছি, ঐ সাধুটিও বৃথাই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, ঈশ্বরলাভের জন্যে।"

আমি ফিরে চললুম। অনন্তদাকে বললুম যে, আমি আর এদের সঙ্গে কোন বৃথা তর্ক করতে চাইনে। এবার চলুন বাড়ী যাওয়া যাক। নিরুৎসাহ দাদাও তৎক্ষণাৎ ফিরতে রাজী হয়ে গেলেন, আমরাও শীঘ্রই কলকাতার ট্রেনে চড়ে বসলুম।

বাড়ী ফিরবার সময় কিন্তু আমার অদম্য কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলুম,—"ডিটেকটিভ মশায়, কি করে জানলেন যে, আমি দুজন সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়েছি?"

দুষ্টু হাসি হেসে দাদা বললেন, "তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে দেখলুম যে, অমর ক্লাস থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। তার পরদিন সকালে তাদের বাড়ী গিয়ে একটা দাগ দেওয়া টাইম টেবল আবিষ্কার করলুম। অমরের বাবা সেই সময় গাড়ী করে বেরুচ্ছিলেন, আর সখেদে কোচম্যানকে বলছিলেন, 'ছেলেটা আজ আর আমার সঙ্গে গাড়ী করে ইস্কুলে যাবে না। সে বাড়ী থেকে পালিয়েছে।'

"কোচম্যানটা তখন বললে, 'শুনুন বাবু, আমাদের দলের একটা গাড়োয়ানের কাছ থেকে শুনলুম যে, সাহেবী পোষাকপরা আপনার ছেলে এবং আর দুটি বন্ধুতে মিলে হাওড়া ইষ্টিশানে গিয়ে গাড়ীতে চড়েছে। যাবার সময় তাদের চামড়ার জুতোগুলো কিন্তু তারা গাড়োয়ানটাকে বকশিশ দিয়ে গেছে!"

"এতে করে আমি তিনটি সূত্র পেলুম—টাইম টেবল, তোমাদের তিনমূর্তি আর সাহেবী পোষাক।"

অনন্তদার রহস্যোদ্ঘাটন আমি মিশ্রিত আমোদ আর বিরক্তির সঙ্গে শুনছিলুম। দেখা গেল, গাড়োয়ানের প্রতি আমাদের বদান্যতা কিঞ্চিৎ অপাত্রে ন্যস্ত হয়েছে।

"অবিশ্যি অমর টাইম টেবলে যে সব শহরের নামের তলায় দাগ দিয়েছিল

সেই সব জায়গায় ষ্টেশন মাষ্টারদের কাছে তখনই টেলিগ্রাম করতে ছুটলুম। বেরিলীর গায়েও দাগ দেওয়া ছিল, কাজেই সেখানে তোমার বন্ধু দ্বারকাকে তার করলুম। কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম যে খুড়তুতো ভাই যতীনদা একরাত্রি অনুপস্থিত, কিন্তু তার পরদিন সকাল-বেলায় সাহেবী পোষাকে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে। তাকে খুঁজে বার করে আমি তাকে বাড়ীতে খাবার নেমন্তন্ন করলুম। আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে সে নেমন্তন্নে এল। রাস্তায় কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়ে আমি তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে তুললুম। গোড়া থেকেই জনকতক ভয়ঙ্কর গোছের চেহারার পুলিশের লোক আমি বেছে রেখে এসেছিলুম। তারা তাকে নিয়ে ঘিরে বসল। তাদের ভীষণ চাউনি দেখে যতীনদা ভড়কে গিয়ে তখন তার রহস্যজনক আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে রাজী হল।

"যতীনদা বললে, 'একটা হাল্কা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম। গুরুলাভের আশায় মন উৎসাহে নেচে উঠেছিল। কিন্তু মুকুন্দ যেই বললে, 'হিমালয়ের গুহার মধ্যে যখন ধ্যানে মজে বসে থাকব, সেখানকার বাঘগুলো তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পোষা বিড়ালের মতন এসে আমাদের চারধারে বসবে। তখনই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। ভাবলুম, 'আমাদের যোগবলে যদি বাঘগুলোর হিংস্র-প্রকৃতি সব না বদলায় তা হলে কি হবে, এ্যাঁ? তারা কি তবুও আমাদের কাছে বাড়ীর পোষা মেনীবিড়ালটির মতই শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকবে? মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম, একেবারে পুরো ধড়টা না হলেও,—হাতপাগুলোর এক একটা কিস্তি পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই আমি একটি বাঘের পেটের ভিতর ঢুকে গেছি!"

যতীনদার অদৃশ্য হওয়াতে যে রাগ হয়েছিল, তা চলে গিয়ে আমার অত্যন্ত হাসি পেল। ট্রেন হতে সরে পড়ার এই হাস্যোদ্দীপক কৈফিয়তে, তিনি আমায় যে মনঃকষ্ট দিয়েছিলেন, তা সব দূর হল। যতীনদাও পুলিশের হাত এড়াতে পারেননি বলে, মনে যে কিঞ্চিৎ তৃপ্তির ভাব এসেছিল তা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

হাসি পাচ্ছিল আবার ভয়ানক রাগও হচ্ছিল, বললুম, "অনন্তদা, আপনি দেখছি জাত ডিটেকটিভ। যাই হোক যতীনদাকে আমি বলব যে, অবিশ্যি বিশ্বাসঘাতকতা করবার মতলবে নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক বুদ্ধিবশেই যে তিনি এ কাজ করে ফেলেছেন, এতে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই।"

কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছলে পিতা অন্ততঃ স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও পা না বাড়াতে কাতর অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে আমার অনুপস্থিতিতে পিতা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুপণ্ডিত স্বামী কেবলানন্দজীকে* আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত আসার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। পিতা এবার পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "এই সাধু পণ্ডিতমশায়ের কাছে এবার থেকে তুমি সংস্কৃত পড়বে।"

পিতা আশা করেছিলেন যে, আমার ধর্মাকাঙ্ক্ষা একজন পণ্ডিতের শাস্ত্রোপদেশেই পরিতৃপ্ত করবেন। কিন্তু তার বিপরীত ফল ফলল অতি সূক্ষ্মভাবে। আমার নব নিযুক্ত শিক্ষকটি, বৌদ্ধিক শুষ্কতার পরিবর্তে আমার অন্তরের ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে পবন সঞ্চার করলেন। পিতার কিন্তু জানা ছিল না যে, স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ী মহাশয়ের একজন উন্নত শিষ্য। সেই অদ্বিতীয় গুরুর অমোঘ দৈবশক্তির চৌম্বকপ্রভাবে সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁর দিকে নীরবে আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে আমি শুনেছিলুম যে লাহিড়ী মহাশয় কেবলানন্দজীকে প্রায়ই ঋষি আখ্যায় অভিহিত করতেন।

কেবলানন্দজীর সুন্দর মুখখানি কোঁকড়ান চুলে ঘেরা। তাঁর কালো চোখ দুটি শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল। তাঁর সুকুমার দেহের গতি একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা সংহত। চিরশান্ত ও স্নেহময় তিনি আত্মজ্ঞানে সুসমাহিত। গভীর ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে কাটত।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রে কেবলানন্দজী সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের দরুণ তিনি "শাস্ত্রী মহাশয়" এই উপাধি লাভ করেছিলেন এবং সচরাচর তিনি এই নামেই অভিহিত হতেন। কিন্তু সংস্কৃতে আমার উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় নি। আমি সর্বদাই সুযোগ খুঁজতুম কি করে নীরস ব্যাকরণের হাত এড়িয়ে, যোগ আর লাহিড়ী মহাশয়ের আলোচনা শুরু করা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় একদিন তাঁর গুরুর সঙ্গে তাঁর জীবনের কিছু অংশ বিবৃত করে আমাকে কৃতার্থ করেন।

*আমাদের সাক্ষাতের সময় কেবলানন্দজী তখনও সন্ন্যাস অবলম্বনে "স্বামী" উপাধি ধারণ করেননি আর তিনি সাধারণতঃ "শাস্ত্রী মহাশয়" নামেই অভিহিত হতেন। "লাহিড়ী মহাশয়" আর "মাষ্টার মহাশয়" (নবম অধ্যায়) এই দুই নামের সঙ্গে গোলমাল এড়াবার জন্যই আমি আমার সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে তাঁর পরবর্তী সন্ন্যাস জীবনের নামে স্বামী কেবলানন্দজী বলেই উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি এঁর জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, "বহু পুণ্যের ফলে আমার লাহিড়ী মশায়ের কাছে বছর দশেক থাকবার অশেষ সৌভাগ্যলাভ ঘটেছিল। তাঁর কাশীর বাড়ীতে প্রায় রোজই রাত্রে যেতুম। দোতলার উপর সামনের বৈঠকখানায় তিনি সর্বদাই থাকতেন। একটা তক্তাপোষে তিনি পদ্মাসনে বসে থাকতেন, আর শিষ্যবর্গ মালার মত অর্ধবৃত্তাকারে বস্‌তে। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত ; অর্ধনিমীলিত থেকে সেই দুটি চোখ অন্তরের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি-মণ্ডলের ভিতর দিয়ে শাশ্বত আনন্দময় রাজ্যে গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে থাকত। কদাচিৎ তিনি বেশী কথা বলতেন। কখন কখন কোন জিজ্ঞাসু শিষ্যের উপর গিয়ে তাঁর দৃষ্টি সংহত হত। তাঁর মধুমাখা প্রাণারাম কথাগুলি তখন জ্যোতিঃ-প্রপাতের মত ঝর্‌তে শুরু হত।

"গুরুদেবের দৃষ্টিপাতে মনের মধ্যে এক অপূর্ব শান্তি ফুটে উঠ্‌ল। যেন একটি অনন্ত পদ্মের ভিতর থেকে তার অবর্ণনীয় অমৃতনিঃষ্যন্দী আনন্দসৌরভ আমার সকল সত্তার উপর পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তাঁর সংসর্গ, এমন কি দিনের পর দিন কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করেও আমার সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল! যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব বাধা আমার মনঃসংযমের পথে এসে দাঁড়াত, তাহলে আমি গুরুপদতলে বসে ধ্যান শুরু করতুম। সেখানে নিতান্ত জটিল আর দুর্লভ অবস্থাও আমার কাছে অত্যন্ত সরল আর সহজ হয়ে আসত। পরবর্তী স্তরের গুরুদের কাছে এইসব অনুভূতিগুলি বোঝা কঠিন ছিল। গুরু ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবানের জীবন্ত মন্দির—তাঁর অন্তরদ্বার সকল শিষ্যদের কাছে ভক্তির জোরেই উন্মুক্ত হত।

"লাহিড়ী মহাশয় পুঁথিগত বিদ্যার জোরে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন না। বিনা আয়াসে তিনি 'ঐশ্বরিক জ্ঞানভাণ্ডারে' প্রবেশ লাভ করেছিলেন। তাঁর সর্বজ্ঞতার উৎস হতে বাণীর ফেনোর্মি আর চিন্তার ধারা সহস্রধারে উৎসারিত হয়ে উঠত। যুগযুগান্ত পূর্বে বেদের* মধ্যে নিহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বসকল নিরূপণ

---

* সনাতন চতুর্বেদের একশতেরও উপর প্রস্থান গ্রন্থ এখনও বর্তমান। ইমার্সন তাঁর "জর্ণালে" নিম্নলিখিত ভাবে বৈদিক চিন্তা ধারার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন : "ইহা উত্তাপ, রাত্রি আর প্রশান্ত, স্তব্ধ ও নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত মহান ও গরিমময়। প্রত্যেক উন্নত কবিচিত্তে পর্যায়ক্রমে যে সকল উচ্চ ও মহান্ নীতি ও ধর্মভাব আসে তাদের সবগুলিই এতে আছে............এই পুস্তকটি সরিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না ; যদি কোন বনে অথবা পুষ্করিণীর উপর নৌকায় আমার নিজের প্রতি সত্যিই কোন আস্থা থাকে তাহলে প্রকৃতি আমাকে সদ্য সদ্য ব্রাহ্মণ করে দেয় ; সীমাহীন প্রয়োজন, অখণ্ড ক্ষতিপূরণ, অপার শক্তি আর অখণ্ড নীরবতা.........এই তার নীতি। তার বাণী হচ্ছে শান্তি, পবিত্রতা আর

করবার অদ্ভুত কৌশল তাঁর চমৎকারভাবে জানা ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের বিষয় বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে, তিনি একটু হেসে বলতেন, "দাঁড়াও, আমি ঐ সব অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, এখুনিই আমার অনুভূতি-গুলো তোমাদের সব বলে দিচ্ছি।" তিনি ছিলেন সেই সব গুরুদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যাঁরা কেবলমাত্র শাস্ত্র মুখস্থ করে অনুপলব্ধ বিষয়গুলোর অজীর্ণোদ্গারই করতে পারতেন, আর কিছু নয়।

"নিকটস্থ কোন শিষ্যকে সেই স্বল্পভাষী গুরু প্রায়ই এই উপদেশ দিতেন, 'শ্লোকগুলোর মানে তোমার কাছে যেমন বোধ হয়, তেমনি ভাবে তাদের ব্যাখ্যা কর। আমি তোমার চিন্তা পরিচালিত করব, যাতে করে তোমার ব্যাখ্যা নির্ভুল হয়।'

"এমনি করে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু অনুভূতিলব্ধ বিষয় তাঁর নানা শিষ্যদের বহুল ব্যাখ্যাসমেত লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

"গুরুদেব কখনও অন্ধ বিশ্বাসে উপদেশ দিতেন না। তিনি ব'লতেন, 'কথাগুলো কেবল খোসামাত্র, ধ্যানেতে নিজ আনন্দবোধরূপে ঈশ্বরোপলব্ধির প্রমাণ গ্রহণ কর।'

"শিষ্যের যা' কিছু সমস্যাই উপস্থিত হোক না কেন, তিনি তার সমাধানে ক্রিয়াযোগ সাধনেরই উপদেশ দিতেন। বলতেন, যখন আমি এ শরীরে আর তোমাদের দেখিয়ে দিতে উপস্থিত থাকব না, যৌগিক সমাধান তখনও তার উপযোগিতা হারাবে না। একটা কাল্পনিক প্রেরণার মত এর অভ্যাসের কৌশল কখনও রুদ্ধ, অবহেলিত, বা বিস্মৃত হবে না। ক্রিয়ার সাহায্যে তোমার মোক্ষ-পথে অবিরত এর অভ্যাস করে যাও, তাতেই তোমার শক্তি বৃদ্ধি হবে।"

কেবলানন্দজী তারপর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে শেষ করলেন যে, "সেই অনন্তপুরুষের সন্ধানে আত্মপ্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত আজ পর্য্যন্ত যে সব মুক্তির উপায় বেরিয়েছে, তা'র মধ্যে এই ক্রিয়াযোগই হচ্ছে আমার মতে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। এর অভ্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল জীবের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও, লাহিড়ী ম'শায় আর তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট শিষ্যদের দেহে প্রত্যক্ষভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।"

কেবলানন্দজীর সাক্ষাতে লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বারা এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল। এক দিন সেই ব্যাপারটি বল্‌তে শুরু করলেন—দৃষ্টি তখন তাঁর টেবিলের ওপর রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি ছাড়িয়ে অনেক, অনেক দূরে নিবদ্ধ।

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—এই সকল সর্বরোগহর বিষয়গুলিই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আর তোমাকে সেই অন্তর্দেবতার পরমানন্দের কাছে উপনীত করে।"

"রামু নামে তাঁর একটি অন্ধ ভক্ত-শিষ্য ছিল। তার অবস্থা দেখে মনে বড় দয়া হল। ভাবলুম, যাঁর মধ্যে ঐশীশক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, সেই আমাদের গুরুদেবকে যখন সে আন্তরিক ভাবে সেবা করছে, তখন কি তিনি ওর জন্যে কিছুই করবেন না? যা'ই হো'ক একদিন সকালে আমি রামুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাটা পাড়লুম। একটা তালপাতার হাতপাখা নিয়ে রামু তখন অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গুরুদেবকে বাতাস ক'রে চলেছিল। রামু যখন উঠে পড়ল, তখন আমি তার পিছু নিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম,—

" 'রামু, কতদিন তুমি অন্ধ হয়েছ?'

" 'জন্মাবধি ম'শাই, সূর্য্যের আলো কখনও চোখে দেখি নি।'

" আমাদের সর্বশক্তিমান গুরুদেব ত' তোমায় সাহায্য করতে পারেন। তাঁর চরণে একদিন তোমার কথাটা নিবেদন করেই দেখ না কেন?'

"তারপর দিন রামু খানিক ইতস্ততঃ করে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হল বটে, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের কাছে সামান্য দেহসম্পদ ভিক্ষা করতে রামু যেন একটু লজ্জিত হয়েই বললে, 'গুরুদেব, সারা জগতের আলো যোগান যিনি, তিনি ত' আপনার ভেতরেই রয়েছেন। আপনার কাছে শুধু এইটুকু মাত্র ভিক্ষে যে, তাঁর আলো আমার চোখে ফুটিয়ে দিন, যাতে ক'রে আমি এ জগতের সূর্যের আলো, যদিও সে আলোর কাছে তুচ্ছ, তা' যেন দেখতে পাই।"

"গুরুদেব বললেন, 'রামু, এসব কথা তোমায় কে বলেছে? আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যে কিচ্ছু না জেনেই তোমায় কেউ এ সব কথা বলেছে। আমার ত' রোগ সারাবার কোন ক্ষমতা নেই, রামু!'

"রামু বললে, 'গুরুদেব, আপনার ভেতর অনন্ত শক্তি যিনি রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমায় ভাল করে-তুলতে পারেন।'

" 'সে অবিশ্যি আলাদা কথা রামু। ভগবানের অনন্ত শক্তি, তার কোথাও সীমা নাই। যিনি তারায় তারায় আলো আর শরীর কোষে প্রাণের জ্যোতিঃ জ্বালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার চোখে দৃষ্টির জ্যোতিঃও ফুটিয়ে তুলতে পারেন।' এই বলে গুরুদেব রামুর কপালে দুই ভ্রূর মাঝখানে* স্পর্শ করে বললেন, 'তোমার মন ঠিক ঐ জায়গায় লাগিয়ে রাখ আর সাতদিন ধ'রে অবিরাম রামনাম† জপ কর, সূর্য্যের আলোর নতুন অরুণোদয় আবার তোমার চোখে হবে।' আশ্চর্য্য! এক হপ্তার মধ্যে তাই'ই হল। জীবনে এই প্রথম রামু

* তৃতীয় বা যোগনেত্রের স্থান। মৃত্যুকালে মানুষের চৈতন্য সাধারণতঃ এই পবিত্র স্থানেই আকৃষ্ট হয়—আর সেই হচ্ছে মৃতের ঊর্দ্ধ দৃষ্টির কারণ।

† সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণের পূতচরিত্র।

প্রকৃতির সুন্দর মুখ দেখতে পেল! সর্বদর্শী তিনি শিষ্যকে নির্ভুলভাবে রাম নাম জপ ক'রতে দিয়েছিলেন, যার চেয়ে প্রিয় আর কোন নাম তাঁর কাছে ছিল না। রামুর মনের জমিতে ভক্তির চাষ দেওয়া ছিল, যাতে গুরুদত্ত রোগ নিরাময়ের মহাবীজ পড়ে অচিরেই তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠ্‌ল।" মুহূর্তেক চুপ ক'রে থেকে কেবলানন্দজী পুনরায় গুরুপ্রসঙ্গ শুরু করলেন: "লাহিড়ী মহাশয়ের যা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘট্‌ত, তাতে তিনি নিজের কৃতিত্ব দাবী করে কখনও কোন অহংকারের* প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠায় তিনি রোগনিরাময়ে সেই আদ্যাশক্তিকে নিজের মধ্য দিয়ে অবাধে পরিচালিত করতে পারতেন।

"সংখ্যাতীত মানবদেহ, যা লাহিড়ী মহাশয়ের ঐশী শক্তির দ্বারা চমকপ্রদ-ভাবে আরোগ্য লাভ করেছিল, অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত তাদের চিতার আগুনেই পুড়ে ছাই হতে হয়েছে, কিন্তু যে নীরব আধ্যাত্মিক জাগরণ তিনি সংসাধিত করেছিলেন, যে সব শিষ্য তিনি তৈরী করেছিলেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তি।"

সংস্কৃত বিদ্যায় আমার পাণ্ডিত হওয়া কখনও ঘটে উঠে নাই বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কেবলানন্দজী আমায় আরও উচ্চতর ঐশ্বরিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করেছিলেন।

---

* অহংকার হচ্ছে দ্বৈতবাদ অর্থাৎ মানব ও তার স্রষ্টার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছেদের মূল কারণ। অহংকারই মানুষকে 'মায়াধীন' করে যাতে করে বিষয়ই বস্তু বলে মিথ্যা উপলব্ধি হয়। সৃষ্ট জীবেরা নিজেদেরই স্রষ্টারূপে কল্পনা করে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

... ...

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ (৫ : ৮, ৯)

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ (১৩ : ৩০)

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ (৪ : ৬)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (৭ : ১৪)

৫ম পরিচ্ছেদ

গন্ধবাবার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন

"পৃথিবীতে সব ব্যাপারেরই একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আর সব কাজেরই একটা উপযুক্ত সময় আছে।"* সলোমনের এই মহাজন বাক্য আমি আমার আশ্বাস-লাভের জন্য পাইনি। বাড়ী থেকে কোন জায়গায় গেলেই আমার সন্ধানীদৃষ্টি বেশ সজাগ ও সতর্ক রাখতুম, যদিই বা আমার ভাগ্যে নির্দিষ্ট গুরুর মুখটি কোনো জায়গায় চোখে পড়ে। কিন্তু আমার ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দর্শন কোথাও মেলে নি।

অমরের সঙ্গে হিমালয়ে পলায়ন আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আমার জীবনে আবির্ভাবের সেই পরম পুণ্যদিনটির মাঝখানে দুবছর কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে আমি অনেকগুলি সাধুমহাত্মাদের দর্শন লাভ করেছিলুম: "গন্ধবাবা", সোহহং স্বামী, নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়, মাষ্টার মহাশয় এবং জগৎবিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়। গন্ধবাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দুটি পূর্বাভাস ছিল, একটি ছিল সুসঙ্গত আর একটি বেশ কৌতুকজনক!

"ঈশ্বরই সরল আর সবই জটিল। আপেক্ষিক প্রাকৃতিক জগতে কোন পরম মান খুঁজতে যেয়ো না।" মন্দিরস্থিত কালীমূর্তির* সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এই সব দার্শনিক চরম তত্ত্বসকল মৃদুভাবে আমার কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, একটি দীর্ঘকায় পুরুষ—যাঁর পরিচ্ছদে, অথবা বলতে গেলে তার অভাবে, তাঁকে পরিব্রাজক সাধু বলেই বোধ হল।

আমি সকৃতজ্ঞভাবে হেসে বললুম, "সত্যিই আপনি আমার মনের জটিল

* বাইবেল—এক্লিসিয়াণ্টীজ, ৩:১

† কালী—প্রকৃতির অনন্ত সত্তার মূর্ত্ত প্রতীক। পরম সত্তা অর্থাৎ শিবের অর্ধশায়িত মূর্ত্তির উপর দণ্ডায়মান চতুর্ভুজা দেবীমূর্তিরূপে শাস্ত্রীয় ভাবে চিত্রিত; কারণ এই প্রপঞ্চময় বিশ্ব বা প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াই নির্গুণ ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন। তাঁর চতুর্ভুজ এই মৌলিক গুণগুলির প্রতীক—দুটি মঙ্গলপ্রসূ আর দুটি বিনাশকারী; জড় বা সৃষ্টির মৌলিক দ্বৈতভাব।

চিন্তারাশির মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। প্রকৃতির রুদ্র আর প্রসন্ন এই দুই ভাব মূর্ত্ত হয়েছে কালীপ্রতিমার মধ্যে কিন্তু তাদের বৈপরীত্য আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী গুণীদেরও বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়েছে।"

তিনি বল্‌লেন, "অতি অল্পলোকই আছেন, যাঁরা তাঁর রহস্য ভেদ করতে পারেন। শুভাশুভ এই দুই ভাবের দুর্ভেদ্য প্রহেলিকাময় মানুষের জীবন যেন স্ফিংসের মত সকল লোকের বুদ্ধির কাছে এক বিরাট রহস্যের সৃষ্টি করে! এর সমাধানের কোন চেষ্টা না করে অধিকাংশ লোক তাদের জীবন বৃথাই ব্যয় করে। মান্ধাতার আমল হতে, এমন কি আজ পর্য্যন্তও লোকে সেই দণ্ডই দিয়ে আস্‌ছে। এক আধজন হয় ত' তাদের বিরাট ব্যক্তিত্বের জোরে কখনও পরাজয় মান্‌তে চায় না। দ্বৈত মায়াবাদের* মধ্যে হয়ত বা সে অদ্বৈতবাদের অখণ্ড সত্যের সন্ধান পায়।"

"আপনার কথাগুলি খাঁটি সত্যি, ম'শাই।"

"বহুদিন ধরে অকপটভাবে জ্ঞানরাজ্যে অন্তর্দর্শনের অনুশীলন করে দেখেছি, প্রবেশের পথ দারুণ কঠিন। আত্মপরীক্ষা আর চিন্তার শুদ্ধির কৃচ্ছ্রসাধনায় কঠিন আর দারুণ অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রবল আত্মাভিমান এ চূর্ণ করে দেয়। সত্যিকারের আত্মবিশ্লেষণেই কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে সত্যদ্রষ্টার ভাব আনয়ন করে। আত্মপ্রকাশের ধারা বা ব্যক্তিগত মত পোষণ শেষ পর্য্যন্ত তাদের আত্মম্ভরিই করে তোলে এই ধারণায় যে, ঈশ্বর ও সৃষ্টির ব্যাখ্যায় তাদেরই ব্যক্তিগত অধিকার আছে।"

আলোচনাটি বেশ ভালই লাগছিল, বল্‌লুম, "এ রকম উদ্ধত মৌলিকত্বের কাছ হতে কিন্তু সত্য নীরবে সরে যায়, তাতে আর সন্দেহ নাই।"

"মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যক্তিগত সংস্কার হতে মুক্ত হতে পারে,

---

* মায়া—মা (পরিমাণ করা) + য + আপ্‌। মায়া হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ যাতে করে অপরিমেয় আর অভেদের মধ্যে সীমা আর ভেদের আপাতভাব দৃষ্ট হয়।

ইমার্সন 'মায়া' নামে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেছিলেন :—

"অভেদ্য মায়ার লীলা ব্যাপ্ত সর্বকালে,
বয়ন করিয়া চলে সংখ্যাতীত জালে ;
মানস মোহন দৃশ্য নানা মায়াছবি
একের উপরে আসি' ঢাকা দেয় সবি।
মায়াবীরে সেইজন সত্য বলি মানে,
যেজন রঞ্জিত হতে চায় মনে প্রাণে।"

ততক্ষণ পর্যন্ত সে শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষের মন যুগ যুগান্তব্যাপী সংস্কারের পলিমাটিতে আবৃত, সংখ্যাতীত জগৎমায়ার অধীন নিরানন্দ জীবনের নিষ্ফলতায় পরিপূর্ণ। মানুষ যখন তার অন্তঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই শুরু করে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ লড়াই তখন তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ শারীরিক শক্তিতে পরাজিত হবার মত মরজগতের শত্রু এরা নয়। সর্বত্রই সজাগ দৃষ্টি, নিরন্তর নিরলস থেকে মানুষকে স্বপ্নেও এরা অনুসরণ করে ফেরে। ভীষণ আর মারাত্মক রকমের অস্ত্রশস্ত্রে গুপ্তভাবে সজ্জিত হয়ে অন্ধ কামনার এই সব সৈন্যের দল আমাদের হত্যা করবার সুযোগ অনবরত খুঁজে বেড়ায়। অদৃষ্টের কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, তার আদর্শের অপমৃত্যু ঘটায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য বইকি! তাকে অক্ষম, নীরস আর ঘৃণ্য ছাড়া আর কিছু বোধ হয় কি?"

"মশায়, এই সব ভ্রান্ত হতভাগ্যদের জন্যে কি আপনার একটুও সহানুভূতি নেই?"

সাধুটি মুহূর্তের জন্যে ক্ষান্ত হলেন, পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "সর্বগুণাধার অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর প্রত্যক্ষ মানুষ, যার প্রায় কিছুই গুণ নেই বললেই চলে, এই দু'জনকে সমান ভাবে ভালবাসা অভাবনীয় বই কি! কিন্তু এ রহস্যেরও একটা সমাধান আছে। অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখলে, মানুষের মন যা স্বার্থবুদ্ধিজড়িত, তার মধ্যেও একটা ঐক্যের ভাব শীগ্‌গিরই খুঁজে পাওয়া যায়। এক হিসেবে অন্ততঃ মানুষের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পরিচয় মেলে। এই সাম্যভাবের আবিষ্কারে, মানুষের ক্ষুদ্র ও ভীত মন স্তম্ভিত হয়ে যায়। এইভাবে মানুষের ওপর মানুষের দরদ সৃষ্টি হয়। বিকাশোন্মুখ মানবাত্মার নিরাময় শক্তির বিষয়ে যে মন অন্ধ ছিল, তা একটা উদার দিব্যদৃষ্টি লাভ করে।"

"সকল যুগের সাধুসন্তরা তো আপনারই মতন জগতের দুঃখে কাতর হয়েছেন।"

"কেবল মাত্র স্বার্থপরায়ণ লোকেরাই অপর লোকেদের জীবনের দুঃখ-দৈন্যের প্রতি সহানুভূতি হারায়, কারণ তাদের নিজেদেরই সীমিত দুঃখকষ্টের মধ্যে তাদের মন ডুবে থাকে।" সাধুটির গম্ভীরবদন বেশ সুস্পষ্ট কোমল হয়ে এল। বলতে লাগলেন, "যে ছুরি দিয়ে চেরার মত আত্মব্যবচ্ছেদ করে দেখে, সেই বিশ্বানুকম্পার বিস্তার অনুভব করতে পারে। আর তার অহঙ্কারের উচ্চনাদও থেমে আসে। এই সব জমিতেই ভগবৎ প্রেমের ফুল ফোটে। অবশেষে জীব আর কিছু না হোক, মনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আর কেন প্রভু, আর কেন? আর যে পারি না।' দারুণ দুঃখের

কশাঘাতে জর্জ্জরিত আর তাড়িত হয়ে মানুষ শেষে সেই অসীম সত্তার দিকেই ধাবিত হয়, যাঁর একমাত্র অনুপম রূপের মাধুরীই তাকে তাঁর নিকটে আকর্ষণ করে।”

সাধুটি আর আমি কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাটের মন্দিরে কালীমায়ের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করবার জন্যে গিয়েছিলাম। আমার ক্ষণপরিচয়ের সাথীটি তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের কারুকার্য ও শোভাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠ্‌লেন,—

“ইঁটকাঠে মনে কোন সাড়া জাগে না, হৃদয় কেবল প্রাণের সুরেই উন্মুক্ত হয়।” সূর্য্যের কিরণ তখন বেশ মিষ্টি লাগছিল, আমরা দরজার দিকে অগ্রসর হলুম। মন্দিরে ভক্ত পূজার্থীর দল তখন যাওয়া আসা করছিল।

সাধুটি আমায় চিন্তিতভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, “তুমি শিশু, ভারতবর্ষও শিশু! প্রাচীন মুনি ঋষিরা* আধ্যাত্মিক জীবনের অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁদের সনাতন প্রথা অধুনাতন দেশ ও কালের পক্ষেও যথোপযুক্ত। জড়বাদের মোহে আচারভ্রষ্ট আর বিকৃত না হয়ে সেই সব ধর্ম্মানুশাসন বা তার উপদেশাদি এখনও ভারতবর্ষকে গড়ে তুলছে। হাজার হাজার বছর ধরে বিপর্যস্ত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা যার মূল্যায়ন করতে পারেননি, সন্দেহ প্রবণ সেই কালের বিচারে বেদের মূল্য আজ নিরূপিত হয়ে গেছে। এইটেই তোমার উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ কোরো।”

পরম বাগ্মী সেই সাধুটির কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করবার সময় তিনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বস্‌লেন ঃ “এখান থেকে যাবার পরই কিন্তু তোমার একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌বে দেখো।”

মন্দির সীমানা ছেড়ে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একটা বাঁক ঘুরতেই বহুদিনের পরিচিত একটি লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ইনি হচ্ছেন সেই সব মহাপ্রভুদের একজন, যাঁদের একবার আলাপ জুড়লে আর স্থানকালের কোন মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

আমি কিন্তু তখন তার হাত এড়িয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার মতলব করছিলুম দেখে সে বল্‌লে, “আচ্ছা, তোমায় আমি শীগ্‌গিরই ছেড়ে দিচ্ছি দাঁড়াও, কিন্তু আমাদের এই দুবছর ছাড়াছাড়ির ভেতর যা কিছু ঘটেছে, তা সব একে একে বল দেখি!”

* ঋষি—ঋষ্‌ (গমন করা)+ই। স্মরণাতীত কালে রচিত বেদের মন্ত্র রচয়িতা।

বললুম, "কি মুস্কিল ! আরে আমাকে যে এখুনিই যেতে হবে।" কিন্তু হলে কি হয়, কে বা শোনে কার কথা। সে তো আমার হাতটি পাকড়ে যত সবটুকিটাকি খবর একে একে বার করে নিতে লাগল। মজা মন্দ নয় ! যতই আমি বলি, ততই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আরও খবরের সন্ধানে লালায়িত হয়। মনে মনে আমি মা কালীর কাছে, যাতে আমি চট্ করে পালাতে পারি, তার একটা উপায় বার করে দেবার জন্যে প্রার্থনা শুরু করলুম।

লোকটি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে দিলুম এই ভয়ে যে, আবার তার বক্‌বকানির পাল্লায় যাতে না পড়তে হয়। পশ্চাতে দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পেয়ে আমিও গতি বৃদ্ধি করলুম। পিছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না। কিন্তু এরই মধ্যে একটি লম্ফপ্রদানে বন্ধুবর খুব স্ফূর্তির সঙ্গে আমার কাঁধটি ধরে এসে দাঁড়াল। তার পরেই শুরু হল,—

"আরে, আমি যে তোমায় গন্ধবাবার কথা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। উনি ঐ সামনের বাড়ীতেই থাকেন।" বলে সে গজ কয়েক দূরে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিলে। তারপর বললে, "ওঁকে দর্শন করে যেয়ো কিন্তু, বুঝলে ? ভারি অদ্ভুত লোক ! তুমি অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ওখানে দেখতে পাবে। যাই হোক, এখন আমি চললুম তবে।" বলে এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই সে চলে গেল।

তার এই কথায় কালীঘাটের মন্দিরের সেই সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তখন আমার মনে পড়ে গেল। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, একটি বেশ প্রশস্ত বৈঠকখানায় একটা গেরুয়ারঙের পুরু গালিচার ওপর বহু লোক এখানে ওখানে বসে রয়েছে। গিয়ে বসতে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের চাপা ফিসফিসানি আমার কাণে এসে ঢুকল—

"ঐ দেখ, গন্ধবাবা বাঘছালের ওপর বসে রয়েছেন। উনি যে কোন গন্ধহীন ফুলের ভিতর স্বাভাবিক সুগন্ধ এনে দিতে পারেন। তা ছাড়া, কোন শুকনো কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলতে অথবা কারুর গা থেকেও অতি মনোরম গন্ধ বার করতে পারেন।"

শুনে সাধুটির দিকে আমি সোজা তাকালুম। সাধুটিরও চঞ্চল দৃষ্টি আমার উপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণ নধর দেহটি, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, চক্ষু দুটি বেশ বড় বড় আর উজ্জ্বল। বললেন, "বাবা, তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি। কি চাও বল ? কোন কিছু গন্ধ চাই ?"

মনে হল, কথাগুলো যেন ছেলেমানুষের মত। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি জন্য ?"

বললেন, "অলৌকিক উপায়ে গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতে পাবে।"

"ভগবানকে গন্ধ তৈরী করার কাজে লাগান নাকি ?"

"তা'তে কি হয়েছে ? ভগবানই ত' গন্ধ তৈরী করেন।"

"তা বটে ! তবে তিনি ফুলের নরম পাপড়ির ভিতরেই গন্ধ তৈরী করেন, সদ্যসদ্য ব্যবহারের পর ফেলে দেবার জন্যে। আপনি ফুল তৈরী করতে পারেন কি ?"

"হ্যাঁ, তবে সাধারণতঃ আমি কেবল গন্ধই তৈরী করি।"

"তাহলে গন্ধ তৈরীর কারখানা ত' সব উঠে যাবে।"

"আরে না, না, তাদের ব্যবসা সব ঠিক বজায় থাকবে। আমার নিজের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈশ্বরের শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া মাত্র, আর কিছু নয় বুঝলে ?"

"মশায়, ঈশ্বরের প্রমাণের কোন দরকার করে নাকি ? তিনি কি সর্বত্র সকল বিষয়েই অলৌকিক ব্যাপার দেখাচ্ছেন না, বলুন ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে আমরাও তো সামান্য কিছু দেখাতে পারি।"

"কতদিন আপনার এ বিদ্যায় পারদর্শী হতে লেগেছে ?"

"বার বৎসর।"

"এই অলৌকিক উপায়ে গন্ধ তৈরী করার জন্যে ! পূজনীয় সাধুজী, মনে হয় যে, কোন গন্ধবিক্রেতার দোকান থেকে গোটা কতক টাকার বদলে আপনি যা পেতে পারেন, তার জন্যে বৃথাই আপনি এই বারোটা বছর ব্যয় করেছেন।"

"গন্ধ ত' ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়।'

"হ্যাঁ, কিন্তু গন্ধ ত' মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেও চলে যায়। শুধু মাত্র দেহের তৃপ্তির জন্যে আমি তা চাইব কেন ?"

"দার্শনিকপ্রবর ! তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলুম। নাও, তোমার ডানহাতটি বাড়িয়ে দাও তো দেখি," বলে আশীর্বাদচ্ছলে দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করলেন।

গন্ধবাবার কাছ থেকে আমি গজকতক দূরে বসেছিলুম। আমার গা ছুঁয়েও কোন লোক সেখানে বসে ছিল না। আমি হাতটি বাড়িয়ে দিলুম যোগিবর তা কিন্তু স্পর্শও করলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি গন্ধ চাই ?"

"গোলাপ।"

"বেশ, তাই হবে।"

অপারিসীম বিস্ময়ে দেখলুম যে, গোলাপের মনোরম সৌরভ আমার করতলের মধ্যস্থল হতে তীব্রভাবে ফুটে বেরুচ্ছে। আমি একটু হেসে কাছের ফুলদানী থেকে একটি গন্ধহীন ফুল তুলে নিয়ে বল্লুম, "এই ফুলটিতে কি যুঁইফুলের গন্ধ হতে পারে?"

"তাই হবে।"

ফুলের পাপড়িগুলি থেকে তখনই যুঁই ফুলের গন্ধ ভর ভর করে বেরুতে লাগ্‌ল। এই অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে, তাঁর একটি শিষ্যের পাশে গিয়ে বস্‌লুম। তিনি বল্‌লেন যে, গন্ধবাবা, যাঁর আসল নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, তিব্বতে এক গুরুর কাছ থেকে যোগের নানা আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া শিক্ষা করে এসেছেন। তিব্বতী যোগীটির বয়স শুনলুম হাজার বছরেরও ওপর।

শিষ্যটি গুরুর বিষয়ে বেশ একটু গর্ব প্রকাশ করে বল্‌লেন—"তাঁর শিষ্য গন্ধবাবা। আপনি এইমাত্র যে রকম দেখলেন, তেমনি যখন তখন উনি শুধু কথা বলে গন্ধ তৈরী করেন না। অবিশ্যি মেজাজ অনুযায়ী ওঁর কাজের অনেক তারতম্য হয়। ওঁর অদ্ভুত শক্তি! কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ওঁর শিষ্যদের ভিতর আছেন।"

আমি মনে মনে ঠিক করলুম, আমি আর এঁদের দল বাড়াব না। একেবারে আক্ষরিক অর্থে "অলৌকিক শক্তিশালী" গুরু আমার ঠিক মনের মত নয়। গন্ধবাবাকে বিনম্র ধন্যবাদ প্রদান করে সেখান হতে প্রস্থান করলুম। বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী ফেরবার সময় সেদিনকার তিনটি বিচিত্র বিষয়ের কথা ভাবতে লাগলুম।

বসতবাড়ীর দরজায় পা দিতেই উমাদিদির সঙ্গে দেখা। বল্‌লে, "বড়ই চাল বেড়ে গেছে দেখ্‌ছি, আবার সুগন্ধি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপার কি বল দেখি?"

বিনা বাক্যব্যয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিদিকে তা শুঁক্‌তে ইসারা করলুম। শুঁকেই চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "আঃ কি চমৎকার গোলাপের গন্ধ, আর কি অস্বাভাবিক রকমের উগ্র!" "সত্যিই ব্যাপারটা উগ্র রকমের অস্বাভাবিক" ভেবে নিঃশব্দে তার নাকের কাছে সেই অলৌকিক উপায়ে সুগন্ধকরা ফুলটি ধরলুম।

"ওঃ যুঁইফুল আমি বড্ড ভালবাসি।" বলেই সে ফুলটি ছিনিয়ে নিলে।

কারণ দিদি খুব ভাল রকমই জানত যে, ও ধরণের ফুল একেবারেই গন্ধহীন, কিন্তু, তা থেকে যুঁইফুলের গন্ধ বারম্বার শুঁকতে শুঁকতে তার মুখের উপর একটা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেলে। দিদির উপর গন্ধের প্রতিক্রিয়াতে আমার এ সন্দেহটা দূর হল যে, হয়ত বা গন্ধবাবা আমার উপর আত্মসম্মোহিত অবস্থা আনাতে আমিই কেবল গন্ধটা টের পাচ্ছিলুম।

পরে আমি আমার বন্ধু অলকানন্দের কাছ হতে গন্ধবাবার আর একটি অলৌকিক শক্তির কথা শুনেছিলুম—যা শুনে আমার মনে হল যে, হায় রে, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষের আজকে যদি তা থাকত!

অলকানন্দ বললে, "বর্ধমানে গন্ধবাবার আস্তানায় এক উৎসব উপলক্ষ্যে শতাধিক অভ্যাগতের মধ্যে আমিও উপস্থিত। বিরাট আনন্দোৎসব, অনেকেই এসেছেন। যোগিবরের শূন্য থেকে জিনিষ তৈরী করবার কথা শুনে আমি একটু হেসে কিছু অসময়ের ট্যাঞ্জারিন্ কমলালেবু তৈরী করবার কথা বললুম। সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতের ওপর পরিবেশন করা লুচিগুলো বেশ ফুলে উঠল। প্রত্যেকটি লুচির খোলের ভেতর একটি করে খোসা ছাড়ানো ট্যাঞ্জারিন কমলালেবু! আমারটিতে তো ভয়ে ভয়ে কামড় দিলুম। কিন্তু দেখলুম, তা অতি চমৎকার!"

বহু বৎসর পরে আমি আত্মোপলব্ধিবলে জানতে পেরেছিলুম, কি করে গন্ধবাবা ঐ সব তৈরী করতেন। কিন্তু হায়! এই প্রক্রিয়াটি চিরকালই জগতের ক্ষুৎপীড়িত মানবগোষ্ঠীর আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উত্তেজনা, যা মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—তা সব ইলেকট্রন আর প্রোটনের স্পন্দন তারতম্যে উৎপন্ন হয়। এই স্পন্দনগুলি আবার প্রাণ অর্থাৎ "লাইফট্রন" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই "লাইফট্রন"ই হচ্ছে সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি, অথবা পারমাণবিক শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর শক্তি, সুকৌশলে পঞ্চতন্মাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গন্ধবাবা কতকগুলি যৌগিক প্রক্রিয়াবিশেষের বলে নিজেকে এই বিশ্বপ্রাণশক্তির সঙ্গে একসুরে বেঁধে এই সব "প্রাণকণিকা"গুলির স্পন্দনশীল গঠনকার্য্যে পরিবর্ত্তন সাধিত করে, তাদের ইচ্ছামত রূপ দিয়ে অভীপ্সিত ফললাভ করতে পারতেন। তাঁর গন্ধ বা ফল তৈরী বা অন্যান্য আশ্চর্য ব্যাপার সকল এই সব জাগতিক স্পন্দনেরই বাস্তব রূপ প্রদান, আর তা সম্মোহিত অবস্থায় কোন আভ্যন্তরীণ অনুভূতি নয়!*

---

* প্রতীচ্যের মনোবিদ্‌দের সংবিৎ চেতনার অনুধ্যান প্রধানতঃ অন্তর্জ্ঞান মন এবং মানসরোগ সকল যা মনোরোগবিদ্যা আর মনঃসমীক্ষণ দ্বারা চিকিৎসিত হয় সেই সব বিষয়ের

যে সব লোকেদের অবেদক প্রয়োগে বিপদ ঘট্‌তে পারে, তা'দের ছোটখাট অস্ত্রোপচারে চৈতন্যাবসাদক ক্লোরোফরম হিসাবে ডাক্তারেরা সম্মোহনবিদ্যা প্রয়োগ করেন। কিন্তু যা'দের বারবার এ রকম অবস্থা উৎপাদিত হয়, তা'দের উপর সম্মোহন শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এর ফলে পরে এমন একটি তামসিক মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যাতে করে, কালে ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে একটা বিশৃংখলার ভাব এনে ফেলে। সম্মোহনবিদ্যা হ'চ্ছে অপরের চিত্তভূমিতে অনধিকার প্রবেশ। এর সাময়িক ব্যাপার ঈশ্বরানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপের তুল্য কখনই নয়। ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ প্রকৃত সাধুসন্তরা, এই নিখিল বিশ্বসৃজনকারী যে একজন স্বপ্নদ্রষ্টা আছেন, তাঁরই ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধা তাঁদের ইচ্ছাশক্তিবলে এই স্বপ্নজগতে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত করতে পারেন।

গন্ধবাবা প্রদর্শিত অলৌকিক কার্য্যাবলী দেখতে অবশ্য খুবই আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে সে সব একেবারেই নিরর্থক। একমাত্র আনন্দবিধান ছাড়া তা'র আর কোনও সার্থকতা না থাকাতে এরা গভীর ঈশ্বরানুসন্ধিৎসার পথ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

প্রকৃত গুরুরা কিন্তু অসাধারণ শক্তির অযথা ও সাড়ম্বর প্রদর্শন আদৌ পছন্দ করেন না।

পারস্য দেশের মরমী, আবু সৈয়দ কিন্তু একবার এই জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের উপর ক্ষমতালাভে দৃপ্ত কতকগুলি ফকিরকে মৃদু ভর্ৎসনাচ্ছলে বলেছিলেন,—"ব্যাং জলে বাস করে, সেইটাই তার স্বাভাবিক স্থান, কাক-শকুন অতি সহজেই হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। পূর্ব পশ্চিমে সয়তান যুগপৎ বর্তমান। সত্যিকারের খাঁটি মানুষ কিন্তু সেই, যে তার স্বজনদিগের সঙ্গে সাধু ব্যবহার করে—ভবের হাটে যার বেচাকেনা চলে, কিন্তু মুহূর্ত্তেকের তরেও সে ভগবানকে ভোলে না।* আর এক উপলক্ষ্যে পারস্যদেশের সেই মহান্ শিক্ষাগুরু ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে এই রকম উপদেশ দিয়েছিলেন,—

অনুসন্ধানেই সীমিত। স্বভাবী মানস অবস্থাসমূহ আর তাদের প্রক্ষোভক আর ঐচ্ছিক দ্যোতনা সকলের উৎপত্তি আর মৌলিক গঠনের বিষয় অতি অল্পই গবেষণা হয়েছে—সত্যিই এ এমন একটা মৌল বিষয় যা ভারতীয় দর্শনও উপেক্ষা করেনি। সাংখ্য আর যোগদর্শনের মধ্যে স্বমিত মানসগঠনের তারতম্যের মধ্যে বিভিন্ন সংযোগ আর বুদ্ধি, অহংকার ও মনের বিশেষ বৃত্তিসমূহের যথাযথ শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে।

*"......বেচাকেনা চলে কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভোলে না" এই উক্তির মধ্যে

"তোমার মাথার ভেতর যা' সব ঢুকে আছে (স্বার্থপর চিন্তা আর নানা দুরাশা) তা সব দূর করে ফেল, তোমার হাতে যা আছে, তা সব অকুণ্ঠভাবে বিতরণ কর। আর দুঃখের আঘাতে কখনও মুষড়ে পোড়োনা।"

কালীঘাটের সেই নিরপেক্ষ সাধু, বা তিব্বতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই যোগী, কেউই আমার গুরু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় পরিতৃপ্তি এনে দিতে পারেন নি।

মূল আদর্শটি হল এই যে বুদ্ধি এবং হৃদয় সুসমঞ্জস ভাবে কাজ করবে। কয়েকজন পাশ্চাত্য-লেখক বলেন যে হিন্দুর জীবনাদর্শ হল ভীরুর পলায়নবাদ অর্থাৎ কর্মহীনতা এবং সমাজ বিরোধী আত্মসংকোচন। বস্তুতঃ বৈদিক চতুরাশ্রম ব্যবস্থা হল সাধারণের পক্ষে প্রকৃত সুসমঞ্জস ব্যবস্থা, যাতে জীবনের অর্ধেক অংশ অধ্যয়ন আর গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালনের জন্য আর অপর অর্ধেক অংশ চিন্তা ও ধ্যানাভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট।

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্জনতা আবশ্যক কিন্তু (সিদ্ধ) গুরুগণ অতঃপর জগৎকে সেবা করবার জন্য সেখানেই ফিরে আসেন। এমন কি সন্তরা কোনও বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত না হয়েও তাঁদের সৎচিন্তা এবং পবিত্র স্পন্দনের দ্বারা জগতের এমন মহা উপকার সাধন করেন যা আত্মানুভূতিশূন্য ব্যক্তিদের বহু আয়াসসাধ্য মানবিক কার্যকলাপ থেকে পাওয়া যেতে পারে না। মহাত্মাগণ প্রায়ই তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও স্ব স্ব পন্থা অনুসারে নিঃস্বার্থভাবে অনুবর্তিগণকে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করতে চেষ্টা করে যান। হিন্দুর কোনও ধর্মীয় বা সামাজিক আদর্শই নেতিমূলক নয়। মহাভারতে যে অহিংসাকে "সকলো ধর্মঃ" বলা হ'য়েছে সেই অহিংসা হল বিধিমূলক উপদেশ কারণ অহিংসা সম্বন্ধে এই ধারণা যে, কারও সাহায্য না করলেই পরোক্ষ ভাবে তাকে "হিংসা" করা হ'ল (অর্থাৎ অহিংসা হল শুধু হিংসার নিষেধ নয় কিন্তু সাহায্যের বিধি)।

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতে (৩।৪-৮) বলা হয়েছে যে, কর্ম-প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতি এবং আলস্য হল অকর্ম বা ভ্রান্ত কর্ম।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্বৈঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥
কর্ম অনুষ্ঠান বিনা কহিনু তোমারে, কর্মশূন্য ভাব কেহ পায় না সংসারে।
কর্মের আসক্তি পার্থ, নাহি যদি যায়, শুধু কর্মত্যাগে সিদ্ধি কেহ নাহি পায়। ৪
কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়, স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

আমার অন্তরে তাঁর পরিচয়ের জন্যে কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়নি, আর সেখানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ বাণীর প্রতিধ্বনি প্রবলতর হয়ে উঠত কারণ তার বিরল আবির্ভাব ঘটত নীরবতার মধ্য হতে। শেষ পর্য্যন্ত যখন আমি আমার গুরুর সাক্ষাৎ পেলাম তখন একমাত্র তাঁর মহিমময় আদর্শের মধ্যেই প্রকৃত মানুষটির পরিচয় পেলাম—আর কিছুরই দরকার রইল না।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥৮॥
ইন্দ্রিয় সংযত রাখি, ইন্দ্রিয় বিষয়, স্মরণ যে করে মূঢ়, কপটী সে হয়। ৬
ইন্দ্রিয় সংযত করি কর্ম্ম করে যেই, অনাসক্ত শুদ্ধচিত প্রশংসিত সেই। ৭
অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা কর সে সকল, কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম করাই মঙ্গল। ৮
(সুধাকর কৃত অনুবাদ—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—৩য় অধ্যায়)

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোঽহং স্বামী

স্কুলের বন্ধু চণ্ডী একদিন এসে এই মনোরম প্রস্তাবটি করে বসল, "ওহে, সোঽহং স্বামীর ঠিকানাটি এবার খুঁজে বার করেছি—চল, কাল তাঁকে দর্শন করে আসা যাক।"

সন্ন্যাস নেবার আগে তিনি শুধু হাতে বাঘ ধরে তাদের সঙ্গে লড়াই করতেন বলে, সাধুটিকে দেখবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এ রকম দুঃসাহসিক আর অসাধারণ শক্তির অধিকারীকে দেখবার জন্যে মনে বালকোচিত উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল।

তারপর দিন সকালে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বন্ধু চণ্ডী আর আমি কিন্তু খুব স্ফূর্তির সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। কলকাতার ভবানীপুরে কিছুক্ষণ বৃথা খোঁজাখুঁজির পর খানিক বাদে ঠিক বাড়ীটা পেয়ে গেলুম। বহুক্ষণ প্রচণ্ডশব্দে কড়া নাড়বার পর বাড়ীর ভৃত্যমহাশয় গদাই লস্করী চালে বেরিয়ে এসে সহাস্যবদনে দর্শন দিলেন। তার সেই বিদ্রূপাত্মক হাসিতে বেশ বোঝা গেল যে, এত দারুণ শব্দ সৃষ্টি করেও আগন্তুকেরা সাধু মহারাজের আস্তানার নীরবতা ভঙ্গ করতে অক্ষম!

যাই হোক, তার নীরব তিরস্কার ত' হজম করে, আমরা দু'জনে বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলুম। বহুক্ষণ ধ'রে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে গিয়ে মনে নানা রকম অস্বস্তিকর ভাবের উদয় হতে লাগল। সাধু মহারাজেরা ইচ্ছে করেই হয়ত তাদের দর্শনের জন্য ঠিক কতটা আগ্রহ আছে, তা দেখবার জন্যে এই রকম পরীক্ষা করেন। পশ্চিমে কিন্তু ডাক্তার আর দন্ত-চিকিৎসকদের দ্বারা এই ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা কৌশল অবাধে প্রয়োগ চলে।

অবশেষে ভৃত্যবর এসে আমাদের আহ্বান জানাতে চণ্ডী আর আমি একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম—দেখা গেল সেটি একটি শোবার ঘর। বিখ্যাত সোঽহং* স্বামী বিছানার ওপর বসে ছিলেন। তাঁর বিরাট বপু দর্শনে আমাদের অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমরা নির্বাকভাবে

---

* সন্ন্যাসজীবনের নাম সোঽহং। 'ব্যাঘ্র স্বামী' নামেই কিন্তু তিনি অধিক পরিচিত।

দাঁড়িয়ে রইলুম। এ রকম বিরাট বক্ষঃস্থল বা ফুটবলের মত হাতের গুলি আমরা জীবনে কখনো দেখি নি। প্রকাণ্ড ঘাড়ের ওপর স্বামীজির ভীষণ অথচ শান্ত মুখ ঘন গোঁপদাড়ি আর বাবরিচুলে ঘেরা। কালো চোখে তাঁর একাধারে পারাবতের শান্তকোমল আর ব্যাঘ্রের হিংস্র দৃষ্টি! পেশীবহুল কোমরে একটা বাঘছাল জড়ান ছাড়া পরিধানে আর কিছুই ছিল না।

গলার স্বর ফুটলে, বন্ধুটি আর আমি, বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর অপূর্ব শৌর্যের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও প্রণাম করে বললুম, "আচ্ছা স্বামীজী, আজ দয়া করে একটু বলুন না জঙ্গলের যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার, সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের শুধু খালি হাতে কেমন করে 'কাবু করে ফেলা' সম্ভব?"

"বাবা, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই নয়। দরকার হলে আমি আজই লেগে যেতে পারি।" শিশুর মত সরল হাসিতে মুখখানি তাঁর ভরে গেল, বললেন, "তোমরা বাঘকে বাঘ বলেই দেখ, আমি কিন্তু ওদের শুধু মেনী বেড়াল বলেই ভাবি।"

"স্বামীজী, মনে হয়, অবচেতন মনে এ চিন্তা ঢোকালেও ঢোকাতে পারি যে বাঘেরা মেনীবেড়াল মাত্র, কিন্তু বাঘেদের কি তা বিশ্বাস করাতে পারব?"

"অবিশ্যি শক্তিরও প্রয়োজন আছে! একটা শিশু, বাঘকে বাড়ীর পোষা বিড়াল বলে ভাবে বলেই কি আর তার কাছ থেকে বাঘকে লড়াইয়ে হারান আশা করা যেতে পারে, বল? আমার এই মজবুত হাত দুটিই হচ্ছে আমার উপযুক্ত অস্ত্র!"

তারপর তিনি আমাদের দালানের দিকে নিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে একটা দেওয়ালের ধারে একটি ঘুঁসি মারতেই একটা ইঁট সোজা খুলে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল আর সেই দেওয়ালের হাঁএর ভিতর দিয়ে আকাশ সুস্পষ্টভাবে উঁকি দিল। হতভম্ব হয়ে ত আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলুম। ভাবলুম, একটি ঘুঁষির ঘায়ে যিনি নিরেট দেওয়াল থেকে চূণসুরকি দিয়ে পাকাপোক্ত করে গাঁথা ইঁট খসিয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি বাঘের দাঁতও খসিয়ে দিতে পারেন!

স্বামীজী বললেন, "কতকগুলো লোকের আমার মত গায়ে জোর আছে বটে, কিন্তু মনে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই। যারা শরীরে খুব মজবুত কিন্তু মনে তেমন নয়, তারা কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জন্তুর স্বাধীনভাবে উল্লম্ফন দেখামাত্রই মূর্চ্ছা যেতে পারে। স্বাভাবিক হিংস্রতা আর বাসস্থানের মধ্যে বনের বাঘের সঙ্গে আর আফিম খাওয়ান সার্কাসের বাঘের সঙ্গে আকাশপাতাল তফাৎ।

"ভীমের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও অনেক লোক একটা রয়েল

বেঙ্গল টাইগারের প্রচন্ড আক্রমণের সামনে দারুণ ভয়ে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, এও দেখা গেছে। কারণ এই রকম বাঘেই মানুষকে তার নিজের মনের ভিতরেই পোষা বিড়ালের মতন ভীরু আর নিরুপায় করে তোলে। বেশ সবল আর দৃঢ় শরীর আর তার সঙ্গে অসীম মনের জোর যার ভিতর আছে, সে উল্টে বাঘকেই পোষা বিড়ালের মতন আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে ফেলতে পারে। ঠিক ঐ রকমই আমি যে কতবার করেছি, তার আর ঠিক নেই।"

আমার সামনে যে ভীমমূর্ত্তিটি, তা বাঘকে যে একেবারে পোষা বিড়াল বানিয়ে ফেলতে পারে, তা বিশ্বাস করতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম। তাঁর এই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ উপদেশ বিতরণও ছিল, আর তা চন্ডী আর আমি সসম্ভ্রমে শুনতে লাগলুম,—"মনই আমাদের দেহের সব পেশী চালনা করে। হাতুড়ীর ঘা—তাতে কতটা শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তার উপর নির্ভর করে। মানুষের শরীরযন্ত্রের দ্বারা যে শক্তির প্রকাশ হয়, সেটা তার আক্রমণের জন্যে মনের দৃঢ়তা আর সাহসের উপর নির্ভর করে। শরীরটা প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই সৃষ্ট ও পুষ্ট। অতীত জীবনের সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই শক্তি অথবা দুর্বলতা মানুষের চেতনার উপর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। প্রথমতঃ তারা অভ্যাসরূপে দেখা দেয়, তারপর তারা অভীপ্সিত বা অনভীপ্সিত দেহ গঠন করে। বাইরের দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মনে। বিপরীত অবস্থায়, অভ্যাসে গড়া শরীর মনের প্রতিবন্ধক হয়। মনিব যদি চাকরের হুকুমে চলে, তা হলে চাকরই শেষকালে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। মনও সেই রকম—শরীরের হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার দাস হয়ে পড়ে।"

আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী তাঁর নিজের জীবনের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আর হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে কিছু বলতে শুরু করলেন,—

"ছেলেবেলা থেকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা। আমার ইচ্ছা ছিল প্রচন্ড, কিন্তু শরীরটা ছিল নিতান্তই দুর্বল!"

বিস্ময়ে আমার মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল মাত্র! এই 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' লোকটিকে দেখে দুর্বলতা যে কি, বা কোনকালে তিনি কিছু জানতেন, সেটা অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হল।

"স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের চিন্তায় অদম্য অধ্যবসায় বলে, আমি সে অসুবিধা দূর করতে পেরেছিলুম। মনের প্রচন্ড জোরই হচ্ছে আসল জোর, আর তা দিয়েই যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও হারাতে পারা যায়, এ অত্যুক্তি করার আমার যথেষ্ঠ কারণ আছে।"

"পূজনীয় স্বামীজী, আপনি কি মনে করেন যে আমি কোনও কালে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারব ?" এই উদ্ভট চিন্তা অবশ্য সেই প্রথম আর শেষবারের মতই আমার মনে উদিত হয়েছিল।

মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তবে বাঘ অনেক রকমের আছে, বুঝলে ? তাদের মধ্যে কতক আবার মানুষের কামনাবাসনার জঙ্গলে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। জঙ্গলের পশুদের ঘুঁসির ঘায়ে অজ্ঞান করে ফেলে ত কোন আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। তার চেয়ে অন্তরের মধ্যে যে সব হিংস্র জন্তু ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তাদেরই জয় করবার চেষ্টা করো।"

"তা হলে মশায়, বুনো বাঘ বশ করা থেকে, এই সন্ন্যাসের পথে এসে পড়লেন কি করে, একটু দয়া করে শোনান যদি !"

সোহহং স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। অতীতের স্বপ্নদর্শনে তাঁর দৃষ্টিতে সুদূরের আভাস। আমার অনুরোধ রাখবেন কি না, তা তখন তাঁর মনে ঈষৎ তোলাপাড়া চল্‌ছিল সেটা বেশ লক্ষ্য করলুম। অবশেষে তিনি সম্মতিসূচক হেসে বলতে আরম্ভ করলেন,—

"যশের উচ্চশিখরে পেঁাছে আমার মনে একটা গর্বের উন্মাদনা এল। স্থির করলুম, শুধু যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করব তা নয়,—তাদের নিয়ে নানারকম খেলাও দেখাব। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বুনো জানোয়ারদের পোষমানা প্রাণীদের মতন চল্‌তে শেখান। আমি লোকেদের সামনে খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই খেলা দেখাতে লাগলুম।

"একদিন সন্ধ্যেবেলা পিতা খুব চিন্তিত মনে ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, 'বাছা, তোমায় গুটিকতক কথা বলে সাবধান করে দিতে এসেছি,—তোমার কর্মফলের দরুন ভাবী অমঙ্গলের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে হবে।

"জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাবা, আপনি কি অদৃষ্টবাদী ? কুসংস্কারকে কি আমার শক্তিশালী কর্মস্রোত আবিল করে তুল্‌তে দিতে হবে ?'

"তিনি বল্‌লেন, 'বাছা আমি অদৃষ্টবাদী নই ; শাস্ত্রের বিধানে, কর্মের প্রতিফলের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। বুনো জানোয়ারদের ভিতর তোমার ওপর যা রাগ জমে আছে, তা যদি জান্‌তে ! একদিন না একদিন তোমায় জীবনের মূল্যে তা পরিশোধ করতে হবে।'

"বাবা, আপনি আমায় অবাক্ করলেন ! আপনি ভালরকমই জানেন যে, বাঘেরা কি রকম প্রাণী—সুন্দর বটে কিন্তু ভীষণ হিংস্র। কোন হতভাগ্য প্রাণীকে বিরাট ভোজে লাগাবার পরক্ষণেই হয়ত' আবার নতুন শিকার দেখ্‌লে তার প্রাণিহিংসা প্রবল হয়ে ওঠে। হয়তো বা জঙ্গলের ঘাসের ওপর একটি

আনন্দচঞ্চল হরিণ লঘুপদে নেচে বেড়াচ্ছে। তাকে ধরেই তার নরম গলাটা ফুটো করে সেই হিংস্র পশুটো তার একটুখানি রক্ত চেখেই আবার খুশীমত চলতে আরম্ভ করে।

"বাঘগুলো হচ্ছে জঙ্গলের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট! কে জানে, হয়তো বা আমার গোটাকতক ঘুঁসি তাদের মোটা মাথায় খানিকটা বুদ্ধিবিবেচনা ঢুকিয়ে দিতে পারে! ভব্যতা শেখাবার জন্যে জঙ্গলের শেষ ইস্কুলে আমিই হচ্ছি হেড্‌মাষ্টার!

"বাবা, আপনি জান্‌বেন, আমার কাজ হচ্ছে বাঘকে মারা নয়, পোষ মানান। আমার এই অত্যন্ত সাধুসংকল্পে কি করে যে অমঙ্গল আসতে পারে, তা আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে! আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ বাবা যে, আমার জীবনের গতি যাতে বদলে যায়, এমন কিছু আমায় আদেশ করবেন না।"

চণ্ডী আর আমার ঐ একই রকম সংকটের কথা মনে উদয় হওয়াতে কথাগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিলুম, কারণ ভারতবর্ষে ছেলেরা ত কখনও বাপের কথা লঘুভাবে অমান্য করে চলতে পারে না।

"একটা নীরব ঔদাসীন্যে পিতা আমার কৈফিয়ৎ শুন্‌লেন। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তিনি গম্ভীরভাবে আমায় বল্‌লেন,—'শেষ অবধি তোমায় সব কথা খুলেই বল্‌তে হল দেখ্‌ছি। তবে শোন, কাল যখন বারাণ্ডায় আমি ধ্যানে যেমন বসি তেমনি বসেছি, এমন সময় একটি সাধু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই বল্‌তে লাগলেন, 'বন্ধুবর, আপনার লড়িয়ে ছেলের জন্যে একটি কথা বলে যাচ্ছি। বাঘকে পোষ মানান বা তাদের সঙ্গে লড়াই করা প্রভৃতি তার এই সব হিংস্র আর বিপজ্জনক কাজগুলো এখুনিই থামাতে বলুন। নইলে এর পরের বারেই বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে এমনি ভয়ানক রকম জখম হতে হবে যে, মরণাপন্ন হয়ে পড়ে থেকে, ছ'টি মাস ধরে তাকে ভুগতে হবে। তার পরেই তার একটা পরিবর্তন আস্‌বে, তখন সে এ সব চালচলন ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!'

"এই কাহিনীতেও কিন্তু আমার মনে কোনও রেখাপাত হল না। মনে হল, পিতা এক ভ্রান্ত উন্মাদের পাল্লায় পড়ে এই সব বিশ্বাস করে বসেছেন!"

সোঽহং স্বামীর এই স্বীকারোক্তিতে অধীরভাব প্রকাশ যেন কোন নির্বুদ্ধিতার প্রতি।

অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে থাকতে বোধ হল যেন, আমরা যে বসে রয়েছি তা একদম ভুলে গেছেন। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত চাপাস্বরে গল্পের ছিন্নসূত্র ধরে আবার শুরু করলেন,—

"বাবার সাবধান করে দেবার খুব অল্প কিছুদিন পরেই আমি কুচবিহার রাজ্যে গিয়েছিলুম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ দেশটি আমার পক্ষে নূতন। এতে বিশ্রামের জন্যে বেশ একটা পরিবর্তনও হবে বলে আশা করলুম। সর্বত্র যেমন, সেখানেও তেমনি কৌতূহলী জনতা রাস্তায় বেরুলেই আমার পিছু নিত। মাঝে মাঝে এই ধরণের ফিসফিসানি আলাপের টুকরো একটু আধটু আমার কানে এসে পৌঁছুত,—

" 'এই লোকটি বুনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন!'

" 'ও গুলো ওঁর পা, না গাছের গুঁড়ি, এ্যাঁ?'

" 'আরে, আরে, ওঁর মুখটা একবার দেখ, যেন জ্যান্ত বাঘের রাজা!' এই সব আর কি।

"তোমরা জান ত' যে গাঁয়ের ছোকরারা সব এক একটা চলন্ত টাটকা খবরের কাগজ! আর মেয়েদের মুখেও তারপরের খবর সব কি রকম তাড়াতাড়ি বাড়ী বাড়ী বিলি হয়ে যায়। ঘণ্টাকতকের মধ্যেই আমার উপস্থিতিতে সহরের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া ও উত্তেজনা দেখা দিল।

"সন্ধ্যে বেলায় আমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা এসে আমার বাসাবাড়ীর সামনে থামল। পর মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকল একদল লম্বা, জোয়ান, পাগড়ীধারী পুলিশ।"

"আমি ত অবাক হয়ে গেলুম! ভাবলুম, মানুষের আইনের এই সব সৃষ্টিদের কাছে সবই সম্ভব! হয় ত' বা আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত কোন বিষয়ের জন্যে বাড়ী বয়ে আমায় ধমকাতে এসেছে! দেখলুম কিন্তু তা' নয়। লোকগুলো বেশ মোলায়েম ভাবে অসাধারণ বিনয়নম্র ভাব প্রকাশ করে অভিবাদন করবার পর বললে, 'হুজুর, কুচবিহারের যুবরাজের তরফ হতে আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এসেছি। কাল সকালে তিনি তাঁর প্রাসাদে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।'

"এ ব্যাপারের সম্ভাবনা কি হতে পারে, তা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ ধরে মনে মনে চিন্তা করলুম। কোন অনির্দেশ্য কারণে আমার এই নিশ্চিন্ত ভ্রমণে বাধা পেয়ে মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ হল। কিন্তু কি করি, পুলিশের লোকেদের কাকুতিমিনতিতে অবশেষে যেতে রাজী হতে হল।

"তার পরদিন সদর দরজায় এসে দাঁড়াল এক বিরাট চৌঘুড়ি! খুব জাঁকজমকের সঙ্গে ত আমায় তুলে নিয়ে চললে। আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লুম। সূর্যের রোদ তখন খুব প্রচণ্ড—আড়াল করবার জন্যে সহিস মাথার ওপর ঝালর দেওয়া কারুকার্যময় একটা প্রকাণ্ড ছাতা খুলে ধরল। সহর আর

তার বনাকীর্ণ সহরতলীর ভিতর দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত আরামে গাড়ী চড়ে বেড়ানটা পরম উপভোগ্য বলেই বোধ হচ্ছিল। রাজপুত্র স্বয়ং আমায় রাজ-প্রাসাদের দুয়ারে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দণ্ডায়মান। ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের সোনার কারুকার্যকরা আসনটিতে আমায় বসালেন—আর নিজে একটা সাধারণ গোছের চেয়ারেই বস্‌লেন।

"উত্তরোত্তর বিস্ময় আমার বেড়েই চল্‌ল। ভাবলুম, 'এই সব খাতির দেখাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমায় নিশ্চয়ই কোন কিছু একটা করতে হবে। সেটা কি ? সেটা কি ?' ভাবছি—দেখলুম রাজকুমারের মতলব দু' একটা সাধারণ কথাবার্তার পরই বেরিয়ে পড়ল। বল্‌লেন, 'সারা সহরে রটে গেছে যে, আপনি শুধু হাতে জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়তে পারেন ? সত্যি নাকি ?' "

"বললুম 'খুবই সত্যি।'

" 'বলেন কি মশাই আমার যে বিশ্বাসই হয় না! আপনি কলিকাতার ভেতো বাঙ্গালী—সহরের লোকেদের মত সাদা চাল খেয়েই মানুষ! আচ্ছা মশাই, সত্যি করে বলুন দেখি, আপনি কি যত সব কোমরভাঙ্গা, আফিম-খাওয়ান, ঝিমিয়েপড়া বাঘগুলোর সঙ্গেই কেবল লড়েন, না ?' স্বর তাঁর কিঞ্চিৎ চড়া, আর টিট্‌কারি দেওয়া—তাতে কিছু প্রাদেশিকতার টানও আছে।

"তাঁর এই রকম অপমানজনক প্রশ্নে আমি কোন উত্তরই দিলুম না। চুপ করে বসেই রইলুম।

"কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি শুরু করলেন,—'শুনুন মশায়, জঙ্গল থেকে একটা ভীষণ বাঘ সদ্য ধরা পড়েছে—নাম দিয়েছি তার "রাজা বেগম"।* তার সঙ্গে লড়াই করতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, বুঝেছেন ? যদি আপনি তাঁকে ঠেকাতে পারেন, আর তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে এসে সজ্ঞানে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, তবে আপনি এই রয়েল বেঙ্গল টাইগারটিকে ত' পাবেনই, তা ছাড়া হাজার কতক টাকা আর অন্যান্য পুরস্কারও বিস্তর পাবেন। কিন্তু তার সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যদি আপনি পিছিয়ে যান, তবে আমি সারা রাজ্যে ঢাক পিটিয়ে দেব যে, আপনি একজন পাকা ধাপ্পাবাজ!'

"তাঁর আস্পর্ধার কথাগুলো যেন একঝাঁক গুলির মত এসে আমার গায়ে বিঁধল। আমি রেগে তখুনিই তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলুম। শুনে ত' তিনি উত্তেজনায় অর্ধেক লাফিয়ে উঠে একটু দেঁতোহাসি হেসে আবার ধপ্ করে বসে

---

*রাজা বেগম—একাধারে ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রীর সংযুক্ত হিংস্রতার জন্য প্রদত্ত নাম।

পড়লেন। রোমসম্রাটদের কথা মনে পড়ল—যাঁরা খ্রীষ্টানদের হিংস্র প্রাণীর আস্তানার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন!

"বললেন,—'আজ থেকে একহপ্তা বাদে লড়াই হবে। কিন্তু আগে থেকে আপনাকে বাঘটা দেখতে দেবার অনুমতি না দিতে পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত!'

"রাজকুমার কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে—হয়ত বা আমি বাঘটাকে হিপনটাইজ করে ফেলব কিম্বা আফিমই খাওয়াব, তা জানি না!

"রাজপ্রাসাদ থেকে তারপর বেরিয়ে এলুম। মজা দেখলুম যে, এবার আর আগেকার মত রাজছত্র বা চোঘুড়ি প্রভৃতি কিছুই নেই।

"পরের সপ্তাহে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে আমি শরীর আর মন দুইই নিয়মিতভাবে তৈরী করতে লাগলুম। আমার চাকরের মারফতে নানা আজগুবি খবর সব কানে এসে পৌঁছুতে লাগল। পিতার নিকটে সেই সাধুটির অশুভ ভবিষ্যম্বাণী কোনও রকমে বাইরে প্রচার হয়ে পড়েছিল—তা সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছিল। বহু সরল গ্রামবাসী সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে, একটা দুষ্ট আত্মা ঈশ্বরের অভিশাপে বাঘের রূপ ধারণ করে জন্মেছে, রাত্রিবেলায় নানা রকম ভীষণাকার রাক্ষসের মূর্তি ধারণ করে আর দিনের বেলায় ঠিক বাঘটি হয়ে থাকে। লোকে অনুমান করেছিল যে আমায় সায়েস্তা করবার জন্যে এই রাক্ষস বাঘটাকেই পাঠান হয়েছিল।

"আর একটা অদ্ভুত গুজব রটে গিয়েছিল যে, বাঘেরা তাদের স্বর্গরাজ্যে কাতর প্রার্থনা পাঠাতে, এই 'রাজা বেগমের' আকারে তার উত্তর এসেছিল। গোটা বাঘজাতটার পক্ষে অত্যন্ত মানহানিকর এই দু'পেয়ে মানুষের আস্পর্ধাকে শাস্তি দেবার সেটাই হবে ব্রহ্মাস্ত্র। হায় রে নখদন্তলোমবিহীন একটা মানুষ, নখদন্ত বিশিষ্ট মজবুতহাড়ের একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেও সাহস পায়! গ্রামবাসীরা সরবে ঘোষণা করল,—যুদ্ধে পরাজিত ব্যাঘ্রবরদের পুঞ্জীভূত হিংসার গতিবৃদ্ধিতে গুপ্ত অভিশাপ ফলে গিয়ে এই গর্বিত বাঘের খেলোয়াড়টিকে এবার রীতিমত আক্কেল দিয়ে দেবে।

"আমার চাকরটি এসে আরও একটু খবর দিয়ে গেল যে, রাজকুমারটি হচ্ছেন আসল বাঘে মানুষে লড়াইয়ের ব্যাপারে একজন উদ্যোক্তার মতো। এমনি সব কত কথাই তখন শুনলুম। যাই হোক অবশেষে দেখা গেল যে রাজকুমার, কয়েক হাজার লোক ধরতে পারে আর ঝড়ে না উড়ে যায় এমন একটা বেশ মজবুত মণ্ডপ তৈরী করান শুরু করলেন। এর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচায় 'রাজা বেগমকে' রাখা ছিল—তার বাইরের খানিকটা জায়গাও বেশ

নিরাপদ করে ঘিরে রাখা হয়েছে। খাঁচায় বন্ধ করা ব্যাঘ্র মহাপ্রভু অনবরত যা গর্জন ছাড়ছিলেন, তা শুনে গায়ের রক্ত জমাট হয়ে যায়, এমনি ভীষণ! এর উপর তাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা হত, তার দারুণ হিংসার আগুনে প্রচণ্ড ক্ষুধার ইন্ধন যোগাবার জন্যে। ষোড়শোপচারে আয়োজন সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হচ্ছিল আর রাজপুত্র বোধ হয় 'রাজা বেগমের' জয়ের পুরস্কারস্বরূপ আমাকেই তার ভোজের ব্যবস্থা বলে আশা করে ছিলেন! যাই হোক, দিন তো ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসতে লাগল।

"এদিকে হয়েছে কি, ষ্টেট থেকে চারিদিকে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে, বাঘে মানুষে অদ্ভুত লড়াই হবে। তাই না শুনে, সহর আর তার আশেপাশের নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার লোক সহরে এসে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তামাসা দেখবার জন্যে টিকিট কিনতে লাগল। এত টিকিট বিক্রি হয়েছিল যে, লড়াইয়ের দিনে জায়গার অভাবে শতশত লোককে ফিরে যেতে হল! অনেকে বিনা টিকিটেই তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল, অথবা গ্যালারির তলায় যেটুকু জায়গা ছিল, সেখানে গিয়ে ঢুকে ভিড় করে দাঁড়াল।"

সোহহং স্বামীর গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমারও উত্তেজনা চরম সীমায় উপস্থিত হল। চণ্ডী ত ভাবাবেগে একেবারে নির্বাক!

"রাজা বেগমের কানফাটান গর্জনের সঙ্গে ঈষৎ ভীত জনতার কোলাহলের মধ্যে নীরবে এসে দাঁড়ালুম। কোমরে সামান্য কাপড় ব্যতীত গায়ে আর অন্য কিছু আবরণ ছিল না। বাইরের দিকের নিরাপদ ঘরটার হুড়কো খুলে ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে সেটাকে আমার পেছন থেকে এঁটে দিলুম। 'রাজা বেগম' রক্তের গন্ধ পেল। লোহার রেলিঙের ওপর বাজের মত আছড়ে পড়ে ব্যাঘ্ররাজ ত আমায় ভীষণ অভ্যর্থনা জানালেন। দারুণ ভয়ে, দর্শকবৃন্দ একেবারে নির্বাক নিশ্চল হয়ে বসে রইল। কারণ ক্রোধে উন্মত্ত, জঙ্গল হতে সদ্যধৃত সেই ভীষণ-দর্শন ব্যাঘ্রবরের সম্মুখে আমাকে তখন একটি নিতান্ত নিরীহ মেষশাবকের মতই দেখাচ্ছিল!

"চোখের পলকের মধ্যে আমি খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়লুম। দরজাটি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'রাজা বেগম' বিদ্যুৎগতিতে আমার ওপর সোজা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে ডান হাতটি আমার ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। নররক্ত বাঘের কাছে পরম উপাদেয় বস্তু। ভীষণভাবে তা হাত থেকে ঝরে পড়তে লাগল। সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণী এবার বুঝি ফলে গেল দেখছি!

"আমি কিন্তু দারুণ আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা তখুনি সামলে নিলুম।

রক্তমাখা আঙ্গুলগুলো কোমরের কাপড়ের তলায় ঢুকিয়ে চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে ফেললুম। তারপর বেশ করে বাগিয়ে বাম হাত দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে একটি ঘুঁসি লাগালুম। বাঘটা আর টাল সামলাতে না পেরে খাঁচার পিছন দিকে একটা পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে সামনের দিকে আবার একটা লাফ মারল। লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দারুণ ঘুঁসির বৃষ্টি তার মাথার ওপর পড়তে শুরু হল।

"কিন্তু নররক্তের স্বাদ, বহুদিনের পিপাসী নেশাখোরের প্রথম মদের চুমুকের মতো 'রাজা বেগমকে' একেবারে পাগল করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে বুকের রক্তহিমকরা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার আক্রমণ ক্রমশঃই ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু একটা মাত্র হাতের দ্বারা অপ্রতুল আত্মরক্ষা করতে গিয়ে, আমায় তার নখদন্তের আক্রমণের কাছে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়তে হল। যাই হোক, শেষপর্যন্ত তাকে ঘুঁসির চোটেই ঠান্ডা করে আনলুম : দুজনেরই জয়ের আশায় মরণ বাঁচনের লড়াই চলতে লাগল। লড়াইয়ের চোটে চারধারে যেমনি রক্ত ছিটিয়ে পড়তে লাগল—বাঘটারও তেমনি গলার ভেতর থেকে যন্ত্রণার তীব্র গর্জনে আর তার সাংঘাতিক আক্রমণচেষ্টায় খাঁচাটা যেন একেবারে নরককুন্ড হয়ে দাঁড়াল!

"দর্শকদের মাঝখান থেকে চিৎকার উঠল, 'গুলি কর, গুলি কর, বাঘটাকে মেরে ফেল, সাবাড় করে দাও!' বাঘেমানুষে লড়াই এত দ্রুতগতিতে চলছিল যে, সেখানকার রক্ষীদের রাইফেলের গুলি পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। এবার আমি আমার সকল ইচ্ছাশক্তি একত্র সংগ্রহ করে ভীষণ চিৎকারের সঙ্গে প্রচন্ড একটা ঘুঁষি মারলুম। বাস! বাঘটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে শুয়ে পড়ল। আর তার কোন নড়নচড়ন নেই।"

আমি মাঝপথে বলে উঠলুম, "ঠিক মেনিবিড়ালের মতো আর কি!" স্বামীজী পরম আপ্যায়িত হয়ে প্রাণ খুলে হাসলেন, তারপর আবার কৌতূহলোদ্দীপক গল্পটি শুরু করলেন,—

"যাক্—শেষ অবধি ত 'রাজা বেগম' হারল। তার রাজগর্ব একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। ক্ষতবিক্ষত হস্তে সদর্পে তার চোয়ালটা ফাঁক করে ধরে নাটকীয় ভঙ্গিতে আমি মুহূর্তেকের জন্যে সেই হাঁ-করা মরণের ফাঁদের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিলুম—তারপর একটা শিকলের জন্যে চারিদিকে চাইলুম। মেঝের ওপরে ছিল একটা শিকলের থাক্, তার ভিতর থেকে একটা শিকল টেনে এনে বাঘটার গলা খাঁচার ডান্ডার সঙ্গে বেশ করে বেঁধে ফেললুম। তার পর বিজয়গর্বে দরজার দিকে আমি অগ্রসর হলুম।

"কিন্তু জীবন্ত সয়তান সেই 'রাজা বেগমের'—কল্পিত রাক্ষস-ভূতেরই মত দারুণ শক্তি ছিল। একটা অদ্ভুত ঝটকা মেরে সে শিকলটা ছিঁড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধটা আমার প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরতেই, আমি হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে গেলুম। কিন্তু পলকের মধ্যে আমি তাকে উল্টে ফেলে আমার পায়ের তলায় চেপে ধরলুম। নিদারুণ ঘুঁসির চোটে সেই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটা আবার অর্ধচেতন অবস্থায় এলিয়ে পড়ল। এবার কিন্তু আমি তাকে আরও সাবধানে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেললুম। তারপর আস্তে আস্তে খাঁচা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

"এইবার কিন্তু একটা নতুন চিৎকার শোনা গেল—সেটা প্রচণ্ড উল্লাসের। সেই বিপুল জনতা হতে প্রবল আনন্দে যে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল, তা যেন একটি মাত্র বিরাট গলার ভিতর থেকে! দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও আমাকে কিন্তু লড়াইয়ের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল, এক—বাঘটাকে অজ্ঞান করে ফেলা, দুই—তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা, আর তিন—কারুর সাহায্য না নিয়ে একলা বেরিয়ে আসা। উপরন্তু আমি সেই জানোয়ারটাকে এমন দারুণ ঠেঙিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম যে, সে তার মুখের মধ্যে আমার মাথাটি অতি সুখাদ্যের মতন পাওয়ার সুযোগটাও উপেক্ষা করে স্থির হয়ে পড়েছিল।

"আমার ঘা গুলোর প্রাথমিক চিকিৎসার পর,—আমায় মালা পরিয়ে সম্মানিত করা হল। শতশত সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে বৃষ্টির মত এসে পড়তে লাগল। সারা সহরে তখন উৎসবের জোয়ার বয়ে গেল। সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ভীষণ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে আমারই যে জিত হয়েছে, তা নিয়ে চারিদিকে অফুরন্ত আলোচনা চলছে শোনা গেল। প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যে 'রাজা বেগম'কে আমায় যে উপহার দেওয়া হল তা পেয়ে কিন্তু আমার মনে কোন উল্লাস বোধ হল না। অন্তরে তখন কি রকম একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। মনে হল, খাঁচা থেকে আমার এই শেষ বারের মতন বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল পার্থিব উচ্চাশা আর আকাঙ্ক্ষারও দরজা যেন চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে এলুম!

* * * *

"তারপর এল দুঃখের দিন! রক্তদুষ্টির জন্যে ছ'মাস ধরে জীবনমরণ দোলায় দুলতে লাগলুম। কুচবিহার হতে বেরুবার মত একটু ভাল হতেই নিজের দেশে ফিরে এলুম।

"এই লড়াইয়ের পর মনে যে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, তাতে এ পথে আর

পা বাড়াতে প্রবৃত্তি রইল না। পিতার কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলুম, 'যে পুণ্যাত্মা সাধুটি আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এখন বুঝছি যে, তিনিই আমার গুরু। আহা, আজ যদি তাঁর দর্শন পেতুম!' আমার ইচ্ছা যে খুবই আন্তরিক ছিল, তার প্রমাণ হাতে হাতেই পেয়ে গেলুম, কারণ তারপর অতি শীগগির তিনি একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

"তাঁকে প্রণাম করতেই অতি স্নিগ্ধ মধুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমার বাঘকে পোষ মানান ত যথেষ্ট হয়েছে হে। এখন আমার সঙ্গে এস, মানুষের মনের জঙ্গলে অজ্ঞান অবিদ্যার যে সব পশুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কি করে দমন করতে হয়, তা তোমায় আমি শিখিয়ে দেব। এ জগতে ত প্রচুর উত্তেজনা আর আনন্দের খোরাক জুগিয়ে বহু দর্শকদের আনন্দ দিয়েছ, এবার তোমার যোগাভ্যাসের অদ্ভুত কৌশল দেখে স্বর্গবাসীরা তেমনি উল্লসিত হোক, কি বল?'

"তারপর সেই সাধু গুরুজীর কাছে আমি আধ্যাত্মিক পথে দীক্ষালাভ করলুম। আমার বহুদিনের অব্যবহৃত অনমনীয় মরচেধরা আত্মার সিংহদ্বার, যেন তিনি নিজহস্তে উন্মুক্ত করে দিলেন! তারপর—তারপর আর কি? গুরুশিষ্য দুজনে হাত ধরাধরি করে সাধনার জন্যে শীগগিরই হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়লুম।"

চণ্ডী আর আমি সত্যিই তাঁর এই রকম ঘূর্ণিবাত্যাবিক্ষুব্ধ বিচিত্র জীবনের অপরূপ কাহিনীর প্রত্যক্ষ বর্ণনায় অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর চরণে প্রণত হলুম। যাই হোক, বেশ একটি স্নিগ্ধ আর শান্ত পরিবেশের মধ্যে সুশীতল বৈঠকখানার ভিতরে, শিক্ষার্থীর আগ্রহে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পুরস্কার তখন প্রচুর ভাবে পেয়ে গেলুম বলেই মনে হল!

৭ম পরিচ্ছেদ

লঘিমা সিদ্ধ সাধু

বন্ধুবর উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী এসে একদিন বললেন, "ওহে, কাল রাত্তিরে একটি ধর্মসভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। গিয়ে দেখি, একটি যোগী ভুঁই থেকে ফুটকতক উঁচুতে শূন্যে অবস্থান করছেন!" শুনে মনে একটা প্রবল কৌতূহলের সঞ্চার হল।

উৎসাহব্যঞ্জক হাসির সঙ্গে বললুম, "বোধ হয় তাঁর নাম আমি আন্দাজ করে বলতে পারি। আচ্ছা, তিনি কি আপার সারকুলার রোডের ভাদুড়ী মশাই?"

উপেন্দ্র নতুন খবর আমদানি করার কৃতিত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়ল। সাধুসন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশ ভালভাবেই জানা ছিল, কাজেই নতুন কোন সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধান পেয়ে আমাকে তা জানাতে পারলে তাদের খুব আনন্দই হত।

বললুম, "উনি আমাদের বাড়ীর এত কাছে থাকেন, যে প্রায়ই আমি ওঁকে দেখতে যাই।" কথাটা শুনে উপেন্দ্রের মুখে বেশ একটা গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল দেখে আমি আরও খানিকটা বলতে শুরু করলুম,—

"তার অনেক অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। পতঞ্জলির* অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রাণায়ামের** বিভিন্ন প্রণালী তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন। একবার তিনি 'ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম' আমার সামনে এমন ভয়ঙ্কর জোরের সঙ্গে করে দেখালেন যে, মনে হল যেন ঘরের মধ্যে সত্যিসত্যিই একটা প্রবল ঝড় উঠেছে। তারপর তিনি ঝড়ের মত নিশ্বাস থামিয়ে উচ্চ সমাধিতে† নিমগ্ন হয়ে গিয়ে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে পড়লেন। ঝড়ের পর শান্তির স্বর্গীয় জ্যোতিঃর ছটা যা তাঁর বদনে দেখা গেল, তা ভোলবার নয়।"

---

* সর্বপ্রধান প্রাচীন যোগব্যাখ্যাতা।

** শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাণশক্তির সংযমন। ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামে মন স্থির হয়।

†১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক জুলে বোয়া বলেছিলেন যে ফরাসী মনোবিদ্‌গণ গবেষণার

"শুনেছি, সাধুটি নাকি বাড়ী থেকে কোথাও বড় একটা বেরোন না ?" উপেন্দ্রের স্বর যেন ঈষৎ সন্দিগ্ধ।

"সত্যিই তাই! তিনি আজ কুড়ি বছর ধরে বাড়ীর ভিতরেই আছেন। কোথাও বড় একটা বেরোন না। পালপার্বণের সময়েই কেবল তাঁর এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে—সে সময় হয়ত বা সামনের ফুটপাথে একটু বেড়ালেন মাত্র! তাঁকে দেখলেই ভিখিরির দল সেখানে ছুটে যায়, কারণ সাধু ভাদুড়ী মশায়ের দয়া সকলের কাছেই সুপরিচিত।"

"আচ্ছা, এই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এড়িয়ে, কি করে তিনি শূন্যে ঝুলে থাকেন, এ্যাঁ ?"

"কতকগুলো প্রাণায়ামের প্রক্রিয়ার পর যোগীদের শরীরের জড়ত্ব একেবারে কেটে যায়, তাতে সেটা শূন্যে ভেসে ওঠে অথবা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠ্‌তে পারে। এমন কি সাধুসন্ন্যাসীরা, যাঁরা যোগপ্রণালীর কোন নির্দিষ্ট সাধনা আদৌ অভ্যাস করেন না, জানা গেছে যে, ঈশ্বরের গভীর ধ্যানের সময় তাঁদেরও দেহ এমনিতর হাল্কা হয়ে যায়।"

"তা হলে 'ত, এঁর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার দেখছি। আচ্ছা, রোজই কি তুমি সন্ধ্যার সময় সভায় যাও নাকি ?" উপেন্দ্রের চোখ দুটি কৌতূহলে চক্‌চক্‌ করে উঠল।

"হ্যাঁ, আমি প্রায়ই সেখানে যাই। তাঁর জ্ঞানোপদেশের ভিতর সরসতা আমায় ভারি তৃপ্তি আর আনন্দ দেয়। মুশকিল এই যে মাঝে মাঝে আমার

পর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয় স্বীকার করেছেন, যা তার পরিপূর্ণ মহিমায় হচ্ছে, "ফ্রয়েডের কল্পিত অন্তর্জ্ঞান মনের সম্পূর্ণ বিপরীত আর যার বৃত্তিগুলি মানুষকে প্রকৃতই মানুষ করে তোলে, কোন অতিজন্তু নয়।" ফরাসী পণ্ডিতটি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে উচ্চতর সংবিদের উন্মেষের সঙ্গে "ক্যুয়িজম্‌" অথবা সংবেশনের ভুল করা উচিত নয়। দার্শনিকভাবে অতীন্দ্রিয় মনের অস্তিত্ব বহু দিন ধরেই স্বীকৃত হয়েছে, বস্তুতঃ যা হচ্ছে ইমার্সন কথিত পরমাত্মা—তা কিন্তু কেবলমাত্র বর্ত্তমানেই বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।"

"দি ওভারসোল"এ ইমার্সন লিখেছেন, মানুষ হচ্ছে মন্দিরের সিংহদ্বার, যেখানে সবকিছু জ্ঞান, সকল কিছু শুভ অবস্থিত। সাধারণভাবে আমরা যাকে মানুষ বলি, পানভোজনরত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত কাজের মানুষ, যেরূপে তাকে জানি, তাতে করে নিজেকে সে প্রকাশ করতে পারে না, বরং নিজেকে ভুল করে প্রকাশ করে। তাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করি না, কিন্তু আত্মা, যার যন্ত্র সে, যাকে তার কর্মের ভিতর দিয়েই সে প্রকাশ করে, তার কাছেই আমাদের নতজানু হতে হয়।...ঈশ্বরের সকল গুণ বা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির গভীরতার দিকে আমাদের একটা দিক সর্বদাই উন্মুক্ত।"

একটানা হাসি কিন্তু সভার গাম্ভীর্য নষ্ট করে ফেলে। সাধুটি তাতে কিছু বিরক্ত হন না বটে কিন্তু ওঁর শিষ্যরা যেন তেড়ে মারতে আসে।"

সেদিন বৈকালে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় ভাদুড়ী মশায়ের আশ্রমের পাশ দিয়ে আসতে আসতে একবার তাঁকে দর্শন করে আসব বলে মনস্থ করলুম। সাধারণ লোকেদের সেখানে প্রবেশলাভ দুরূহ। একটি মাত্র শিষ্য কেবল নিচের তলায় থেকে গুরুর নির্জনতা যাতে ভঙ্গ না হয়, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখেন। শিষ্যটি দারুণ কড়া, সহজে কাউকে তাঁর কাছে ঘেঁসতে দেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা করবার কোন কথা আগে থেকে ঠিক করা আছে কিনা। তাঁর গুরুদেব কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই এসে পড়ে, আমায় পত্রপাঠ বিদায়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

ভাদুড়ী মশাই চোখদুটি মিট মিট করে বললেন, "মুকুন্দর যখনই ইচ্ছে হবে ও তখনই আসবে। আমার নির্জনে থাকবার ব্যবস্থা আমার নিজের আরামের জন্যে নয়, বাইরের লোকেদের জন্যে, বুঝলে? সংসারের লোক সরলতা চায় না, যাতে করে তাদের মোহ টুটে যায়! সাধুরা যে কেবল বিরল তা নয়, দুর্বোধ্যও। শাস্ত্রেও তাঁদের চালচলন একটু খাপছাড়া ধরণেরই বলে।"

আমি ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে উপরতলায় তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধে আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলুম। সেখান থেকে কদাচিৎ তিনি কোথাও নড়তেন। সাধারণ পার্থিব সুখদুঃখের মিছিল সাধুসন্তরা উপেক্ষা করেই চলেন। এ সব তাঁদের দৃষ্টির বাইরেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা যুগসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সাধু-ঋষিগণের সকল সমসাময়িকেরা এই সঙ্কীর্ণ বর্তমানেতে আবদ্ধ নন।

বললুম, "মহর্ষি, আমার পরিচিত যোগীঋষিদের ভিতর কেবল আপনাকেই দেখলুম, যিনি সর্বদাই অন্তরালে থাকেন!"

"ভগবান সময় সময় সাধুসন্ন্যাসীদের একেবারে অপ্রত্যাশিত স্থানে এনে ফেলেন, বুঝলে? পাছে আমরা ভেবে বসি যে, তিনি একটা প্রাণহীন বিধি নিয়মের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নন!"

ভাদুড়ী মহাশয় অতঃপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর সত্তর বছর বয়সে, বার্ধক্যজনিত অথবা তাঁর স্থির শান্ত জীবনের অপ্রীতিকর কোন চিহ্নই দেখতে পেলুম না। সুপুষ্ট দেহ, সরল মন, ধর্মপ্রাণ ভাদুড়ী মশায় সকল বিষয়েই আদর্শ। শাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন মুনিঋষিদের মতই তাঁর প্রসন্ন আনন, আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি। উন্নত-দেহ, প্রচুর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, ঊর্দ্ধনিবদ্ধ দৃষ্টি; তিনি সর্বদাই ঋজু ও দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট।

আমরা দুজনে ধ্যানে বসলুম। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর মধুর শান্তস্বরে

আমি জেগে উঠলুম। ধ্যানের চেয়ে ভগবানকে আরও বেশী করে ভালবাসতে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বললেন, "প্রায়ই ত নীরবে ধ্যানে বস, কিন্তু কোন কিছু 'অনুভব'* লাভ তোমার হয়েছে কি? সিদ্ধিলাভের প্রণালীটি যেন ভুলো না কিন্তু।"

ধ্যান শেষ হবার পর তিনি উঠে পড়লেন, তারপর কয়েকটি আম আমায় খেতে দিলেন। গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যেও তাঁর সরস মনের পরিচয় মেলে। রসিকতা করে বললেন, "সাধারণ লোকেরা ধ্যানযোগের চেয়ে জলযোগের কথাটাই বেশী বোঝে, জানলে হে!" তাঁর এ 'যৌগিক' রসিকতা আমায় হাসিতে উচ্ছ্বসিত করে তুলল। বললেন, "বাবাঃ, তোমার কি হাসি!" তাঁর দৃষ্টিতে সকৌতুক স্নেহের দীপ্তি! তাঁর নিজের মুখ কিন্তু সদাই গম্ভীর, অথচ তাতে একটি স্বর্গীয় হাসির পরশ লাগা। তাঁর পদ্মলোচন, একটি অন্তগূঢ় দিব্য-হাসিতে উজ্জ্বল।

টেবিলের উপর কতকগুলো মোটা খাম দেখিয়ে তিনি বললেন, "সুদূর আমেরিকা হতে এই চিঠিগুলো এসেছে। সেখানকার গোটাকতক সভাসমিতির লোকেদের সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। দেখছি তাদের সভ্যদের যোগ সম্বন্ধে খুব আগ্রহ। কলম্বাসের চেয়েও তাদেব দিঙ্‌নির্ণয়ের জ্ঞান সূক্ষ্মতর; এরা ভারতবর্ষকে নতুন করে আবার আবিষ্কার করছে। আমি তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করে খুব খুশী। অবারিত দিনের আলোর মত যোগের জ্ঞান যেই চায়, সেই বিনামূল্যে পেতে পারে।

"মানুষের মুক্তির জন্যে মুনিঋষিরা যা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বোধ করেছিলেন, সেটা প্রতীচ্যের লোকেদের জন্যে হাল্কা করে দিয়ে আর কাজ নেই। আত্মায় এক, কিন্তু বাইরের অভিজ্ঞতায় ভিন্ন হলেও কি পশ্চিম, কি পূর্ব, কেউই কিছু উন্নতি করতে পারবে না, যদি না ঠিক কোন বিধি নিয়মানুযায়ী যোগ অভ্যাস করা যায়।"

সাধু মহাশয় তাঁর শান্ত ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমায় অভিষিক্ত করলেন। আমি তখন বুঝতেই পারিনি যে, এইসব কথাগুলোর মধ্যে আমার ভবিষ্যতের এক গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। আজ এই কথাগুলো লিখতে বসে এখন বুঝতে পারছি যে, সময় সময় আমায় তিনি যে সব ইঙ্গিত করতেন, তার পরিষ্কার মানে এই ছিল যে, হয় ত কোন দিন বা আমায় ভারতের সংস্কৃতি আমেরিকায় বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

---

* প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন

"মহর্ষি, আমার বড্ড ইচ্ছে যে, আপনি জগতের উপকারের জন্যে যোগ সম্বন্ধে একটা বইটই কিছু লেখেন।"

তিনি বললেন, "আমি শিষ্যদের সব তৈরী করছি। তারা আর তাদের শিষ্যেরাই হবে সব এক একটা জীবন্ত পুস্তক। তারা হবে কালের স্বাভাবিক বিনাশ বা ক্ষয় অথবা সমালোচকদের অস্বাভাবিক সমালোচনার ক্ষতির অতীত।"

সন্ধ্যায় তাঁর শিষ্যেরা না আসা পর্যন্ত আমি একলা তাঁর সঙ্গে বসে রইলুম। ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর এক অননুকরণীয় অপূর্ব প্রসঙ্গ সুরু করলেন। শান্তির প্লাবন বইয়ে তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মানসিক জঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে দিয়ে যেন ভগবানের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌লেন। রূপকচ্ছলে নীতিকথা তিনি বেশ বিশুদ্ধ বাংলায় বলতেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভাদুড়ী মহাশয় মীরাবাঈয়ের জীবনসংক্রান্ত বিবিধ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছিলেন। মধ্যযুগের রাজকুমারী মীরাবাঈ ছিলেন একজন রাজপুতানী, যিনি সাধুসঙ্গলাভের জন্যে রাজৈশ্বর্য পর্যন্তও ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

একজন খুব বড় সাধু, সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁকে স্ত্রীলোক বলে দর্শন দিতে অস্বীকার করায় তিনি বলেছিলেন,—"তোমার গুরুজীকে বোলো যে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ যে পুরুষ (বিশ্বস্রষ্টা) আছেন, তা আমি জানি না। তাঁর কাছে আমরা কি সবাই নারী (মায়া বা প্রকৃতি) নই ?" জবাব শুনে সন্ন্যাসীপ্রবর মীরাবাঈয়ের পদতলে পড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করলেন।

মীরাবাঈ বহু ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন,—সে সব ভারতের সর্বত্র সাদরে গীত হয়ে থাকে। এখানে তারই একটি উদ্ধৃত হ'ল,—

নিত নহানে সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই,
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই।
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে তো মৈঁ পূজুঁ তুলসী ঝাড়,
পথ্থর পূজন্‌সে হরি মিলে তো মৈঁ পূজুঁ পহাড় ॥
তৃণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা,
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলে তো বহুত রহে হৈ খোজা ॥
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা ॥

[ভাদু]ড়ী মহাশয় যেখানে যোগাসনে বসেছিলেন, সেখানে তাঁর পাদুকার কাছে জন কয়েক শিষ্য কিছু প্রণামী রাখলেন। এই শ্রদ্ধানিবেদনের অর্থ এই যে, শিষ্য তাঁর পার্থিব সকল সম্পদ গুরুপদতলে অর্পণ করলেন।

কৃতজ্ঞ বন্ধুরা ভগবানেরই স্বরূপ, তিনি স্বরূপের সন্ধানেই ফেরেন।

পিতৃপ্রতিম সেই মহর্ষির নিকট হতে বিদায় নিতে গিয়ে, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে তাঁর এক শিষ্য উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন, "গুরুদেব, আশ্চর্য আপনি! ভগবানের খোঁজে আপনি আপনার আরাম, ঐশ্বর্য, সর্বস্ব ত্যাগ করে এসে আজ আমাদের জ্ঞান বিলোচ্ছেন, সত্যিই অদ্ভুত!" সকলেই জানত যে, একান্ত মনে যোগমার্গ অবলম্বন করবার জন্য ভাদুড়ী মহাশয় বাল্যকাল হতেই তাঁদের বংশের বিরাট ঐশ্বর্য্য অতি অবহেলায় ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

সাধুপ্রবর মৃদু ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, "তুমি ঠিক উল্টো কথা কইছ। আমি সামান্য গোটাকতক টাকা বা তুচ্ছ কয়েকটা সংসারসুখ ত্যাগ করে চলে এসেছি বটে, কিন্তু তার বদলে কি পেয়েছি জান? অপার ভূমানন্দের অনন্ত সাম্রাজ্য! তা হলে আমি সব ত্যাগ করলুম কি করে, বল? আমি সে ধন উপভোগের আনন্দ জানি। সেটা কি ত্যাগ হল? অদূরদর্শী সাংসারিক লোকেরাই ত্যাগী। কারণ তারা সামান্য গোটাকতক সংসারের খেলনার লোভে তাদের অতুলনীয় স্বর্গের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বসে!"

ত্যাগের এই অপরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি হাসতে লাগলুম। এ ব্যাখ্যার জোরে সাধুভিখারীরা কুবেরের ঐশ্বর্য্য পায় আর ধনগর্বী কোটীপতিরা সব তাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে আত্মদান করে।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "জানলে, ঈশ্বরের বিধানে, আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে যে কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ে বেশ ভালভাবেই ব্যবস্থা করা আছে, তার আর কোন ভুল নেই।" সাধক শ্রেষ্ঠের এই কথাগুলি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত সত্য। "বাইরের নিরাপত্তার বিষয়েই সংসারের সকল লোক অনিশ্চিত বিশ্বাসে খোঁজে। তাদের সংসার-জীবনের ক্লিষ্ট চিন্তাসকল তাদের কপালে কাটা দাগেরই মতন ফুটে আছে। যিনি আমাদের প্রথম নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ু, দুগ্ধ, মাতৃস্তন্য প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন—তিনি তাঁর ভক্তদের দিনের পর দিন কি করে রক্ষে করে চলতে হয়, সে ব্যবস্থাও জানেন বই কি।"

স্কুলের ছুটির পর সেই সাধুর কাছে আমার প্রত্যহই যাতায়াত চলতে লাগল। নীরব উৎসাহদানে তিনি আমায় প্রত্যক্ষ অনুভব লাভে সাহায্য করতেন। একদিন তিনি আমাদের বসত বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে রামমোহন

রায় রোডে উঠে গেলেন। তাঁর ভক্তশিষ্যগণ সেখানে "নগেন্দ্র মঠ"* নামে একটি নূতন আশ্রম স্থাপনা করেছেন।

যদিও এটা আমার এ কাহিনীর কয়েক বছর পরের কথা, তবুও ভাদুড়ী মশায়ের শেষ কথাগুলো এখানে একবার উল্লেখ করব। পশ্চিমে যাবার অব্যবহিত পূর্বেই আমি তাঁর কাছে বিদায় আশীর্বাদ নেবার জন্যে নতজানু হয়ে বসতেই তিনি বললেন, "বাবা, আমেরিকায় যাও ; ভারতের প্রাচীন গৌরবই হ'বে তোমার বিজয়বর্ম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার কপালে বিজয়লেখা। দূর দূরান্তের, দেশ বিদেশের বড় বড় মনীষীরা তোমায় সাদরে বরণ করে নেবেন, তা দেখে নিও!"

---

* তাঁর পুরো নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী।

খৃষ্টীয় জগতের লঘিমাসিদ্ধ সাধুগণের অন্যতম ছিলেন, ১৭শ শতাব্দীর কুপেরতিনো নিবাসী সেণ্ট জোসেফ্। তাঁর কৃতিত্ব বহু-প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা পরীক্ষিত। সেণ্ট জোসেফ্ একপ্রকার জাগতিক অন্যমনস্কতা প্রদর্শন করতেন যা ছিল আসলে দিব্য স্মৃতিমাত্র। তাঁর সঙ্গী মঠবাসিগণ কখনও সাধারণ ভোজন স্থলে তাঁকে পরিবেশন করতে দিতেন না, তাহলে তিনি সহসা পরিবেশনের পাত্রাদি সমেত শূন্যে উত্থিত হতেন। ভূপৃষ্ঠে একসঙ্গে দীর্ঘসময় থাকার অক্ষমতা হেতু তিনি কোন জাগতিক কর্ত্তব্য সাধনের অদ্ভুতভাবে অনুপযোগী ছিলেন। কোনও পবিত্রমূর্ত্তির দর্শন সেণ্ট জোসেফের ঊর্দ্ধগতির পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। হঠাৎ দেখা যেত দুজন সন্ত—একজন প্রস্তর মূর্ত্তিরূপে আর একজন রক্তমাংসের দেহে, পরস্পর সংলগ্ন হয়ে ঊর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে ভাসছেন।

আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রাপ্তা আবিলার সেণ্ট টেরেসা শারীরিক ঊর্দ্ধগতির জন্য বড়ই বিব্রত বোধ করতেন। প্রতিষ্ঠানের গুরু কর্ম্মভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি শারীরিক ঊর্দ্ধগতি রোধ করতে চেষ্টা করতেন—কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। তিনি লিখেছেন, "প্রভু যখন অন্যরূপ ইচ্ছা করেন তখন তুচ্ছ প্রতিরোধ চেষ্টা নিষ্ফলই হয়।" স্পেনের আলবা নামক স্থানের গীর্জায় রক্ষিত সেণ্ট টেরেসার দেহ দীর্ঘ চার শতাব্দী যাবৎ পুষ্পের অলৌকিক সৌরভ সহ অবিকৃত অবস্থা প্রকট করে আসছে। ঐ স্থানটি বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে।

৮ম পরিচ্ছেদ

ভারতের সর্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক

—স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

"জগদীশ চন্দ্র বসুর বেতার আবিষ্কার মার্কনির আগে হয়েছিল।" এই চাঞ্চল্যকর উক্তি শুনে একটু এগিয়ে দেখলুম যে, ফুটপাথের উপর জনকতক অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদানের অভিপ্রায় যদি আমার জাতীয় গর্বপ্রণোদিত হয়, তা হলে অবশ্য আমি দুঃখিত! ভারতবর্ষ শুধু দর্শনে কেন, পদার্থবিদ্যায়ও জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে। তার এই প্রমাণ প্রদর্শনে আমি আমার প্রবল আগ্রহ দমন করতে পারলুম না।

জিজ্ঞাসা করে বসলুম, "তার মানে কি মশায় ?"

অধ্যাপকটি অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করে শোনালেন, "বসু মহাশয়ই হচ্ছেন বেতার সংসঞ্জক আর বৈদ্যুতিকতরঙ্গ প্রতিসরণ নির্দেশক যন্ত্র আবিষ্কারে প্রথম। কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তাঁর আবিষ্কার ব্যবসায়ে অর্থোপার্জনের কাজে লাগান নি। শীগ্‌গির কিন্তু তিনি অজৈব হতে জৈব জগতে তাঁর মনোযোগ নিবেশিত করলেন। উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার, এমন কি পদার্থবিদ্ হিসাবে তাঁর মৌলিক গবেষণাকেও ছাড়িয়ে

আমার ব্যাখ্যাতাকে আমি বিনীত ধন্যবাদ দিতে তিনি বললেন, "বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বসু মহাশয়, প্রেসিডেন্সী কলেজে আমারই সহ-অধ্যাপক।"

তার পরদিনই আমি সেই ঋষি জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী! দূর থেকেই বরাবর আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করে চলতুম। গম্ভীর, প্রশান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি বসু মহাশয় আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পঞ্চাশের কোঠায়ও তাঁর সুন্দর সুঠাম দেহ, ঘন চুল, প্রশস্ত কপাল, চোখ দুটিতে স্বপ্নদ্রষ্টার আবেশময় দৃষ্টি সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁর জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পরিচায়ক।

জগদীশ চন্দ্র বললেন,—

"আমি সম্প্রতি পশ্চিমের বিজ্ঞান সভাগুলিতে যোগদান করে ফিরছি।

প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক অবিভাজ্য অখণ্ড প্রাণের ঐক্য প্রদর্শক আমার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির বিষয়ে সভ্যগণ অসীম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।* জগদীশ বসুর আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ্ যন্ত্রে আয়তন এক কোটি গুণ বড় দেখায়। অনুবীক্ষণযন্ত্রে কেবলমাত্র কয়েক হাজার গুণ বড় দেখায়। তাইতেই এ জীববিদ্যায় অত্যাবশ্যক অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছে। ক্রেস্কোগ্রাফ্ নানাদিকে অগণিত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।"

বললুম,—"আপনি মশায় বিজ্ঞানের অদৃশ্য হাত দিয়ে পূর্ব পশ্চিমের দ্রুত মিলন ঘটাতে যথেষ্টই সাহায্য করেছেন।"

বসু মহাশয় সুরু করলেন, "কেম্ব্রিজে আমার শিক্ষালাভ হয়। পশ্চিমের সব মতবাদেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষামূলক সত্যনির্ধারণ প্রণালীপ্রয়োগ কি সুন্দর! এই রকম পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর এইটাই আমার প্রাচ্যের উত্তরাধিকার! মূক জড়প্রকৃতির চিরমৌন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে আজ তারাই একসঙ্গে আমায় সাহায্য করেছে। আমার ক্রেস্কোগ্রাফের** স্বতঃপ্রকাশ লিপিগুলো দারুণ সন্দেহবাদীদের কাছেও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, গাছেরও সুখদুঃখবোধের সংবেদনশীল তন্ত্রিকাতন্ত্র আছে, এবং বিচিত্র ভাবানুভূতির জীবনও আছে। প্রাণিজগতে যেমন, উদ্ভিদ জগতেও তেমনি সেই একই ধরণের ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, আনন্দ, ক্লেশ ও উত্তেজনা, মোহ প্রভৃতি আরও অসংখ্য রকমের উত্তেজনার সংযোগে প্রতিক্রিয়ার যথোপযুক্ত ভাবানুভূতিও আছে।"

"অধ্যাপক ম'শায়, এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন, আপনার আবির্ভাবের পূর্বে কেবল কবিকল্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আমি একটি সাধুকে জানতাম, যিনি কখনও ফুল তুলতেন না। বলতেন, 'গোলাপ কুঞ্জকে তার সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আমার নিষ্ঠুর চয়নে কি এর মহিমার অপহ্নব ঘটান উচিত হবে?' আপনার আবিষ্কার তাঁর এই দরদী কথাগুলির সত্যতাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে।

"কাব্যসুষমামণ্ডিত সত্যের সঙ্গে কবির মধুর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয় বটে,

* "সব বিজ্ঞানই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানময়, তা না হলে তার অস্তিত্ব থাকে না। উদ্ভিদবিদ্যাও যথার্থ মত এখন গ্রহণ করছে—ব্রহ্মের অবতারবাদও সত্বরই প্রাকৃত ইতিবৃত্তের পাঠ্যপুস্তকরূপে দেখা যাবে।"—এমার্সন।

** ল্যাটিন শব্দ ক্রেসিকের বা বৃদ্ধি থেকে জাত। ক্রেস্কোগ্রাফ ও তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের জন্য জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

কিন্তু বিজ্ঞানী সে পথে অগ্রসর হন স্থূলভাবে। একদিন আমার ল্যাবরেটরীতে এসে ক্রেস্কোগ্রাফের অবিসম্বাদিত প্রমাণ সব দেখে যাবেন।"

সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্থান করলুম। পরে আমি শুনেছিলুম যে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বসু মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করেছেন এবং কলকাতায় একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলুম। শত শত উৎসাহী লোক সেই উপলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়েছিলেন। নূতন বিজ্ঞান মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য আর তার আধ্যাত্মিক প্রতীকের দর্শনে আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলুম। সম্মুখের প্রবেশদ্বারে দেখা গেল—কোন সুদূর তীর্থক্ষেত্র হতে আনীত বহু শতাব্দীর প্রাচীন এক স্মৃতিচিহ্ন! পদ্মাকৃতি* ফোয়ারার পিছনে মশাল হাতে এক খোদিত কল্যাণীমূর্তি,—অনির্বাণ জ্ঞানালোকবর্তিকার চিরবাহিকা নারীর প্রতি ভারতীয় শ্রদ্ধার অপূর্ব নিদর্শন! উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রকৃতির লীলাতীত অরূপের প্রতি উৎসৃষ্ট। বেদীতে কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠার অভাব, দেবতার অশরীরী ভাবেরই সূচনা প্রকাশ করছিল। আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত জগদীশ-চন্দ্রের নিম্নলিখিত বাণী শুনে মনে হল যেন, ভাবানুপ্রাণিত প্রাচীন কোন ঋষির মুখ হতে তা' নিঃসৃত হয়েছে,—

"আজকের দিনে এই গৃহ আমি মাত্র পরীক্ষাগাররূপে নয়, প্রকৃতই মন্দির রূপে উৎসর্গ করলুম।" তাঁর শ্রদ্ধাপ্লুত গম্ভীরবাণী, তখন সেই জনপূর্ণ সভাগৃহের উপর এক অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করল। "আমার গবেষণার কাজ চালাবার সময় আমার অজ্ঞাতসারে আমি পদার্থবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের সীমারেখায় উপস্থিত হয়ে পড়েছিলুম। আশ্চর্যের বিষয় আমি দেখতে পেলুম যে, সীমারেখা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর জড় ও প্রাণের রাজ্যের সংযোগস্থল ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে! অজৈব পদার্থ বোধ হল, যেন জড় ছাড়া অন্য কিছু;—বহু বিচিত্র শক্তির ক্রিয়া প্রকাশে এতে এক অপূর্ব পুলক শিহরণ!

"দেখলুম,—একই সমান প্রক্রিয়ায় ধাতু, বৃক্ষ, প্রাণী প্রভৃতি সব একই সাধারণ নিয়মের অধীন। তারা সকলেই মূলতঃ একই রকমের ক্লান্তি আর

---

*পদ্ম—ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্মপ্রতীক। এর উন্মীলিত দলগুলি জীবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্যোতক। পঙ্ক হতে উদ্ভিন্ন পঙ্কজের অনাবিল সৌন্দর্যের বুকিতে আধ্যাত্মিক পুণ্য প্রসাদের আশ্বাস।

অবসাদ বোধ করে—একই রকমের তাদের আরোগ্যলাভ বা আনন্দ শিহরণ অথবা মরণে একই রকমের চিরস্থায়ী স্থির নিস্পন্দ ভাব। এই বিরাট ঐক্যে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে প্রচুর আশার সঙ্গে আমার পরীক্ষা প্রমাণ প্রদর্শন সিদ্ধ গবেষণার ফলগুলি আমি রয়েল সোসাইটির গোচরীভূত করি। কিন্তু সেখানে উপস্থিত শারীরতত্ত্ববিদেরা আমার পরীক্ষার ফলগুলি জড় জগতের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ রেখে আমায় নিরস্ত হতে উপদেশ দান করে বললেন যে, তাতেই আছে আমার নিশ্চিত সাফল্য এবং তাঁদের সংরক্ষিত রাজ্যে যেন অনধিকার প্রবেশ না করি। আমি হয় ত' আমার অজ্ঞাতসারে এক রকমের জাতিভেদের এলাকায় ঢুকে পড়ে বোধ হয় তাদের সভ্যতা লঙ্ঘন করে ফেলেছিলুম।

"অজানিত একটা ধর্মের গোঁড়ামি গোছের জিনিষও সেখানে বর্তমান ছিল, যাতে করে বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞতার একটা বিশৃঙ্খলা আনে। এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, যিনি চিরবিবর্তনশীল সৃষ্টিরহস্যে আমাদের ঘিরে রেখেছেন, তিনিই আমাদের অন্তরের মাঝে জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির ইচ্ছাও সুপ্ত রেখেছেন। বহুদিনের ভ্রান্তির মধ্যে জানতে পেরেছিলুম যে, বিজ্ঞানীদের উৎসৃষ্ট জীবন অলঙ্ঘনীয়ভাবে অন্তহীন সংগ্রামে পরিপূর্ণ। লাভ, ক্ষতি, ফলাফল একই ভেবে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়, অবিচলিত শ্রদ্ধা নিবেদনে।

"কালে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানসমিতিগুলি আমার মতবাদ আর তার পরীক্ষার ফলগুলিও গ্রহণ করলেন আর বিজ্ঞানে ভারতের দানের প্রাধান্যও স্বীকার করে নিলেন। সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ কোন কিছু কি ভারতীয় মনে তৃপ্তি আনতে পারে? বহু প্রচলিত জীবন্ত ঐতিহ্য আর পুনরুজ্জীবনের প্রাণশক্তিবলে এই ভারতভূমি বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপাতমনোহর আর সাময়িক পুরস্কারের আকর্ষণ দূরে ফেলে রেখে ভারতবাসীরা সর্বদাই এগিয়ে চলেছে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ উপলব্ধির সন্ধানে,—আর তা নিষ্ক্রিয় ত্যাগে নয়, সক্রিয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। যে দুর্বল, যে সংগ্রামকে অস্বীকার করে কিছুই পায়নি, তার ত্যাগ করবারও কিছু নেই। যুদ্ধনিরত থেকে যিনি জয়লাভ করেছেন, তিনিই কেবল তাঁর বিজয়লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে জগৎকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

"জড়ের উপর প্রতিক্রিয়া এবং উদ্ভিদ জগতে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের কাজ যা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে—সে সব কাজ পদার্থবিদ্যায়, শারীরতত্ত্বে, চিকিৎসা, কৃষি এমন কি মনোবিদ্যায়ও গবেষণার বিস্তৃত পন্থা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যে সব সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত অসাধ্য বলেই বিবেচিত হত, তারা আজ পরীক্ষামূলক গবেষণার সীমার মধ্যে এসে পড়েছে।

"কিন্তু নিশ্চিত সত্য নির্ণয় ছাড়া ত আর চরম সাফল্য লাভ করা যায় না। কাজেই আমার পরিকল্পিত সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন যন্ত্র সকলের সুদীর্ঘ শ্রেণী তাদের আধারের ভিতর প্রবেশ গৃহের মধ্যে আপনাদের সম্মুখেই আজ রাখা হয়েছে। তারা হচ্ছে আপাতপ্রতীয়মান ভ্রান্তিজনক সাদৃশ্য হতে, অদৃশ্য প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে বার করতে আর মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করতে অবিরাম ধৈর্য, শ্রম আর উপায় উদ্ভাবনের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই সাক্ষী। স্রষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, আসল পরীক্ষাগার হচ্ছে মন, যেখানে মায়ার আড়াল হতে তাঁরা প্রকৃত সত্য বিধিগুলি খুঁজে বার করেন।

"এখানে প্রদত্ত বক্তৃতায় কোন বিষয়ের চর্বিতচর্বন বা কোন অমৌল জ্ঞানের কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তি হবে না। তারা ঘোষণা করবে সব নতুন আবিষ্কার যা এই মন্দিরে আজ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হবে। মন্দিরের গবেষণাকার্যের বিবরণীর নিয়মিত প্রকাশে ভারতের এই সব অবদানগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই পৌঁছতে পারবে, আর তা সর্বসাধারণেরই সম্পত্তি হবে। এদের উপর কখনও কোন পেটেন্ট নেওয়া হবে না। আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ভাব এই চায় যে, ব্যক্তিগত লাভের জন্যে আমরা জ্ঞানের ব্যবহারের মর্যাদাহানি থেকে যেন চিরতরে মুক্ত থাকি।

"আর এও আমার ইচ্ছা যে, এই বিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত সুযোগসুবিধা সকল দেশেরই কর্মীরা যতদূর সম্ভব যেন লাভ করতে পারেন। এ বিষয়ে আমি আমাদের প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি। আড়াই হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষ তার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সকল, নালন্দা ও তক্ষশীলায়, পৃথিবীর সর্বত্র হতে বিদ্যার্থীদের সাদর আহ্বান জানিয়েছিল।

বিজ্ঞান যদিও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন দেশ বিশেষের নয়, বরং সর্বজনীনতায় এ আন্তর্জাতিক, তবুও ভারতবর্ষ জগৎকে তার বিরাট দানের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।*

---

*প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পদার্থের আণবিক সংগঠন সুপরিচিত ছিল। ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক একটি—সংস্কৃত "বিশেষ" অর্থাৎ আণবিক বৈশিষ্ট্য হতে এর ব্যুৎপত্তি। বৈশেষিক দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ঔলূক্য,—যিনি কণাদ (কণাভক্ষক; তণ্ডুলের কণা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতেন) নামেও পরিচিত; তিনি ২৮০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালের "ইস্ট ওয়েস্ট" পত্রিকায় বৈশেষিক দর্শনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে: "যদিও আধুনিক আণবিক মতবাদ

"ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কল্পনা, যা আপাতবিরোধী সত্যসকল হতে নতুন ধারাকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করে, তা গভীর একাগ্রতার অভ্যাসে সংযত। এই সংযম কিন্তু মনে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসন্ধানের শক্তি জোগায়।"

জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এই শেষ কথাগুলিতে আমার চোখে জল এল। "ধৈর্য" কথাটা কি ভারতবর্ষ এই নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত নয়—যা কালের গতি অথবা ঐতিহাসিকদের নাগালের বাইরে?

প্রতিষ্ঠাদিবসের অল্প কিছুদিন পরেই আমি আবার সেই গবেষণাকেন্দ্র দেখে এলুম।

সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ মহাশয়, তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে, তাঁর নিঃস্তব্ধ পরীক্ষাগারে আমায় নিয়ে গেলেন। তারপর একটা পরীক্ষা শুরু করে বললেন, "আমি এই ফার্ণগাছের সঙ্গে আমার "ক্রেস্কোগ্রাফ" লাগিয়ে দিচ্ছি, এ বহুগুণ বাড়িয়ে দেখায়। ঐ অনুপাতে যদি শামুকের গতি বাড়িয়ে দেখান যায়, তবে তাকে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দৌড়তে দেখা যাবে।"

পরদার উপর খুব বড় করে প্রতিফলিত ফার্ণ গাছের ছায়ার ওপর আমার সাগ্রহ দৃষ্টি গিয়ে আবদ্ধ হল। সূক্ষ্ম জীবনের স্পন্দন এখন বেশ স্পষ্টই

সাধারণতঃ বিজ্ঞানের নূতন উন্নতি বলেই বিবেচিত হয়, কিন্তু এ বিষয়টি কণাদ কর্ত্তৃক বহু পূর্বেই পরিপাটিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সংস্কৃত 'অণু', গ্রীকশব্দ এটমের (atomos = uncut) বাচ্যার্থ "অবিভাজ্য" রূপে সুষ্ঠুভাবেই অনূদিত হতে পারে। খৃষ্টপূর্ব যুগের বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকলের মধ্যে আছে—(১) চুম্বকের দিকে সূচের গতি (২) বৃক্ষমধ্যে জলসংবহ (৩) আকাশ বা ইথর, জড় ও অবয়বহীন,—সূক্ষ্মশক্তি সঞ্চারণের ভিত্তি (৪) সৌরাগ্নি সর্বপ্রকার উত্তাপের কারণ (৫) উত্তাপই আণবিক গঠন পরিবর্ত্তনের কারণ (৬) মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পৃথিবীর অণুমধ্যস্থ গুণ, যা তাদের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ শক্তি দেয় (৭) সকল শক্তির গতিশীলতা—যার কার্যকারণ সম্বন্ধে শক্তির ব্যয় অথবা গতির পুনঃসংস্থান নিহিত। (৮) আণবিক বিস্ফোরণে জগতের প্রলয় (৯) তাপ ও আলোর কিরণের বিচ্ছুরণ হচ্ছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্মকণার চতুর্দিকে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ধাবন (আধুনিক "কসমিক রে" বা মহাব্যোমরশ্মি মতবাদ) (১০) দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা।

বৈশেষিক দর্শন, অণুই জগতের উৎপত্তির কারণ বলে নির্দেশ করেছে—অনন্ত তাদের প্রকৃতি অর্থাৎ তাদের চরম বৈশিষ্ঠ্য। এই অণুগুলি অবিরাম স্পন্দনগতিবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে। অণু যে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ, এই নূতন আবিষ্কার প্রাচীন বৈশেষিক দার্শনিকদের কাছে কোন নূতন সংবাদ নয়। এঁরা সময়কেও তার গাণিতিক ধারণায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে, তার এককে 'কলা' বলে অভিহিত করেছেন, আর তা হচ্ছে অণুর নিজ একক অবকাশে ঘুরতে যেটুকু সময় লাগে কেবল সেইটুকু সময় মাত্র।"

দেখতে পাওয়া গেল। আমার মুগ্ধ চোখের সামনে গাছটি অতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বৈজ্ঞানিক মহাশয় ফার্ণ গাছটির ডগার উপর একটি ছোট ধাতুখণ্ড দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। নীরব বৃদ্ধির অঙ্গসঞ্চালন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দণ্ডটি সরিয়ে নিতেই আবার বৃদ্ধির মুখর ছন্দ সুরু হল।

বসু মহাশয় বললেন, "দেখলেন 'ত, বাইরের সামান্য কোন বাধাও, সুবেদী কলাগুলির পক্ষে কি রকম ক্ষতিকর। দেখুন, এবার আমি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করব, তারপর এর প্রতিষেধকও দেব।"

ক্লোরোফর্ম দেওয়ার ফলে গাছের বৃদ্ধি থেমে গেল, প্রতিষেধকের ক্রিয়াতে আবার তা পুনরুজ্জীবিত হল। বৃদ্ধির সময়কার স্পন্দনগুলি চলচ্চিত্রের প্লটের চেয়েও আমাকে একান্ত নিবিষ্ট করে তুলল। বসু মহাশয় (এ ক্ষেত্রে সিনেমার খল চরিত্রের স্থলে) ফার্ণ গাছটার এক অংশের ভিতর একটা তীক্ষ্ন অস্ত্র প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যন্ত্রণাজনিত আক্ষেপের স্পন্দন দেখা গেল। কাণ্ডের একাংশ দিয়ে যখন তিনি একটা ক্ষুর চালিয়ে দিলেন, ছায়াটা তখন ভয়ানক কাঁপতে লাগল, অবশেষে মরণের কোলে ঢলে পড়ে অন্তিম বিরাম লাভ করে স্থির হয়ে গেল।

একটা সতৃপ্ত হাসির সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের কৌশল দেখাতে দেখাতে আচার্য জগদীশ বসু মহাশয় বললেন, "একটা প্রকাণ্ড গাছকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমি সাফল্যের সঙ্গে স্থানান্তরিত করতে পেরেছিলুম। সাধারণতঃ এই রকম বিরাট বনস্পতি স্থানান্তরিত করতে গেলেই অতি শীঘ্র মারা যায়। আমার সূক্ষ্ম যন্ত্রের রেখাচিত্রগুলো—গাছেদেরও যে সংবহনতন্ত্র আছে, তা প্রমাণ করেছে। গাছেদের রসসঞ্চালনক্রিয়া ঠিক প্রাণিদেহের রক্তসঞ্চালনক্রিয়ারই অনুরূপ। বৃক্ষরসের উর্ধ্বগতি কৈশিক আকর্ষণেরই মত সাধারণ কোন যান্ত্রিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্রেস্কোগ্রাফের দ্বারাই এর রহস্যের সমাধান হয়েছে। এটা সজীব কোষের ক্রিয়া বলে। গাছের তলা অবধি নামান একটা গোলাকৃতি নল থেকে সর্পিল গতিতে ঢেউগুলো বেরোয় আর এইটাই আসলে হৃৎপিণ্ডের কাজ করে। যতই আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি, ততই এ প্রমাণ অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয় যে, একটি ঐকাত্ম্য পরিকল্পনা প্রকৃতির নানা বিচিত্ররূপকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে।"

বসু মহাশয় নিজের তৈরী আর একটি যন্ত্র দেখিয়ে বললেন, "এবার আমি আপনাকে এক টুকরো টিনের ওপর কতকগুলো পরীক্ষা দেখাব। বাইরের উত্তেজনা প্রয়োগে ধাতুর ভিতরের প্রাণশক্তি অনুকূল অথবা প্রতিকূলভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করে; কালির দাগেই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফল দেখা যাবে।"

গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আমি অণুপরমাণুর গঠনগুলির তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের রেখাচিত্রগুলো দেখতে লাগলুম। টিনে যখন আচার্য মহাশয় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করলেন, স্পন্দনশীল লিখন তখনই থেমে গেল। ধীরে ধীরে ধাতুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে, আবার সেগুলি শুরু হল। বসু মহাশয় খানিকটা বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন। টিনের স্পন্দনশীল অংশের সঙ্গে সঙ্গে সূচীলেখনীও নাটকীয় ভাবে রেখাচিত্রের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা লিখে দিল।

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাঁচি বা যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত ইস্পাতও ক্লান্তির অধীন, আর তারা সাময়িক বিশ্রাম পেলে পুনরায় কর্মক্ষমতা লাভ করে। ধাতুর মধ্যে প্রাণস্পন্দন, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা প্রচণ্ড চাপপ্রয়োগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কি লোপ পর্যন্ত পায়।

অক্লান্ত কর্মকুশলতার মুখর নিদর্শনস্বরূপ গৃহ মধ্যস্থ সেই অগণিত আবিষ্কারের যন্ত্রগুলো আমি চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

বসু মহাশয়কে বললুম, "মশায়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আপনার অদ্ভুত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পূর্ণতর সুযোগ নিয়ে কৃষিকার্যে ব্যাপক উন্নতি আরও দ্রুত হয়ে উঠতে পারছে না। গাছের বৃদ্ধির ওপর নানারকম সারের প্রভাব দেখবার জন্যে, এদের মধ্যে কতকগুলোকে ল্যাবরেটরীতে চট্ করে পরীক্ষা করে দেখবার কাজে লাগান সহজে সম্ভব হবে নাকি?"

তিনি বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। ভবিষ্যতে বসু আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর ব্যবহারের অগণিত উপায় বেরিয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা কদাচিৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার পায়। সৃজন প্রচেষ্টার আনন্দই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।"

অক্লান্তকর্মী, নিরলস সেই ঋষিপ্রতিম বৈজ্ঞানিকের প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে আমি বিদায় নিলুম। ভাবলুম, "তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার উদ্ভাবনী শক্তি কখনও কি হ্রাস পেতে পারে?"

কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার কখনও হ্রাস ঘটেনি। 'রেজোনেণ্ট কার্ডিওগ্রাফ' নামে একটি জটিল যন্ত্র আবিষ্কার করে জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় নানাজাতীয় ভারতীয় বৃক্ষের বিস্তৃত গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রয়োজনীয় ঔষধের একটা বিরাট অনাবিষ্কৃত ভেষজতালিকা বেরিয়ে পড়ল। কার্ডিওগ্রাফ এমন নির্ভুল আর সঠিকভাবে তৈরী যে, তাতে সেকেণ্ডের শতাংশও রেখাচিত্রে অঙ্কিত হয়। বৃক্ষ, প্রাণী এবং মনুষ্যশরীরের গঠনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন সকল রেজোনেণ্টে পরিমাপ হয়। সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ বসু মহাশয়

ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত 'কার্ডিওগ্রাফ' ব্যবহারে প্রাণিগণের পরিবর্তে বৃক্ষেরও জীবচ্ছেদ পাওয়া যাবে।

তিনি বললেন, "একই সময়ে একটা বৃক্ষ বা একটি প্রাণীকে একটা ওষুধ দেওয়াতে, পাশাপাশি লেখা প্রতিলিপিতে তাদের ফলের এক আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, তার সব কিছুরই পূর্বাভাস গাছের ভিতরও আছে। উদ্ভিদ জ্ঞানের উপর পরীক্ষা, পশু ও মানবের অনেক দুঃখকষ্ট দূর করতে সাহায্য করবে।"

তার পর কয়েক বৎসর বাদে বসু মহাশয়ের বৃক্ষ সম্বন্ধীয় প্রাথমিক আবিষ্কার সকল অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাও সমর্থিত আর স্বীকৃত হয়। ১৯৩৮ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিবরণ 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়ঃ—

"গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এটা স্থির নির্ধারিত হইয়াছে যে, যখন তন্ত্রিকা সকল মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংবাদ বহন করে, তখন ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রবাহ সূক্ষ্ম গ্যালভানোমিটারে নিরূপিত হইয়াছে—এবং আধুনিক পরিবর্ধনকারী যন্ত্র সাহায্যে লক্ষ লক্ষ গুণ পরিবর্ধিতও হইয়াছে। জীবন্ত প্রাণী অথবা মানব দেহের তন্ত্রিকাতন্তুর মধ্য দিয়া শক্তিপ্রবাহ অনুসন্ধান করিবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, কারণ এই সকল শক্তিপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়।

"ডাক্তার কে, এস, কোল এবং ডাক্তার এইচ, জে, কার্টিস রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিঠাজলের ঝাঁঝি—যাহা সাধারণতঃ লাল মাছের কাঁচের পাত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের দীর্ঘ একটি মাত্র কোষ তন্ত্রিকাতন্তুর একটিমাত্র কোষের সহিত কার্যতঃ সমান। উপরন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন যে ঝাঁঝির তন্তুগুলি উত্তেজিত হইলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করে, যাহা একমাত্র গতি ভিন্ন, প্রাণী ও মানব তন্ত্রিকাতন্তুর সহিত সর্বতোভাবে সমান। গাছের তন্ত্রিকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রাণীদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্লথ। এই আবিষ্কার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ, তন্ত্রিকার বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধীরগতিচিত্র লইবার উপায় বলিয়া ধরিয়া লইলেন।"

"জড় ও মনোজগতের সীমারেখার সুরক্ষিত গুপ্তরহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনে এই ঝাঁঝিই হয়ত কালে পরশ পাথর হইয়া দাঁড়াইতে পারে।"

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের এই আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিকের

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কবি, নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন,—

হে তপস্বি ডাকো তুমি সামমন্ত্রে* জলদগর্জনে,
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাকো শাস্ত্র অভিমানীজনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে—

*রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উল্লিখিত "সামমন্ত্র" চতুর্বেদের মধ্যে একটি। অপর তিনটি হচ্ছে ঋক্, যজুঃ আর অথর্ব্ব। হিন্দুদের এই ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মের সগুণভাব—স্রষ্টারূপে ঈশ্বর, যিনি মানবদেহে জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, তাঁর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দ বৃহ্ ধাতু হতে উৎপন্ন, মানে বিস্তার করা; বৈদিক অর্থে এর মানে হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তির স্বতঃ-প্রসারণ অথবা সৃষ্টিক্রিয়াশীলতায় সম্প্রসারণ। ঊর্ণনাভের ঊর্ণার মত নিখিল বিশ্ব তাঁর সত্তার বিবর্তন। বেদের সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে পরব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সজ্ঞান মিলন।

বেদের সংক্ষিপ্তসার বেদান্ত বহু বড় বড় পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ফরাসী ঐতিহাসিক ভিক্তর কুজ্যাঁ বলেছেন, "যখন আমরা প্রাচ্যের—সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষের দার্শনিক গরিমার বিষয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে এমন সব গভীর সত্য আছে যে, যার পরিচয়ে আমরা প্রাচ্যদর্শনের সম্মুখে নতজানু হতে বাধ্য হই, আর দেখি যে মানবজাতির এই ধাত্রীগৃহেই সর্ব্বোচ্চ দর্শনের জন্মভূমি।" শ্লীগেল মন্তব্য করেছেন যে "এমন কি ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ দর্শন গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা প্রচারিত যুক্তির আদর্শবাদ, প্রাচ্যের আদর্শবাদের প্রাণপ্রাচুর্য্য আর শক্তির তুলনায় মনে হয়, যেন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডালোকের প্রবল বন্যাপ্রবাহের কাছে প্রমিথিয়ুস কর্তৃক আনীত অগ্নির একটি ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গমাত্র।" (গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত আছে যে প্রমিথিয়ুস, সূর্যের কাছ থেকে অগ্নিকে চুরি করে মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে মর্ত্যে আনয়ন করেন।)

ভারতবর্ষের বিরাট সাহিত্যে বেদসকল (বিদ্ ধাতু অর্থে জানা) হচ্ছে এমন সব মূল রচনা, যাতে কোন রচয়িতার নাম আরোপ করা যায় না। ঋগ্বেদে (১০,৯০,৯) মন্ত্রের উৎপত্তি অপৌরুষেয় বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদ বলে (৩,৩৯,২) যে তারা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসে নূতন ভাষার আচ্ছাদনে পুনরাচ্ছাদিত হয়েছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের নিকট যুগে যুগে ঐশীভাবে প্রকাশিত বেদসকল "নিত্যত্ব" অর্জ্জন করেছে।

বেদ সকল শ্রুতি ব'লে পরিচিত—ঋষিরা যা শুনে শুনে মনে রাখতেন। মূলতঃ এ স্তব ও আবৃত্তির সাহিত্য। অতএব যুগযুগান্ত ধরে বেদের এক লক্ষ শ্লোক লিখিত হয়ে রক্ষিত হয় নি, ব্রাহ্মণ আচার্যদের দ্বারা মুখে মুখেই চলে এসেছে। প্রস্তর কিম্বা কাগজ উভয়েই কালের বিলোপকারী প্রভাবের অধীন। বেদ যে লোপ না পেয়ে যুগে যুগে রক্ষিত

একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক সে অপ্রমত্তচিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

হয়ে এসেছে, তার কারণ ঋষিরা বুঝেছিলেন যে এর উপযুক্ত প্রচলনের পক্ষে জড়পদার্থের চেয়ে মনই শ্রেষ্ঠ। "মানসপটে" যা লিখিত থাকে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদান আর কি হ'তে পারে?

"আনুপূর্ব্বী", অর্থাৎ ক্রমবিশেষ যাতে বৈদিক শব্দসকল পাওয়া যায়, তা সংরক্ষণ করে, সন্ধিপ্রকরণাদি ও অক্ষর সংযোজন প্রভৃতি ধ্বনিবিদ্যার কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে আর স্মৃতিগ্রন্থ মূল পাঠের নির্ভুলতা কতকগুলি গাণিতিক উপায়ে প্রমাণিত করে, ব্রাহ্মণরা কোন সুদূর অতীত হতে বেদের আদিম বিশুদ্ধি অতি অপূর্ব উপায়ে সংরক্ষণ করে এসেছেন। বেদের প্রত্যেকটি অক্ষর গূঢ়ার্থ প্রকাশক আর ফলপ্রসূ।

৯ম পরিচ্ছেদ

মাষ্টার মহাশয়

মাষ্টার মহাশয় বল্লেন, "ছোটো মহাশয়, বোসো, আমি জগজ্জননীর সঙ্গে এখন কথা বল্‌ছি।"

বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি নীরবে ঘরে প্রবেশ করলুম। মাষ্টার মহাশয়ের দিব্য আকৃতি আমার চোখকে যেন রীতিমত ঝল্‌সে দিল। রেশমের মত শ্বেত শ্মশ্রু আর উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু দুটিতে মূর্তিমতী পবিত্রতা যেন আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর উর্ধোত্তলিত আনন আর যুক্তকর দেখেই মনে হ'ল যে, প্রথম সন্দর্শনের জন্যে তাঁর গৃহমধ্যে আমার প্রবেশ যেন তাঁর ধ্যানে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

তাঁর সরল আন্তরিক আহ্বান আমার মনের উপর অননুভূতপূর্ব একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করল। মায়ের মৃত্যুর করুণ বিচ্ছেদে মনে করেছিলুম যে, আমার সকল দুঃখের সেটাই চরম পরিণতি। এখন কিন্তু জগন্মাতার অদর্শনে আমার মনের মধ্যে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা বোধ হ'ল। খিন্ন হৃদয়ে মেঝের উপর বসে পড়লুম।

"ছোটো মহাশয় শান্ত হও।" বলে সাধু মহাশয় সহানুভূতিসূচক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হয়ে তাঁর চরণ দুটিই আমার উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভেবে আঁকড়ে ধরে বললুম,—"মহাত্মন্, আপনার সাহায্য বিনা আমার আর গতি নাই। মাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তাঁর করুণা পাব কি না!"

সহজে এ আশ্বাস পাওয়া যায় না। মাষ্টার মহাশয় চুপ করে বসেই রইলেন।

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলুম যে মাষ্টারমশায় মায়ের সঙ্গে একান্তে কথা কইছেন। ভাবতেও মনে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলেই বোধ হল যে আমার দৃষ্টি তাঁর প্রতি অন্ধ, যিনি এই ক্ষণেতেই সাধুটির অমল দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত। লজ্জা ত্যাগ করে, তাঁর পা দুটি ধরে, তাঁর মৃদু ভর্ৎসনায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করে, বার বার তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে লাগলুম।

মাষ্টার মহাশয় মৃদু স্নিগ্ধহাসি হেসে বললেন, "আচ্ছা গো, মায়ের কাছে

তোমার কথা জানাবো।" তাঁর প্রসন্ন অঙ্গীকার সহানুভূতির ধীর শান্ত হাসিতে উজ্জ্বল।

বললুম, "মশায়, আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ থাকে যেন; মায়ের উত্তর পাবার জন্যে শীগগিরই আমি আবার ফিরে আসছি।" মুহূর্তেক পূর্বের দুঃখের উচ্ছ্বাসে অবরুদ্ধ আমার কণ্ঠস্বর আবার আশার আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসবার সময় অনেক কথাই মনে পড়ল। ৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের এই বাড়ী, যাতে এখন মাষ্টার মহাশয় থাকেন, এককালে সেটা আমাদেরই বসত বাড়ী ছিল। এই বাড়ী মায়ের মৃত্যুর করুণ স্মৃতি-বিজড়িত। এইখানে আমার মানবহৃদয় লোকান্তরিতা মাতার জন্যই ভগ্ন হয়েছিল, আর এইস্থানেই আবার জগন্মাতার বিরহে আমার আত্মা যেন ক্রুশ-বিদ্ধ! পুণ্য-স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ীটি আমার শোকের নিদারুণ বেদনা ও তার চরম নিরাময়ের নীরব সাক্ষী।

তাড়াতাড়ি গড়পার রোডের বাড়ীতে ফিরলুম। সেদিন রাত দশটা অবধি আমার সেই নির্জন ছোট্ট চিলেকোঠায় আমি ধ্যানে ডুবে বসে আছি। নিদাঘ নিশীথের অন্ধকার সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

দিব্যজ্যোতিঃর ছটাবিভূষিতা জগজ্জননী মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে! মধুর হাসিতে ভরা তাঁর মুখখানি স্বর্গীয় সুষমায় মাখা। স্পষ্ট তাঁর বাণী কানে এসে প্রবেশ করল, বললেন—'তোমায় 'ত আমি চিরকালই স্নেহ করি আর সর্বদাই করব!'

স্বর্গীয় সুর তখনও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল,—মা অন্তর্হিতা হলেন। তার পরদিন সূর্য্য তখন সবেমাত্র উঁকি দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আমি মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে আবার হাজির হলুম। বহু দুঃখের নানা স্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে আমি পাঁচতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার হাতলে একটুক্‌রা ন্যাকড়া জড়ান। বুঝলুম মাষ্টার মহাশয় এখন কারুর ভিতরে আসা পছন্দ করেন না। কি করব ভেবে না পেয়ে অনিশ্চিতভাবে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াতেই, মাষ্টার মহাশয় সাদরে দুয়ার খুলে দিলেন। আমি তাঁর পুণ্যপদতলে নতজানু হয়ে বস্‌লুম। দিব্য আনন্দের ভাব চেপে রেখে মুখের উপর একটা ছদ্মগাম্ভীর্যের আবরণ টেনে দিয়ে নিরীহ ভাবে বল্‌লুম,—"মাষ্টার মহাশয়,—খবরটা জানবার জন্যে খুব সকাল সকালই এসে পড়লুম। যাহোক, মা কি আমার জন্যে আপনাকে কিছু বল্‌লেন নাকি?"

"তুমি ভারী দুষ্টু ছোটো মহাশয় !" শুধু এইটুকুমাত্র বলে আর কিছুই তিনি বললেন না।

বাহ্যতঃ আমার কৃত্রিম গাম্ভীর্যে তাঁর মনে কোনই রেখাপাত হল না।

মহা মুশ্‌কিলে পড়লুম; ফের জিজ্ঞাসা করলুম,—"আপনার এত হেঁয়ালিই বা কিসের, আর আমাকে এত এড়াতেই বা চাচ্ছেন কেন? সাধু-সন্ন্যাসীরা কি সোজাসুজি কোন কিছু বলেন না নাকি?" বোধ হয় একটু অধৈর্যও হয়ে পড়েছিলুম।

"তুমি কি আমায় পরীক্ষা করতে চাও নাকি, বল?" তাঁর শান্ত নয়নের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। "সেই করুণাময়ী জগজ্জননীর কাছ থেকে কাল রাত দশটার সময় যে আশ্বাস তুমি স্বয়ং পেয়েছ, তার উপর কি আজ এই সকালে আমার আর একটাও কথা বলা চলে, বল?"

পুনরায় তাঁর চরণে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। এবার আমার চোখ আর দুঃখে নয়, যেন অসহ্য সুখেই অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

"তুমি কি মনে কর, তোমার ভক্তি মায়ের অসীম করুণাকে স্পর্শ করতে পারে নি? ঈশ্বরের মাতৃভাব,—যা' তুমি মানবী আর দেবীর আকারে পুজো করে এসেছ, তা তোমার আকুল ক্রন্দনে সাড়া না দিয়েই পারে না।"

কে এই সরল সাধু, যাঁর সামান্য অনুরোধটুকুও পরমাত্মার কাছে মধুর স্বীকৃতি লাভ করেছে? পৃথিবীতে তাঁর কর্মজীবন অতি সামান্যই—আমার জানা অতি দীনতম ব্যক্তিরই মত। এই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে মাষ্টার মহাশয়* ছোট্ট একটি উচ্চ বিদ্যালয় চালান। ছেলেদের শাসনের জন্যে কোন রকম বকুনিই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না। কড়া শাসনের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম-কানুন বা বেতের শাসন তাঁর কাছে ছিল না। এই সব অত্যন্ত সাধারণ ক্লাস ঘরে, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত—আর শিক্ষা দেওয়া হত প্রেমের রসায়ন শাস্ত্র, যা কোন ইস্কুলের পাঠ্য বইয়েই নেই। তিনি দুর্বোধ্য নীতি-শিক্ষার বদলে ধর্মভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান দান করতেন। মা ভগবতীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির আগুনে পুড়ে তিনি এমন হয়েছিলেন যে, ছোট শিশুর মতই কোন বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনের লৌকিকতা প্রত্যাশা করতেন না।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি তোমার গুরু নই; তিনি কিছুকাল পরেই আস্‌বেন। তাঁরই পথ প্রদর্শনে আর তোমার প্রেম ও ভক্তির জোরে

---

*এইরূপ সম্মানসূচক উপাধিতেই তিনি সাধারণতঃ অভিহিত হতেন। তাঁর আসল নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর রচনাবলীতে তিনি "শ্রীম" এই সংক্ষিপ্ত নামেই স্বাক্ষর দিতেন।

তোমার যে সব দিব্যানুভূতি আসবে, তাতেই তাঁর গভীর জ্ঞান তোমার লাভ হবে।"

রোজই বিকালের দিকে একবার করে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যেতুম। মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ আমি প্রত্যহই কামনা করতুম। তাঁর পবিত্র সহচর্য্যের আনন্দ আমার সকল সত্তাকে পরিপ্লাবিত করে যেন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। এত প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে আমি কখনও প্রণাম করি নি। মাষ্টার মহাশয়ের পদচিহ্ন যে ভূমি পবিত্র করেছে, সেখানে দাঁড়াতে পাওয়াটা একটা পরম সৌভাগ্য বলেই মনে করি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা একছড়া চাঁপাফুলের মালা হাতে করে এনে বললুম, "মাষ্টার মশাই, আজ এই মালাটি পরুন, আপনার জন্যই এটি আমি তৈরী করে এনেছি।" কিন্তু তিনি এই সম্মান গ্রহণ করতে বারম্বার অস্বীকার করে সসঙ্কোচে সরে গেলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মনে আঘাত পেলুম ভেবে অবশেষে রাজী হলেন। বললেন, "আচ্ছা বেশ, আমরা দুজনেই যখন মায়ের ভক্ত সন্তান, তখন মায়ের আবাস এই দেহমন্দিরে তুমি তাঁকেই অর্ঘ্য দিতে পার, আমাকে কিন্তু নয়।" তাঁর নিরহংকার ও উদার প্রকৃতিতে আত্ম-শ্লাঘার কোন স্থান ছিল না। তারপর বললেন, "চল, কাল আমরা আমার গুরুস্থান পুণ্যতীর্থ—দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দেখে আসি।" মাষ্টার মহাশয় ঈশ্বরকোটিক জগদ্‌গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন।

তার পরদিন সকালে নৌকা করে গঙ্গায় আমাদের চারমাইল ভ্রমণ শুরু হল। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছে চাঁদনীর ভিতর দিয়ে আমরা নবচূড়শোভিত কালীমন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলুম। মন্দিরের ভিতর জগজ্জননী ভবতারিণী দেবী ও শিব, উজ্জ্বল ও সুনিপুণ কারুকার্যশোভিত রৌপ্য নির্মিত সহস্রদল কমলের উপর বিরাজ করছেন দেখলুম। মাষ্টার মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি সেখানে বসে মায়ের ধ্যানে ডুবে গেলেন। ধ্যানের পর মায়ের নামগান যখন শুরু করলেন, আমার আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয় তখন যেন সহস্র ধারায় বিগলিত হতে লাগল।

তারপর আমরা সেই পুণ্যভূমি মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে একটা ঝাউগাছের ঝোপের ধারে এসে দাঁড়ালুম। এই বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য যে রসনিঃসরণ, তা যেন মাষ্টার মহাশয়ের পরিবেষ্টিত আধ্যাত্মিক অমৃত ধারারই প্রতীক। তাঁর সেই প্রাণগলান মধুমাখা নাম গান সমান ভাবেই চলতে লাগল। আমি সেই ঝোপের পাশে গোলাপী রঙের চামরের মত একটা গাছের পাশে ঘাসের ওপর স্থির হয়ে সোজা বসে রইলুম। তখন মনে

হল, যেন সাময়িকভাবে দেহ থেকে বিযুক্ত হ'য়ে কোন স্বর্গীয় ভাবরাজ্যে গিয়ে পড়েছি।

এরপর সেই পুণ্যাত্মা সাধু মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আরো বহুবার দক্ষিণেশ্বর বেড়িয়ে এসেছি। তাঁর কাছ থেকেই ঈশ্বরের মাতৃভাবে আরাধনার মাধুর্য উপলব্ধি করি। পিতৃভাবে ভজনা করার মধ্যে তিনি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করতেন না। কঠোর আর খুব খুঁটিনাটিভাবে নিখুঁত হিসাব করে চলা তাঁর শান্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল।

একদিন তিনি উপাসনায় বসেছেন, দেখে মনে হল যেন ইনি স্বর্গের দেবদূতদের মর্ত্যের প্রতিচ্ছবি। কোন বিচার-বিতর্ক বা অভিযোগ-অনুযোগ মনে বহন না করে, তিনি এ জগৎকে তাঁর চিরদিনের ক্ষমাসুন্দর চক্ষেই দেখতেন। তাঁর দেহ, মন, কথা, কাজ—সবই ছিল তাঁর অন্তরের সরলতার সঙ্গে একান্ত সহজ ভাবে সুন্দর আর সুসমঞ্জস। কোন জ্ঞানোপদেশ বিতরণের সময় আত্মগরিমাকে দূরে রেখে তিনি প্রায়ই এই কথা বলে শেষ করতেন, "আমার গুরুদেব এই কথা বলেছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এতদূর প্রবল ছিল যে, মাষ্টার মহাশয় কোন চিন্তা তাঁর নিজের বলে ভাবতেই পারতেন না।

তাঁর স্কুলবাড়ীর একটা অংশে একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছি। একটি পরিচিত লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। লোকটি অত্যন্ত আত্মম্ভরী। তাঁর আবির্ভাবে আমাদের আনন্দটুকু সব উবে যাবার জোগাড় হল। ভদ্রলোকটি একবার তর্ক শুরু করলে সহজে আর থামতে চাইতেন না।

নিজের বক্তৃতায় নিজেই বিভোর—সেই মহাপ্রভুটির কর্ণগোচর যাতে না হয়, এমনভাবে মাষ্টার মহাশয় চুপি চুপি আমায় বললেন, "দেখছি যে এই লোকটিকে দেখে তুমি খুসী নও। যাই হোক মায়ের কাছে সব জানিয়েছি। তিনি আমাদের ফ্যাসাদ বুঝতে পেরেছেন। মা বললেন, যেই আমরা ওধারের ঐ লালবাড়ীটার কাছে পৌঁছাব, অমনি ওর একটা ভয়ানক জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাবে।"

আমার চোখ দুটি সেই মুক্তিতীর্থে আবদ্ধ হয়ে রইল। লালবাড়ীটার দরজার কাছে পৌঁছতেই লোকটি অকারণেই ফিরে একেবারে প্রস্থান করলে; না শেষ করলে তার কথা, না নিলে বিদায়। ক্ষুব্ধ ও রুদ্ধ বায়ু যেন শান্তির আশ্বাসে ভরে উঠল।

আর একদিন হাওড়া ষ্টেশনের কাছ দিয়ে একলাই চলেছি। ক্ষণেকের জন্যে সেখানকার একটা মন্দিরের কাছে একটু দাঁড়িয়ে পড়লুম। চুপচাপ

দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি, একটা ছোট্ট দল, ঢোলক আর করতালের সঙ্গে প্রচণ্ড সুরে একটা গান শুরু করে দিয়েছে। ভাবলুম, "হায় রে, কি রকম কলের মত এরা ভগবানের নাম আউড়ে চলেছে! ভক্তির নাম গন্ধও নেই!" বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখলুম, মাষ্টার মহাশয় দ্রুতপদে এগিয়ে আস্‌ছেন। জিজ্ঞাসা করলুম,—"মাষ্টার মহাশয়, এখানে এলেন কি করে?"

মাষ্টার মহাশয় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আমার যেন চিন্তার প্রত্যুত্তরেই বল্‌লেন "ছোটো মহাশয়, ঠাকুরের নাম কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকলেরই মুখ থেকে কি শুন্‌তে মধুর লাগে না?" বলে সস্নেহে তিনি এক হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমার মুখে আর কথাটি ফুট্‌ল না—আমি যেন তাঁর স্পর্শে হাওয়ায় ভেসে তাঁর সঙ্গে মায়ের দরবারে গিয়ে হাজির হলুম।

একদিন বিকালে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "একটা বায়োস্কোপ দেখবে না কি?" প্রশ্নটা সংসার-বিরাগী মাষ্টার মহাশয়ের কাছ হতে বেরোতেই বেশ রহস্যময় বলেই বোধ হল। কথাটা তখন চলচ্চিত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হত। আমিও তখনি রাজী হয়ে গেলুম, যে কোন উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে থাকতে পাব বলে। যাই হোক দুজনে তো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গোলদীঘিতে এসে পৌঁছলুম। মাষ্টার মহাশয় সেখানে একটা বেঞ্চে বস্‌তে ইঙ্গিত করলেন।

মাষ্টার মহাশয় বল্‌লেন, "এস, মিনিট কতক এখানেই বসি। গুরুদেব সর্বদাই বলতেন—কোন জলাশয় দেখলেই তার পাশে বসে ধ্যান করবে। এর নিস্তরঙ্গ রূপ, ঈশ্বরের বিরাট শান্তির ভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। সব জিনিষই যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হতে পারে, তেমনি নিখিল বিশ্বজগৎও বিশ্বচৈতন্য সাগরে প্রতিফলিত হতে পারে। গুরুদেব প্রায়ই এই কথা বলতেন।"

অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে প্রবেশ করলুম। সেখানে তখন একটা বক্তৃতা চলছিল। সেটা নীরস আর অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই বোধ হল, যদিও একই রকমের একঘেয়ে ছবি দেখিয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতার ভিতর বৈচিত্র্য আন্‌বার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

ভাবলুম "তা হলে মাষ্টার মহাশয় কি আমায় এই ধরণের বায়স্কোপ দেখাতে চেয়েছিলেন না কি?" যদিও আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু মুখে সে রকম ভাব প্রকাশ করে মাষ্টার মহাশয়ের সরল মনে কোন আঘাত দিতে আর আমার মন সরল না। কিন্তু তিনি সাগ্রহে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তবে ত' দেখছি, তোমার এই ধরণের বায়োস্কোপ আর

মনে ধরছে না। মাকে জানালুম, বুঝলে, তিনিও আমাদের দুজনের জন্যে দুঃখিত। যাই হোক, তিনি আমায় জানিয়ে দিলেন যে, এই হলের ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলো এক্ষণি নিভে যাবে আর আমাদের এ হল থেকে বেরিয়ে পড়বার সুযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত তা নিভেই থাকবে, আর জ্বলবে না।"

আশ্চর্য। যেই মাত্র তাঁর কথা শেষ হল, অমনি হলটি একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। অধ্যাপক মহাশয়ের সুউচ্চ কণ্ঠ বিস্ময়ে হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। তারপর তিনি ব'লে উঠলেন, "হলের ইলেকট্রিক্ লাইনগুলো সব একদম খারাপ।" এর মধ্যেই মাষ্টার মহাশয় আর আমি নিরাপদে চৌকাঠ পেরিয়েছি। দালান থেকে পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে, হলঘরটি আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে।

"ছোটোমহাশয়, তুমি ঐ রকমের বায়স্কোপ দেখে খুশী হও নি দেখ্‌ছি। যাক, তুমি এবার আর এক ধরণের বায়স্কোপ দেখে নিশ্চয় খুশী হবে বলে মনে হয়।"

ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং-এর ফুটপাথের সামনে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। তিনি আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে মৃদুভাবে আঘাত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নীরব আর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। শব্দমুখর সজীব চলন্ত দৃশ্যপট যেন এক মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল। শব্দযন্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে আধুনিক "টকি"র কথাবলা ছবিগুলো যেমন এক মুহূর্তে শব্দহীন হয়ে যায়, তাদের হাত পা মুখ ঠোঁট নাড়াই শুধু কেবল ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না, তেমনি ঈশ্বরের হাতে এক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়ে জগতের সব শব্দ যেন একেবারে থেমে গেল। পথচারীর দল, চলন্ত ট্রামগাড়ী, মোটর, গরুরগাড়ী, লোহার চাকাওয়ালা "ছ্যাকড়াগাড়ী"—সবই যেন নিঃশব্দ গতিতে রাস্তা দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লে। যেন একটি সর্বদর্শী চক্ষু পেয়ে সামনে যেমনি—দুধারে আর পাশেও তেমনি অত্যন্ত সহজ ভাবে সকল দৃশ্যই বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখতে লাগ্‌লুম। কলকাতার সেই ক্ষুদ্র অংশে কর্মচাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে পরিপূর্ণ নিঃশব্দতার মধ্যে ঘটে যেতে লাগ্‌লে। মিহি ছাইয়ের তলায় ঢাকা আগুনের মৃদু আলোকছটার মত একটা স্নিগ্ধ আলোর উজ্জ্বলতা সেই সব পরিদৃশ্যের উপর যেন ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার নিজের শরীরও সেই সব ছায়ামূর্তিদের একটির চেয়ে আর বেশী কিছু বোধ হচ্ছিল না—যদিও সেটা একেবারে নিশ্চল আর গতিহীন, আর বাকীগুলো সব ইতস্ততঃ নিঃশব্দ গতিতে চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছে। কতক-

গুলো ছেলে,—আমারই সব বন্ধুর দল, কাছে এল আর চলে গেল। আমার উপর যদিও তাদের নজর পড়ল, কিন্তু তবু তারা মোটেই আমায় চিনতে পারল না।

এই অপূর্ব্ব মূক দৃশ্য মনের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় হর্ষোচ্ছ্বাস এনে দিল। যেন কোন অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের ধারা গভীরভাবে পান করেছি। হঠাৎ মাষ্টার মহাশয় আমার বুকে আবার সেই রকম মৃদুভাবে আঘাত করলেন। আবার আমার অনিচ্ছুক কর্ণদ্বয়ের মধ্যে রাজ্যের যত সব হট্টগোল হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার মধুর আর সূক্ষ্ম স্বপ্নজাল একটা রূঢ় আঘাতে ছিঁড়ে যেতে, জেগে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সেই অতীন্দ্রিয় ভাব মদিরার মোহঘোর কেটে গিয়ে একেবারে পরিষ্কার সাফ হয়ে গেল।

"এবার দেখ্‌ছি যে, দ্বিতীয় বায়স্কোপটি* তোমার বেশ ভাল লেগেছে, না?" মাষ্টার মহাশয় হাস্‌ছিলেন। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে নতজানু হয়ে পায়ের উপর পড়তে যাচ্ছি দেখে, তাড়াতাড়ি আমায় ধরে ফেলে বল্‌লেন, "আরে, আরে কর কি, কর কি—এখন আর তুমি আমায় ওটি করতে পারবে না। তুমি ত' জান যে, ভগবান তোমার মন্দিরেও আছেন। আমি জগজ্জননীকে তোমার হাত দিয়ে ত আমার পা ছুঁতে দিতে পারিনে।"

সেই জনতাবহুল ফুটপাথ হতে বিনয়নম্র সরল মাষ্টার মহাশয় আর আমি ধীরে ধীরে চলে আসবার সময় কেউ যদি লক্ষ্য করত, তা হলে নিশ্চয়ই তার সন্দেহ হত যে আমরা নেশা করে চলেছি। মনে হল, তখন আকাশে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ঘন ছায়া যা নেমে আস্‌ছিল, তাও যেন আমাদেরই মত ভগবৎ-প্রেমমদিরা পানে বিহ্বল!

তাঁর এই প্রসন্ন মধুর উদারতার প্রতি ক্ষীণ ভাষায় সুবিচারের চেষ্টা করতে গিয়ে আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, মাষ্টার মহাশয় আর অন্যান্য যে সব গভীর তত্ত্বদর্শী সাধুগণের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, তাঁরা কি জানতে পেরেছিলেন যে, বহু বৎসর পরে পশ্চিম প্রান্তে বসে আমি তাঁদের দিব্য ভক্তজীবনের কাহিনী লিখ্‌ব। তাঁদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির ক্ষমতা ভেবে আজ আর আমি আশ্চর্য্য হই না, আর আশা করি আমার পাঠকবর্গও হবেন না, যাঁরা আমার এ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসে পড়েছেন।

সকল ধর্মেরই সাধুসন্তদিগের ঈশ্বরের ধারণা হয়েছে সরল প্রেমভাব থেকে।

---

*ওয়েবষ্টার নিউ ইনটারন্যাশনাল ডিক্সনারিতে (১৯৩৪) বায়স্কোপের এই অর্থ—অসাধারণ হলেও—দেওয়া আছে, "জীবনের দৃশ্য, যা এরূপ দেখায়"। অতএব মাষ্টার মহাশয়ের নির্বাচিত কথাটি সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত।

যেহেতু পরম সত্তা বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে "নির্গুণ" এবং "অচিন্ত্য", তাই মানবচিন্তা আর আকাঙ্ক্ষা এই সত্তাকে জগজ্জননীরূপে কল্পনা করে ইষ্টদেবতা-রূপে ব্যক্ত করেছে। ইষ্টদেবতাতে মূর্ত আস্তিক্যবাদ আর অদ্বৈতবাদের সংযোগ, হিন্দুর ভগবচ্চিন্তার একটা প্রাচীন বৈশিষ্ট্য—বেদ ও ভগবদ্গীতায় তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই দুই "বিপরীতের সমন্বয়" যুক্তি ও ভাবের সামঞ্জস্য আনে। ভক্তি ও জ্ঞান মূলতঃ এক। "প্রপত্তি"—ঈশ্বরে আশ্রয় গ্রহণ আর "শরণাগতি"—ঈশ্বরানুকম্পায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ বস্তুতঃ সর্বোচ্চ জ্ঞানেরই পথ।

ঈশ্বরই যে একমাত্র প্রাণ আর তিনিই যে একমাত্র বিচারক এই ভাবের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা (শেষত্ব) হতেই মাষ্টার মহাশয় আর অন্যান্য সাধুসন্তদের বিনয় আর নম্রতার উদ্ভব। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপই হচ্ছে আনন্দময়, আর মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধে একটা সহজাত অসীম আনন্দলাভ হয়। "আত্মা ও সংকল্পের প্রথম ভাবাবেশ হচ্ছে আনন্দ।"*

সকল যুগের ভক্তরাই জগন্মাতার কাছে শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেছেন যে তাঁদের মধ্যে সর্বদাই তাঁর লীলার প্রকাশ। মাষ্টার মহাশয়ের জীবনেও এই দৈবলীলার প্রকাশ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা সময়েই ঘটত। ঈশ্বরের চক্ষুতে তো ক্ষুদ্রবৃহৎ কিছুই নাই। অণুপরমাণুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গঠননৈপুণ্য তাঁর না থাকলে কি আর আজ আকাশ অভিজিৎ ও স্বাতীনক্ষত্রের মত বিরাট দেহ বুকে ধারণ করে থাকতে পারত? সৃষ্টিকর্তার কাছে "প্রয়োজন" "অপ্রয়োজনের" বিভেদ নিশ্চয়ই অজ্ঞাত পাছে একটা আলপিনের অভাবে সারা বিশ্বসৃষ্টিটাই লোপ পেয়ে না যায়!

---

*সেন্ট জন অফ্ দি ক্রস্—বিনয়নত কমনীয় এই খৃীষ্টিয় সাধুটির মৃত্যু ঘটেছিল ১৫৯১ খৃীষ্টাব্দে। ১৮৫৯ খৃীষ্টাব্দে সমাধি হতে শবোত্তোলন করে দেখা যায় যে তা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্ব্যাণ্ড (এ্যাটলান্টিক মন্থলি, ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৩৬) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "উল্লাস বা প্রাণচঞ্চল আনন্দোচ্ছ্বাস হতে ঢের ঢের বেশী একটা ভাব আমায় অভিভূত করে ফেল্লে। আনন্দের গভীরতায় আমি একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলুম। আর ঐ অবর্ণনীয় আর প্রায় অসহ্য আনন্দের মধ্যে প্রকাশিত হল জগতের মঙ্গল সত্তা। সকল যুক্তিতর্কের অতীত আমার এই বিশ্বাস দাঁড়াল যে, মানুষ অন্তরে সৎ, তাদের মধ্যে অসৎ বৃত্তিটা একটা বাহ্যবস্তু"।

১০ম পরিচ্ছেদ

আমার গুরুর সাক্ষাৎলাভ

(শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজ)

"ঈশ্বরে বিশ্বাস যে কোন রকম অসাধ্য সাধন ঘটাতে পারে বটে কিন্তু একটি মাত্র বিষয় ছাড়া—তা হচ্ছে, না পড়ে পরীক্ষায় পাশ করা।" কথাগুলো পড়ে নিতান্ত বিরক্ত হয়েই অলস মুহূর্তে হাতে নেওয়া সেই "ভাবোদ্দীপক" পুস্তকখানি বন্ধ করলুম।

ভাবলুম, "এই লিখিয়ের বিপরীত উক্তিতে তাঁর বিশ্বাসের একান্ত অভাবই দেখা যায়। বেচারার রাত জেগে পড়া তৈরীর উপরই ভরসা আছে দেখছি।"

পিতার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলুম যে আমি ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ করব। পরিশ্রমী ছিলুম যে তা বলতে পারিনে। মাসের পর মাস ক্লাস ঘরের চেয়ে কলকাতার স্নানের ঘাটে কোন নির্জ্জন স্থানেই আমার বেশী দেখা পাওয়া যেত। নিকটস্থ শ্মশানভূমি, বিশেষতঃ রাত্রিকালে যা বিভীষিকা উৎপাদন করে, যোগীদের কাছে তাই-ই পরম আকর্ষণীয়। মৃত্যুহীন সত্তার খোঁজে যারা ফেরে, গোটাকতক মড়ার খুলি বা নরকঙ্কাল দেখে নিশ্চয়ই তারা ভীত হয় না। মানুষের অসম্পূর্ণতা নানা অস্থি কঙ্কালের অন্ধকার আবাসেই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই পড়ুয়াদের রাতজাগা থেকে আমার রাতজাগা একটু ভিন্ন রকমের ছিল।

হিন্দু হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিল। পরীক্ষার এই সময়টা শ্মশানভূমির ভয়ের মত একটা বহুপরিচিত ভয়ের সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও আমার মনে একটা শান্তি ছিল। সাহস নিয়ে এই সব ভূত প্রেতের রাজ্যে বিচরণ করে আমি এমন সব জ্ঞান আহরণে রত ছিলুম যা লেকচার হলে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দের মত ক্ষমতা আমার ছিল না, যাতে দু' জায়গায় একই সময় আবির্ভূত হতে পারা যায়। আমার যুক্তি (হায়! হয়ত অনেকেরই কাছে এটা অযৌক্তিক বলে মনে হবে) ছিল যে ভগবানই আমার সমস্যা দেখে আমায় তার হাত থেকে উদ্ধার করবেন। বিপদ হতে উদ্ধার করবার হাজারো রকমের উদাহরণের অবোধ্য কারণ হতেই ভক্তের এইরকম যুক্তিহীনতা এসে পড়ে।

একদিন বিকালে গড়পার রোডে একটি সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।

বন্ধুটি বললে, "কিহে মুকুন্দ, আজকাল যে তোমার দেখা পাওয়াই ভার।"

তার প্রীতিকোমল দৃষ্টির সম্মুখে আমার হৃদয়ভার উন্মুক্ত করে বললুম, "হ্যাঁ রে নন্টু, স্কুলে না গিয়ে আমায় বড্ডই মুশকিলে পড়তে হয়েছে।"

নন্টু ছিল খুব ভাল ছেলে, শুনে প্রাণ খুলে হাসল। অবশ্য আমার বিপদেও হাসির খোরাক ছিল না যে তা নয়! বলল, "তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য তো কিছুমাত্র তৈরী হও নি। তা হলে তোমায় কিছু সাহায্য করা দরকার তো দেখছি!"

এই অত্যন্ত সহজ কথাগুলো কিন্তু আমার কানে দৈব আশ্বাসবাণীর মতই এসে প্রবেশ করল। কাল বিলম্ব না করে বন্ধুটির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। মাস্টার মশায়দের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন আসতে পারে, তার উত্তরগুলো সব মোটামুটি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বললে,—"এই প্রশ্নগুলোই হচ্ছে সব টোপ—যাতে করে সরল বিশ্বাসী ছেলেগুলো পরীক্ষার ফাঁদে ধরা পড়তে পারে। আমার বাতলানো উত্তরগুলো সব মনে রেখো বুঝলে, তা হলে বিনা হাঙ্গামায় এ ফ্যাসাদ এড়িয়ে যেতে পারবে।"

বাড়ী ফিরলুম যখন, রাত তখন অনেক। অসময়ে পড়া তৈরী করে অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যাতে করে সেই সাংঘাতিক দিনগুলো পর্য্যন্ত পড়াগুলো মনে থাকে। নন্টু আমায় অনেক পাঠ্যবিষয়েই সাহায্য করেছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সংস্কৃতের বিষয়টা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কি করি আর উপায় নেই, কাতর প্রাণে আমি ভগবানের কাছে এই মারাত্মক ভুলের কথাটা নিবেদন করে রাখলুম।

যাক্, তার পরদিন 'ত সকাল বেলায় রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম—পায়চারি করতে করতে আমার নবলব্ধ বিদ্যা সব পরিপাক করবার জন্য। চলতে চলতে হঠাৎ নজর পড়ল, রাস্তার একটা কোণে কতকগুলো আগাছার ওপর খানকতক ছাপা কাগজ পড়ে রয়েছে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেগুলো তুলে নিতেই দেখা গেল, তাতে সব সংস্কৃত শ্লোক ছাপা রয়েছে। আমার কষ্টকল্পিত অর্থের সাহায্য নেবার জন্য, এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে হাজির হলুম। গম্ভীর উদাত্তস্বরে সেই প্রাচীন শ্লোকগুলির সুমধুর আবৃত্তি শেষ করবার পর তিনি সন্দিগ্ধস্বরে বললেন,—"কিন্তু এই অসাধারণ শ্লোকগুলি তো তোমার সংস্কৃত পরীক্ষায় কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।"*

---

* সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত বা সুসম্পূর্ণ। সংস্কৃত ভাষা সকল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনীস্বরূপা। ইহার ধ্বনিপ্রকাশক লিপির নাম—"দেবনাগরী" যাহার বাচ্যার্থ দিব্য

ঐ বিশেষ শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যা বেশ ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা থাকাতে, তার পরের দিনে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আমার খুবই সাহায্য হল। নন্টুর সাক্ষাৎ সাহায্যে অন্যান্য বিষয়েও আমি পাস মার্ক পেয়ে গেলুম।

ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ করে কথা রেখেছি দেখে বাবা অত্যন্ত খুশী হলেন। আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলুম, একমাত্র যাঁর কৃপাবলে আমি নন্টুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, আর জঞ্জালের উপর ছড়ান সেই সংস্কৃত শ্লোকছাপা কাগজের পাতাগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। লীলাচ্ছলে তিনি ঠিক সময়মত আমায় সাহায্য পাঠালেন, দু' দুবার বিপদ হতে উদ্ধার হবার জন্য!

আবার সেই পরিত্যক্ত বইটি খুলে দেখলুম, যাতে লেখক পরীক্ষার হলে ভগবৎশক্তির প্রাধান্য অস্বীকারই করে গেছেন। মনে মনে আমি হাসি সংবরণ করতে পারলুম না, এই ভেবে যে, যদি লেখক মহাপ্রভুকে বলি, শ্মশানে বসে ঈশ্বরের ধ্যানই হচ্ছে স্কুলের পরীক্ষায় পাস করবার সহজ পথ, তা শুনে 'ত বেচারার মাথা একেবারে বিগড়ে যাবে!

যাই হোক, এই "নূতন গৌরব" লাভের পর আমি প্রকাশ্যভাবেই বাড়ী ছেড়ে বেরোতে সঙ্কল্প করলুম। আমার একটি যুবক বন্ধু জিতেন্দ্র মজুমদারের* সঙ্গে কাশীধামের শ্রীভারত ধর্ম মহামন্ডলের আশ্রমে যোগদান করে সেখানকার আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ করতে মনস্থ করলুম।

একদিন সকালবেলায় বসে বসে ভাবছি। মনে আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছেদের ভাবনা এসে উপস্থিত হল। মায়ের মৃত্যুর পর আমার দুই ছোট ভাই সনন্দ আর বিষ্ণু এবং ছোট বোন থামুর উপর আমার স্নেহ আরও গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল। আমার বহু কঠিন সাধনার** স্থল সেই ছোট ঘরটিতে দ্রুত গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। প্রায় ঘণ্টা দুই অশ্রুবন্যায় প্লাবিত হবার পর আমার একটা অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হল, মনে হল যেন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়

নিবাস। সংস্কৃত ভাষার গাণিতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি প্রকারান্তরে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্ মহর্ষি পাণিনিকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে "যিনি আমার ব্যাকরণ জানেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ।" যিনি এই ভাষার মূলে গমন করিতে পারিবেন তিনি সত্যই সর্বজ্ঞতা লাভ করিবেন।

*ইনি যতীনদা (যতীন ঘোষ) নন, হিমালয়ে পলায়নের পথে যাঁর সময়োচিত ব্যাঘ্র-ভীতির কথা পাঠকের স্মরণে আছে।

**ঈশ্বরলাভের পথ বা প্রাথমিক উপায়।

আমার অন্তর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সব আকর্ষণ* দূরে চলে গিয়ে সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ বন্ধু একমাত্র ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করবার প্রবল প্রচেষ্টা আমার অন্তরে পাথরের মত দৃঢ় হয়ে চেপে বসল।

পিতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি বললেন—"আমার একটি শেষ কথা রেখো, মুকুন্দ! তুমি আমাকে আর তোমার দুঃখী ভাইবোনদের ত্যাগ করে যেয়ো না।"

বললুম, "বাবা, আপনার প্রতি আমার ভক্তির কথা আর আমি কি বলব! কিন্তু যিনি আপনার মত আদর্শ পিতা আমাকে দান করেছেন সেই পরম পিতার জন্য আমার ভক্তি যে তার চেয়েও বেশী। আমাকে যেতে দিন বাবা, যাতে করে একদিন আমি আরও পরিপূর্ণ শুদ্ধজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসতে পারি।"

পিতার অনিচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি সংগ্রহ করে আমি জিতেন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করতে বেরিয়ে পড়লুম। সে ইতিমধ্যেই কাশীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমি উপস্থিত হতে আশ্রমের তরুণ অধ্যক্ষ স্বামী দয়ানন্দ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। দীর্ঘকায়, কৃশ আকৃতি, চিন্তাশীল স্বামীজী মহারাজের প্রতি আমার মনে অনুকূল ধারণারই উদয় হল। তাঁর সুন্দর মুখের ওপর বুদ্ধদেবের ন্যায় একটা ধ্যানস্তিমিত গভীর প্রশান্তির ভাব।

আমার নতুন আবাসেও একটি ছোট ঘর ছিল দেখে ভারি খুশী হলুম। সেখানে আমি প্রত্যুষে এবং সকাল বেলায় নিরালায় কাটাবার সুযোগ পেলুম। আশ্রমবাসীরা ধ্যানধারণার বিষয় অল্পই জানত বলে ভাবল যে, আমি সংগঠন কাজেই আমার সময়টা সব ব্যয় করব। সেইজন্য তাদের অফিসের কাজেই আমার বৈকালিক সময়টা ব্যয় করবার জন্যে আমায় উৎসাহিত করল।

একদিন সকাল সকাল সেই ছোট্ট ঘরটির দিকে চলেছি, একটি সহআশ্রমবাসীর বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছল,—"ওহে, ভগবানকে এত জলদি পাকড়াতে চেষ্টা কোরো না।" স্বামী দয়ানন্দের কাছে গেলুম, দেখি যে তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর ছোট ঘরটিতে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত।

বললুম, "স্বামীজী, আমি এখানে যে কি কাজে লাগব, তা বুঝতে পারছি

---

*আকর্ষণ—হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয় পারিবারিক আসক্তি মোহজনক তা যদি সাধককে—তার জীবনের কথা ছেড়ে দিলেও তার স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনসমেত সর্বপ্রকার দানের দাতাকে সন্ধানের পথে বাধা উপস্থিত করে। যীশুখ্রীষ্ট অনুরূপভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, "যে আমার চেয়ে তার পিতা বা মাতাকে বেশী ভালবাসে, সে আমার উপযুক্ত নয়।" বাইবেল : ম্যাথিউ—১০:৩৭।

না। আমি চাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করতে। তাঁকে ছাড়া, কোন সঙ্গ, ধর্মমত বা সদাচরণ কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট নই !"

গেরুয়াবসন পরা সদানন্দ সেই সন্ন্যাসীটি সস্নেহে আমায় শুধু একটি মৃদু চপেটাঘাত করলেন। হাতের কাছে জনকতক শিষ্যকে পেয়ে তিনি কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "মুকুন্দকে তোমরা কেউ বিরক্ত কোরো না. ও আমাদের ধরণধারণ শীগগিরই শিখে নেবে।"

বিনয়ের আড়ালে আমি আমার সন্দেহ গোপন করলুম। শিষ্যেরা সব ঘর ছেড়ে চলে গেল, তিরস্কার লাভ করে বেশী কিছু অপ্রভিত না হয়ে। দয়ানন্দজীর আমাকে আরও কিছু বলবার বাকী ছিল।

বললেন, "মুকুন্দ! দেখছি তোমার বাবা তোমায় বেশ নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন। এ তাঁকে ফিরিয়ে দাও, এখানে তা তোমার কিছুমাত্র দরকার নেই। আর তোমার দ্বিতীয় সংযমবিধি হচ্ছে, আহার বিষয়ে। ক্ষিদে পেলেও তা তুমি বোলো না।"

চোখে আমার ক্ষিদের আগুন জ্বলছিল কি না বলতে পারি না, তবে আমার যে দস্তুর মতন ক্ষিদে পেয়েছিল তা তখন ভালরকমই টের পাচ্ছিলুম। বেলা বারটা নাগাদ আশ্রমে প্রথম আহার জুটত। নিজের বাড়ীতে কিন্তু বেলা নটার মধ্যেই বেশ বড় রকমের একটি প্রাতঃরাশ খাওয়াই আমার অভ্যাস ছিল।

এই তিন ঘণ্টার ফাঁক কিন্তু দিনের পর দিনই আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। হায়রে! কলকাতার সে সব দিন চলে গেছে,—যখন দশ মিনিট দেরী হয়ে গেলেই রাঁধুনী বামুনকে আমি বকেঝকে অনর্থ বাধিয়ে তুলতুম। এখন আর কি করি, উপায় নেই দেখে অগত্যা ক্ষিদে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। একদিন তো চব্বিশ ঘণ্টা উপোষ করেই পড়ে রইলুম। ফল এই হল যে, উদরের মধ্যে অগ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল আর আমি অধীর আগ্রহে তার পরদিন মধ্যাহ্নের প্রতীক্ষা করতে.লাগলুম।

ভগ্নদূত জিতেন্দ্র আমার ঘরে ঢুকে এই নিদারুণ সংবাদটি ঘোষণা করে গেল, "দয়ানন্দজীর ট্রেন আজ লেট্, তাঁর না পোঁছান পর্যন্ত আমরা আজ আর খেতে বসতে পাচ্ছি নে।" প্রায় দু' সপ্তাহ বাইরে থাকার পর দয়ানন্দজী আজ ফিরে আসছেন, কাজেই সেই উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী দিয়ে তাঁর পরিপাটিরূপে সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রবল ক্ষুধার উদ্রেককারী নানাবিধ সুখাদ্যের সৌরভে বাতাস পরিপূর্ণ। মনের তখনকার যা অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়! কিছুই এখন না মিললে, কালকের উপবাসের দম্ভ ছাড়া আর এখন কি-ই বা নীরবে পরিপাক করা যায়?

মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম, "তাড়াতাড়ি ট্রেনটি পৌঁছিয়ে দাও, ঠাকুর!" ভাবলুম, দয়ানন্দজী যে সব বিধিনিষেধ আমার উপর আরোপ করে আমায় চুপ করিয়ে রেখেছিলেন, তাতে তো ভগবানের কোন হাত ছিল না। তাঁর মন হয়ত সে সময় অন্য কোথাও ছিল! যাই হোক, ঘড়িতে অত্যন্ত মন্থর গতিতেই যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে লাগল। স্বামীজী যখন আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন, তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। অকৃত্রিম আনন্দেই তখন আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলুম।

জিতেন্দ্র একটা মূর্তিমান দুর্গ্রহের মতন উদয় হয়ে এসে বললে, "এখনও খাবার দেরি আছে হে! দয়ানন্দজী এখন স্নান করবেন, করে ধ্যানে বসবেন, তারপর ধ্যান থেকে তাঁর উঠবার পর আমরা সব খেতে বসতে পাব।" আমার ত' নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম! এ ধরণের ক্লেশে অনভ্যস্ত আমার তরুণ উদর ক্ষুধার দারুণ দংশন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে প্রবল আপত্তি জানাতে লাগল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকেদের কঙ্কালসার মূর্ত্তির ছবি আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন ছায়ামূর্তির মতন ভেসে যেতে লাগল।

ভাবলুম, "কাশীতে অনাহারে আর একটি মৃত্যু এই আশ্রমে এখনই ঘটল বলে।" যাক্, রাত ন'টা নাগাদ আসন্ন সে দণ্ড হতে অব্যাহতি পেলুম আহারের জন্য অমিয় মধুর আহ্বান বাণীতে। আহা! কি অমৃতবর্ষী সেই আহ্বান! স্মৃতিপটে সে রাত্রের ভোজটি জীবনের একটি পরিপূর্ণ মুহূর্তরূপে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

ভোজে গভীর মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও আমার পক্ষে লক্ষ্য করতে কোন বাধা হল না যে, দয়ানন্দজী অন্যমনস্কভাবে আহার করে চলেছেন। বেশ বোঝা গেল যে, তিনি আমার স্থূল ভোজনানন্দের ঊর্ধ্বে!

পরিপূর্ণ ভোজনসুখের পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের পড়বার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে তিনি একলাই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীজী, আপনার কি আজ ক্ষিধে ছিল না?"

বললেন "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ছিল বই কি। গত চার দিন 'ত আমার কোন রকম দানাপানি জোটে নি। তা ছাড়া তুমি ত জান, ট্রেনে আমি কখনও খাইনে। সেখানকার হাওয়া সংসারী লোকেদের নানা কামনাবাসনায় দূষিত। আমাদের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ সব আমি খাঁটিভাবেই মেনে চলি।

"আমাদের আশ্রমের সংগঠন কাজের কতকগুলো জটিল বিষয় মনের উপর চেপে বসে রয়েছে—তাই আজকের আশ্রমের ভোজে আর মন বসল না। আর

তাড়াতাড়িই বা কিসের হে ? কালকেই না হয় পারিপাটিরূপে ভোজনে মন দেওয়া যাবে, কি বল ?" বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন।

লজ্জায় শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হল। কিন্তু কালকের দিনের কষ্টের কথা 'ত আর ভোলবার নয়, তাই সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললুম, "স্বামীজী, আমি ত' ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। ধরুন, আপনার উপদেশ পালন করতে গিয়ে খাবার যদি নাই বা চাইলুম, আর কেউ যদি কিছু খেতেই না দেয়—তা হলে ত অনাহারে একেবারে মরেই যাব।"

"মর তাহলে।" এই নিদারুণ বাক্যে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে স্বামীজী বললেন, "মরতে যদি হয় তো মর মুকুন্দ! কখনও মনে ঠাঁই দিও না যেন, তুমি কেবল খাওয়ার জোরেই বেঁচে আছ,—ঈশ্বরের শক্তিতে নয়! যিনি সকল রকম পুষ্টির ব্যবস্থা করেছেন, যিনি ক্ষুধা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই দেখবেন, যাতে তাঁর ভক্তের প্রাণরক্ষা হয়। মনেও কোরো না যে, অন্নই তোমায় বাঁচিয়ে রাখে বা টাকাকড়ি অথবা লোকজনই তোমায় রক্ষা করে। ভগবান যদি তোমার প্রাণবায়ুটুকু টেনে নেন, তাহলে কি তারা আর তোমায় সাহায্য করতে পারবে ? তারা হচ্ছে তাঁর সাহায্য করবার যন্ত্র মাত্র। তোমার উদরে যে অন্ন পরিপাক হয়, তাতে তোমার নিজের কোন কৃতিত্ব আছে না কি, বল ? তোমার যুক্তির তরবারি ধর মুকুন্দ, কর্তৃত্ববুদ্ধির শৃংখল কেটে ফেল, আর সেই পরম কারণকে অনুভব করতে চেষ্টা কর।"

তাঁর এই মর্মান্তিক মন্তব্য আমার মজ্জার গভীরে প্রবেশ করল। বহু কালের ভ্রান্তি, যাতে করে দেহের দাবি আত্মাকে ছাপিয়ে চলে, তার আজ নিরসন ঘটল। সেই ক্ষণে, সেই মুহূর্তেই আমি আত্মার সর্বার্থসিদ্ধি উপলব্ধি করলুম। পরবর্তী জীবনে অবিরাম ভ্রমণকালীন কত অপরিচিত শহরে, কাশীর আশ্রমে প্রাপ্ত এই উপদেশের উপযোগিতা প্রমাণ করতে কত উপলক্ষ্য যে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা আর কি বলব !

কলকাতা থেকে একটিমাত্র সম্পত্তি যা সঙ্গে এনেছিলুম, তা হচ্ছে মায়ের দেওয়া সাধুর সেই রূপোর মাদুলিটি। বহু বৎসর এটিকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি, এখন আশ্রমে এসে এটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখলুম। কবচটির উপকারিতার কথা স্মরণ করে সেটিকে একটু দেখবার আনন্দলাভের জন্যে একদিন সকাল বেলায় চাবি দিয়ে বাক্সটি খুলে ফেললুম। সীলকরা আধারটি কেউই ছোঁয় নি, কিন্তু কি আশ্চর্য ! কবচটি তার ভিতর থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। নিতান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তার খামটা ছিঁড়ে ফেলে দেখলুম,—সত্যিই, তার আর কোন ভুল নেই !

সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে শূন্য থেকে সেটা এসেছিল, সেই শূন্যেতেই সেটা মিলিয়ে গেছে!

দয়ানন্দজীর শিষ্যবর্গের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্রমশই আরও অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে লাগল। আমার দৃঢ় নিঃসঙ্গতা দেখে সমস্ত আশ্রমিকরা আমায় এড়িয়ে যেত। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা দূরে ফেলে রেখে গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি, তার ধ্যানে আমার গভীর নিষ্ঠা কিন্তু চারদিক থেকে লঘু সমালোচনার সৃষ্টি করল।

দারুণ যন্ত্রণায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে একদিন সকাল বেলায় সেই ছোট্ট ঘরটিতে প্রবেশ করলুম প্রার্থনা করবার জন্যে—যতক্ষণ না একটা নিশ্চিত কোন উত্তর মেলে।

কেঁদে বললুম,—"করুণাময়ী মা আমার, হয় তুমি স্বপ্নে আমায় দেখা দাও, না হয় কোন সদ্‌গুরু পাঠিয়ে আমায় দীক্ষা দাও।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল; অত কেঁদে বললুম, তবুও কোন উত্তর মিললে না। হঠাৎ মনে হল যেন আমি অসীম শূন্যে ভাসছি!

মহাশূন্য হতে যেন স্বর্গীয় বামাকণ্ঠের একটি মধুর বাণী কানে ভেসে এল, "তোমার গুরু আজই আসছেন।"

একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা চিৎকার এসে পড়ে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। নীচের তলায় রান্নাঘর থেকে একটি ছোকরা পূজারী—ডাক নাম তার হাবু, সে আমায় ডাকছিল।

"মুকুন্দ, তোমার খুব ধ্যান হয়েছে, এখন নেমে এস, তোমায় এক জায়গায় এক্ষুনি যেতে হবে।"

অন্যদিন হয়ত আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, আর একটা কড়া গোছের উত্তরও দিতুম। আজ আর কিন্তু সে সব কিছু না করে, অশ্রুস্ফীত মুখ মুছে ফেলে অত্যন্ত নিরীহ ভাবে হুকুম তামিল করলুম। হাবুতে আর আমাতে বেরিয়ে পড়লুম—একটু দূরে, কাশীর বাঙ্গালীটোলার ভিতর একটা বাজারের দিকে। বাজারে কেনাকাটা করবার সময়, অকরুণ সূর্যদেব তখনও মধ্যগগনে আরোহণ করেন নি। আমরা তখন সধবা স্ত্রীলোক, পাণ্ডা, থানপরা বিধবা, গম্ভীর স্বভাব ব্রাহ্মণ, আর সর্বত্র বিচরণশীল ধর্মের ষাঁড়ের বিচিত্র সমাবেশের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলুম। একটা অজানা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেটা ভয়ানক রকম ছোট দেখে, মাথা ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি —গলির শেষ প্রান্তে গেরুয়াকাপড় পরা এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখামাত্রই মনে হল যেন কত যুগযুগান্তের পরিচয় তাঁর

সঙ্গে ! ক্ষণেকের জন্য আমার তৃষিত দৃষ্টি তাঁর উপর আবদ্ধ হল,—তারপর একটা সন্দেহ মনে এসে উপস্থিত হল। মনকে বোঝালুম, "মন, এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীটিকে তোমার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে ভুল করছ। ও সব কিছু নয় স্বপ্নবিলাসী, এগিয়ে চল।"

মিনিট দশেক পরে পা দু'টো ক্রমশঃ ভারি হয়ে পড়ে যেন অসাড় হয়ে এল। যেন পাথর হয়ে পড়ে তারা আর আমাকে এক পাও টেনে নিয়ে যেতে চাইল না। অতি কষ্টে আমি ফিরে দাঁড়ালুম, আশ্চর্য, অমনি তক্ষুণি পা দুটো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল ! বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতেই, অমনি পা দুটো আবার অদ্ভুতভাবে ভারি হয়ে এল। সাধুটি আমায় কোন সম্মোহনশক্তির বলে আকর্ষণ করছেন, এই ভেবে আমি হাবুর হাতে জিনিষপত্র-গুলো সব দিয়ে দিলুম। হাবু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার এলোমেলোভাবে পা ফেলা দেখছিল, এখন হো হো করে হেসে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলে—"তোমার কি হয়েছে বল 'ত ? মাথা খারাপ হল না কি ?"

মনে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ, মুখে কোন উত্তর যোগাল না। নিঃশব্দে এগিয়ে চললুম।

সেদিকে ফিরে যেন হাওয়ায় উড়ে সেই সরু গলিটার ভিতর গিয়ে পেঁছিলুম। চকিতদৃষ্টিতে তাকাতেই সেই সৌম্যমূর্তি নজরে পড়ল। দেখলুম, তখনও তিনি একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি কয়েক পা এগোতেই তাঁর চরণপ্রান্তে এসে পেঁছিলুম।

"গুরুদেব !" সেই মূর্ত্তি আমার হাজার স্বপনের মধ্যে পাওয়া তাঁর দিব্যমূর্তি ছাড়া ত আর কারুর নয় !

ঐ শান্তস্নিগ্ধ দুটি চোখ, সিংহের মত উঁচু মাথা, ছুঁচলো দাড়ি, আর বাবরি চুল—এ ত প্রায়ই আমার শৈশস্বপ্নের অন্ধকার ভেদ করে উঁকি মারত, আর কি যে ইঙ্গিত করত, তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারতুম না।

আমার গুরুদেব আনন্দকম্পিত স্বরে বার বার বলতে লাগলেন, "আমার কত আপনার তুমি, আজ আমার কাছে এলে। কত বছর ধরে যে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি !"

পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে তখন আমরা দু'জনে এক হয়ে গেছি। কথা বলা যেন তখন নিতান্তই বাহুল্য মাত্র। গুরুর অন্তর থেকে শিষ্যের কাছে নীরব ভাষায় যেন বাক্যের স্রোত অবিরাম ভাবেই বয়ে যেতে লাগল। অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির বেতারে জানতে পারলুম যে আমার গুরু ভগবানকে লাভ করেছেন

আর আমাকেও তাঁর সান্নিধানে নিয়ে যেতে পারবেন। এ জীবনের অন্ধতমিস্রা প্রাক্‌জীবনের স্মৃতির মৃদু উষার আলোকে অন্তর্হিত হল। একটা নাটকীয় মুহূর্ত্ত। অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ যেন এর ঘূর্ণমান দৃশ্যাবলী। সেই চরণযুগলে যেন এই আমার প্রথম প্রণতি নয়।

আমার হাত ধরে তিনি কাশীর রাণামহলে তাঁর বাসা বাড়ীতে আমায় নিয়ে চললেন। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ তাঁর, দৃঢ় পদবিক্ষেপে তিনি অগ্রসর হলেন।

সেই সময় তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর। দীর্ঘ ঋজু সুঠাম দেহ, যুবকের ন্যায় কর্ম্মঠ। বড় বড় কালো সুন্দর দুটি চোখ, অসীম জ্ঞানের জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল। ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক আননে কোমলতা এনে দিয়েছিল। শক্তির সঙ্গে স্নিগ্ধ পেলবতার এক মৃদু সংমিশ্রণ!

বাড়ীটি গঙ্গার পাড়ে। দোতলার পাথরের বারান্দায় গিয়ে বসতে, সস্নেহে তিনি আমায় বললেন, "দেখ, আমার আশ্রম আর যা কিছু আছে সবই তোমায় দিয়ে দেব, বুঝলে?"

বললুম, "প্রভু, আমি এসেছি জ্ঞানলাভ আর ঈশ্বরোপলব্ধির আশায়, আপনার ঐসব ধনরত্নগুলিরই উপর আমার লোভ, অন্য কিছুতে নয়!"

দ্রুত ক্ষীয়মাণ গোধূলির আলো ক্রমশঃই নিভে এসে আধাঅন্ধকারের ক্ষীণছায়া বিস্তার করছিল। গুরুদেবের নয়নে অতল গভীর কোমলতা। স্নেহমধুর কণ্ঠে তিনি আমায় বললেন, "তোমায় আমি আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিলুম।"

অমিয় মধুর অমূল্য এ বাণী। পঁচিশ বছর পরে আবার তাঁর এই রকম স্নেহের আর এক একটি বাচনিক প্রমাণ পেয়েছিলুম। অধরোষ্ঠে স্নিগ্ধ কোমল ভাব। হৃদয়ে সাগরের অতলস্পর্শী নীরবতা।

শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমিও কি আমায় ঐ রকমই ভালবাসা দিতে পারবে—বল।"

বললুম,—"গুরুদেব, চিরকালই আমি আপনাকে ভক্তি করব।"

নম্রমধুর স্বরে তিনি বললেন,—"সাধারণ ভালবাসা স্বার্থময়, কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির গাঢ় অন্ধকারের ভিতরই এর মূল দৃঢ় হয়ে থাকে। স্বর্গীয় ভালবাসা প্রতিদান চায় না, সে সীমাহীন বাধাবন্ধহীন, তার কোন পরিবর্ত্তন নেই। অনাবিল প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় মানব মনের আবিলতা চিরতরে দূরে হয়ে যায়। আর দেখ, কখনও যদি তুমি আমায় ভগবদ্‌বিচ্যুত হ'তে দেখ, তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার মাথা তোমার কোলে নিয়ে আমাদের প্রেমের ঠাকুরের কাছে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে।"

তারপর সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে উঠে পড়ে তিনি আমায় ভিতরের একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। বাদামের তক্তি, আম প্রভৃতি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই তিনি আমার প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়ে বসলেন। অন্তরের বিনয়নম্র ভাবের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের বিরাট ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম।

বললেন,—"কবচের জন্যে দুঃখ কোরো না। তার কাজ ফুরিয়ে গেছে, তাই সে চলে গেছে।" আমার সারা জীবনের প্রতিচ্ছায়া আমার গুরুদেব যেন তাঁর মনের দিব্য আয়নায় প্রতিবিম্বিত দেখতে পেলেন।

"আপনার সাক্ষাৎ দর্শন, গুরুদেব, দেবদর্শনের আনন্দের চেয়েও বেশী।"

"আশ্রমে তুমি এখন খুবই অস্বস্তিতে আছ দেখছি, কাজেই এখন তোমার তা বদলান দরকার।"

আমার জীবনের কোনো বিষয়ের আমি কোন উল্লেখই করি নি। তা এখন নিতান্তই বাহুল্য বলে বোধ হল। তাঁর নিতান্ত সহজ সরল আর অত্যন্ত সাধারণভাবে বলার ধরণে বুঝলুম যে, ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে তিনি কাউকে চমক লাগিয়ে দিতে চান না।

তারপর তিনি বললেন, "তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত। তোমার আত্মীয়স্বজনদেরই বা তোমার বিশ্বপ্রেম হতে বঞ্চিত করবে কেন বল?"

তাঁর এই কথাতে আমার মনে কিন্তু ভয় এল! আমার পরিবারবর্গ কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যে আমায় অনবরত তাগিদ দিচ্ছিলেন, যদিও চিঠিতে তাঁদের বহুবিধ উপরোধ অনুরোধের আমি এ পর্য্যন্ত কোন উত্তরই দিই নি।

অনন্তদা টিপ্পনী কেটে লিখেছিলেন, "নতুন পাখী আধ্যাত্মিক আকাশে এখন একটু উড়ুক। এর ভারি হাওয়ায় তার ডানা শীগ্‌গিরই শ্রান্ত হয়ে আসবে। আর আমরাও দেখব যে সে নীড়ের দিকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে—আর পাখাটি গুটিয়ে আবার সে সংসারের দাঁড়ে ঠিক এসে বসেছে!"

এইরকম উপমা যা দারুণভাবে মন দমিয়ে দিত—তা আমার মনে বরাবরই জাগ্রত ছিল, তাই কলকাতার দিকে আর "ঝাঁপিয়ে" পড়ব না বলে মনে মনে স্থির করেছিলুম।

বললুম, "প্রভু, বাড়ীর দিকে আমি আর ফিরছি না। কিন্তু আপনি যেখানে বলবেন, সেখানেই যাব। এখন আপনার নাম ঠিকানাটা একটু দয়া করে আমায় দিন।"

"স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি। প্রধান আশ্রম, শ্রীরামপুর রায়ঘাট লেনে। এখানে দিনকতকের জন্যে মাকে দেখতে এসেছি।"

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের গূঢ়লীলার পরিচয় পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। কলকাতা হতে শ্রীরামপুর মাত্র বার মাইল,—তবুও ঐ অঞ্চলে আমি আমার গুরুর ক্ষীণতম আভাসও পাই নি। আমাদের সাক্ষাতের জন্য লাহিড়ী মশায়ের পুণ্যস্মৃতিপূত প্রাচীন কাশীধাম পর্য্যন্ত দৌড়তে হল। অবশ্য এখানকার ভূমিও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য* ও অন্যান্য যোগী মহাপুরুষদের পদরজঃপূত।

"তোমায় ঠিক চার সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে আসতে হবে, বুঝলে?

---

*শংকরাচার্য—ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক; গোবিন্দযতির শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দযতির গুরু ছিলেন গৌড়পাদ। গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকার একটি সুবিখ্যাত ভাষ্যও তিনি রচনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য তাঁর অকাট্য যুক্তি আর অপূর্ব প্রসাদগুণের সঙ্গে বিশুদ্ধ অদ্বৈতভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী শংকর ভক্তিপ্রেমমূলক কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর "দেব্যপরাধ ক্ষমাপণ" স্তোত্রের ধুয়া ছিল, "কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।"

শংকরশিষ্য সনন্দন ব্রহ্মসূত্র-(বেদান্ত দর্শন)-শংকরভাষ্যের এক টীকা রচনা করেন। পাণ্ডুলিপিখানি অগ্নিদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু শংকরাচার্য (যিনি একবার মাত্র পুস্তকখানির মধ্যে চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলেন) তাঁর শিষ্যের কাছে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি শব্দের পর শব্দ আবৃত্তি করে গিয়েছিলেন। পঞ্চপাদিকা নামে সেই গ্রন্থ, আজ পর্যন্ত বিদ্বজ্জন কর্তৃক সযত্নে অধীত হয়।

শিষ্য সনন্দন একটি চমৎকার ঘটনার পর একটি সুন্দর নাম পেয়েছিলেন। একদিন নদীতীরে উপবিষ্ট, শুনতে পেলেন গুরু শংকরাচার্য নদীর অপর পার হতে তাঁকে ডাকছেন। ডাক শুনেই সনন্দন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। গুরু শংকরাচার্য তাঁর বিশ্বাস আর ভক্তি অটুট রাখবার জন্য এবং নদীর উপর দিয়ে পদব্রজে গমনের জন্য সেই ফেনোদ্বেল জলরাশির উপর কুবলয় শ্রেণীর শৃংখল সৃষ্টি করলেন আর তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গিয়ে সনন্দন গুরুর নিকট উপস্থিত হলেন। পদ্মের উপর পাদবিক্ষেপে গমন করাতে সনন্দনের নূতন নামকরণ হল "পদ্মপাদ"।

পঞ্চপাদিকায় পদ্মপাদ তদীয় গুরুর প্রতি বহুভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। আচার্য শংকর স্বয়ং এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখেছিলেন, "ত্রিভুবনে প্রকৃত সদগুরুর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। স্পর্শমণি যদি সত্যই আছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সে কেবল লোহাকেই সোনায় পরিণত করতে পারে, কিন্তু সে তাকে আর একটা পরশ পাথরে পরিণত করতে পারে না। পরমপূজ্য সদ্‌গুরু কিন্তু যে শিষ্য তাঁর চরণে আশ্রয় নেয় তাকে নিজেরই সমান করে তোলেন। সদ্‌গুরু তাই তুলনাবিহীন, না—তিনি লোকোত্তর।"

এই প্রথম শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। বললেন,—"আমার অগাধ স্নেহ আর তোমায় পেয়ে আমার কত যে আনন্দ তা মুখ ফুটে বললুম বলেই বুঝি তুমি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করছ? এর পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমার উপর আমার আগ্রহ আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। সহজে কিন্তু তোমায় আমি শিষ্য বলে গ্রহণ করছিনে। আমার কঠিন শিক্ষার কাছে বাধ্যতা স্বীকার করে, তোমায় পরিপূর্ণ ভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

তবুও আমি নিজের গোঁ ধরে চুপ করে বসেই রইলুম। গুরুদেব অবশ্য সহজেই আমার মুশকিল বুঝতে পেরে বললেন,—

"তোমার বুঝি মনে ভয় হচ্ছে, তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমায় ঠাট্টা করবেন?"

"আমি বাড়ী যাব না।"

"আজ থেকে ঠিক তিরিশ দিনের মধ্যে তোমায় ফিরতেই হবে।'

"কখনোই না" বলে ভক্তিভরে চরণে প্রণাম করে কথাবার্তার ভাব নরম না হতেই প্রস্থান করলুম। রাত তখন দ্বিপ্রহর—চারিদিকে অন্ধকার। আশ্রমের দিকে চলতে চলতে ভেবে আশ্চর্য্য হলুম যে, আমাদের এই অদ্ভুত সাক্ষাতের কেন এ রকম বিসদৃশ পরিণতি ঘটল। মায়ার তুলাদণ্ডে সুখের সঙ্গে সমান ওজনে আসে দুঃখ। আমার কিশোর হৃদয়, এখনও বোধ হয় আমার গুরুদেবের হাতে গড়ে তুলবার মত উপযুক্ত নমনীয় হয়ে ওঠেনি!

তার পরদিন সকালেই লক্ষ্য করলুম যে, আশ্রমবাসীদের ব্যবহারে একটা বিরুদ্ধভাব বেশ বেড়ে উঠেছে। দিনগুলো ক্রমশঃ অবিরাম কর্কশতায় রুক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তিন সপ্তাহের ভিতর দয়ানন্দজী বোম্বাইয়ে একটা কনফারেন্সে যোগদান করতে চলে গেলেন। আমার মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কপাল মন্দ, মাথার উপর নানা দুর্বিপাক ঘনিয়ে এল।

একদিন কানে এসে পৌঁছুল, "মুকুন্দ একটি গলগ্রহ, দিব্যি আরামে আশ্রমে আছে, প্রতিদানে কিছু দেবার নামটি পর্যন্ত নেই।" শুনে আমি সর্বপ্রথম অনুতপ্ত হলুম এই ভেবে যে—কেন আমি পিতার কাছে টাকা ফেরৎ দেবার অনুরোধ রাখতে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আশ্রমে একমাত্র বন্ধু জিতেন্দ্রকে খুঁজে বার করে বললুম, "জিতেন্দ্র আমি চললুম। দয়ানন্দজী ফিরলে তাঁকে ভক্তি প্রণাম জানিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। আর আমার এখানে থাকা পোষাবে না।"

"আমিও চলে যাব মুকুন্দ! আমারও এখানে ধ্যানধারণার চেষ্টার

সুযোগ তোমার চেয়ে যে বেশী কিছু মেলে, তা নয়।" জিতেন্দ্রের স্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

আমি বললুম, "জিতেন্দ্র আমি এক ঈশ্বরকোটিক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। চল, শ্রীরামপুরে তাঁকে দর্শন করে আসি।"

তারপর—তারপর আর কি, সেই "পাখীটি" এবার বিপজ্জনক ভাবে কলকাতার সান্নিধ্যে "ঝাঁপিয়ে" পড়তে প্রস্তুত হল!

১১শ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে দুইটি কপর্দকহীন বালক

"মুকুন্দ! বাবা যদি তোমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করতেন, তাহলেই ঠিক হত। কি বোকার মতন তুমি তোমার জীবনটাকে উড়িয়ে দিচ্ছ!" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সুমধুর উপদেশ বাণীতে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হল।

আগ্রায় তখন ট্রেন থেকে সবেমাত্র নেমেছি, সর্বাঙ্গ ধূলোয় ধূসরিত। জিতেন্দ্র আর আমি অনন্তদার বাড়ীতে এসে উঠলুম। অনন্তদা কলকাতা থেকে সম্প্রতি আগ্রায় বদলি হয়ে এসেছেন। দাদা তখন গভর্ণমেণ্টের পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের একজন সুপারভাইজিং একাউণ্ট্যাণ্ট।

"অনন্তদা, আপনি ত ভাল রকম জানেন যে আমি সেই বিশ্বপিতার কাছ থেকেই আমার উত্তরাধিকার খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর কারুর কাছ থেকে নয়।"

"আরে টাকা আগে, টাকা আগে,—তোমার ঈশ্বরটীশ্বর না হয় পরে আস্তে পারেন! কে জানে বাবা, জীবনটা ত খুব দীর্ঘও হতে পারে?"

"ভগবানই আগে,—টাকা তাঁর দাস। কে বলতে পারে, জীবনটা তো অতি স্বল্পস্থায়ীও হতে পারে?"

আমার উত্তরটা সেই মুহূর্তের প্রয়োজনে এসে জুগিয়ে গেল, কোন ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সূচনায় নয়। (হায়, অনন্তদার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল তার অকালবিয়োগে)।*

"মনে হচ্ছে, আশ্রমে থেকে তোমার বেশ টন্‌টনে জ্ঞানলাভ হয়েছে। যাক্, দেখছি যে শেষ অবধি বেনারস ছেড়ে এসেছ!" অনন্তদার চোখ দুটি বেশ একটা আত্মতৃপ্তির আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠল। এখনও তিনি আমায় সংসার বন্ধনে বাঁধবার আশা করছিলেন।

"বেনারস যাত্রা আমার বৃথায় যায় নি। প্রাণ আমার যা চাইছিল, সেখানে তা সব পেয়েছি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন, সেটা আপনার সেই পণ্ডিত মহারাজ বা তার পুত্ররত্ন নয়।"

অনন্তদা, পূর্বকথা স্মরণ করে আমার সঙ্গে হাস্‌লেন। তাঁকে স্বীকার

---

* ২৫শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

করতে হল, কাশীতে যে "ভবিষ্যদ্বক্তা" তিনি যোগাড় করেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি একেবারেই ছিল না।

"উপস্থিত ভবঘুরে ভায়ার মতলবটা কি, একটু শোনাও দেখি!"

"জিতেনদা আমায় সঙ্গে করে আগ্রায় নিয়ে এলেন। এখানে তাজমহল দেখে পরে যাব শ্রীরামপুরে। নতুন গুরু আমি খুঁজে পেয়েছি। তাঁর আশ্রম আছে শ্রীরামপুরে, সেখানে আমরা তাঁকে দর্শন করতে যাব।"

অনন্তদা অবশ্য আমাদের যথোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন ত্রুটি করলেন না। সন্ধ্যার সময় বার কতক দেখলুম, তাঁর দৃষ্টি আমার উপর চিন্তিতভাবে নিবদ্ধ। মনে মনে ভাবলুম, "তোমার ও দৃষ্টি আমি খুব চিনি, নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আঁটা হচ্ছে।"

নাটকের শেষ অঙ্কের পরিণতি ঘটল প্রাতর্ভোজনের সময়। অনন্তদা, কালকের কথাবার্তার সূত্র ধরে শুরু করলেন, "তাহলে তুমি বাপের বিষয় কিছুই প্রত্যাশা কর না?" দৃষ্টি কিন্তু তাঁর অত্যন্ত নিরীহ।

"ভগবানের উপরই আমার একান্ত নির্ভর, তিনিই আমার একমাত্র ভরসা।"

"বলা তো খুবই সোজা! জীবনটাও এ পর্যন্ত যা হোক এক রকম আড়ালে আবডালে কাটিয়ে এলে। তোমার আহার আর আশ্রয়ের জন্য যদি তোমায় সেই ভগবানের অদৃশ্য হস্তের দানের প্রত্যাশায় থাকতে হত, তাহলে কি দুর্দশাটাই না আজ হত, বল দেখি? শীগগিরই তোমায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হত, বুঝলে ভায়া?"

"কখনোই নয়! ভগবান ছাড়া রাস্তার লোকেদের উপর আমি কখনও নির্ভর করতুম না। ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া তাঁর ভক্তের জন্য তিনি হাজারো রকমের উপায় ঠাউরে রেখেছেন, তাও জেনে রাখবেন।"

"আরে খুব যে কথার বড়াই! ধর, যদি তোমার কথার বড়াই-এর দাম এই সংসারের কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায়—তখন?"

"খুব রাজি, আমি খুব রাজি আছি। আপনি কি মনে করেন যে, ভগবান কেবলমাত্র কল্পলোকেই বাস করেন, এই কঠিন সংসারে আর তাঁকে পাওয়া যায় না?"

"আচ্ছা, বেশ তো দেখা যাবে। এখনই তোমার সুযোগ মিলবে। হয় তোমার না হয় আমার, কোনটা ঠিক মত, তা' আজই প্রমাণ হয়ে যাবে।"

অনন্তদা যেন একটা নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে থামলেন, তারপর আবার ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে শুরু করলেন, "শোন, আমি তোমাকে আর তোমার এই সতীর্থ জিতেন্দ্রকে আজ সকালেই এই কাছে বৃন্দাবন শহরে পাঠাচ্ছি। তোমরা

সঙ্গে একটি পয়সাও নিতে পারবে না আর খাওয়াদাওয়া বা টাকাকড়ির জন্যও কারুর কাছে হাত পাততে পারবে না। তোমাদের দুর্দশার কথাও কাউকে জানাতে পারবে না, অথচ না খেয়েও থাকতে পারবে না বা বৃন্দাবনের রাস্তায়ও পড়ে থাকতে পারবে না। যদি আমার পরীক্ষার এই সব শর্তগুলোর একটাও না ভেঙ্গে রাত বারটার আগে আমাদের এই বাংলোয় ফিরে আসতে পার, তাহলে সত্যিই বুঝব যে, তোমার কথাই ঠিক!"

"আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।" আমার অন্তরে বা কথায় কোথাও বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তাঁর সদ্যকৃপার সকৃতজ্ঞ স্মৃতি মনের মধ্যে সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির কাছে প্রার্থনার ফলে আমার সাংঘাতিক কলেরা থেকে মুক্তিলাভ; লাহোরে ছাতে বেড়ানর সময় লীলাচ্ছলে আমায় দুটি ঘুঁড়ি প্রদান; আমার গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী বহন করে বেরিলীতে সেই কবচটির আবির্ভাব; বেনারসে সেই পণ্ডিতপ্রভুর বাড়ীর উঠানের বাইরে সেই অপরিচিত সাধুর নির্ভুল পথনির্দেশ; জগন্মাতার আবির্ভাব আর তাঁর স্নেহসিক্ত অমিয়মধুর বাণী; আমার তুচ্ছ বিব্রতাবস্থায় মাষ্টার মহাশয়ের মাধ্যমে তার ত্বরিত প্রতীকার; শেষ মুহূর্তের সাহায্যে আমার স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ এবং তাঁর চরম দান—সারা জীবনের স্বপ্নকুহেলী ভেদ করে আমার জীবন্ত সদ্গুরুলাভ! নাঃ, কখনই আমি স্বীকার করব না যে আমার "জীবনদর্শন" সংসারের কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন লড়াইয়েরই উপযুক্ত নয়।

"তোমার এতে আগ্রহ প্রশংসার কথা বটে! তা বেশ, ভাল কথা তোমাদের আমি এখুনিই ট্রেনে তুলে দিচ্ছি।" বলে অনন্তদা ব্যাদিতবদন জিতেন্দ্রের দিকে ফিরে বল্লেন, "শোন জিতেন্দ্র, সাক্ষী হিসেবে তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাবে, আর কি বলব, খুব সম্ভব ওরই মত তোমারও ঠিক একই দুর্দশা ঘটবে।"

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জিতেন্দ্র আর আমি, আমাদের এই হঠাৎ ভ্রমণের একখানি করে এক পিঠের টিকিট পেলুম। ষ্টেশনের একটা নির্জন কোণে আমাদের দু'জনকে দেহতল্লাসীতে আত্মসমর্পণ করতে হল। অনন্তদা শীঘ্রই টের পেয়ে নিরস্ত হলেন যে, কোন কিছু লুকিয়ে বা বাঁচিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিনে। আমাদের সাদাসিধে ধুতিতে, যা নিতান্ত দরকার, তাছাড়া আর কোন কিছুই লুকানো ছিল না।

বিশ্বাস যখন আর্থিক ব্যাপারকে কঠিন আক্রমণ করল তখন আমার বন্ধুটি প্রবল প্রতিবাদসহকারে বল্লে, "অনন্তদা, দুটো একটা টাকা আমাকে হাতে

রাখতে দেবেন, হঠাৎ দরকার হলে বা কোন ফ্যাসাদে পড়লে অন্ততঃ টেলিগ্রাম তো করতে পারব ?”

আমি চেঁচিয়ে বকে উঠলুম, “জিতেন্দ্র, টাকাকড়িরই উপর যদি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে বেরুতে চাও, তাহলে আমি এ পরীক্ষায় একদম যাব না, তা বলে রাখছি।”

“টাকার মিষ্টি বুলি প্রাণ ঠান্ডা করে হে, বোঝ তো ?”

চোখ পাকিয়ে তাকাতেই জিতেন্দ্র একেবারে চুপ করে গেল।

“মুকুন্দ, আমি একেবারে হৃদয়হীন নই!” অনন্তদার কণ্ঠস্বরে একটু কোমল নম্রতার আভাস! বোধ হয় তাঁর বিবেক তাঁকে দংশন করছিল, হয়ত দুটি নিঃসম্বল বালককে একটা অপরিচিত শহরে পাঠাবার জন্যে অথবা তাঁর নিজের ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাবের জন্যে, তা কে জানে! তাই তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, “যদি কোন সুযোগে, বা ধর যদি ভগবানের দয়াতেই তুমি বৃন্দাবনের পরীক্ষায় উৎরে আসতে পার, তা হলে আমি তোমার শিষ্য হব।”

এই রকম একটা অপ্রত্যাশিত উপলক্ষ্যের সঙ্গে এই ধরণের প্রতিজ্ঞার কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি ছিল। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে ত কোথাও কখন মাথা নীচু করেন না। পিতার পরই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের স্থান; কিন্তু আমার আর তখন কোন মন্তব্য প্রকাশের সময় ছিল না, ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।

ট্রেন ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে ছুটে চলেছে। জিতেন্দ্র একটা বিষণ্ণ নীরবতা অবলম্বন করেই বসে রইল। শেষে একটু নড়ে চড়ে বসে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে শরীরের এক স্থানে একটি প্রবল চিমটি কেটে ব্যথা দিয়ে বললে, “ভগবান যে এর পর কি করে আমাদের আহার জোটাবেন তার কোন হদিসই 'ত খুঁজে পাচ্ছি নে।”

“চুপ চাপ বসে থাক, ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন, তা জান ?”

“আচ্ছা চটপট তিনি যাতে করেন, তার কোন ব্যবস্থা করতে পার ? এর পর যা অবস্থা দাঁড়াবে, তা ভেবেও এরই মধ্যে খিদেয় আধমরা হয়ে গেছি! কাশী ছেড়ে বেরিয়েছিলুম মমতাজের কবর দেখতে, নিজের কবরে ঢোকবার জন্যে নয়!”

“আরে ঘাবড়াও কেন জিতেন্দ্র ? পুণ্যধাম বৃন্দাবনের কি চমৎকার দৃশ্য সব আজ আমরা দেখতে পাব, বল ত ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃপূত লীলা-ভূমিতে আজ আমাদের বেড়াতে পাবার সৌভাগ্য হবে বলে কি যে আমার আনন্দ হচ্ছে, তার আর কি বলব!”

আমাদের কম্পার্টমেণ্টের দ্বার খুলে গেল। দুটি লোক ভিতরে এসে বস্‌লে। পরের স্টেশনেই আমাদের নামতে হবে।

"ওহে ছোকরারা, বৃন্দাবনে তোমাদের কোন বন্ধুটন্ধু আছে না কি হে ?" বলেই ঠিক আমার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট অপরিচিত লোকটি আমাদের দিকে চাইলেন, দৃষ্টিতে তাঁর বিস্ময়কর কৌতূহল।

"আপনার তাতে কি দরকার মশাই ?" বলে রুক্ষভাবে তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালুম।

"মনচোরার* বাঁশীর টানে তোমরা বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি ? আমিও একজন দীন ভক্ত, বুঝলে ? তা' যাক, এই অসহ্য গরমে আজ তোমরা কোথায় থাক কি খাও, তা দেখা তো আমার এখন অবশ্য কর্তব্য হল দেখছি !"

"না মশায়, আমাদের একলা থাকতে দিন। আপনার দয়া অসীম, কিন্তু বাড়ী ছেড়ে আমরা পালাচ্ছি ভেবে আপনি নিতান্তই ভুল করেছেন।"

কথাবার্ত্তা আর বেশীদূর এগোল না ; গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। জিতেন্দ্র আর আমি প্ল্যাট্‌ফরমে নামতেই আমাদের সেই হঠাৎ পাওয়া সঙ্গীদ্বয় আমাদের দুজনের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলেন।

চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিপরিবেষ্টিত, সুবিন্যস্ত ভূমিতে অবস্থিত এক বিশাল আশ্রমের সম্মুখে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। আমাদের উপকারী বন্ধুগণ এখানে বেশ সুপরিচিত বলেই বোধ হল। একটি সহাস্যবদন বালক এসে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে একটি প্রশস্ত বৈঠকখানায় বসাল। অনতিবিলম্বে একটি সৌম্যদর্শন বর্ষীয়সী মহিলা আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

ইনিই বোধ হয় আশ্রমকর্ত্রী। তাঁকে সম্বোধন করে একটি লোক বললে, "গৌরী মা, রাজকুমারেরা আজ আর আস্‌তে পারলেন না। শেষ মুহূর্তে তাঁদের মতলব সব বদলে গেল ; তার জন্য তাঁরা খুব দুঃখ জানিয়েছেন। কিন্তু তার জায়গায় আজ আমরা আর দুজন অতিথি এনেছি। ট্রেনে তাদের উপর নজর পড়াতে কৃষ্ণভক্ত বলেই মনে হল।"

দরজার দিকে এগোতে এগোতে আমাদের পরিচিত সেই লোক দুটি বললেন, "বন্ধুগণ, এখন তবে আসি। গোবিন্দের ইচ্ছায় আবার পরে দেখা হবে !"

এই অপ্রত্যাশিত অতিথি দুটির দিকে তাকিয়ে মায়ের স্নেহকোমল হাসির

---

*মনচোরা অর্থাৎ হরি—ভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রিয় নাম।

সঙ্গে গৌরী মা বললেন, "তোমরা এস বাবা, এস, আজকের চেয়ে ভাল দিনে আর কবে তোমরা আসতে পারতে? আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক দু'জন রাজকুমারের আজ আসবার কথা ছিল। তা আর হল না। যাই হোক, আমার হাতের রান্নার কোন সমঝদার আর যদি না পাওয়া যেত, তাহলে বড্ডই আফশোস থেকে যেত যে বাবা!"

অত্যন্ত মিষ্টিমধুর এই কথাগুলি জিতেন্দ্রর উপর মারাত্মক রকমের প্রভাব বিস্তার করল। বেচারা ত আনন্দে কেঁদেই ফেলল। বৃন্দাবনে যে 'দশা' প্রাপ্ত হবে বলে সে আশঙ্কা করেছিল, তা যে আজ এই রকম রাজোচিত সম্বর্ধনায় পরিণত হবে, তা বেচারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। হঠাৎ মানসিক ভারসাম্যচ্যুত হয়ে পড়াটা তার পক্ষে অত্যধিক বলেই বোধ হল। আমাদের গৃহকর্ত্রী তাকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না। বোধ হয় তিনি কৈশোরসুলভ চাপল্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন।

সংবাদ এল, আহার্য প্রস্তুত। গৌরী মা আমাদের এক খাবার দালানে নিয়ে চললেন; পরিপাটি রন্ধনের সৌরভে পরিপূর্ণ। সেখানে আমাদের বসিয়ে পাশের রান্নাঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

এই সুযোগের সন্ধান আমি আগে থেকেই করছিলুম। জিতেন্দ্রের শরীরে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনপূর্বক একটি অম্লমধুর চিমটি প্রদান করলুম। ট্রেনে জিতেন্দ্রের সেই মোলায়েম চিমটিটির শোধ তুলে বললুম, "হায়রে অবিশ্বাসী, দেখতে পাচ্ছ না যে, ভগবানই আজ আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর তা চটপট এবং সঙ্গে সঙ্গেই?" গৌরী মা একটা পাখা হাতে করে আবার ঘরে ঢুকলেন। আমরা দুজনে চমৎকার কাজকরা দুটো কম্বলের আসনে বসতে, তিনি আস্তে আস্তে বাতাস করা শুরু করলেন।

আশ্রমের শিষ্যেরা কিছু না হোক অন্ততঃ ত্রিশ রকম আহার্যের পদ নিয়ে যাতায়াত শুরু করে দিল। "খোরাক জোটা"র চেয়ে বরং নিঃসংশয়ে একে "ভূরিভোজন" বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। পৃথিবীতে আগমনের পর জীবনে এ পর্যন্ত জিতেন্দ্র আর আমি এ রকম উপাদেয় ও তৃপ্তিকর ভোজ্য আর কখনও আহার করি নি।

বললুম, "মা ঠাকরুণ, এ রাজারাজড়াদের উপযুক্ত ভোজই বটে! এ রকম নেমন্তন্নে না এসে আপনাদের রাজঅতিথিদের এমন কি বেশী জরুরী কাজ পড়ে গেল, তা কল্পনাও করতে পারিনে! আপনার এ খাওয়ান আমাদের সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে রইল!"

অনন্তদার নির্বন্ধাতিশয্যে নীরব হয়ে আমরা আর সেই করুণাময়ী মহিলাটির কাছে প্রকাশ করতে পারলুম না যে, আমাদের এই ধন্যবাদের দুটি তাৎপর্য ছিল। অন্ততঃ আমাদের আন্তরিকতা যে সুস্পষ্ট ছিল, তার আর কোন সন্দেহই নাই। আমরা তাঁর আশীর্বাদ মস্তকে বহন করে আর পুনরায় আশ্রম দর্শন করবার চিত্তাকর্ষক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্থান করলুম।

বাইরে অসহ্য গরম। বন্ধুটি আর আমি আশ্রমের দুয়ারের কাছে একটি বিশাল কদম গাছের তলায় আশ্রয় নেবার জন্য অগ্রসর হলুম। এখন জিতেন্দ্রর চোখা চোখা কথা বেরুতে শুরু হ'ল। জিতেন্দ্রর আর এক দফা সংশয় উপস্থিত! বললে, "তুমি আমায় আজ আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি! অবশ্য আমাদের এ ভোজটা আজকে ভাগ্যের জোরে হঠাৎ পাওয়া। কিন্তু ট্যাঁকে একটিও পয়সা না থাকলে, কি করে এই শহরের সব দেখ্‌ব বল দেখি? অনন্তদার কাছেই বা আমায় তুমি কি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাও বল?"

জবাব দিলুম, "এখন তোমার পেটটি বেশ ভরেছে কি না, তাই ভগবানকে সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে মেরে দিলে, বেশ মজা যা' হোক!"

আমার কথাগুলো নেহাৎ তিক্ত না হলেও কিন্তু অভিযোগপূর্ণ। ভগবানের করুণার স্মৃতি মানুষের মনে কত ক্ষীণ! এমন কোন মানুষ বেঁচে নেই যে, সে ভগবানের কাছে তার কোন না কোন প্রার্থনা পূরণ হতে না দেখেছে।

"তোমার মত বদ্ধপাগলের সঙ্গে বেরোনর মত বোকামি আমি জীবনে কখনো ভুলছিনে!"

"চুপ কর জিতেন্দ্র, যে ঠাকুর আমাদের আজ আহার জুটিয়ে দিলেন, সেই ঠাকুরই আবার আমাদের বৃন্দাবন দর্শন করিয়ে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবেন, দেখ না কেন?"

দেখা গেল, একটি ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক দ্রুতপদে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। গাছের তলায় এসে আমায় প্রণাম করে বললে,—

"মশায়, আপনি আর আপনার সঙ্গীটি নিশ্চয়ই আজ এখানে নতুন এসেছেন। আপনাদের আতিথিসেবা করতে আর তীর্থদর্শন করাতে আমায় অনুমতি দিন।"

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হঠাৎ কারুর মুখ শুকিয়ে যায় না, কিন্তু জিতেন্দ্রের মুখ হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল! আমি কিন্তু সবিনয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলুম।

"নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন না, কি বলেন?" বলতে বলতে বেচারার মুখে যে ভয় দেখা গেল, অন্য উপলক্ষ্যে[1] তা নিতান্তই হাস্যকর বলে বোধ হত।

"নয় কেন ?"

"আপনি আমার গুরু", বলে সে নিতান্ত বিশ্বাসভরে আমার দিকে চেয়ে বললে, "আমার দুপুরের ধ্যানের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে আমায় দেখিয়ে দিলেন যে, এই গাছটিরই তলায় দুটি পথহারা পথিক বসে, তার মধ্যে একটির মুখ হচ্ছে স্বয়ং আপনার—আমার গুরুদেব, ধ্যানে যাকে আমি প্রায়ই দেখেছি ! আমার এ দীন সেবা গ্রহণ করলে যে অজস্র আনন্দ পাব,—তা থেকে আমায় আজ আর বঞ্চিত করবেন না !"

বললুম, "আমিও খুব খুশী হয়েছি তুমি আমায় পেয়েছ বলে। দেখছি, কি ভগবান, কি মানুষ কেউই আমাদের ত্যাগ করে নি !" যদিও তখন আমি নিশ্চল হয়ে বসে সেই আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌ছিলুম, অন্তরে কিন্তু গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভক্তিতে সেই পরম দেবতার চরণে মাথা নত হয়ে এল।

"মশায়রা কি গরীবের বাড়ীতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন না ?"

"খুবই আপ্যায়িত হলুম ! কিন্তু তা আর হয় না, কারণ আমরা যে আগ্রাতে আমার দাদার বাড়ীতে এসে উঠেছি।"

"আমার অদৃষ্ট ! যাক্, অন্ততঃ আপনাদের সঙ্গে বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু আমায় রাখতে দিন।"

আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলুম। যুবকটি তার নাম বললে, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনল। আমরা মদনমোহনের মন্দির আর শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাস্থল দর্শন করে এলুম। মন্দির দর্শন করে বেড়াতে বেড়াতে রাত হয়ে এল।

"একটু দাঁড়ান, কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি", বলে প্রতাপ ষ্টেশনের কাছে এক মিষ্টান্নের দোকানে ঢুকে পড়ল। এখন অপেক্ষাকৃত একটু ঠাণ্ডা হওয়াতে জিতেন্দ্র আর আমি জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথে বেড়াতে লাগলুম। কিছুক্ষণের অনুপস্থিতির পর আমাদের বন্ধুবর নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

"অন্ততঃ আমায় এইটুকু পুণ্য সঞ্চয় করতে দিন," বলে প্রতাপ সানুনয় হাসিতে একগোছা টাকার নোট আর সদ্যক্রীত দুটি আগ্রার টিকিট আমাদের সামনে প্রসারিত করে ধরল।

অবশ্য তার হাত থেকে সেগুলো গ্রহণের সঙ্গে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সেই অদৃশ্য হস্তের প্রতিই সমর্পিত হল। অনন্তদার কাছ হতে উপহসিত হলেও কি তাঁর অজস্র দান আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত হয়ে যায় নি ? তার হিসাব এখন কে দেবে ?

স্টেশনের কাছে একটা নির্জন জায়গা খুঁজে পেয়ে বললুম, "প্রতাপ, আজ তোমায় আমি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী লাহিড়ী মহাশয়ের 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত করব। তাঁরই সাধন প্রণালী তোমার গুরু হবে!"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দীক্ষা দান শেষ হ'ল। নূতন শিষ্যটিকে বললুম, "ক্রিয়াই তোমার চিন্তামণি।* সাধনপ্রণালী তুমি ত দেখলে,—খুবই সহজ, এতে করে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্রুত সাধিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলে যে, দেহবন্ধ আত্মার মায়ামুক্ত হতে দশলক্ষ বৎসর লাগে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই স্বাভাবিক কাল বহুগুণ কমিয়ে ফেলতে পারা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু যেমন দেখিয়েছেন যে, গাছের বৃদ্ধি তার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেখান যায়, ঠিক তেমনি মানুষের মনোবৈজ্ঞানিক উন্নতিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দ্রুততর করে তোলা যেতে পারে। সাধনে তোমার খুব নিষ্ঠা হোক, তুমি সকল গুরুর যিনি গুরু তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছবে।"

প্রতাপ ভাবতে ভাবতে বললে, "যোগের এই চাবিকাঠিটির সন্ধান বহুদিন ধরেই করেছি। আজ তা পেয়ে যে কি পরিমাণ আনন্দ হল, মুখে আর তা কি বলব! আমার ইন্দ্রিয়ের সকল বাঁধন ছিঁড়ে এ আমায় উচ্চস্তরে পেঁছবার পথ মুক্ত করে দেবে—এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হল।"

একটা অনাস্বাদিতপূর্ব নীরব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম; তারপর ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললুম। ট্রেনে যখন চাপলুম, আমার অন্তর তখন এক অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত—কিন্তু জিতেন্দ্রর আজ কাঁদবার দিন। প্রতাপের কাছ হতে আমার সস্নেহ বিদায় গ্রহণ—আমার দুটি সঙ্গীরই কাছ হতে রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে মাঝে মাঝে করুণোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। এ যাত্রায় জিতেন্দ্রের দুঃখ আর এক দফা উথলে উঠল। এবার আর তা নিজের জন্যে নয়,—নিজেরই বিরুদ্ধে!

জিতেন্দ্র বলতে লাগল, "আমার কতটুকুই বা বিশ্বাস? মন যে আমার একেবারে পাথর হয়ে গেছে! আর নয়, ভবিষ্যতে আমি আর ভগবানের দয়াতে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করব না।"

রাত দুপুর এগিয়ে আসছিল। দুটি সহায়সম্বলহীন দীন পরিব্রাজককে কপর্দকহীনভাবে রাস্তায় পাঠানর পর পুনরায় তারা অনন্তদার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল। আজ আমরা সব শর্ত পালন করে এখন আবার ফিরে এসেছি!

---

*চিন্তামণি—যে মণি অভীষ্টদান করতে পারে। ভগবানের একটি নাম।

তাঁরই লঘু পরিহাসের ফল—তাঁর মুখটি, তখন দেখবার মত একটি পরম বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি! নীরবে আমি টেবিলের উপর টাকার নোটের ধারা বর্ষণ করতে শুরু করলুম।

"জিতেন্দ্র, বলি ব্যাপারটা কি হে?" অনন্তদার স্বরে বিদ্রূপ মাখান ছিল। "এ ছোকরা কোন রাহাজানি-টাহাজানি করে আসে নি ত'?"

ভ্রমণ কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হলে, দাদা আমার প্রথমে চুপ করে থেকে পরে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন!

"চাওয়া আর পাওয়ার নিয়মটা দেখছি, যা ভেবেছিলুম তার চেয়েও সূক্ষ্মতর রাজ্যে গিয়ে পেঁছায়।" অনন্তদার এমন আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। বললেন, "আজ আমি এই প্রথম তোমার টাকার প্রতি, আর তুচ্ছ পার্থিব ধনসঞ্চয়ে ঔদাসীন্যের কারণ বুঝলুম।"

রাত আরও গভীর হয়ে এল। দাদা তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা* নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। "গুরু" মুকুন্দকে একদিনেই দুটি "অযাচিত" শিষ্যের ভার গ্রহণ করতে হল।

তার পরের দিনের প্রাতরাশ যে মধুর ঐক্য আর গভীর আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হল, আগের দিনে তা' ছিল না। আমি জিতেন্দ্রর দিকে চেয়ে হেসে বললুম, "তোমাকে তাজমহল না দেখে ঠকতে হবে না। চল, শ্রীরামপুর যাবার আগে এটা দেখেই যাই!"

অনন্তদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা শীঘ্রই আগ্রার গৌরব তাজমহলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সূর্যকিরণোজ্জ্বল সুসমঞ্জস গঠনের এ যেন একটা শ্বেত মর্মরস্বপ্ন! কৃষ্ণবর্ণ ঝাউ, চিক্কণ তৃণাস্তীর্ণ ভূমি আর প্রশান্ত জলাশয়ে এর পরিবেশ সুসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরভাগ বহুমূল্যবান না হলেও মূল্যবান প্রস্তরখচিত জাফরিযুক্ত বস্ত্রের ন্যায় অপূর্ব কারুশিল্পশোভিত। লতাপাতার পুষ্পস্তবক ও মাল্যাকারে সূক্ষ্মকারুকার্য বেগুনী ও পীতাভ মর্মরোপরি উৎকীর্ণ। গম্বুজনিঃসৃত আলো সম্রাট সাজাহান ও তাঁর সাম্রাজ্য আর হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সমাধির উপর স্নিগ্ধ মায়া রচনা করেছে!

যাক্, খুব বেড়ান তো হল। গুরুদেবের জন্যে তখন আমার প্রাণ কাঁদছে। জিতেন্দ্র আর আমি শীঘ্রই ট্রেনে চড়ে দক্ষিণদেশে বাংলার দিকে রওনা হলুম।

---

* দীক্ষা—আধ্যাত্মিক ব্রত গ্রহণ। সংস্কৃত দীক্ষ ধাতু নিষ্পন্ন যাহার এক অর্থ আত্মোৎসর্গ করা।

জিতেন্দ্র বললে "মুকুন্দ, কত দিন যে হল, আমি বাড়ীর লোকজনদের মুখ দেখিনি! আমার মতলব এখন বদলেছে। পরে না হয় শ্রীরামপুরে তোমার গুরুদেবকে দর্শন করে আসা যাবে।"

বন্ধুটি,—যাকে মৃদুভাবে বললে, অস্থিরচিত্ত বলা যায়, কলকাতায় আমায় ছেড়ে গেল। কলকাতার মাত্র বার মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর; লোকাল ট্রেনে আমি শীঘ্রই পৌঁছে গেলুম।

কাশীতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আটাশ দিন কেটে গেছে যখন বুঝতে পারলুম, সর্বশরীরে তখন একটা বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব করলুম।

তিনি বলেছিলেন, "চার সপ্তাহের মধ্যেই তোমায় আমার কাছে আবার আসতে হবে!" আজ আমি এখানে দুরু দুরু বক্ষে,—শান্ত আর নির্জন রায়ঘাট লেনে, তাঁর উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে। জীবনে সর্বপ্রথম আমি সেই আশ্রমে প্রবেশ করলুম, যেখানে ভারতের 'জ্ঞানাবতারে'র সঙ্গে আমার জীবনের পরবর্তী দশবছরের শ্রেষ্ঠাংশই কাটাতে হবে!

১২শ পরিচ্ছেদ

আমার গুরুর আশ্রমে বহু বৎসর

"যাক্ শেষ পর্যন্ত তুমি এসেই পড়লে দেখছি।" সামনে বারান্দা, তার পিছনে বসবার ঘর, মেঝেতে বাঘছালের আসন পাতা। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বসে আছেন, আমায় সাদর সম্ভাষণ জানালেন,—কিন্তু স্বর উত্তাপবিহীন, ভাব আবেগশূন্য।

"আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার চরণে এখন আশ্রয় নিলুম।" নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলুম।

"তা কি করে হয় বল? তুমি তো আমার কোন কথাই মান না।"

"আর নয় গুরুজী! আপনার ইচ্ছাই হবে আমার কাছে আদেশ।"

"তবে ভাল। এখন তা হলে তোমার জীবনের ভার আমি নিতে পারি।"

"গুরুদেব! স্বেচ্ছায় আমি আমার সকল ভার আজ আপনার উপর অর্পণ করলুম।"

"আচ্ছা, তাহলে আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, তুমি এখন তোমার বাড়ীতে ফিরে যাও। আমি চাই যে, তুমি কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাক।"

"আচ্ছা গুরুদেব, তাই করব।" মানসিক আতঙ্ক অপ্রকাশই রাখলুম। বছরের পর বছর ধরে সেই একঘেয়ে বই নিয়েই দিন কাটাতে হবে? পিতা আগে সেই কথা বলেছেন এখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও ঐ একই কথা বলছেন! বেশ তাই হোক্। ভেবে আর কি করব?

"একদিন তোমায় হয়ত পশ্চিমে যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় খুবই মন দিয়ে শুনবে, যদি তারা দেখে যে, সেই হিন্দু গুরুর কোন ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রি আছে, বুঝলে?"

"আপনিই ভাল জানেন গুরুজী, আমি আর কি বলব, বলুন!" মনের মেঘ এখন কেটে গেল। পশ্চিমে যাওয়ার উল্লেখ আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় আর রহস্যময় বলেই বোধ হল। কিন্তু কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে সদ্য সদ্য গুরুর আজ্ঞা পালন করে তাঁর সন্তোষবিধানই হচ্ছে এখন আমার একমাত্র কাজ।

"তুমি কাছে এই কলকাতাতেই থাকবে। তবে আর কি, ফুরসৎ পেলেই এসো!"

"সম্ভব হলে রোজই আসব গুরুদেব। কিন্তু আমার জীবনের উপর আপনার সর্বময় কর্তৃত্ব আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মানতে পারি—কেবল একটি মাত্র শর্তে……"

"কি, বল ?"

"—যে আপনি আমায় ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়ে দেবেন বলুন ?"

ঘণ্টাখানেক ধরে বাগযুদ্ধ চলল। গুরুবাক্য মিথ্যা হবার নয়, আর তা লঘুভাবে দেওয়াও যায় না। এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদানের অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক পথ উন্মুক্ত করার বিরাট সম্ভাবনা। শিষ্যকে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে দেবার পূর্বে গুরুরও অবশ্য ঈশ্বরানুভূতি হওয়া চাই। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের কথা আমি অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলুম আর মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিলুম যে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমায় ঐ সুযোগটি আদায় করে নিতে হবে।

বললেন, "তুমি দেখছি নেহাৎই নাছোড়বান্দা!" তারপর গুরুদেব শেষ পর্যন্ত সস্নেহ সম্মতিপ্রদানে ব্যাপারটির চরম নিষ্পত্তি করে বললেন,—

"বেশ, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।"

জীবনব্যাপী অন্ধকার যবনিকা আমার মন হতে অপসৃত হল। ইতস্ততঃ নিরর্থক অনুসন্ধানের আজ শেষ! আজ আমি প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণে চির আশ্রয় লাভ করলুম।

"চল, তোমায় আশ্রম দেখিয়ে নিয়ে আসি।" বলে গুরুদেব বাঘছালের আসন থেকে উঠে পড়লেন। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সবিস্ময়ে দেখলুম যে, দেওয়ালে একটি ছবি যুঁইফুলের মালা দিয়ে সযত্নে সাজান!"

সবিস্ময়ে বলে উঠলুম, "লাহিড়ী মহাশয়!"

"হ্যাঁ, আমার গুরু দেবতা!" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বর ভক্তিকম্প্র। বললেন, "আমার সাধনপথে যে সব গুরুদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কি মানুষ আর কি যোগী হিসেবে তাঁদের যে কোন জনের চেয়ে উনি বড়।"

নীরবে আমি সেই অতিপরিচিত ছবির তলায় গিয়ে ভক্তিভরে মাথা নত করলুম। আমার আত্মার প্রণতি, সেই অদ্বিতীয় গুরুর চরণে গিয়ে পৌঁছাল, —যিনি আমার শৈশবে আমায় আশীর্বাদ করে আজকার এই শুভ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে পরিচালিত করে এসেছেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ী আর তার সংলগ্ন জমি দেখে এলাম।

আশ্রম বাড়ীটি বেশ বড়, প্রাচীন ধরণের আর সুগঠিত। বড় বড় থাম দিয়ে ঘেরা উঠান। বাইরের দেওয়ালগুলি শেওলা পড়া। সমতল ছাদের উপর পায়রার দল সব উড়ে বেড়াচ্ছে। আশ্রমের নানা অংশ তারা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দখল করে বাস করছে। খিড়কির বাগান আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি নানাজাতীয় রসনাতৃপ্তিকর ফলের গাছে সাজান। দোতলা বাড়ীটির তিন দিকের ঘরগুলিই উঠানের সামনে। তার বারান্দা রেলিং দিয়ে ঘেরা। বড় বড় থামের উপর খুব উঁচু ছাদওয়ালা ঠাকুর দালান, গুরুদেব বললেন—দুর্গাপুজো হোত। একটি সরু সিঁড়ি, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর বসবার ঘর পর্যন্ত পেঁাচেছে। ঘরটার বারান্দা রাস্তার ধারে। আশ্রমের সাজসজ্জা সরল ও অনাড়ম্বর। সবই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কতকগুলো বিলাতি ধরণের টেবিল চেয়ার আর বেঞ্চিও দেখা গেল।

গুরুদেব সে রাতটা আশ্রমে থেকে যেতে বললেন। দুটি তরুণ শিষ্য নিরামিষ তরকারী আর খাবার দিয়ে গেল। শিষ্য দুটি আশ্রমে থেকে শিক্ষালাভ করছে।

গুরুদেবের বাঘছালের আসনের কাছে একটা কুশাসনে বসেছিলুম। বললুম, "গুরুজী, আপনার জীবনের কথা কিছু বলুন।" মনে হচ্ছিল আকাশের তারাগুলো অতি নিকটেই নেমে এসেছে—বারান্দার অদূরেই।

গুরুদেব শুরু করলেন, "সাংসারিক জীবনে আমার নাম ছিল প্রিয়নাথ কড়ার। এই শ্রীরামপুরেই আমার জন্ম।* পিতা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এই পৈতৃক বাড়ীটি রেখে গেছেন যা এখন আমার আশ্রম হয়েছে। স্কুলের সাধারণ শিক্ষা আমার বেশীদূর এগোয়নি। আমার কাছে এ অত্যন্ত মন্থর আর অগভীর বলে মনে হতো। জীবনের গোড়ার দিকেই গৃহীর সব দায়িত্ব আমায় নিতে হয়েছিল। একটি মেয়ে আছে, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মধ্যজীবন,—লাহিড়ী মহাশয়ের আশীর্বাদপূত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি† এই নতুন নাম হল। এই হচ্ছে আমার জীবনের সরল ইতিহাস।"

আমার আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে গুরুদেব মৃদু হাসলেন। সকল জীবনালেখ্যের মত, তাঁর কথাগুলি কেবল বাইরেরই পরিচয় দিল ভিতরের আসল মানুষটি কিন্তু লুকোনই রয়ে গেল।

বললুম, "গুরুজী, আপনার ছেলেবেলাকার কথা কিছু শুনতে ইচ্ছে হয়।"

---

*শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ১৮৫৫ সালের ১০ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

† যুক্তেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। গিরি 'স্বামী' সম্প্রদায়ের পদবী।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী সতর্কীকরণের ভঙ্গিতে চোখ দুটি তুলে বললেন,—"আচ্ছা, তবে দু'চারটে ঘটনা বলি শোন। সবগুলোরই কিন্তু একটা করে নীতি আছে, তা জেনে রেখো। প্রথমটা হচ্ছে—মা একদিন একটা অন্ধকার ঘরে ভূত আছে বলে আমায় ভয়ংকর একটা ভূতের গল্প শুনিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তখনই সেই ঘরে ঢুকে ভূত না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলুম। মা এরপর আর আমায় কোনদিন ভয় দেখানর চেষ্টা করেন নি। নীতি হচ্ছে —ভয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও, অমনি সব উৎপাত থেমে যাবে।

"আর একটা ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ছে। একবার আমাদের এক প্রতিবেশীর একটা অত্যন্ত কুৎসিত কুকুর নিতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে হ'ল। সেই কুকুরটা পেতে কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি বাড়ীর লোকেদের একেবারে উত্ত্যক্ত করে তুলেছিলুম। সেটার চেয়ে দেখতে আরও বেশী সুন্দর সুন্দর কুকুর দিতে চাইলেও তা কানে তুলতুম না। এর নীতি হচ্ছে—মোহ অন্ধ, এ প্রার্থিত বস্তুটিকে ঘিরে একটা কাল্পনিক আকর্ষণের মায়াজাল সৃষ্টি করে।

"তৃতীয় গল্পটি আমার কিশোর মনের সৌকুমার্যের উদাহরণ। মাঝে মাঝে মাকে বলতে শুনতুম, 'কারুর কাছে কেউ চাকরি স্বীকার করলে সে তার ক্রীতদাসই হয়ে পড়ে।' ঐ ধারণা আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আমার বিবাহের পরেও আমি সব কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে দিয়েছিলুম। পৈতৃক ধন আমি সব জমি জমাতেই লগ্নী করে খরচপত্র চালাতুম। এই নীতি হচ্ছে—শিশুদের সরল মনে সৎ আর সুস্পষ্ট উপদেশ প্রবেশ করান উচিত। শিশু বয়সের ধারণা বহুদিন মনে দাগ কেটে বসে থাকে।"

গুরুদেব শান্ত নীরবতার মধ্যে ডুবে গেলেন। রাত একটু বেশী হলে একটি সরু খাটিয়ার উপর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। গুরুর আশ্রমে প্রথম রাত্রির নিদ্রা বেশ গাঢ় আর মধুরই হয়েছিল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তার পরদিন সকালেই আমায় 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা দেবেন বলে স্থির করলেন। পিতা এবং আমার সংস্কৃত শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দজী, লাহিড়ী মহাশয়ের এই দুই জন শিষ্যের কাছে ইতিমধ্যেই আমি ক্রিয়াযোগ প্রণালী শিক্ষা করেছিলুম। কিন্তু গুরুদেবের কাছে যেন রূপান্তর সাধিত করবার শক্তি রয়েছে অনুভব করলুম। তাঁর স্পর্শমাত্রই যেন আমার সর্বশরীরে একটা প্রচন্ড জ্যোতির প্লাবন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল। যেন কোটি সূর্য একসঙ্গে জ্বলছে। একটা অফুরন্ত আনন্দের বন্যা আমার অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত অভিভূত করে রেখেছিল। তার পরদিন বিকালের শেষে আশ্রম হতে বিদায় গ্রহণ করলুম।

কলকাতার বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করবার সময় গুরুদেব যে আমার ত্রিশ দিনের মধ্যে ফিরবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা মনে পড়ে গেল। 'উড়ন্ত পাখী'র আবার দাঁড়ে এসে বসবার টিট্‌কারি, যা আমি আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ভয় করেছিলুম, তা অবশ্য আর কেউ দেয় নি।

চিলেকোঠায় ঢুকে, যেন তিনি সশরীরে বর্তমান ভেবে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললুম, "ঠাকুর, আপনি ত সবই দেখেছেন,—আমার ধ্যানধারণা, সাধনায় বহু বাধাবিপত্তি, বুকে দারুণ ঝড়ের আবির্ভাব আর প্রবল অশ্রুপাত। আজ আমি প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় খুঁজে পেলুম।"

শান্ত-নীরব সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসেছিলুম। পিতা বললেন, "বাবা, আজ আমরা দুজনেই সুখী। আমি যেমন দৈবক্রমে আমার গুরু-খুঁজে পেয়েছিলুম, আজ তুমিও তেমনি তোমার গুরু খুঁজে পেয়েছ। লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যহস্তই আমাদের জীবন রক্ষা ক'রে চলেছে। তোমার গুরুদেব হিমালয়ের কোন দুর্লভ সাধু নন,—নিতান্তই কাছের লোক। আজ আমার প্রার্থনা সফল হয়েছে। তুমি ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে আড়াল হয়ে যাও নি।"

পিতা এও ভেবে খুশী হলেন যে, আমার নিয়মিত পাঠাভ্যাস পুনরায় শুরু হবে। তিনি তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে দিলেন। তার পরদিনই আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলুম।

সময় খুব সুখেই কাটতে লাগল। আমার পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সঠিক অনুমান করতে পেরেছেন যে, কলেজের ক্লাশে আমার অতি অল্পই দর্শন মিলত। শ্রীরামপুরের আকর্ষণ আমার কাছে দুর্নিবার। গুরুদেব আমার নিয়মিত উপস্থিতিতে কোন রকম প্রশ্ন করতেন না। পরম আশ্বাসের কথা যে, তিনি কলেজের কথা কদাচিৎ উত্থাপন করতেন। যদিও সকলে পরিষ্কার জানত যে পণ্ডিত হবার জন্যে আমি গঠিত হই নি, তবুও মাঝে মাঝে অন্ততঃ পাস মার্ক রেখে চলতুম।

আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনের ধারা প্রায়ই বৈচিত্র্যহীন, সহজ ও সরল গতিতেই বয়ে চলল। খুব ভোরেই গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত। শুয়ে শুয়েই অথবা কখনও কখনও বিছানার উপর বসেই তিনি সমাধিস্থ হতেন।*

*সমাধি—পরমানন্দময় অতীন্দ্রিয় অনুভব যাতে করে যোগী জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি করেন।

গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত কখন তা জানা অতি সহজ ছিল। তা হচ্ছে গভীর নাসা গর্জন* হঠাৎ থেমে যাওয়া। দু একবার গভীর নিশ্বাস, হয়ত বা একটু-খানি শরীরের নড়াচড়া, তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসহীন নিস্তব্ধভাব, তখন গভীর যোগানন্দে তিনি মগ্ন হতেন।

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃরাশ জুটত না। প্রথমে গঙ্গার ধারে খুব খানিকটা ঘুরে আসতুম। গুরুদেবের সঙ্গে সেই সব প্রাতর্ভ্রমণ, আজও মনে কত গভীর ও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। স্মরণমাত্রই মনে পড়ে,—তাঁর পাশে আমি, উষার অরুণকিরণ জলে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজছে—উদাত্ত, জ্ঞানগম্ভীর।

অতঃপর হত স্নান, তার পর মধ্যাহ্ন ভোজন। গুরুদেবের দৈনিক ব্যবস্থাপনার দ্বারাই আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের এসব সযত্নে তৈরী করার কাজ ছিল। গুরুদেব ছিলেন নিরামিষাশী। সন্ন্যাস নেবার আগে অবশ্য মাছ ও ডিম খেয়ে ছিলেন। কিন্তু শিষ্যদের তিনি উপদেশ দিতেন যে শরীরে যা সয়, সেই রকম সাদাসিধে জিনিষই খাওয়া উচিত।

গুরুদেব ছিলেন অল্পাহারী। আহার হত প্রায়ই ভাত, একটু হলুদ বা বীট অথবা পালমের রস দিয়ে রাঙান, তাতে একটু ভঁয়সা বা মাখন গলান ঘি। কোনদিন বা মসুর ডাল, বা একটু ছানার ডালনা আর নিরামিষ তরকারী। তারপরে আম কিম্বা কমলালেবুর সঙ্গে একটু পায়েস কিম্বা কাঁঠালের রস।

অভ্যাগতরা বিকালের দিকে আসতেন। কর্মচঞ্চল জগতের স্রোত শান্ত আশ্রমের মধ্যে নিয়তই প্রবেশ করত। গুরুদেব সকল অভ্যাগতকেই সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করতেন। যে সদ্‌গুরু নিজেকে আত্মা বলে জেনেছেন, যাঁর কাছে দেহাভিমান বা অহঙ্কার বলে কিছু নেই, সকল মানুষের মধ্যেই তিনি এক অপরূপ ঐক্য খুঁজে পান। সাধুদিগের সমদৃষ্টির মূল হচ্ছে আত্মজ্ঞানে। সদ্‌গুরুদের উপর মায়ার একান্তরধর্মী মুখসকল আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অজ্ঞানী লোকদের বিচারবুদ্ধির বিভ্রান্তিকর ভাল বা মন্দ লাগার বিষয়ে তারা আর অধীন নন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কোন রকম ক্ষমতাশালী ধনী বা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ আপ্যায়ন প্রদর্শন করতেন না। আবার যারা দীন বা মূর্খ তাদেরও কোন অবহেলা প্রদর্শন করতেন না। সত্যকথা তিনি বালকের মুখ হতেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই

*নাসাগর্জন—শরীরতত্ত্ববিদগণের মতানুযায়ী পরিপূর্ণ বিশ্রান্তির লক্ষণ।

শুনতেন আর ক্ষেত্রবিশেষে আত্মম্ভরী পণ্ডিতকেও তিনি প্রকাশ্যে অবহেলা করে চলতেন।

রাত আটটার সময় সান্ধ্যভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তাতে কখনও কখনও অপেক্ষমাণ অতিথি-অভ্যাগতগণও যোগদান করতেন। গুরুদেব কখনও একলা খেতে বসতে পারতেন না। ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত কেউ তাঁর আশ্রম হতে ফিরতে পারত না। অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমে কখনও তিনি বিব্রত বা ভীত হয়ে পড়তেন না। শিষ্যদিগের প্রতি আদিষ্ট তাঁর সদ্য উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় সামান্য উপকরণের আয়োজনই তখন রাজভোগ হয়ে দাঁড়াত। তবুও তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন আর তাঁর অল্প পুঁজিতেই অনেক কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত। তিনি প্রায়ই বলতেন, "তোমার যা আছে তাতেই গুছিয়ে চালাবে। অতিরিক্ত খরচে নানা অসুবিধা আর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় জেনো"। কি আশ্রমের উৎসবের আয়োজনের খুঁটিনাটি বিষয়ে, কি বাড়ী ঘরদুয়ার মেরামতের কাজে, কি অন্য কোন করণীয় ব্যাপারে বা কাজে, গুরুদেব সৃজনীশক্তির মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারতেন।

স্নিগ্ধসন্ধ্যার শান্ত আবেষ্টনীতে গুরুদেবের সঙ্গে বহু আলোচনাই চলত। কালের ক্রোড়ে এ একটা অক্ষয় সম্পদ্ হয়েই রয়েছে। তাঁর প্রতিটি উক্তি জ্ঞানের প্রখরতায় তীক্ষ্ণ ছিল। একটা মহান্ আত্মপ্রত্যয় তাঁর বলবার ভঙ্গীতে সুপরিস্ফুট—যা একেবারে অপূর্ব! আমার জ্ঞানে তো তাঁর মতন কথাবলা আমি আর কারুর কাছ থেকে শুনিনি। ভাষার আবরণে বাইরে প্রকাশ করার পূর্বে তাঁর চিন্তাধারাকে সদসৎ বিচারের সূক্ষ্ম মানে তা স্থির করে নিতেন। সর্বব্যাপী এমন কি জড় ও শরীরতত্ত্বের বিচারেও সকল সত্যের সার তাঁর কাছ হতে এক মহান আত্মার স্বর্গীয় সৌরভের মত পরিব্যাপ্ত হত। সর্বদাই আমার মনে হত যে, ভগবানের মূর্তপ্রকাশ আমার সামনে। তাঁর দেবত্বের গৌরবভারে আমার মস্তক আপনাআপনিই তাঁর সামনে নত হয়ে আসত।

যদি অপেক্ষমাণ অতিথিরা টের পেতেন যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়ছেন, তা বুঝে তিনি তক্ষুনি তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন। কোন চমকপ্রদ ভঙ্গি বা ভাবে মগ্ন হয়ে পড়ার বা আত্মজ্ঞানের গর্বপ্রকাশ তাঁর আদৌ ছিল না। সর্বদাই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন বলে, ধ্যানধারণার কোন বিশেষ সময় তাঁর ছিল না। ঈশ্বরোপলব্ধি যাঁর হয়েছে সেই সদ্‌গুরু ধ্যানাভ্যাসের প্রাথমিক সোপান পূর্বেই অতিক্রম করেছেন। বলতেন, "ফল হলে ফুল আপনিই খসে পড়ে।" সাধারণতঃ সাধুসন্তরা কিন্তু শিষ্যদিগের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সাধনভজনের বাহ্য অনুষ্ঠানাদিতে লিপ্ত থাকেন।

রাত গভীর হয়ে এলে গুরুজী শিশুর মতই স্বাভাবিকভাবে ঢুলতে শুরু করতেন। বিছানাপত্র করার বিশেষ কোন হাঙ্গামা ছিল না। প্রায়ই তিনি একটা কৌচের উপর, এমন কি বিনা বালিশেই শুয়ে পড়তেন, তার উপর তাঁর সেই সর্বদা ব্যবহার্য বাঘছালের আসনটি কেবল বিস্তৃত থাকত। সারারাত ধরে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা দুর্লভ ছিল না,—কোন শিষ্য একটু গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেই তা শুরু হয়ে যেত। আমার তখন কোন প্রকার ক্লান্তি বা ঘুমাবার ইচ্ছাও আসত না। গুরুদেবের প্রাণবন্ত বাণীই ছিল যথেষ্ট। সারারাত আলোচনা চলবার পর কখন হয়তো হঠাৎ বলে উঠতেন, "ওঃ, ভোর হয়ে গেছে হে! চল এবার গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।" আমার বহু জ্ঞানানুশীলনের রাত্রির এইভাবে অবসান হয়েছে।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে থাকবার সময় গোড়ার দিকে আমার একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ হয়,—"কি করে মশার হাত এড়ান যায়।" বাড়ীতে সকলেই রাত্রিতে সর্বদা মশারি ব্যবহার করত। শ্রীরামপুর আশ্রমে এসে সভয়ে আবিষ্কার করলুম যে, এই সুবিবেচিত প্রথাটি পালন করা অপেক্ষা লঙ্ঘনই বেশী করা হয়। আমি তো সেখানে প্রবল পরাক্রান্ত মশকবাহিনী কর্তৃক আপাদমস্তক আক্রান্ত হয়ে ভীত ও জর্জরিত হয়ে পড়লুম। গুরুজীর দেখে দয়া হল।

হেসে বললেন "তোমার জন্যে একটা মশারি কিনে এনো, আর আমার জন্যেও একটা,—কারণ তোমার নিজের জন্যে মাত্র একটা কিনলে, মশাগুলো সব আমাকেই এসে ছেঁকে ধরবে!"

অতিশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে আজ্ঞাপালনে তৎপর হলুম। শ্রীরামপুরে থাকলে প্রতিরাত্রিতেই গুরুদেব আমায় মশারি টাঙিয়ে দিতে বলতেন।

একদিন রাত্রিবেলায় মশকদল 'ত প্রচন্ড বিক্রমে আক্রমণ শুরু করলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে রাত্রিতে গুরুদেব আমায় অভ্যস্ত নির্দেশ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভীতকম্পিত হৃদয়ে তাদের আবির্ভাবসূচক গুন্ গুন্ শব্দ শুনতে লাগলুম। বিছানায় প্রবেশ করে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার প্রতি প্রসন্ন হবার জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলুম। কিন্তু কেবা শোনে কার কথা! আধ ঘন্টাটাক বাদে আর উপায়ন্তর না দেখে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে একবার কাশবার ভাণ করলুম। মনে হল কামড়ের চোটে, বিশেষতঃ এই রকম "রক্তলোলুপ" আক্রমণ চালাবার সময়, তাদের গুন্‌গুনানিতে আমি তখন পাগলই বা হয়ে যাব।

গুরুদেবের কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই বা কোনও নড়নচড়নও নেই। অতি

সন্তর্পণে তাঁর কাছে এগোলুম। এখন তাঁর আর কোন নিঃশ্বাসই পড়ছে না। যোগনিদ্রাভিভূত অবস্থায় তাঁকে আমার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এই প্রথম। দেখে কিন্তু আমি মনে বড় ভয় পেয়ে গেলুম, ভাবলুম, "তাঁর নিশ্চয়ই হার্ট ফেল হয়েছে।" নাকের নীচে একটি আরশি ধরলুম,—নিঃশ্বাসের কোন বাষ্প তাতে লাগল না। আরও সুনিশ্চিত হবার জন্যে মিনিট কতক ধরে তাঁর মুখ-বিবর আর নাসারন্ধ্র আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে চেপে ধরে রইলুম। শরীর তাঁর একদম ঠাণ্ডা আর অসাড়! হতভম্ব হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললুম,—সাহায্য পাবার জন্যে কাউকে ডাকতে।

"ও হরি! পরীক্ষা করে দেখছিলে বুঝি? হায়রে, বেচারী আমার নাক!" গুরুজীর কণ্ঠস্বর হাস্যোচ্ছল। বললেন, "যাও, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়গে। আরে, তোমার জন্যে সারা দুনিয়াটা বদলে যাবে না কি? তুমি আগে নিজেকে বদলাও, মশার কামড়ের ভাবনা একেবারে ছাড়; বুঝলে?"

অত্যন্ত নিরীহভাবে বিছানায় ফিরে গেলুম। এবার আর একটা মশাও কাছে ঘেঁসল না! বুঝলুম, গুরুজী যে এর আগে আমায় মশারি আনতে বলেছিলেন তা কেবল আমার মনস্তুষ্টির জন্য,—তাঁর নিজের কোন মশার ভয় ছিল না। তাঁর যোগবল এতদূর ছিল যে, হয় তিনি তাদের দংশন নিবারণ করতে পারতেন, আর না হয় ইচ্ছামত দংশনযন্ত্রণা প্রতিরোধক অবস্থায় প্রবেশ করতে পারতেন।

ভাবলুম, "উনি বোধ হয় যোগবল প্রদর্শন করছেন। ঐরকম যোগাবস্থা তাহলে আমারও লাভ করতে হবে।" প্রকৃত যোগী জগতে সদা বর্তমান বহুবিধ চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয়সমূহ অতিক্রম ক'রে—তা সে কীট-পতঙ্গের বিরক্তিকর গুঞ্জনধ্বনিই হোক বা দিবালোকের প্রচণ্ড দীপ্তিই হোক—অতীন্দ্রিয় অবস্থা লাভ ক'রে সেখানে অবস্থান করতে পারেন। সমাধির প্রথম অবস্থায় (সবিকল্প) সাধক বহির্জগতের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বোধ অবরুদ্ধ করেন। তার পর তার পুরস্কার আসে শব্দ ও দৃশ্যাদির আবির্ভাবে অন্তররাজ্য হতে—যে স্থান আদিস্বর্গ ইডেন হতেও অধিকতর মনোরম।*

আশ্রমের প্রাথমিক শিক্ষালাভের মধ্যে হচ্ছে আর একটি, যা ঐ মশককুলের

---

*যোগীর সর্বব্যাপী শক্তি যাতে করে তিনি বাইরের কর্মেন্দ্রিয় ব্যতীতই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দাদির জ্ঞানলাভ করতে পারেন, তা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে:—"অন্ধটি মুক্তায় ছিদ্র করলে, অঙ্গুলিহীন তাতে সুতা পরালে, গলহীন সেটা গলায় পরলে আর জিহবাহীন তা প্রশংসা করল।"

কাছ থেকেই লাভ করেছি। শান্ত গোধূলি। গুরুদেব প্রাচীনশাস্ত্রের অনুপম ব্যাখ্যায় রত। তাঁর চরণতলে আমি পরিপূর্ণ শান্তিতে উপবিষ্ট। একটা দুষ্ট মশা এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করলে। উরুর উপর তার সূক্ষ্ম বিষাক্ত হুল প্রবেশ করাতেই মারবার জন্যে আমি হাত ওঠালুম। ভাগ্য কিন্তু তার ভাল। সদ্য প্রাণদণ্ড হতে তার অব্যাহতি লাভ হল, কারণ ঠিক সময়মত পতঞ্জলির একটি যোগাঙ্গের বিষয় মনে পড়ে গেল—তা হচ্ছে অহিংসা।*

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, শেষ করে ফেললে না যে ?"

বললুম, "না গুরুদেব, আপনি কি প্রাণিহিংসা করতে বলেন ?"

তিনি বললেন, "বলি না বটে, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে তার আক্রমণ তো এসে গিয়েছিল।"

"ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার মনের কথা যেন একটা খোলা বইয়ের পাতার মত পড়ে নিয়ে বললেন, "পতঞ্জলির মতে অহিংসা হল প্রাণবধের 'ইচ্ছা' পর্যন্ত ত্যাগ। পৃথিবীতে অহিংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অসুবিধা অনেক। মানুষ অবশ্য হিংস্র প্রাণিদের বিনাশ সাধন করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু সে ক্রোধ বা দ্বেষ পোষণ করতে অনুরূপ ভাবে বাধ্য নয়। জীবনের বিভিন্নরূপে একই মায়ার অভিব্যক্তি। যে সাধুব্যক্তি সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে সমর্থ, তিনি প্রকৃতির সংখ্যাতীত বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে একাত্মীভূত। অন্তরে প্রাণিহিংসা দমন করতে পারলে, সকল লোকই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে।"

"গুরুজী, তাহলে কি হিংস্র প্রাণী বধ না করে তার মুখে নিজেকে বলি দিতে হবে ?"

"না ; মানুষের দেহ অমূল্য,—কারণ এর মধ্যে অপূর্ব মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের চক্রগুলি থাকায় এর বিবর্তনের সুযোগ সব চেয়ে বেশী। এর দ্বারা যাঁরা সাধনপথে বহুদূরে অগ্রসর হয়েছেন, সেই যোগীরা ঈশ্বরতত্ত্বের উচ্চতম অবস্থা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, আর তা প্রকাশও করতে পারেন। নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর ত' এ ব্যবস্থা নেই। অবিশ্যি একথা সত্যি যে, কেউ যদি কোন পশু বা প্রাণী হত্যা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ছোট খাট পাপের ভাগী হতে হয়। কিন্তু সৎ শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে মনুষ্য শরীরের স্বেচ্ছাকৃত নাশ হচ্ছে কর্মবিধির গুরুতর লঙ্ঘন।"

*অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ৩৫। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তৎসন্নিধিতে সর্ব্বপ্রাণী নির্বৈর হয়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শাস্ত্রমতের অনুমোদন সব সময় পাওয়া যায় না।

যতদূর জানি, গুরুদেবকে বাঘ বা চিতাবাঘের সামনাসামনি হতে কখনও হয়নি। এক কৃতান্তসদৃশ কেউটে তাঁর সামনে পড়েছিল বটে, কিন্তু সেও তাঁর অহিংসার বলে একেবারে বশীভূত হয়ে পড়েছিল।

এই মোলাকাতের ঘটনাটি ঘটেছিল পুরীতে। সেখানে সমুদ্রের ধারে গুরুদেবের আর একটি আশ্রম আছে। জায়গাটি অতি মনোরম, বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শেষের দিকে প্রফুল্ল নামে একটি তরুণ শিষ্য সেই ঘটনার সময় গুরুজীর কাছে উপস্থিত ছিল।

প্রফুল্ল আমায় বলেছিল ঃ "সে দিন আশ্রমের বাইরে এক জায়গায় আমরা বসে আছি। কাছেই একটা কেউটে সাপ বেরুল, চারফুট লম্বা—সাক্ষাৎ যম! রাগের চোটে ফণা তুলে সেটা তীরের মত আমাদের দিকে ছুটে এল। গুরুদেব মৃদু মৃদু, হাসলেন। যেন একটি ছোট ছেলেকে আদর করে ডাকছেন। তার ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে হাততালি* দিতে দেখে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম। মূর্তিমান যমের সঙ্গে তাঁর খেলা! দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে একেবারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে মনে সভয়ে ইষ্টনাম জপ করছি—সাপটা তখন গুরুদেবের একেবারে সামনে, কোন নড়ন চড়ন নেই। তাকে নিয়ে তাঁর খেলানর ভাব দেখে মনে হল যেন সাপটা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ! সেই ভীষণ ফণা ক্রমশঃ গুটিয়ে গেল,—আর সাপটা গুরুদেবের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে ঝোপের ভিতর ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল।"

প্রফুল্ল বললে,—"গুরুদেব কেনই বা হাততালি দিলেন, আর সাপটাই বা তাঁকে কামড়াল না কেন, তা তখন বুঝতে পারি নি। তারপর বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমাদের গুরুদেবতার কোনও প্রাণীর কাছ থেকে কোন রকম হিংসা বা আঘাতের আশঙ্কা ছিল না।"

আশ্রমে থাকার সময় গোড়ার দিকে একদিন বিকালবেলা দেখি যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। বললেন, "মুকুন্দ, তুমি ত' ভয়ানক রোগা!" তাঁর কথাগুলো মনের খুব কোমল স্থানে আঘাত করল। কোটরগত চক্ষু আর ক্ষীণ দেহের জন্য আমার

*নাগালের মধ্যে পেলে কেউটে সাপ যে কোন চলন্ত জিনিষের উপর বিদ্যুদ্বেগে ছোবল মারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণস্থির বা একেবারে নিশ্চল অবস্থাই নিরাপত্তার একমাত্র আশা।

মনের গহনে গভীর দুঃখ লুকান ছিল। পুরাতন অজীর্ণ রোগ আমায় ছেলেবেলা থেকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে। গড়পার রোডের বাড়ীতে আমার ঘরের তাকে সাজান থাকত সারি সারি টনিকের শিশি,—কেউই কিছু সাহায্য করে নি। মাঝে মাঝে নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতুম যে এমন একটা ভগ্নস্বাস্থ্য শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি না!

"ওষুধপত্রের আরোগ্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু দৈব সঞ্জীবনী প্রাণশক্তির তা অসীম। এইটে বিশ্বাস কোরো; তুমি তাতেই সেরে যাবে আর শরীরও শক্ত হবে।"

গুরুদেবের কথায় সদ্য সদ্য বিশ্বাস জন্মাল যে, আমি তাদের সত্য আমার নিজের জীবনেই সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারি। আর কোনও আরোগ্যকারী (যদিও আমি অনেককেই দেখিয়েছি) আমার মনে এ রকম গভীর বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন নি।

দিন দিন, আমার স্বাস্থ্য আর শক্তি বৃদ্ধি হতে লাগল। গুরুদেবের মৌন আশীর্বাদের পরে দেখি যে, সপ্তাহ দু-এর মধ্যে শরীরের ওজন যা বেড়ে গেছে আর বলও যা পেয়েছি তা অতীতে আমি বৃথাই খুঁজে মরেছি। আমার পেটের গোলমাল স্থায়ীভাবে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

পরে বহু উপলক্ষ্যে বহুলোকের বহুমূত্র, মৃগী, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বহু সাংঘাতিক রোগের হাত থেকে গুরুদেবের দৈবশক্তিতে আরাম করে দেওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছিলুম।

আমাকে সারিয়ে তোলবার অল্প কয়েকদিন পরেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "বহুদিন আগে আমারও ওজন বাড়াবার খুব আগ্রহ ছিল। একবার এক ভারি অসুখ থেকে ওঠবার পর, কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

"বললুম, গুরুদেব দারুণ অসুখে পড়েছিলুম, আর ওজনে ভয়ানক কমে গিয়েছি।'

"তিনি বললেন, 'তাইত' দেখছি যুক্তেশ্বর*—তুমি ত নিজেই নিজের রোগ ডেকে এনেছ, আর এখন ভাবছ তুমি বড্ডই রোগা!'

*লাহিড়ী মহাশয় প্রকৃতপক্ষে সম্বোধন করেছিলেন, "প্রিয়" (গুরুজীর সাংসারিক নাম ধরে) যুক্তেশ্বর নয় (লাহিড়ীমহাশয়ের জীবদ্দশায় আমার গুরুদেব কর্তৃক তাঁর সন্ন্যাস জীবনের এই নাম গৃহীত হয় নি।) এই পুস্তকের এস্থলে এবং অপর কয়েক স্থানেও "প্রিয়" নামের জায়গায় "যুক্তেশ্বর" এই নাম বসান হয়েছে—কারণ দুটি নামে পাঠকের মনে কোন গোলমাল উপস্থিত হবে না বলে।

"যা' আশা করেছিলুম, তা থেকে দেখ্‌ছি যে এ উত্তরটা সম্পূর্ণ বিপরীত; যাই হোক্, গুরুদেব আমায় একটু আশা দিয়ে বললেন, 'দেখি কি হয়,—আচ্ছা যাক্, কাল থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটু একটু করে ভাল হতে থাক্‌বে।'

"আমার আগ্রহাকুল মনে তাঁর কথাগুলি আমাকে তাঁর গোপনে নিরাময় করবার একটা ইঙ্গিত বলেই বোধ হল। তার পরদিন সকালেই গুরুদেবের কাছে গিয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললুম,—"আজকে বেশ ভালই বোধ করছি গুরুদেব।'

'সত্যি নাকি? তাহলে দেখছি যে আজকে তুমি নিজে থেকেই জোর পেয়েছ।'

"সবিনয় প্রতিবাদে বললুম, 'না গুরুদেব! এ আপনারই দয়াতে। এই ক' সপ্তাহের মধ্যে দেখছি যে আজকেই যা একটু বল পেলুম।"

" 'হ্যাঁ, তা বটে! অসুখ অবিশ্যি তোমার খুব গুরুতরই হয়েছিল, শরীর তোমার এখনও দুর্বল—তা কাল কি রকম থাক তা কে বল্‌তে পারে?

"আবার দুর্বলতা ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে, আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। তার পরদিন ব্যাপার দাঁড়াল একেবারে বিপরীত! অতি কষ্টে নিজেকে তো কোনক্রমে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে লাহিড়ী মশায়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম।

" প্রভু, আবার ত রোগে ভুগছি!' "

"গুরুদেবের দৃষ্টি রহস্যময়। বললেন, 'তা হলে ফের তুমি নিজে নিজেই অসুখ বাধালে দেখছি!' ধৈর্য্য আমার নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল; বলে ফেললুম, "গুরুদেব, এখন দেখছি রোজ রোজ আপনি আমায় উপহাসই করে আসছেন। আমার সত্যিকারের খবরগুলো আপনি কেন যে বিশ্বাস করেন না, তা তো বুঝতে পারি না।'

"গুরুদেব সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসল ব্যাপার কি জান? তোমার চিন্তাই তোমায় একবার সবল আর একবার দুর্বল করে দিচ্ছে। তুমি ত দেখেছ যে, তোমার স্বাস্থ্য কেমন ঠিক তোমার অবচেতন মনের আশানুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিন্তাও হচ্ছে ঠিক বিদ্যুৎ অথবা মাধ্যাকর্ষণেরই মত একটা শক্তি। মানুষের মন হচ্ছে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরচৈতন্যের একটা স্ফুলিঙ্গ। আমি তোমায় দেখাতে পারি যে, তোমার শক্তিশালী মন যা কিছু গভীরভাবে বিশ্বাস করবে, তাই সদ্য সদ্য ঘটে যাবে।'

"লাহিড়ী মহাশয় যে বৃথা কিছু বলেন না, তা' জেনে আমি সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে বললুম, 'গুরুদেব, আচ্ছা ধরুন, আমি যদি চিন্তা করি যে

আমি বেশ ভাল আছি আর আগেকার মত গায়ে বেশ বল পেয়েছি, তা হলে কি ঐ সব ব্যাপারগুলো ঘটবে ?'

"গুরুদেব আমার চোখের উপর দৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই তাই-ই হবে, এই মুহূর্তেই।'

"আশ্চর্য ! সঙ্গে সঙ্গে বোধ করলুম, শরীরের শুধু যে কেবল বল বাড়ল তা নয়, ওজনও বেড়ে গেল ! লাহিড়ী মহাশয় মৌন অবলম্বন করে রইলেন। কয়েক ঘণ্টা তাঁর চরণপ্রান্তে অতিবাহিত করবার পর আমি মায়ের কাছে ফিরে এলুম। কাশীতে গেলে আমি সেখানেই থাকতুম।

"মা আমায় দেখে বললেন, 'বাছা ! এ তোমার হল কি ? এ্যাঁ, শোথে ফুলে উঠেছ না কি ?' মা ত' তাঁর চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ! শরীর এখন আমার অসুখের আগে যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান ছিল, ঠিক তেমনটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে !

"শরীরের ওজন নিয়ে দেখা গেল যে, একদিনেই পঞ্চাশ পাউণ্ড বেড়ে গেছি। সেটা কিন্তু বরাবরই রয়ে গেল। পরিচিতের দল আর বন্ধুরা, যারা সব আমার রোগা শরীর দেখেছিল তারাও বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের জীবনের ধারা বদলে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

আমার ব্রহ্মজ্ঞ গুরুদেব জেনেছিলেন যে, এ জগৎটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের বাস্তবরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই দৈব স্বপ্নবিলাসীর সঙ্গে একাত্মবোধের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের স্বপ্ন-কণার মধ্যে রূপদান কিম্বা তার বিলোপসাধন অথবা ইচ্ছামত যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে পারতেন।*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "সৃষ্টিমাত্রই বিধিনিয়মের অধীন। বাহির্বিশ্বে যে সকল বিধি ক্রিয়াশীল, বিজ্ঞানীদের যা আবিষ্কারের বিষয়, তা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পরিচিত। কিন্তু আরও সব সূক্ষ্মতর বিধি আছে যা গুহ্য আধ্যাত্মিক স্তর আর জ্ঞানরাজ্যের গভীরতর প্রদেশ সকল নিয়ন্ত্রিত করে। এই সব নীতি যোগবিজ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞাতব্য। পদার্থবিদ্ বা জড়বিজ্ঞানী

---

* "যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।"—মার্ক ১১ : ২৪ (বাইবেল)।

ঈশ্বর প্রণিহিত সদ্গুরুগণ তাঁদের ঐশী উপলব্ধি উন্নত শিষ্যদের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারতেন, যেমন লাহিড়ী মহাশয় বর্তমান উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জন্য করেছিলেন।

নয়, পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, সেই সদ্‌গুরুই জড়ের সত্যকারের প্রকৃতি জানতে পারেন। এইরূপ জ্ঞানের বলেই যীশুখ্রীষ্ট তাঁর এক শিষ্য কর্তৃক এক ভৃত্যের কর্তিত কর্ণ পুনঃসংযোজিত করে দিতে পেরেছিলেন।*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা ছিল অনুপম। আমার বহু সুখস্মৃতি তাঁর এই সব শাস্ত্র ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত। তাঁর ভাবরত্নগুলি অমনোযোগিতা বা নির্বুদ্ধিতার ভস্মে ছড়ান হত না। আমার শরীরের সামান্যমাত্র অস্থির অঙ্গসঞ্চালন অথবা আমার বিন্দুমাত্র অমনোযোগ দেখতে পেলেই গুরুদেবের শাস্ত্রব্যাখ্যা হঠাৎ থেমে যেত।

একদিন বিকালবেলা যথারীতি শাস্ত্রালোচনা চলছে, মাঝখানে হঠাৎ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলে বসলেন, "তোমার মন কিন্তু এখানে নাই।" কারণ, যথাপূর্ব তিনি কিন্তু আমার মনের গতি অবিরাম অনুসরণ করে চলেছিলেন। তবুও প্রতিবাদের সুরে বললুম, "গুরুজী! আমি ত বিন্দুমাত্র নড়িনি, বা আমার চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপেনি। আপনি যা বলেছেন তার প্রত্যেক কথাটি আমি পুনরায় আবৃত্তি করতে পারি।"

"তা হলেও তোমার মন কিন্তু সম্পূর্ণ আমার কথায় ছিল না। তোমার প্রতিবাদে আমি বলতে বাধ্য হলুম যে, তোমার মনের পটভূমিকায় তুমি তিনটি প্রতিষ্ঠানের চিন্তার সৃষ্টি করছিলে। একটি হচ্ছে সমতল ভূমির উপর তপোবনের মত, একটি পাহাড়ের মাথায়, আর একটি হচ্ছে সমুদ্রের ধারে।"

ঐ সব অস্পষ্ট ভাবে গড়া চিন্তাগুলো সত্যিই তখন আমার নির্জ্ঞান মনে বর্তমান ছিল। ক্ষমাপ্রার্থীর চক্ষে স্বীকৃতিসূচক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালুম। মনে মনে ভাবলুম,—"তাইত, এমন গুরু নিয়ে চলি কি করে, যিনি আমার বিশৃঙ্খল চিন্তারাশির মধ্যেও প্রবেশ করতে পারেন।"

গুরুজী বললেন, "তুমিই তো আমায় সে অধিকার দিয়েছ। যে সূক্ষ্মতত্ত্ব আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, তা তোমার পরিপূর্ণ মনোযোগ না হলে ধারণাই করতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমি কখনও অপরের মনের গহনে প্রবেশ করি না। মানুষের অবশ্য নিজ মনের চিন্তার ভিতরে গোপনে বিচরণ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে। কিন্তু জান কি যে, ভগবানকে না ডাকলে, তিনিও সেখানে প্রবেশ করেন না? আর আমারও সেখানে অনধিকার প্রবেশের সাহস হয় না।"

---

* "আর তাঁহাদের মধ্যে একব্যক্তি মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হও; পরে তিনি তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন।" —লূক ২২ঃ ৫০-৫১ (বাইবেল)।

"গুরুদেব আপনার ত' সেখানে অবারিতদ্বার, আপনি সেখানে সর্বদাই স্বাগত !"

"যাক, তোমার বাড়ী ঘরদুয়োরের স্বপ্ন সব পরে সফল হবে ! এখন তোমার পড়ার সময় ।"

এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে গুরুদেব আমার জীবনের তিনটি ভবিষ্যৎ প্রধান ঘটনার বিষয় তাঁর নিতান্ত সহজভাবে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। প্রথম যৌবন হতেই তিনটি বাড়ীর রহস্যময় ক্ষীণ আভাস আমার মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তিনটিই বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই পর পর এই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। প্রথমে হ'ল রাঁচির সমতলভূমিতে বালকদের জন্য যোগবিদ্যালয় স্থাপন। তারপর হচ্ছে, লস্ এঞ্জেলেসের পাহাড়ের মাথায় আমেরিকান হেড কোয়ার্টার্স, আর সব শেষ হচ্ছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরে ক্যালিফোর্ণিয়ার এন্‌সিনিটাসে আশ্রম রচনা।

গুরুদেব কখনও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে বলতেন না যে, "আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছি যে এ রকম ঘটনা ঘটবেই !" বরং ইঙ্গিতে বলতেন যে, "তোমার কি মনে হয় না যে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে ?" কিন্তু তাঁর সরল উক্তির ভিতর যেন বৈদ্যুতিক শক্তি লুকান থাকত। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য কখনও ভুল বলে প্রত্যাহৃত হ'ত না ; ঈষৎ রহস্যাচ্ছাদিত হলেও তাঁর কথা কিন্তু কখনও মিথ্যা হ'ত না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রশান্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি এবং আচরণেও খুব খাঁটি ছিলেন। তাঁর কোন কিছুতে অস্পষ্টভাব বা স্বপ্নালুতা ছিল না। মৃত্তিকার উপর তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ়, মস্তক যেন স্বর্গের আশ্রয়ে উন্নত। করিতকর্মা লোকদের তিনি প্রশংসাই করতেন। বলতেন, "সাধুগিরি মানে এ নয় যে, বোবা হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরানুভূতি হলেই অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হয় না। সদ্‌গুণাবলীর প্রত্যক্ষ প্রকাশেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিকাশ হয়।"

গুরুদেব জড়াতীত রাজ্যের বিষয় আলোচনায় অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর একমাত্র "অলৌকিক" গৌরবচ্ছটা ছিল তাঁর পরিপূর্ণ সরলতা। কথাবার্তায় চিত্তচমকপ্রদ ব্যাপারের উল্লেখ তিনি একেবারে পরিহার করে চলতেন। কাজে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট ছিলেন। অন্যান্য গুরুরা হয়ত নানা অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ করতেন, কিন্তু কাজে কিছুই দেখাতে পারতেন না। সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম সমূহের উল্লেখ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কদাচিৎ করতেন, আর তা ইচ্ছা-মাত্র সব গোপনেই সাধিত করতেন।

গুরুদেব বোঝালেন, "আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, তিনি অলৌকিক কোন কিছু দেখান না—যতক্ষণ না মনের ভিতর থেকে কোন সায় পান। ভগবান তাঁর সৃষ্টিরহস্য যত্রতত্র প্রকাশ করা ইচ্ছা করেন না।* আর তা ছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই ত' তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি সেই স্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বাভাবিক মৌনভাব তাঁর গভীর ঈশ্বরানুভাবেরই ফল। আত্মোপলব্ধিহীন গুরুদের অন্তহীন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন,—যা তাদের প্রধান অবলম্বন, তা দেখাবার মত তাঁর সময় ছিল না। হিন্দুদের একটি লৌকিক উক্তি হচ্ছে, "অগভীর মনের জলে অল্প বিদ্যার শফরী খুবই ফরফরায়। কিন্তু মহাসাগরের মত মনের অতল গভীরতায় তিমির মত বিরাট অনুভবও কদাচিৎ কম্পন জাগায়!"

আমার গুরুদেবের নিতান্ত সরল আর অনাড়ম্বর চালচলনের জন্য তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁকে অতিমানব বলে চিনতে পেরেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, "যে তার জ্ঞানের বিষয় লুকোতে পারে না, সে একেবারেই মূর্খ।" এ কথা কিন্তু আমার পরম জ্ঞানী আর অতি প্রশান্ত গুরুদেব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে না।

আর সকল মরণশীল লোকের মধ্যে জন্মালেও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যেন দেশ আর কালের অধিপতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষের দেবত্বে উপনীত হবার পথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা গুরুদেব কখনো দেখতে পান নি। আমি পরে জানতে পেরেছিলুম যে, আধ্যাত্মিক প্রেরণার বা উৎসাহের অভাব ছাড়া বাস্তবিকই এতে আর কোন বাধা নাই।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যপাদস্পর্শে সর্বদাই আমার এক অপূর্ব পুলক-শিহরণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। গুরুর সহিত ভক্তিপূতস্পর্শে শিষ্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন; তাঁর সর্বশরীরে একটা সূক্ষ্ম তড়িৎ-প্রবাহ জন্মায়। ভক্তের মস্তিষ্কে অনভীপ্সিত অভ্যাসের যন্ত্রগুলি যেন প্রায়ই আগুনে পুড়ে গিয়ে পবিত্র অগ্নিশুদ্ধ হয়ে যায় আর সাংসারিক প্রবৃত্তির যে সব বিচিত্র রেখা থাকে, তখন তাদের কল্যাণকর পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্ততঃ সাময়িকভাবেও সে দেখতে পায় যে, মায়ার আবরণ অপসারিত হয়ে যাচ্ছে আর

---

*পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায় এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে।" ম্যাথিউ—৭ : ৬ (বাইবেল)।

পরমানন্দের আভাস সে পাচ্ছে। গুরুদেবের চরণতলে যখনই গিয়ে নতজানু হয়ে পড়তুম তখনই মনে হত যে, আমার সর্বশরীর যেন মুক্তির জ্যোতিঃধারায় স্নান করে উঠে এক অপূর্ব উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গুরুদেব আমায় বলেছিলেন, "লাহিড়ী মহাশয় যখন একেবারে চুপ করে থাকতেন অথবা খাঁটি ধর্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য বিষয়েও কথাবার্তা কইতেন, তখনও দেখতুম যে, তিনি আমার মধ্যে এক অনির্বচনীয় জ্ঞানের সঞ্চার করতেন।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার উপরেও ঐরূপ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর আশ্রমে যদি আমি কোন রকম বিব্রত অথবা চিন্তাকুল মনে প্রবেশ করতুম, আমার মনের ভাব আমার অজ্ঞাতে কখন যে বদলে যেত, তা টেরই পেতুম না। গুরুদেবের দর্শনমাত্রই মনের উপর একটি আরামদায়ক শান্তির প্রলেপ এসে লাগত। তাঁর সঙ্গে থেকে প্রতিদিনই নব নব জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতুম। তাঁকে আমি কখনও বিভ্রান্ত, অথবা লোভ, ক্রোধ কিংবা কোন আসক্তির ভাবাবেগে উত্তেজিত হতে দেখি নি।

"মায়ার অন্ধকার নীরবে ঘনিয়ে আসছে, চল এবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা যাক্।" এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি শিষ্যদিগকে, তাদের ক্রিয়াযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে কোন নতুন শিষ্য যোগাভ্যাসে তার নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, "অতীতের কথা একদম ভুলে যাও। সব লোকেরই অতীতজীবন কোন না কোন লজ্জা বা গ্লানিতে অন্ধকার হয়ে আছে। মানুষের প্রকৃতি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ভগবানে দৃঢ়মূল হয়। তুমি যদি এখন থেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা শুরু কর, তাহলে ভবিষ্যতে তোমার সর্ববিষয়েই উন্নতিলাভ হবে, তা জেনে রেখো।"

আশ্রমে সব সময়েই গুরুদেবের ছোট ছোট চেলারা থাকত। তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা আর মানসিক উন্নতির বিষয়ে তাঁর জীবনব্যাপী আগ্রহ ছিল। এমন কি তাঁর তিরোভাবের অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি দুটি ছ বছরের আর একটি ষোল বছরের ছেলেকে শিক্ষাদানের জন্য আশ্রমে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধীনে যাঁরা থাকতেন তাঁদের সযত্নে শিক্ষা দিতেন। "শিষ্য" ও "শাসন" এ দুটি কথা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে এবং সক্রিয়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। আশ্রমবাসীরা তাঁদের গুরুদেবকে ভালবাসতেন আর আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। একটু মৃদু হাততালির শব্দেই তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে গুরুর সামনে এসে দাঁড়াতেন, সাগ্রহে আজ্ঞা পালন করতে। মন যখন তাঁর গম্ভীর বা

চিন্তামগ্ন থাকত, তখন কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে চেষ্টা বা সাহস করত না ; আর যখন কোন কারণে আনন্দে উল্লসিত হয়ে তিনি হেসে উঠতেন, নিতান্ত শিশুর দলও তখন তাঁকে তাদের একান্ত আপনার জন ভেবে নির্ভয়ে এগিয়ে এসে সে আনন্দে যোগদান করত।

গুরুদেব কদাচিৎ কাউকে তাঁর ব্যক্তিগত কোন কাজ করে দেবার জন্য অনুরোধ করতেন ; কোন চেলার কাছ থেকে কোন সাহায্যই নিতেন না, যদি না সেটা আন্তরিক বা সানন্দে করা হত। শিষ্যরা যদি কখনও তাদের কোন বিশেষ কাজ, যেমন গুরুদেবের বস্ত্রধৌত করা প্রভৃতির কথা ভুলে যেত, তাহলে তিনি নিজহাতেই সে সব নীরবে সম্পন্ন করে নিতেন। তাঁর সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল সন্ন্যাসীদের সেই চিরন্তন গেরুয়া বসন। বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য যোগিদের প্রথানুযায়ী তিনি বাঘের বা হরিণের চামড়ার তৈয়ারী ফিতাবিহীন জুতাই ব্যবহার করতেন।

গুরুদেব দ্রুত ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা ও হিন্দী বলতে পারতেন। সংস্কৃতেও তাঁর বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরেজী আর সংস্কৃতে তাঁর নিজ উদ্ভাবিত কতকগুলি সরল পদ্ধতিতে তিনি তাঁর তরুণ শিষ্যদিগকে ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিতেন।

দেহের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকলেও শরীর সম্বন্ধে তিনি সতর্ক থাকতেন। তিনি বলতেন,—ভগবানের সুষ্ঠু প্রকাশ শারীরিক আর মানসিক সুস্থতার ভিতর দিয়েই হয়। কোন কিছুর আতিশয্য তিনি পছন্দ করতেন না। একবার এক শিষ্য খুব লম্বা এক উপবাস শুরু করেছিল। তাই না দেখে গুরুদেব হেসে বললেন, "আহা, ওটাকে একমুঠো কেউ খেতে দাও না কেন ?"*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বাস্থ্য খুব চমৎকার ছিল। আমি তাঁকে কখনও অসুস্থ হতে দেখি নি।† সাংসারিক প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য তিনি শিষ্যদের অনুমতি দিতেন, ইচ্ছা করলে, ডাক্তার ডাকতে। তিনি বলতেন, "চিকিৎসকদের রোগ নিরাময়করণ ব্যাপারে জড়ে আরোপিত ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলা উচিত।" কিন্তু তিনি মানসিক শক্তির সাহায্যে রোগ সারানর

---

*উপবাসকে গুরুদেব আদর্শ স্বাভাবিক দেহশুদ্ধিপ্রণালী বলেই অনুমোদন করতেন। কিন্তু ঐ শিষ্যবিশেষটি তাঁর শরীর নিয়ে অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

†কাশ্মীরে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় আমি তাঁর কাছে ছিলুম না। (২১শ পরিচ্ছেদের শেষ দ্রষ্টব্য)।

চেষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করতেন, আর প্রায়ই বলতেন,—"জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিকারক।"

চেলাদের বলেছিলেন, "শরীরটা কি জান? ও হচ্ছে তোমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকুই তাকে দেবে, তার একটুও বেশী নয়। সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী। সব দ্বৈতভাব ধীরভাবে সহ্য করে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রভাব এড়াবার চেষ্টা করবে। কল্পনার দুয়ার দিয়েই রোগ আর তার নিরাময়—এ দুই-ই প্রবেশ করে। অসুস্থ হয়ে পড়লেও বিশ্বাস কোরো না যে তোমার কোন অসুখ হয়েছে, তাহলেই রোগ একেবারে পালাবে।"

গুরুদেবের শিষ্যদের মধ্যে ডাক্তার সংখ্যায় অনেকজন ছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, "যাঁরা শারীরবৃত্তের চর্চা করেছেন, তাঁদের আরও একটু অগ্রসর হয়ে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ শারীরিক গঠনের পিছনে একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক যন্ত্র লুকোন আছে।"*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গুণাবলীর জীবন্ত যোগসূত্র হবার জন্য শিষ্যদের সর্বদাই উপদেশ দিতেন। বাইরের আচার ব্যবহারে তিনি নিজে একজন সক্রিয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হলেও, অন্তরে তিনি প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীই ছিলেন। প্রতীচ্যের প্রগতিশীল, প্রয়োজনীয় আর স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের আর প্রাচ্যের বহু শতাব্দীর গৌরবচ্ছটামণ্ডিত জ্ঞানভাস্বর ধর্মের আদর্শের তিনি প্রশংসা করতেন।

নিয়মানুবর্তিতা অবশ্য আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। বাড়ীতে পিতার শাসন ছিল কঠিন, অনন্তদাও প্রায়ই কড়া হ'তেন। কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিক্ষাকে "কঠোর" ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নিখুঁতস্বভাব

---

*শারীরবৃত্তে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত, নির্ভীক চিকিৎসক, চার্লস রবার্ট রিশে লিখেছেন, "সরকারীভাবে অধ্যাত্মবিদ্যা বিজ্ঞান বলে এখনও পরিচিতি লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এ শীঘ্রই হবে.........। এডিনবরাতে প্রায় একশত শারীরতত্ত্ববিদ্‌দের সামনে আমি প্রতিপাদন করতে সমর্থ হয়েছিলুম যে, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ই যে জ্ঞানলাভের এক মাত্র উপায় তা নয়, আর আংশিক সত্যও কখনো কখনো অন্যান্য উপায়ে বোধগম্য হয়। কোন বিষয় বা তথ্য দুর্লভ বলতে একথা বোঝায় না যে, সেটার অস্তিত্ব একেবারেই নাই। কোন বিদ্যাভ্যাস কঠিন বলে কি সেটা অধিগত না করাটাই হবে তার একমাত্র যুক্তি? রসায়নকে পরশমণির অনুসন্ধানের কারণে নিযুক্ত বলে ভ্রান্তিমূলক আর অসার বলে উপহাস করার মতন অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে যাঁরা একটা গুপ্তবিদ্যা বলে উপহাস করেন, তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত। নীতিবিষয়ে সেখানে ল্যাভোয়াসিয়ে, ক্লড বার্নার্ড, আর পাস্তুর—সর্বদা এবং সর্বত্র আছেন, পরীক্ষামূলক-ভাবে। মানবচিন্তার ব্যাখ্যার পরিবর্তনকারী এই নূতন বিজ্ঞানকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

আমার গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন, তা কি সাময়িক প্রয়োজনে, আর কি সাধারণ আচার ব্যবহারে সূক্ষ্মতা রক্ষা করে চলতে।

উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তিনি বলে বসতেন, "আন্তরিকতা ছাড়া ভদ্র ব্যবহার, যেন প্রাণহীনা একটি সুন্দরী মহিলা। ভব্যতা ছাড়া সরলতা যেন ডাক্তারের ছুরি আর কি—কাজ দেয় বটে, কিন্তু অপ্রীতিকর। ভব্যতার সঙ্গে সরলতা যুক্ত হলে তবেই সেটা কাজ দেয়, আর সেইটাই প্রশংসনীয়।"

গুরুদেব আমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্টই ছিলেন, কারণ কদাচিৎ তিনি সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন। অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু তাঁর বকুনির হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। আমার প্রধান অপরাধ ছিল অন্যমনস্কতা, কখনও কখনও বিষণ্ন হয়ে পড়া, ভব্যতার কতকগুলো নীতি লঙ্ঘন, আর মাঝে মাঝে অনিয়মিত ভাবে চলা।

উপদেশচ্ছলে একদিন গুরুদেব বললেন, "দেখ, তোমার বাবা ভগবতীবাবুর কাজকর্মে সব দিকেই কেমন একটা সুশৃঙ্খলা আর সুসমঞ্জস ভাব রয়েছে।" শ্রীরামপুর আশ্রমে প্রথমবার যাবার অল্প কয়েকদিন পরেই লাহিড়ী মহাশয়ের এই শিষ্যদুটির একদিন সাক্ষাৎ হল। পিতা আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী পরস্পর পরস্পরের মহিমাকীর্তনে উল্লসিত। উভয়েরই অন্তর্জীবন কঠিন আর সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক শিলাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—যা কোন যুগেই বিলুপ্ত হবার নয়।

আমার বাল্যজীবনের জনৈক সাময়িক শিক্ষকের কাছ থেকে কতকগুলো ভুলশিক্ষা আমি পেয়েছিলুম। শুনেছিলুম, চেলাদের সাংসারিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে পরিশ্রম করবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার করণীয় কাজগুলো যখন অবহেলা করতুম বা অযত্নে তা শেষ করতুম, তখন কিন্তু আমি তিরস্কৃত হই নি। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই এ রকম ফাঁকি দেওয়া শিক্ষা অতি সহজেই গ্রহণ করে। কিন্তু গুরুদেবের কাছে এসে ফল হল বিপরীত। তাঁর অবিরত কঠিন শাসনের ফলে আমি অতি শীঘ্রই এই আরামদায়ক দায়িত্বহীনতার মোহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পেরেছিলুম।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একদিন বললেন, "যাঁরা এ জগতের পক্ষে অতিশয় ভাল, তাঁরা অন্য কোন জগৎ অলঙ্কৃত করছেন। যতদিন তুমি এ জগতের মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছ, ততদিন পর্যন্ত তার প্রতিদানে তোমার সকৃতজ্ঞ কর্তব্য পালনে তুমি বাধ্য। যিনি পরিপূর্ণভাবে বিগতশ্বাস* অবস্থায়

---

*সমাধি।

প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তাঁর আর কোন সাংসারিক কর্তব্য নেই।" তারপর স্পষ্টতঃই বললেন, "তোমার পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে তা আমি বলতে ভুলব না, জেনো।"

গুরুদেবকে ভালবাসা দিয়েও অন্যায়ভাবে বশ করা যেত না। আমার মত স্বেচ্ছায় যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও তিনি কোন দুর্বলতাই প্রদর্শন করতেন না। গুরুদেব আর আমি, কি শিষ্যদের দ্বারা, কি অপরিচিত লোকেদের দ্বারা বেষ্টিত, কি আর কেউ না থাকলেও সর্বদা সোজা-সুজিভাবেই কথাবার্তা বলতেন, আর দরকার হলে তীক্ষ্নভাবে তিরস্কার করেও বসতেন। তুচ্ছ লঘু বা অসংলগ্ন ভাবের কোন কিছু দেখলে তাও তাঁর বকুনির হাত থেকে রেহাই পেত না। এই রকম অহমিকা চূর্ণ করবার চিকিৎসাপ্রণালী বাস্তবিকই বরদাস্ত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু আমারও দৃঢ় পণ ছিল যে, আমার প্রত্যেক মানসিক বক্রতা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শাসনকঠোর হস্তের দ্বারাই সরল করে নেব। এই রকমে আমার বিরাট পরিবর্তন সাধন করবার সময় বহুবারই আমায় তাঁর শাসনদণ্ডের তলায় মাথা পেতে দাঁড়িয়ে কম্পান্বিত হতে হয়েছিল। গুরুদেব বলতেন, "আমার যদি কোন কথা তোমার পছন্দ না হয়, তবে যে কোন সময় তুমি চলে যেতে পার। তোমার উন্নতি ছাড়া আমি আর কিছু চাইনে,—মনে হয় যদি উপকার হচ্ছে, তবে থাকতে পার।"

আমার প্রত্যেক অহমিকা চূর্ণ করে দেবার দারুণ আঘাতের জন্য সত্যই আমি তাঁর কাছে অপরিসীমভাবে কৃতজ্ঞ। রূপকভাবে বলা চলে—তিনি যেন আমার চোয়াল হতে রোগগ্রস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত দন্ত সব আবিষ্কার করে উৎপাটিত করে দিচ্ছেন। মানুষের অহংভাবের কঠিন "আঁটি" দারুণ আঘাত ছাড়া বের করে দেওয়া সত্যিই দুঃসাধ্য! এ দূর হলে তবেই সব বাধা দূর হয়ে ঈশ্বরাবির্ভাবের পথ সুগম হয়ে পড়ে। ভগবান বৃথাই আত্মাভিমানীর কঠিন প্রস্তরহৃদয়ের মধ্য দিয়ে আসবার পথ খুঁজে মরেন!

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বজ্ঞা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, কোন মন্তব্যে কর্ণপাত না করে, তিনি প্রায়ই কারুর না কারুর অনুক্ত ধারণার যথাযথ উত্তর দিয়ে দিতেন। লোকে কথা যা ব্যবহার করছে আর তাদের পিছনে সত্যিকারের যা মনোভাব আছে, তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকতে পারে। আমার গুরুদেব বলতেন, "মানুষের কথাবার্তার বিভ্রান্তির পিছনে তার মনের প্রকৃত ভাব স্থির হয়ে বোঝবার চেষ্টা কর।"

কিন্তু সংসারের কানে ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টি বা তার জ্ঞানের কথা প্রায়ই কটু লাগে। লঘুপ্রকৃতি শিষ্যদের কাছে গুরুদেব প্রিয় ছিলেন না।

প্রকৃত জ্ঞানী—অবশ্য সংখ্যায় তাঁরা খুবই অল্প—তাঁরাই তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত গুরু হতে পারতেন, যদি তাঁর কথাগুলি এত সোজা আর তিরস্কারমূলক না হত।

তিনি আমার কাছে স্বীকার করে বলেছিলেন,—"আমার কাছে যারা শিক্ষা নিতে আসে তাদের ওপর আমি কড়া বটে, কিন্তু এইটাই হচ্ছে আমার প্রকৃতি। থাকতে হয় থাক, না হয় পথ দেখ। আমার সঙ্গে কোন আপোসরফা নেই। তুমি কিন্তু তোমার শিষ্যদের কাছে খুবই সদয় হবে, কারণ ঐটেই হচ্ছে তোমার প্রকৃতি। আমি কেবলমাত্র কঠিন শাসনের আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করি, যা হচ্ছে সাধারণের সহ্যের সীমার বাইরে। অবশ্য ভালবাসার মৃদুকোমল পরশও পরিবর্তন আনে। কঠিন ও কোমল দুরকম প্রণালীতে একই রকম ফল পাওয়া যায়, অবশ্য যদি সুবিচারের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারা যায়।" তারপর বললেন, "তোমায় বিদেশে যেতে হবে, যেখানে আত্মাভিমানে ঘা লাগা কেউই পছন্দ করে না। কোন গুরুর পক্ষে প্রতীচ্যে ভারতের অমরবাণী প্রচার করা প্রচুর অবিচলিত ধৈর্য আর সহনশীলতা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়।' (আমেরিকায় থাকতে গুরুদেবের কথাগুলি যে কতবার স্মরণ হয়েছে তা আর বলে কাজ নাই।)

যদিও আমার গুরুদেবের অপ্রিয় সত্যভাষণের ফলে তাঁর জীবদ্দশায় বহু-সংখ্যক শিষ্য হয় নি, তবুও তাঁর আত্মার প্রাণবন্ত বিকাশ রয়েছে এই পৃথিবীতে তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে, তাঁর ক্রমবর্ধনশীল ভক্তশিষ্যগণের মধ্যে। মহাবীর অ্যালেকজ্যাণ্ডারের মতন যোদ্ধারা চান পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র অধিকার, আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মত সদ্‌গুরুরা জয় করেন তার চেয়েও সুদূরতর স্থান—মানুষের অন্তর। গুরুদেবের অভ্যাস ছিল তাঁর শিষ্যদের যা নিতান্তই তুচ্ছ বা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় এমন সব সামান্য দুর্বলতা বা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উপরও একটা বিরাট গুরুত্ব আরোপ করে তা সালঙ্কারে বর্ণনা করা। পিতা একদিন শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে দর্শন করতে এলেন। পিতা আশা করেছিলেন যে, খুব সম্ভবতঃ আমার প্রশংসার কথাই শুনতে পাবেন, কিন্তু শুনলেন তিনি সব একেবারে বিপরীত। আমার কর্তব্যচ্যুতির একটা বিরাট তালিকা পেয়ে ত তিনি একেবারে দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলেন। দৌড়ে এলেন আমার কাছে। হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে বললেন, "তোমার গুরুর কথা শুনে ত ভেবেছিলুম যে, তোমার একেবারে দফারফা হয়ে গেছে!"

সেই সময়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আমার প্রতি অসন্তোষের একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তাঁর মৃদু ইঙ্গিত সত্ত্বেও জনৈক ব্যক্তিকে আমি আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলুম।

রাগের চোটে ত' গুরুদেবের কাছে দৌড়লুম। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম যে, তাঁর চোখ দুটি মাটির দিকে নামান, যেন তিনি নিজ দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এই একটিবার মাত্র সেই বিরাট অধ্যাত্মজগতের সিংহকে আমার সামনে নিতান্ত শান্ত ও নিরীহভাবে দেখলাম। পরম উপভোগ্য সেই অপূর্ব ক্ষণ! জিজ্ঞাসা করলুম, "গুরুদেব, বাবার সামনে আমায় নির্মমভাবে এমন সব কথা বললেন কেন? এটা কি ঠিক হয়েছে?"

"আচ্ছা, আর কখনও বলব না।" শ্রীযুক্তেশ্বরজীর স্বর যেন অনুতপ্ত। তখনই আমার সব অভিমান ঘুচে গেল। কত শীগগির সেই বিরাট মানুষটি তাঁর দোষটুকু স্বীকার করে নিলেন! যদিও তিনি আর কখনও পিতার মনের শান্তির ব্যাঘাত ঘটান নাই, তবুও তিনি আমায় খণ্ড খণ্ড করে নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করে চলতেন তা সে যখনই হোক, আর যেখানেই হোক; তা থেকে আর আমার কিছুমাত্র রেহাই ছিল না।

নতুন শিষ্যরা এসে গুরুদেবের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধে সমালোচনা শুরু করতেন। যেন গুরুদেবের মতই সব মহা মহা জ্ঞানী আর কি! ভাবতেন, যেন তাঁরা নিজেরা সব নির্ভুল ভালমন্দ বিচারের এক একটি আদর্শ। কিন্তু যিনি আক্রমণ করেন, তাঁর নিজেরও প্রতিরক্ষার ক্ষমতা না থাকলে চলে না। সেই সব ছিদ্রান্বেষী শিষ্যরাই আবার গুরুদেবের কাছ থেকে প্রকাশ্যে কঠিন সমালোচনার দু' চারটি চোখা চোখা বাণ খেয়ে একেবারে পিঠটান দিতেন।

"অন্তরের দুর্বলতা হচ্ছে মৃদু স্পর্শে কাতর শরীরের ব্যাধিগ্রস্ত স্থানের মত, সামান্য একটু কোমল তিরস্কারের ছোঁয়া একবার তাতে লাগলেই গুটিয়ে যায়!" এই ছিল শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পলাতক শিষ্যদিগের সম্বন্ধে সরস মন্তব্য।

বহু শিষ্যদের কাছে গুরুর একটি পূর্বকল্পিত রূপ থাকে, যার দ্বারা তারা তাঁর কথা ও কাজের বিচার করেন। এই ধরণের শিষ্যরা প্রায়ই অনুযোগ করতেন যে তাঁরা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

আমি একবার বলেছিলুম, "ঈশ্বরপ্রণিধান তোমাদের দ্বারা হবার নয়। সাধুসন্ন্যাসীদের জলের মত পরিষ্কার বুঝে নিতে পারলে ত, তোমরাই সাধু হয়ে যেতে।" লক্ষকোটি রহস্যের মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই যেখানে অবর্ণনীয় ভাব,

সেখানে সাহস করে কেউ কি বলতে পারে যে গুরুর গহন প্রকৃতিকে এক কথায় বুঝে নিতে পারা যায় ?

কত শিষ্য এল, কত গেল। যারা সহজ পথ খুঁজত,—সদ্য সদ্য সহানুভূতি আর তাদের গুণপনার ভাল রকম আদর, তারা তা এ আশ্রমে পেত না। শিষ্যদের আশ্রয় দান ও তাদের জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা গুরুদেবের চিরকালের জন্যই ছিল; কিন্তু বহুশিষ্যই কৃপণের মত তাদের আত্মতৃপ্তিই খুঁজত। নতিস্বীকার করার চেয়ে জীবনের অসংখ্য দীনতা আর হীনতা বরণ করেই তারা প্রস্থান করত। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলোকের তেজ তাদের আধ্যাত্মিক দৌর্বল্যের পক্ষে নিতান্তই দুর্বিসহ ছিল। তারা খুঁজে বার করে নিত অপেক্ষাকৃত আরও সাধারণ গোছের গুরু, যাঁরা মিঠে তোয়াজের বুলিতে তাদেরকে মাঝে মাঝে অজ্ঞানের মোহনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারতেন।

গুরুদেবের সঙ্গে থাকার সময় আমার প্রথম কয়েকমাস বকুনি খাবার ভয়ে ভয়ে কাটাতে হয়েছিল। আমি শীঘ্রই দেখতে পেলুম যে তাঁর বাচনিক জীবচ্ছেদ সেই সমস্ত লোকেদের উপরই প্রযুক্ত হত, যাঁরা আমার মত তাঁর নৈতিক শাসনের তলে মাথা পেতে দিত। কোন মর্মাহত শিষ্য তার প্রতিবাদ করলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সে জন্য কিছু মনে করতেন না, শুধু চুপ করে যেতেন। তাঁর কথায় কখনও ক্রোধ প্রকাশ পেত না। তাঁর সার কথাগুলি সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য এবং জ্ঞানগর্ভই হত।

গুরুদেবের তিরস্কার কোন সাময়িক আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হত না। অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা গেলেও, তিনি কারুর কোন দোষ প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দিতেন না। কিন্তু যে সব শিষ্য তাঁর উপদেশ সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতে আসত, তাদের জন্য তিনি গুরুদায়িত্বের ভার গ্রহণ করতেন। একমাত্র সেই গুরুরই অসীম সাহস আর ক্ষমতা, যিনি মানব মনের অহংভাবের কাঁচামাটি থেকে তার রূপান্তর সাধন করতে পারেন। খাঁটি সাধুসন্ন্যাসীদের সাহস ও শক্তির মূল হচ্ছে এ জগতের মায়াবিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট দৃষ্টিহীনদের প্রতি অনুকম্পায়।

মনের ভিতরকার খুঁতখুতানি ছেড়ে দিতে দেখা গেল যে, আমার বকুনি খাওয়া একদম কমে গেছে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে গুরুদেব যেন আমার প্রতি অপেক্ষাকৃত আরও কোমল হয়ে উঠলেন। কালে আমি সব রকম যুক্তিতর্কের বেড়া আর আমার নির্জ্ঞান মনের* গোপন ধারণা সবই ভেঙে দিলুম, সাধারণতঃ

---

*নিউইয়র্কে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ইহুদী পুরোহিত ইস্রায়েল, এচ, লেভিন্থল উল্লেখ

যার আড়ালে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তার আসল রূপটি লুকিয়ে থাকে। তার পুরস্কার লাভ হল এই যে, গুরুর সঙ্গে আমি যেন এক হয়ে গেলুম। তখন দেখলুম যে তিনি সুবিবেচক, আমার পরম নির্ভরস্থল, আর আমার প্রতি তাঁর স্নেহের ফল্গুধারা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত সঙ্গোপনে বয়ে চলেছে। বাইরে কথাবার্তায় কিন্তু সে স্নেহের কোনরকম প্রবল উচ্ছ্বাস বা তার অনাবশ্যক প্রকাশ নাই।

আমার নিজের মনের প্রকৃতি ছিল প্রধানতঃ ভক্তিপ্রবণ। প্রথমতঃ দেখে কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি যে, যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর কেন কোথাও ভক্তির ছিটেফোঁটাও নাই। কেবল যেন জ্ঞানরাজ্যের শুষ্ক কঠোর হিসাব-নিকাশ দিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একসুরে বাঁধা হয়ে দেখতে পেলুম যে, আমার ভক্তিপথে* কোথাও বাধা নেই,—আমি বেশ এগিয়ে যাচ্ছি। আত্মজ্ঞানসমাহিত গুরু তাঁর শিষ্যদিগকে তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতির গতি অনুযায়ী চালিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কতকটা অস্পষ্টগোছের হলেও তাতে কিন্তু ছিল একটা অন্তর্নিহিত মুখরতা। প্রায়ই দেখা যেত যে, আমার চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর ভাববৈশিষ্ট্যের নীরব ছাপ পড়েছে, যেখানে ভাষা একেবারে নিরর্থক। নীরবে তাঁর পাশে বসে দেখতুম যে, তাঁর অযাচিত দান শান্তির সহস্রধারায় আমার সকল সত্তা পরিপ্লাবিত করে তুলেছে।

কলেজে ঢোকার প্রথম বছরের গ্রীষ্মাবকাশে গুরুদেবের নিরপেক্ষ বিচারের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পেয়েছিলুম। একটানা ছুটিটা শ্রীরামপুরে গুরুর চরণতলে কাটিয়ে দেবার প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে বসেছিলুম।

আশ্রমে প্রবল আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে পৌঁছতেই খুশী হয়ে গুরুদেব বললেন, "দেখ, আশ্রমের সব ভার এখন তোমার ওপর। তোমার কাজ হবে অতিথিরা এলে তাদের অভ্যর্থনা করা আর অন্য সব শিষ্যদের কাজের তদারক করা।"

করেছেন, "আমাদের সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান সত্তার শীর্ষদেশে অধিসংবিৎ। বহুবৎসর পূর্বে ইংরেজ মনোবিদ্ এফ, ডব্লিউ, এইচ্ মায়ার্স ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, 'আমাদের সত্তার গভীরে জঞ্জালের স্তূপের সঙ্গে ধনরত্নের আগারও লুক্কায়িত আছে'। মানুষের প্রকৃতিতে নির্জ্ঞান মনের বিষয়ে মনোবিদ্যার যে সকল গবেষণা কেন্দ্রীভূত, তাদের সঙ্গে তুলনায় এই অতিমানস-লোকের নূতন মনোবিদ্যা সেই রত্নভূমির সন্ধানে মনোনিবেশ করেছে একমাত্র সেই রাজ্যেই যেখানে মানুষের মহান্, নিঃস্বার্থ আর বীরোচিত কার্যের সন্ধান মেলে।"

*জ্ঞান ও ভক্তি, ঈশ্বরলাভের দুটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

দিন চোদ্দ পরে পূর্ববঙ্গ থেকে কুমার নামে একটি শিষ্য এল আশ্রমে শিক্ষালাভের জন্য। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে সে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্নেহ শীঘ্রই আকর্ষণ করে নিলে। কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে গুরুজীর সমালোচকের ভাব নতুন বাসিন্দাটির চালচলনের প্রতি শিথিল হয়ে এল।

মাসখানেক কুমার থাকবার পর গুরুদেব একদিন আমায় নির্দেশ দিলেন, "মুকুন্দ, কুমার তোমার কাজ করুক আর তুমি তোমার নিজের সময়টুকুতে রাঁধাবাড়া আর ঝাঁটপাট দিও।"

পদোন্নতি হওয়াতে কুমার ত' আশ্রমের মধ্যে ছোটখাট বেশ একটি অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিলে। নীরব বিদ্রোহে অন্যান্য শিষ্যরা সব রোজই আমার কাছে কি করা যায় তার পরামর্শ চাইতে আসত। ব্যাপারটা তিন সপ্তাহ ধরে চলল।

তারপর একদিন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলুম যে কুমার গুরুদেবের কাছে নালিশ করছে, "মুকুন্দকে নিয়ে আর পারা যায় না। আপনি আমায় সব দেখাশোনার ভার দিলেন, কিন্তু তবুও আর সব শিষ্যেরা কেবল তারই কাছে যায়, আর তার কথাই মানে।"

"সেইজন্যেই ত' আমি তাকে হেঁসেলে পাঠিয়েছি, আর তোমায় বৈঠকখানায়।" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আজকের কঠিন স্বর কুমারের কাছে একেবারেই নূতন। "এইতেই তো তুমি বুঝতে পেরেছ যে উপযুক্ত দলপতি যে হয়, তার কেবল কাজ করতেই ইচ্ছে যায়, কারুর ওপর কর্তৃত্ব করতে নয়। তুমি মুকুন্দর জায়গা চেয়েছিলে, কিন্তু নিজের গুণে তা রাখতে পারলে না। এখন আবার রাঁধুনির যোগানদার হয়ে আগেকার কাজে ফিরে যাও।"

এই রকমে তাকে খাটো করে দেবার পরই কিন্তু কুমারের প্রতি গুরুদেবের আগেকার মত অস্বাভাবিক প্রশ্রয় আবার বেড়ে গেল। আকর্ষণের রহস্য কে ভেদ করতে পারে? কুমারের ভিতর আমাদের গুরুদেব দেখতে পেয়েছিলেন একটি মধুর ভাবের উৎস, সেটা কিন্তু অপর সহশিষ্যদের দিকে উৎসারিত হয়ে উঠত না। নতুন ছেলেটি যদিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু তাতে আমার কোন আশঙ্কা হয় নি। গুরুদেরও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য জীবনের ছন্দে নানা গুরে বৈচিত্র্য আনয়ন করে। আমার প্রকৃতিতে খুঁটিনাটি বিশেষ কিছু স্থান পেত না। গুরুদেবের কাছ থেকে আমি আরও উচ্চতর জিনিষ লাভের সন্ধানে ছিলুম—বাইরের কোনপ্রকার স্নেহাতিশয্য বা প্রশংসা নয়।

বিনা কারণেই কুমার একদিন আমার প্রতি বিষোদ্গার করে কতকগুলো কথা বললে। মনে বড়ই আঘাত পেলুম।

"তোমার মাথা যা ফেঁপে উঠেছে এবার তা ফাটল বলে!" মনে মনে এর

যাথার্থ্য আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বুঝে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে বললুম, "তোমার চালচলন এবার একটু শোধরাও, বুঝলে হে, তা না হলে একদিন না একদিন তোমায় এ আশ্রম থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে কুমার আমার কথাগুলো সব গুরুজীকে বলে দিল। তখনই তিনি ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। খুব একচোট বকুনি খাবার ভয়ে আমি ঘরের একটা কোণে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

গুরুদেব শুধু এই কটি কথা বললেন, "হয়ত মুকুন্দর কথাই ঠিক।" কণ্ঠস্বর তাঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর।

বছরখানেক পরে কুমার গুরুদেবের নীরব অনিচ্ছা উপেক্ষা করেই তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেল। তিনি কখনও শিষ্যদের চলাফেরার উপর কোন অনাবশ্যক কর্তৃত্ব প্রকাশ করতেন না। মাসকতক পরে ছেলেটা শ্রীরামপুরে ফিরে আসতেই তার মধ্যে একটা বিসদৃশ পরিবর্তন দেখা গেল। অমন যে রাজোচিত সৌম্যমূর্তি কুমার, আর জ্বলজ্বলে মুখ, সব যেন কোথায় চলে গেছে। নিতান্ত একটা নগণ্য চাষা যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে! সম্প্রতি কতকগুলো বদ অভ্যাসও সে জুটিয়ে এনেছে।

গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন যে, ছেলেটা আর এখন ব্রহ্মচারীর আশ্রমজীবনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

"মুকুন্দ, কুমারকে কালই আশ্রম থেকে চলে যেতে বলবার জন্যে তোমার ওপরেই ভার দিলুম। আমি এ পারব না।" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর চোখে জল, কিন্তু তখনই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ছেলেটা যদি আমার কথা সব শুনত আর চলে না গিয়ে সব কুসঙ্গীদের সঙ্গে না মিশত, তা হলে কখনো তার এতদূর অধঃপতন হত না। আমার আশ্রয় সে প্রত্যাখ্যান করেছে—এইবার কঠিন সংসারই এখন তার গুরু হবে আর কি।"

কুমার চলে যাওয়াতে খুব যে খুশী হয়েছিলুম তা নয়। মনে বড় দুঃখ হতে লাগল যে, গুরুদেবের স্নেহ আকর্ষণ করবার যার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁর স্নেহ পেয়ে যে ধন্য হয়েছে, সে কি করে এ রকম সস্তা মোহে মুগ্ধ হতে পারলে। নারী আর সুরার প্রলোভন মানুষের মজ্জাগত। তার উপযুক্ত সমাদরের জন্যে আর বিশেষ সূক্ষ্মভাবে বোঝবার দরকার করে না। ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন বিষবৃক্ষেরই মতন—নানাবর্ণের ও নানাস্বাদের সুগন্ধি ফলফুলে ভরা; কিন্তু এর প্রতি অণু-পরমাণুই বিষাক্ত।* তৃপ্তি আর আরামের স্থান হচ্ছে অন্তরেরই মধ্যে—সুখেতে

*শংকরাচার্য লিখেছেন,—"জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য মানুষের অন্তহীন

উজ্জ্বল, যে সুখ লোকে হাজারো রকমের বাইরের পথে অন্ধভাবে খুঁজে মরে।

গুরুদেব একদিন কুমারের ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বললেন, "তীক্ষ্ন বুদ্ধির হচ্ছে দুটো ধার। ছুরির মতন—একে অজ্ঞানের বিষফোড়া কাটা আর নিজের গলা কাটা, এই মরাবাঁচা বা ভাঙাগড়ার দুকাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। মন আধ্যাত্মিক বিধিনিয়মের অপরিহার্যতা স্বীকার করলেই বুদ্ধি তখন ঠিক পথে চলে।"

গুরুদেব স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে পুত্রকন্যাজ্ঞানে তাঁর সকল শিষ্যদের সঙ্গেই মিশতেন। তাঁদের আত্মা যে এক, দুই নয়, এই ভেবে তাদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করতেন না বা কোন পার্থক্য রাখতেন না।

তিনি বলতেন, "ঘুমিয়ে পড়লে তুমি জানতে পার না যে, তুমি স্ত্রী কি পুরুষ। পুরুষ যেমন স্ত্রীরূপ ধারণ করলে কখনও সে স্ত্রী হয়ে যায় না, তেমনি আত্মা স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ রূপ ধারণ করলেও তার কোন লিঙ্গভেদ নাই। আত্মা হচ্ছে নিত্য সনাতন, ঈশ্বরের শাশ্বতরূপ!"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কিন্তু নারীকে "নরের পতনের মূল," বলে কখনও ঘৃণা বা পরিহার করতেন না। তিনি বলতেন যে, নারীরও তো নরের কাছ থেকে প্রলোভনের আশঙ্কা আছে। আমি একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম যে, জনৈক প্রাচীন সাধু নারীকে "নরকের দ্বার" বলে গেছেন কেন?

গুরুদেব তিক্তভাবে উত্তর দিলেন, "তাঁর প্রথম জীবনে হয়ত কোন রমণী তাঁর মনের শান্তির বিঘ্নস্বরূপ হয়েছিল, তা না হলে নারীকে পরিত্যাগ না করে তিনি তাঁর আত্মসংযমের ত্রুটিগুলিই বর্জন করতেন।"

কোন অভ্যাগত আশ্রমে এসে যদি কোন ইঙ্গিতপূর্ণ গল্প বলবার চেষ্টা করতেন, তা হলে তিনি তখন একেবারে নিঃশব্দ নীরবতা অবলম্বন করতেন। শিষ্যদের তিনি বলতেন, "সুন্দর মুখকে তোমার মনকে বশ করতে দিও না; ইন্দ্রিয়ের দাস যে, সে জগৎকে উপভোগ করবে কি করে? এর যে সূক্ষ্ম রস-ভাব আর তার অনুভূতি তা তাদের হাত এড়িয়ে যায়, যখন তারা স্থূল উপভোগের ক্লেদকর্দম হাতড়ে মরে। সূক্ষ্ম ভেদাভেদ-জ্ঞান স্থূল ইন্দ্রিয়বোধের দাসেদের কাছে একদম হারিয়ে যায়।"

প্রচেষ্টা; সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে, সে আপাতভোগ্য সুখও ভুলে গিয়ে নিদ্রা যায়, তার স্ব-ভাব আত্মায় বিশ্রাম লাভ করবার জন্য। অতীন্দ্রিয় সুখ এইজন্যই অতি সহজপ্রাপ্য, আর তা স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের আনন্দ—যার সর্বদা পরিণতি গ্লানিতেই, তার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্যরা মায়াসঞ্জাত যৌনমোহের হাত এড়াবার জন্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ হতে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নানাবিধ সহজবোধ্য আর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করতেন।

তিনি বলতেন, "খাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন ক্ষিধে মেটান, লালসা মেটান নয়, তেমনি যৌনবোধ হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে, অতৃপ্ত কামনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে নয়। কদভিপ্রায় সব এখনই দূর কর, তা না হলে তারা সব এ জড়দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তোমার সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। রক্তমাংসের শরীর তোমার ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনের কাছে দুর্বল হলেও মন সর্বদা চাঙ্গা রাখা চাই। প্রলোভন যদি তোমায় নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে, তা হলে তাকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ আর মনের অদম্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দাবিয়ে রাখ। যা কিছু স্বাভাবিক বাসনাকামনা আছে তা সবই দমন করা যেতে পারে।

"শক্তি সঞ্চয় করে যাও। বিশাল সমুদ্রের মত হও ; ইন্দ্রিয়বোধের নদী-পথে যা কিছু ভেসে আসছে, সবই নীরবে তোমার ভিতর একেবারে তলিয়ে যাবে। নিত্য নূতন জাগ্রত কামনাবাসনা সকল তোমার অন্তরের শান্তির আধারের তলায় খোঁড়া সব এক একটা ছিদ্র ! এর ভিতর দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় শান্তিবারি সব জড়বাদের শুষ্ক মরুভূমির বুকে গিয়ে পড়ে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। কু-অভিপ্রায়ের সক্রিয় প্রবল তাড়না হচ্ছে মানুষের সুখের পক্ষে তার পরম শত্রু। আত্মসংযমের শক্তিতে সিংহের মত এ জগতে ঘুরে ফিরে বেড়াবে ; দেখো যেন ইন্দ্রিয়ের প্রতি দুর্বলতার ব্যাংগুলো তোমার চারধারে লাফালাফি করে না বেড়ায়।"

প্রকৃত ভক্তের শেষ অবধি সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ ঘটে। মানবপ্রেমের প্রতি তার আকর্ষণ তখন একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, আর সেইটাই হচ্ছে তার একমাত্র খাঁটি প্রেম, কারণ তা সর্বব্যাপী।

যেখানে আমার গুরুর প্রথম দর্শনলাভ ঘটেছিল, কাশীর সেই রাণামহল অঞ্চলেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মাতাঠাকুরাণী বাস করতেন। স্নেহকোমল আর সদয়প্রকৃতির হলেও তিনি বেশ দৃঢ়মতী ছিলেন। একদিন তাঁর বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, মাতাপুত্রের মধ্যে কথাবার্তা চলছে শুনতে পেলুম। গুরুদেবকে বোধ হল, তিনি তাঁর স্বাভাবিক শান্তভাবে যুক্তিসহকারে তাঁর মাকে কোন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। দেখে বোধ হল তিনি নিষ্ফলই হলেন, কারণ তাঁর মা তখন প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলছেন,—"না, না, বাছা, তুমি এখন যাও।

তোমার ও সব উপদেশটুপদেশ এখন রেখে দাও ; ও সব আমার জন্যে নয় ! আমি তোমার শিষ্য নই বাছা, বুঝলে ?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তো বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছ থেকে সরে এলেন—ছোট ছেলে যেমন বকুনি খেয়ে পালিয়ে আসে। ন্যায্য কথা শুনতে না চাইলেও মায়ের প্রতি তাঁর অপার ভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মা তাঁকে তাঁর ছোট্ট ছেলেটির মতই দেখতেন, সাধুসন্ন্যাসীর মত নয়। এই তুচ্ছ ঘটনাটার মধ্যেও বেশ একটা মাধুর্যের আকর্ষণ ছিল ; এতে আমার গুরুদেবের অসাধারণ প্রকৃতির একটা দিকে আলোকপাত হল, যা অন্তরে কোমল আর বাইরে কঠিন।

সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মানুসারে কোন সন্ন্যাসী একবার সংসার আশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করলে আর তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে পারেন না। গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য পালনীয় সাংসারিক বিবিধ সংস্কার সব তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভবপর নয়। তবুও প্রাচীন দশনামীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য এ সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্যই করে গেছেন। তাঁর পরম স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হস্তে অগ্নিশিখা আহ্বান করে তাঁর মাতার শবদাহ করেছিলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও এ সব বাধাবন্ধ নিতান্তই অনাড়ম্বর ভাবে এড়িয়ে চলতেন। তাঁর মাতার পরলোকগমনে তিনি কাশীর গঙ্গার ঘাটেই শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করে প্রাচীন প্রথানুযায়ী বহু ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন।

শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সব সন্ন্যাসীদের ক্ষুদ্র আত্মাভিমান রোধের জন্যই রচিত। শঙ্করাচার্য ও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পূর্ণভাবেই ব্রহ্মলাভ ঘটেছিল। তাঁদের উদ্ধারের জন্য বিধিনিয়ম পালনের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কখনও কখনও গুরুরা ইচ্ছা করেই শাস্ত্রীয়বিধি লঙ্ঘন করে চলেন তার অনুষ্ঠানের খোসা ত্যাগ করে, তার অন্তর্নিহিত নীতি বা ভাবটুকুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্যই, আর কিছু নয়। যীশুখ্রীস্টও ঐ রকম করে রবিবারে ভুট্টার শীষ তুলেছিলেন, আর সম্ভাব্য সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, “রবিবার মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ রবিবারের জন্য নয় !”*

শ্রীযুক্তেশ্বরজী শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কিছু খুব অল্পই পড়তেন। তবুও খুব অধুনাতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ে অগ্রগতির সঙ্গে তিনি সর্বদাই পরিচিত ছিলেন।** চমৎকার আলাপী ছিলেন তিনি।

*মার্ক ২-২৭ (বাইবেল)।

**গুরুদেব ইচ্ছামাত্র তৎক্ষণাৎ অপরের চিত্তের সঙ্গে নিজের চিত্তের সমন্বয় সাধন করতে

আশ্রমে অভ্যাগতদের সঙ্গে তিনি অসংখ্য বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা শুরু করে দিতেন। তাঁর অপূর্ব রসিকতা আর উচ্ছ্বল হাসিতে সব আলোচনাই যেন সরস, প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠত। প্রায়ই গম্ভীর হয়ে থাকলেও, মুখ কখনও অন্ধকার করে থাকতেন না। বাইবেলের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন, "ভগবানকে লাভ করতে গেলে মানুষের মুখবিকৃতির প্রয়োজন হয় না।* স্মরণ রেখো যে, ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানেই সকল দুঃখের অগ্নিসংকার।"

দার্শনিক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রথমবার আগমন ঘটত, তাঁরা ভাবতেন যে, এসে একজন গোঁড়া ধর্মাচারীরই সাক্ষাৎ পাবেন। তাঁদের একটু গর্বোত্থিত হাসি বা কৌতুকমিশ্রিত কৃপাদৃষ্টিতে প্রকাশ পেত যে, তাঁরা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ হতে কতকগুলি আচারনিষ্ঠার মামুলী মন্তব্য ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে আলোচনা করে যখন তাঁরা দেখতে পেতেন যে তাঁদের নিজ নিজ বিশেষ অধিকারের ক্ষেত্রেও তাঁর যথাযথ জ্ঞান আছে, তখন তাঁদের প্রস্থান হত বিরাগভরেই।

সাধারণতঃ আমার গুরুদেব অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি খুব ভদ্র আর অমায়িক ছিলেন; একটা মধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। তবুও দারুণ আত্মম্ভরীরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বেশ একটু ভাল রকমেরই শিক্ষা পেয়ে যেতেন। গুরুদেবের ভিতর তাঁরা দেখতে পেতেন, একেবারে নীরব ঔদাসীন্য অথবা কঠিন প্রতিবাদ—বরফ বা লোহা আর কি!

একবার একজন বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে একদিন এক দারুণ তর্কযুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও মানতেন না, কারণ বিজ্ঞান তাঁকে পাবার কোন সোজা রাস্তা বার করে দিতে পারে নি।

"তা হলে কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে আপনি টেস্ট টিউবে পরীক্ষার ফলে সেই পরমাশক্তিকে স্বতন্ত্র করে ফেলতে পারেন নি, কি বলুন?" গুরুদেবের দৃষ্টি কঠিন, বললেন, "আচ্ছা আমি একটা নতুন পরীক্ষার কথা বাতলে দিচ্ছি। নিরবচ্ছিন্নভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আপনার চিন্তাগুলো সব একে একে বিশ্লেষণ

পারতেন (এক প্রকার বিভূতি। পতঞ্জলি যোগসূত্র—বিভূতি-পাদ ১৯।) মানব রেডিওরূপে তাঁর শক্তি আর চিন্তার প্রকৃতি সব ১৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

*ম্যাথিউ ৬ : ১৬ (বাইবেল)।

করুন, তা হলে ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্বন্ধে আর কখনও আশ্চর্য বোধ করতে হবে না।”

একজন বিখ্যাত পণ্ডিত প্রথমবার তাঁর আশ্রমে এসে ঐ রকম একটি বেশ অমনমধুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রবল উৎসাহে পণ্ডিতপ্রবর ত' তাঁর শাস্ত্র-কাহিনীতে উচ্চৈঃস্বরে আশ্রমের কড়ি বরগা ফাটিয়ে তুললেন। মহাভারত, উপনিষদ, শঙ্করভাষ্য প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ কোন কিছুই বাদ গেল না, তা থেকে অনর্গল শ্লোক সব উদ্ধৃত করে চললেন। আপন মনে তিনি ত' বকেই চলেছেন, হঠাৎ নজর পড়ল যে গুরুদেব কিছুই বলছেন না। তাঁর দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইতে গুরুদেব জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বললেন, “আমি কেবল আপনার কথাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি, বলবার জন্যে ত নয়।” তখন চুপচাপ ! পণ্ডিত মহাশয় একেবারে হতভম্ব হয়ে বসেই রইলেন।

“শ্লোক ত' আউড়েছেন প্রচুর কিন্তু আপনার কী মৌলিক ব্যাখ্যা আছে যা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারেন, তাই আগে বলুন ? শাস্ত্রীয় কী ধর্মব্যাখ্যা আপনার জীবনে খাটাতে পেরেছেন বা সেইমত জীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছেন ? কী উপায়ে এইসব চিরন্তন সত্য সকল আপনার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত করতে পেরেছে ? কেবল দমদেওয়া গ্রামোফোনের মতন অপরের কথাগুলো আউড়ে গিয়েই কি আপনি সন্তুষ্ট ?” ভদ্রলোকের কাছ থেকে তখন আমি একটু সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে বসে, কথাগুলো শুনে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলুম। পণ্ডিতজী সখেদে বললেন, “না মশায়, আমার দ্বারা আর হল না ! সত্যিই তো, অন্তরে অনুভব ত' কিছুই পাই নি !” পণ্ডিতজীর খেদোক্তি তখন বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় তিনি বুঝতে পারলেন যে, শাস্ত্রের চুলচেরা বিচার আধ্যাত্মিক অনুভবের অভাবের প্রায়শ্চিত্ত নয় !

আক্কেল সঞ্চয় করে ভদ্রলোকটি প্রস্থান করলে গুরুদেব বললেন, “এইসব নিরুপলব্ধ বিদ্যাবাগীশেরা কেবল রাত জেগে জেগে বই-ই পড়েছেন, আর কিছুই পান নি। তাদের কাছে শাস্ত্রচর্চা কেবল মৃদু বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালনার একটা উপায় মাত্র। তাদের উচ্চচিন্তাসকল তাদের বাইরের কাজের স্থূলতা বা তাদের কৃচ্ছ্রসাধ্য আন্তরশুদ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ সযত্নে পরিহার করে চলে।”

অন্যান্য উপলক্ষ্যেও গুরুদেব শুধু পুঁথিগত বিদ্যার নিরর্থকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি বলতেন, “বিরাট পাণ্ডিত্য আর নিজবোধ-রূপ, দুটো এক জিনিষ নয়। শাস্ত্রগ্রন্থ নিজবোধলাভে উদ্দীপনা জাগাতে

পারে, যদি একটি একটি করে শ্লোকের অর্থ ধীরে ধীরে পরিপাক করা যায়। পাণ্ডিত্যলাভের জন্যে অবিরত অধ্যয়নে বড় জোর একটা মিথ্যা গর্ব আসতে পারে বা অপরিপক্কজ্ঞানের একটা মিথ্যা তৃপ্তি আনতে পারে, তা ছাড়া আর কিছু হয় না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একবার শাস্ত্রব্যাখ্যার তাঁর এক নিজ অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করেছিলেন। দৃশ্যটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের একটি তপোবন। এখানে তিনি দবরুবল্লভ নামে এক বিখ্যাত গুরুর শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করেছিলেন। তাঁর প্রণালী, প্রাচীন ভারতে যা ছিল—একাধারে সরল আর কঠিন।

তপোবনের নির্জনতার মধ্যে দবরবল্লভকে নিয়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে চারধারে ঘিরে বসে আছে। তাদের সামনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা খোলা। আধঘণ্টা ধরে একটিমাত্র শ্লোক দেখে দেখে তারপর তারা চোখ বুঁজল। আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। গুরুদেব একটুখানিমাত্র ব্যাখ্যা করে দিলেন। নিথর হয়ে বসে তারা আরও ঘণ্টাখানেক ভাবলে। অবশেষে গুরুদেব বললেন, "এখন শ্লোকটি বুঝতে পারছ কি?"

দলের মধ্যে কেবল একটিমাত্র শিষ্য বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব।"

"উঁহুঁ, না, ঠিক পুরোপুরি নয়। এই কথাগুলির ভিতর সেই আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিকে খুঁজে বার কর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা ভারতকে নবজীবনে উজ্জীবিত করেছে।" আরও একঘণ্টা নীরবে কেটে গেল। গুরুদেব শিষ্যদের বিদায় করে দিয়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দিকে ফিরে বললেন, "ভগবদ্গীতা বুঝেছেন?"

"না মশায়, যদিও বহুবার এর পাতার ওপর চোখ আর মন বুলিয়েছি, কিন্তু তবুও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি নি।"

সেই পরম সাধু মহাপুরুষটি গুরুদেবকে সহাস্যে আশীর্বাদ করে বললেন, "হাজার জনে কিন্তু আমায় ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছে। যদি কেউ তার শাস্ত্রজ্ঞানের ঐশ্বর্য বাইরে দেখাতেই ব্যস্ত থাকে, তা হলে তার আর অন্তরের মধ্যে নীরবে ডুব দিয়ে অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করবার অবকাশ কোথায় থাকে, বলুন?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও ঠিক ঐ রকমই একমুখী গভীর চিন্তার সাহায্যে শাস্ত্রোপলব্ধির বিষয়ে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। বলতেন, "চোখ দিয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না, যায় তোমার অস্তিত্বের প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে। সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস যখন তোমার শুধু মনেই আবদ্ধ থাকবে না, তোমার সমস্ত সত্তা ব্যেপে হবে, তখনই তুমি এর মানে করবার সাহস করতে পার।"

আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে গেলে বই পড়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনীয় উপায় বলে শিষ্যদের এ রকম ঝোঁকের উপর কোন উৎসাহ দিতেন না।

তিনি বলতেন, "ঋষিরা একটি মাত্র শ্লোকের ভিতর বা একটি মাত্র সূত্রের মধ্যে যে গূঢ় অর্থ নিহিত করে গেছেন, তার উপর টীকাকার পণ্ডিতেরা যুগযুগান্ত ধরে ব্যাখ্যা করতেই ব্যস্ত। অন্তহীন বিদ্যার কচকচি কেবল অগভীর মনেরই জন্য। 'ঈশ্বর আছেন'—না, কেবলমাত্র শুধু 'ঈশ্বর' এ কথাটি ছাড়া সদ্য মুক্তিদায়িনী সরল চিন্তা আর কি আছে?"

মানুষ কিন্তু সহজে সরল চিন্তায় ফিরে যেতে পারে না। বুদ্ধিজীবী শুধু ছোট্ট একটুমাত্র কথা "ঈশ্বর"তে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চায় না, তার কাছে এর জন্যে বিদ্যার বাহাদুরি চাই। এই রকম একটা বিদ্যার গরিমা দেখতে পেলে তবে তার আত্মতুষ্টি লাভ হয়।

নিজেদের ঐশ্বর্য বা উচ্চ পদমর্যাদার সম্বন্ধে যাঁদের টনটনে জ্ঞান ছিল, গুরুদেবের কাছে এসে অন্যান্য বিষয়ে হয়ত তাঁদের দীনতা স্বীকার করতে হত। একবার পুরীর এক ম্যাজিস্ট্রেট আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লোকটি বড়ই রুক্ষপ্রকৃতির। তিনি আপন ক্ষমতাবলে আমাদের আশ্রম থেকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করতে পারতেন। ব্যাপারটা উল্লেখ করে গুরুদেবকে আমি আগে থাকতেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম। গুরুদেব কিন্তু যেখানে বসেছিলেন সেখানেই নির্বিকারভাবে বসে রইলেন, আদর আপ্যায়ন বা অভ্যর্থনার জন্যে উঠেও দাঁড়ালেন না। একটুখানি সন্ত্রস্ত হয়ে আমি তো দরজার কাছে বসে পড়লুম। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে একটা কাঠের বাক্সের উপরেই বসে সন্তুষ্ট থাকতে হল। গুরুদেব আমাকে একটা চেয়ারও আনতে বললেন না। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব অবশ্য স্পষ্টতঃই আশা করেছিলেন যে, তাঁর মত মহামান্য অতিথির অভ্যর্থনা সাড়ম্বরেই হবে, কিন্তু তা আর পূর্ণ হল না।

অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা শুরু হল। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব পদে পদে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন। বিষয়ের খেই যেমনি হারাতে লাগলেন, তাঁর রাগও তেমনি চড়তে লাগল। অবশেষে আর সামলাতে না পেরে তিনি বলে বসলেন "জানেন, আমি এম. এ, তে ফার্স্ট হয়েছিলুম?" যুক্তি তাঁকে একেবারে পরিত্যাগ করে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও তিনি চেঁচিয়েই চলেছেন!

গুরুদেব অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, "ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব, আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে এটা আপনার এজলাস নয়। আপনার ছেলেমানুষি কথায় অনেকে হয়ত ভাবতে পারে যে, আপনার কলেজ জীবনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। একটা ইউনিভারসিটি ডিগ্রির, বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির সঙ্গে

কোন দিক দিয়েই সম্বন্ধ নেই। খাঁটি সাধুরা কি আর বছর বছর হিসাব-রক্ষকদের মতন দলে দলে ইউনিভার্সিটি থেকে তৈরী হয়ে বেরোন, বলুন?" গুম্ হয়ে খানিকটা চুপ করে বসে থেকে অবশেষে তিনি প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "আজ আমি এই প্রথম একজন স্বর্গরাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষাৎ পেলুম।" পরে অবশ্য তিনি গুরুদেবকে যথারীতি অনুরোধ করলেন, তাকে তাঁর শিষ্য করে নিতে। কিন্তু তার অনুরোধটায় ছিল আইনের কথার ধরণ—যা তার মজ্জাগত—তাকে "শিক্ষানবীশ" শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে।

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, লাহিড়ী মহাশয়ের মতই সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছুক "অপরিণত" শিষ্যদের নিরুৎসাহিতই করতেন। দুই গুরুই বলতেন, "ঈশ্বরোপলব্ধি যার হয় নাই, এমন লোকের গেরুয়া বসন ধারণ করা সংসারকে ঠকান। বাইরে সংসার ত্যাগের চিহ্নধারণের কথা ভুলে যাও, তা একটা মিথ্যা অহমিকা এনে ক্ষতি করতে পারে। তোমার নিয়মিত দৈনিক আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন নাই—আর তার জন্য "ক্রিয়াযোগ" অভ্যাস কর"।

মানুষের মূল্য নিরূপণ করতে গেলে সাধু ব্যক্তিরা এক ধ্রুবমান প্রয়োগ করেন, সংসারের সদাপরিবর্তনশীল মানদণ্ড হতে যার বিরাট পার্থক্য। মানবতা—তার নিজ দৃষ্টিতেই কত বিচিত্ররূপে প্রতিভাত! কিন্তু গুরুর দৃষ্টিতে তারা মাত্র দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—অজ্ঞানী লোক যারা ঈশ্বরকে চায় না, আর জ্ঞানী লোক যারা চায়।

গুরুদেব তাঁর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার সব নিজে নিজেই দেখতেন। অসৎ লোকেরা বহুবার তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি দখল করবার চেষ্টা করেছিল। খুব শক্ত হয়ে এমন কি মোকর্দমা পর্যন্ত রুজু করে তিনি প্রত্যেককে হটিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকম হাঙ্গামা পোহাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে কারুর গলগ্রহ হতে না হয়, এমন কি শিষ্যদেরও উপর কোনপ্রকার নির্ভর না করতে হয়।

তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হচ্ছে একটা কারণ, যাতে করে আমার দারুণ স্পষ্টবাদী গুরুদেবকে কোন রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি। অন্যান্য গুরুরা, যাঁরা তাঁদের অনুগামীদের মনস্তুষ্টি করেই চলতেন, তাঁদের মতন আমার গুরুদেব, অপরের ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবেরই অধীন ছিলেন না। কোন উপলক্ষ্যেই তাঁকে অর্থের জন্য প্রার্থনা করতে, এমন কি কোন ইঙ্গিত করতেও কখন আমি শুনি নি। আশ্রমে তাঁর শিক্ষাদান মুক্ত-হস্তে আর বিনামূল্যে সকল শিষ্যগণের জন্যই ছিল।

একবার শ্রীরামপুরের আশ্রমে সমনজারি করবার জন্য আদালতের এক পিয়াদা এসে হাজির হল। কানাই নামে একটি শিষ্য আর আমি তাকে নিয়ে গুরুজীর কাছে হাজির করলুম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর প্রতি লোকটার ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল। লোকটা দাঁত বের করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে যখন বললে, "এই আশ্রম ছেড়ে আপনাকে যখন আদালতে হাজির হতে হবে, তখন খুব ভাল হবে দেখবেন!" তখন কিন্তু আমি আর সামলাতে পারলুম না। বেশ একটু রীতিমত আক্কেল দেব মনে করে এগিয়ে গিয়ে বললুম, "আর বেশী লম্বাইচওড়াই করেছ কি তোমায় মাটীতে লম্বা করে দেব।" কানাইও আমার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "হতভাগা, তোমার সাহস ত ভারি দেখছি, এই পুণ্যস্থান আশ্রমে এসে আমাদের সামনে আমাদের গুরুদেবের

গুরুদেব কিন্তু তাঁর সামনে নিন্দুককে আগলে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওহে, তোমরা এ তুচ্ছ ব্যাপারে অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এ ত' কেবলমাত্র তার কর্তব্য পালন করতে এসেছে।"

লোকটা ত' একেবারে হতভম্ব! এ রকম বিপরীত ধরণের দুটো অভ্যর্থনা দেখে হকচকিয়ে গিয়ে সসম্মানে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাড়াতাড়ি সে প্রস্থান করল।

আশ্চর্য! এমন যে গুরু যাঁর আগুনের মত তেজ,—তিনি অন্তরের মধ্যে এমন ধীর, এমন অবিচলিত, এমন শান্ত হলেন কি করে? ধার্মিক ব্যক্তির যে বর্ণনা আছে, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি চ", তা তাঁর সঙ্গে ঠিক খাপ খায়।

এ জগতে সর্বদা সেই ধরণের লোক দেখা যায় যারা, রবার্ট ব্রাউনিং এর কথায়—

"নিজেরা আঁধার কারা,
সহেনা আলোর ধারা।"

মাঝে মাঝে দু' একজন আগন্তুক আশ্রমের কাছে এসে তাঁদের সব কাল্পনিক দুঃখ জানিয়ে দারুণ আক্ষেপের সঙ্গে অনুযোগ করতেন। গুরুদেব অবিচলিত-চিত্তে ও নম্রভাবে তাদের সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন আর মনে মনে বিচার করে দেখতেন যে, এরূপ অন্ধ দোষারোপের ভিতর প্রকৃতই কোন সত্যের লেশমাত্র নিহিত আছে কি না। এই সব ঘটনাগুলো গুরুদেবের অননুকরণীয় উক্তিকে স্মরণ করিয়া দেয়—"কতকগুলো লোক পরের মাথা কেটে ফেলে দিয়ে নিজেরা বড় হতে চায়।"

প্রকৃত সাধুদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ভাব, যে কোন উপদেশের চেয়ে শিক্ষাপ্রদ, আর তা মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে যায়। "রাগ যার দেরীতে হয় সে মহাবলশালীর চেয়েও মহাবলী, আর যে তার আত্মাকে শাসন করতে পারে, সে নগরাধিপতির চেয়েও বড়।"*

আমি প্রায়ই ভাবতুম যে আমার সুমহান্ গুরুদেব খুব সহজেই একজন সম্রাট বা বিশ্ববিজয়ী বড় যোদ্ধা হতে পারতেন, যদি তাঁর মন খ্যাতি বা এ জগতে কীর্তিলাভের জন্যে উন্মুখ হত। তার বদলে তিনি অন্তরের মধ্যে আত্মম্ভরিতা আর রোষের দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করে চূর্ণ করবার ব্রতই নিয়েছিলেন, যার পতনেই মানুষের উন্নতি।

---

* হিতোপদেশ ১৬:৩২ (বাইবেল)।

১৩শ পরিচ্ছেদ

বিনিদ্র সাধু

একদিন সত্যসত্যই গুরুদেবকে আমি অকৃতজ্ঞভাবে এই কথাগুলি বলে বসলুম, "গুরুদেব, অনুগ্রহ করে আমায় হিমালয়ে যেতে অনুমতি দিন। সেখানে অখণ্ড নীরবতার মধ্যে আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করব বলেই মনে করি।" সাধকেরা মাঝে মাঝে যেমন এক এক বার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভ্রান্তিতে প্রলুব্ধ হন, সেই রকম ভাবে বিচলিত হয়ে আমি আশ্রমের কর্তব্যে এবং কলেজের পড়াশুনার উপর ক্রমশঃই অধৈর্য আর বীতরাগ হয়ে উঠছিলুম। দোষ লাঘবের একটা ক্ষীণ যুক্তির কথা এই ছিল যে, প্রস্তাবটা করা হয়েছিল মাত্র ছ'মাস কাল যখন আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গলাভ করেছিলুম, সেই সময়। তখনও পর্যন্ত আমি তাঁর গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করতে পারি নি।

গুরুদেব ধীরে ধীরে আর অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন, "হিমালয়ে ত বহুৎ পাহাড়ীরা থাকে, কই তাদের তো ঈশ্বরলাভ হয় না। অথচ পাহাড়ের চেয়ে সত্য সত্যই যাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছে, তেমন লোকের কাছ থেকেই জ্ঞানান্বেষণ করা ভাল নয় কি ?"

তিনিই আমার শিক্ষাদাতা, পাহাড় পর্বত নয়,—গুরুদেবের সরল ইঙ্গিত উপেক্ষা করে আমার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলুম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আর কোন উত্তর প্রদান করলেন না। আমি তার মানে "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" বলেই ধরে নিলুম, লোকে যেমন অনিশ্চিত মানেটা নিজের সুবিধামতই আগে চট্ করে ধরে নেয়।

কলকাতার বাড়ীতে এসে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি যাবার উদ্যোগে ব্যাপৃত হলুম। একটা কম্বলের মধ্যে গোটাকতক জিনিষ বাঁধাছাঁদা করবার সময় মনে পড়ল ঐরকম আর একটা পুঁটুলির কথা, বছরকতক আগে যা চিলেকোঠার জানালা থেকে লুকিয়েচুরিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিলুম। ভাবছিলুম যে, এটাও আবার সেবারকার হিমালয়ে পলায়নের মত নিষ্ফল যাত্রা হবে না তো? প্রথমবারে ত' আমার আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা খুবই উঁচু হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আজকের রাত্রে আমার গুরুদেবকে পরিত্যাগ করে যাবার চিন্তায় বিবেক দংশন করলে। তার পরদিন

আমি আমাদের স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বিহারী পণ্ডিত মহাশয়কে খুঁজে বার করলুম। দেখা হতে বললুম, "মশায়, আপনি আমায় বলেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের খুব বড় এক শিষ্যের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে। তাঁর ঠিকানাটা একটু দয়া করে দিন না!"

"ওঃ, তুমি রামগোপাল মজুমদারের কথা বলছ? তাঁকে আমি বলি 'বিনিদ্র সাধু', সর্বদাই তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। তারকেশ্বরের কাছে রণবাজপুরে তাঁর বাড়ী।"

পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি তারকেশ্বরের ট্রেন ধরলুম। নির্জন হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানধারণায় নিজেকে নিযুক্ত রাখবার বিষয়ে সেই "বিনিদ্র সাধু"টির কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করে আমার সংশয় দূর করব বলে আশা করেছিলুম। বিহারী পণ্ডিত মহাশয় আমায় বলেছিলেন যে রামগোপাল মজুমদার মহাশয় বাংলা দেশেই থেকে নির্জন গুহায় বহুবৎসর "ক্রিয়াযোগ" সাধনের পর শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তারকেশ্বর বাংলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। খ্রিস্টান ক্যাথলিকেরা ফ্রান্সের পবিত্র তীর্থস্থান লুর্ডসের প্রতি যেমন ভক্তি প্রদর্শন করে, হিন্দুরাও তারকেশ্বরকে তেমনি ভক্তি করে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে যে কত অসংখ্য লোক দৈবকৃপায় আরোগ্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই; তার মধ্যে আমাদের পরিবারেরও একজন ছিলেন।

আমার বড়পিসিমা একদিন আমায় বলেছিলেন, "তারকেশ্বরে গিয়ে একবার আমি একহপ্তা ধরে 'হত্যা' দিয়ে পড়েছিলুম। নির্জলা উপোষ করে তোমার খুড়োমশায় সারদাবাবুর একটা পুরানো রোগ সারাবার জন্যে আমি 'হত্যে' দিয়েছিলুম। সাত দিনের দিন হাতের মুঠোর ভিতর একটা ওষুধ পেয়ে গেলুম। তার পাতা সিদ্ধ করে তোমার খুড়োমশায়কে খাওয়াতেই রোগ একদম সেরে গেল,— আর কখনও হয় নি।"

পবিত্র তীর্থস্থান তারকেশ্বরে গিয়ে নামলুম। মন্দিরের বেদীতে গোলাকার প্রস্তরমূর্তি। অনাদিলিঙ্গ মহাদেব অনন্তেরই প্রতীক। দীনাতিদীন চাষাভুষোদের মধ্যেও দেবদ্বিজে খুব ভক্তি আছে, বস্তুত পশ্চিমের লোকেদের কাছে যা উপহাসের বস্তু।

আমার মনের ভাব তখন এমন উগ্র পাথরের ঠাকুরের কাছে যে মাথা নোয়াব, তার আর ইচ্ছা হল না। ভাবলুম, আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা উচিত। নতজানু হয়ে প্রণাম না করেই মন্দির ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম দূরবর্তী রণবাজপুর গ্রামের দিকে এগোবার জন্যে। রাস্তায় এক পথিককে

জিজ্ঞাসা করাতে, সে ত' মহা ভাবনায় পড়ে গেল। যাক্, শেষ পর্যন্ত আন্দাজ করে সে এই বলে একটা হদিস বাতলে দিলে,—"দেখ, এবার একটা রাস্তার মোড় দেখতে পেলে ডান দিকে বেঁকে সোজা চলতে থাকবে, তা হলেই ঠিক গাঁয়ে গিয়ে পেঁছুতে পারবে।"

লোকটার কথামত যে রাস্তা ধরে চললুম, সেটা একটা খালের ধার দিয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল, গাঁয়ের ধারে বনেজঙ্গলে জোনাকির মেলা ; চার ধারে শেয়ালের হুক্কাহুয়া। ক্ষীণ চাঁদের আলোর পাণ্ডুর হাসি। রাস্তার ঠিক ঠাওর পাওয়া যায় না। ঘণ্টা দুই ধরে হোঁচট খেতে খেতে চললুম।

গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ! বারম্বার চিৎকার করে ডাকতে একটি কৃষকপুঙ্গব তো আমার পাশে এসে উদয় হলেন। বললুম, "এখানে রামগোপাল বাবু কোথায় থাকেন, জান ?"

"ও নামে এ গাঁয়ে কেউ নেই।" জবাবটা রুক্ষ আর কিছু চড়া! "আপুনি মশাই বোধ হয় একটি টিকটিকি, মিছেমিছি ভাঁড়াচ্ছ!"

কি আর করি, তখনকার তার স্বদেশী হাঙ্গামাসন্ত্রস্ত মনের সন্দেহ দূর করবার আশায় আমার দুর্ভোগের কথা তার কাছে কাতরস্বরে বর্ণনা করলুম। লোকটার কি দয়া হল, তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভালরকম অতিথি সৎকার করলে।

যেতে যেতে বললে, "রণবাজপুর এখান থেকে বহু দূর। সেই রাস্তটার মোড়ে আপুনি বাঁ ধারে গেলেই পেতে, ডান ধারে নয়।"

হা ভগবান! সখেদে ভাবতে লাগলুম যে অচেনা পথে চলবার সময় পথিকদের কাছে আগের লোকটা কি রকম একটা মূর্তিমান দুর্গ্রহ আর দারুণ বিপদ! যাই হোক, অবশেষে মোটা চালের ভাত, মুসুরির ডাল আর তার সঙ্গে আলু-কাঁচকলার ঝোল দিয়েই পরম পরিতৃপ্তি সহকারে রাত্রির পরিপাটি ভোজন-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করে ত উঠানের পাশে একটি ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে শয়ন করা গেল। দূরে গ্রামবাসীরা খোল* আর করতালের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আলাপ করে চলেছে। সে রাত্রে নিদ্রার কথা আমার কাছে একেবার তুচ্ছই হয়ে রইল। ভগবানের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যাতে করে গুপ্তযোগী রামগোপাল বাবুর কাছে পেঁছিতে পারি।

রাত্রি প্রভাতে উষার প্রথম আলোর রেখা আমার অন্ধকার ঘরের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রণবাজপুরের দিকে যাত্রা শুরু করলুম। এবড়ো

---

* খোল—ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং শোভাযাত্রায় ভক্তিমূলক গানের (কীর্তন) সঙ্গে বাজান হয়।

খেবড়ো ধানের ক্ষেত, কাস্তে দিয়ে কাটা কাঁটাগাছের গোড়া আর শুকনো মাটির ঢিপির উপর দিয়ে মন্থরগতিতে অগ্রসর হলুম। মাঝে মাঝে দু একজন চাষার সঙ্গে দেখা হয়, এবং তাকে আর কতদূর জিজ্ঞাসা করলেই বলে, "এই কোশটাক আর আছে, বেশী দূরে নয়!" ভোর থেকে হাঁটা শুরু করে মাথার উপর সূর্য এসে পড়ল, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সেই "কোশটাক" পথ আর ফুরোয় না,—রণবাজপুর বরাবর একক্রোশ দূরেই রয়ে গেল!

বেলা তিন প্রহর গড়িয়ে গেল, সামনে তবুও সেই অন্তহীন ধানের ক্ষেত! উন্মুক্ত আকাশ থেকে গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবর্ষণের হাত এড়াবার উপায় নেই; আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম! গদাইলস্করী চালে একটি লোক এগিয়ে আসছে দেখে আর কতদূর আছে জিজ্ঞাসা করলুম অতি ভয়ে ভয়ে, পাছে লোকটা সেই একঘেয়ে জবাবই দিয়ে বসে, "এই আর কোশখানেক হবে আর কি!"

অপরিচিত লোকটি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেঁটে আর রোগা-গোছের চেহারা, তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত বিশেষ কিছুই নাই, কেবল একজোড়া অসাধারণ উজ্জ্বল আর কালো চোখ ছাড়া!

বিস্ময়স্তব্ধ মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, "রণবাজপুর ছাড়বার মতলব করেছিলুম, কিন্তু দেখলুম যে তোমার উদ্দেশ্য ভাল, তাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। তুমি ভারি চালাক, না? ভেবেছিলে যে, না বলে-কয়েই তুমি এসে আমায় পাকড়ে ফেলবে? বেহারী পণ্ডিতের কি দরকার ছিল তোমায় আমার ঠিকানা দেবার?"

সেই পরম সাধুটির সামনে আত্মপরিচয় দেওয়া তখন নিতান্তই বাহুল্য জ্ঞান করে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলুম। আমার অভ্যর্থনার ধরণ দেখে, তাতে খানিকটা আহত হলুম। তার পরের কথায় হঠাৎ প্রশ্ন হল, "আচ্ছা, আমায় বল তো, ভগবান কোথায় আছেন বলে তোমার মনে হয়?"

"আজ্ঞে, তিনি আমার ভিতর আর সর্বত্রই তো রয়েছেন।" উত্তর দিলুম, কিন্তু তখন আমার চেহারাতেও মনের বিহ্বল ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

"এ্যাঁ, সর্বব্যাপী তিনি, বল কি গো, সত্যি না কি?" সাধুটি হেসে বললেন, "তা হলে বাছা কালকে তারকেশ্বরের মন্দিরে তুমি সেই সর্বব্যাপী ভগবানের প্রস্তরমূর্তির সামনে মাথা নোয়ালে না কেন হে?* তোমার দম্ভের দরুণ ফল কি হল জান? রাস্তায় সেই লোকটা, যার ডাইনে বাঁয়ে জ্ঞান নেই,

---

* "যে কোন কিছুর সামনে মাথা নত করে না, সে নিজের ভারও নিজে বহন করতে পারে না।"—ডস্টয়েভস্কি, 'দি পজেসড্'

তার দ্বারা ভুলপথে চালিত হয়ে শাস্তি পেলে। আজকেও তুমি বেশ খানিকটা ভুগলে দেখছি।"

সর্বান্তঃকরণে আমিও তাই বিশ্বাস করলুম। বিস্ময়ে অভিভূত হলুম এই ভেবে যে, আমার সামনে এ রকম একটা অত্যন্ত সাধারণগোছের শরীরের ভিতর কি করে এমন সর্বদর্শী চক্ষু লুকিয়ে ছিল। সেই অদ্ভুত যোগীর কাছ থেকে কেমন একটা আশ্চর্য প্রাণারাম শক্তি এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললে। মাঠের মাঝখানে সেই আগুনের হুল্কার মধ্যেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্নিগ্ধ আর সুস্থ হয়ে উঠলুম।

তিনি বললেন, "সাধক ভাবতে চায় যে, সে যে পথ বেছে নিয়েছে সেইটেই হচ্ছে ভগবানকে পাবার একমাত্র পথ। যে যোগের দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবের উদয় হয়, সেই যোগই হচ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লাহিড়ী মহাশয়ও সেই কথাই আমাদের বলেছেন। অন্তরে ভগবানকে পেয়ে বাইরেও কিন্তু তাঁকে আমরা শীগগিরই পেতে পারি। তারকেশ্বর বা অন্যান্য তীর্থস্থানে লোকেদের যে এত ভক্তিশ্রদ্ধা তা ঠিকই, কারণ সে স্থানগুলি হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রস্থল।"

সাধুবরের তিরস্কারের ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হ'ল। চক্ষুতে স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি; সস্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "নবীন যোগী, দেখছি যে তুমি তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে পালাচ্ছ। আরে, তোমার যা যা প্রয়োজন সবই তো তাঁর কাছে আছে, তোমার আর ভাবনা কি? তাঁর কাছেই ফিরে যাও। পর্বত কি কখনো গুরু হয় নাকি?" রামগোপাল বাবু ঠিক সেই ভাবেরই পুনরুক্তি করলেন যা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দিন দুই আগে প্রকাশ করে-ছিলেন।

রামগোপাল বাবু আমার দিকে একটি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, "গুরুদের যে বিশ্ববিধানে কেবলমাত্র পাহাড় পর্বতেই বাস, তা নয়। ভারত বা তিব্বতের হিমালয়ের, সাধুসন্তদের উপর কোন একচেটে অধিকার নেই। এ দু জায়গা ছাড়া ভূভারতে আর কোথাও যে মুনিঋষিদের পাওয়া যায় না, তা নয়। অন্তরের মধ্যে যে জিনিস পাবার জন্যে লোকে অস্থির হয় না, তার জন্যে চারধাম ঘুরে বেড়ালেও কিছুরই দর্শন লাভ হয় না। সাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লাভের জন্য যেই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তও যেতে মনস্থ করে, অমনি দেখতে পায় যে, তার গুরু তার কাছেই এসে হাজির হয়েছেন।"

নীরবে মনে মনে সায় দিলুম। মনে পড়ল কাশীর আশ্রমে আমার প্রার্থনার উত্তরে জনাকীর্ণ গলিপথে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ!

"একটা ছোটগোছের ঘর যোগাড় করে নিতে পারবে কি, যেখানে দরজা বন্ধ করে তুমি একলা থাকতে পার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" দেখলুম যে সাধারণ থেকে ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে সাধু-মহাশয় অতি দ্রুতবেগে নেমে আসছেন।

"তাই হবে তোমার গুহা।" বলে আমার উপর তিনি যে জ্ঞানালোকদীপ্ত দৃষ্টিপাত করলেন তা আজ পর্যন্তও ভুলি নি। "সেটাই হবে তোমার হিমালয় পাহাড় আর সেখানেই ভগবানকে খুঁজে পাবে, বুঝলে?"

তাঁর সরল কথাগুলো তৎক্ষণাৎ আমার হিমালয়ের জন্য জীবনব্যাপী দৌর্বল্য একেবারে দূর করে দিলে। চিরন্তন তুষার আর পর্বতের স্বপ্ন থেকে আমি যেন সেই আগুনে ঝলসান ধানক্ষেতের মাঝে হঠাৎ জেগে উঠলুম।

"বৎস, তোমার ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তোমার উপর আমার প্রগাঢ় স্নেহ জন্মেছে।" বলে রামগোপালবাবু আমার হাত ধরে কাছেই জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি মনোরম কুটিরের ভিতর নিয়ে গেলেন। মাটির ঘর, নারকেলপাতা দিয়ে ছাওয়া, প্রবেশ পথে সদ্যফোটা ফুলের শোভা।

সাধুপ্রবর তাঁর ছোট্ট কুঁড়েঘরটির ভিতর একটি ছায়াশীতল বাঁশের মাচার উপর নিয়ে গিয়ে আমায় বসালেন। একখণ্ড মিছরি আর খানিকটা মিষ্টি লেবুর সরবত দিয়ে অতিথিসৎকার করবার পর আমরা মাটির রোয়াকে গিয়ে পদ্মাসন করে ধ্যানে বসলুম। ঘণ্টাচারেক ধ্যানে কাটল। পরে নয়ন উন্মুক্ত করে দেখলুম যে, জ্যোৎস্নাস্নাত যোগিবরের দেহ তখনও নিথর নিষ্পন্দ। উদরে তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলছে; রক্তচক্ষু প্রদর্শনে উদরকে শাসন করে বোঝাচ্ছি যে, মানুষ কেবল অন্নেরই দাস নয়, হেনকালে রামগোপালবাবু আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, "আহা দেখছি বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, না? আচ্ছা, শীগগিরই খাবার তৈরী হচ্ছে।"

রোয়াকের এককোণে মাটির উনুন জেলে ভাত আর ডাল চট্‌পট্ সিদ্ধ করে নামিয়ে কলাপাতায় বেড়ে দেওয়া হল। গৃহস্বামী রন্ধনকার্যে আমার সর্ববিধ সহায়তাই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। কথায় আছে "অতিথি নারায়ণ", তার সেবা যে পুণ্যকর্ম, এ নীতি হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল হতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করছে। পরবর্তীকালে ভ্রমণের সময় আমি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম যে, বহু দেশেরই গ্রামবাসীদের মধ্যে এই রকম অতিথিদের আদর আপ্যায়ন বা তাদের প্রতি সম্মান ব্যবহার প্রচলিত আছে। সহরবাসীর অতিথিসেবার উৎসাহ, অপরিচিত আননের আবির্ভাবের আতিশয্যে ক্রমশঃই ম্লান হয়ে পড়ে।

জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট সেই একটেরেতে যখন আমি সেই যোগিবরের কাছে আসনপি'ড়ি হয়ে বসেছিলুম, তখন হাটবাজারের শব্দ প্রায় অভাবনীয় দূরে বলেই মনে হচ্ছিল। কুঁড়ের ভিতরে সেই ছোট্ট ঘরটি একটি মৃদু স্নিগ্ধকোমল আলোয় যেন অপরূপ রহস্যময়। কতকগুলো ছেঁড়া কম্বল পেতে রামগোপাল-বাবু আমার বিছানা করে দিলেন আর নিজে একটা মাদুরের উপরেই বসলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির চৌম্বক আকর্ষণে অভিভূত হয়ে আমি ভরসা করে একটি অনুরোধ করে বললুম, "মশায়, আমায় 'সমাধি' লাভ করিয়ে দিন না কেন?"

"বাবা, ভগবৎসঙ্গ লাভ করিয়ে দিতে পারলে আমি খুবই খুশী হতুম, কিন্তু তা করবার লোক তো আমি নই।" সাধুপ্রবর তখন অর্ধোন্মীলিতনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করে বললেন, "তোমার গুরুদেব সে অনুভব তোমায় শীগগিরই দেবেন। তোমার শরীর এখনও পর্যন্ত তেমন ভাবে তৈরী হয় নি। ছোট ইলেকট্রিক ডুমে যেমন অতিরিক্ত কারেন্ট চালালে তক্ষুণি তা ফেটে যায়, তোমার তন্ত্রিকাগুলোও তেমনি সমাধিলাভের জন্যে এখনও উপযুক্তভাবে তৈরী হয় নি। তোমায় যদি আমি এখনই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই তা হলে তুমি এক্ষুণি জ্বলে শেষ হয়ে যাবে, মনে হবে যেন তোমার শরীরকোষের প্রতি অণুপরমাণুতে আগুন লেগে গেছে।"

চিন্তিতভাবে যোগিবর বলতে লাগলেন, "তুমি আমার কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান চাইছ! কিন্তু আমি ভাবছি, দীনাতিদীন আমি, সামান্য যেটুকু ধ্যানধারণা করতে পেরেছি—তা দিয়ে আমি ভগবৎকৃপা লাভ করতে পেরেছি কি না, আর শেষ হিসাবনিকাশের দিনে তাঁর চোখে আমার কি মূল্য দাঁড়াবে, তাও তো বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে!"

"মশায়, আপনি তো একান্তহৃদয়ে বহুদিন ধরেই ভগবানকে ডেকে আসছেন। তবে আর ভাবনা কিসের?"

"তা বটে, তবে বেশী আর আমি কিছু করতে পারি নি। বেহারী পন্ডিত বোধ হয় তোমায় আমার জীবনের কথা কিছু বলে থাকবে। বিশ বছর ধরে একটি নির্জন গুহায় আমি রোজ আঠার ঘণ্টা করে বসে ধ্যান করতুম। তারপর ওখান থেকে চলে গিয়ে আমি আরও একটি দুর্গম গুহায় প্রবেশ করে সেখানে পঁচিশ বছর ধরে রোজ প্রায় কুড়ি ঘণ্টা করে যোগাভ্যাস করতুম। ঘুমের আমার দরকার হত না, কারণ আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করতুম। সাধারণ অচেতন অবস্থার আংশিক শান্তির চেয়ে সমাধির পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যেই আমার দেহ পূর্ণবিশ্রাম লাভ করত।

"ঘুমের সময় মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ে; কিন্তু হৃদয়, ফুসফুস

এবং রক্তচলাচলের কাজ তো সর্বদাই চলেছে—তাদের কিছুমাত্র বিশ্রাম নেই। সমাধিলাভ হলে বিশ্বশক্তির বৈদ্যুতিকপ্রবাহে শরীরের ভিতরের যন্ত্রটন্ত্রগুলোর প্রাণশক্তি যেন স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। এই উপায়েই বহুবৎসর ধরে আমি ঘুমের কোন প্রয়োজন বোধ করি নি।" তারপর বললেন, "এমন সময় আসবে যখন তুমিও ঘুম ত্যাগ করতে পারবে।"

"আশ্চর্য! আপনি এতদিন ধরে ধ্যানধারণা করে এলেন, আর তবুও বলেন যে ভগবানের কৃপালাভ করবেন কি না? তা হলে আমাদের মত অভাগা অকিঞ্চনদের কি গতি হবে, বলুন দেখি?" বলে তো অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

"বাবা, এটা বুঝছ না কেন যে, ভগবানের অনন্ত রূপ। তাঁকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর ধ্যান করেই সব বুঝে ফেলব—এ আশা একান্ত অসংগত নয় কি? যাই হোক, বাবাজী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এমন কি সামান্যমাত্র ধ্যানেই মানুষের দারুণ মৃত্যুভয় বা পরলোকের ভয় নিবারণ হবে। দেখ, তোমার আধ্যাত্মিক আদর্শ সামান্য একটা ছোট্ট পাহাড়ে ধরে রেখ না। তাকে একেবারে অসীম ভগবৎপ্রাপ্তির নক্ষত্রলোকে তুলে ধর। কঠোর পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে পৌঁছুতে পারবে।"

আশায় উল্লসিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আরও সব জ্ঞানের কথা শুনতে চাইলুম। তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করলেন।* মাঝরাতের কাছাকাছি রামগোপালবাবু মৌনাবলম্বন করলেন, আর আমি কম্বলগুলোর উপর শুয়ে পড়লুম। চোখ বন্ধ করতে দেখলুম যে, চারধারে যেন অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর আমার ভিতরকার অনন্ত আকাশ যেন একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃর বন্যায় প্লাবিত! চোখ মেলে বাইরে চাইলুম,—দেখলুম যে সেই একই চোখঝলসানো আলো! অন্তশ্চক্ষুতে দেখতে পেলুম, যেন ঘরটা সেই অনন্ত মহাকাশের একটা অংশ হয়ে গেছে!

"ঘুম আসছে না, নাকি?"

"কি করে ঘুমোই বলুন, চোখ বুজলেই বা কি আর চাইলেই বা কি, চোখের সামনে যদি অনবরত বিদ্যুৎ চমকায়, তা হলে ঘুম আসবে কি করে, বলুন?"

রামগোপালবাবু সস্নেহে বললেন, "যাক, তোমার ভাগ্য ভাল, এ রকম

*৩৩শ পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অনুভূতি লাভ করলে। এ রকম আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃর দর্শন সহজে কারুর ভাগ্যে হয় না।"

ভোরবেলা হতেই রামগোপালবাবু আমায় এক টুকরো মিছরি দিয়ে বললেন, "এবার স্বস্থানে প্রস্থান কর আর কি!" তাঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে আসতে আমার এতদূর অনিচ্ছা হল যে, দুইগাল বেয়ে অশ্রুধারা অজস্রধারে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামগোপালবাবু তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে বললেন, "যাক্, নেহাৎ শুধু-হাতে তোমায় আজ আর ফেরাব না, একটা কিছু তোমার জন্যে করছি।" বলে একটু মৃদু হেসে আমার দি'কে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেল, আর নড়তেচড়তে পারলুম না। যোগিবরের কাছ হতে নিঃসৃত শান্তির তরঙ্গ আমার সকল সত্তাকে পরিপ্লাবিত করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠের একটা বেদনা একদম আরাম হয়ে গেল; বেদনাটা বহুবছর ধরে মাঝে মাঝেই আমায় কষ্ট দিচ্ছিল।

অপরূপ জ্যোতির্ময় আনন্দসাগরে স্নান করে উঠে যেন নবজন্ম পেলুম—আর কাঁদলুম না! সাধু রামগোপাল মজুমদারের চরণ স্পর্শ করে জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। তারপর নানা ঝোপঝাড় আর বহু ধানের ক্ষেত পার হয়ে তবে গিয়ে তারকেশ্বরে পেঁছিলুম।

সেই পবিত্র তীর্থস্থানে আবার দ্বিতীয়বার দর্শনের জন্য গিয়ে হাজির হলুম। এবার বাবা তারকেশ্বরের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম। অন্তর্দৃষ্টির সামনে দেখতে পেলুম যে, গোলাকার প্রস্তরখণ্ডটি যেন ক্রমশঃই বর্ধিত হয়ে মহাবিশ্বের নানাস্তরে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চক্রের মধ্যে চক্র, অঞ্চলের পর অঞ্চল, সবই যেন আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

ঘণ্টাখানেক বাদে প্রফুল্ল চিত্তে কলকাতার ট্রেন ধরলুম। আজ আমার ভ্রমণের শেষ—উচ্চ পর্বতমালার মধ্যে নয়, কিন্তু হিমালয়ের মত মহান উচ্চ আমার গুরুদেবের সম্মুখে!

১৪শ পরিচ্ছেদ

সমাধির অনুভূতি

লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল, ঘাড় হেঁট করে গিয়ে দাঁড়ালুম—"এলুম, গুরুদেব!" মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "চল, চল, রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবার যোগাড় করা যাক!" তাঁর কথাবার্তা এত সহজ আর স্বাভাবিক, যেন কয়েক দিন নয়, এই মাত্র কয়েক ঘণ্টা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

"গুরুদেব, আশ্রমের কর্তব্য সব ত্যাগ করে হঠাৎ এখান থেকে ছেড়ে চলে যাওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ভেবেছিলুম রাগ করবেন।"

"না হে, না, মোটেই নয়। রাগ কোথা থেকে হয়, জান? অবদমিত ইচ্ছা থেকেই রাগের উৎপত্তি। আমি তো কারুর কাছ থেকে কোন কিছুরই প্রত্যাশা করি না, কাজেই তাদের কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধনে তো তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যে সত্যিই সুখী হয়েছ, তাতেই আমি সুখী।"

"গুরুদেব, অহেতুক স্নেহ যে কি, সাধারণ লোকের কাছে সে ধারণা খুব বেশী স্পষ্ট নয়। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম আমি আপনার দেবশরীরে তার খাঁটি উদাহরণ দেখলুম। এ সংসারে তো সবই জানা আছে; না বলে কয়ে বাপের কাজকর্ম ফেলে ছেলে যদি সরে পড়ে, তা হলে বাপও কখন তাকে সহজে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনার কিছুমাত্র বিরক্তিও এল না,—বিশেষতঃ কত সব কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়ে, আপনাকে কত না অসুবিধায় ফেলে গিয়েছিলুম?"

দুজনেরই চোখে জল। আনন্দের ঢেউ এসে আমায় যেন ভাসিয়ে দিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে গুরুরূপে ঈশ্বর আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভালবাসার পরিধি ভগবৎপ্রেমের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে প্রসারিত করে দিচ্ছেন।

দিনকতক বাদে একদিন সকালে আমি গুরুদেবের বসবার ঘর খালি দেখে গিয়ে ঢুকলুম,—মতলব ছিল ধ্যানে বসব। কিন্তু নানা অশান্ত আর অবাধ্য চিন্তা এসে আমার সে সাধুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। ব্যাধের সামনে এক ঝাঁক পাখীর মত তারা চার ধারে উড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ভিতরকার একটা দূরের

বারান্দা হতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুকুন্দ!" মনটা আমার অশান্ত চিন্তার মতই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মনে মনে বললুম, "গুরুদেব তো আমায় সর্বদা ধ্যান করতে বলেন, আর এ ঘরে এলুম কেন তাও জানেন; তখন আর আমায় তাঁর বিরক্ত করা উচিত হয় না।"

আবার ডাক এল, গোঁয়ার্তুমি করে চুপ করে বসেই রইলুম। তিন বারের বার ডাকেতে বেশ বকুনির ঝাঁঝ আছে টের পাওয়া গেল। তবুও প্রতিবাদের সুরে বললুম, "গুরুদেব, ধ্যান করছি।"

গুরুদেব চেঁচিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বুঝেছি, তোমার কি রকম ধ্যান করা হচ্ছে! মন তো তোমার ঝড়ের মুখে উড়ো পাতা। শীগগির নীচে নেমে এস।

মনের আসল রূপটি ধরা পড়াতে আর তিরস্কৃত হয়ে, ক্ষুণ্ণমনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালুম; গুরুদেব অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বাছা, তুমি যা চাইছ কুবেরও তা তোমায় এনে দিতে পারে না!" তাঁর দৃষ্টি শান্ত, গভীর, অতলস্পর্শী। তারপর বললেন, "তোমার অন্তরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে!"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কদাচিৎ হেঁয়ালিতে কথা বলতেন। আমার বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চাইছেন। যাক্, তারপর তিনি আমার ঠিক বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত দিয়ে একটা মৃদু আঘাত করলেন।

আমার সমস্ত শরীর যেন জমে অনড় পাথর হয়ে গেল। ফুসফুস হতে কে যেন একটা প্রকাণ্ড চুম্বক দিয়ে সমস্ত নিঃশ্বাস একেবারে টেনে বার করে নিয়েছে। আত্মা আর মন জড়দেহের বন্ধন হতে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে তরল তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃধারার ন্যায় যেন প্রতি লোমকূপ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে। শরীর মৃতবৎ, কিন্তু গভীর চেতনার মধ্যে এমন জাগ্রত অবস্থা, এত পরিপূর্ণ জ্ঞান যেন জীবনে আর কখনও পাই নি। আমার আত্মবোধ এখন আর ক্ষুদ্র জড় দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয়, চতুর্দিকের সকল বস্তুর যেন প্রতি অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। দূরে রাস্তার লোকগুলো যেন আমারই সুদূর পরিধির মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে ফিরছে। গাছপালা, লতাপাতার শিকড়গুলো যেন মাটির মৃদু স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গাছের ভিতরকার রসসঞ্চালন অবধি আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।

আশপাশের সব জিনিসই একটা পরিষ্কার দৃশ্যপটের মতন চোখের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। আমার সাধারণ সম্মুখদৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে

যেন একটা বিরাট বিশ্বব্যাপী মণ্ডলাকার দৃষ্টিতে পরিণত হল,—সকল বস্তু, সকল বিষয় সর্বত্র একই সময়ে দৃষ্ট আর অনুভূত হচ্ছে। মস্তিষ্কের পিছন দিয়ে দেখতে পেলুম, রায়ঘাট লেন হতে বহুদূর পর্যন্ত লোকগুলো হেঁটে চলেছে; আরও দেখা গেল যে, একটা সাদা গরু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আশ্রমের খোলা সদর দরজার সামনের জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতে, তাকে যেন আমি এই দেহের চক্ষুদুটি দিয়ে দেখতে লাগলুম, আবার ধীরে ধীরে ইঁটের দেওয়ালের ওপাশে সে গিয়ে পড়লে, তখনও তাকে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলুম।

আমার চোখের সামনে সুবিস্তৃত দৃশ্যপটের ভিতরকার সমস্ত জিনিসই যেন চলচ্চিত্রের পরদার ছবির মতন কাঁপছিল। আমার শরীর, গুরুদেবের শরীর, থামেঘেরা দালান, আসবাবপত্র, মেঝে, গাছপালা, সূর্যকিরণ, মাঝে মাঝে হঠাৎ ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে উঠে এক বিরাট জ্যোতিঃসমুদ্রে যেন গলে যাচ্ছিল —এক গ্লাস জলে চিনির দানা দিয়ে ঝাঁকালে যেমন সেগুলো একেবারে গলে যায় ঠিক তেমনি। সেই জ্যোতিঃসাগরে এক হয়ে বিলীন হয়ে যাবার মাঝে মাঝে নানাবিধ সৃষ্টির রূপপরিগ্রহে সেই অপরূপ আলোর পরিবর্তন ঘটছিল, আর সেই রূপান্তর গ্রহণের সময় সৃষ্টির কার্য-কারণ তত্ত্বের আভাসও প্রকাশ পাচ্ছিল।

অতলগভীর নীরব আনন্দসাগরে মন তখন ভাসছে। ঈশ্বরোপলব্ধিতে অনুভব করলুম এক অপার অসীম আনন্দ; তাঁর দেহ যেন অগণিত জ্যোতিস্তন্তু দিয়ে গড়া। আমার ভিতর তাঁর অপূর্ব আবির্ভাবের বিরাট মহিমা যেন ক্রমশঃ নগর, মহাদেশ, পৃথিবী, সূর্যচন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, মহাশূন্যে ভাসমান জগৎসকল, সবই যেন ছেয়ে ফেলতে লাগল। আমার অনন্ত সত্তার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যেন রাত্রিতে দূর থেকে দেখা কোন শহরের মত ঈষৎ আলোকে দীপ্ত। পৃথিবীমণ্ডলের পরিস্ফুট দিকচক্রবাল রেখার পরে উজ্জ্বল আলো যেন তার দূরতম প্রান্তে ঈষৎ মিলিয়ে গেছে; সেখানে এক অতি মৃদু আর স্নিগ্ধ আলোর অনির্বাণ জ্যোতিঃ! এ জ্যোতিঃর স্নিগ্ধ মৃদুতা অবর্ণনীয়। সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রের অন্যান্য ছবি সব যেন আরও স্থূল আলোয় গড়া।*

যেন এক অনন্ত উৎসমুখ হতে স্বর্গীয় আলোর ধারা সহস্রধারে উৎসারিত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জরূপে জ্বলে উঠে আবার এক অনির্বচনীয় জ্যোতির্মণ্ডলে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বারবারই দেখতে লাগলুম, যেন সেই সৃজনকারী রশ্মিগুলো

*আলোই যে সৃষ্টির সার পদার্থ তা ত্রিশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

গাঢ় সংবদ্ধ হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জে ঘনীভূত হয়ে আবার স্বচ্ছ অগ্নিশিখারাশিতে পরিণত হয়ে যেতে লাগল। যেন এক সুসম্বদ্ধ ছন্দে আসাযাওয়ার তালে তালে লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক স্বচ্ছ সুনির্মল জ্যোতিঃতে রূপান্তরিত হল; বিরাট অগ্নিমণ্ডল যেন বিশাল গগনে পরিণত হল।

আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হল যে, সেই উর্ধ্বতম স্বর্গের কেন্দ্রস্থলেই হচ্ছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের সহজাত অনুভূতির স্থান। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বাংশেই যেন আমার কেন্দ্র হতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃর ছটা সহস্রধারে ছড়িয়ে পড়ছে। দেহে মনে অমৃতের ধারা বয়ে চলেছে তরলভাবে, তীব্র বেগে, ঢেউয়ের উপর ঢেউ তুলে। নাদব্রহ্মের শব্দরূপ ওঙ্কারধ্বনি,* প্রণব ঝঙ্কারে শুনতে পেলুম—বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দন!

হঠাৎ আবার নিঃশ্বাস ফুসফুসের ভিতর ফিরে এল। প্রায় অসহ্য নৈরাশ্যে অনুভব করলুম যে আমার সেই অসীম বিরাট সত্তা একেবারে লোপ পেল। আবার সেই সামান্য ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে এসে আবদ্ধ হলুম, যাতে করে আত্মার অতবড় বিরাট ব্যাপ্তিকে সহজে ধরে রাখা যায় না। অমিতব্যয়ী পুত্রের মত আমি যেন আমার সেই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবাস পরিত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিলুম, এখন এই ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডের মধ্যে এসে আবার নিজেকে কারারুদ্ধ করলুম।

গুরুদেব সামনেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুদিনের বাঞ্ছিত তৎ-কর্তৃক প্রদত্ত সমাধির অভিজ্ঞতালাভে আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর পদতলে পড়তে যাচ্ছিলুম দেখে, তিনি আমায় সোজা দাঁড় করিয়ে ধীরস্বরে বললেন, "দেখ, এ আনন্দমধুপানে উন্মত্ত হয়ো না; জগতে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে। এস, এখন বারান্দা ঝাঁটপাট দিয়ে তারপর একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বেড়ান যাক, চল!"

একটা ঝাঁটা আনলুম। জানতুম যে গুরুদেব আমায় সুসম্বদ্ধ জীবনযাপনে শিক্ষা দিচ্ছেন। আত্মা বিশ্বসৃষ্টির অসীম রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকলেও দেহ কিন্তু তার দৈনন্দিন কর্তব্যসকল ঠিক নিয়মিত করে যাবে। খানিক পরে যখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আর আমি বেড়াতে বেরোলুম, তখনও দেহমন অনির্বচনীয় আনন্দে মত্ত। দেখলুম, আমাদের দুটো ছায়াছবি এক আলোর নদীর ধারে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে।

*"আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত ছিল, আর বাক্যই ঈশ্বর ছিল"। ১:১ (বাইবেল)।

গুরুদেব বোঝাতে লাগলেন, "এই বিশ্বজগতে যা কিছু আছে, তার আকৃতিপ্রকৃতি, গতি, শক্তি, সবই কিছু সেই পরমাত্মাই সক্রিয়ভাবে ধারণ করে রয়েছেন, তবুও তিনি এইসব জগৎ ব্যাপারের বহির্ভূত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়রূপেই অবস্থান করছেন। সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান সহজপ্রাপ্য নয়, তিনি 'অবাঙ্মনসগোচর'।* যে সব উচ্চশ্রেণীর সাধকের এই রক্তমাংসের দেহেই ঈশ্বরভাবের উপলব্ধি হয়, তাঁদের এই ধরনের দুইপ্রকার জীবনের অনুভূতি থাকে। সংসারের কর্তব্য সব বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন, অথচ অন্তরে ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবে আছেন। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—তাঁর অসীম অপার আনন্দসত্তা হতেই তো সকল প্রাণীর উৎপত্তি। এই ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে তারা যতই আবদ্ধ হোক না কেন—ভগবান নিশ্চয়ই চান যে, তাঁর প্রতিরূপ এই সব জীবাত্মাসকল, পরিশেষে সকল ইন্দ্রিয়বোধ হতে মুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আবার পুনরায় মিলিত হোক্।"

এই আত্মদর্শনলাভে আমার কতকগুলো স্থায়ী শিক্ষা হল। দৈনিক চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করে মনের যে শান্তভাব আসত, তাতে আমার দেহটা যে রক্তমাংস আর হাড়ের খাঁচা,—এই জড়জগতের কঠিন ভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ভাব থেকে মুক্তি পেতুম। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস আর অস্থির মন,

---

*"কারণ পিতা কোন মনুষ্যকে বিচার করেন না, কিন্তু তিনি পুত্রকে সমস্ত বিচারভার অর্পণ করিয়াছেন"।—জন ৫:২২। "কোন লোকই কোন সময়ে ঈশ্বরকে দেখে নাই; তাঁর একজাত পুত্র যিনি পিতার বক্ষে আছেন, তিনিই তাঁকে প্রচার করিয়াছেন।"—জন ১:১৮। "ঈশ্বর.........সকল কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন যীশুখৃষ্টের দ্বারা।"—এফিসিয়ান্স্ ৩:৯। "যে আমায় বিশ্বাস করে, যে সকল কাজ আমি করি সে সমস্তই সেও করিতে পারিবে; ইহার অপেক্ষা আরও বড় বড় কাজও সে করিতে পারিবে কারণ আমি আমার পিতার নিকট যাই"।—জন ১৪:১২। "শান্তিদায়ক, যিনি হইতেছেন পবিত্রাত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাইবেন, তিনিই তোমায় সব কিছু শিখাইবেন, আর যা কিছু আমি তোমায় বলিয়াছি, সে সব কিছুই তোমায় স্মরণ করাইয়া দিবেন।" জন ১৪ : ২৬ (বাইবেল)।

বাইবেলের এই সব উক্তি ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির নির্দেশক পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা (হিন্দুশাস্ত্রে সৎ, তৎ, ওঁ রূপে বর্ণিত।) ঈশ্বর পিতারূপে অব্যক্ত আর সৃষ্টির অতীত। পুত্ররূপে ঈশ্বর হচ্ছেন খৃষ্টচৈতন্য (ব্রহ্ম অথবা কূটস্থ চৈতন্য) সৃষ্টির অধীন। এই খৃষ্টচৈতন্য হচ্ছে একজাত অথবা অনাদি অনন্তের একমাত্র প্রতিরূপ। এই সর্বব্যাপী খৃষ্টচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ অথবা সাক্ষী হচ্ছে (রিভিলেশন্স্ ৩:১৪—বাইবেল) ওঙ্কার, বাক্য বা পবিত্রাত্মা; অদৃশ্য ঐশীশক্তি বা একমাত্র কারণ বা ক্রিয়াশক্তি যা স্পন্দনের মধ্য দিয়ে সকল সৃষ্টি ধারণ করে। ধ্যানে এই ওঙ্কার বা প্রণব ঝঙ্কারের স্বর্গীয় আনন্দময়ধ্বনি শোনা যায় যা "সকল বিষয় স্মরণে এনে" ভক্তের নিকট পরম তত্ত্ব প্রকাশ করে।

যেন ঝড়ের মতন একটা জ্যোতিঃসাগরের উপর আছড়ে পড়ে, তার উপর তরঙ্গ তুলে, এই সব জড়পদার্থের সৃষ্টি করছে—আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, পশুপক্ষী, প্রাণী, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ। যতক্ষণ না এই সব ঝড়কে শান্ত করা যায়, ততক্ষণ সেই অসীম সত্তাকে এক অখণ্ড জ্যোতিঃরূপে অনুভব করা যায় না।

যতবারই আমি ঐ দুটো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে শান্ত করেছি, দেখেছি যে, সৃষ্টির অসংখ্যরূপ যেন এক অনন্ত জ্যোতিঃসাগরে গলে যাচ্ছে, ঠিক যেমন সমুদ্রের উপর ঝড় প্রশমিত হলে সমুদ্র তখন এক প্রশান্ত অখণ্ড বিস্তৃতিতে পরিণত হয়।

শিষ্য যখন ধ্যানধারণায় মনকে এমনভাবে শক্ত করে গড়ে তোলে, যাতে করে কোন বিরাট অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলতে পারে না, তখনই গুরু ব্রহ্মানন্দলাভের অনুভূতি তাকে দান করেন। মনের ঋজুতা বা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বা একান্ত ইচ্ছা থাকলেই যে তা দেওয়া যায়, তা নয়। অবিরত যোগাভ্যাস সাধনে বিরাট উন্নতি ও শক্তিসঞ্চয় হলে এবং শ্রদ্ধাভক্তি থাকলে, তবেই মন সর্বব্যাপিত্বের বিরাট অনুভূতির প্রচণ্ড ধাক্কা সইতে পারে।

প্রকৃত ভক্ত যিনি, তাঁর কাছে এই স্বর্গীয় অনুভূতি একটা স্বাভাবিক পরিণতিরূপে অতি সহজেই এসে যায়। তাঁর ঈশ্বরলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা, তাঁকে দুর্ণিবারবেগে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, আর সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, প্রেমময় ভগবানও সমাধিরূপে ভক্তের প্রেমের টানে তাঁর অন্তরে এসে বাঁধা পড়েন।

এই বিরাট ভাবের মহিমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে আমি "সমাধি" নামে এই কবিতাটি রচনা করেছিলুম,—

আলোছায়ার মায়াজাল ছিঁড়ে গেছে আজ,
দুঃখেরও বাষ্পমাত্র নাই,—
ক্ষণস্থায়ী আনন্দের উষা, এবে তাও অপগত,
ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণ মরীচিকা সেও মিলায়েছে।

প্রেম, ঘৃণা, স্বাস্থ্য, রোগ, জনম, মরণ,
মায়াপটে প্রকাশিত এ সবের মিথ্যাছায়া পাইয়াছে লয়।
মায়ার প্রবল ঝঞ্ঝা,
নিজবোধরূপ যাদুদণ্ড স্পর্শে এবে চিরশান্ত আজ।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, আর আমা'তরে নয়,
শুধু আছে শাশ্বতিক, সর্বব্যাপী আমি—আমিই সর্বতঃ।
গ্রহনক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জ,—এ পৃথিবী,
মহাপ্রলয়ের অগ্ন্যুদ্গার, আর
সৃষ্টির জ্বলন্ত চুল্লী,
স্তব্ধ "এথারে"র তুষারস্রোত, জ্বলন্ত "বিদ্যুতিন্" বন্যা,
অতীত, বর্তমান আর অনাগত ভবিষ্যতের
সবাকার চিন্তাধারা,
প্রতি তৃণদল, আমি, সকল মানবজাতি আর,
মহাবিশ্বের প্রতি অণুপরমাণু,
ক্রোধ, লোভ, শুভাশুভ, মুক্তি, কাম,
আমাতে বিলীন সবে,
যেন তারা একমাত্র মোর অস্তিত্বের.
সর্বব্যাপী সত্তারূপে পরিণত আজ !

গভীর ধ্যানের মাঝে প্রায়জাত যে আনন্দের জ্যোতিঃ
রোধ করে অশ্রুপূর্ণ আঁখি,—
পরিণত হয়ে তারা আনন্দের অনির্বাণ অগ্নিশিখারূপে
গ্রাস করে অশ্রুধারা, দেহমন সব কিছু মোর !

তুমি—আমি, আমি—তুমি,
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, আজ—সবি একাকার।
অখণ্ড পরমানন্দ, আর নিত্য নবশান্তি চিরবর্তমান।

সমাধির অনুভূতি, সে আনন্দের রূপ, আশার অতীত আর কল্পনার পার,
এ নয় অজ্ঞান ভাব,
কিম্বা চৈতন্যের অবসাদকারী,—মানসিক ক্লোরোফর্ম,
যাতে করে স্বইচ্ছায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই ;
এ সমাধি ব্যেপে চলে আমার জ্ঞানের পরিধি,
এ নশ্বর দেহ অতিক্রমি',—অনন্তের সীমাহীনতায়—
যেখানেতে মহাবিশ্বপারাবার আমি,
দেখিতেছি ক্ষুদ্র "আমি", আমাতেই ভাসমান আজ।

শোনা যায় অণুদের সচল মর্মরধ্বনি,
অন্ধকার এ পৃথিবী, শৈলমালা, উপত্যকা সব,—হায়, গলিত তরল।
সাগরপ্রবাহ সব নীহারিকাবাষ্পে পরিণত।

ওঙ্কার প্রণবধ্বনি ঝঙ্কারিছে সে বাষ্পের 'পর,
মুক্ত করি অপরূপ 'গুণ্ঠন তাদের,
প্রকাশিছে জ্যোতির্ময় অণুপরমাণুদের বিশাল বারিধি;
অবশেষে মহাবিশ্বসঙ্গীতের* শেষ মূর্চ্ছনায়,
জড়ের আলোকরশ্মি—সর্বব্যাপী মহানন্দের
অনন্ত জ্যোতিঃর মাঝে মিশে যায় ধীরে।

* * * *

এসেছি আনন্দ হতে, আনন্দেতেই বেঁচে রব, মিশে যাব শেষে,
অনাবিল ভূমানন্দ মাঝে।
আমার মনের সাগরে, সৃষ্টির সকল ঊর্মি পান করি আমি।

কঠিন, তরল, বাষ্প, আলোকের ধারা
অবগুণ্ঠন এ চারের খুলে যায় এবে,
সকলেতে ক্ষুদ্র "আমি" প্রবেশিছে,—"বড় আমি" মাঝে।
ক্ষণস্থায়ী, ক্ষীণরশ্মি মর্ত্যের স্মৃতির ছায়া সব,
মিলায়েছে চিরতরে আজ।

নিম্নে, সম্মুখে আর ঊর্ধ্বে তার—মনের আকাশ মোর,
অকলঙ্ক ছায়ালেশহীন,
হাসির বুদ্বুদ ক্ষুদ্র—আমি, আজ
আনন্দের মহাসাগরেতে পরিণত।

ইচ্ছামাত্র কিরূপে এ অপূর্ব অনুভূতি লাভ করা যায়, তা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন; আর শিখিয়েছিলেন, যাদের ব্রহ্মনাড়ী

*ওঙ্কার—নাদব্রহ্মের স্পন্দন।

পরিপুষ্ট হয়েছে, তাদের উপরেও এ ভাব কি করে সঞ্চারিত করা যায়।* প্রথম অনুভবের পর মাসের পর মাস ধরে যখন আমি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতুম, তখন বুঝতুম যে উপনিষদ তাঁকে "রসো বৈ সঃ, "—রসস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছে কেন।

কিন্তু মনে এক সমস্যা উপস্থিত হল দেখে, একদিন গুরুদেবের কাছে ছুট্‌লুম জিজ্ঞাসা করতে,—"প্রভু বলতে পারেন, ভগবানকে কবে পাব ?"

"তুমি ত তাঁকে পেয়েছ !"

"আজ্ঞে না মশায়, কৈ আমার তো তা বলে মনে হয় না !" গুরুদেব মৃদু হাসছিলেন,—বললেন, "তুমি বোধ হয় ভাবছ যে এক মহিমময় মূর্তি দেখব যাঁর মাথায় স্বর্গীয় ছটা, এই বিশ্বমাঝে কোন পুণ্যস্থানে হয়তো সিংহাসন আলোকিত করে বসে রয়েছেন ! যাই হোক, দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি মনে করেছ কিছু সিদ্ধিটিদ্ধি লাভ হলেই ভগবানকে জানা যায়, না ? হায়, হায়, তা নয় গো, এ তা নয়। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তোমার যাকে বলে হাতের মুঠোয় "করামলকবৎ" আর কি, সেই রকম এসে পড়লেও ভগবান যে সুদূরে সেই সুদূরেই থেকে যান। বাইরে কোন সিদ্ধাইটিদ্ধাই-এর প্রকাশে এ বোঝায় না যে, তার খুব আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে,—তা বোঝায় তার ধ্যানানন্দের গভীরতা দেখে, বুঝলে ?

"এ আনন্দ কি রকম জান ? চিরনূতন আনন্দ, নিত্যানন্দ—কখনও ফুরায় না। বছরের পর বছর ধরে এমনি জপতপ, ধ্যানধারণা করে যাও, তিনি তাঁর অনন্ত লীলা দিয়ে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাবেন। তোমার মতন ভক্তরা, যাঁরা এই রকম করে ভগবানকে পেয়েছেন, তাঁরা এ আনন্দ, এ সুখ, আর কোনও সুখের বদলে নিতে চাইবেন না, বুঝলে ? ধরি ধরি করেও তাঁকে ধরা যায় না, এমনই তাঁর লুকোচুরি খেলা !

"দেখ, সংসারের সুখ কত শীগ্‌গির ফুরিয়ে যায়। এ জগতে বাসনা-কামনার অন্ত নেই। পার্থিব সুখের আশা অফুরন্ত। মানুষ কখনও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না ; একটা আশা মিটলেই আবার একটার পিছনে ছোটে। মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে এ সংসারে সে ছুটেই চলেছে, কিসের আশায় তা সে নিজেই জানে না। 'একটা কিছুর জন্য' নিশ্চয়ই, যাতে সে মনে করে যে

---

*প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জনকয়েক ক্রিয়াযোগীর উপর আমি এই সমাধিলাভের ভাব সঞ্চারিত করেছি। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিঃ জেমস জে, লিন,—এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট একখানি চিত্রে তিনি সমাধিমগ্ন।

সে তৃপ্তি পাবে, শান্তি পাবে,—সেই 'একটা কিছু' কি জান? সেই তিনিই, একমাত্র যিনি তাকে চিরশান্তি দিতে পারেন, বুঝলে?

"বাইরের আকর্ষণ আমাদের অন্তরের স্বর্গ হতে নির্বাসিত করে দেয়। তারা যে মিথ্যা সুখ আনে, সেটাকেই আমরা আত্মারাম বলে ভুল করি। হৃতস্বর্গের আবার পুনরুদ্ধার হয় ঈশ্বরের গভীর ধ্যানে। ভগবান হচ্ছেন অনাস্বাদিতপূর্ব চিরনূতন আনন্দ! চিরনবীন সে আনন্দ সম্ভোগে কি কখনও ক্লান্তি আসে, কখনও অবসাদ আনে? সেই অপার আনন্দের অনন্তবৈচিত্র্যে কি কখন বিতৃষ্ণা আসে, বল?"

"গুরুদেব এখন বুঝলুম, কেন সাধুমহাপুরুষেরা তাঁকে অনির্বচনীয় বলে গেছেন। বোধ হয় অনন্ত জীবন পেলেও তাঁর পরিমাপ করা যায় না।"

"তা' সত্যি বটে, কিন্তু তা হলেও তিনি অন্তরের অন্তরতম ধন। ক্রিয়াযোগ সাধনে মন হতে ইন্দ্রিয়বোধের সব বাধাবন্ধ দূর হলে, ধ্যানে ঈশ্বরের দুই রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আবির্ভাবের চিরনবীন আনন্দ আমাদের প্রতি অণুপরমাণু টের পায়, আর ধ্যানে পাওয়া যায় তাঁর সদ্য সদ্য নির্দেশ, কোন্ পথ অবলম্বন করে চলব আর পাই আমাদের প্রত্যেক সঙ্কটেই তাঁর যথাযোগ্য উত্তর।"

কৃতজ্ঞহাসিতে মুখ ভরে গেল, বললুম, "গুরুজী, দেখছি যে আপনি আমার সন্দেহ নিরসন করেছেন। আমি এখন বুঝছি যে আমি ঈশ্বরকে পেয়েছি, কারণ যখনই আমার কাজকর্মের সময় ধ্যানের আনন্দ অবচেতন মনে এসে উদয় হয়, তখনই কে যেন আমায় আমার সকল বিষয়ে, এমন কি অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও ঠিক খাঁটি পথ অবলম্বন করতে অতি সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত করেন।"

গুরুদেব বললেন, "মানুষের জীবন কেবল দুঃখেই ভরা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কেবল সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে শিখি। তাঁর 'ন্যায়পথ' অনেক আত্মাভিমানীর কাছেই রহস্যাবৃত। একমাত্র ভগবানই নির্ভুল পথনির্দেশ করতে পারেন, আর কেউ নয়; তিনি ছাড়া আর কে এই বিশ্বসংসারের ভার বহন করছে, বল?"

১৫শ পরিচ্ছেদ

ফুলকপি চুরি

"গুরুদেব, আপনার জন্যে এই গোটাছয়েক বড় বড় ফুলকপি এনেছি। ফুলকপিগুলো নিজে হাতে পুঁতেছিলুম, তারপর খুব যত্নটত্ন করে, এতবড় করে তুলেছি।" বলে যথোপযুক্ত ভঙ্গির সঙ্গে হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখলুম।

গুরুদেব কপিগুলি পেয়ে খুব খুসী হয়ে বললেন, "বেশ বেশ, তুমি এগুলোকে তোমার ঘরে নিয়ে রাখ। কালকে একটা বিশেষ ভোজে এগুলো লাগবে।"

কলেজ গ্রীষ্মের ছুটির দরুণ বন্ধ। সমুদ্রতীরে, গুরুদেবের পুরীর আশ্রমে, ছুটিটা কাটাব বলে এসেছি। গুরুদেব ও তাঁর শিষ্যগণের তৈরী মনোরম দ্বিতল বাটিকা। সম্মুখে বঙ্গোপসাগর।

তার পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল; সমুদ্রের হাওয়া আর আশ্রমের শান্ত মাধুর্যে শরীর তাজা, মন বেশ প্রফুল্ল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমায় ডাকছেন। ফুলকপিগুলোকে একবার দেখে নিয়ে খাটের তলায় ভাল করে গুছিয়ে রেখে দিয়ে এলুম।

"চল সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক,' বলে তিনি এগিয়ে চললেন; কতক-গুলি অল্পবয়সী শিষ্য আর আমি এধার ওধার ছড়িয়ে পড়ে তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলুম। গুরুজী দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখ, সাহেবরা হাঁটবার সময় দুজনে একসঙ্গে পা ফেলে কেমন হাঁটে দেখেছ? তোমরাও তেমনি দুজন দুজন করে একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটতে শুরু কর।" গুরুজী দেখতে লাগলেন, তাঁর কথামত কেমন করে চলি। তারপর শুরু করলেন, "ছেলেরা সব এগিয়ে চলে, একটি করে ছোট্ট দলে।" গুরুজীও ছোকরা শিষ্যদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না।

"আরে থাম, থাম," গুরুজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, "মুকুন্দ! আশ্রমের খিড়কিদরজা বন্ধ করে এসেছো কি, মনে পড়ছে?"

"আমার ত মনে হয়, গুরুজী।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মিনিটকতক চুপ করে রইলেন; ঠোঁটে তাঁর চাপা

হাসি! তারপর শেষে বললেন, "না, তুমি ভুলে গেছ। দেখ, ধ্যানধারণা কর বলে সংসারের কাজে অবহেলা করার দরুণ তার দোহাই পাড়া চলে না। আশ্রমে যাতে চুরিচামারি না হয় তা দেখা ত' তোমার কর্তব্য ছিল! তা যখন অবহেলা করেছ, তখন তোমায় শাস্তি পেতে হবে বই কি?" তারপর যখন বললেন যে, "তোমার ছটা ফুলকপি শীগগিরই পাঁচটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দেখগে"—তখন ভাবলুম তিনি হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে ঠাট্টাই করছেন। যাই হোক শেষ অবধি আমরা গুরুদেবের আদেশে আবার আশ্রমের দিকে ফিরে চললুম। কাছাকাছি যেই পেঁাচেছি, গুরুদেব অমনি বললেন, "একটু দাঁড়াও দেখি মুকুন্দ! উঠোনের বাঁ ধারে ঐ রাস্তার দিকে একটু নজর রাখ, এখুনি একটি লোক এসে হাজির হবে, আর ওর জন্যেই তোমায় বকুনি খেতে হবে, বুঝলে?"

এসব দুর্বোধ্য কথার মানে বুঝতে না পেরে মনের বিরক্তি মনেই গোপন রাখলুম। দেখলুম, একটা চাষা গোছের লোক রাস্তার মাঝখানে এসে হাজির হল, এসেই সে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বেতালা হাত পা ছুঁড়ে নাচতে শুরু করে দিলে। অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি। রাস্তার একটা জায়গায় পেঁাছে যেমনি লোকটা চোখের আড়াল হবার উপক্রম হল, অমনি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "এইবার দেখ, ও ফিরবে।"

চাষা লোকটা সত্যসত্যই তখনই ফিরে আশ্রমের পিছন দিকে চলল। খানিকটা বেলে জমি পার হয়ে খিড়কিদরজা দিয়ে লোকটা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। গুরুদেব যেমন বলেছিলেন, ঠিক তাই—সত্যই দরজায় আমি চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। লোকটা চট করে বেরিয়ে এল। তার হাতে তখন আমার একটি সযত্নবর্ধিত সুপুষ্ট ফুলকপি। বিনা বাধায় ফুলকপি লাভের গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে লোকটা এখন বেশ শান্ত আর ভদ্র ভাবেই এগিয়ে চলল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর আচ্ছা ঠকান ঠকেছি দেখে ত রাগে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেল। লোকটার পিছনে পিছনে দৌড়লুম; অর্ধেক রাস্তায় গিয়েছি এমন সময় গুরুদেব ডাকলেন, দেখি যে তিনি হাসিতে যেন ফেটে পড়ছেন।

হাসির দমকের মাঝে মাঝে গুরুজী ব্যাপারটা বোঝালেন, "দেখ, ও বেচারার একটি ফুলকপির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর আমি ভাবলুম যে, আহা তোমার একটি কপি যদি ও পায়, সাবধানটাবধান করে গুছিয়ে ত' রাখনি, তা হলে ভারি মজা হয়।" শুনে ত' চক্ষু কপালে উঠল। ঘরের দিকে দৌড়লুম! গিয়ে দেখি চোরটার কেবল ফুলকপিটার উপর নজর ছিল।

যাক্, বেঁচে গেছি—কম্বলের উপর সোনার আংটি, ঘড়ি, টাকাকড়ি সবই ঠিক রয়েছে, কিছুই ছোঁয়নি দেখছি। আর আশ্চর্য, এগুলো চোখের সামনে পড়ে রয়েছে দেখেও সে তার একটাও ছুঁলো না, আর তার একমাত্র ইচ্ছা হল নিতে কি না একটা ফুলকপি, তাও খাটের তলায় লোকের চোখের আড়ালে একদম লুকোন—আর তা বার করতে হয়েছে, খাটের তলায় হেঁট হয়ে মাথা গলিয়ে তার ভিতর ঢুকে!

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাই জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি! কারণ আমার মনে হল এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে। তিনি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, "একদিন এ সব তুমি বুঝবে। যাক্, তোমাদের বিজ্ঞান এই সব গুপ্তবিধির মধ্যে দু চারটে শীগগির আবিষ্কার করে ফেলবে, দেখো।"

তারপর রেডিওর আশ্চর্যজনক আবিষ্কার যখন পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন গিরিজী মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল। সময় ও দূরত্বের ব্যবধান আর তার যুগযুগব্যাপী ধারণা সব একেবারেই লোপ পেল। এখন আর কোন মানুষের ঘর এমন সঙ্কীর্ণ নেই যে, সেখানে লণ্ডন অথবা কলকাতা মাথা গলাতে পারে না! একটা বিষয়ে মানুষের সর্বব্যাপিত্বের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে অতিনির্বুদ্ধিরও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হল।

এই "ফুলকপি" নাটকের প্লটটির বিষয় রেডিওর* সঙ্গে তুলনা করে

---

*১৯৩৯ সালে রেডিও অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতে অদ্যাবধি অজ্ঞাত এক নূতন রশ্মিজগতের সন্ধান মেলে। এসোসিয়েটেড প্রেস বলেছেন, "মানুষের নিজে হতে আর অনুমিত সকলপ্রকার জড়পদার্থ হতেই যে রশ্মি সর্বদা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা সব এই যন্ত্র "দেখতে" পায়। যারা পরচিত্তপ্রবেশ, দ্বিতীয়দৃষ্টি আর দিব্যদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা এই ঘোষণায় সেইসব অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাবে যে, সেই সব রশ্মি সত্যসত্যই এক ব্যক্তির কাছ হতে অপর ব্যক্তির নিকট বিচ্ছুরিত হয়। এই রেডিও যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে রেডিও কম্পাঙ্কের বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র। বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন রশ্মিবর্ণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কি কি মূল উপাদানের অণুপরমাণুতে নক্ষত্রাদি গঠিত, এও ঠিক তেমনি সব শীতল অনুজ্জ্বল জড়পদার্থের সেইরূপ বর্ণালি বিশ্লেষণ করে............মানুষ আর সকল সজীব পদার্থ হতে যে এরকম রশ্মি নির্গত হয়, তার অস্তিত্বের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা বহু বছর ধরেই সন্দেহ করে আসছিলেন। আজকে তাদের অস্তিত্বের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক অণু আর পরমাণু এক একটি অবিরাম বেতারতরঙ্গ-প্রেরক যন্ত্রাগার। এইরূপে যে পদার্থটি পূর্বে মানবরূপী ছিল, মৃত্যুর পরেও সে তার অতি সূক্ষ্ম রশ্মি প্রেরণ করতে থাকে। এইসব রশ্মির

দেখলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাবে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে একটি চমৎকার মানব-রেডিও যন্ত্র বলা যেতে পারে। চিন্তা সকল কি? তারা ঈথরে অতি মৃদু কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখুঁতভাবে একসুরে বাঁধা রেডিও গ্রাহকযন্ত্র যেমন চতুর্দিক হতে হাজার হাজার প্রোগ্রামের ভিতর থেকে ঠিক যেটি দরকার সেটি ধরে নেয়, তেমনি পৃথিবীতে অগণিত লোকের চিন্তাতরঙ্গের মধ্য হতে আমার গুরুদেব একটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা (ঐ আধপাগলা লোকটার ফুলকপি সংগ্রহের ইচ্ছাটি) ধরে নিতে পেরেছিলেন।

সমুদ্রের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যেইমাত্র গুরুদেব চাষীটির সামান্য অভিপ্রায়টুকু জানতে পারলেন, অমনি সেটুকু পূরণ করতে তিনি মনস্থ করলেন। লোকটি শিষ্যদের দৃষ্টিগোচর হবার পূর্বেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দিব্যদৃষ্টি তাকে রাস্তা দিয়ে নেচে নেচে আসতে দেখেছিল। আশ্রমের দুয়ার চাবি-বন্ধ করে আসতে ভুলে যাওয়াতে গুরুদেবের সুবিধাজনক ছুতো হল আমার অমন সখের কপিগুলো থেকে একটি সরিয়ে দিতে।

এইরূপে রেডিওর গ্রাহকযন্ত্ররূপে কাজ করবার পর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ব্রডকাস্টার বা প্রেরকযন্ত্রের মতও কাজ করেছিলেন।* তাইতে তিনি চাষীটিকে মাঝরাস্তা থেকে ঘুরিয়ে এনে একটি-মাত্র ফুলকপির জন্য একটি ঘরবিশেষের দিকে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মানুষের মন যখন ধীর ও শান্ত থাকে সেই সব মুহূর্তে মানুষের ভিতর স্বাভাবিকভাবে যে সব অনুভূতির বিকাশ হয়, তারাই হচ্ছে আত্মার পথ-প্রদর্শক! প্রায় প্রত্যেকেরই অদ্ভুতভাবে সঠিক অনুমানের অভিজ্ঞতা আছে অথবা সে অপর কোন লোককে সাফল্যের সঙ্গে তার চিন্তাতরঙ্গ পাঠাতে সমর্থ হয়েছে।

মানুষের মন সর্ববিধ অস্থিরতার বা অশান্তির "স্থৈতিক" ঝড় থেকে মুক্ত

তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্তমানে ব্যবহৃত বেতারতরঙ্গের যে কোন সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষাও হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ। এই সব রশ্মিগুলির জটিলতা কল্পনাতীত। কোটি কোটি রকমের রশ্মি আছে। একটি মাত্র বেশ বড়গোছের অণু একই সময়ে ১০,০০,০০০ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি পাঠাতে পারে। এই ধরনের দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যসকল, সহজে এবং বেতার-তরঙ্গদের গতিতে চালিত হয়......আলো প্রভৃতির মত পরিচিত রশ্মিদের তরঙ্গের সঙ্গে নূতন রেডিও রশ্মির একটা অদ্ভুত পার্থক্য আছে। অতি সুদীর্ঘকাল—এমন কি হাজার হাজার বছর ধরেও এই সব রেডিও তরঙ্গসকল স্থাবর জড়পদার্থ হতে অবিরতই নির্গত হতে থাকবে।"

*২৮শ পরিচ্ছেদের প্রথম পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

হয়ে যখন একেবারে ধীর, স্থির, শান্ত হয়, তখন সে অত্যন্ত জটিল রেডিও-যন্ত্রেরই মতন অনুভবের অ্যানটেনার মধ্য দিয়ে সবরকমই কাজ করবার শক্তিবিশিষ্ট হয়—চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণ, গ্রহণ, অথবা অবাঞ্ছিত তরঙ্গ পরিবর্জন। রেডিও ব্রডকাস্টিং ষ্টেশনের শক্তি যেমন যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সে ব্যবহার করতে পারে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি মানব-রেডিওর ক্রিয়াশীলতা প্রত্যেক মানবের প্রবল ইচ্ছাশক্তির মাত্রার উপরেই নির্ভর করে।

চিন্তার তরঙ্গ কোথাও নষ্ট হয় না—মহাব্যোমে অনন্তকাল ধরে তাদের অনুরণন চলে। গভীর ধ্যানসংযোগে সদ্‌গুরু কি জীবিত কি মৃত, যে কোন ব্যক্তির মনের খবর জানতে পারেন। চিন্তাসকলের মূলে ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বজনীনতায়। সত্য তো সৃষ্টি করা যায় না, তা কেবল উপলব্ধি করতে হয়। উপলব্ধি করার ত্রুটির ফলে, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, অনেক সময় মানুষের চিন্তা ভুল হয়ে দাঁড়ায়। যোগবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছে যে, এই মনকে একেবারে শান্ত করা—যাতে করে সে অন্তরের বাণীর নির্ভুল পথনির্দেশ অবিকৃতভাবেই শুনতে পারে।

রেডিও (দূরশ্রবণ) আর টেলিভিসন (দূরদর্শন) এরা অতি সুদূরের মানুষদের দৃশ্য আর শব্দ মুহূর্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের কোণে এনে হাজির করেছে ; মানুষ যে সর্বব্যাপী আত্মা এ হয়ত তার অতি ক্ষীণ প্রথম বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত। যদিও অহংভাব অতি বর্বর উপায়ে মানুষকে সীমাবদ্ধ করার বৃথা চেষ্টা করে, যাচ্ছে তবুও মানুষ কোন দেশে সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ একটা শরীরমাত্র নয়—আসলে সে সর্বব্যাপী আত্মা। শারীরতত্ত্বে নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্ত চার্লস রবার্ট রিশে* বলেছেন,—"অতি বিচিত্র, অত্যাশ্চর্যজনক আর আপাতদৃষ্টিতে একান্ত অসম্ভব ব্যাপারও এখন ঘটতে পারে—আর তা একবার প্রচলিত হয়ে গেলে বিজ্ঞান গত শতাব্দীতে আমাদের যা শিখিয়েছে তাতে এখন আমরা যতটা আশ্চর্য হই, তার চেয়ে আর বেশী কিছু হব না। এ যেন ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যাপার দেখে আর আমাদের এখন চমক লাগে না, তাতে আর আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু নাই,—কারণ তাদের আমরা বুঝি বলে। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। তারা আর আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না তার কারণ এই নয় যে তাদের আমরা সব বুঝি, কারণ হচ্ছে তারা সব আমাদের পরিচিত। কারণ যা বোঝা যায় না, তাতে যদি আমাদের আশ্চর্য হতে হয়, তাহলে ত' আমাদের সবকিছুতেই

---

*"আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়"—প্রণেতা। (লণ্ডনে রাইডার এণ্ড কোংর নিকটে প্রাপ্তব্য।)

আশ্চর্য হওয়া উচিত—আকাশে ঢিল ছুঁড়লে তা পড়তে দেখে, বটের বীজ হতে বিশাল বনস্পতি হওয়া, বা পারদ উত্তপ্ত হলে তার আয়তন বর্ধিত হওয়া অথবা চুম্বক কর্তৃক লোহ আকর্ষণ, ফস্‌ফরাস ঘসলে তা থেকে প্রজ্বলিত অগ্নি উৎপাদিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

"আজকের বিজ্ঞান ত' এখনও নিতান্ত লঘু ব্যাপার········অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সত্যসকল যা আমাদের উত্তরাধিকারীরা ভবিষ্যতে আবিষ্কার করবে—তারা এখনই, এই মুহূর্তেই আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে, বলতে গেলে আমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে আছে, তবুও আমরা তাদেরকে দেখছি না। কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি না বললেই যথেষ্ট বলা হল না—আমরা তাদের দেখতে ইচ্ছা করছি না, কারণ যখনই একটা অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, তখনই আমরা সেটাকে আমাদের অধিগতজ্ঞানের সাধারণ কাঠামোতে আরোপ করবার চেষ্টা করি, আর সে বিষয়ে কেউ যদি তার আরও পরীক্ষা করবার সাহস করে, তা হলে তার উপর ক্রুদ্ধই হই!"

এমন লজ্জাকরভাবে আমার ফুলকপি চুরি হবার দিনকতক পরে একটা কিন্তু খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা কেরোসিন ল্যাম্প পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি গুরুদেবের যোগদৃষ্টির ব্যাপার দেখে ভাবলুম যে এটার সন্ধান বলে দেওয়া তাঁর পক্ষে নেহাৎ ছেলেখেলাই হবে আর কি!

গুরুদেব আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে তিনি আশ্রমের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ল্যাম্পটা কোথায় গেল। একটি তরুণশিষ্য স্বীকার করে ফেললে যে, খিড়কির দিকে কুয়োর ধারে যেতে সে আলোটা নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন, "কুয়োর ধারে খোঁজ।"

গেলুম দৌড়ে,—আলো নাই! অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গুরুদেবের কাছে ফিরে এলুম। আমার ভ্রান্তিনিরসনে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি অকুণ্ঠভাবে হাসছেন। বললেন, "হারান ল্যাম্পটার খোঁজ করে দিতে পারলুম না—কি করব বল, আমি তো আর গণৎকার নই! এমন কি ভালগোছের একটা শার্লক হোম্‌স্‌ও নই!"

বুঝতে পারলুম যে, পরীক্ষার জন্য অথবা তুচ্ছ কারণে তিনি কখনও তাঁর শক্তি প্রদর্শন করবেন না।

কয়েক সপ্তাহ খুব আনন্দে কাটল। গুরুদেব একটি নগরসঙ্কীর্তন বার করবার মতলব করছিলেন। পুরী সহরের ভিতর আর সমুদ্রের ধার দিয়ে সঙ্কীর্তন নিয়ে যাবার জন্য গুরুদেব আমারই উপর ভার দিলেন। উৎসবের

দিন (দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি) সকালে যা রোদ উঠল, তাতে রাস্তায় আর পা পাতা যায় না। হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলুম "গুরুজী, খালিপায়ে ছেলেদের কি করে আগুনে তাতা বালির উপর দিয়ে নিয়ে যাই বলুন ?"

গুরুদেব বললেন, "শোন, তোমায় চুপি চুপি একটা কথা বলে রাখি— তোমাদের কিচ্ছু ভাবনা নেই, ঠাকুরই একটা মেঘের ছাতা পাঠিয়ে দেবেন দেখো ; তার তলায় তোমরা বেশ আরামে হেঁটে যাবে, কোনই কষ্ট হবেনা, বুঝলে ?"

যাক্, নিশ্চিন্ত হয়ে ত সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা শুরু করে দিলুম। আমাদের দল আশ্রম থেকে সৎসঙ্গের* পতাকা নিয়ে বেরোল। মাঝখানে তৃতীয় নেত্রের প্রতীক একটিমাত্র চক্ষু†—জ্ঞানচক্ষু, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পরিকল্পনা।

আশ্রম হতে বেরোবামাত্রই ঠিক মাথার উপরের আকাশ যেন ভোজ-বাজিতেই মেঘে ছেয়ে গেল। চারধার থেকে বিস্ময়ের অস্ফুটধ্বনি ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাল্কাগোছের বৃষ্টিও হয়ে গেল। সহরের রাস্তা, আর আগুনের মত তেতে থাকা সমুদ্রের ধারের বালি সব বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর ঘণ্টাদুই ধরে আমাদের সঙ্কীর্তনের দল নগর পরিভ্রমণ করার সময় পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়েই চলল। তারপর যে মুহূর্তে দলটি আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করল, সেই মুহূর্তেই মেঘ আর বৃষ্টি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় উড়ে গেল !

গুরুদেবের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেই তিনি বললেন, "দেখ, ভগবান আমাদের জন্যে কত ভাবেন বল দেখি ! সকলেরই প্রার্থনার তিনি উত্তর দেন আর সকলেরই জন্যে তিনি খাটেন। তিনি যেমন আমার প্রার্থনামত বৃষ্টি পাঠিয়ে দিলেন, তেমনি তিনি সকল ভক্তেরই আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করেন। ভগবান যে কত রকমে তাদের প্রার্থনা শোনেন, লোকেরা অতি অল্পই তা জানতে বা বুঝতে পারে। তিনি কারুর প্রতি পক্ষপাতী নন, যে কেউ তাঁর কাছে বিশ্বস্তহৃদয়ে এগোয় তার কথাই তিনি শোনেন। আমরা সকলেই সেই

---

*শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী পুরী আশ্রম প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন—সৎসঙ্গ।

†"অতএব যদি তোমার জ্ঞানচক্ষু হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ জ্যোতিঃতে পূর্ণ হবে।" —ম্যাথিউ ৬:২২ (বাইবেল)। গভীর ধ্যানের সময় আধ্যাত্মিক চক্ষু বা অন্তশ্চক্ষুঃ কপালের মধ্যভাগে দেখা যায়। এই সর্বদর্শী চক্ষু নানাশাস্ত্রে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা—তৃতীয় নেত্র, প্রাচ্যের তারকা, অন্তশ্চক্ষু, স্বর্গ হতে অবতীর্ণ পারাবত, শিবনেত্র, জ্ঞাননেত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

সর্বব্যাপী বিভু, সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের সন্তান। তাঁর অপার স্নেহ আর অসীম দয়ার উপর তাঁর সন্তানদের সকলেরই অখণ্ড বিশ্বাস থাকা উচিত।"*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী চারটি বাৎসরিক উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহাবিষুব, জলবিষুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি। এই সময় তাঁর শিষ্যবর্গ দেশদেশান্তর হতে এসে উপস্থিত হতেন।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব শ্রীরামপুরেই পালন করা হত। প্রথমবারে যোগদান করে আমি সেখানেই তাঁর চিরাশীর্বাদ লাভ করেছিলুম।

উৎসব আরম্ভ হত ভোরবেলায় রাস্তায় নগ্নপদে সঙ্কীর্তনের দল বার ক'রে; খোল- করতাল আর বাঁশীর সঙ্গে মধুর নামগান করে শিষ্যের দল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসত। সঙ্কীর্তন শুনে উৎসাহী নগরবাসীরা দলের উপর পুষ্পবৃষ্টি করত, সংসারের কাজ থেকে ক্ষণিকের জন্যও সরে এসে ভগবানের পুণ্য নামসঙ্কীর্তন শ্রবণে আনন্দ পেত। তারপর অনেক রাস্তা ঘুরে সঙ্কীর্তনের দল এসে থামত আশ্রমের উঠানে, সেখানে গুরুদেবকে ঘিরে আমাদের খুব নামগান চলত, আর শিষ্যরা উপরের বারান্দা থেকে আমাদের মাথার উপর গাঁদাফুল বৃষ্টি করত!

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকে উপরে কমলালেবু আর ছানার পায়েস নিতে চলে যেতেন। একদল গুরুভাই, যাঁরা আজ রান্নার কাজে লেগেছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। এই রকম বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে বাইরে উনুন পেতে প্রকাণ্ড কড়াইতে করে রান্না করতে হত। ইঁটের উনুনে কাঠ গুঁজে দেওয়া হয়েছে—ধোঁয়াতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তবুও হাসিমুখে আমরা কাজ করে চলেছিলুম। ধর্মোৎসবের কাজে কারুরই ক্লান্তি নেই। সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতামত চাল, ডাল, তরিতরকারি, টাকাকড়ি অথবা সাধ্যমত গতরে খেটে উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টা করেন।

গুরুদেব শীঘ্রই এসে পড়ে খাওয়ানদাওয়ানর তদারক করতে শুরু করলেন। মুহূর্তমাত্র তাঁর বিশ্রাম নাই, খুব চটপটে ছোকরাদেরও সঙ্গে সমানতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উপরে দোতলায় হারমোনিয়ম আর বাঁয়াতবলার সঙ্গে সঙ্কীর্তন চলছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী খুব মন দিয়ে শুনছিলেন! তাঁর তাল, লয়, মান জ্ঞান একেবারে নিখুঁত।

---

*"যিনি কর্ণ প্রদান করেছেন, তিনি কি শুনবেন না? যিনি চক্ষুপ্রদান করেছেন, তিনি কি দেখবেন না?......যিনি মানুষকে জ্ঞানলাভে শিক্ষাপ্রদান করেছেন, তিনি কি সব জানতে পারবেন না?" গীতসংহিতা ৯৪:৯-১০ (বাইবেল)।

গুরুদেব হঠাৎ বলে উঠলেন, "এঃ, একেবারে বেসুরো গাইছে !" বলেই রান্নার জায়গা ছেড়ে একেবারে গানের আসরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নীচে থেকে আমরা শুনতে পেলুম গান আবার শুরু হল,—এবার কিন্তু বিশুদ্ধ সুরতাললয়মানে।

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম উল্লেখ আমাদের 'সামবেদে'র মধ্যেই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা স্বর্গীয় কলারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি, এঁরাই হচ্ছেন প্রথম সঙ্গীতকার। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দেবনর্তক নটরাজরূপে শিব তাঁর চরণঘাতের তালে তালে অসীমের ছন্দে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আনয়ন করেন আর সেই নৃত্যের তালে তালে ব্রহ্মা বাজান করতাল আর বিষ্ণু মৃদঙ্গ।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, তারযন্ত্রের আদি বীণাবাদনরতা রূপে কল্পিতা। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রাণমাতান মধুর স্বরে কেবলই জীবাত্মাদের ডাকছে মায়াবশে ভ্রমণ পরিত্যাগ করে নিজ আবাসে ফিরে আসবার জন্য।

হিন্দুসঙ্গীতের মূলভিত্তি হল তার রাগরাগিণী। ছয়টি মূলরাগ আর তা থেকে উৎপন্ন রাগিণী আর তাদের পুত্রগণক্রমে ১২৬টি শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্যেক রাগের আবার অন্ততঃ পাঁচটি ক'রে সুর আছে, যেমন বাদী অর্থাৎ রাগরাগিণীতে যে স্বরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তার নাম বাদী। বাদীর সহগামী সুরকে বলে সংবাদী আর বাকী সব সুরকে বলে অনুবাদী বা অংশ; আর যে রাগে যে সুর সংযোজিত হলে রাগভ্রষ্ট হয়, তাকে বলে বিবাদী। রাগের বাদীসুর হচ্ছে রাজা, সংবাদীসুর মন্ত্রী, অনুবাদীসুর ভৃত্য আর বিবাদীসুর বৈরী অর্থাৎ শত্রুর মতন।

প্রত্যেক মূলরাগের আবার বিশিষ্টশক্তিপ্রদায়ক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ঋতু, দিন বা রাতে গাইবার সময়ের স্বাভাবিক উপযোগিতা আর তা কোন্ কোন্ ভাবের উদ্দীপক তা নির্ধারণ করা আছে। যেমন,—

	রাগ	ঋতু	সময়	ভাব
(১)	হিন্দোল	বসন্ত	রাত্রি তৃতীয় প্রহর	বিশ্বপ্রেম
(২)	দীপক	গ্রীষ্ম	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	অনুকম্পা
(৩)	মেঘ	বর্ষা	দিবা দ্বিতীয় প্রহর	সাহস
(৪)	ভৈরব	শরৎ	দিবা প্রথম প্রহর	শান্তি
(৫)	শ্রী	হেমন্ত	দিবা চতুর্থ প্রহর	নিষ্কাম প্রেম
(৬)	মালকোশ	শীত	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	শৌর্য

প্রাচীন ঋষিরা মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে শব্দের ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতি নাদব্রহ্ম, ওঙ্কারধ্বনি বা প্রণবঝঙ্কারের বস্তুরূপ বলে মানুষ কতকগুলি মন্ত্রের* আবৃত্তিবলে প্রকৃতিতে সকল ব্যাপারের উপরেই নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, আকবরের সভায় ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ মিঞা তানসেন অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, সম্রাট আকবর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মিঞা তানসেন বেলা দ্বিপ্রহরে রাত্রিকালের একটি রাগ গেয়ে রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরসপ্তক বাইশটি শ্রুতিতে বিভক্ত। শ্রুতি হচ্ছে স্বরগত শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্মবিভাগ মাত্র। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরগ্রামের মাত্র বারটি শ্রুতির মধ্যে এ রকম সূক্ষ্ম বিস্তার দুষ্প্রাপ্য। আবার এই সপ্তসুরের প্রত্যেক সুরের একটি ক'রে বর্ণ আর কোন পশু বা পক্ষীর কণ্ঠস্বর হতে তাদের উৎপত্তি, তা বলা আছে ; যেমন, সা—হরিৎবর্ণ, ময়ূরের কেকাধ্বনি ; রে—রক্তবর্ণ, ভরতপক্ষী ; গা—স্বর্ণবর্ণ, ছাগ ; মা—হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ, সারস পক্ষী ; পা—কৃষ্ণবর্ণ, বুলবুল পক্ষী ; ধা—হরিদ্রাবর্ণ, অশ্বের হ্রেষারব আর নি—হচ্ছে সকল বর্ণের সমন্বয়, এর উৎপত্তি হচ্ছে হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি থেকে।

ভারতীয় সঙ্গীতে ৭২টি ঠাট আছে। এতে সঙ্গীতকার শুদ্ধরাগের মধ্যে সুরসৃষ্টি ও তার বিন্যাসে অন্তহীন সুযোগ পায় ; যে কোন বিষয়ের মধ্যে রূপপ্রদানে তার ভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট ক'রে তার চতুর্দিকে সুরের স্বপ্নজাল বুনে নিজের মৌলিকত্ব প্রদর্শন করে। হিন্দুসঙ্গীতের চর্চা শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বরলিপিতেই সীমাবদ্ধ নয়। গানের পদসকল ত্যাগ ক'রে তার মধ্যে

---

*সকল দেশের উপকথার মধ্যে প্রকৃতির উপর মন্ত্রশক্তির প্রভাবের বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়। আমেরিকার ইন্ডিয়ানগণ যে বৃষ্টি ও বায়ুর জন্য শব্দানুষ্ঠানের ক্রিয়াপদ্ধতির উন্নতিসাধন করেছিল, তা সর্বজনবিদিত। জগৎপ্রসিদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীতকার তানসেন তার গানের শক্তিবলে অগ্নি নির্বাপিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে নিউইয়র্কের একটি অগ্নি নির্বাপক দলের সম্মুখে ক্যালিফোর্ণিয়ার নিসর্গবেদী কেলগ্ অগ্নির উপর স্বরকম্পনের প্রভাব প্রদর্শন করেছিলেন। "বেহালার ছড়ির মতন একটি প্রকাণ্ড ছড়ি একটা অ্যালিউমিনিয়াম টিউনিং ফর্ক উপর অতিদ্রুত টান দিয়ে তিনি গভীর বেতার ষ্ট্যাটিকের মতন একটা অদ্ভুত চিৎকারের মতন শব্দ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শূন্য কাঁচের নলের ভিতর দুফুট লম্বা হলদে লক্‌লকে এক গ্যাসের শিখা সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে ছয় ইঞ্চিতে দাঁড়াল, তারপরে স্ফুলিঙ্গশীল একটা নীলাভ আগুনে পরিণত হল। আর একবার টান দিতেই আবার সেইরকম কম্পনের চিৎকার শব্দ এবং সঙ্গেসঙ্গে সেটি একেবারেই নিভে গেল।"

বিন্যস্ত স্বরসমূহকে নানা শব্দ যোগে প্রকাশ করা যায়,—তাকে আলাপ বলে। আলাপে গায়ক বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার গতিতে আর আশ, মীড়, কম্পন প্রভৃতি সংযোগে সুরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে বাখ্ শত শত প্রকারের জটিল উপায়ে সুরের আবৃত্তির সূক্ষ্ম তারতম্যের মধ্যে তার প্রভাব ও অপূর্ব সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে ১২০ প্রকার "তালে"র বিষয় উল্লিখিত আছে। কথিত আছে যে, আদিসঙ্গীতকার ভরতমুনি ভরতপক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে ৩২ প্রকার তাল পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তালের উৎপত্তির মূল হচ্ছে, মানুষের গতিছন্দে—পদক্ষেপের দ্বিগুণ আর নিদ্রার মধ্যে যখন নিশ্বাস, প্রশ্বাসের দুগুণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই নিশ্বাসপ্রশ্বাসের তিনগুণ সময়।

ভারতবর্ষে মনুষ্যকণ্ঠস্বরই শব্দযন্ত্র মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে পরিচিত। হিন্দুসঙ্গীত তাই প্রধানতঃ কণ্ঠস্বরের তিন সপ্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ আর ঐ একই কারণে হিন্দুসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতির চেয়ে সুতানেরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুসঙ্গীত হচ্ছে ভাবময়, আধ্যাত্মিক আর ব্যষ্টিগত কলারূপ প্রদর্শন, যার লক্ষ্য ঐক্যতানের চরম সৌন্দর্যে নয়, কিন্তু নাদব্রহ্মের সহিত ব্যক্তিগত মিলনে; তাই সঙ্গীতকারের সংস্কৃত প্রতিশব্দ, "ভাগবত, যিনি ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন।"

সঙ্কীর্তনও একটি ফলপ্রসূ যৌগিকপ্রথা অথবা আধ্যাত্মিক নিষ্ঠাচার, যাতে করে চিন্তা আর শব্দবীজের গভীর মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মানুষ স্বয়ং নাদব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ বলে, তার উপর শব্দের অত্যন্ত শক্তিশালী আর সদ্যপ্রভাব বিদ্যমান।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহান ধর্মসঙ্গীত সব মানুষকেই পরমানন্দ দান করে কারণ এ সাময়িকভাবে তার সুষুম্নাকাণ্ডের একটি চক্রকে জাগরিত করে।* সেই পরমানন্দের ক্ষণে তার দিব্য জনমের একটা ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে আসে।

---

*উল্লিখিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণই যোগীর পরমপবিত্র চরম লক্ষ্যস্থান। প্রতীচ্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ, নিউ টেস্টামেন্টের "রিভিলেশন" অধ্যায়ে যে প্রতীক ব্যবহারে যোগবিজ্ঞানের অনুরূপ ব্যাখ্যা আছে—যে বিষয় প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জন এবং তাঁর অন্যান্য অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা আদৌ বুঝতে পারেন নি। বাইবেলের উক্ত অধ্যায়ে ১:২০ পংক্তিতে জন "সপ্ততারকার রহস্য" এবং সাতটি গির্জা"র বিষয় উল্লেখ করেছেন; এই প্রতীকগুলি যোগশাস্ত্রবর্ণিত মস্তিষ্ক কশেরুকাচক্রের সাতটি পদ্ম বা চক্রকে বোঝায়। দিব্যপরিকল্পিত

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দোতলার বসবার ঘর থেকে সঙ্কীর্তনের যে গান ভেসে আসছিল, তা নীচে উনুনশালে দাঁড়িয়ে যারা রান্না করছিল, তাদেরও মাতিয়ে তুলছিল। আমরাও হাততালি দিয়ে গানের ধুয়া গাইতে শুরু করে দিলুম।

সন্ধ্যার মধ্যে শত শত অতিথিঅভ্যাগতদের খিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ করা হল। সঙ্গে ছিল নিরামিষ তরকারী, পায়েস প্রভৃতি। খাওয়াদাওয়ার পর সভার আয়োজন হল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শতরঞ্চি বিছিয়ে জায়গা করা হল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী সমবেত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই নীরবে শুনতে লাগলেন। ক্রিয়াযোগের প্রয়োজনীয়তাই ছিল বক্তৃতার বিষয়। সে বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনার পর তিনি আদর্শজীবনে আত্মসম্মান, ধীরতা, দৃঢ়সঙ্কল্প, সাদাসিধা আহার এবং দৈনন্দিন ব্যায়ামের উপযোগিতাও বর্ণনা করেন।

এরপর ছোট ছোট ব্রহ্মচারী বালকেরা স্তোত্রপাঠ করবার পর সঙ্কীর্তন হয়ে সভাভঙ্গ হল।। বেলা দশটা থেকে রাত বারটা অবধি আশ্রমবাসীরা বাসন-কোসন মাজা-ঘষা ধোয়াপোঁছা প্রভৃতিতে ব্যস্ত রইল। গুরুদেব আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "মুকুন্দ, উৎসবের আয়োজনের জন্যে এই সাত দিন ধরে, বিশেষতঃ আজকে তুমি সারাদিন ধরে হাসিমুখে যে খাটুনি খেটেছ, তাতে আমি ভারি খুশী হয়েছি। তুমি আমার কাছে থাকবে। আর দেখ, আজ তুমি আমার বিছানায় শুতে পার।"

এই বিশেষ অনুগ্রহটি আমার কপালে কোনও দিন জুটবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। দুজনে আমরা কিছুক্ষণ গভীর প্রশান্তির মধ্যে বসে রইলুম। বিছানায় ঢোকবার পর মিনিটদশেক কেটেছে কিনা সন্দেহ, গুরুদেব উঠে পড়ে জামাটামা গায়ে দিতে শুরু করলেন।

এই নিষ্ক্রমণপথে যোগী বৈজ্ঞানিক ধ্যানের সাহায্যে দেহকারা হতে মুক্তিলাভ করে তার আদি সত্তায় ফিরে যায়। (২৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

মস্তিষ্কস্থিত সপ্তমচক্র, "সহস্রদলকমল"ই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতির স্থান। দিব্যজ্ঞানলাভ হলে যোগী সৃজনকর্তা ঈশ্বরকে ব্রহ্মা অথবা "পদ্মজ" বা পদ্মযোনি বলে উপলব্ধি করতে পারেন।

"পদ্মাসন" অভ্যাস হলে যোগী উক্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে মস্তিষ্ককশেরুকাচক্রের বিচিত্রবর্ণের পদ্মসকল অথবা চক্রসমূহ দর্শন করেন। প্রত্যেক পদ্মই বিভিন্ন দল অথবা প্রাণশক্তির বর্ণে রঞ্জিত। এই পদ্মসকলই চক্ররূপে বর্ণিত।

গুরুদেবের পাশে শয়নলাভ করার অপ্রত্যাশিত আনন্দে সেটা কতকটা অবিশ্বাস্য বলেই যেন তখন বোধ হচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হল গুরুদেব ?"

"দেখ, মনে হচ্ছে যেন জনকতক শিষ্য ঠিক সময়মত ট্রেন ধরতে পারে নি ; তারা হয়ত এখুনিই এসে পড়বে। চল, তাদের জন্যে কিছু খাবারদাবারের যোগাড় করে রাখা যাক্।"

"গুরুজী, রাত একটায় কেউই আজ আর আসছে না, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন।"

"আচ্ছা, তুমি শুয়ে থাক, সারাদিন ধরে খুব খেটেছ খুটেছ ; আমিই না হয় রান্নাটান্নার ব্যবস্থা দেখিগে।"

গুরুজীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা দেখে, আমি তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চললুম সেই দোতলার উপর ভিতরকার বারান্দার ধারে ছোট্ট রান্নাঘরটিতে, যেখানে আমাদের রোজ রান্না হয়। চাল-ডাল শীঘ্রই ফুটতে শুরু হল।

গুরুদেব স্নিগ্ধমধুর হেসে বললেন, "আজকের রাতে তুমি ক্লান্তি আর কঠিন কাজের ভয়কে জয় করেছ—জীবনে আর তোমার এদের থেকে কোন ভয় থাকবে না, দেখো!"

আমার চিরজীবনের এই পরম শুভ-আশীর্বাদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঠানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে নীচে নামতেই দেখা গেল, একদল শিষ্য এসে উপস্থিত।

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "ভাই, এত রাত্রিতে এসে গুরুদেবকে বিব্রত করতে আমাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করব বলুন, ট্রেনের সময়ের গোলমাল করে ফেলেছিলুম, তাই এই বিভ্রাট ঘটে গেল। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তখন একবার গুরুদেবের দর্শনলাভ না করে আর কি করে ফিরে যাই, বলুন ?"

"তিনি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা করছেন কি— আপনাদের জন্যে একেবারে রান্না চড়িয়ে দিয়েছেন, দেখুন গে।"

গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ডাকছেন ; অবাক সেই শিষ্যদলকে নিয়ে একেবারে রান্নাঘরে হাজির করলুম।

গুরুদেব এইবার আমার দিকে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে বললেন, "যাক্,

এতক্ষণে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হল। এবার তো বুঝলে যে, এরা সত্যিসত্যিই ট্রেন ফেল করেছিল ?"

আধঘণ্টাটাক বাদে, তাঁদের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গুরুদেবের পিছন পিছন চললুম ; মনে হল, এবার অবশ্য ঠিক আমার ঈশ্বরতুল্য গুরুদেবের পাশে শয়নের সৌভাগ্যলাভ হবে। এবার আর তাতে বাধা পড়বার কোন সম্ভাবনা নাই।

১৬শ পরিচ্ছেদ

গ্রহশান্তি

"মুকুন্দ, তুমি গ্রহশান্তির জন্য একটা তাগা ধারণ কর না কেন?"

"করব না কি গুরুদেব? কিন্তু ও সব জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার কোন বিশ্বাসই হয় না।"

"না, না, এসব বিশ্বাসটিশ্বাসের কথা নয়। কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ধারণা করতে গেলে দেখতে হবে, সেটা সত্যি কিনা। নিউটনের আবিষ্কারের পরে যেমন, তেমনি তার আগেও তো মাধ্যাকর্ষণ বেশ চমৎকারভাবেই কাজ করছিল। মানুষের বিশ্বাসের অভাবে যদি এর আইনকানুন কাজ করতে না পারে, তা হলে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

"যত সব বুজরুকদের দ্বারাই জ্যোতিষশাস্ত্রের এইরকম বর্তমান দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে, কি গাণিতিক,* কি আধ্যাত্মিক, কোনরূপেই কেউ সঠিকভাবে এর ধারণা করতে পারে না—এ এতবড়ই একটা বিরাট শাস্ত্র। মূর্খ আনাড়ি যদি শাস্ত্রের লেখা ঠিকমত না বুঝে সেখানে হিজিবিজি দাগ দেখেই বিদ্যে ফলাতে যায়, তাহলে ফল তো ঐরকমই হবে আর

---

* প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে জ্যোতিষিক উল্লেখে পণ্ডিতেরা গ্রন্থরচয়িতাদের তারিখ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ঋষিদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অতি উচ্চধরণের ছিল। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের সুনির্দিষ্ট জ্যোতিষাংশে আমরা দেখতে পাই যে, ৩১০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, যে শাস্ত্রবলে তিথি নক্ষত্রানুযায়ী ক্রিয়াকর্মের শুভলগ্ন নির্ধারণ করা হত। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঈষ্ট-ওয়েষ্ট পত্রিকায় "জ্যোতিষ" অথবা বৈদিক জ্যোতিষ তত্ত্বসমূহের নিবন্ধ সমষ্টির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত এক আলোচনা প্রকাশিত হয়,—"এর বৈজ্ঞানিক কাহিনীসমূহে জানতে পারা যায় যে, প্রাচীন জাতিসকলের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল—এবং ছিল জ্ঞানান্বেষিগণের পক্ষে তীর্থস্বরূপ। সুপ্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র ব্রহ্মগুপ্তে নিম্নলিখিত বিষয় সব আছে, যথা—আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহাদির মন্দস্ফুট গতি, রবিপরমক্রান্তি, পৃথিবীর গোলাকৃতি, চন্দ্রের পরাবর্তিত আলোক, পৃথিবীর নিজ অক্ষরেখার উপর আহ্নিকগতি, ছায়াপথে স্থিরনক্ষত্রের অবস্থান, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল যা, কোপার্নিকাস বা নিউটনের আগে পাশ্চাত্যজগতে কখনও আবিষ্কৃত হয় নি।"

এ অপূর্ণ জগতে তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তাই বলে এই সব 'শাস্ত্রজ্ঞ'দের সঙ্গে শাস্ত্রটাও বিসর্জন দেওয়া চলে না।"

গুরুদেব বলতে লাগলেন,—"সৃষ্টির সকল অংশই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত আর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বপ্রকৃতির সমতাছন্দ এই আদানপ্রদানের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে। মানুষকে তার মানব প্রকৃতি অনুসারে দুই ধরণের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হয়। প্রথমতঃ তার সত্তার ভিতর 'ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম' প্রভৃতি পঞ্চভূত ও তন্মাত্রের সংমিশ্রণ হতে উদ্ভূত বিপর্যয় আর দ্বিতীয়তঃ বহিঃপ্রকৃতির ধ্বংসশক্তি। মানুষ যতদিন মরণের সঙ্গে লড়াই করে চলে, ততদিন তাকে লক্ষকোটি পার্থিব আর অপার্থিব পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলতে হয়।

"জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছে, মানুষের জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের বিষয় অধ্যয়ন। গ্রহনক্ষত্রেরা তো নিজ বুদ্ধিবলে উপকার বা অপকার করে না, তারা কেবল ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক জ্যোতিঃ বিকিরণ করে মাত্র। এদের নিজেদের কোন অনুকূল বা প্রতিকূল ক্রিয়াশক্তি নেই ; এরা মানুষের সোজাসুজি কোন উপকার অথবা অপকার করতে পারে না। এরা হচ্ছে, মানুষ অতীতে কার্যকারণের যা ভারসাম্য চালিত করে এসেছে, বহির্জগতে তার ফলপ্রকাশের বিধিনির্দিষ্ট পথ।

"জাতক জন্মায় ঠিক সেই দিন ক্ষণ মুহূর্ত ধরে, যখন সেটা তার প্রাক্তন কর্মফল অনুসারে গ্রহনক্ষত্রদের সংস্থানের সঙ্গে সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে একেবারে নির্ভুলভাবে মিলে যায়। তার কোষ্ঠি হচ্ছে, তার অতীতকর্মের অবিকল প্রতিলিপি যা বদলান যায় না, আর তা ভবিষ্যতেরও সম্ভাব্য ফল প্রকাশ করে। কিন্তু জন্মফল কেবল যাদের স্বজ্ঞাত উপলব্ধি আছে, তারাই সঠিকভাবে প্রকাশ করে বলতে পারে, কিন্তু তারা সংখ্যায় অতি অল্পই।

"জন্মমুহূর্তে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ এ বোঝায় না যে, তার অতীত শুভাশুভ কর্মফলের সমষ্টিতে যে অদৃষ্ট রচিত হয়েছে, তা থেকে তার উদ্ধারের

তথাকথিত "আরব সংখ্যা," যা পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্রের উন্নয়নের পক্ষে অমূল্য, তা নবম শতাব্দীতে আরব দেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এসেছিল ভারতবর্ষ থেকেই, যেখানে অঙ্কলিখন-প্রণালী বহু প্রাচীনকাল হতেই বিধিবদ্ধ হয়েছিল। ভারতের বিরাট বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের আরও অধিকতর পরিচয় লাভ করতে গেলে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" আর ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের "প্রাচীন হিন্দুদের প্রত্নবিজ্ঞান," বি. কে. সরকারের "প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে হিন্দুকৃতিত্ব" এবং তাঁর "হিন্দু সমাজবিদ্যার সদর্থক পটভূমিকা" এবং ইউ. সি. দত্তের "হিন্দু ভেষজ্য বিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য।

আর কোন উপায়ই নাই। এ সমাবেশ জাতকের চিরজীবনের জন্য অদৃষ্টের দাসত্ব হতে মুক্তিকামনার চেষ্টার উদ্রেক করার জন্য সূচনা করে। যা সে করেছে তা সে বদলাতে পারে, তা সে উলটে দিতে পারে। তার জীবনে যে সকল ফল এখন বর্তমান রয়েছে, তাদের কারণেরও সেই 'ত একমাত্র প্রবর্তক—তা ছাড়া আর কেউ নয়। সে তার যে কোন অসামর্থ্য, অক্ষমতা দূর করতে পারে, কারণ প্রথমতঃ তারই কর্মফলবশতঃ সেটা সৃষ্ট হয়েছে আর তাছাড়া তার আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যেটা গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন নয়।

"অদৃষ্ট ছাড়া আর কোন পথ নাই, এই যে কুসংস্কার, এই যে ভয়, এ মানুষকে একেবারে প্রাণহীন যন্ত্রের মতই করে তোলে ; ক্রীতদাসের মতন তাকে যন্ত্রচালিতের মতনই নির্ভর করে চলতে হয়। জ্ঞানী যে, সে তার গ্রহনক্ষত্রের শক্তিকে পরাভূত করতে পারে, মানে তার প্রাক্তন কর্মফল খণ্ডন করতে পারে—সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার প্রতি তার ভক্তি আরোপ করে। যতই সে চৈতন্যের সঙ্গে তার অভেদত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ততই সে জড়ের প্রভাব হতে মুক্ত হয়। আত্মা চিরমুক্ত, অজ, নিত্য, শাশ্বত—এর মরণ নেই, কারণ এর জন্ম নেই ; কাজেই এ কখনও গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন হতে পারে না।

"মানব হচ্ছে একটি জীবাত্মা আর তার একটি দেহ বর্তমান। যখন সে প্রকৃত সত্যোপলব্ধি করতে পারে, তখন সে আর বাইরের কোন শক্তিরই খেলাতে অভিভূত বা বিব্রত হয়ে পড়ে না, সে অকুতোভয়ে সব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাধারণ আধ্যাত্মিক স্মৃতিভ্রংশের বশে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধিনিয়মের সূক্ষ্ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

"তিনি সৎ, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; ভগবানের সঙ্গে ভক্ত এক হয়ে গেলে তার তো আর কোন কাজেই ভুল হবার আশংকা নেই। তার কার্যকলাপ সব স্বাভাবিক আর সঠিকভাবেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয়, তাতে কোন বিরুদ্ধফল উৎপন্ন হয় না। গভীর ধ্যান আর প্রার্থনার বলে সে সেই বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়—অন্তরের মধ্যে রক্ষা করতে তার চেয়ে বড় তো আর কোন শক্তিই নেই।"

"তা হলে গুরুদেব, আপনি আবার আমাকে তাগা ধারণ করতে বলছেন কেন?" বহুক্ষণ নীরব থাকার পর এই প্রশ্ন করলুম। এর মধ্যে আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর এই জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা খানিকটা পরিপাক করবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। এতে চিন্তার খোরাক ছিল যা আমার কাছে একেবারে নূতন।

"মানেটা কি জান? পরিব্রাজক গন্তব্যস্থানে পেঁছে তবেই তার ম্যাপ ফেলে দেয়। পথ চলতে তো তাকে সুবিধাজনক আর সোজা রাস্তা খুঁজে বার করে নিতে হয়। প্রাচীন ঋষিরা আমাদের এ পৃথিবীর মায়াতে নির্বাসনের কালটা কমিয়ে ফেলবার জন্যে নানা রকম উপায় আবিষ্কার করে গেছেন। অবিশ্যি কর্মফলভোগের কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মকানুন আছে বইকি, কিন্তু তাও জ্ঞানবলে সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়, নিতান্ত গতানুগতিকভাবে ভোগ করে যেতে হয় না।

"মানুষের যা কিছু দুঃখকষ্ট, অমঙ্গল, তা কোন না কোন প্রকার বিশ্ব-বিধানের লঙ্ঘন থেকেই উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রবিধি এই নির্দেশ দেয় যে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার না করে, সব প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলা। তার কি বলা উচিত জান? তার এই প্রার্থনা করা উচিত যে,—'প্রভু, একমাত্র তোমাকেই তো আমি ভক্তি করি আর বিশ্বাস করি, আর জানি যে তুমিই আমায় সাহায্য করবে, কিন্তু আমিও আমার কৃত অন্যায় বা ভুল কাজের জন্যে বা তার জন্যে যদি কোন ফলের উৎপত্তি হয়, তা সংশোধনের জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব।' বহুবিধ উপায়ে—এই ধর না কেন, প্রার্থনার দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, যোগসাধন, গভীর ধ্যানধারণা বা সাধুসন্তদের উপদেশ, আশীর্বাদ বা অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা অথবা উপযুক্ত তাগা প্রভৃতি ধারণ করে, অতীত জীবনের কর্মফলের গুরুত্ব হ্রাস করান অথবা তা এড়ান যেতে পারে।

"বাজপড়ার হাত থেকে এড়ানর জন্যে বাড়ীর মাথার ওপর তামার শিক দেওয়া থাকে দেখেছ তো, তেমনি এই শরীরমন্দিরও কতকগুলি উপায়ে রক্ষা করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক শক্তির বিকিরণ বিশ্বজগতের চতুর্দিকে প্রতিনিয়তই ছড়িয়ে পড়ছে, তারা মানব শরীরের উপর অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। যুগযুগান্ত পূর্বে আমাদের মুনিঋষিরা সূক্ষ্ম জ্যোতিষ প্রভাবের প্রতিকূল ক্রিয়া প্রতিহত করবার গূঢ় রহস্যের বিষয় চিন্তা করে গেছেন। মুনিঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে খাঁটি ধাতু থেকে একরকম আধ্যাত্মিক শক্তিবিশিষ্ট সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি বিনির্গত হয়, যা গ্রহনক্ষত্রের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। কতক-গুলি বৃক্ষলতাগুল্মাদির মূল প্রভৃতির সংযোগও উপকারী দেখা গেছে। সবচেয়ে ফলপ্রদ হচ্ছে বেদাগ আর নিখুঁত গ্রহরত্ন—এবং তা অন্ততঃ দু'রতি হওয়া চাই।

"ফলিত জ্যোতিষের ফলপ্রদ প্রতিরোধক ব্যবস্থার বিষয়ে ভারতবর্ষের বাইরে গুরুতরভাবে আলোচনা কদাচিৎ হয়েছে। আসল কথাটা কি জান, প্রশস্ত

ধাতু, গ্রহরত্ন বা মূল ধারণ সবই বৃথা হয়ে যায়, যদি না সে সব ঠিক উপযুক্ত পরিমাণের ওজনের দেওয়া হয় অথবা কবচাদি ঠিক অঙ্গস্পর্শ করিয়ে না ধারণ করা হয়।"

"তা হলে ত' গুরুদেব, গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করা দরকার। নিশ্চয়ই আমি আপনার পরামর্শ মত তাগা ধারণ করব।"

"সাধারণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তোমায় সোনা, রূপো আর তামার তাগা ব্যবহার করবার পরামর্শ দিই, আর বিশেষ ফললাভের জন্যে তোমায় আমি রূপো আর সীসের তাগা ব্যবহার করাতে চাই," বলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী এবিষয়ে আমায় সব খুঁটিনাটি উপদেশ দিয়ে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম,—"আচ্ছা গুরুজী, এই 'বিশেষরূপে ফললাভ'টার মানে কি? কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে, বলুন তো?"

"মুকুন্দ, শীগগিরই তোমার একটা দারুণ গ্রহপীড়া ঘটবে—ভয় পেয়ো না। রক্ষা পেয়ে যাবে। মাসখানেকের মধ্যেই তোমার লিভারের দোষ দাঁড়িয়ে গিয়ে তোমায় খুবই ভোগাবে। এ ভোগ তোমার ছ'মাসকাল পর্যন্ত চলবে, কিন্তু তাগা ধারণ করলে ভোগকালটা কমে গিয়ে মাত্র চব্বিশ দিনে এসে দাঁড়াবে।"

তার পরদিনই একটা স্যাকরা ডাকিয়ে গুরুজীর কথামত তাগা তৈরী করিয়ে নিয়ে ধারণ করলুম। স্বাস্থ্য তখন আমার খুবই ভাল ছিল; গুরুজীর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে ভুলে গেলুম, আর কিছুই মনে রইল না। তিনি শ্রীরামপুর থেকে কাশী চলে গেলেন। আমাদের কথাবার্তার দিন ত্রিশেক পরে আমার লিভারের জায়গায় একটা দারুণ বেদনা উঠল। তার পরের ক'হপ্তা যে কি করে কেটেছিল, তা ভগবানই জানেন। সে যে কি দারুণ যন্ত্রণা আর কষ্ট, আর তার কি একটু মাত্রও রেহাই ছিল! মনে মনে ভাবলুম যে গুরুদেবকে এ নিয়ে আর বিব্রত করব না, একাই এ নিদারুণ কষ্ট নীরবে সহ্য করে যাব।

কিন্তু তেইশ দিন ধরে দারুণ ভোগবার পর আর সইতে না পেরে, সে সঙ্কল্প আর বজায় রাখতে পারলুম না; কাশীর ট্রেনে চেপে বসলুম। বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতে গুরুজী অবশ্য আমায় খুবই আদর যত্ন করলেন। দর্শনের জন্য বহু ভক্তশিষ্যেরা সেদিন গুরুজীর কাছে এসে হাজির। আমার যে কি দারুণ কষ্ট তা আর তাঁকে আড়ালে ডেকে বলবার ফুরসৎ পাই না, আর কেউ ডেকে জিজ্ঞাসাও করবে না। কি বিপদ! মন খিঁচড়ে গেল, একা একা একটা কোণে চুপ করে বসে রইলুম। রাত্রে সব খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তবে সবাই চলে গেল; তখন গুরুদেব আমাকে তাঁদের বাড়ীর সেই অষ্টকোণ বারান্দাটিতে ডেকে পাঠালেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী চাঁদের আলোয় পায়চারি করছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর ছায়া এসে পড়ছিল ; আমার দিকে তাঁর চোখ না ফিরিয়ে তিনি পায়চারি করতে করতেই বললেন, "তোমার লিভারের যন্ত্রণার জন্যে এসেছ। ওঃ! আচ্ছা দেখি, তুমি কদ্দিন ভুগছ—দিন চব্বিশেক হবে, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব।"

"তা হলে তোমায় যে পেটের ব্যায়ামটা শিখিয়ে ছিলুম, সেটা কর না কেন ?"

হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলুম না, তবুও তাঁর আজ্ঞা পালনের ক্ষীণ প্রচেষ্টায় বললুম, "গুরুদেব, কি দারুণ যন্ত্রণায় যে ভুগছি, তা যদি জানতেন, তাহলে ও কথা আর মুখেও আনতে পারতেন না। এই যন্ত্রণার ওপর আবার ব্যায়াম করব, কি যে বলেন।"

"তুমি বলছ যে তোমার যন্ত্রণা আছে, এ্যাঁ, আর আমি বলছি যে তোমার কিছুমাত্র যন্ত্রণা নেই। এ দুটো বিপরীত কাণ্ড কি করে একসঙ্গে হয় বল দেখি ?" বলে গুরুদেব আমার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইলেন।

শুনে আমি তো একেবারে স্তম্ভিত আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম। এই চব্বিশদিন ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণা অবিরত ভোগ করে এসেছি, যাতে করে রাত্রে বিন্দুমাত্রও ঘুম হত না, তা তো আর কিছুমাত্র টের পাচ্ছি না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কথায় সে দারুণ যন্ত্রণা একেবারে বেমালুম উড়ে গেল, যেন কোনও কালে কখনও কিছু হয় নি, কি আশ্চর্য !

কৃতজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়ে পদতলে গিয়ে পড়তে গেলুম, তাড়াতাড়ি তিনি আমায় ধরে ফেললেন। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে বললেন, "আরে ছেলেমানুষি কোরো না, ওঠো, ওঠো ; গঙ্গায় কেমন চাঁদের আলো পড়েছে, দেখ দেখি।" নীরবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, তাঁর চোখদুটি আনন্দে উজ্জ্বল। তাঁর এ রকম ব্যবহারে ভাবলুম যে, তিনি আমাকে এই বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে তিনি নন, ভগবানই হচ্ছেন আমার আরোগ্যকর্তা।

সুদূর অতীতের চিরপোষিত স্মৃতিচিহ্ন, আজও আমি সেই রূপো আর সীসের ভারী তাগা পরে রয়েছি। তখন আবার আমি নতুন করে বুঝতে পারলুম যে সত্যিই আমি এক মহামানবের সঙ্গলাভ করেছি। পরবর্তী জীবনে আমি অনেক বন্ধুদের শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে ভাল হবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি তাগা* কি রত্ন আর তারা কোন্ গ্রহশান্তিতে প্রশস্ত আর

* ২৫শ পরিচ্ছেদের শেষে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

তাদের ব্যবহার কিরূপ, সব বুঝিয়ে দিয়ে ধারণ করবার উপদেশ দিয়ে তাদের ভাল করে দিতেন।

ছেলেবেলা থেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসের ভাব ছিল খানিকটা এই কারণে যে, অনেকেই এর প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে যাদের কোন যুক্তি বিচার নাই, আর খানিকটা এই কারণে যে, আমাদের বাড়ীর জ্যোতিষী মহাশয় বলেছিলেন যে, "তোমার দু দুবার পত্নীবিয়োগ আর তিন তিনটে বিয়ে হবে।" এই তিনটে বিয়ের বুলির কথা শুনে তো বলিদানের ছাগের মত আমার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলুম।

অনন্তদা পরম নিশ্চিন্তভাবে বলেছিলেন, "এ তো তোমার কপালে ঘটবেই। কারণ তোমার কুষ্ঠিতে তো লেখা ছিল যে, ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে হিমালয়ের দিকে পালাবে আর জোর করে তোমায় ধরে আনা হবে, তা যখন সব ঠিক ঠিক ফলে গেছে, তখন তোমার এ বিয়ের কথাও ফলে যেতে বাধ্য।" যুক্তিটা একেবারে অকাট্য। কিন্তু একরাত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করলুম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই মিথ্যা। কোষ্ঠি আগুনে পুড়িয়ে একটা কাগজের খামে তার ছাইগুলো পুরে তার উপর লিখে দিলুম, "জ্ঞানের আগুনে পুড়লে প্রাক্তন কর্মের বীজ আর কখনও ফুটতে পারে না।" চট করে নজরে পড়ে, এমন জায়গায় খামটা রেখে দিলুম। অনন্তদা তক্ষুনি দেখতে পেয়ে আমাকে হেসে ঠাট্টা করে বললেন, "যা সত্যি জীবনে ঘটবে, তা ওড়ান কি কুষ্ঠি পোড়ানর মত এতই সোজা ?"

তবে একথা সত্য যে, বয়স হবার আগেই বাস্তবিক তিন তিনবার আমার বিবাহের সম্বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিন তিনবারই আমি সে ফাঁদ এড়াতে পেরেছিলুম* এই ভেবে যে, কোষ্ঠিতে লেখার ফল ঘটতে দেওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল ঢের ঢের বেশী প্রবল।

"মানুষের যত গভীর আত্মোপলব্ধি হয়, ততই সে সারা বিশ্বপ্রকৃতিকে তার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তির স্পন্দনে প্রভাবিত করতে পারে, আর ততই সে নিজেও তার নৈসর্গিক প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে।" গুরুদেবের এই কথাগুলো প্রায়ই মনের মাঝে উদয় হয়ে খুব উৎসাহের সঞ্চার করত।

মাঝে মাঝে আমি জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করতুম, আমার সবচেয়ে খারাপ সময় কবে পড়বে বলুন দেখি, আর সেই সময়টাই বেছে নিয়ে যে কাজে লেগে থাকতুম তাই-ই করে যেতুম। এও অবশ্য সত্য যে, এই রকম সব দুঃসময়ে দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়ে তবেই কতকটা কৃতকার্য হতে পারা গেছে। কিন্তু আমার যা বিশ্বাস ছিল, তা শেষ অবধি একেবারে খাঁটি বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাস আর মানুষের ঈশ্বরদত্ত ইচ্ছার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার—এ দুটোর এত বড় শক্তি যে, সারা সৌর-জগতের এমনতর ক্ষমতা নাই যে তা উল্টাতে পারে। তাতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রের কোন দশাই মানুষের বিন্দুমাত্র দুর্দশা আনতে পারে না।

পরে জানলুম যে জাতকের জন্মকালীন রাশিচক্রের অবস্থান এ কথা বোঝায় না যে, সে প্রাক্তন কর্মফলের দাস। এর লিখন বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য! এরা সর্ববিধ সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হবার জন্য মানুষের দৃঢ়সঙ্কল্পকে জাগিয়ে তোলে। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই জীবাত্মারূপে সৃষ্টি করে তাকে ব্যক্তিত্ব দান করেছেন, কাজেই তারা এই বিশ্বসৃষ্টির একটা অপরিহার্য অংশ—তা সে মহান বা ক্ষুদ্র যাই-ই হোক না কেন। তার মুক্তি সদ্য ও চরম, অবশ্য সে যদি তা একান্ত কামনা করে—আর তার জন্য বাইরের কোন শক্তিকে জয় করা দরকার করে না, অন্তরে বিজয়লাভ করাই তার প্রয়োজন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমাদের বর্তমান যুগে ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী সায়ন বৃত্তের বা চক্রের গাণিতিক প্রয়োগ আবিষ্কার করেছিলেন।* এই কালচক্র অধিরোহী-অবরোহী ভেদে দুটি চাপ বা বৃত্তাংশে বিভক্ত, প্রত্যেকেরই ব্যাপ্তি ১২,০০০ বৎসর। প্রত্যেক বৃত্তাংশের মধ্যে আবার কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য এই চারটি করে যুগ পড়ে। গ্রীকদের মতে এরা লৌহ, ব্রোঞ্জ, রৌপ্য ও স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত।

আমার গুরুদেব নানাবিধ গণনায় স্থির করেছিলেন যে, অধিরোহী বৃত্তাংশের শেষ কলি বা লৌহযুগ প্রায় ৫০০ খ্রীস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। এই কলিযুগের স্থিতিকাল হচ্ছে ১২০০ বৎসর আর এটা ছিল জড়ের যুগ। এ যুগ শেষ হয় প্রায় ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বৎসর হতেই ২৪০০ বর্ষব্যাপী দ্বাপর যুগের সূচনা। এই যুগে বৈদ্যুতিক ও আণবিক শক্তির নানাবিধ উন্নতি; টেলিগ্রাফ, রেডিও, বিমানাদি আর অন্যান্য দূরত্ববিলোপকারী যন্ত্রাদির আবির্ভাব।

* এই সব সায়নবৃত্ত স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রণীত "দি হোলি সায়েন্সে" ব্যাখ্যাত হয়েছে। (যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া, ২১ ইউ. এন্. মুখার্জী রোড, দক্ষিণেশ্বর, কলিঃ ৭০০০৭৬ হইতে প্রাপ্তব্য)।

ত্রেতাযুগের আরম্ভ হবে ৪১০০ খ্রীস্টাব্দে; স্থিতিকাল, ৩৬০০ বৎসর। এ যুগের লক্ষণ হবে টেলিপ্যাথি বা পরচিত্তজ্ঞান আর কালবিলোপকারী অন্যান্য বিষয়, তাতে সকলেরই সাধারণ জ্ঞান থাকবে। তারপর অধিরোহী বৃত্তাংশের শেষ যুগ, সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটবে। এর স্থিতিকাল হবে ৪৮০০ বৎসর। এ যুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি চরম উৎকর্ষ আর পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, তখন সে দৈবপরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সকল কর্ম সম্পাদন করবে।

তারপর আসবে অবরোহী বৃত্তাংশের ১২,০০০ বৎসর। এর সূচনায় পৃথিবীতে ৪৮০০ বর্ষব্যাপী অবরোহী সত্যযুগের আবির্ভাব হবে (১২,৫০০ খ্রীস্টাব্দে)। মানবজাতি তখন ক্রমশঃ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এই সব কালচক্র হচ্ছে মায়ারই চিরন্তন আবর্তন—প্রাতিভাসিক জগতের বৈষম্য আর আপেক্ষিকতার ক্রিয়া।* বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে যখন তার অচ্ছেদ্য দৈব অভেদত্বের সংজ্ঞান বা কল্যাণবুদ্ধি জাগরিত হয়, তখনই মানুষ একে একে এই সৃষ্টির মায়াকারাগার হতে মুক্তি লাভ করে।

গুরুদেব শুধু যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তা নয়, পৃথিবীর নানা শাস্ত্রসম্বন্ধেও আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থের উপদেশ তিনি তাঁর নিষ্কলঙ্ক মনের উপলব্ধিজাত জ্ঞানের বিচারে বিশ্লেষণ করে আর মহাপুরুষ-

---

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কল্পিত সরল ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী সায়নবৃত্ত অপেক্ষা হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত পৃথিবীর বয়স এক দীর্ঘতর যুগপর্যায়ে নির্দিষ্ট। শাস্ত্রে বর্ণিত পৃথিবীর যুগ ৪,৩০,০৫,৬০,০০০ বর্ষব্যাপী আর এই কল্পকাল সৃষ্টির এক দিবস অথবা আমাদের বর্তমান সৌরমণ্ডলের জীবন বা অবস্থিতিকালের পরিমাণ। ঋষিপ্রদত্ত এই বিরাট সংখ্যা, সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য এবং পাই (৩·১৪১৬, বৃত্তের পরিধিও ব্যাসের অনুপাতে) এর গুণিতকের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের মতানুযায়ী মহাবিশ্বের জীবনকাল হচ্ছে ৩১,৪১,৫৯, ০০,০০,০০,০০০, সৌরবর্ষ অথবা "ব্রহ্মার একযুগ"।

হিন্দুশাস্ত্র বলে যে আমাদের জগতের মত কোন জগৎ লোপ পায় দুটির মধ্যে একটি কারণে—হয় সেই জগতের অধিবাসীসকল চরম সৎ, না হয়, চরম অসৎপ্রকৃতির হয়ে পড়ে। এতে করে বিশ্বময় এমন একটা প্রচণ্ড মানসশক্তি সঞ্চিত হয় যে, তার বলে পৃথিবীর গঠনে সংহত অণুপরমাণুগুলি একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে "পৃথিবীর শেষদিন উপস্থিত" বলে এক একটা ভয়ংকর ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এক দৈবপরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বযুগ এক নিয়মানুগ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। উপস্থিত আমাদের এই গ্রহে হঠাৎ প্রলয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অধিরোহী এবং অবরোহীভেদে সায়নবৃত্তের বহু কোটি বৎসর এখনও আমাদের এই বর্তমান আকৃতির গ্রহটির জন্য সঞ্চিত আছে।

দিগের আদিপ্রচারিত বাণী হতে টীকাকারগণ কৃত ভ্রমপ্রমাদ বা প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়ে তা হতে সারসত্য উধৃত করে দেখাতে পারতেন।

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে "সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং"এর ভুল ব্যাখ্যা প্রাচ্য পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য অনুবাদকেরা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করাতে গুরুদেব সকৌতুকে সমালোচনা করে বলতেন, "একে ত' যোগীদের পথ অদ্ভুত, তার উপর আবার তাদের ট্যারা হবার উপদেশ দেওয়া কেন, বল ? 'নাসিকাগ্রং'-এর আসল মানে হচ্ছে 'নাসামূল', নাকের ডগা নয়। আর নাসিকার আরম্ভ হচ্ছে দুই ভ্রূর মধ্যস্থল,—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির স্থান।"*

সাংখ্যের** সূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধে"† এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ হয় না ধরে নিয়ে বহু পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্রকে একেবারে নিরীশ্বরবাদী বলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বুঝিয়ে বললেন, "এই সূত্র নাস্তিকতা আনে না। অশিক্ষিত লোকেরা, যারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধেরই উপর নির্ভর করে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রমাণ অজ্ঞাতই থেকে যায়, কাজেকাজেই তার অস্তিত্বও প্রমাণসিদ্ধ হয় না। খাঁটি সাংখ্যমতাবলম্বীরা তাদের অবিচলিত ধ্যানলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি জ্ঞেয়"।

খ্রীস্টিয় বাইবেলও গুরুদেব অতি চমৎকার আর অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অপরিচিত আমার এই হিন্দুগুরুর কাছ থেকেই আমি বাইবেলের অমর সত্তা আর খ্রিস্টধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করতে শিক্ষা করেছিলুম, যাতে করে যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, "স্বর্গ মর্ত্য লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার বাণী কখনও লোপ পাবে না।"‡

যীশুখ্রিস্ট যে সকল ঈশ্বরাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সব একই প্রকার উচ্চ আদর্শে ভারতবর্ষের মহাগুরুগণ আপনাদের জীবন গঠন করেন। এঁরা

---

* "দেহের আলোক (জ্যোতিঃ) হচ্ছে চক্ষুঃ ; সুতরাং যখন তোমার একটিমাত্র চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) হবে, তখন তোমার সমস্ত শরীর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে ; কিন্তু যখন তোমার চক্ষু অসৎ হবে তখন তোমার দেহও (অজ্ঞান) অন্ধকারে পূর্ণ হবে। সুতরাং অবহিত হও যে, যে জ্যোতিঃ (জ্ঞানালোক) তোমার মধ্যে আছে তা যেন (অজ্ঞান) অন্ধকার না হয়ে যায়।"—লূক ১১ : ৩৪-৩৫ (বাইবেল)।

** সাংখ্যদর্শন—হিন্দু ষড়দর্শনের এক দর্শন। সাংখ্যের মত হচ্ছে প্রকৃতি হতে পুরুষ পর্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভেই পরামুক্তি।

† সাংখ্যদর্শন—১:৯২।

‡ ম্যাথিউ ২৪:৩৫ (বাইবেল)

তাঁর সমগোষ্ঠী। খ্রিস্ট বলেছেন, "যেকোন লোক আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সে হবে আমার ভাই, ভগ্নী, মাতা।"* যীশুখ্রিস্ট বুঝিয়েছেন যে, "যদি তোমরা আমার বাক্য অনুসরণ কর, তা হলে তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য হতে পারবে এবং সত্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং এই সত্যজ্ঞানেই তোমাদের মুক্তি হবে।"** যাঁরা সব নিজেদের সেই একমাত্র পরম পিতারই সন্তান বলে জ্ঞানলাভ করেছেন, তাঁরা সব স্বাধীন মুক্তপুরুষ; ভারতীয় যোগী-ঋষিগণ সেই অমর ভ্রাতৃসঙ্ঘেরই একাংশ।

বাইবেলে বর্ণিত আদিপিতা ও আদিমাতা আদম ও ইভের রূপক বোঝবার প্রথম প্রথম চেষ্টায় একদিন অধৈর্য হয়ে কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ করে ফেললুম, "আদম ও ইভের গল্প আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য। ঈশ্বর শুধু দোষীদম্পতিকে শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে তাঁদের নিরীহ অজাত সন্তান-সন্ততিদেরও শাস্তি দিলেন কেন?"

গুরুদেব আমার অজ্ঞতার চেয়ে উষ্মাপ্রকাশের ধরণ দেখে মনে মনে হেসে বললেন, "জেনেসিস্ হচ্ছে গভীরভাবে রূপক আর তা শব্দার্থ ব্যাখ্যায় বোঝা যায় না। 'জীবনতরু' হচ্ছে আমাদের এই মানবদেহ। এর মেরুদণ্ড হচ্ছে যেন একটা উল্টান গাছ, তার শিকড় হচ্ছে মানুষের মাথার চুল আর তার অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী তন্ত্রিকাসকল হচ্ছে তার শাখাপ্রশাখা। স্নায়ুমণ্ডলীর তরুতে নানারকম উপভোগ্য ফল ফলে—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এদের বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এতে অবিশ্যি মানুষের একটু আধটু প্রশ্রয় দেওয়া চলে, কিন্তু শরীর উদ্যানের মাঝখানে আপেল-ফলরূপে বর্ণিত যে ইন্দ্রিয়সুখের স্থান, তার জ্ঞানাহরণ তার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।"†

'সর্প' হচ্ছে মেরুদণ্ডবাহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি, যা ইন্দ্রিয়তন্ত্রিকা উত্তেজিত করে। 'আদম' হচ্ছে যুক্তি আর 'ইভ' হচ্ছে অনুভূতি বা ভাব।

---

* ম্যাথিউ ১২:৫০ (বাইবেল)।

** জন ৮:৩১-৩২ (বাইবেল)। সেণ্টজন প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, "কিন্তু যে সকল লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলে (কূটস্থে উপলব্ধি করলে) তাঁদের সকলকে ঈশ্বরের সন্তান হবার শক্তি তিনি দান করলেন, এমন কি তাঁদেরকেও, যাঁরা তাঁর নামে বিশ্বাস করে (যাঁরা সর্বব্যাপী খ্রিস্টচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত।)"—জন ১:১২ (বাইবেল)।

† "আমরা উদ্যানের বৃক্ষসকলের ফল সব ভক্ষণ করতে পারি বটে কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থলে স্থিত বৃক্ষটির ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন, তুমি অবশ্যই এ ফল ভক্ষণ করবে না, এমন কি স্পর্শও করবে না, তাহলে তোমার মৃত্যু ঘটবে।" —জেনেসিস ৩:২-৩ (বাইবেল)।

যখন কোন মানুষের ভিতর ইন্দ্রিয়ের তাড়না তার মানসিক ভাবকে পরাভূত করে, তখন সে যুক্তিকে হারায় অর্থাৎ আদমের মৃত্যু ঘটে।*

"ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাশক্তিবলে নর ও নারীর দেহে রূপদান করে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঐ নবসৃষ্ট জাতিকে ঐরূপ একই প্রকার নির্দোষ বা দৈব উপায়ে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অর্পণ করলেন।** পূর্ণ বিচারক্ষমতার সম্ভাবনাবিহীন, আর সংস্কারচালিত প্রাণিদেহে ঈশ্বরের জীবাত্মারূপে প্রথম প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টি করলেন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যশরীর আর তাদের আদম ও ইভ এই রূপক নাম দিলেন। এদের সুবিধাজনক ক্রমোন্নতিসূচক বিবর্তনের জন্য দুই শরীরে দুইটি প্রাণীর আত্মা বা দৈবসত্তা প্রেরণ করেন।† আদম অর্থাৎ নরের ভিতর যুক্তিই প্রবল আর ইভ অর্থাৎ নারীর মধ্যে ভাবই প্রধান। তাই এই জগৎসংসারের ভিতর এই দ্বৈত-ভাবেরই প্রকাশ। সর্পরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রবলশক্তির দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মন প্রলুব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তি আর ভাব মিলিত আনন্দের স্বর্গেই বাস করে।

"তা হলে তোমার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মনুষ্যশরীর কোন জন্তু শরীরের ক্রমবিবর্তনের একমাত্র ফল নয়, এ জাত হয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই। জন্তুশরীর পূর্ণ দৈব বা ঐশ্বরিক ভাববিকাশের পক্ষে অত্যন্ত স্থূল। আদি মানব-মানবীকে দত্ত তাঁর অপূর্ব দান হচ্ছে বিরাট মননশক্তির আধার—প্রচ্ছন্ন সর্বজ্ঞতার মূল, মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্ম, আর তা ছাড়া মেরুদণ্ডে পূর্ণ জাগরিত ষট্চক্র।

প্রথমসৃষ্ট নরনারীযুগলের ভিতর ঈশ্বরতত্ত্ব বা পরমজ্ঞান তাদের এই উপদেশই দিয়েছিল যে, সকল রকমই ইন্দ্রিয়ানুভূত ভোগ করতে পার, কিন্তু

---

* "যে স্ত্রীলোককে আমার সঙ্গিনী হবার জন্যে দিয়েছিলেন, সে-ই বৃক্ষ থেকে আমায় ফল দেয় এবং আমি তা ভক্ষণ করি। স্ত্রীলোকটি বলে, সর্পটি আমায় প্রলুব্ধ করে, তাইতেই আমি ফলটি ভক্ষণ করেছিলুম।"—জেনেসিস ৩:১২-১৩ (বাইবেল)।

** "সুতরাং ঈশ্বর মানবকে নিজ প্রতিরূপে সৃষ্টি করলেন এবং তাহাদিগকে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করলেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে বললেন, ফলবান হও এবং বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী সম্পদে পূর্ণ কর এবং একে শাসন কর।"

—জেনেসিস ১:২৭-২৮ (বাইবেল)।

† "এবং প্রভু ঈশ্বর ভূমির মৃত্তিকা হতে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করলেন এবং তার নাসিকায় প্রাণ বায়ু প্রবিষ্ট করালেন। তখন মানব একটি সজীব আত্মায় পরিণত হল।"

—জেনেসিস ২:৭ (বাইবেল)।

একটিমাত্র ভোগ ছাড়া—তা হচ্ছে যৌনসম্ভোগ।* এদের উপর এত করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এই জন্য যে, যৌনাঙ্গের ব্যবহার প্রতিক্রিয়ার জালে আবদ্ধ করে ফেলে। মানুষের অবচেতন মনে অবস্থিত পাশবিকবৃত্তির স্মৃতি যাতে পুনরায় জাগরিত না হয়, তার জন্যে যে সতর্কতা, কেউই তা গ্রাহ্য করলে না। পাশবিকসৃষ্টির পথ বেছে নিয়ে আদম আর ইভ স্বর্গীয় আনন্দ থেকে চ্যুত হল, যা আদি পূর্ণ মানবের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। যখন 'তারা বুঝতে পারলে যে তারা উলঙ্গ', তাদের অমরত্ববোধ অন্তর্হিত হল, ঈশ্বর তাদের সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও; তারা এখন শারীরবিধির অধীন হল, যাতে করে দেহের জন্মের অনিবার্য পরিণাম দেহের মৃত্যু।

'সর্প' কর্তৃক 'ইভ'কে প্রতিশ্রুত 'সদসৎ' জ্ঞান বিষম আর দ্বৈতভাব সূচিত করে, মরণশীল মানব মায়াবশে যার অধীন। আদম ও ইভ চেতনা অর্থাৎ যুক্তি আর ভাবের অপব্যবহারের দরুণ মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়ে মানুষ তার পূর্ণ দিব্যজ্ঞানের স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে।** প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে তার আদি পিতামাতা অর্থাৎ দ্বিমুখী প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে আবার সেই পরিপূর্ণ ঐক্য অর্থাৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ব্যাখ্যা শেষ হলে বাইবেল বর্ণিত জেনেসিসের পৃষ্ঠায় নবোদিত শ্রদ্ধায় দৃষ্টিনিবদ্ধ করলুম।

বললুম "গুরুদেব, আজ আমি এই প্রথম আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও ইভের‡ প্রতি সন্তানের যথোচিত কর্তব্যের আহ্বান অনুভব করছি।"

---

* "এক্ষণে সর্প (যৌনশক্তি) হল ভূমির যে কোন জন্তু (শরীরের যে কোন ইন্দ্রিয়বোধ) অপেক্ষা অধিকতর চতুর ও ধূর্ত।"—জেনেসিস ৩:১ (বাইবেল)।

** "এবং প্রভু ঈশ্বর ইডেনের (স্বর্গোদ্যানের) পূর্বদিকে একটি উদ্যান রচনা করলেন; এবং তথায় তাঁর সৃষ্ট মানবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।" —জেনেসিস ২:৮ (বাইবেল)। "অতএব প্রভু ঈশ্বর তাকে পাঠালেন সেই ভূমিকর্ষণ করতে যেখান হতে সে সৃষ্ট হয়েছিল।" —জেনেসিস ৩:২৩ (বাইবেল)।

ঈশ্বরসৃষ্ট প্রথম দিব্যমানবের জ্ঞান তার কপালের (পূর্বদেশ) সর্বদর্শী একটি মাত্র চক্ষুতেই কেন্দ্রীভূত থাকত। নিখিলসৃজনক্ষমতাবিশিষ্ট তার ইচ্ছাশক্তি, মানুষ যখন তার জড়প্রকৃতির "ভূমিকর্ষণ" করবার চেষ্টা শুরু করলে, তখনই তা লোপ পায়।

‡ হিন্দুদের "আদম ইভ" গল্পটি সুপ্রাচীন শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম নর ও নারী (জড়দেহধারীরূপে) স্বয়ম্ভুব (সৃষ্টিকর্তা হতে জাত) মনু আর তাঁর স্ত্রী শতরূপা বলে কথিত হয়েছে।

তাঁদের পাঁচটি সন্তানসন্ততি প্রজাপতিগণের (পূর্ণ জীব, যাঁরা জড়াকৃতি ধারণ করতে

পারতেন) সঙ্গে বিবাহের আদান প্রদান প্রচলিত করেছিলেন ; এই প্রথম দিব্যদেহধারী পরিবার হতেই মানবজাতির উৎপত্তি ।

কি পূর্ব, কি পশ্চিম কোথাও আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মতন এমন গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে খৃষ্টিয়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে কখনও শুনিনি। গুরুদেব বলতেন "তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগন, 'আমিই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন ; আমা ভিন্ন কেউই পিতার নিকট আগমন করতে পারে না,'—জন ১৪:৬ (বাইবেল), এই সব পংক্তিগুলির ভুল ব্যাখ্যা করে গেছেন । যীশুখৃষ্ট কখনও একথা বলেননি যে, তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ; তিনি এই কথা বলেছিলেন যে, কোন মানবই সেই নির্গুণ পরমব্রহ্ম, সেই ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর, যিনি স্বয়ম্ভু, সৃষ্টির অতীত, সেই 'পিতার' ভাব প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ না সে প্রথমে সেই 'পুত্রভাব' অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সক্রিয় বিশ্বচৈতন্যের ভাবপ্রদর্শন করতে পারে। যীশু, খৃষ্টচৈতন্য অথা বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর জীবাত্মাবোধ একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল ।"

যখন পল লিখলেন, "ঈশ্বর...যীশুখৃষ্ট দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন,"—এফিসিয়ানস্ ৩:৯ (বাইবেল), এবং যখন যীশু বললেন, "এব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকে আমি আছি",—জন ৮:৫৮ (বাইবেল), তখন কথাগুলির সার অর্থ বোঝায় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা ।

কর্মবিধি ও তার অনুসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে পারলে দেখা যাবে যে, পুনর্জন্মের বিষয় বাইবেলের অসংখ্য পংক্তিতে উল্লেখ আছে যথা, "যে কেহ মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষের দ্বারাই তার রক্তপাত হবে ।" জেনেসিস্ ৯:৬ (বাইবেল) । প্রত্যেক নরহন্তা যদি 'মানুষ দ্বারাই' হত হয়, তা হলে প্রতিক্রিয়ার নিয়মে স্পষ্টতঃ বহুক্ষেত্রে এই প্রয়োজন উপস্থিত হয় যে, একাধিক জীবনের প্রয়োজন ।' সমসাময়িক কোন শাস্তিবিধান সদ্যসদ্য হয়ত পাওয়া যায় না বলেই !

আদি খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়, জ্ঞেয়বাদী এবং সুবিখ্যাত অরিজেন, অ্যালেকজাণ্ডিয়ার ক্লিমেণ্ট (উভয়ই ৩য় শতকের) এবং সেণ্ট জেরোম (৫ম শতাব্দী) সমেত বহু খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ৫৫৩ খৃঃ অব্দে কনস্ট্যাণ্টিনোপলের দ্বিতীয় কাউন্সিল কর্তৃক এই মতবাদ প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মত বলে ঘোষিত হয় । সেই সময় বহু খৃষ্টানই ভেবেছিলেন যে পুনর্জন্মবাদ মানুষকে সদ্যমুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করতে দেশ আর কালের একটা অতি বড় সুযোগ দান করেছিল। কিন্তু সত্য চাপা দেওয়ার কুফলে হয় একগাদা ভুলের সৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের "একটি জীবন কাল" ঈশ্বরানুসন্ধানে ব্যয় করেনি,—ব্যয় করেছে দুর্লভরূপে প্রাপ্ত এই সংসারকে ভোগ করবার জন্য, যা শীঘ্রই চিরতরে হারিয়ে যাবে। সত্য হচ্ছে এই যে, মানুষ পৃথিবীতে পুনর্জন্মগ্রহণ করে, যতক্ষণ না সে সজ্ঞানে ঈশ্বরের পুত্ররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে ।

১৭শ পরিচ্ছেদ

শশী ও তিনটি লীলা

ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র রায় একদিন আমায় বললেন, "ওহে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সম্বন্ধে তোমার আর আমার ছেলেরও খুব উচ্চ ধারণা শুনতে পাই—তা চল, একদিন না হয় দর্শনলাভ করেই আসা যাক্, কি বল?" ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল যে, তিনি যেন দুটো আধপাগলার খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য একটু ব্যাঙ্গ করেই কথাগুলো বললেন। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলুম।

ডাক্তারবাবু ছিলেন পশুচিকিৎসক, আর একজন দারুণ নাস্তিক। তাঁর ছোট ছেলে সন্তোষ তার বাপের বিষয়ে আমায় একটু নজর রাখতে বলত। কিন্তু এ পর্যন্ত আমার অমূল্য সাহায্যের চেষ্টা বাইরে বিশেষ কিছু প্রকাশ পায় নি।

যাক্, তারপরদিন 'ত ডাক্তার রায় আমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশ্রমে গেলেন। গুরুদেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল। রইলেন অল্পক্ষণই, কিন্তু যতটুকুসময় সেখানে রইলেন, তার অধিকাংশ সময় উভয়েরই চুপচাপ করে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ উঠে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হতেই তিনি আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আশ্রমে তুমি মরা মানুষ কেন আনো বলত?"

"বলেন কি গুরুদেব! ডাক্তারবাবুর মতন অমন জলজ্যান্ত আর কেউ আছে না কি?"

"কিন্তু শীগগিরই বেচারা মারা যাবে যে, তা জান?" শুনে তো হাত পা হিম হয়ে এল, বললুম, "গুরুদেব, ছেলেটা তো তা হলে দারুণ আঘাত পাবে। আহা বেচারা! সন্তোষ এখনও আশা করে যে, তার বাপের নাস্তিকতা ঘুচোবার সময় আছে। আপনার পায়ে পড়ি গুরুদেব, বেচারাকে বাঁচান!"

"আচ্ছা বেশ, তোমার জন্যেই কেবল আমি চেষ্টা করে দেখব।" গুরুদেবের মুখ ভাবলেশহীন। বললেন, "দেখ তোমার ঐ দাম্ভিক ঘোড়ার ডাক্তারটির বহুমূত্র রোগ ভিতরে ভিতরে অনেক দূর এগিয়েছে, তা ও বেচারা কিছুই জানে না। এই দেখ না, দিন পনেরোর ভিতরই বিছানায় পড়ল বলে। ডাক্তারেরা একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন দেখো। তাঁর স্বাভাবিক আয়ু

আজ হতে আর বড়জোর মাসদেড়েক। কিন্তু তোমার আগ্রহে যাই হোক, ঐদিনেই সে ভাল হয়ে উঠবে। আর দেখ, একটা কথা আছে, তোমার ডাক্তার-বাবুকে একটি তাগা ধারণ করাতে হবে—তবেই সে সুস্থ থাকবে; কিন্তু অপারেশন করার সময় ঘোড়ার লাথিছোঁড়ার মতন সে তাতে দারুণ আপত্তিই করবে, তোমার কথা কিছুতেই মানবে না, তা দেখে নিও।" বলেই উচ্চহাস্য শুরু করে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ করেই কেটে গেল। ভাবতে লাগলুম কি করে সন্তোষ আর আমি এই বিদ্রোহী নাস্তিকটিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে কাজ হাসিল করতে পারি, তখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আবার বলতে শুরু করলেন, "দেখ, তোমার ডাক্তার-বাবু আরাম হয়ে গেলেই বোলো, যেন কিছুতেই আর মাংসটাংস না খান, তা হলেই বিপদ ঘটবে। সে অবিশ্যি একথা কানেই তুলবে না, আর এখন যেমন সে ভাবছে যে তার স্বাস্থ্য খুব ভালই আছে, তখনও সে তেমনই ভাববে। তাহলেও দেখো মাসছয়েকের ভিতরই সে ঠিক মারা পড়বে। আর এই যে ছ'মাস আয়ু বাড়ল, তা কেবল তোমার অনুরোধ-উপরোধেরই জন্যে।"

তার পরদিন সন্তোষকে বলে এক স্যাঁকরাকে দিয়ে একটা তাগা তৈরী করার ব্যবস্থা হল। হপ্তাখানেকের ভিতরই তা তৈরী হয়ে গেল বটে, কিন্তু ডাক্তার রায় সেটা পরতে রাজী হলেন না। বললেন, "না, না, আমার স্বাস্থ্য এখন খুবই ভাল। তোমার ও জ্যোতিষীটোত্যোতিষীদের বুজরুকি সব এখানে আর চলবে না, বুঝলে হে!" বলেই আমার প্রতি একটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

সকৌতুকে স্মরণ করলুম, গুরুদেব এক বগ্‌গো ঘোড়ার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কি রকম ন্যায্য তুলনাই করেছিলেন। যাক্‌, আরও দিনসাতেক কাটল; তারপর ডাক্তারবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কি আর করেন, নিতান্ত নিরীহভাবে তিনি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন তাগা ধারণ করতে। আরও হপ্তাদুই কাটল, ডাক্তার এবার একেবারে জবাব দিয়ে গেলেন, বাঁচবার আর কোন আশা নাই! তিনি আমাকে বললেন যে বহুমূত্রে নারায়ণবাবুর শরীরে এত ক্ষতি করেছে যে, এ যাত্রা তাঁর আর রক্ষে নেই; বলে বহুমূত্ররোগের দারুণ উপসর্গসকল আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। আমি মাথা নেড়ে বললুম, "উঁহু, আমার গুরুদেব বলেছেন যে, মাসখানেক ভোগবার পর ডাক্তার রায় ঠিক ভাল হয়ে উঠবেন, দেখবেন।"

ডাক্তারবাবু তো নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে আমার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন।

হপ্তাদুই বাদে একদিন সেই ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে দেখা করে যেন ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক ভাবেই বললেন, "কি আশ্চর্য, নারায়ণবাবু একেবারে সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে আরাম হয়ে গেছেন। আমার অভিজ্ঞতায় তো এমন অদ্ভুতভাবে রোগমুক্তি একটা অলৌকিক ব্যাপার। যমের মুখ থেকে এ রকম আশ্চর্য ভাবে ফিরে আসা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তোমার গুরুদেবের রোগ নিরাময়ের অদ্ভুত দৈবশক্তি আছে দেখছি।"

এরপর নারায়ণবাবুর সঙ্গে একটিবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তখনই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সাবধানবাণী তাঁকে শুনিয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসেছিলুম যে, জীবনে তিনি যেন আর কখনও মাংস আহার না করেন। তারপর মাসছয়েকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় আমি গড়পার রোডের আমাদের বাড়ীর বারান্দায় বসে আছি। ডাক্তার নারায়ণ রায় আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কথায় কথায় তিনি বললেন, "দেখ, তোমার গুরুদেবকে বোলো যে, প্রায়ই মাংস খেয়ে আমি পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি। মাংস ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি আমায় টলাতে পারেন নি।" সত্যিই তখন ডাক্তার রায়কে পূর্ণস্বাস্থ্যের একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলেই দেখাচ্ছিল।

কিন্তু তার পরদিনই সন্তোষ আমার কাছে ছুটে এল। পাশেই তাদের বাড়ী। বললে, "এই সকালবেলা হঠাৎ বাবা মারা গেলেন।" গুরুদেবের নানা অলৌকিক ঘটনাবলী আমি যা সব দেখেছি, তার মধ্যে এটাও সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। সেই বিদ্রোহী ঘোড়ার ডাক্তারটিকে গুরুদেব তাঁর দারুণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও আরাম করে তুললেন, আর ছ'মাস তাঁর আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিলেন, কেবলমাত্র আমার কাকুতিমিনতির জন্য। ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দয়া ছিল অসীম।

আমার কলেজের বন্ধুদের গুরুজীকে দর্শন করান আমার একটা সর্বাপেক্ষা গর্বের বস্তু ছিল। অন্ততঃ আশ্রমে পেঁছেও সন্দেহবাদীদের অনেকেরই কেতাদুরস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানের মুখোস খসে পড়ত।

আমার একটি বন্ধু শশী প্রায়ই হপ্তার শেষে শ্রীরামপুরের আশ্রমে এসে থেকে যেত। গুরুদেব ছেলেটিকে খুব ভালবেসে ফেললেন, কিন্তু দুঃখ করতেন যে, ছেলেটির নিভৃতজীবন একটু উচ্ছৃঙ্খল আর অসংযত।

একদিন গুরুদেব একটু সস্নেহবিরক্তির সঙ্গেই বললেন, "দেখ শশী, তুমি যদি এখন থেকে না শোধরাও, তাহলে ঠিক এক বছর বাদেই তুমি সাংঘাতিক-ভাবে অসুখে পড়বে, তা জেনে রেখো। মুকুন্দ সাক্ষী রইল, পরে যেন

আমায় আর দোষ দিয়ো না যে, সময় থাকতে আমি তোমায় সাবধান করে দিই নি।"

শশী হেসে বললে, "গুরুদেব, আমার পোড়াকপালে ভগবানের দয়া জোটানতে যা কিছু করবার, তার ভার আপনার ওপরেই দিলুম, যা করবার হয় করবেন, আমি আর কি বলব, বলুন? আমার প্রাণ চায় বটে, কিন্তু মন যে বড় দুর্বল। পৃথিবীতে কেউ যদি আমায় বাঁচাতে পারেন তো সে আপনি, এ ছাড়া আমি আর কিছু বিশ্বাস করিনে।"

"অন্ততঃ দু'রতির একটা নীলা ধারণ কোরো, এতেও অনেকটা কাজ হবে।"

"ও সব আমি জোগাড়যন্ত্র করতে পারব না। যাই হোক্, গুরুদেব, বিপদ যদি একান্তই আসে, তা হলে আপনিই আমায় রক্ষা করবেন, এ বিশ্বাস আমার পুরোমাত্রায় আছে।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটু রহস্যজনকভাবে উত্তর দিলেন, "দেখ, আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে এই বছরখানেকের মধ্যেই তোমায় এখানে তিন তিনটি নীলা নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তখন আর তাদের কোন দরকারই থাকবে না, তা জেনে রেখো।"

এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা নিয়মিত ভাবেই চলত। কখনও বা শশী কৃত্রিম হতাশ্বাসের সঙ্গে বলত, "আমি আর বদলাতে পারলুম না দেখছি। যাক্, গুরুদেব, আমি বলে রাখছি ও সব রত্নটত্নর চেয়ে আপনার ওপর আমার যে বিশ্বাস, তার দাম ঢের ঢের বেশী!"

বছরখানেক বাদে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর এক শিষ্য নরেনবাবুর কলকাতার বাড়ীতে গুরুদর্শন করতে গিয়েছি। তেতলার বৈঠকখানায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আর আমি চুপচাপ বসে আছি, বেলা তখন দশটা। সদর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। গুরুদেব বেশ শক্ত আর সোজা হয়ে বসলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "এ সেই শশীটা, বছর এখন শেষ হয়েছে, তাই এখন এসেছে। এখন আর এলে কি হবে? ওর দুটো ফুসফুসই একেবারে গেছে। আমার কথা ত শুনলে না। ওকে বলে দাও যে আমি ওর সঙ্গে আর দেখা করতে চাই না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর রূঢ়তায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে দেখি যে, শশী তখন উপরে উঠছে।

"ওহে মুকুন্দ, গুরুদেব এখানে আছেন বুঝি, আমার কেমন মনে হচ্ছে তিনি নিশ্চয়ই এখানে হবেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেউ তাঁকে বিরক্ত করে, তিনি তা চান্ না।" শুনে তো শশী একেবারে কেঁদেই ফেললে, তারপর দৌড়ে উপরে উঠে গেল। গুরুদেবের চরণতলে প্রণাম করে সেখানে তিনটি অতি সুন্দর নীলা রেখে বললে, "সর্বদর্শী গুরুদেব, ডাক্তারেরা তো বলছেন যে, আমার রাজযক্ষ্মা দাঁড়িয়েছে, আর বড়জোর মাসতিনেক! গুরুদেব আপনার চরণতলে আশ্রয় নিলুম। আমি নিশ্চয় জানি যে, একমাত্র আপনিই আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন!"

"এই আজ এখন তোমার মরাবাঁচার ভাবনা এসে জুটেছে বুঝি, না? এখন বেজায় দেরী হয়ে গেছে শশী। যাক, তোমার রত্নটত্ন সব এখান থেকে নিয়ে যাও, ওদের দ্বারা আর কিছু ফল পাওয়া যাবে না, ওদের কাজ সব ফুরিয়েছে।" শশীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনজড়িত দয়াভিক্ষার মাঝে গুরুদেব নিষ্করুণ নীরবতার এক পাথরের মূর্তির মতই অনড় হয়ে বসে রইলেন।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস এল যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দৈবশক্তিতে রোগ আরামের বিষয়ে শশীর বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করছেন। কিছু আর বললুম না। চুপচাপ আমি বসেই রইলুম। দারুণ উৎকণ্ঠায় ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গুরুদেব ভূমিষ্ঠ শশীর উপর সস্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "ওঠ, ওঠ শশী, পরের বাড়ীতে এসে তুমি কি সব হাঙ্গামা শুরু করেছ, বল দেখি? তোমার ও সব নীলাটীলা স্যাঁকরাকে ফেরৎ দিয়ে দাও; এখন আর ওতে বাজে খরচ করে কোন লাভ নেই। কিন্তু তুমি একটা তাগা তৈরী করিয়ে সেইটাই এখন ধারণ কর, বুঝলে? তোমার কোন ভয় নেই; দু এক হপ্তার মধ্যেই তুমি আরাম হয়ে যাবে।"

হঠাৎ কালো মেঘ সরে গেলে উজ্জ্বল সূর্যকিরণে যেমন বৃষ্টিতে ভেজা চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সব আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তেমনি শশীর অশ্রুকলঙ্কিত মুখে একটি পরম নির্ভরতার গভীর আনন্দসূচক হাসি দেখা দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "গুরুদেব, ডাক্তারের ওষুধ খাব কি?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দৃষ্টি বিরক্তিসূচক, বললেন, "তোমার যা ইচ্ছে করগে যাও; খাও, ফেলে দাও, তাতে কিছু এসে যায় না। চন্দ্রসূর্য তাদের জায়গা বদলাতে পারে, কিন্তু যক্ষ্মায় আর তোমার কিছুতেই মৃত্যু হবে না, এ নিশ্চয় জেনে রেখো।" তারপর হঠাৎ বললেন, "পালাও পালাও, এক্ষুনি পালাও, নইলে আবার আমার মন বদলে যেতে পারে!"

ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করেই শশী তাড়াতাড়ি পালাল। তারপর ক'হপ্তা ধরে আমি শশীকে দেখতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখলুম যে, তার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হয়ে আসছে।

শশীর আজ আর রাত কাটবে না—একথা ডাক্তারের কাছে শুনে আর তার সেই একেবারে কঙ্কালসার দেহ দেখে আর থাকতে পারলুম না, উঠিপড়ি করে দৌড়লুম শ্রীরামপুরে। কাঁদতে কাঁদতে সব খবর দিলুম গুরুদেবকে। নিতান্ত নিস্পৃহভাবেই তিনি সব শুনে গেলেন। তারপর তিনি বললেন, "তুমি আমায় এখানে বিরক্ত করতে এসেছ কেন বল তো? শশী আরাম হয়ে উঠবে আমি তো কথা দিয়েছি; তবে আবার ফের এখানে আসা কেন, এ্যাঁঃ?"

প্রগাঢ়ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি আমি দরজার দিকে এগোলুম। যাবার সময় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটা কথাও বললেন না; নীরবতার মধ্যে ডুবে গিয়ে অর্ধোন্মীলিতনয়নে অপলক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, দৃষ্টি তাঁর ওপারের দিকে প্রসারিত।

কলকাতায় শশীর বাড়ীতে ফিরলুম তখনই। ঢুকে দেখলুম যে, শশী বিছানার ওপর বসে,—দুধ খাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, "আরে শোন শোন মুকুন্দ! কি আশ্চর্য ব্যাপার বল দেখি। এই ঘন্টাচারেক হল দেখি যে গুরুজী আমাদের এই ঘরে এসে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে দেখেই আমার যা কিছু যন্ত্রণাকষ্ট সব যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। এখন আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, তাঁর অসীম দয়াতেই আমি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি।"

কয়েক হপ্তার ভিতরেই শশী বেশ সুস্থ আর মোটাসোটা হয়ে উঠল। আর তার স্বাস্থ্যও আগেকার চেয়ে খুব ভাল হয়ে গেল।* কিন্তু তার আরোগ্যলাভের পর একটি মাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, যাতে একটু অকৃতজ্ঞতার ছোঁয়াচ ছিল। সেটা হচ্ছে তারপর সে আর বড় একটা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে যেত না। শশী একদিন আমায় বললে যে, তার পূর্বজীবনের ধারার জন্য সে এতদূর দুঃখিত যে, গুরুজীর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তার বড়ই লজ্জা করে।

আমি শুধু ভাবলুম যে, দারুণ রোগভোগের পর শশীর মন বড় শক্ত হয়ে গেছে আর তার চালচলনেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রথম দু'বছর কেটে গেল। মাঝে মাঝে ক্লাসে হাজির হতাম, কিন্তু তার কিছু ঠিক ছিল না। যেটুকু পড়াশোনা করতুম, তা বাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্যই। আমার দুজন গৃহশিক্ষক বাড়ীতে নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতেন, আর আমিও নিয়মিতভাবে অন্তর্ধান করতুম। যাই হোক, পাঠ্যাবস্থায় দেখি যে, এই একটিমাত্র বিষয়ে আমার ঠিক নিয়মনিষ্ঠা ছিল।

* ১৯৩৬ সালেও জনৈক বন্ধুর কাছ হতে সংবাদ পাই যে, শশীর স্বাস্থ্য তখনও বেশ চমৎকার।

দু'বছর কলেজে পড়ে পাশ করবার পর আই. এ., তারপর আরও দু'বছর কলেজে পড়া শেষ করে তবে বি. এ. ডিগ্রি। আই. এ. পরীক্ষার দিন বিপজ্জনকভাবে ঘনিয়ে আসতে লাগল। পুরীতে পালালুম, গুরুদেব সেখানে কয়েকহপ্তা কাটাবার জন্যে গিয়েছিলেন। ক্ষীণ আশায় ভাবলুম যে, হয়ত তিনি বলবেন আমার আর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নাই, তাই পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে পারিনি বলে আমার যে দুরবস্থা দাঁড়িয়েছে তা সবিস্তারে তাঁকে নিবেদন করলুম।

গুরুদেব কিন্তু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি ত অন্তরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক কর্তব্যসকল পালন করেছ, তাতে করে অবিশ্যি তোমার কলেজের পড়াশুনা অবহেলা না করে পারা যায় নি। সামনে হপ্তা থেকে খুব মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করে দাও, তাইতেই তুমি পরীক্ষায় ঠিক পাস করে যাবে, দেখো।"

কলকাতায় ফিরলুম। মনের মধ্যে অবশ্য দু একটা ন্যায্য সন্দেহ যে উঁকি দিয়ে ভয় আনেনি তা নয়, কিন্তু তাদের মনের মধ্যেই চেপে রাখলুম। টেবিলের উপর বইয়ের পাহাড় দেখে মনে হল, যেন এক দুর্গম গহনবনের মধ্যে পথিক আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, কি করে পার হব তা ভেবে পেলুম না। বহুক্ষণ ভাববার পর একটা খাটুনি বাঁচাবার মতন মতলব মাথায় এল। প্রত্যেক বইটা একবার খুলে ফেলে যে জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে, কেবল সেই জায়গাটুকুই তৈরী করে যাব, তাতে যা হয় হবে। এমনি করে হপ্তাখানেক ধরে দিনে আঠারঘণ্টা খেটে ভাবলুম যে, এইবার মুখস্থ বিদ্যায় একেবারে দিগ্‌গজ হয়ে গেছি।"

তারপর কয়েকদিন পরীক্ষা দেবার পর মনে হল যে, আপাতদৃষ্টিতে আমার ঐ রকম উদ্দেশ্যবিহীন প্রণালীই যেন অনেকটা ঠিক। সব পরীক্ষা-গুলোতেই পাস হলুম বটে, কিন্তু একেবারে কান ঘেঁসে। বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের অভিনন্দন আর আনন্দ কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে হাস্যকরভাবে মিশ্রিত ছিল তাদের অকৃত্রিম বিস্ময়!

পুরী থেকে ফিরে এসে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় যা বললেন, তাতে করে আনন্দে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলুম! তিনি বললেন, "তোমার কলকাতার পড়া এখন শেষ হল। এবার তুমি শ্রীরামপুরে এখান থেকেই বাকী দুবছর কলেজে পড়বে।"

কিন্তু তবুও আমার মাথা গুলিয়ে গেল, কারণ শ্রীরামপুর কলেজে এক আই. এ. ছাড়া বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবুও জিজ্ঞাসা

করলুম, "গুরুদেব, কলেজে তো বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্থা নাই, কি করে এখান থেকে পড়ব ?"

গুরুজী একটু দুষ্টুহাসি হেসে বললেন, "আমার এ বুড়োবয়সে লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে তোমার জন্যে বি. এ. পড়ার কলেজ ত আর তৈরী করে দিতে পারি নে। মনে হয়, কাউকে দিয়ে তোমার জন্যে ব্যবস্থাটা করে ফেলতে পারব।"

মাসদুই পরে, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক হাওয়েল্‌স্‌ সাহেব প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. পড়বার ক্লাস খোলবার জন্য তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ইউনিভার্সিটি থেকে শ্রীরামপুর কলেজ বি. এ. ক্লাস খোলবার অনুমতি পেয়েছে। ক্লাসে পড়বার প্রথম ছাত্রদের মধ্যে আমি ছিলুম একজন।

উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতাভরে বললুম, "গুরুজী, আমার ওপর আপনার কি অসীম দয়া! কতদিন থেকে ভাবছি যে, কলকাতা ছেড়ে কবে আপনার কাছে দিনরাত ধরে থাকতে পাব! আর প্রফেসর হাওয়েল্‌স্‌ হয়ত স্বপ্নেও জানেন না যে, আপনার নীরবদানের কাছে কতটা তিনি ঋণী!"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, "যাক্‌ এখন তোমায় ট্রেনে যাতায়াতে আর এতটা করে সময় নষ্ট করতে হবে না, তাতে তুমি মনোযোগ দিয়ে ভাল করে লেখাপড়া করতে পারবে, আর শেষ মুহূর্তে বইয়ের গোটাকতক পাতা উল্টে মুখস্থ করে পাস করার চেয়ে ভাল ছাত্রই হতে পারবে, কি বল ?"

কিন্তু যাই হোক, স্বরে তাঁর কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস ছিল!*

---

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বহু সাধু মনীষীদের মতনই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির জড়বাদী ভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। অতি অল্প শিক্ষালয়ই বোঝাতে পারে যে, আধ্যাত্মিক বিধির অর্থ হচ্ছে সুখের জন্য অথবা "ঈশ্বরকে ভয়' 'করে অর্থাৎ তার সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে চলে নিজের জীবন পরিচালনাতেই জ্ঞান লাভ করা যায়, এই শিক্ষা দেয়।

তরুণবয়স্কেরা যারা আজকাল উচ্চবিদ্যালয় অথবা কলেজে শোনে যে মানুষ হচ্ছে "একটি উচ্চতর প্রাণী মাত্র", তারা প্রায়ই নাস্তিক হয়। তারা আত্মানুসন্ধানের কোন চেষ্টাই করে না অথবা তাদের নিজেদের মূল সত্তা যে "ঈশ্বরের প্রতিরূপ," সে কথাও ভাবে না। ইমার্সন বলেছেন, "আমাদের অন্তরে কেবল যেটুকু আছে, সেইটুকু মাত্রই বাইরে দেখতে পারি। যদি আমরা কোন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না পাই, তার কারণ হচ্ছে অন্তরে আমরা তেমন কোন ভাব পোষণ করি না।" পশু প্রকৃতিকেই যে তার একমাত্র সত্তা বলে ভাবে, দৈবাকাঙ্ক্ষা থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা পরমাত্মাকে মানব অস্তিত্বে প্রধান বা চরম তথ্য বলে শিক্ষা দেয় না, সে ব্যবস্থা বিদ্যার পরিবর্তে "অবিদ্যা"ই দান করে, অজ্ঞান এনে দেয়। "তুমি বলছ যে তুমি ধনী, এবং নানাসম্পদ সম্পন্ন আর কোন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু তুমি জান না যে তুমি হতভাগ্য, তুমি দুঃখী, দরিদ্র, জ্ঞানহীন অন্ধ আর আশ্রয়হীন।" —রেভেলেশন্‌ ৩:১৭ (বাইবেল)।

প্রাচীন ভারতে তরুণদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল আদর্শ। নয় বৎসর বয়সে ছাত্র "গুরুকুল আশ্রমে" "সন্তান" রূপে গৃহীত হত। "আধুনিক ছাত্র বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাকালের অষ্টমাংশ ব্যয় করে (বৎসরে) ; ভারতীয় ছাত্র তার সব সময়টাই করত।" "ইণ্ডিয়ান কালচার থ্রু দি এজেস্‌" (প্রথম খণ্ড, লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং) নামক পুস্তকে অধ্যাপক এস. ভি. ভেঙ্কটেশ্বর লিখছেন, "তখন বেশ একটা একনিষ্ঠতা, ঐক্য ও দায়িত্ববোধের স্বাস্থ্যকর মনোভাব ছিল এবং আত্মনির্ভরতা আর ব্যক্তিত্বের অনুশীলনেরও প্রচুর সুযোগ ছিল। সেখানে ছিল সৌচিত্ত্য আর স্বেচ্ছাগৃহীত নিয়মনিষ্ঠার একটা উচ্চমান আর ছিল কর্তব্য, নিষ্কাম কর্ম আর ত্যাগের একটা কঠোর নিষ্ঠা ; তার সঙ্গে ছিল আত্মসম্মানবোধ এবং অপরের প্রতিও শ্রদ্ধা, বিদগ্ধজনের মর্যাদার উচ্চমান আর ছিল মানবজীবনের বিরাট উদ্দেশ্যের মহত্ত্ববোধ।"

১৮শ পরিচ্ছেদ

একটি মুসলমান যাদুকর

শ্রীরামপুর কলেজে প্রবেশ করেই আমি কাছাকাছি একটা বোর্ডিং হাউসে ঘর নিয়েছিলুম। গঙ্গার ধারে পুরান ধরণের পাকাবাড়ী, নাম ছিল "পন্থী"*। আমার নূতন আবাসে যে দিন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বেড়াতে এলেন, সেদিন তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেই একটি অদ্ভুত কথা বললেন, "দেখ, অনেক বছর আগে ঠিক তোমার এই ঘরের ভিতরে আমার সামনে একটি মুসলমান যাদুকর চারটি ভোজবাজির মত এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছিল।" শুনে উদ্দীপ্ত কৌতূহলে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললুম, "কি আশ্চর্য! এ ঘরেরও কোন অদ্ভুত ইতিহাস আছে না কি?"

গুরুজী পুরাতন স্মৃতির রোমন্থনে হেসে বললেন, "তা আছে বই কি! সে অনেক কথা। মুসলমানটি ছিল একজন ফকির,**—নাম আফজল খাঁ। একটি হিন্দুযোগীর হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়ে সে তাঁর কাছ থেকে ঐরকম অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করে।

"আফজলের বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। ছেলেবেলায় সে একদিন দেখে যে, ধুলোয় ধূসরিত এক সন্ন্যাসী তাদের গাঁয়ে এসে উপস্থিত। সন্ন্যাসীটি তাঁকে বললেন, 'বাবা, বড়ই তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল এনে দিতে পার?'

"আফজল বললে, 'সাধুজী, আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু হয়ে আমার হাত থেকে জল খাবেন কি করে?'

"সন্ন্যাসী বললেন, 'বাছা, তোমার সত্যি কথায় ভারি খুশী হলুম। আমি ওসব অশাস্ত্রীয় জাতিভেদের ছোঁয়াছুঁয়ির নিয়ম মানি না। যাও, চট্ করে আমায় জল এনে দাও।'

"আফজলের ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে যোগীটি তার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল খুবই ভাল। আমি তোমায় গুটিকতক যোগের কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি। এতে করে অদৃশ্য জগতের

* ছাত্রাবাস; 'পন্থ' শব্দ থেকে উৎপত্তি; অর্থ—পথিক, জ্ঞানান্বেষী।

** মুসলমান, যোগী; আরবী শব্দ ফকির—ভিক্ষুক; ভিক্ষুক জীবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দরবেশদের এই আখ্যা দেওয়া হয়।

অংশবিশেষকে তোমার নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা জন্মাবে, তা কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবে; কিন্তু খবরদার! তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তা কখনো ব্যবহার করো না যেন। কিন্তু হায়; দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ব-জন্মের কতকগুলো সর্বনাশা কুকর্মের বীজও তুমি সঙ্গে সঙ্গে বহন করে এনেছ। দেখো যেন, আবার নতুন কুকর্ম করে আর সেগুলো ফুটিয়ে তুলো না। তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল এত জটিল যে, এ জন্মে তোমায় যোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মঙ্গলসাধন করেই তা কাটাতে হবে।'

"তারপর সেই হতভম্ব ছেলেটিকে কতকগুলি জটিল প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়ে যোগীটি অন্তর্ধান করলেন।

"আফজল বিশবৎসর ধরে সেই যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করেছিল। তার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা বহু দেশদেশান্তরের লোকদের আকৃষ্ট করতে শুরু করল। মনে হয় এক অদৃশ্য আত্মা যাকে সে 'হজরত' বলে ডাকত, সে সর্বদাই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। ফকিরের সামান্য ইচ্ছাও সে তৎক্ষণাৎ পূরণ করে দিত।

"তার গুরুর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে আফজল ক্রমশঃ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করল। যে কোন জিনিস সে কেবল একবার মাত্র ছুঁয়েই আবার রেখে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেত। এই রকম হাতসাফাই-এর ব্যাপার দেখে লোকে কেউ বড় একটা তাকে আর আমল দিতে চাইত না।

"মাঝে মাঝে সে কলকাতার বড় বড় জুয়েলারির দোকানে গিয়ে ঢুকত। দোকানদার ভাবত, বুঝি বা বড়দরের কোন খদ্দের এল। এটা ওটা দেখাত। আফজল তাদের নেড়ে চেড়ে রেখে দিয়ে দোকান থেকে বেরুবার পরই সে সব একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত!

"শত শত ছাত্র তাকে প্রায়ই ঘিরে থাকত, তার কেরামতি শিখে নেবার আশায় আকৃষ্ট হয়ে। সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য আফজল মাঝে মাঝে তাদের ডাকত। স্টেশনে গিয়ে একগোছা টিকিট নিয়ে দেখেশুনে তা আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলত, 'নাঃ, আজ আর আমাদের যাওয়া হল না, এখন আর টিকিট কিনব না।' বলে টিকিটগুলো ফেরত দিয়ে সটান রেলে গিয়ে চেপে বসত। তখন দেখা যেত যে, ঠিক সেই টিকিটগুলোই আবার তার হাতে এসে পৌঁছে গেছে।*

---

* আমার পিতা পরে আমায় বলেছিলেন যে, তাঁদের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীও আফজলের হাতে এমনিভাবে ঠকেছিল।

"এইরকম লোকঠকান জবরদস্তি আর জুলুমবাজি দেখে লোকে রেগে আগুন হয়ে উঠল। বাঙ্গালী জুয়েলাররা আর স্টেশনের টিকিটবেচা কেরাণীর দল তো ভয়ে কাঁটা। কখন ফাঁসিয়ে দেয় কে জানে। পুলিশও তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে। অপরাধের বিন্দুমাত্র চিহ্নও ধরতে পারা যেত না। আফজলের কেবল একবারমাত্র বললেই হ'ল, 'হজরত এসব হটাও!' ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ্!"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী উঠে পড়ে গঙ্গার ধারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম, উদ্দেশ্য—আফজলের এইসব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার আরও কিছু ব্যাপার সব শুনবো বলে।

গুরুজী শুরু করলেন, "এই 'পন্থী' বাড়ীটি পূর্বে আমার এক বন্ধুর ছিল। আফজলের সঙ্গে আলাপ হতে সে একদিন তাকে এখানে আনালে। বন্ধুটি আরও জনকুড়িক পাড়াপ্রতিবাসীদেরও ডাকলে; তাদের মধ্যে আমিও ছিলুম। আমার তখন যুবা বয়স আর এই দুর্দান্ত ফকিরের ভোজবাজির খেলা দেখবার জন্যে মনে তখন প্রচণ্ড আগ্রহ।" গুরুদেব হেসে বললেন, "এধারে কিন্তু ঠিক হুঁশিয়ার ছিলুম। দামী কোন কিছুই পরে যাই নি। আফজল আমার আপাদমস্তক বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ করে নিয়ে তারপর বললে, 'দেখছি তোমার হাত দুটি বেশ মজবুত। আচ্ছা নীচে বাগানে চলে যাও; গিয়ে একটা বেশ চকচকে পাথর নিয়ে তার ওপর তোমার নাম লিখে গঙ্গার জলে যতদূরে পার জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এস।'

"হুকুম তো তামিল করে এলুম। যখন গঙ্গার জলের ভিতর পাথরটি টুপ করে পড়ে ডুবে গেল, ফকির সাহেব তখন বললে, 'একটা পাত্রে গঙ্গার জল ভরে এই বাড়ীর সামনে এনে রাখ। পাত্রটি জল ভরে এনে রাখতেই ফকিরসাহেব চিৎকার করে বলে উঠল, 'হজরত, এই পাত্রের ভিতর পাথরটি এনে রাখ!'

"তখনই পাথরটি তার ভিতর এসে গেল। হাত ঢুকিয়ে পাথরটি বার করে নিয়ে দেখলুম যে, আমার সই যেমনটি করেছিলুম ঠিক তেমনি পরিষ্কারই রয়েছে।

"—বাবু* আমার একজন বন্ধু, সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। একটি ভারী সোনার ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পরেছিলেন। ফকিরসাহেব তাদের হাত দিয়ে

---

*শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সেই বন্ধুটির নাম আমার ঠিক মনে নেই বলে শুধু "—বাবু" সম্বোধন করলুম।

নেড়েচেড়ে দেখে খুব তারিফ করলে। সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটি হাওয়া হয়ে গেল।

"—বাবু ত প্রায় কেঁদেই ফেললেন। কাকুতিমিনতি করে বলতে লাগলেন, 'আফজল, ও আমার দামী পৈতৃকসম্পত্তি, দয়া করে আমায় ফিরিয়ে দাও, ও গেলে আমার সর্বনাশ হবে।' ফকিরসাহেব নিতান্ত অনাসক্তভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর বললে, 'দেখ, তোমার লোহার সিন্ধুকে পাঁচশ টাকা আছে। সেগুলো নিয়ে এসো দেখি, তবে বলে দেব কোথায় তোমার ঘড়িও ঘড়ির চেন আছে।'

"উদ্‌ভ্রান্ত"—বাবু ত তখনি দৌড়ল বাড়ীর দিকে। শীগগিরই ফিরে এল ; এসে নগদ করকরে পাঁচশটি টাকা গুণে আফজলের হাতে তুলে দিলে।

"ফকিরসাহেব তখন যেন নিতান্ত অনুকম্পাবশতঃই' বাবুকে বললে, 'তোমার বাড়ীর কাছেই যে ছোট্ট পোলটা আছে সেখানে যাও আর দেখ, যেতে যেতে হজরতকে ডেকে তোমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন সব ফেরত দিয়ে দিতে বোল ; তা হলেই তুমি তোমার সব জিনিস ফেরত পাবে।'

"—বাবু তো পড়ি কি মরি করে দৌড়লেন। ফিরলেন কিছুক্ষণ বাদে। মুখে নিশ্চিন্ত হাসি, কিন্তু সঙ্গে ঘড়িটড়ি কিছুই নেই!

"—বাবু বললেন, 'ফকিরসাহেবের কথামত যেমনি হজরতকে ডেকেছি অমনি যেন শূন্য থেকে ঘড়িটড়ি সব আমার ডান হাতের উপর ঝুপ করে এসে পড়ল। বাব্বাঃ, আর তা এখানে নিয়ে আসি! সোজা বাড়ীতে গিয়ে একেবারে সিন্ধুকে তাদের বন্ধ করে রেখে তবে তোমাদের এখানে আসছি।'

"ঘড়ির মুক্তিপণ আদায়ের এই বিয়োগমিলনান্ত নাটকের সাক্ষী,—বাবুর বন্ধুরা সব অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আফজলের দিকে তাকাল। ফকিরসাহেব তখন যেন সান্ত্বনা দেবার মতলবেই আবার আরম্ভ করল, 'আচ্ছা, তোমরা কি পানীয় চাও বল। হজরত এখনি তা এনে দেবে।'

"জনকতক দুধ চাইলে, কেউ কেউ আবার ফলের রস খেতে চাইলে। কিন্তু আমাদের খুব ভীতগ্রস্ত—বাবু খেতে চাইলেন হুইস্কি—যদিও তাতে আমি খুব বেশী আশ্চর্য হই নি। ফকিরসাহেব হুকুম করলে। অনুগত হজরত মুখবন্ধ পানীয়ের পাত্রগুলো সব যেন শূন্য থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল আর তা সব ঠকাস ঠকাস করে মেঝের উপর এসে পড়তে লাগল। একে একে সবাই তাদের ফরমাসী জিনিসগুলো পেলে।

"তার পর চার নম্বরের ব্যাপারটি হচ্ছে আরও অদ্ভুত!

"আফজল বললে যে, সে এখানে বসে বসেই সবাইকে এক বিরাট ভোজ

খাওয়াতে পারে। কেউ পরীক্ষা করে দেখতে চায় কি? প্রস্তাবটি আমাদের গৃহস্বামীর কাছে অতিশয় মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ বলেই বোধ হল।

"—বাবুর ঘা তখনও শুকোয় নি, মনে তখনও দারুণ জ্বালা ছিল। মুখটা হাঁড়ি করে বললেন, 'আমার পাঁচশ টাকা তো গেছে, তা যাক, তার বদলে আমি রাজারাজড়াদের মতন একটি বিরাট ভোজ চাই। যা কিছু পরিবেশন করা হবে, তা সব সোনার পাত্রে হওয়া চাই।' সবাই তাতে যখন সায় দিলে, ফকিরসাহেব তখন অফুরন্ত হজরতকে হুকুম করলে। সঙ্গে সঙ্গে বাসনপত্রের একটা ঝনঝনানির শব্দ উঠল আর সোনার থালার উপর গরম লুচি, আর নানারকমের অতি উপাদেয় আর সুস্বাদু তরকারী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্য, বহুপ্রকারের অসময়ের ফল সব যেন শূন্য থেকেই আবির্ভূত হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল। খাবারদাবার সব অতি চমৎকারই হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা ঘর ছেড়ে বেরোতে গেলুম। একটা দারুণ শব্দ—বাসনপত্রের ঝনঝনানির মত, মনে হল কেউ যেন থালাবাটি সব গুছোচ্ছে, শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ঝকঝকে সোনার বাসনকোসনের, এমন কি খাওয়াদাওয়ার পর ভুঁয়ে পড়েথাকা এঁটোকাঁটার কোন চিহ্নমাত্রও নাই!" জিজ্ঞাসা করলুম, "গুরুজী, আফজল যদি এমনভাবে সোনার বাসনকোসন আমদানি করতে পারে, তবে আবার তার পরের ধনে লোভ করা কেন?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বুঝিয়ে দিলেন, "দেখ, তোমার ঐ আফজল ফকিরের কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব বেশী দূর হয় নি। তার যোগের একটা প্রক্রিয়াবিশেষের উপর দখল থাকাতে সে তার যে কোন ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করতে পারত। হজরত নামে জনৈক অশরীরীর সাহায্যে, ফকিরসাহেব তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে যে কোন ঈপ্সিত বস্তুর অণুপরমাণু নিয়ে ইথার বা ব্যোমশক্তি দিয়ে সেই জিনিসটি তৈরী করে নিতে পারত। কিন্তু এ রকম ভৌতিকপ্রক্রিয়ায় তৈরী জিনিস বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।* কাজেই আফজলকে এই পৃথিবীরই ধনরত্ন আহরণ করবার চেষ্টায় থাকতে হত, যা চট করে উবে যায় না, যদিও তার জন্যে তার নানা কষ্ট আর হাঙ্গামা পোহাতে হত।" আমি হেসে বললুম, "কিন্তু তাও ত কখন কখন একেবারে বিনা কারণেই উড়ে যায়, ধরে রাখতে পারা যায় না।"

* যেমন শূন্য থেকে আসা আমার রুপার মাদুলিটি শেষ পর্যন্ত এ পৃথিবী থেকে অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিল। (৪৩শ পরিচ্ছেদে পরলোকের কথা দ্রষ্টব্য)।

গুরুজী বলতে লাগলেন, "আফজলের কোনরকম ঈশ্বরানুভূতি বা ভগবদ্‌জ্ঞান ছিল না। স্থায়ী আর মঙ্গলজনক কোন অলৌকিক ক্রিয়া কেবল খাঁটি সাধুসন্তরাই দেখাতে পারেন, কারণ তাঁরা সর্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। আফজল ছিল নেহাৎই সাধারণগোছের একজন লোক ; কেবল তার এইটুকু অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে এমন এক সূক্ষ্মস্তরে প্রবেশ লাভ করতে পারত, যেখানে সাধারণতঃ কোন মরজগতের লোক মৃত্যু না হলে প্রবেশ করতে পারে না।"

"এখন সব বুঝলুম, গুরুদেব ! তা হলে পরজগতেও বেশ লোভের আর আকর্ষণের জিনিস আছে দেখছি।"

গুরুদেব বললেন, "তা আছে বই কি। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমি আফজলকে আর কখনও দেখিনি। বছরকতক পরে—বাবু আমার বাড়ীতে এসে একটা খবরের কাগজ খুলে দেখালেন যে, সেই মুসলমান যাদুকরটির প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি সেখানে বেরিয়েছে। তাই থেকেই আমি তোমায় এইমাত্র যা বললুম, সেই আফজলের ছেলেবেলায় এক হিন্দুগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা জানতে পারি।"

খবরের কাগজে আফজলের যে স্বীকারোক্তি বেরিয়েছিল, তার শেষ অংশের সারটুকু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর যা স্মরণে ছিল, তা মোটামুটি হচ্ছে এই,— "আমি আফজল খাঁ, আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আর যারা অলৌকিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চায় তাদের সাবধান করে দেবার জন্যে এই কথাগুলো লিখছি। ভগবৎকৃপায় আর গুরুদত্ত ক্ষমতাবলে আমি যে অদ্ভুতশক্তি হস্তগত করেছিলুম, বছরের পর বছর ধরে তার অপব্যবহার করে এসেছি। আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়ে ভেবেছিলুম যে আমি সুনীতি-দুর্নীতির সাধারণ নিয়ম কানুনের বহু ঊর্ধ্বে। আমার শেষবিচারের দিন অবশেষে ঘনিয়ে এল।

"সম্প্রতি কলকাতার বাইরে একটি বৃদ্ধলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। লোকটি অতিকষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল ; হাতে ছিল একটি চকচকে জিনিস, দেখতে সোনারই মত। মনে দারুণ লোভ হল। লোকটিকে ডেকে বললুম, 'দেখ, আমি একজন বড় দরের ফকির, নাম আফজল খাঁ। তোমার হাতে ওটা কি বল দেখি।'

"এটি একটি সোনার তাল ; সংসারে এইটিই আমার সর্বস্ব। তা এতে আর আপনার মতন ফকির মানুষের কি দরকার বলুন ? যাই হোক মশায়, আপনাকে মিনতি করি, আমার খুঁড়িয়ে চলাটা এখন সারিয়ে দিন !"

"আমি সোনার তালটি ছুঁয়ে কোন কথাবার্তা না বলেই চলতে শুরু করে

দিলুম। বুড়োমানুষটি আমার পিছন পিছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার, 'সোনা, কৈ আমার সোনা কোথায় গেল, এ্যাঁ ?'

"তার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে এগোতেই লোকটি বজ্রনির্ঘোষস্বরে বলে উঠল, 'কি, আমায় চিনতে পাচ্ছ না, নাকি ?' ঐরকম ডিগ্‌ডিগে শরীর থেকে অমন প্রচণ্ড গলার আওয়াজ বেরোতে পারে, তা ধারণাই করতে পারি নি।

"ফিরে তাকাতেই আমার বাক্‌শক্তি একেবারে লোপ পেল। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম। দেখি যে সেই নেহাৎ সাধারণগোছের বৃদ্ধ খঞ্জব্যক্তিটি আর কেউ নন—সেই সাধুশ্রেষ্ঠ স্বয়ং, যিনি বহুদিন পূর্বে আমায় যোগসাধনে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও দেখতে দেখতে বেশ জোয়ান আর শক্ত হয়ে গেল।

"গুরুদেবের চোখে তখন আগুন জ্বলছিল। বললেন, 'বটে, তোমার এই কীর্তি ? আজ আমি নিজের চোখে দেখলুম যে তুমি দীনদুঃখীদের উপকারের জন্যে না করে, একটা সাধারণ চোরের মত তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করছ ! যাক, আজ থেকে আর তোমার কোন ক্ষমতাই থাকবে না, সব আমি কেড়ে নিলুম। হজরত এখন তোমার কাছ থেকে ছাড়ান পেলে, আর ও তোমার কথায় কোন ফাইফরমাশ খাটবে না। বাংলা দেশে কেউ আর তোমায় এখন ভয় করবে না।'

"উদ্বেগাকুল কণ্ঠে হজরতকে ডাকলুম ; এই প্রথম আমি টের পেলুম যে অন্তরে আর তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ যেন চোখের উপর থেকে একটা কাল পর্দা সরে গেল ; আমার ঘৃণ্য অপবিত্রজীবনের ছবি আজ আমি স্পষ্টরূপে দেখতে পেলুম।

"গুরুজী, আপনি আমার জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রান্তি দূর করে দিতে এসেছেন বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ', বলে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, 'গুরুদেব, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, সংসারের সাধআহ্লাদ, বাসনাকামনা আমার যা কিছু সব আজ থেকে ত্যাগ করলুম। এবার আমি পাহাড়ে চলে গিয়ে নির্জনে ভগবচ্চিন্তায় কাল কাটাব, মনে হয় তাতে আমার পাপজীবনের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

"আমার গুরু নীরব অনুকম্পায় আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অবশেষে বললেন, 'তোমার আন্তরিকতা আছে বুঝতে পাচ্ছি। যাই হোক্, তোমার ছেলেবেলায় গুরুআজ্ঞাপালন আর বর্তমান অনুতাপ দেখে তোমায় আমি একটিমাত্র বর দিয়ে যাব। যদিও তোমার আর সব ক্ষমতা এখন চলে গেছে,

তবুও কিন্তু যখনই তোমার কেবলমাত্র অন্নবস্ত্রের অভাব হবে, হজরতকে ডাকলে তা এনে দেবার জন্যে তখনই তার সাড়া পাবে। যাও, এখন কোন নির্জন পাহাড়ে গিয়ে ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করবার জন্যে মনপ্রাণ উৎসর্গ কর গিয়ে।'

"আমার গুরুদেব কথাবলার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সম্বল রইল কেবল শুধু চোখের জল আর ভাবনা। আজ আমি সেই পরমদয়াল পরমপিতার ক্ষমালাভের আশায় এখন যাত্রা শুরু করলুম। বিদায়! এ সংসার, চিরতরে বিদায়!"

১৯শ পরিচ্ছেদ

কলিকাতাস্থ গুরুদেবের শ্রীরামপুরে সশরীরে আবির্ভাব

"পন্থী" ছাত্রাবাসে আমার ঘরে আর একজন সঙ্গী থাকতেন, নাম তাঁর দ্বিজেনবাবু। দ্বিজেনবাবুকে আমার গুরুদর্শনের জন্যে আহ্বান করাতে তিনি একদিন বলে ফেললেন, "দেখুন, ভগবানের অস্তিত্বে আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়। তবুও মাঝে মাঝে চিত্তবিক্ষোভকারী একটা অনুমান গোছের ভাব মনকে বড়ই উতলা করে তোলে; আত্মিক ব্যাপারের অনেক কিছু সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না কি? মানুষ যদি সে সব খুঁজে বার করতে নাই পারে, তাহলে সেকি তার আসল ভাগ্যকেই হারিয়ে ফেলে না।"

আমি বললুম, "শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আপনাকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করলে, তাতেই আপনার অন্তরে দৃঢ় ধারণা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এনে দিয়ে মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেবে, দেখবেন।"

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দ্বিজেনবাবু আমার সঙ্গে আশ্রমে গেলেন। গুরুদেবের সামনে এসে বন্ধুবর মনে এমন এক অপূর্ব গভীর আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করলেন যে, শীগগিরই তিনি নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিলেন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের গভীরতম প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়; জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কথায় দ্বিজেনবাবু তাঁর এই নশ্বর জীবনে ক্ষুদ্র 'আমি'র জায়গায় অন্তরের মধ্যে তার পূর্ণ আত্মস্বরূপকে খুঁজে বার করবার চেষ্টায় উৎসাহ পেলেন।

দ্বিজেনবাবু ও আমি একসঙ্গে শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. ক্লাসে পড়তুম। ক্লাস শেষ হলেই বেড়াতে বেড়াতে দুজনে আশ্রমে গিয়ে হাজির হতুম। প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, দোতলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমাদের আসতে দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

একদিন বৈকালে দেখি যে কানাই নামে একটি বালক ব্রহ্মচারী দ্বিজেনবাবু আর আমাকে দরজায় ঢুকতে দেখেই খবর দিলে, "গুরুদেব এখানে নাই; কি একটা জরুরী খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেছেন!"

তার পরদিনই গুরুদেবের কাছ থেকে একটি পোস্টকার্ড পেলুম। তিনি

লিখেছেন, "বুধবার সকালে কলকাতা থেকে যাব। তুমি আর দ্বিজেন শ্রীরামপুর ষ্টেশনে সকাল ন'টার ট্রেনটা দেখো।"

বুধবার সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় অনবরত মনে হতে লাগল, যেন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ হতে টেলিপ্যাথিযোগে একটা সংবাদ আসছে—তা হচ্ছে এই, "আমি আটকা পড়ে গেছি। ন'টার গাড়ী আর দেখো না।"

আটকা খবরটা দ্বিজেনবাবুকে যখন দিলুম, ষ্টেশনে যাবার জন্য তখন তার জামাকাপড় পরা একেবারে সারা।

বন্ধুবর বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "রাখুন আপনার ও সব মনের ভিতরকার অনুভূতি! আমি গুরুদেবের লেখা কথাই বেশী বিশ্বাস করি।"

কি আর করি, একটু নড়ে চড়ে চুপচাপ বসেই রইলুম! রাগে গজগজ করতে করতে দ্বিজেনবাবু দড়াম করে দরজা বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ঘরটা কিছু অন্ধকার বলে আমি রাস্তার ধারের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ক্ষীণ সূর্যালোক হঠাৎ যেন এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃতে ঝলসে উঠল, তাতে লোহার গরাদে দেওয়া জানলা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই আলোকের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পেলুম, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে সেখানে আবির্ভূত।

এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের হঠাৎ ধাক্কাতে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলুম। চিরাভ্যস্তভাবে তাঁর পাদুকাযুগল স্পর্শ করে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করলুম। দড়ির সোলদেওয়া গেরুয়ারঙের ক্যাম্বিসের তাঁর সেই পাদুকাযুগল আমার চিরপরিচিত। তাঁর গেরুয়াবসন হাওয়ায় উড়ে আমার গাত্রস্পর্শ করছিল। পরিধেয় বসন শুধু নয়, তাঁর সেই ধুলোবালিমাখা জুতোজোড়া আর তার ভিতরে চেপেবসা তাঁর পায়ের আঙুলগুলোও বেশ স্পষ্টই অনুভব করলুম। বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কেবল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়েই রইলুম।

"তুমি যে আমার মনের কথা জানতে পেরেছ, তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।" গুরুদেবের স্বর শান্ত আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। "আমার কলকাতার কাজ এবার শেষ হয়েছে। দশটার গাড়ীতে শ্রীরামপুর আসছি।"

হতবাক হয়ে তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "এ আমার 'ভূত' নয়, আমার রক্তমাংসেরই শরীর। ঈশ্বরের আজ্ঞায় তোমায় এ অভিজ্ঞতা দিলুম, পৃথিবীতে যা লাভ করা নিতান্ত দুর্লভ। ষ্টেশনে এসো, তুমি আর দ্বিজেন আমায় এই বেশেই তোমাদের

দিকে আসতে দেখতে পাবে। আর সেই সঙ্গে আমার আগে আগে একটি ছোট ছেলে একটা রুপোর জগ নিয়ে আসছে দেখতে পাবে।"

মাথার উপর দুটি হাত রেখে গুরুদেব অস্ফুটস্বরে আমায় আশীর্বাদ করলেন। তারপর "তবে আসি" এই দুটি কথা বলা যেই শেষ করলেন, অমনি একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ানি শব্দ শোনা গেল।*

সেই চোখঝলসান আলোর মধ্যেই তাঁর শরীর যেন ধীরে ধীরে গলে যেতে লাগল। প্রথমতঃ তাঁর পায়ের দুটি পাতা আর পা দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল তারপর তাঁর দেহের মধ্যভাগ আর মস্তক, যেন একটা ছবি গুটিয়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলুম যে, তাঁর আঙুলগুলি আলতোভাবে আমার চুল ছুঁয়ে রয়েছে। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। গরাদ দেওয়া জানলার ভিতর দিয়ে আসা ম্লান সূর্যের আলো ছাড়া আমার সামনে আর কিছুই রইল না। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম; মনে মনে ভাবতে লাগলুম, ছায়াবাজি দেখলুম না কি? ভগ্নমনোরথ দ্বিজেনবাবু তখুনি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

বন্ধুবর খানিকটা অনুতপ্ত স্বরেই বললেন, "গুরুদেব ন'টার গাড়ীতে এলেন না, সাড়ে ন'টারটাতেও নয়।"

"তাই না কি? আমি কিন্তু ঠিক জানি যে তিনি দশটার গাড়ীতেই আসছেন।" "আসুন, আসুন," বলেই তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত না করে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে ষ্টেশনের দিকে ছুটলুম। মিনিটদশেকের ভিতরে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম; ট্রেন এর মধ্যে পৌঁছে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলুম, "দেখুন, দেখুন, সারা ট্রেনটা গুরুদেবের জ্যোতিঃর ছটায় পূর্ণ হয়ে গেছে। ঐ তিনি ওখানে।"

দ্বিজেনবাবু ঠাট্টা করে হেসে বললেন, "স্বপ্ন দেখছেন না কি?"

বললুম, "আসুন, এখানে দাঁড়ান যাক।" তারপর কি রকম করে গুরুজী আমাদের কাছে আসবেন তা বন্ধুবরের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলুম। বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে দেখা গেল—সেই একই জামাকাপড় পরা যা এইমাত্র একটু আগে দেখেছিলুম। ধীরে ধীরে তিনি আসছিলেন, সামনে একটি ছোট ছেলেও আসছিল রুপোর জগ হাতে করে।

আমার অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা স্মরণ করে মনের মধ্যে একটা ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল। মনে হল; এই বিংশ শতাব্দীর জড়যুগে

---

* শরীরকোষের অণুপরমাণু বিশ্লিষ্ট হওয়ার বিশিষ্ট শব্দ।

আমাদের এই বর্তমান জগৎ যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে ; আমি কি সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গেছি, যখন যীশুখ্রিষ্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পিটারের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ?

বর্তমান যুগের মহাযোগী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন, যেখানে দ্বিজেনবাবু আর আমি নির্বাক হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলুম। বন্ধুর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, "তোমায়ও তো আমি খবর পাঠিয়েছিলুম, তুমি ধরতে পারলে না ত আমি কি করব, বল ?" দ্বিজেনবাবু নীরবই ছিলেন, কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। গুরুদেবকে আশ্রমে পৌঁছিয়ে দিয়ে দ্বিজেনবাবু আর আমি শ্রীরামপুর কলেজের দিকে এগোলুম। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে দ্বিজেনবাবু বললেন, "ওঃ, তাই বলুন! গুরুদেব আমায় খবর পাঠিয়েছিলেন আর আপনি তা চেপে রেখেছেন! এর কি কৈফিয়ৎ আপনার আছে, দেবেন ?" রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল। আমি উত্তর দিলুম, "আপনার মনের আয়না যদি এতই চঞ্চল হয়ে পড়ে যে তাতে গুরুদেবের উপদেশের কোন ছাপ পড়তে পায় না, তা হলে আর আমি কি করব বলুন ?"

দ্বিজেনবাবুর আনন হতে ক্রোধের ছায়া অন্তর্হিত হল। তিনি অনুতপ্ত-স্বরে বললেন, "এখন আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি। আচ্ছা, রুপোর-জগ নিয়ে ঐ ছেলেটার আসার কথা কি করে জানতে পারলেন, বলুন ত ?"

সেইদিন সকালে আমাদের ছাত্রাবাসে গুরুজীর আবির্ভাবের অলৌকিক কাহিনী যখন শেষ করলুম তখন আমরা কলেজে পৌঁছে গেছি। সব শুনে দ্বিজেনবাবু শুধু বললেন, "গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা যা এইমাত্র আপনার মুখ থেকে শুনলুম, তাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ সবের কাছে একটা শিশুপাঠশালা ছাড়া আর কিছু নয়!"*

---

* "মধ্যযুগের দার্শনিকদের রাজা" সেণ্ট টমাস্ একুইনাস্‌কে তাঁর কর্মসচিব "সামা থিয়োলজিকা" শেষ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করাতে, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, "এমন সব জিনিস আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে যে আমি এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি, তাদের মূল্য আমার চোখে একগাছি তৃণের চেয়ে বেশী নয়।" ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে একদিন নেপল্‌স্-এর একটি গির্জায় ভজন গানের সময় সেণ্ট টমাসের এক গভীর অতীন্দ্রিয় পরিজ্ঞান লাভ হয়। আর এই দিব্যজ্ঞানলাভের মহিমা তাঁকে এতদূর অভিভূত করেছিল যে তারপর থেকে তিনি আর বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানানুশীলনে কোন আগ্রহ বোধ করেন নি।

(প্লেটোর ফিড্রাসের) সক্রেটিসের বাক্যগুলি তুলনীয় :—"আমার বিষয়ে যা কিছু আমি জানি তা হচ্ছে এই যে, আমি কিছুই জানি না।"

২০শ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর ভ্রমণে বাধা

পিতার কাছে গিয়ে একদিন বললুম, "বাবা, গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদেব আর জনচারেক বন্ধুকে নিয়ে হিমালয়ের দিকে একটু বেড়িয়ে আসব বলে মনে করছি। কাশ্মীরের জন্যে খানছয়েক পাস আর বেড়াবার খরচের জন্যে কিছু টাকা দেবেন কি?"

যা মনে করেছিলুম তাই, পিতাও হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "এইবার নিয়ে তিনবার হল তোমার ও সব আজগুবী মতলব শোনাচ্ছ। গেল বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময়, আর তার আগের বছরেও কি ও রকম কথা শোনাওনি? শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বেঁকে বসবেন আর তাঁর যাওয়াও হবে না!"

"সত্যি বাবা, গুরুদেব কেন যে কাশ্মীরে যাবার পাকা কথা দেন না, তা জানি না।* কিন্তু যদি আমি এবার বলি যে কাশ্মীরে যাবার জন্যে আপনার কাছ থেকে এর মধ্যেই পাস নিয়ে রেখেছি, তাহলে মনে হয় যে, কোন না কোন রকমে বেড়াতে যাবার জন্যে এবার তাঁকে রাজী করাতে পারব।"

অবশ্য সে সময় পিতার কোন কিছুই বিশ্বাস হল না। তার পরদিন সকালে পিতা আমার হাতে খানকতক দশটাকার নোট দিয়ে একটু রসাল টিপ্পনী কেটে বললেন, "দেখ তোমার ওরকম ফাঁকা মতলবে এমন সব নিরেট জিনিসের আর প্রয়োজন কেন, তাও ত বুঝতে পাচ্ছি না। তা যাই হোক, এগুলো এখন তোমার কাছেই রাখ।"

সেই দিন বিকালবেলা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে আমার যোগাড়যন্ত্রের সব ব্যবস্থা দেখালুম। আমার উৎসাহ দেখে যদিও তিনি হাসলেন কিন্তু কিছু পাকা কথা দিলেন না, শুধু বললেন, "যেতে তো ইচ্ছে, দেখা যাক কি হয়।" আশ্রমের তরুণ শিষ্য কানাইয়ের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথাতে কোন মন্তব্যই

---

*দুবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কাশ্মীর ভ্রমণে অনিচ্ছায় গুরুদেবের কোন কিছু কারণ না দর্শালেও মনে হয় যে, সেখানে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার সময় তখনও উপস্থিত হয় নি, তার পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন।

প্রকাশ করলেন না। আরও তিনটি বন্ধুকে যাবার জন্য বললুম—রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন আঢ্য ও আর একটি ছেলে। তার পরের সোমবার আমাদের যাত্রার দিন স্থির হল।

শনি রবি এ দুদিন কলকাতায়ই রইলুম। আমাদের বাড়ীতে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের তখন বিয়ে লেগেছে। সোমবার খুব সকালেই মালপত্র নিয়ে শ্রীরামপুর পেঁাছলুম। আশ্রমের দরজায় রাজেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। বললে, "গুরুদেব বেরিয়েছেন, বেড়াতে। তিনি যাবেন না বলে দিয়েছেন।"

ক্ষোভ যেমনি হল, জেদও তেমনি চাপল। বললুম, "কাশ্মীর যাওয়ার ফাঁকা কথা বলে বাবাকে আর এবার নিয়ে তিন বারের বার খোঁটা দেবার সুযোগ দিচ্ছিনে। চল, আমরা সব যেমন করেই হোক এবার যাব।"

রাজেন্দ্র রাজী হয়ে গেল; আমি আশ্রম ছেড়ে বেরোলুম একটা চাকর খুঁজে বের করবার জন্য। আমি জানতুম, কানাই গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও বেরোবে না। আর মালপত্র প্রভৃতি দেখাশোনা করবার জন্য একজন লোকও তো চাই। বেহারীর কথা মনে এল, আগে আমাদের বাড়ীতে ছিল, তখন শ্রীরামপুরে এক স্কুলের মাষ্টারের কাছে রয়েছে; তাড়াতাড়ি এগোতে গিয়ে শ্রীরামপুরের কাছারির কাছে গির্জার সামনে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় চলেছ?" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আনন হাস্যলেশশূন্য। বললুম, "গুরুদেব, শুনলুম যে আপনি আর কানাই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না। এখন বেহারীকে খুঁজছি। আপনার বোধ হয় মনে আছে যে গেলবার সে কাশ্মীর যাবার জন্যে এতদূর আগ্রহ দেখিয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গে বিনা মাইনেতেও যেতে রাজী ছিল।"

"মনে আছে। যাই হোক, বেহারীর এবার যে যাবার ইচ্ছে আছে বলে তো আমার বোধ হয় না।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "সে যাবার জন্যে এবার পা বাড়িয়ে আছে, দেখবেন।"

গুরুজী নীরবে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। শীগগিরই সেই স্কুল-মাষ্টারের বাড়ী পেঁাছলুম। বেহারী তখন উঠানে কি করছিল, আমাকে দেখেই একগাল হেসে কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু কাশ্মীর যাওয়ার নাম শুনেই তার সব হাসি উড়ে গেল। কিছু যেন মনে না করি বলে বেহারী তার মনিবের বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে, মনে মনে ভাবছি যে বেহারীর দেরী হচ্ছে, যাবার জন্যে বাঁধাছাঁদা গোছগাছ করছে বুঝি। শেষে আর থাকতে না পেরে সদর দরজায় ঘা দিলুম। একটা লোক বেরিয়ে এসে বললে যে, বেহারী প্রায়

আধঘণ্টা আগে খিড়কিদরজা দিয়ে সরে পড়েছে। একটু মুচকিহাসিও তার ঠোঁটে দেখা গেল।

কি করি, নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে প্রস্থান করলুম। ভাবলুম যে, তাকে নিয়ে যেতে চাওয়াটা কি খুব বেশী জবরদস্তি হয়েছে অথবা গুরুজীর অদৃশ্য প্রভাব এখানেও কাজ করছে। খ্রিস্টানদের গির্জা পেরিয়ে দেখি, গুরুদেব আস্তে আস্তে আমার দিকেই আসছেন। খবর শোনবার অপেক্ষা না করেই তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে বেহারী আর যাচ্ছে না। যাক্, এখন তোমাদের কি মতলব ?"

রাশ-ভারী বাপের কথাও যে অমান্য করে, তেমনি একগুঁয়ে ছেলের মতন আমি জবাব দিলুম, "গুরুদেব, এখন খুড়োমশায়ের কাছে গিয়ে একবার দেখি, তাঁর চাকর লালধারীকে পাওয়া যায় কি না।"

একটু হেসে শ্রীযুক্তেশ্বরজী বললেন, "দেখতে দাও, দেখ। কিন্তু মনে হয় না যে গিয়ে কিছু ফল হবে।"

ভয় হল, তবু বিদ্রোহ করেই গুরুদেবকে ছেড়ে শ্রীরামপুরের কাছারি বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলুম। খুড়োমশায় শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ, ওখানকার সরকারী উকিল, আমায় সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন।

তাঁকে বললুম, "গুটিকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে আজ আমি কাশ্মীর যাচ্ছি। অনেকদিন ধরেই এই হিমালয়ে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে আছে।"

"তাই না কি, মুকুন্দ, শুনে খুশী হলুম ; তা যাক, তোমাদের বেড়ানটুকু যাতে বেশ আরামের হয়, তার জন্যে আমি কি করতে পারি, বল ?"

এই স্নেহমধুর সম্ভাষণে বুকে অনেকটা সাহস এল। বলে ফেললুম, "ন'কাকা, আপনার লালধারীকে আমাদের সঙ্গে একবার ছেড়ে দিন না, একবার ঘুরে আসি।"

বস্, আর যান কোথা। একেবারে ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত একসঙ্গে ঘটে গেল। খুল্লতাতমহাশয় এরূপ প্রবলভাবে একটি লম্ফপ্রদান করলেন যে তাঁর চেয়ার উল্টে গিয়ে ডেস্কের উপরকার কাগজপত্র চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে, হাত থেকে হুঁকো মাটির উপর ঠকাস করে পড়ে গিয়ে এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললেন, "তুমি ত ভারি স্বার্থপর ছোকরা হে! কি আবদার দেখ, তোমরা সব ফুর্তি করতে যাবে আমার চাকরটি নিয়ে, আর আমায় এখানে কে দেখবে হে, বলতো ?"

বিস্ময় মনের মধ্যে লুকোলুম এই ভেবে যে, আমার অমায়িক খুল্লতাত মহাশয়ের সহসা প্রকৃতির বিপর্যয় নিশ্চয়ই আর একটা রহস্য, যাতে করে

আজকের সারা দিনটাই পরিপূর্ণ। কাছারিবাড়ী হতে আমার পশ্চাদপসরণ সম্মানজনকের চেয়ে অধিকতর তৎপরই হল।

আশ্রমে ফিরলুম। বন্ধুরা সব আগ্রহে সমবেত হয়েছে। মনে মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছিল যে, হয়ত গুরুদেবের মনোভাবের পিছনে যদিও অত্যন্ত গূঢ়, তবুও যথেষ্ট কোন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। মনে অনুতাপ এল গুরুদেবের ইচ্ছা লঙ্ঘনের চেষ্টা করছি বলে।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মুকুন্দ, আমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাক না কেন? রাজেন্দ্র আর সব এখন এগিয়ে কলকাতায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। কলকাতায় গিয়ে কাশ্মীরের রাত্রের শেষ ট্রেন ধরবার এখনও ঢের সময় আছে।"

ক্ষুণ্ণ হয়ে বললুম, "গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে নেই!"

বন্ধুগণ আমার কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করলে না। তারা একটা ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়ে মালপত্র সব তুলে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল। কানাই আর আমি গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নীরবে বসে রইলুম। আধঘণ্টা গভীর নিস্তব্ধতার পর, গুরুদেব উঠে পড়ে দোতলায় খাবার বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "কানাই, মুকুন্দর খাবার দাও। তার গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে।"

কম্বলের আসন ছেড়ে উঠতেই হঠাৎ একটা বমি-বমি ভাব এসে হাত পা যেন এলিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়ে গিয়ে পাকস্থলীর ভিতর মোচড় দিয়ে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। পেটের ভিতর কে যেন ছুরি দিয়ে চিরে ফেলছে। যন্ত্রণা এত গভীর, মনে হল যেন আমায় কেউ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক নরককুণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিলে। গুরুদেবের দিকে অন্ধভাবে হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের তলায় ধড়াস করে পড়ে গেলুম—সাঙ্ঘাতিক এসিয়াটিক কলেরার সব লক্ষণই তখন প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আর কানাই আমাকে পাথালিকোলা করে তুলে নিয়ে বৈঠকখানায় এলেন।

যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে দিতে চেঁচিয়ে বললুম, "গুরুদেব, আপনার হাতে আমার প্রাণ তুলে দিলুম—যা করবার হয় করুন", কারণ মনে তখন স্থির বিশ্বাস হল যে প্রাণ অতি দ্রুতভাবেই আমার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর কোলে আমার মাথাটি তুলে নিয়ে সস্নেহে অতি সুকোমলভাবে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "দেখ ত, স্টেশনে যদি এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে, তাহলে ব্যাপারটা কি হত, বল দেখি।

আমাকেই তো তোমায় এইরকম অবস্থায় দেখতে হত—কারণ ঠিক এই সময়টাতে তোমার যে বেড়াতে বেরোন উচিত নয়, আমার সে বিবেচনায় ত তুমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে।"

শেষে সবই বুঝতে পারলুম। যেহেতু মহাগুরুগণ প্রকাশ্যে তাঁদের ক্ষমতা প্রদর্শন করাটা কদাচিৎ উপযুক্ত বলে মনে করেন, সে হেতু তৎকালীন একজন দর্শক সে দিনের ঘটনাগুলো দেখলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করত যে তাদের পরপর ঘটে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। গুরুদেবের আমাকে নিবারণের প্রচেষ্টা এত সূক্ষ্ম যে, তা ধরতেই পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছা বেহারী, খুড়োমশায়, রাজেন্দ্র, আর অপরাপরদের মধ্যে এমন অদৃশ্যভাবে কাজ করছিল যে, বোধ হয় আমি ছাড়া আর সকলেই ভেবেছিল যে, ঘটনা পরম্পরা যা ঘটে যাচ্ছে তা সঙ্গত আর নিতান্তই স্বাভাবিক।

সাংসারিক কর্তব্যও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে উপেক্ষিত হত না বলে তিনি কানাইকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে খুড়োমশায়কে খবর দিতে বললেন।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, "গুরুদেব, একমাত্র আপনিই কেবল আমায় আরাম করতে পারেন, এখন আমি ডাক্তারের নাগালের বাইরে।"

"বাছা. ঈশ্বরের কৃপাই তোমায় রক্ষা করছে। ডাক্তারের বিষয় আর ভেবো না। এসে তাঁকে আর তোমায় এই অবস্থায় দেখতে হবে না। তুমি একদম আরাম হয়ে গেছ, বুঝলে ?"

গুরুদেবের কথার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মোচড়ানি আর যন্ত্রণা একেবারে মিলিয়ে গেল। অত্যন্ত দুর্বলতা নিয়ে উঠে বসলুম। একজন ডাক্তার তখন শীগগিরই এসে পড়লেন, এসে আমাকে অতি যত্নের সঙ্গেই দেখলেন। দেখে বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি দারুণ মারাত্মক অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছ। যাক, আমি পরীক্ষার জন্যে তোমার এসব বমি আর মলের কিছু কিছু নমুনা নিয়ে যাচ্ছি। কালকে এর ফল জানতে পারবে।"

তার পরদিন সকালবেলা ডাক্তারবাবু একরকম উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এলেন। আমি তখন বসে আছি, মন খুব হাল্কা।

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমার হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডাক্তারবাবু বললেন, "বাঃ বাঃ, এখন তো বসে বসে খুব হাসি-গল্প হচ্ছে, যম যে ছুঁয়ে চলে গেল—তার খবর রাখ কি ? নমুনা পরীক্ষায় তোমার এসিয়াটিক কলেরা ধরার পর থেকে তুমি যে বেঁচে উঠবে, তা কখনো ভাবতেও পারি নি। রোগ আরামের এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন গুরু পেয়েছ ছোকরা, তুমি ত

খুব ভাগ্যবান্ হে। তাঁর প্রতি আমার এখন দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে, বুঝলে!"

আমিও অন্তরের সঙ্গে সায় দিলুম। ডাক্তারবাবু উঠবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় রাজেন্দ্র আর আন্ডি এসে হাজির হল। প্রথমতঃ ডাক্তার, তারপরে আমার কতকটা ম্লান আর রুগ্ন চেহারা দেখে তাদের আননে ক্রোধ অনুকম্পায় পরিবর্তিত হল।

রাজেন্দ্র বললে, "দেখলুম যখন কথামত কলকাতায় ট্রেন ধরবার সময় তুমি হাজির হলে না, তখন মনে মনে বড়ই রাগ হচ্ছিল। যাক, অসুখ হয়েছিল বুঝি?"

বললুম, "হ্যাঁ"। আর যখন দেখলুম যে, বন্ধুরা কালকে যে কোণ থেকে মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল আবার সেই কোণেই সে সব ফিরিয়ে এনে রাখছে, তখন আর হাসি চাপতে পারলুম না। মনে মনে একটা ছড়া কাটলুম,—

"জাহাজটির যাত্রা শুরু হল স্পেনে যাবার,
পেঁছিবারই আগে সেটি ফিরে এল আবার।"

গুরুদেব ঘরে ঢুকলেন। রোগীর আবদারে তাঁর হাত সসম্ভ্রমে ধরে বললুম, "গুরুজী, বারবছর বয়স থেকে আমি হিমালয়ে যাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে মরছি। এখন আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনার আশীর্বাদ ছাড়া পার্বতী* আর আমায় ডাক দেবেন না দেখছি!"

---

*পুরাণে পার্বতী হিমালয়কন্যা বলে বর্ণিতা হয়েছেন, যাঁর বাসস্থান হচ্ছে তিব্বতপ্রান্তে কোনও পর্বতশিখরে। বিস্ময়বিমুগ্ধ পথিকগণ সেই দুরধিগম্য পর্বতচূড়ার তলদেশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পান যে, দূরে একটি বিরাট তুষারস্তুপ, নানা আকারের বরফে তৈরী চূড়া ও শীর্ষসমন্বিত—প্রকান্ড এক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যার সাদৃশ্য রয়েছে।

জগজ্জননীর বিভিন্নরূপ—পার্বতী, কালী, দুর্গা, উমা প্রভৃতি নানারূপে অভিহিতা হয়েছেন, বিশিষ্ট শক্তির লীলা দেখাবার জন্য। ঈশ্বর অর্থাৎ শিব তাঁর পরাপ্রকৃতিতে সৃষ্টিকার্যে অক্ষম। তাঁর শক্তি, সৃজনকারিণী প্রকৃতির শক্তিরূপে এই বিশ্বরচনায় অসীম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

পৌরাণিক কাহিনীতে হিমালয় মহাদেবের বাসস্থান বলে বর্ণিত হয়েছে। হিমালয় হতে উৎপন্ন নদীসমূহের অধিষ্টাত্রী দেবীরূপে গঙ্গাদেবী আকাশ হতে নেমে আসেন। কাব্যে গঙ্গাদেবী স্বর্গ হতে অবতরণ করে ত্রিমূর্তির সংহার-সৃষ্টিকর্তা মহাযোগীশ্বর শিবের জটা-জূটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা হন বলে বর্ণিত হয়েছে। ভারতের শেক্‌স্‌পীয়র কবি কালিদাস হিমালয়কে মহাদেবের "রাশীভূত অট্টহাসি" (রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ—মেঘদূতঃ, পূর্বমেঘ শ্লোক ৬০।) বলে বর্ণনা করেছেন। "দি লিগেসি অফ ইন্ডিয়া

(অক্সফোর্ড হতে প্রকাশিত)" পুস্তকে এফ, ডব্লিউ, টমাস্ লিখেছেন, "পাঠক হয়ত বিরাট শুভ্র দন্তপংক্তির বিস্তারের কল্পনা করলেও করতে পারেন। কিন্তু তার সম্পূর্ণ অর্থ তবুও তাঁর নিকট লুক্কায়িতই থেকে যাবে যতক্ষণ না তিনি সেই মহাযোগীশ্বর শিবের মূর্তি কল্পনা করতে পারছেন, যিনি অভ্রংলিহ পর্বতচূড়ায় চিরসমাসীন, যেখানে স্বর্গ হতে মর্ত্যে অবতরণকালে গঙ্গা চন্দ্রমৌলি মহাদেবের জটাজুটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা হয়েছেন।"

হিন্দু চিত্রকলায় দিগম্বর শিবের একমাত্র আবরণ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণসার চর্ম বলে প্রদর্শিত হয়েছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে রাত্রির অন্ধকার আর রহস্যের প্রতীক; কতকগুলি শৈবায়ত, শিবের সম্মানে দিগম্বর হয়েই ভ্রমণ করেন—যাঁর কিছুই নেই অথচ সবই আছে।

কাশ্মীরের এক পুণ্যবতী সাধ্বী, চতুর্দশ শতকের লালা যোগীশ্বরীও ছিলেন একজন দিগম্বরা, শিব উপাসিকা। তদানীন্তন এক সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি, তিনি নগ্নতা অবলম্বন করে চলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে যোগীশ্বরী তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেন, "কেনই বা নয়? আমি তো কোথাও পুরুষ দেখতে পাই না।" যোগীশ্বরীর কতকটা উগ্রধরণের এই মত হচ্ছে যে ঈশ্বরানুভূতি যার হয় নি, সে পুরুষ পদবাচ্য নয়। তিনি ক্রিয়াযোগের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট একপ্রকার প্রণালী অবলম্বন করে সাধনা করতেন, যার অপূর্ব গুণ তিনি অসংখ্য চৌপদীতে বর্ণনা করে গেছেন। তার একটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল,—

"দুঃখের কি কালকূট আমি কত না করেছি পান?
সংখ্যাতীত জনম-মরণে চলে মোর অভিযান!
হায়! অমৃত বিনা যে হিয়ার পাত্রখানি,
শ্বাসের চুমুকে পূর্ণ হবে না জানি।"

জড়মৃত্যুর অধীন না হয়ে তিনি নিজ দেহকে অগ্নিতে পরিণত করে দেহের বিলোপসাধন করেছিলেন। পরে তিনি শোকসন্তপ্ত নগরবাসীদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন—জীবন্তমূর্তি পরিগ্রহ করে স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিতা হয়ে, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিতা হয়ে।

২১শ পরিচ্ছেদ

এবার কাশ্মীর যাত্রা

এসিয়াটিক কলেরার হাত থেকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পাবার পর দিন দুই পরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "এখন তুমি বেড়াতে যাবার মত বেশ বল পেয়েছ দেখছি। এবার আমি তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাব।"

সেই রাত্রে আমরা জন ছয়েক মিলে কাশ্মীর যাবার জন্য ট্রেন ধরলুম। প্রথমে নামলুম গিয়ে সিমলা সহরে। সিমলা হচ্ছে হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে যেন শহরের রাণী। চতুর্দিকের বিরাট সৌন্দর্য আর অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা খাড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

একটা খোলা জায়গায় বাজার বসেছে। জায়গাটি ছবির মত চমৎকার। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাঁকছে, "বিলিতি স্ট্রবেরী চাই।"

অপরূপ লাল লাল ফলগুলি দেখে গুরুদেবের কৌতূহল উদ্রিক্ত হল। কানাই আর আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলুম। গুরুদেব এক ঝুড়ি ফল কিনে আমাদের খেতে দিলেন। আমি একটাতে কামড় দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলুম।

"কি ভীষণ টক, গুরুদেব! ও স্ট্রবেরী আমার কোন কালেই ভাল লাগে না।"

গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা, আমেরিকায় গিয়ে সেখানে তোমার ভাল লাগবে। সেখানে এক ডিনারে বাড়ীর গিন্নী যখন সর আর চিনি দিয়ে মেখে স্ট্রবেরী তোমায় খেতে দেবে, তখন কাঁটা দিয়ে তুলে খেতে খেতে বলবে, 'কি চমৎকার স্ট্রবেরী!' তখন তোমার সিমলার এই আজকের দিনের কথা মনে পড়বে দেখো!"

(শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভবিষ্যদ্বাণী মন থেকে তখন অন্তর্হিত হল বটে, কিন্তু বহুদিন বাদে আবার জেগে উঠল, যখন আমেরিকায় যাবার অল্প কিছুদিন বাদেই ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশে ওয়েস্ট সমারভিলির মিসেস এলিস টি, হেসির ডিনারে নিমন্ত্রিত হলুম। টেবিলে ফলটল দেওয়ার সময় আমাদের গৃহকর্ত্রী কাঁটা দিয়ে সর আর চিনির সঙ্গে স্ট্রবেরীগুলো মেখে আমায় খেতে দিয়ে বললেন, "ফলগুলো কিছু টক হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই রকম করে তৈরী করে দিলে আপনার খেতে ভাল লাগবে।" একমুখ পুরে দিয়েই বলে উঠলুম,

"কি চমৎকার স্ট্রবেরী !" সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অতল গভীর হতে সিমলায় গুরুদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী বেরিয়ে এল। বহুদিন পূর্বেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভগবদ্ভাবিত মনে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কর্মপ্রসূত ঘটনাবলীর তালিকা যে ধরা পড়েছিল, তা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়।)

আমাদের দলটি শীগ্গিরই সিমলা ছেড়ে রাওয়ালপিণ্ডির গাড়ীতে চড়ে বসল। সেখানে একটা ছাদঢাকা ল্যাণ্ডো জুড়ি-গাড়ী ভাড়া করে আমরা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে যাত্রা করলুম। দিন সাতেক লাগল। আমাদের উত্তরাপথ ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে প্রকৃত হিমালয়ের বিরাট দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অত্যন্ত গরম পাথরের রাস্তা দিয়ে গাড়ীর লোহার চাকা ঘড় ঘড় শব্দ তুলে চলতে লাগল। পার্বত্য সৌন্দর্যের মুহুর্মুহুঃ দৃশ্য পরিবর্তনে আমাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আড্ডি গুরুদেবকে বললে, "গুরুজী, আপনার সৎসঙ্গে এমন বিরাট দৃশ্য দেখতে পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব !"

ভ্রমণের ব্যবস্থা আমারই করা, কাজেই আড্ডির প্রশংসা শুনে মনটা আনন্দে ফুলে উঠল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার দিকে ফিরে ফিস ফিস করে বললেন, "শুনে ফুলে উঠো না। ও আমাদের খানিকক্ষণ ছেড়ে একটান সিগারেট খাবার আশায় যতটা উৎফুল্ল, তোমার ওসব দৃশ্যটৃশ্য দেখে ততটা নয়, বুঝলে ?"

শুনে আমি তো স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। চাপাগলায় বললুম, "গুরুদেব, দয়া করে আর এ কড়া কথাগুলো শুনিয়ে আমাদের দল ভাঙাবেন না। আমি যে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিনে যে, আড্ডির সিগারেট খাবার বাসনা জেগেছে !" গুরুদেব সহজে হটবার পাত্র নন সভয়ে তাঁর দিকে তাকালুম।

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, আড্ডিকে আর আমি কিছু বলব না। কিন্তু তুমি শীগ্গিরই দেখবে ল্যাণ্ডো থামলেই আড্ডি তখনই এ সুযোগটি নেবে।"

একটা ছোট সরাই-এর কাছে এসে গাড়ী থামল। ঘোড়াদুটোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যেতেই আড্ডি জিজ্ঞাসা করলে, "গুরুজী, গাড়োয়ানের পাশে বসেই এবার খানিকক্ষণ যাই, কিছু মনে করবেন না 'ত ? গাড়ীর ভিতর বড় গরম। বাইরের একটু টাটকা হাওয়া খাওয়া যাবে।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অনুমতি দিলেন, কিন্তু আমায় বললেন, "আড্ডির চাই টাটকা হাওয়া নয়, টাটকা ধোঁয়া !"

আবার ধূলিজর্জরিত রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের ল্যাণ্ডো চলতে শুরু

করলে। গুরুদেবের চোখ হাসিতে মিট্ মিট্ করছিল ; তিনি আমায় উপদেশ দিলেন, "গাড়ীর দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ তো আড্ডি হাওয়া নিয়ে কি করছে ?"

উপদেশ পালন করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি যে আড্ডি মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাড়ছে ! ক্ষমাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টিতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দিকে তাকিয়ে বললুম, "গুরুদেব, বরাবরই দেখছি যে আপনার কথাই ঠিক ! আড্ডি এখন চারধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ ধোঁয়া ছাড়ছে !' অনুমান করলুম যে বন্ধুবর গাড়োয়ানের কাছ থেকে সিগারেটটি বাগিয়েছে ;' কেননা আমি জানতুম যে, কলকাতা থেকে আড্ডি কোন সিগারেট কি কিছু সঙ্গে করে আনে নি।

পাহাড়ের উপর রাস্তা সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। চার ধারের দৃশ্যে কি অপূর্ব আর সুন্দর ! নদী, উপত্যকা, গভীর খাদ, বন্ধুর ও সুদীর্ঘ পাহাড়ের পর পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ ! প্রত্যহ রাত্রে আমরা পথের ধারে কোন গ্রাম্য সরাইয়ে উপস্থিত হতুম ; সেখানে আমরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করে নিতুম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার পথ্যের ভার নিজে নিয়েছিলেন, আর দেখতেন যে প্রত্যেকবার খাবার সময় আমায় যেন লেবুর রস দেওয়া হয়। তখনও আমি বেশ দুর্বল, কিন্তু রোজই একটু একটু করে উন্নতিলাভ করতে লাগলুম। হলে কি হবে, গাড়ীর ঝড়্ঝড়ানিতে হাড়পাঁজরা সব একেবারে ঢিলে হয়ে আসত।

কাশ্মীরের মধ্যভাগে যতই অগ্রসর হতে লাগলুম, ততই আমাদের হৃদয় আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রকৃতি—পদ্মহ্রদ, ভাসমান উদ্যান, সুসজ্জিত শিকারা (হাউসবোট) বহুসেতুশোভিত ঝিলাম নদী আর ফুলে ফুলে ভরা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত বনভূমিতে এখানে ভূস্বর্গ রচনা করে রেখেছে।

শ্রীনগরে প্রবেশের পথ দুইদিকে সুদীর্ঘ গাছের সারি দিয়ে ঘেরা, আমাদের সাদর আহ্বানের জন্যই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি দ্বিতল সরাইয়ে আমরা ঘর নিলুম। সামনে উত্তুঙ্গ শৈলমালা—গর্বোন্নত মস্তক উত্তোলন করে আপনার বিরাট মহিমায় দণ্ডায়মান। কাছাকাছি কোথাও স্রোতের জল পাওয়া যেত না, নিকটস্থ একটা কুয়া হতেই আমাদের জল আসত। গ্রীষ্মঋতু এখানে অত্যন্ত আরামদায়ক, দিনে গরম বটে কিন্তু রাত্রে ঈষৎ ঠাণ্ডা।

শ্রীনগরে শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মন্দির একদিন দর্শন করতে যাওয়া গেল। নীল আকাশে উন্নতশির পর্বতশিখরস্থ সেই প্রাচীন মন্দির দর্শন করতে করতে

তন্দ্রার মতন একটি মধুর আবেশের মধ্যে ডুবে গেলুম। দূর বিদেশভূমিতে পাহাড়ের উপর একটি অট্টালিকার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই সুউচ্চ শঙ্করাচার্যের আশ্রম তখন পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে সেই স্থানটিতে পরিণত হল, যেখানে আমি বহুবৎসর বাদে আমেরিকার সেল্ফ্ রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপের প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। যখন আমি লস্ এঞ্জেলিসে গিয়ে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের চূড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী দেখলুম, তখনই আমি চিনতে পারলুম যে, কাশ্মীর আর অন্যত্র আমার স্বপ্নে দেখা এই হোল সেই বাড়ী।

কাশ্মীরে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর আরও ছয়হাজার ফুট উঁচুতে গুলমার্গে গেলুম। সেখানে গিয়ে আমি প্রথম বড় ঘোড়ার উপর চড়ি। রাজেন্দ্র একটি ছোট টাট্টুঘোড়ার উপর চড়ল। ঘোড়াটা খুব তেজী আর দৌড়বার জন্য একেবারে অস্থির। মতলব করলুম খিলানমার্গে যেতে হবে। জায়গাটা খুব খাড়াই আর রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে; প্রচুর "ব্যাঙের ছাতা" গাছে পরিপূর্ণ আর কুয়াশায় ঘেরা বলে সেই পথ চলাও অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাজেন্দ্রের ছোট টাট্টুঘোড়াটি কিন্তু আমার বৃহদায়তন অশ্ববরকে মুহূর্তেকের তরেও বিশ্রাম দিত না, ছুটেছে ত ছুটেই চলেছে, এমন কি বিপজ্জনক বাঁকের মুখেও তার গ্রাহ্যি নেই! রাজেন্দ্রের ঘোড়া বাজি মারবার আনন্দে অক্লান্তভাবে ছুটে চলেছে, দৌড়, দৌড়, দৌড়, তাকে থামান দায় আর কি!

ঘোড়দৌড়ের বাজির শেষে যা পুরস্কার পেলুম তা দেখে আনন্দে বিস্ময়ে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। জীবনে এই সর্বপ্রথম তুষারমৌলি হিমালয়ের উপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালুম, দেখি শৃঙ্গের পর শৃঙ্গের বিরাট রজতস্তূপ অথবা নীল আকাশের কোলে যেন শ্বেত ভল্লুক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি মহান্ গম্ভীর দৃশ্য! সূর্যকিরণোজ্জ্বল সুনীল আকাশের গায়ে হিমাবৃত গিরিশৃঙ্গের সেই অনন্ত বিস্তার, অপূর্ব আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যেন দুই চক্ষু দিয়ে পান করতে লাগলুম!

সকলেরই গায়ে ওভারকোট ছিল। বরফে ঢাকা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের সেই ঢালু জমির উপর স্ফূর্তি করে গড়াগড়ি খাওয়া গেল। ফিরবার পথে দূরে দেখা গেল, কে যেন একখানা হলদে রঙের কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, তাতে উলঙ্গ পর্বতগাত্রের রূপ একেবারেই বদলে গেছে।

তারপরের যাত্রা হল, শালিমার আর নিশাতবাগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত রাজপ্রমোদউদ্যান। নিশাতবাগের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ একটা স্বাভাবিক জলপ্রপাতের ঠিক উপরেই তৈরী; পাহাড় হতে বেগে নেমে আসবার সময় জলের গতিকে নানা উপায়ে আর অতি সুকৌশলে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে

যে, তারা রঙবেরঙের ধাপের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নানাবর্ণোজ্জ্বল পুষ্পকুঞ্জের মাঝখানে ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে। স্রোতটি রাজপ্রাসাদের গুটিকতক ঘরের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে শেষে পরীর মত নিচেকার হ্রদে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশাল উদ্যানে রঙের সে কি বিচিত্র সমারোহ! নানাবর্ণের গোলাপ, জুঁই, পদ্ম, স্ন্যাপড্র্যাগন, ল্যাভেণ্ডার, প্যান্সি, পপি আরও কত কি! সমআয়তনের চিনার, সাইপ্রেস, চেরী প্রভৃতি গাছ দিয়ে ঘেরা, যেন চারদিক পান্নাবসান। দূরে হিমালয়ের অভ্রংলিহ শুভ্র গিরিশিখর গর্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান।

তথাকথিত কাশ্মীরী আঙুর কলকাতায় একটা বড়দরের মেওয়া। রাজেন্দ্র বরাবরই বলত যে কাশ্মীরে পৌঁছে আমাদের কি আঙুরটাই না খাওয়া যাবে। কিন্তু গিয়ে দেখল যে সেখানে বড়গোছের কোন আঙুরক্ষেত নাই। তার এই ভুল ধারণার জন্য যখন তখন আমি তাকে খোঁটা দিয়ে ঠাট্টা করতুম।

মাঝে মাঝে বলতুম,—"ওঃ, আঙুর খেয়ে খেয়ে পেট আমার এমন ঢাক হয়ে গেছে যে আর চলতে পারি না। অদৃশ্য আঙুরের রস পেটে জমছে।" পরে শুনেছিলুম যে কাশ্মীরের পশ্চিমে কাবুল প্রদেশে প্রচুর আঙুর জন্মায়। আঙুর তেমন পাওয়া গেল না, কি আর করি গোটা পেস্তাদেওয়া রাবড়ির মালাই খেয়েই ঠাণ্ডা থাকতে হল।

ডাল হ্রদে লাল শামিয়ানা ঢাকা শিকারা বা হাউসবোটে করে বার কতক খুব বেড়ান গেল। জলপথ এমন নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত যে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড জলের তৈরী মাকড়সার জাল। এখানে অসংখ্য ভাসমান উদ্যান, কাঠের উপর মাটি ফেলে তৈরী। জলের মাঝখানে শাকসব্জি আর তরমুজ জন্মাচ্ছে, প্রথম দর্শনে এত অদ্ভুত বলে বোধ হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, এক একজন চাষী "মাটিতে শিকড় বসা" অপছন্দ করে তার "ক্ষেত"টি লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হ্রদের এক জায়গা থেকে আর একটা নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই বহুতলবিশিষ্ট উপত্যকায় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ। কাশ্মীরসম্রাজ্ঞী—মস্তকে শৈলমুকুটধারিণী, হ্রদবলয়িতা, পুষ্পাভরণসজ্জিতা। পরে যখন আমি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ফিরলুম তখন আমি বুঝলুম যে কেন কাশ্মীরকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিসর্গ দৃশ্যের স্থান বলা হয়। এখানে আছে সুইস আল্পসের, স্কটল্যাণ্ডের লমণ্ড হ্রদের আর ইংলণ্ডের হ্রদগুলির সৌন্দর্যের কিছু কিছু পরিচয়। কাশ্মীরে আমেরিকান ভ্রমণকারীকে আলাস্কা প্রদেশের পার্বত্যসৌন্দর্য আর ডেনভারের নিকটস্থ পাইকস পীকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদৃশ্য প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম পুরস্কার দিই—হয় মেক্সিকোর জকিমিলকোকে—যেখানে পর্বত, আকাশ আর পপলার গাছেরা হাজারো দিকের জলধারার মাঝে যেখানে মাছেরা খেলা করছে তার উপর তাদের ছায়া ফেলেছে, আর না হয় কাশ্মীরের রত্নসদৃশ হ্রদগুলিকে—যেন নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরী, হিমালয়ের কঠিন প্রহরার মধ্যে সুরক্ষিত। পৃথিবীতে এই দুটি স্থানই সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলে আমার স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান।

তবুও যখন আমি ইয়েলোস্টোন ন্যাশন্যাল পার্ক আর কলোরাডো এবং আলাস্কার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন প্রথম দর্শন করি তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। ইয়েলোস্টোন পার্ক বোধ হয় পৃথিবীতে একমাত্র স্থান যেখানে অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রবণ প্রচণ্ডবেগে জল উদ্গীরণ করছে—বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত, ঠিক সময়ে, ঘড়ির কাঁটার মত। এই আগ্নেয় গিরির প্রদেশে, প্রকৃতি যেন তার আদিম সৃষ্টির একটা নমুনা এখনও ফেলে রেখেছে ; এখানে আছে উষ্ণ গন্ধকজলের প্রস্রবণ, রামধনু আর ইন্দ্রনীলবর্ণের জলাশয়, গরম জলের প্রচণ্ড ফোয়ারা, আর অবাধ বিচরণশীল ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, বাইসন এবং অন্যান্য বন্য জন্তুসকল। উয়োমিংএর রাস্তাসকল দিয়ে মোটরে করে "ডেভিলস্ পেণ্ট পট"—যেখানে গরম কাদা ফুটছে, সেখানে যেতে গিয়ে পথে কলকলনাদে উচ্ছ্বলিত ঝরণা, প্রচণ্ডবেগে উদ্গীরণশীল উষ্ণজলের প্রস্রবণ আর বাষ্পময় উৎস প্রভৃতি দেখে বলতে ইচ্ছা হয় যে, ইয়েলোস্টোন পার্কও তার অপরূপ দৃশ্যাবলীর জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার পেতে পারে।

যোশেমাইটের প্রাচীন বিরাট বনস্পতি সিকোইয়া সকল তাদের বিশাল স্তম্ভ আকাশের দিকে বহুদূরে উত্তোলিত করে দণ্ডায়মান—যেন দিব্য কারিগরী দিয়ে গড়া হরিৎবর্ণের প্রকৃতির মন্দির। প্রাচ্যে বহু আশ্চর্য আশ্চর্য জলপ্রপাত থাকলেও কানাডার সীমান্তের কাছে নিউইয়র্ক প্রদেশে নায়াগ্রা প্রপাতের জলধারার বিরাট সৌন্দর্যের কাছে কেউ লাগে না। কেণ্টাকির বিরাট গুহা আর নিউমেক্সিকোর কার্লসবাডের মাটির নিচেকার গুহাগুলির ভিতরকার রঙীন বরফঝুরি দেখলে অপরূপ পরীরাজ্য বলেই ভ্রম হয়। গুহার ছাদ হতে ষ্ট্যালাক্টাইটের লম্বা ঝালর ঝুলে পড়েছে, আর তাদের ছায়া মাটির নিচের জলে প্রতিফলিত হয়ে দেখাচ্ছে যেন স্বপ্নজগতের চকিত স্ফুরণ।

কাশ্মীরের অধিকাংশ লোকই দেখতে অতি সুন্দর। দেহসৌন্দর্যের জন্য তারা জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপীয়দের মত তারা শ্বেতবর্ণ, আর তাদের দেহের আকৃতি আর অস্থিসংস্থানও তদ্রূপ ; অনেকেরই চোখ নীল আর সুন্দর সোনালী চুল। সাহেবী পোষাকে তাদের আমেরিকানদের মতই দেখায়।

হিমালয়ের শৈত্য তাদের উত্তপ্ত সূর্যকিরণ হতে রক্ষা করে, তাতে তাদের গৌরবর্ণও রক্ষা পায়। দক্ষিণের দিকে নামতে থাকলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ ক্রমশঃ ঘোর হতে ঘোরতর হয়ে বদলে আসছে।

কয়েক সপ্তাহ কাশ্মীরে ভ্রমণসুখে অতিবাহিত করবার পর বাংলাদেশে ফিরতে বাধ্য হলুম। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলবে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, কানাই আর আড্ডির সঙ্গে আরও কিছু দিনের জন্য শ্রীনগরে রয়ে গেলেন। আমার যাবার অল্প কিছু আগে গুরুদেব একদিন আভাসে জানালেন যে, কাশ্মীরে তাঁর অসুখ হতে পারে।

আমি প্রতিবাদের সুরে বললুম, "গুরুদেব, আপনি তো নিটোল স্বাস্থ্যের একটি পরিপূর্ণ ছবি, তবে আর আপনার ভাবনা কিসের ?"

"আরে এমন সম্ভাবনা হয়ত এখন আছে যে আমায় এমন কি এ সংসার ত্যাগ করেও যেতে হতে পারে।"

শুনে দারুণ বিচলিত হয়ে তাঁর পদতলে পড়ে অনুনয় করে বললুম, "গুরুজী, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে এখন দেহরক্ষা করবেন না। আপনি ছাড়া যে আমি একপাও চলতে পারব না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী নীরব হয়ে রইলেন, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর হাসি হাসলেন যে, তাতে আমি কতকটা আশ্বস্ত হলুম। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে চলে আসতে হল।

শ্রীরামপুরে ফেরবার অল্প কিছুদিন পরেই আড্ডির কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল, "গুরুজী সাংঘাতিকরূপে পীড়িত।"

উন্মত্তের মত তার পাঠালুম, "গুরুদেব, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমায় ছেড়ে যাবেন না। দেহরক্ষা করুন নইলে আমিও আর বাঁচব না!"

কাশ্মীর হতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর উত্তর এল, "তোমার যা ইচ্ছে, তাই হোক্।"

দিনকতকের মধ্যেই আড্ডির কাছ থেকে চিঠি এল, গুরুদেব আরোগ্যলাভ করেছেন। তারপরে পক্ষকাল মধ্যে গুরুদেব শ্রীরামপুরে ফিরলেন, দেখে কষ্ট হল যে, তাঁর শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর শিষ্যদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে, কাশ্মীরে তাঁর দারুণ জ্বরভোগের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের বহু পাপ পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক উপায়ে অপরের শরীর থেকে নিজের শরীরে রোগ নিয়ে তা ভোগ করে খণ্ডন করে দেওয়া উচ্চস্তরের যোগীদের জানা আছে। শক্তিমান লোক

দুর্বলকে গুরুভার বহন করতে সাহায্য করতে পারে ; আধ্যাত্মিক জগতের অতিমানবও তেমনি তাঁর শিষ্যদের প্রাক্তন কর্মফলের অংশগ্রহণ করে তাদের দৈহিক বা মানসিক দুঃখক্লেশের লাঘব করতে পারেন। ঋণে জর্জরিত অমিত-ব্যয়ী পুত্রের বিরাট ঋণের বোঝা নামিয়ে দিতে ধনী পিতা যেমন কিছু অর্থদন্ড দেয়, যাতে করে সে বেচারা তার নির্বুদ্ধিতার ভীষণ পরিণাম হতে বেঁচে যায়—তেমনি সদ্‌গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দুঃখমোচন করবার জন্য তাঁদের স্বাস্থ্যগৌরবের কতক অংশ স্বেচ্ছায় বিসর্জন করেন।

গূঢ় যৌগিক প্রণালীতে যোগী তাঁর মন, আর আধ্যাত্মিক সংবাহনশক্তিপীড়িত ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করেন—তাতে করে সেই রোগ যোগীর দেহে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সঞ্চারিত হয়। জড়জগতে ভগবানকে লাভ করে সদ্‌গুরু গ্রাহ্যই করেন না যে, তাঁর জড়শরীরের কি দশা ঘটবে। যদিও তিনি অপর লোকদের মুক্তি দেবার জন্য নিজ শরীরে তাদের রোগ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাহলেও কিন্তু তাতে তাঁর নিষ্কলুষ মন অভিভূত হয় না ; আর এ রকম সাহায্য করতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করেন। চরম মুক্তিলাভের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, শরীর তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত করেছে ; সদ্‌গুরু তখন যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তেমনিভাবেই তার ব্যবহার করেন।

এ জগতে গুরুর একমাত্র কর্ম হচ্ছে মানবজাতির দুঃখশোক প্রশমিত করা, —তা সে আধ্যাত্মিক উপায়েই হোক, আর জ্ঞানোপদেশ বা ইচ্ছাশক্তি বলে বা শারীরিক রোগপরিচালনা করেই হোক। ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে সদ্‌গুরুরা শারীরিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারেন। কখনও কখনও একান্ত নীরবে শারীরিক ক্লেশ বহন করতে চান—শিষ্যদিগকে উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা দেবার জন্য। যোগীরা অন্যান্যদের ভোগ নিজ শরীরে গ্রহণ করে তাদের হয়ে কর্মফলের খন্ডন করতে পারেন। এ বিধি দুর্লঙ্ঘ্য, চুলচেরা, অঙ্কের হিসাবে ঠিক যন্ত্রের মতন এ কাজ করে যাবে, কেউ তা এড়াতে পারে না। ভগবদ্‌জ্ঞান যাঁদের লাভ হয়েছে, তাঁরাই বৈজ্ঞানিকভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

কোন সদ্‌গুরু যখন অপরের রোগ নিরাময় করেন, তখন আধ্যাত্মিকবিধানে তাঁকে যে পীড়া ভোগ করতেই হবে, এমন কিছু অত্যাবশ্যক নয়। সাধু-সন্তদের সদ্য সদ্য রোগনিরাময়ের সাধারণতঃ নানা উপায় জানা আছে, তাতে করেই রোগ আরাম হয় আর তাতে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন গুরুর কোনই ক্ষতি হয় না। কেবল বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে গুরু যদি ইচ্ছা করেন যে, তাঁর শিষ্যের অতি দ্রুত উন্নতি সাধিত করা প্রয়োজন, তখনই কেবল তিনি নিজশরীরে তার প্রচুর অশুভ কর্মফল একসঙ্গে গ্রহণ করে ভোগান্তে সে সব খন্ডন করেন।

যীশুখ্রিস্টও এমনি করে বহুলোকের পাপের মুক্তিপণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দৈবশক্তিপ্রভাবে* তাঁর শরীর ক্রুশবিদ্ধ হয়েও কখন মৃত্যুমুখে পতিত হত না, যদি না তিনি কার্যকারণের সূক্ষ্ম দৈববিধি পালিত হতে স্বেচ্ছায় না সাহায্য করতেন। তিনি এই রকম করে অপরের কর্মফল নিজশরীরে গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষতঃ তাঁর শিষ্যদের। এই প্রকারে তাঁরা বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ হলে তাঁদের উপর পবিত্রাত্মার আবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ তাঁরা পরিশেষে ভগবদ্‌জ্ঞান-লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন।**

আত্মোপলব্ধ সদ্‌গুরুই কেবল তাঁর প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন অথবা অপরের রোগ নিজশরীরে গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ লোকে কেউ অবশ্য এরূপ রোগ নিরাময়ের যৌগিকপ্রণালী প্রয়োগ করতে পারে না, আর তার এসব করতে যাওয়াও উচিত নয়; কারণ অপটু শরীর ঈশ্বরপ্রণিধানের পক্ষে বাধাস্বরূপ। শাস্ত্রে বলে, আগে স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে তারপর ধর্মসাধন, তা না হলে ভগবদ্‌চিন্তায় মন নিবিষ্ট করে রাখা অত্যন্ত দুরূহ।

খুব দৃঢ়মন কিন্তু সমস্ত শারীরিক বাধাবন্ধ অতিক্রম করে ঈশ্বরোপলব্ধি করতে পারে। বহু সাধুসন্ত রোগশোক অতিক্রম করে ঈশ্বরানুসন্ধানে সফলকাম হয়েছেন। আসিসির সেন্টফ্রান্সিস্‌ গুরুতররূপে পীড়িত হয়েও অপরকে আরাম করেছেন—এমন কি মৃতের পুনর্জীবনও দান করেছেন।

আমার একটি ভারতীয় সাধুর কথা জানা আছে। প্রথম জীবনে তাঁর অর্ধেক শরীর ছিল ক্ষতে পরিপূর্ণ। তার উপর তাঁর বহুমূত্ররোগ এত দূর প্রবল ছিল যে, পনেরমিনিটের বেশী তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল অদম্য। করজোড়ে তিনি এই বলে প্রার্থনা করতেন যে, "প্রভু, তুমি কি আমার এই ভাঙা মন্দিরে আসবে?" অবিরাম ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে সাধুটি ক্রমশঃ প্রত্যহই একাদিক্রমে আঠার ঘণ্টা পদ্মাসনে বসে থেকে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকতে সমর্থ হলেন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তারপর তিনবছর বাদে আমার এই ভাঙা ঘরে সেই অনন্ত জ্যোতিঃর প্রকাশ হল। সেই জ্যোতিঃসাগরে ডুবে গিয়ে আনন্দে

---

*যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে দিতে নিয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, "তুমি কি মনে কর যে আমি আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পারি না যাতে করে তিনি দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা বেশী দেবদূতদের আমার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন? কিন্তু তাতে করে শাস্ত্রের এই সব বচন কি করে পূর্ণ হবে যে, এই রকম হওয়া আবশ্যক?"—ম্যাথিউ ২৬:৫৩-৪ (বাইবেল)।

**এক্টস্‌ ১:৮ এবং ২:১-৪ (বাইবেল)।

আমার শরীরের কথা আর মনেই রইল না। শেষে দেখা গেল যে ভগবৎকৃপায় আমার শরীর সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে।"

মোগলসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রিঃ অঃ) কথা সকলেই জানেন। পুত্র হুমায়ুন সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। পিতা প্রচণ্ড মানসিক ব্যাকুলতা নিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, তাঁকে রোগ দিয়ে তাঁর পুত্রটি যেন বেঁচে যায়। চিকিৎসকেরা সব আশা ছেড়ে দেবার পরও হুমায়ুন* বেঁচে উঠলেন। বাবর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের রোগে পড়ে মারা গেলেন।

অনেকেই মনে করেন যে, আধ্যাত্মিক গুরুদের স্যাণ্ডোর† মত গায়ের জোর বা স্বাস্থ্য থাকা উচিত। এই অনুমান একেবারেই অমূলক। জন্মাবধি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ হওয়াটা যেমন ঈশ্বরজ্ঞান লাভের দ্যোতক নয়, তেমনি চিররুগ্ন শরীরও এ সূচনা করে না যে, গুরু আদৌ ভগবৎশক্তির সংস্পর্শে আসেন নি। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, শারীরিক অবস্থা দেখে প্রকৃত গুরুর পরীক্ষা করা চলে না। সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁর শারীরিক নয়—আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

বহু বিভ্রান্ত তত্ত্বান্বেষী ভুল ধারণা করেন যে, দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত বাগ্মী বা সুপরিচিত লেখকরা নিশ্চয়ই সদ্‌গুরু হবেন। সদ্‌গুরুর প্রমাণ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছামাত্র সবিকল্প সমাধিতে প্রবেশ লাভের সামর্থ্য থাকা আর পরে নির্বিকল্প সমাধিলাভ করা। ঋষিরা বলেছেন যে, কেবল মাত্র এই কৃতিত্বের বলেই মানুষ প্রমাণ করতে পারে যে, সে মায়া অতিক্রম করতে পেরেছে। তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, "একম্ সৎ"—"কেবল একজন মাত্রই আছেন।"

---

*হুমায়ুন ছিলেন আকবরের পিতা। ইসলামীয় ধর্মান্ধতায় আকবর প্রথম প্রথম হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমার জ্ঞান যখন ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, তখন লজ্জায় একেবারে অভিভূত হলুম।" "সকল ধর্মমতের মন্দিরেই অলৌকিক ব্যাপার ঘটে।" ভগবদগীতার পারস্য ভাষায় অনুবাদর ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন আর তাঁর রাজসভায় রোম হতে কতিপয় জেসুইট ফাদারদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আকবর ভ্রমক্রমে কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে নিম্নলিখিত উক্তি (আকবরের নবনির্মিত নগরী ফতেপুর সিক্‌রিতে বিজয়স্তম্ভে উৎকীর্ণ) যীশুখৃস্টে আরোপ করেছিলেন—যীশু, মেরীর পুত্র (শান্তি হউক) বলেছিলেন, "জগৎটি একটি সেতু; অতিক্রম করে যাও, কিন্তু এর উপর কোন গৃহ নির্মাণ কোরো না।"

†জার্মান ব্যায়ামবীর (মৃত্যু—১৯২৫); "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বলশালী মানব" বলে পরিচিত।

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর লিখে গেছেন, "অজ্ঞানজাত যে দ্বৈতভাব, তাতে পরমাত্মা হতে সকল জিনিষেই ভেদজ্ঞান জন্মে। যেখানে সর্বভূতে আত্মজ্ঞান জন্মে, সেখানে আত্মা ছাড়া একটা পরমাণুও নাই·········স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার কোনই মূল্য থাকে না, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ হলে শরীরের নশ্বরতা হেতু আর প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করতে হয় না।"

মহাগুরুগণই কেবল শিষ্যদের কর্মফল গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী শ্রীনগরে* কখনই রোগভোগ করতেন না, যদি না তিনি ঐ রকম অদ্ভুত উপায়ে শিষ্যদের উপকার করার জন্য অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ পেতেন।

ভগবৎপরায়ণ আমার গুরুদেব ব্যতীত অতি স্বল্প সাধুরাই ঈশ্বরাদেশ পালনের উপযুক্ত সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ দেহ দেখে সহানুভূতিসূচক দু একটা কথা বলতে যেতেই গুরুদেব হেসে বলে উঠলেন, "দেখ, এর একটা লাভেরও দিক আছে বইকি। কতকগুলো গেঞ্জি ছোট হয়ে গেছে, অনেকবছর ধরে সে সব পড়ে আছে; এবার সেগুলো পরতে পারব।"

গুরুদেবের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ দ্য সেলসের কথাগুলো স্মরণ হল, "যে সাধু নিরানন্দ তার জীবনই বৃথা!"

*সম্রাট অশোক কর্তৃক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি সেখানে ৫০০ মঠ নির্মাণ করেছিলেন, তার মধ্যে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন একহাজার বছর বাদে কাশ্মীর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখনও একশত মঠ বর্তমান ছিল। আর একজন চীন লেখক, ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দী) পাটলিপুত্রে (আধুনিক পাটনা) অশোকের বিরাট রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করে বলেন যে, হর্ম্যরাজি নির্মাণকৌশলে ও ভাস্কর্যের অলঙ্করণে এর গঠন এরূপ আশ্চর্য সুন্দর যে এ "কোন মরজগতের শিল্পীর হাতের কাজ নয়।"

পাটলিপুত্র নগরীর একটি কৌতুহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে প্রভু বুদ্ধ স্থানটি যখন দর্শন করেন, তখন সেটি ছিল একটি অখ্যাতনামা দুর্গ। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "আর্যদিগের বসতি যতদূর, বণিকগণ যতদূর ভ্রমণ করেন, এই পাটলিপুত্রই হবে তার প্রধান নগর—সকল প্রকার পণ্যের বিনিময় কেন্দ্র।" (মহাপরিনির্বাণ সূত্র)। দুই শতাব্দী পরেই পাটলিপুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হল। এঁরই পৌত্র অশোক উক্ত নগরীর বহুল ঐশ্বর্যবর্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

২২শ পরিচ্ছেদ

পাষাণ দেবতার হৃদয়

আমার জ্যেষ্ঠাভগিনী রমাদিদি গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে থাকত। অল্প কিছুদিনের জন্য আমি তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। রমাদিদি একদিন বললে, "দেখ, পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে অবিশ্যি স্বামীর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ করা উচিত নয়, কিন্তু দেখি যে, ঠাকুর দেবতায় তাঁর একেবারে মতিগতি নেই ; আমার একান্ত ইচ্ছে যে নাস্তিকতার পথ থেকে তিনি ফিরুন। আমার পূজার ঘরে সাধুসন্ন্যাসীদের ছবিটবিগুলোকে উপহাস করে তাঁর ভারি উল্লাস ! ভাইটি আমার, তুমিই তাতে সাহায্য করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার খুবই আছে, করবে কি ভাই ?" তার এ কাতর অনুনয়ে আমার অন্তর গলে গেল, কারণ আমার বাল্যজীবনের উপর রমাদিদি একটা খুব আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারে সেই শূন্যস্থান স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে পূরণ করবার তার চেষ্টার আর অবধি ছিল না।

আমি হেসে বললুম, "তা করব বই কি দিদিমণি, যতদূর পারি আমি তা নিশ্চয়ই করব।" আমারও মনে একান্ত আগ্রহ যে শান্ত, নিরীহ, সদাহাস্যময়ী দিদিটির মুখ হতে চিরঅন্ধকার যেন ঘুচাতে পারি।

অন্তরে নির্দেশ পাবার জন্য রমাদিদি আর আমি নীরবে প্রার্থনায় বসলুম। বছরখানেক আগে রমাদিদি আমায় ডাকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিতা করতে বলেছিল, আর তাঁর ক্রমশঃ উন্নতিও বেশ হচ্ছিল।

মনে একটা প্রেরণা এল। বললুম, "দেখ, কালকেই আমি দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে এস, আর জামাইবাবুকেও সঙ্গে আনবার চেষ্টা কোরো। আমি অন্তরে বেশ টের পাচ্ছি যে, সেই পুণ্যপীঠের পবিত্র প্রভাবেই মা কালী তাঁর মন গলিয়ে দেবেন। সঙ্গে আনবার সময় আমাদের উদ্দেশ্য যে কি, তা তাঁকে বোলো না কিন্তু, বুঝলে ?"

দিদিও আশান্বিতা হয়ে তখনই রাজী হয়ে গেল। তার পরদিন খুব ভোরে উঠে দেখলুম যে, রমাদিদি আর জামাইবাবু যাবার জন্য তৈরী। ছ্যাকরাগাড়ী আপার সারকুলার রোড* দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে এগোতে

*বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।

লাগল। ভগিনীপতি সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় গুরুদের যোগ্যতা নিয়ে উপহাস করে মজা করতে লাগলেন। দেখলুম, রমাদিদি গাড়ীর এক কোণে বসে নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে।

কানে কানে বললুম, "দিদি, কিছু ভেব না ; জামাইবাবুকে জানতেই দিওনা যে, তাঁর হাসিঠাট্টা বা রংতামাসা আমরা সত্যিসত্যিই সব বিশ্বাস করছি।"

সতীশবাবু তখন বলছেন, "মুকুন্দ, আরে তোমরা এই সব অপদার্থ বুজরুকদের কি করে যে ভক্তিটক্তি কর, তা ভেবেই পাইনে। সাধুসন্ন্যাসীদের সব চেহারা দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। হয় সে পাঁকাটির মত রোগা হবে, নইলে তো একেবারে হাতীর মত মোটা!' বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে একেবার হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

আমিও তেমনি সশব্দে হেসে উঠলুম। আমার ভালমানুষী প্রতিক্রিয়া হল সতীশবাবুর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। তিনি গুম্ হয়ে চুপ করে বসেই রইলেন। আর একটি কথাও বললেন না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের বাগানে গাড়ী প্রবেশ করবার সময় তিনি দন্তবিকশিত করে উপহাসের সঙ্গে বললেন, "তোমাদের দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণের উদ্দেশ্য বোধ হয় আমায় সংশোধন করার চেষ্টা, কি বল?"

কোন কথা না বলে যেমনি ফিরে চলেছি, অমনি খপ্ করে হাতটি ধরে তিনি বললেন, "ওহে নবীন সন্ন্যাসী, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার ঠিক ব্যবস্থাটি করে রাখবার জন্যে মন্দিরের লোকজনদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে ভুলো না যেন!" সতীশবাবুর ইচ্ছা পূজারীদের সঙ্গে কোন প্রকার কথাবার্তার হাত এড়ান।

তীক্ষ্নস্বরে উত্তর দিলুম, "আমি এখন ধ্যানে বসতে যাচ্ছি। আপনার খাওয়াদাওয়ার বিষয় আর ভাবতে হবে না, মা কালীই সব দেখবেন।"

সতীশবাবু শাসিয়ে বললেন, "তোমার ও মা কালী আমার জন্যে এক চুলও যে কিছু করবেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী, বুঝলে হে ভায়া?"

আমি কালীমন্দিরের নাটমন্দিরের দিকে একলাই চললুম। একটা থামের কাছে একটু আড়ালগোছের জায়গা বেছে নিয়ে পদ্মাসনে বসলুম। বেলা যদিও তখন সাতটা কিন্তু রোদ উঠে পড়লে গরম অসহ্য হয়ে উঠবে।

গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে সারা পৃথিবী যেন আমার মন থেকে মুছে গেল। মনে মনে ভবতারিণীদেবীর ধ্যান করতে লাগলুম। যুগাবতার

পরমহংসদেব এঁর মূর্তি পূজা আর ধ্যান করেই সিদ্ধিলাভ করে গেছেন। তাঁর বুকফাটা কান্নাতে মন্দিরের এই পাথরের মূর্তিই জীবন্ত আকৃতি পরিগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতেন। প্রার্থনা শুরু করলুম, "মাগো, তুমি তো পাষাণহৃদয়া মা, কথাটি অবধি বল না। কিন্তু তুমিই তো মা, তোমার প্রিয়ভক্ত রামকৃষ্ণদেবের আকুল আহ্বানে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলে, তবে কেন মা তোমার এই দীনসন্তানের ব্যাকুল ক্রন্দনে কর্ণপাত করছ না?"

আমার গভীরসাধনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে এল মনে একটা গভীর প্রশান্তি। তবু পাঁচঘণ্টা কেটে গেলেও এবং মাকে অন্তরে দর্শন করলেও কোনই উত্তর পেলুম না, একটু হতাশ হলুম। প্রার্থনা পূরণ করতে বিলম্ব করে ঈশ্বর মাঝে মাঝে ভক্তকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে তার ইষ্টমূর্তিতেই দেখা দেন। খ্রিস্টানভক্ত যীশুখ্রিস্টের মূর্তি দর্শন করে, হিন্দু তার আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণ অথবা মা কালীর দর্শন পায় অথবা কোন মূর্তির আরাধনা না করলে তার ক্রমবিকাশমান বিরাট জ্যোতিঃর দর্শনলাভ ঘটে।

অনিচ্ছায় চক্ষুদুটি উন্মুক্ত করলুম, দেখি যে মন্দিরদ্বার একজন পূজারী তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করছে, দুপুরে দ্বারবন্ধ করবার সময় এখন। নাটমন্দিরের সেই নির্জনস্থান হতে বেরিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাথরের মেঝে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড রৌদ্রকিরণে অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। খালি পা যেন পুড়ে যেতে লাগল।

মনে মনে নীরব অভিমানে বললুম, "জগজ্জননী, তুমি তো মা আমায় দর্শন দিলে না আর এখন তো তুমি মন্দিরের বন্ধ দরজার পিছনে লুকিয়েই রইলে। ভগ্নীপতির জন্যে যে মা তোমার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানাতে এসেছিলুম। তা তুমি মা আর শুনলে কই?"

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলুম। প্রথমতঃ একটি মধুর শীতল শিহরণ আমার পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পায়ের তলা পর্যন্ত পৌঁছুল। তারপর কি আশ্চর্য! মন্দিরটি বিরাট আকৃতি ধারণ করলে আর তার দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে মা ভবতারিণীর পাষাণ মূর্তি প্রকাশিত হল। ধীরে ধীরে তা পরিবর্তন হয়ে একটি জীবন্তমূর্তিতে পরিণত হল, মুখে কি অপরূপ মধুর হাসি। মাথা নেড়ে যেন আমায় ডাকছেন, কি অপরিসীম রোমাঞ্চকারী যে আনন্দ! তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার নাই। যেন কোন অদৃশ্য পিচকারি দিয়ে আমার সমস্ত শ্বাসবায়ু ফুসফুস হতে কে টেনে বার করে নিয়েছে; শরীর একেবারে স্থির কিন্তু তাতে জড়ত্ব নাই।

ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি এল। বাঁ ধারে গঙ্গার উপর দিয়ে কয়েক মাইল ধরে সব জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং মন্দির ছাড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের চারদিকের সব তল্লাটও দেখছি। বাড়ীঘরগুলোর দেয়াল সব যেন স্বচ্ছভাবে আলোকিত, তার ভিতর দিয়ে দেখছি দূরে লোকজনেরা সব চলাফেরা করছে।

যদিও আমার শ্বাসপ্রশ্বাস নেই আর শরীরও তখন অদ্ভুত স্থির, তবুও আমি হাত পা অবলীলাক্রমে নাড়তে পারছিলুম। মিনিট কতক ধরে আমি চোখ একবার খুলে আর বুঁজে পরীক্ষা করে দেখলুম। চোখ খোলাই বা কি আর বন্ধই বা কি, সমানভাবে আমি সারা দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সমস্ত দৃশ্যই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, এক্স-রের মতন সব জড়পদার্থেরই ভিতর ভেদ করে যেতে পারে। দিব্যচক্ষুর কেন্দ্র সর্বত্রই, তার পরিধি কোথাও নাই। সেই রৌদ্রদগ্ধ বিরাট প্রাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার নূতনভাবে উপলব্ধি হল যে, বুদ্বুদের মতই অন্তঃসারশূন্য এই জড়জগতের স্বপ্নে মগ্ন ঈশ্বরের পথভ্রষ্ট সন্তানের অবস্থা হতে মানুষ যখন নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করতে পারে তখন আবার সে তার অনন্তরাজ্য ফিরে পায়। যদি "অব্যাহতিলাভ" করাই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ মানুষের একান্ত কাম্য হয়, তবে কোন পরিত্রাণই কি সর্বব্যাপিত্বের গৌরবের সঙ্গে উপমিত হতে পারে?

দক্ষিণেশ্বরে আমার যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়েছিল তাতে দেখলুম যে, অসাধারণভাবে বর্ধিত একমাত্র বিরাট বস্তু সব হচ্ছে মন্দির আর তার ভিতরকার দেবীমূর্তি। আর সব কিছুরই স্বাভাবিক আকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসটি যেন একটা মৃদু আর স্নিগ্ধ আলোর ছটা দিয়ে ঘেরা—সাদা, নীল আর বিচিত্র বর্ণের রামধনু রঙের। শরীরটা মনে হল যেন বায়বীয় পদার্থে গড়া, এখনিই হাওয়ায় ভেসে উঠবে। আশপাশের সবকিছু যে জড়পদার্থে তৈরী, তার পরিপূর্ণ জ্ঞানও তখন আছে। চারদিকে তাকালুম, আর সে আনন্দস্বপ্ন ভাঙতে না দিয়ে দু এক পা করে এগোতেও লাগলুম।

মন্দিরের দেওয়ালের পিছনে সহসা দেখা গেল, ভগ্নীপতি একটি বেলগাছ তলায় বসে আছেন। তাঁর চিন্তাধারা কোন দিকে বইছে তাও বিনা আয়াসেই দেখতে পেলুম। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপ্রভাবে যদিও তার মন কতকটা উন্নত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তবুও আমার প্রতি মনে মনে তার বিরাগই সঞ্চিত ছিল। বরাভয়প্রদায়িনী প্রসন্নহাস্যময়ী মা ভবতারিণীর মূর্তির দিকে চেয়ে প্রার্থনা জানালুম, "মা জগজ্জননী! তুমি কি আমার ভগ্নীপতির মতিগতি ফিরিয়ে দেবে না মা?"

সেই অপরূপসুন্দর দেবীমূর্তি, যা এতাবৎকাল পর্যন্ত নীরবই ছিল, শেষপর্যন্ত কথা বললে, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

অত্যন্ত তৃপ্তি ও সন্তোষের সঙ্গে ভগ্নীপতি সতীশবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। যেন কোন আধ্যাত্মিকশক্তি তার ভিতর কাজ করছে, অন্তরের মধ্যে সহসা এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ভূমিআসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। দেখলুম মন্দিরের পিছনদিক দিয়ে তিনি দৌড়ে আসছেন ; ঘুঁসি বাগাতে বাগাতে তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

বিশ্বব্যাপী স্বপ্নদৃশ্য যেন কোন মায়াবলে অন্তর্হিত হল। সেই মহিমময়ী দেবীমূর্তি দৃষ্টিপথে আর রইল না ; বিরাটগগনচুম্বী মন্দির তার স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বচ্ছতাও অন্তর্হিত হল। আবার সর্বশরীর প্রখর রৌদ্রকিরণে যেন ঝলসে যেতে লাগল। দৌড়ে নাটমন্দিরে লাফিয়ে উঠে পড়লুম। সতীশবাবুও রাগের চোটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘড়িতে দেখলুম বেলা তখন একটা। দেবীদর্শন একঘণ্টাটাক স্থায়ী ছিল।

ভগ্নীপতি রাগে চিৎকার করে বললেন, "দুষ্টু কোথাকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তুমি আসনপিঁড়ি হয়ে আর চোখ কপালে তুলে এখানে ঠায় বসে রয়েছ। তোমার খোঁজে বার বার আমি এখানে এসেছি আর গেছি। আমাদের খাবারের কি ব্যবস্থা হল ? এখন ত মন্দির বন্ধ হয়ে গেল আর তুমিও মন্দিরের লোকদের বলে রাখ নি, এখন আর খাওয়াদাওয়া জুটবে কি করে ?"

দেবীমূর্তির আবির্ভাবে যে পরম আনন্দ পেয়েছিলুম, তা অন্তরে তখনও বর্তমান। পরম নির্ভরতার সঙ্গেই জবাব দিলুম, "মা কালীই আমাদের খাওয়াবেন।"

সতীশবাবু তো ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে বললেন, "আচ্ছা বেশ, আমি দেখি একবার, আগে হতে বন্দোবস্ত না থাকলে তোমার মা কালী কেমন করে আমাদের আজ এখানে খাওয়ান।"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে মন্দিরের একজন পূজারী উঠান পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আমায় ডেকে বললেন, "বাবা, তোমার ধ্যানের সময় দেখলুম যে তোমার মুখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। তোমাদের দল আজ সকালে এখানে এসেছে, তাও দেখেছি। আর তা দেখে তোমাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে প্রচুর খাবারও গুছিয়ে রেখেছি। অবিশ্যি আগে থাকতে বলে না রাখলে মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী কাউকে খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার কাছে তোমাদের কথা আলাদা।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সোজাসুজি সতীশবাবুর চোখের দিকে তাকালুম। ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে, নীরব অনুতাপে তিনি নীচের দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন। যখন একটি বেশ বিরাটগোছের ভোজের বন্দোবস্ত হল —এমন কি তার মধ্যে অসময়ের আম অবধিও ছিল, তখন দেখা গেল যে ভগ্নীপতিমহাশয়ের ক্ষুধা অতি অল্প, প্রায় সব উড়ে গেছে। তাঁর চিত্ত তখন উদ্‌ভ্রান্ত, চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেছেন। কলকাতায় ফিরবার পথে সতীশবাবু অত্যন্ত কোমলভাবে সানুনয় দৃষ্টিতে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। সতীশবাবুর স্পর্দ্ধাস্ফালনের সাক্ষাৎ উত্তর হিসাবেই যখন সেই পূজারীঠাকুর এসে আমাদের খেতে ডাকলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আর একটি কথাও বলেন নি।

তার পরদিন বৈকালে দিদির বাড়ী গেলুম। দিদি সস্নেহে আমায় ডেকে উপরে নিয়ে গেল। দিদি কেঁদে ফেলে বললে, "ভাই মুকুন্দ! কি আশ্চর্য ব্যাপার শুনেছ? কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার ভগ্নীপতি আমার সামনে বসে বসে কাঁদছিলেন।

"তিনি কি বললেন জান, 'দেবী তুমি! আমার এই মতিগতি বদলাবার তোমার ভাইয়ের মতলবে আমি যে কি পর্যন্ত সুখী হয়েছি, তা আর মুখে বলে শেষ করা যায় না। তোমার উপর যা কিছু আমি অন্যায় অবিচার করেছি,তার সব প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। আজ রাত থেকে আমাদের বড় শোবার ঘরটা পূজোর ঘর হিসাবে ব্যবহার করব আর তোমার ছোট্ট পূজোর ঘরটি আমাদের শোবার ঘর করে নেব। যে নির্লজ্জ ব্যবহার আমি করেছি তাতে আমি নিজেকে এই শাস্তি দেব যে, যতদিন না সাধনপথে আমি বেশ অগ্রসর হতে পারি ততদিন আর আমি মুকুন্দের সঙ্গে কথা বলব না। আজ থেকে মায়ের কাছে গভীরভাবে ধ্যান করব। কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই আমি তাঁর দর্শন পাব বই কি।"

বহুবছর বাদে (১৯৩৬ সালে) দিল্লীতে ভগ্নীপতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দেখে অত্যন্ত আনন্দ হল যে, তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, জগন্মাতার দর্শনলাভও তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল। তাঁর সঙ্গে অবস্থানকালে আমি দেখেছিলুম যে, যদিও তিনি তখন একটা গুরুতর অসুখে ভুগছিলেন আর দিনের বেলায় তাঁকে অফিসের কাজে থাকতে হত, তবুও সতীশবাবু প্রত্যহই রাত্রের অধিকাংশ সময় গুপ্তভাবে ধ্যানধারণাতেই অতিবাহিত করতেন।

মনে কেমন যেন একটা ধারণা এল যে, ভগ্নীপতি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। দিদি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। বললে, "ভাই, আমি তো বেশ ভাল আছি কিন্তু তোমার ভগ্নীপতির যে অসুখ। তুমি জেনে রেখো যে,

আমি সতী স্ত্রী, মরণ আমারই আগে হবে।* আর আমার যে বেশীদিন নয়, তাও জেনো।"

তার এই অমঙ্গলসূচক কথায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলেও তার মধ্যে সত্যের কাঠিন্য অনুভব করলুম। তার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় বছরদেড়েক বাদে আমার দিদি যখন মারা যায় তখন আমি আমেরিকায়। আমার ছোটভাই বিষ্ণু তার বিস্তৃত সংবাদ দিয়েছিল।

বিষ্ণু লিখেছিল, "মরবার সময় রমাদিদি আর সতীশবাবু কলকাতায় ছিলেন। যেদিন মারা যান, সেদিন সকালে দিদি সাজলেন যেন বিয়ের কনে। সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত সাজগোজ কিসের গো?' দিদি বললেন, 'পৃথিবীতে তোমার চরণসেবার আজই আমার শেষ দিন।' কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর বুকধড়ফড়ানি শুরু হল। তাঁর ছেলে যখন ডাক্তার ডাকবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দিদি তাকে বারণ ক'রে বললেন, 'বাবা, আমায় ছেড়ে আর কোথাও যেও না। ডাক্তার ডাকবার আর এখন দরকার নেই; তোমার ডাক্তার আসার আগেই আমি চলে যাব।' মিনিটদশেক বাদে স্বামীর চরণে মাথা রেখে, পরিপূর্ণ শান্তিতে, আর কোন কষ্ট না পেয়ে রমাদিদি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।"

বিষ্ণু বলেছিল, "দিদি মারা যাবার পর সতীশবাবু একলা থাকতেই ভালবাসতেন। একদিন তাঁতে আর আমাতে দিদির একটা বড় ফটোগ্রাফে দেখছি দিদির হাসিমাখা মুখ। দিদি যেন সামনে দাঁড়িয়ে, সতীশবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হাঁসছ কেন বল ত? মনে ভেবেছ যে আমার আগে পালিয়ে গেছ বলে তুমি বড় চালাক, না? সেটি হবে না তা জেনে রেখো। দেখিয়ে দেব যে তুমি বেশীদিন আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। শীগগিরই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।' "

"যদিও এই সময়ে সতীশবাবুর সম্পূর্ণ রোগমুক্তি ঘটেছিল আর তাঁর স্বাস্থ্যও অতি চমৎকার ছিল—কিন্তু সেই ফটোগ্রাফের সামনে তাঁর সেই অদ্ভুত উক্তির অল্প কিছুকাল পরেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর কোন রোগ ধরা গেল না।"

এমনি করেই দুটি প্রাণ নিঃশেষিত হয়েছিল, একটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বড়দিদি রমা আর ভগ্নীপতি সতীশবাবু—দক্ষিণেশ্বরে যাঁর পরিবর্তন ঘটেছিল একজন নিতান্ত সাধারণ সংসারীলোক থেকে এক নীরব সাধুতে।

---

*হিন্দু স্ত্রীর বিশ্বাস যে একান্ত চিত্তে স্বামিসেবার প্রমাণ স্বরূপ "সধবা অবস্থায়" মৃত্যু পুণ্যলাভের চিহ্ন।

২৩শ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীলাভ

শ্রীরামপুর কলেজের প্রফেসর ডি. সি. ঘোষাল ছিলেন খুব কড়া প্রকৃতির লোক। একদিন তিনি বললেন, "দেখ, তোমার ফিলজফির পড়ার বই সব না পড়ে তুমি অবহেলা করছ। বোধ হয় মনে করছ যে বিনা পরিশ্রমে তোমার 'অনুভূতি'র জোরেই পরীক্ষায় পাস করে যাবে। কিন্তু বাবু মনে রেখো খেটেখুটে যদি না তুমি পড়, তাহলে তোমার বি. এ. পাস করা কি করে হয়, তা আমি দেখব।"

ব্যাপার দাঁড়াল এই যে তাঁর ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষায় যদি আমি ফেল করি, তা হলে আমার ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেওয়া দায় হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি দ্বারা এ সব বিধিবন্ধ। শ্রীরামপুর কলেজ এর এক সংশ্লিষ্ট শাখা। বি. এ. পরীক্ষায় একটা বিষয়ে ফেল করলে পরের বছরে আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ছিল নিয়ম।

শ্রীরামপুর কলেজে আমার প্রফেসরেরা আমাকে কতকটা দয়া করেই বরদাস্ত করে রেহাই দিয়ে চলতেন। বলতেন, "মুকুন্দ খুব ধর্মিষ্ঠ হয়ে পড়েছে দেখছি।" এই এককথায় আমায় শেষ করে দিয়ে তারা ক্লাসে কোন পড়ার প্রশ্ন করে আর আমায় বিব্রত করতেন না। তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন যে, টেস্ট পরীক্ষাতেই আমার দফা শেষ হয়ে যাবে, ইউনিভার্সিটিতে আমায় আর পাঠান হবে না। আমার সহপাঠীরাও আমার উপর তাদের রায় বার করলে "পাগলা সন্ন্যাসী" এই ডাকনাম আমায় দিয়ে!

দর্শনশাস্ত্রে যাতে প্রফেসর ঘোষাল আমায় ফেল না করাতে পারেন, তার জন্যে একটা চালাকি করে রেখেছিলুম। টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরোবে এমনি সময় একদিন আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসরের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। যেতে যেতে তাকে বললুম, "আজকে প্রফেসর সাহেবকে কি ঠকানটাই না ঠকাই দেখ; তোমাকে সাক্ষী রাখবার জন্যে সঙ্গে নিচ্ছি, এসো।"

ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার পরীক্ষার খাতায় কত নম্বর উঠেছে। তিনি মাথা নেড়ে বিজয়গর্বে বললেন, "তুমি পাসটাস করনি হে বাপু,

বুঝলে ?" বলেই ডেস্কের উপর একগাদা পরীক্ষার খাতা হাঁটকাতে শুরু করে দিলেন। খানিক পরেই বললেন, "তোমার খাতা এখানে নাই দেখছি ; যাক, তুমি নির্ঘাত ফেলই করেছ বুঝতে পাচ্ছি—অন্ততঃ পরীক্ষায় হাজির না হয়ে।"

আমি হেসে বললুম, "স্যার, পরীক্ষা আমি নিশ্চয়ই দিয়েছি, তাতে আর কোন ভুল নেই ; খাতার বান্ডিলটা আমি একবার দেখতে পারি কি ?"

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে প্রফেসর মহাশয় তো আমায় অনুমতি দিলেন। আমি তক্ষুনিই খাতাটি টেনে বের কবলুম। তাতে শুধু আমার রোলনম্বর ছাড়া আর কিছু নামটাম প্রভৃতি দেওয়া সব সযত্নে পরিহার করে রেখেছিলুম। আমার নামের "ধ্বজা" সেখানে দেখতে তা পেয়ে প্রফেসর মহাশয় আমার খাতায় খুব ভাল নম্বরই দিয়েছিলেন, যদিও আমার লেখাতে পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনও "কোটেশন" ছিল না।*

আমার চালাকি টের পেয়ে তিনি গর্জে উঠে বললেন, "ওঃ, তোমার কি কপাল !" তারপর কি আর করেন, পরম নির্ভরতার সঙ্গে বললেন, "ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয় ফেল মারবে, দেখো !"

টেষ্টের সময় অন্যান্য বিষয়ে আমি কিছু "কোচিং" পেয়েছিলুম, বিশেষতঃ আমার প্রিয়বন্ধু আর খুড়তুতোভাই, খুড়োমশায় সারদাবাবুর ছেলে প্রভাসচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। তাতে টেষ্টের সব পরীক্ষাগুলোতেই পাস করতে পেরেছিলুম—যদিও অতিকষ্টে কোন রকমে পাসমার্ক রেখে।

চার বছর কলেজে পড়ার পর বি. এ. পরীক্ষায় বসার মত আমি উপযুক্ত হলুম। কিন্তু ঐ পরীক্ষা যে পাশ করতে পারব এমন আশা ছিল না। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার তুলনায় শ্রীরামপুর কলেজের টেষ্ট পরীক্ষা ছেলেখেলা। প্রত্যহ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে যাওয়া আসা করাতে ক্লাসে ঢোকবার আর বিশেষ সময় পাইনি। ক্লাসে আমার অনুপস্থিতির চেয়ে আবির্ভাবই ছেলেদের মধ্যে বেশী বিস্ময়ের উদ্রেক করত।

আমার দৈনন্দিন প্রথা ছিল, সকালে সাড়ে নটার সময় বাইসাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়া। একহাতে থাকত গুরুদেবের জন্য কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্য—আমাদের

---

*অবশ্য এ কথা স্বীকার না করলে প্রফেসর ঘোষালের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে যে, আমাদের মধ্যে যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ ছিল তা তাঁর দোষ নয়, তা হচ্ছে আমার ক্লাস থেকে অনুপস্থিতি আর তাতে অমনোযোগ। প্রফেসর ঘোষাল ছিলেন একজন খ্যাতনামা বাগ্মী আর দর্শনশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। পরে অবশ্য আমাদের মধ্যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

"পন্থী" ছাত্রাবাসের বাগানের গুটিকতক ফুল। মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে গুরুজী দুপুরে আমায় খেতে বলতেন। সেদিনের কলেজের চিন্তা উড়িয়ে তৎক্ষণাৎ তা সানন্দে গ্রহণ করতুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে থেকে তাঁর অননুকরণীয় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করে বা আশ্রম-কর্তব্যসকল পালনে কিছু সাহায্য করে মাঝরাতের কাছাকাছি নিতান্তই অনিচ্ছুক মনে "পন্থী"র দিকে ফিরে চলতুম। মাঝে মাঝে হয়ত বা সারারাতই কেটে গেছে গুরুসঙ্গলাভে। কথাবার্তার আনন্দে চিত্ত এত গভীরভাবে নিবিষ্ট হ'ত যে, রাত্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তা টেরই পেতুম না।

একদিন রাত তখন এগারটা, ছাত্রাবাসে ফেরবার উদ্যোগে জুতো পরছি, গুরুদেব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরীক্ষা কবে শুরু হবে ?"

"পাঁচদিন পরে, গুরুদেব।"

"সব তৈরী হয়েছে তো ?"

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—হাতের জুতো একহাতে ধরাই রইল! অভিমানক্ষুণ্ণ হৃদয়ে বললুম, "গুরুদেব, আপনি তো জানেন যে প্রফেসরদের চেয়ে আপনারই সঙ্গে আমার পড়ার দিনগুলো কেমন ভাবে কেটেছে। এরকম শক্ত পরীক্ষা দিতে গিয়ে লোক-হাঁসিয়ে আর কি হবে বলুন ?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমায় বিদ্ধ করলে। কঠিন দৃঢ়-স্বরে তিনি বললেন, "দেখ, আশ্রমজীবনের উপর তোমার টানের জন্য তোমার বাবা বা তোমার আত্মীয়স্বজনদের কারুর সমালোচনা করবার কোন কারণ ঘটতে আমরা দোব না। শুধু প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি পরীক্ষায় হাজির হবে। যতটুকু, যা ভাল পার, তাই উত্তর দেবে, কেমন ?"

অশ্রুধারা আর বারণ মানলে না, সারা মুখ পরিপ্লাবিত করে দিলে। বুঝলুম যে গুরুদেবের আজ্ঞা অযৌক্তিক আর তাঁর আগ্রহে, আর যাই হোক না কেন, নিতান্তই বিলম্ব হয়ে গেছে।

কান্নার ভিতর দিয়ে কোনমতে উত্তর দিলুম, "আপনার যদি ইচ্ছে হয় তবে অবশ্যই পরীক্ষা দেব, কিন্তু ঠিকমত তৈরী হবার তো আর সময় নেই, গুরুদেব।" মনে মনে বললুম, "কি আর করব, খাতাগুলোর পাতা সব কেবল আপনার উপদেশ লিখেই ভরাব।"

তার পরদিন যথাকালে আশ্রমে প্রবেশ করে অত্যন্ত দুঃখার্তহৃদয়ে আর গম্ভীরভাবে যখন ফুলের তোড়াটি উপহার দিলুম, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার শোকাকুল আকৃতি দর্শনে হাস্য করে বললেন, "মুকুন্দ, ভগবান

কি তোমায় কোথাও সাহায্য করতে ভুলে গেছেন, পরীক্ষা কি অন্য কোথাও ?"

উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলুম, "না গুরুদেব।" কৃতজ্ঞস্মৃতির বন্যার প্লাবন এসে পড়ে মনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললে।

গুরুদেব স্নেহকোমল স্বরে বললেন, "দেখ, তোমার আলস্য নয়, তোমার ঈশ্বরলাভের জ্বলন্ত আগ্রহই কলেজে সাফল্যলাভের পথে তোমার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাইবেল থেকে একটা কথা উদ্ধৃত করে গুরুদেব বললেন, "প্রথমে ভগবানের রাজ্যের সন্ধান কর আর তাঁর ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশ্বাস রাখ, তাহলে এ সব জিনিসই তোমার এসে যাবে।*

হাজার বারের মত, গুরুদেবের সামনে আমার মনের গুরুভার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল। সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া শেষ হলে তিনি আমায় "পন্থী"তে ফিরে যেতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত কি এখনও তোমাদের ছাত্রাবাসে থাকে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার কাছেই যাও ; তোমায় পরীক্ষাতে সাহায্য করবার জন্যে ঠাকুরই তার মনে প্রেরণা জাগিয়ে দেবেন, তোমার কোন ভাবনা নেই।"

"আচ্ছা বেশ, গুরুজী ; কিন্তু রমেশ বড্ড ব্যস্ত। বি. এ. তে অনার্স নিয়েছে, বইও আমাদের চেয়ে পড়তে হয় ঢের বেশী।"

গুরুদেব আমার আপত্তিতে কর্ণপাত না করে বললেন, "তোমার জন্যে রমেশের ঠিক সময় হবে দেখো। এখন যাও দিকিন।"

বাইসাইকেলে "পন্থী"তে ফিরলুম। ছাত্রাবাসে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল আমাদের ক্লাসের ভালছেলে রমেশ। আমার অত্যন্ত কুণ্ঠিত অনুরোধ সে খুব খুশী হয়েই রাখবে বললে—যেন তার দিনগুলো একেবারে খালি, হাতে কোন কাজকর্ম নেই! বললে, "নিশ্চয়ই, তোমার কাজ করে দেব বই কি।"

সেইদিন বিকাল হতেই আর তারপর দিনকতক ধরে কয়েকঘণ্টা করে আমার নানাবিষয়ে সে আমায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে যেতে লাগল।

রমেশ বললে, "আমার মনে হয় যে, ইংরেজি সাহিত্যে চাইল্ড হ্যারল্ডের ভ্রমণপথের বর্ণনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। আমাদের তো এক্ষুনি একটা মানচিত্র চাই!"

*ম্যাথিউ —৬ঃ৩৩ (বাইবেল)।

তাড়াতাড়ি খুড়োমশায় সারদাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে একটা ম্যাপের বই সংগ্রহ করে আনলুম। বায়রনের পরিভ্রমণকারী যে যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, রমেশ ইউরোপের ম্যাপে পথের সেই সেই জায়গা সব দাগ দিয়ে দিলে।

রমেশের "কোচিং" শোনবার সময় জনকতক ছেলে সেখানে জড় হয়েছিল। পড়াশুনার শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, "রমেশ তোমায় ভুল খবর বাতলাচ্ছে! সাধারণতঃ পঞ্চাশ নম্বর বই থেকে থাকে আর বাকী পঞ্চাশ লেখকদের জীবনী থেকে।"

এরপর যখন ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে বসলুম, প্রশ্নগুলোর উপর আমার প্রথম দৃষ্টিপাতেই কৃতজ্ঞাশ্রু ঝরে পড়ে পরীক্ষার খাতা ভিজিয়ে দিতে লাগল। গার্ড আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সঙ্গে কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে বললুম, "আমার গুরুদেব বলেছিলেন যে রমেশ আমায় পরীক্ষায় খুব সাহায্য করবে। দেখুন, রমেশ আমায় যে সব প্রশ্নগুলো বলে দিয়েছিল, ঠিক সেই সবগুলোই আজ এসে গেছে। আমার বরাতজোরে ইংরেজি সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন এ বছরে অতি অল্পই এসেছে; আর তাদের জীবনী, অন্ততঃ আমার কাছে তো তা একেবারেই অজানা।"

পরীক্ষা দিয়ে যখন ফিরলুম, ছাত্রাবাসে তখন যেন একটা হুল্লোড় পড়ে গেছে। যে ছেলেগুলো রমেশের "কোচিং" নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তারা আমার দিকে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গেই চাইলে। তাদের সোল্লাস অভিনন্দনে কানে তালা লাগবার জোগাড়! পরীক্ষার সপ্তাহে রমেশের সঙ্গে বহুঘণ্টা কাটাতে হত আর সেই সময় সে পরীক্ষকদের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন আসবার সম্ভাবনা, সেই সব বাতলে দিত। দিনের পর দিন রমেশ যে ধরণের প্রশ্ন বলে দিত, সেই একই ধরণের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসছে দেখা যেত।

কলেজে একটা হৈচৈ পড়ে গেল যে, অলৌকিক গোছের একটা কিছু ব্যাপার ঘটছে, আর এই উদাসী "পাগলা সন্ন্যাসীর" সফলতার সম্ভাবনা খুবই। আমি অবশ্য এ ঘটনার কোন কিছু গোপন রাখবার কোন চেষ্টাই করিনি। ইউনিভার্সিটি থেকে প্রশ্নপত্র এসেছে, কাজেই স্থানীয় প্রফেসররা তা বদলাতে একেবারেই অক্ষম।

ইংরেজি সাহিত্যে পরীক্ষার বিষয়ে ভাবতে গিয়ে একদিন সকালে টের পেলুম যে আমি একটা অত্যন্ত গুরুতর ভুল করে এসেছি। কতকগুলি প্রশ্ন দুইভাগে বিভক্ত করা ছিল; এ কিম্বা বি, আর সি কিম্বা ডি। প্রত্যেক ভাগ থেকে একটা করে প্রশ্নের উত্তর না লিখে ভুল করে প্রথম ভাগ থেকেই একসঙ্গে দুটো প্রশ্নেরই উত্তর লিখে দিয়ে এসেছি আর দ্বিতীয় ভাগটা নজর না দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

সেই খাতায় খুব জোর বেশী নম্বর পেতে পারি তো ৩৩,—কিন্তু পাস-মার্ক হচ্ছে ৩৬। তিন নম্বর কম পড়ছে। দৌড়লুম গুরুদেবের কাছে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁকে নিবেদন করতে! বললুম, "গুরুদেব, আমার তো দেখছি পরীক্ষায় এক অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে গেছে। রমেশের ভিতর দিয়ে ভগবানের করুণা পাবার আমি অধিকারী নই। দেখছি যে আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত।"

"কিছু ভেবো না, মুকুন্দ!" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বর একেবারে লঘু আর নিরুদ্বিগ্ন। তিনি নীল আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "আকাশে চন্দ্রসূর্য তাদের স্থান পরিবর্তন করলেও করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষায় তোমায় কেউ ফেল করাতে পারবে না, তা দেখে নিও।"

হিসেবেতে হদিসই পেলুম না যে আমি কি করে পাস করব, তবুও আমি অপেক্ষাকৃত শান্তমনে আশ্রম ত্যাগ করলুম। সভয়দৃষ্টিতে আকাশের দিকে দু'একবার তাকালুম; দিনমণি তাঁর স্বস্থানে সুদৃঢ়ভাবে সমাসীন, স্থান পরিবর্তনের কোনই লক্ষণ নাই।

"পন্থী"তে পেঁছিতে ক্লাসের একটি ছেলের মন্তব্য কানে গেল, "এই মাত্র শুনলুম যে এবছরে এই প্রথম ইংরেজির পাসমার্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।" ঝড়ের মত সেই ছেলেটির ঘরে প্রবেশ করতে ছেলেটি তো ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকালে। সাগ্রহে সবকথা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম।

হেসে বললে, "ওহে জটাধারী সন্ন্যাসী, তোমার আবার এসব লেখাপড়ার খবরের হঠাৎ কি দরকার পড়ল? আর এখন কেঁদে কি ফল, বল? তবে একথা সত্যি যে পাসমার্ক ৩৩শে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

আনন্দে লাফাতে লাফাতে আমার ঘরে ফিরে এসে নতজানু হয়ে সেই পরম করুণাময়কে পাসমার্কের ঠিক অঙ্কটি পূরণ করে দেওয়াতে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতাভরে ভক্তিতে প্রণাম জানালুম।

প্রত্যহই যে রমেশের ভিতর দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ করছে তা অতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরে আমি পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতুম। বাঙলা পরীক্ষার বিষয়ে কিন্তু একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটেছিল। রমেশ কিন্তু বাঙলার বিষয়ে আমায় কোন সাহায্য করে নি।

একদিন সকালে বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বেরিয়েছি পরীক্ষা হলের দিকে. রমেশ আমাকে পিছন থেকে ডাকলে।

ক্লাসের একটি ছেলে অধৈর্য হয়ে আমায় বললে, "ঐ দেখ, রমেশ তোমায়

ডাকছে। আর ফিরে কাজ নেই, তা হলে পরীক্ষার হলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।" তার পরামর্শ উপেক্ষা করে আবার বাড়ীর দিকে ছুটলুম। রমেশ বললে, "বাঙালী ছেলেদের অবশ্য বাঙলাটা পাস করা সাধারণতঃ খুব সহজ। কিন্তু আমার এইমাত্র কি মনে হচ্ছে জান? এবছর পরীক্ষকেরা মতলব করেছেন যে, অবশ্য-পাঠ্য বই থেকে প্রশ্ন দিয়ে ছেলেদের একেবারে ফাঁসিয়ে দেবেন।" বন্ধুবর তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকহিতৈষী দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী থেকে দুটি গল্প সংক্ষেপে বিবৃত করলে।

রমেশকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইসাইকেলে চেপে কলেজ হলের দিকে দৌড়লুম। বাঙলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুটো অংশ ছিল। প্রথম প্রশ্ন ছিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার দুইটি উদাহরণ লিখ।"* সবেমাত্র শোনা গল্প দুটি লিখতে লিখতে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলুম যে, রমেশের শেষ মুহূর্তের ডাক শুনে আমি কি ভালই না করেছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণার (শেষ পর্যন্ত আমিও এর অন্তর্গত) বিষয় যদি না জানতুম, তাহলে বাঙলায় আমার পাস করাই দুর্ঘট হত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "যে ব্যক্তি তোমায় সব চেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁর বিষয় একটি রচনা লিখ।" ভদ্র পাঠক, রচনার বিষয়ে কার নাম নির্বাচন করেছিলুম তা বোধ হয় আর এখন বলে দিতে হবে না। পাতার পর পাতা যখন আমি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে ভরিয়ে তুলছিলুম, তখন আমি মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, আমার এই স্বগতঃ ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে যে, "পরীক্ষার খাতার সব পাতা আপনার উপদেশেই ভরিয়ে তুলব।"

ফিলজফির বিষয়ে আর রমেশকে বিশেষ কোন প্রশ্ন করি নি।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অধীনে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করে আমি পাঠ্য-পুস্তকের ব্যাখ্যা নিশ্চিন্তেই পরিত্যাগ করেছিলুম। সবচেয়ে বেশী নম্বর যদি কোথাও পেয়ে থাকি তো তা ফিলজফিতে। আর আর সব বিষয়ে অতিকষ্টে কেবল মাত্র পাসমার্ক রাখতে পেরেছিলুম।

আর আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু রমেশচন্দ্র তার ডিগ্রী খুব উচ্চ প্রশংসার সঙ্গেই লাভ করেছিল।

গ্রাজুয়েট হতে পিতার মুখ হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই বলে তিনি

---

*প্রশ্নের ঠিক কথাগুলো ভুলে গেছি, কিন্তু এ আমার মনে আছে যে, তা ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে রমেশ আমায় এই মাত্র যে সব গল্প বললে, সেই সব বিষয়ে। প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের শুধু "বিদ্যাসাগর" নামেই বহুল পরিচয়।

স্বীকার করেছিলেন, "মুকুন্দ, তুমি তোমার গুরুর সঙ্গে এত সময় কাটাও যে, তুমি যে আদৌ পাস করতে পারবে, তা মোটেই ভাবতে পারিনি।" গুরুদেব কিন্তু পিতার নীরব মনোভাব ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন।

বহুবছর ধরে আমার মনে একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, আমার নামের পিছনে বি. এ. অক্ষর দুটি কখনও দেখতে পাব কি না। অক্ষর দুটি বসাতে গিয়ে আমি সর্বদাই ভাবি যে এ ভগবানের দান. কি কারণে তিনি আমায় দিয়েছেন তা যেন কতকটা রহস্যাবৃত। মাঝে মাঝে আমি কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে শুনি যে, গ্রাজুয়েট হবার পর তাদের মুখস্থবিদ্যা অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। আমায় লেখাপড়ার অসম্পূর্ণতায় অবশ্য এই স্বীকারোক্তি কতকটা আমায় সান্ত্বনা দেয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৫ সালের জুন মাসে যে দিন ডিগ্রী নিয়ে এলুম সেদিন গুরুদেবের জীবন* হতে অজস্র আশিস্‌ধারা আমার জীবনের

---

*পতঞ্জলির যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ২৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, অপরের মন এবং ঘটনাসকলের গতিনিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি হচ্ছে একপ্রকার বিভূতি; সেখানে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, "বলে সংযম করার পরাকাষ্ঠা"। সকল শাস্ত্রেই বলে যে ঈশ্বর তাঁর নিজের সর্বশক্তিমান প্রতিরূপে মানুষের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের উপর প্রভাব অতিপ্রাকৃত বলেই বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যাঁদের দৈবসত্তার বিষয়ে "সম্যক স্মৃতির" উদয় হয়, তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে এই শক্তি সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মত ঈশ্বরোপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অহংকার এবং তজ্জনিত কামনাবাসনাশূন্য হন। প্রকৃত সদ্‌গুরুদের ক্রিয়াকলাপ "ঋতের" মতই অনায়াসলব্ধ। ইমার্শনের কথায় "মহৎ ব্যক্তিরা 'গুণবান্' নয়—গুণই হয়ে যান; তাহলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, আর ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন।"

ঈশ্বরোপলব্ধ যে কোন ব্যক্তিই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করতে পারেন, কারণ তিনি বিশ্বসৃষ্টির সূক্ষ্ম বিধিনিয়মের বিষয় অবগত আছেন। কিন্তু সকল সদ্‌গুরুগণই যে এরূপ অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করতে চান, তা নয়। প্রত্যেক সাধুই তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করেন। আর এ জগতে এই ব্যষ্টিগত প্রকাশই হচ্ছে মূলীভূত কারণ, যেখানে দুইটি বালুকণা একেবারে সমান দেখতে পাওয়া যায় না।

ভগবদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন সাধুদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম রচনা করা যেতে পারে না; কেউ কেউ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন, কেউ বা করেন না। কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন আর অপরে হয়ত (রাজর্ষি জনক অথবা আভিলার সেণ্ট থেরেসার মত) বৃহৎ কর্মে লিপ্ত থাকেন। কেউ কেউ উপদেশ দান করেন, ভ্রমণ করেন, অথবা বহু শিষ্য গ্রহণ করেন; আবার কেউ কেউ বা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ছায়ার মতন

উপর ঝরে পড়ছে বলে তাঁর চরণে নতজানু হয়ে প্রণাম জানিয়ে এলুম। তিনি পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, "ওঠ, ওঠ, মুকুন্দ, ঠাকুর দেখলেন যে, চন্দ্র-সূর্যের গতি বদলানর হাঙ্গামার চেয়ে তোমায় গ্র্যাজুয়েট বানিয়ে দেওয়াই ঢের সহজ, তাই তোমায় গ্র্যাজুয়েটই করে দিলেন।"

আত্মগোপন করে থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন সমালোচক আবির্ভূত হন নি যিনি প্রত্যেক সাধুর অতীত কর্মফলের রহস্য ভেদ করে তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করতে পারেন।

২৪শ পরিচ্ছেদ

আমার সন্ন্যাস লইয়া 'স্বামী' আখ্যা গ্রহণ

বহু দিনের আশা হৃদয়ে বহন করে একদিন গিয়ে বললুম, "গুরুদেব, বাবার একান্ত ইচ্ছা যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে* একটি কর্মকর্তার বা প্রশাসনিকের পদ গ্রহণ করি। আমি কিন্তু তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করে এসেছি, আপনি আমায় সন্ন্যাস দিন," বলে অত্যন্ত কাতরনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। আগে আগে বরাবরই তিনি আমার এ অনুরোধ এড়িয়ে এসেছেন, আমার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্য। আজকে কিন্তু তিনি প্রসন্নহাসি হাসলেন।

শান্ত স্নিগ্ধস্বরে সহাস্যে তিনি বললেন, "আচ্ছা, কালই তোমায় সন্ন্যাস দেব। সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছে যে তোমার অটুট আছে তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, 'জীবনের বসন্তেই যদি তুমি ভগবানকে ডেকে না আন, তবে তোমার জীবনের শীতে তিনি আসবেন কেন, বল ?' "

"পূজনীয় গুরুদেব, আপনার মত আমিও সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা কখনও পরিত্যাগ করি নি," বলে অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসলুম।

বাইবেলে আছে, "যে অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয়ে চিন্তা করে কিরূপে সে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবে ; কিন্তু যে বিবাহিত, সে সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিরূপে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে।"† আমার বহু বন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করে দেখেছি, তারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়েই করে ফেলেছে। তারপর সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়াতে তাদের গভীর ধ্যান-ধারণার প্রতিজ্ঞা সব তারা একেবারে ভুলে গেছে।

জীবনে ঈশ্বর গৌণ বা অপ্রধান** স্থান অধিকার করে থাকবেন, এ চিন্তা

*বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে।

†১ করিন্থিয়ানস্ ৭:৩২-৩৩ (বাইবেল)।

**জীবনে ঈশ্বরকে যে গৌণ বা অপ্রধান স্থান দেয়, সে তাকে কোন স্থানই (আমল) দেয় না।"—রাস্কিন।

আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয়। নিখিল ভুবনের অধিপতি তিনি। তাঁর অযাচিত করুণার দান মানুষের জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তার জীবনের উপরে নীরবে বর্ষিত হচ্ছে। প্রতিদানে কিন্তু মানুষের একটি জিনিস দেবার আছে—যা দেওয়া না দেওয়াতে আছে তারই অধিকার—সেটা হচ্ছে তার প্রেম। সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর অস্তিত্ব রহস্যাবৃত করবার উদ্দেশ্যে স্রষ্টার অপরিসীম যত্ন নেওয়ার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল একটি সংবেদনশীল ইচ্ছা যে, মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই তাঁকে সন্ধান করবে। তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বজ্রমুষ্টি প্রত্যেক জিনিসের সহজসাধ্য ভাবের কি কুসুমপেলবতায়ই না ঢেকে রেখেছেন!

তার পরের দিন হচ্ছে আমার জীবনের একটি সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। সেদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে বেরোবার কয়েক সপ্তাহ পরেই—সেদিন ১৯১৫ সালের জুলাই মাসের এক বৃহস্পতিবার, সূর্যকরোজ্জ্বল দিবস। শ্রীরামপুরের আশ্রমের ভিতরকার বারান্দায় গুরুদেব একখণ্ড সাদাসিল্ক গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করলেন—চিরকালের সন্ন্যাসীর বসন। শুকিয়ে গেলে গুরুদেব সেই সন্ন্যাস বস্ত্র দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে দিয়ে বললেন, "একদিন তোমায় পশ্চিমে যেতে হবে যেখানে সিল্কই লোকে বেশী পছন্দ করে! তাই প্রচলিত সুতোর কাপড়ের বদলে নিদর্শনস্বরূপ তোমার জন্যে আমি এই সিল্কই বেছে নিয়েছি।"

অবশ্য ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষাই সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ, সেখানে রেশম-বস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসী একটা অসাধারণ দৃশ্য বটে। অনেক যোগীই কিন্তু সিল্কের আচ্ছাদন পরিধান করেন, তাতে করে তুলোর চেয়ে বেশী তাদের শরীরের সূক্ষ্ম-শক্তিপ্রবাহ রক্ষা হয়।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "আমি ওসব অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান পছন্দ করি না। আমি তোমায় বিদ্বৎ উপায়ে (বিনা অনুষ্ঠানে) সন্ন্যাস দেব।"

'বিবিদিষা' অর্থাৎ সানুষ্ঠানিক দীক্ষাতে হোম প্রভৃতি করতে হয়, তার মধ্যে প্রতীক শ্রাদ্ধও শেষ করতে হয়। এতে করে শিষ্যের জড়দেহ মৃত বলেই গণ্য করা হয়—জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ! নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী পরে একটি মন্ত্রোচ্চারণ করেন, যথা,—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"* অথবা "তত্ত্বমসি" কিম্বা "সোঽহং"।

*"এই আত্মাই ব্রহ্ম"—পরব্রহ্ম, অজ, নির্বিশেষ (নেতি, নেতি ; এ নয়, এ নয়)—কিন্তু বেদান্তে এঁর বিষয় প্রায়ই সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপেই উল্লিখিত হয়েছে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কিন্তু সরল অনাড়ম্বরভাবে, সব লৌকিকবিধি পরিহার করে কেবলমাত্র আমায় একটি নূতন নাম নির্বাচন করে নিতে বললেন।

তিনি হেসে বললেন, "তুমি নিজে নিজেই নাম বেছে নেবে এ বিশেষ অধিকার আমি তোমায় দিচ্ছি।"

মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে আমি বললুম, "যোগানন্দ" !*

"তাই হোক ! আজ থেকে তুমি সাংসারিক জীবনের নাম মুকুন্দলাল ঘোষ পরিত্যাগ করে স্বামী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধি নিয়ে যোগানন্দ নামে অভিহিত হবে।"

নতজানু হয়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পদতলে প্রণাম করতে, সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকে আমার নূতন নাম শুনে, আমার সর্বশরীর কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কত স্নেহের সঙ্গে, কত অক্লান্তভাবে তিনি পরিশ্রম করে এসেছেন, যাতে করে বালক মুকুন্দ এক দিন সন্ন্যাসী যোগানন্দতে পরিণত হতে পারে। সানন্দে আমি শঙ্করদেবের (শঙ্করাচার্যের)† স্তোত্র হতে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করলুম ঃ—

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং।
ন চ শ্রোত্র ন জিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে ॥
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥১॥
ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ।
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ॥
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য— ।
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥২॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো।
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ ॥

*সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই নাম খুবই প্রচলিত।

†শঙ্করদেব শঙ্করাচার্য নামেই অভিহিত। আচার্য মানে "ধর্মোপদেষ্টা"। শংকরাচার্যের আবির্ভাবের তারিখ পণ্ডিতগণের তর্কের বিষয়ীভূত। কতকগুলি লিখিত বিবরণ হতে জানতে পারা যায় যে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; সুবিজ্ঞ পণ্ডিত আনন্দগিরি তারিখ দেন খ্রিঃ পূঃ ৪৪—১২ অব্দ। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর অবস্থান কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ বলে নির্দিষ্ট করেন। বহু-শতাব্দীব্যাপী তাঁর অবস্থিতি কাল ॥

ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি— ।
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৩॥"

স্বামী উপাধিধারী প্রত্যেক সন্ন্যাসীই স্মরণাতীত কাল হতে ভারতে সম্মানিত অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের একজন। বহুশতাব্দী পূর্বে শঙ্করাচার্য কর্তৃক বর্তমান আকারে পুনর্গঠিত এই সম্প্রদায়, তখন হতেই ঋষিকল্প ধর্মোপদেষ্টাদের অবিচ্ছিন্ন অধ্যক্ষতার ধারায় পরিচালিত (প্রত্যেকেই পরম্পরা-ক্রমে জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য উপাধি ধারণ করেন)।* বহু সন্ন্যাসী, বোধ হয় দশ লক্ষেরও বেশী, এই সম্প্রদায়ভুক্ত; আর এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করতে গেলে একটি আবশ্যিক নিয়ম পালন করতে হয়, তা হচ্ছে যাঁরা স্বয়ং স্বামী উপাধিধারী এমন ব্যক্তির নিকট হতে দীক্ষাগ্রহণ। স্বামী সম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীরাই তাঁদের আধ্যাত্মিক ধারা তাঁদের একমাত্র সাধারণ গুরু, আদি শঙ্করাচার্য হতে অনুসরণ করেন। তাঁরা দারিদ্র্যবরণ, সাধুজীবনযাপন এবং অধ্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্রত গ্রহণ করেন। ক্যাথলিক মঠধারী সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে বহুবিষয়ে প্রাচীনতর স্বামী সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

নূতন নামগ্রহণ করে স্বামীজী এমন একটি উপাধি গ্রহণ করেন, যাতে করে বোঝায় যে দশনামী সম্প্রদায়ের একটির সঙ্গে তাঁর লৌকিক সম্বন্ধ আছে। দশনামী সম্প্রদায়ে 'গিরি' উপাধি আছে। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর 'গিরি' ছিলেন, সুতরাং আমিও "গিরি'! অপরাপর শাখার নাম সাগর, ভারতী, পুরী, সরস্বতী, আরণ্য ও তীর্থ প্রভৃতি।

কোন "স্বামী"র সন্ন্যাসজীবনে সাধারণতঃ "আনন্দ"ান্ত নাম গ্রহণের অর্থ

---

*পুরীস্থ প্রাচীন গোবর্ধন মঠের স্বর্গত জগদ্‌গুরু শ্রীশংকরাচার্য, হিজ হোলিনেস্ ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে তিনমাসের জন্য আমেরিকা পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। কোন শংকরাচার্যের পাশ্চাত্যভ্রমণ এই প্রথম। তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণ আয়োজিত হয়েছিল পরমহংস যোগানন্দের দুইটি প্রতিষ্ঠান সেল্‌ফ্‌-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি দ্বারা। জগদ্‌গুরু আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন এবং সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ আর্নল্ড টয়েনবীর সহিত বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের গুরুগণের প্রতিনিধি হয়ে যোগদা সৎসঙ্গের দুই জন সাধুকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য পুরীর শ্রীশংকরাচার্য ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘমাতা শ্রীশ্রী দয়ামাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। উক্ত দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল পুরীস্থ যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমের শ্রীযুক্তেশ্বর মন্দিরে। (প্রকাশকের নিবেদন)

হচ্ছে কোন বিশেষ পথ, অবস্থা বা ঐশ্বরিক ভাব বা গুণ যথা—প্রেম, জ্ঞান, বিবেক, ভক্তি, সেবা, যোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা।

নিখিল মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা এবং ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধন পরিহারের আদর্শ স্বামী সম্প্রদায়ের অধিকাংশকে ভারতবর্ষে মানবহিতৈষণা এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্যে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত রাখে; কখনও কখনও ভারতের বাইরেও এঁদের বহু কার্যকলাপের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জাতিধর্মবর্ণ অথবা স্ত্রীপুরুষ বা শ্রেণী নির্বিশেষে ইঁহারা বিশ্বমানব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণ করে চলেন। তাঁদের চরমলক্ষ্য নির্বাণমোক্ষ। শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, "সোঽহং" এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রসন্নচিত্তে তিনি এই সংসারেই চলাফেরা করেন বটে কিন্তু এ সংসারের কেউ হয়ে নয়। এইরূপে তিনি "স্ব" অর্থাৎ আত্মার সহিত একীভূত হয়ে নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয়ই ছিলেন। স্বামী, যিনি উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলেই যে যোগী হবেন, তা নয়—ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য যে কোন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সাধন করে যোগী হতে পারে, হোক্ না কেন সে বিবাহিত কি অবিবাহিত বা কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

সন্ন্যাসীর পথ শুষ্কজ্ঞান, নিস্পৃহ কঠিন ত্যাগের পথ; কিন্তু যোগী সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে ক্রমপ্রচেষ্টায় সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকেন, যাতে করে তাঁর দেহ, মন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত হবার পর আত্মারও ক্রমশঃ মোক্ষসাধন হয়। ভাবাবেগে পরিচালিত বা কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, যোগীরা প্রাচীন ঋষিপরিকল্পিত সুপরীক্ষিত প্রণালীসমূহ অবলম্বনে যোগপ্রক্রিয়া সাধন করেন। এই যোগসাধনেই ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সাধুসন্ন্যাসী প্রকৃত মুক্ত, প্রকৃত যোগাবতার রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।

যে কোন বিজ্ঞানের মত যোগও দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নয়, সর্বকালের সকল দেশের লোকের দ্বারাই সাধনীয়। কতকগুলি অজ্ঞ লেখকদের ধারণা যে, "প্রতীচ্যের লোকেদের পক্ষে যোগ বিপজ্জনক অথবা অনুপযোগী", তা একেবারেই ভুল, আর এ ধারণা প্রচার করে প্রতীচ্যের আগ্রহশীল, শ্রদ্ধাবান, সমুৎসুক শিক্ষার্থীদের এর বহুবিধ শুভফল পাবার পক্ষে যে কি শোচনীয় প্রতিবন্ধক হয়েছে তা আর বলা যায় না।

সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মনে যে চিন্তাধারার উচ্ছৃঙ্খলতা, যা তার আপন স্বরূপের পরিচয় নিতে গেলে, সমানভাবে সকলেরই পক্ষে

প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হয়—সেই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তারাশিকে সংযত করার, সুনিয়ন্ত্রিত করার বিধিনিবন্ধ প্রণালীর নামই হচ্ছে যোগ। সূর্যালোকের উপকারিতার মত যোগও প্রাচী ও প্রতীচী উভয় দেশের লোকেদের পক্ষে সমভাবে উপকারী। অধিকাংশ লোকেদেরই চিন্তা উচ্ছৃঙ্খল ও উৎকল্পনাশ্রয়ী, এইখানেই মনঃসংযমনের বিজ্ঞান যোগের সুস্পষ্ট প্রয়োজন দেখা যায়।

পতঞ্জলি* বলে গেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।† হিন্দু ষড়দর্শনের মধ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা "যোগসূত্র" হচ্ছে একটি। প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় দেখা যায় যে, হিন্দুর ষড়দর্শনে শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা যে আছে তা নয়—তার সাধনের ব্যবহারিক প্রণালীও প্রদর্শিত হয়েছে। দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার সর্ববিধ সম্ভাব্য প্রশ্নের অনুসন্ধানের পর ছয়টি দর্শনে ছয় প্রকার সুনির্দিষ্ট বিধি প্রদর্শিত হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি আর পরমানন্দলাভ।

পরবর্তী উপনিষদসমূহ এই মতই পোষণ করে যে, ষড়দর্শনের** মধ্যে "যোগসূত্র"তেই পরমসত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ উপায় আছে। যোগপ্রণালীর সক্রিয়সাধনে মানুষ নিষ্ফল অনুমানের ক্ষেত্র পরিহার করে সেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতিলাভ করতে পারে।

পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় বর্ণনা করে গেছেন—তার মধ্যে (১) যম

*পতঞ্জলির আবির্ভাবের তারিখ জানা যায় না, যদিও বহু পণ্ডিত তাঁর কাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক বলে নির্দেশ করেছেন। ঋষিগণ এক বিরাট সংখ্যার বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে রচনা করে গেছেন যে, কালের প্রভাব তাতে কোন প্রাচীনত্ব আনতে পারে নি। তবুও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা দেখে বিব্রত হয়েছেন যে, ঋষিগণ তাঁদের রচনায় তৎকালীন সময় বা তারিখের উল্লেখ বা তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের জীবন সেই অনন্ত মহাজীবনের কেবল একটা সাময়িক স্ফুরণেরই মত, আর সত্য হচ্ছে কালাতীত, তাকে ব্যবসায়ীর চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না আর সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও নয়।

†যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—(যোগসূত্র, ১:২)। মনের সঙ্কল্প বিকল্পের লয় বা স্তিমিত ভাব। চিত্ত—চিন্তন ব্যাপারের অন্তর্গত প্রাণশক্তিসমূহ, মানসসত্তা, অহংকার, বুদ্ধি ইত্যাদি। বৃত্তি=চিন্তা ও ভাব যা মানবের সংজ্ঞান মনে অবিরত উত্থান ও বিলীন হয়। নিরোধ অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখতে পারা।

**ষড়দর্শন—ছয়টি প্রামাণ্য (বেদমূলক) দর্শন হচ্ছে, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক।

হচ্ছে,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ আর (২) নিয়ম হচ্ছে,—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় আর ঈশ্বর প্রণিধান।

তারপর (৩) আসন। মেরুদণ্ড ঋজু আর শরীর দৃঢ় ও স্থিরভাবে রেখে ধ্যানের জন্য নিশ্চলভাবে আর আরামে উপবেশনই আসন। এর আবার নানাবিধ প্রকার আছে। তারপরে (৪) প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের পর (৫) প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হতে মনকে ফিরিয়ে এনে আধ্যাত্মিক দেশে নিবদ্ধ রাখা। তার পরের চারটি অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত যোগের অঙ্গ, যথা ঃ—(৬) ধারণা, মনকে একমুখী চিন্তায় নিবিষ্ট রাখার নামই ধারণা। তারপর (৭) ধ্যান, চিন্তাস্থৈর্যের গাঢ়তা এলে তবে প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা জন্মে ; তারপর (৮) সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের* পর "কৈবল্যপ্রাপ্তি" হয়। যোগীর সকল বোধশক্তির অতীত সত্যোপলব্ধি ঘটে।

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আচ্ছা, সন্ন্যাসী বড় না যোগী বড় ?" বলাবাহুল্য, কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটলে বা ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ হলে আর পথের বিভিন্নতার কোনই প্রয়োজন থাকে না, সবই তখন অদৃশ্য হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কিন্তু বর্ণিত হয়েছে যে, যোগসাধনের প্রণালী সর্বতোমুখী, কারণ এর সাধনপ্রক্রিয়া যে কেবল কতকগুলি বিশেষ শ্রেণী বা মনোভাবের যথা, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত প্রভৃতি লোকেদের জন্যই উপযোগী তা নয়, এ সকলেরই পক্ষে উপযোগী। যোগ সাধনার জন্য কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতাবলম্বী হবার দরকার নেই। যোগবিজ্ঞান একটা সার্বজনীন অভাব পূরণে প্রয়োজন বলে এর একটা স্বাভাবিক সর্বগত আবেদন আছে।

প্রকৃত যোগী সংসারে নির্লিপ্ত থেকে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারেন, জলে যেমন মাখন ভাসে আর কি ; অমিশ্রিত, সহজে জলে মিশে যাওয়া নীতিশূন্য মানবিকতার দুধের মত নয়। সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদনে ঈশ্বর থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন হয় না, অবশ্য যোগী যদি আপনার আত্মচিন্তা

*বৌদ্ধধর্মের অরিয়ট্ঠঙ্গিকো মগ্গো (অষ্টাঙ্গ মার্গ) হচ্ছে ঃ—

১।	সম্মা দিট্ঠি	সম্যক্ দৃষ্টি	৫।	সম্মা আজীবো	সম্যক্ জীবনযাত্রা
২।	সম্মা সংকপ্পো	সম্যক্ সংকল্প	৬।	সম্মা ব্যায়ামো	সম্যক্ প্রচেষ্টা
৩।	সম্মা বাচা	সম্যক্ বাক্	৭।	সম্মা সতি	সম্যক্ আত্মস্মৃতি
৪।	সম্মা কম্মন্তো	সম্যক্ কর্ম	৮।	সম্মা সমাধি	সম্যক্ সমাধি

পতঞ্জলির এই অষ্টাঙ্গযোগ বৌদ্ধধর্মের উপরিউক্ত মানব আচরণের বা 'শীলের' নৈতিক আদর্শ, "অরিয়ট্ঠঙ্গিকো মগ্গো"র সহিত কেউ যেন না ভুল করেন।

প্রণোদিত কামনাবাসনায় জড়িত না হয়ে প'ড়ে ঈশ্বরের হস্তে চালিত যন্ত্রের ন্যায় নিজ জীবনের কর্তব্য করে যান, তবেই।

পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষেরা আছেন, যাঁরা আজ আমেরিকা, ইউরোপ অথবা অন্যান্য অহিন্দু দেশের মধ্যে অবস্থিতি করছেন, তাঁরা হয়ত যোগী কি সন্ন্যাসী একথাগুলো জন্মেও কখনো শোনেন নি। কিন্তু তাঁরাই হচ্ছেন ঐ সব সংজ্ঞার্থের আদর্শ উদাহরণ। মানবজাতির প্রতি নিষ্কামসেবা কিম্বা প্রবল রিপুদমন অথবা চিন্তাসংযমনে অদ্ভুত ক্ষমতা অথবা তাঁদের একনিষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেম বা গভীর ধ্যানশক্তির জন্য এক হিসাবে তাঁরা প্রকৃতই যোগী; তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্যস্থল বেছে নিয়েছেন, যোগ বা আত্মসংযম। যদি সুনির্দিষ্ট পন্থায় যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে এঁদের উত্তমরূপে শিক্ষিত করা যায়, যাতে করে এঁদের জীবন ও মন অধিকতর জ্ঞানের সঙ্গে পরিচালিত করা সম্ভব হয়, তা হলে এঁরা আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারেন।

প্রতীচ্যের কতকগুলি লেখক যোগসম্বন্ধে অতি অল্পধারণাবশতঃ খুবই ভুল বুঝেছেন, কারণ যাঁরা এর সমালোচনা করেন, তাঁরা কোনকালেই এর সাধনের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। যোগ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে সুইস্ মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ সি. জি. য়ুং বলেছেন ঃ—

"যখন কোন ধর্মসাধন প্রণালী 'বিজ্ঞান সম্মত' বলে অভিহিত হয়, তখন সেটা প্রতীচ্যেও সাধারণের গ্রহণযোগ্য বলে নিশ্চিত হতে পারা যায়। যোগ এ আশা পূরণ করে। নূতনত্বের আকর্ষণ আর অর্ধশিক্ষিতদের মোহ ছাড়াও বহুলোকের এ পথ অবলম্বন করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এতে সংযম্য ভূয়োদর্শনের সম্ভাবনা থাকে এবং তাতেই 'তথ্য'লাভের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনও মিটে। আর তা ছাড়া এর বহুব্যাপকতা ও গভীরতা, এর সুপ্রাচীনত্ব, এর মত ও পথ, যেখানে জীবনের সকল স্তরের উপর অধিকার বিস্তার করেছে, সেখানে এর স্বপ্নাতীত সম্ভাবনা আছে।

"ধর্মই হোক আর আধ্যাত্মিক সাধনাই হোক, সকলেরই মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুবর্তিতা আছে, যার মানে হচ্ছে এ একটি মানসিক স্বাস্থ্যগঠন প্রণালী। কেবলমাত্র বিবিধ শারীরিক যোগকৌশলও* শরীরস্বাস্থ্য সূচনা করে,

---

*ডাঃ য়ুং এখানে হঠযোগের বিষয় উল্লেখ করেছেন। হঠযোগে শরীরের আসনাদি এবং স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায়ের প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। হঠযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অদ্ভুত শারীরিক ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু যোগের এই শাখা আধ্যাত্মিক মুক্তিকামী যোগিদের দ্বারা অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়।

যা সাধারণতঃ জিমন্যাস্টিকজাতীয় শারীরক্রীড়াকৌশল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযমসাধন প্রণালীর চেয়েও উন্নততর, যেহেতু এ শুধু যে শারীরযান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক তা নয়—এর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবও আছে। শরীরের অংশবিশেষের সাধনায় এ পরিপূর্ণভাবে আত্মার সঙ্গে একীভূত করে। এর পরিষ্কার উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাণায়ামে। প্রাণায়ামসাধন শুধু যে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিনিয়ন্ত্রণ করে প্রাণশক্তির সংযম করা তাই নয়, শ্বাসের সঙ্গে যে প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে জড়িত, তারও সাধনা করা বোঝায়।

"যোগ যে মূলভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তার অনুসরণ বিনা যোগসাধন কল্পনাই করা যায় না, আর তা করাও নিরর্থক। যোগে শারীরিক আর আধ্যাত্মিক ভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে এক অপূর্ব সুসামঞ্জস্য আনয়ন করে।

"প্রাচ্যে যেখানে এই সব ভাবধারা আর প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন হয়েছে আর যেখানে সহস্র সহস্র বৎসরের প্রচলিত অখণ্ড প্রথায় প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে, সেখানে আমার বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, যোগই হচ্ছে সম্পূর্ণ ও বিধিসঙ্গত প্রণালী, যার দ্বারা শরীর আর মনের এমন একটা একীভবন সাধিত হয়, যার উপর আর কোন প্রশ্নই করা চলে না। এই ঐক্য এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে করে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলাভের সম্ভাবনা হয়।"

পশ্চিমের সেদিন আগত ঐ, যখন আত্মসংযমের অন্তর্বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টারই মত একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠবে। এই নূতন আণবিকযুগে দেখা যাবে যে, জড়পদার্থ যে আসলে ঘনীভূত শক্তি—এই বৈজ্ঞানিক, অবিসম্বাদিত সত্যে মানুষের মন আরও স্থির, প্রশান্ত, আরও প্রশস্ত আর বিস্তৃততর হবে। মানবমনের সূক্ষ্মশক্তি সব প্রস্তর বা ধাতুর মধ্যে যে সব আণবিকশক্তি নিহিত আছে তার চেয়েও প্রবলতর শক্তির সৃষ্টি করতে পারে এবং তা করবেও, পাছে অধুনাসৃষ্ট নবজাত জড় আণবিকশক্তির দানব সারা পৃথিবীর উপর তার নির্ম্মম যান্ত্রিক ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু করে। আণবিক বোমার বিষয়ে মানবজাতির উদ্বেগের একটা পরোক্ষ উপকার হবে এই যে যোগবিজ্ঞান* সম্বন্ধে ব্যবহারিক আগ্রহ বর্ধিত হবে—যা প্রকৃতপক্ষেই বোমাপ্রতিরোধী আশ্রয় হবে।

---

*যোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই যোগকে হঠযোগ বা চমকপ্রদ শক্তিলাভের জন্য এক গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রণালী বা ম্যাজিক বলে উল্লেখ করেন। যাই হোক, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ

পণ্ডিতেরা যখন যোগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, তখন তাঁরা পতঞ্জলির যোগসূত্রে বর্ণিত প্রণালীর বিষয় বা 'রাজযোগ' কেই বোঝেন। পুস্তকটিকে এমন অপূর্ব সুন্দর দার্শনিক তত্ত্বসকল বিষয়ীভূত হয়ে আছে যে পরমজ্ঞানী সদ্‌গুরু সদাশিবেন্দ্র প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তামনীষী গণ তার টীকা বা ব্যাখ্যা রচনাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। (৪১ অধ্যায়ের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

অপর পাঁচটি প্রাচীন বেদমূলক দর্শনশাস্ত্রের মত যোগসূত্রে নৈতিক পবিত্রতার (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ) "ম্যাজিকের" বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা প্রাথমিক দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য। এই ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা—পশ্চিমে যার অভাব দেখা যায়, ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে চিরস্থায়ী প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে। 'ঋত', যাতে এই বিশ্বজগৎবিধৃত, তা মানুষের অদৃষ্টনিয়ামক নীতিশাসন হতে পৃথক নয়। বিশ্বের মূলে নীতিসূত্রগুলি যে পালনে অনিচ্ছুক, সে সত্যানুসন্ধানে কখনও দৃঢ়সংকল্প নয়।

যোগসূত্রের বিভূতিপাদে বিভূতি ও সিদ্ধি বিষয়ে যোগের নানা অলৌকিক শক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সত্যজ্ঞানই সর্বদা প্রকৃত শক্তি। যোগপন্থা চারিটি অংশে বিভক্ত আর তার প্রত্যেক অংশের বিভূতির প্রকাশের বিষয় উল্লিখিত আছে। কোন একটা শক্তি অধিগত হলে যোগী বুঝতে পারেন যে তিনি চারটি অবস্থার একটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশিষ্ট শক্তি সকলের সহসা আবির্ভাব যোগপ্রণালীর বৈজ্ঞানিক গঠনের সাক্ষ্য প্রদান করে, যেখানে সাধকের "আধ্যাত্মিক উন্নতির" বিষয়ে ভ্রান্ত কল্পনা দূরীভূত হয়,—প্রমাণ তো চাই।

যোগের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ বিভূতিদর্শন ইত্যাদি একটা সাময়িক ফললাভ মাত্র। পতঞ্জলি সাধকদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, পরমাত্মার সহিত পরিপূর্ণ সংযোগসাধনই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই অনন্ত দাতারই অনুসন্ধান করা উচিত—তাঁর অপূর্ব দানের বিষয় নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, যে কতকগুলি তুচ্ছ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে, ঈশ্বর কখনও তার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। কাজেই সত্যপথাশ্রয়ী, অধ্যবসায়শীল যোগী তাঁর বিভূতি বা সিদ্ধি প্রভৃতির শক্তিপ্রদর্শনে সর্বদাই বিরত থাকেন, পাছে সে সব মনে একটা মিথ্যা গর্ব এনে পরিণামে কৈবল্যপ্রাপ্তির চরম অবস্থালাভের পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করে।

যোগী চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার পর ইচ্ছামত বিভূতিপ্রদর্শনে অথবা তা হতেবিরত থাকেন। তাঁর সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অলৌকিক হোক বা অন্যবিধ হোক, কর্মফলপ্রসূ না হয়েই তখন সম্পন্ন হয়। যেখানে অহংকারের চুম্বক তখনও বর্তমান থাকে, সেখানেই কেবল কর্মের লৌহচূর্ণ সকল আকৃষ্ট হয়।

২৫শ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা অনন্ত ও ভগিনী নলিনী

একদিন সকালে গভীর ধ্যানে বসে আছি- হঠাৎ যেন এই সাংঘাতিক কথাগুলো মনে এসে আঘাত করতে লাগল, "অনন্তদা আর বেশীদিন নন, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।"

সন্ন্যাসগ্রহণ করবার অল্প কিছুকাল পরেই আমি আমার জন্মস্থান গোরখপুরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনন্তদার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলুম। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়াতে অনন্তদা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন ; প্রাণপণে তখন তাঁর সেবা করতে লাগলুম।

মনের মধ্যে এই গুরুতর কথার আবির্ভাবে অন্তর শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভাবলুম যে, আমার অসহায় দৃষ্টির সামনে থেকে দাদাকে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাবে এদৃশ্য আমার একেবারে অসহ্য হবে, কাজেই গোরখপুরে আর বেশী দিন থাকা বরদাস্ত করতে পারব না। আত্মীয়স্বজনদের হৃদয়হীন আর তীক্ষ্ন সমালোচনা সত্ত্বেও প্রথম জাহাজেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম। বর্মা হয়ে চীনসমুদ্র দিয়ে জাহাজ জাপানের দিকে চলল। জাপানে কোবে সহরে নামলুম —মাত্র কয়েকদিনের জন্য। শহর বেড়িয়ে দেখবার মতন তখন ঠিক মনের অবস্থা ছিল না।

ভারতবর্ষে ফেরবার পথে জাহাজ সাংহাইয়ে থামল। সেখানে জাহাজের চিকিৎসক ডাক্তার মিশ্র আমাকে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলো ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, আমার পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের জন্য, সেখান হতে কিছু কিছু পছন্দসই উপহার কিনলুম। অনন্তদার জন্য খুব চমৎকার কাজকরা বাঁশের তৈরী একটি জিনিস কিনলুম। চীনা দোকানদারটি আমার হাতে জিনিসটি তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপর সেটাকে পড়ে যেতে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "হায় হায়, কার জন্যে এখন এ জিনিস কিনছি, দাদা ত মারা গেছেন!"

একটা বেশ সুস্পষ্ট অনুভূতি এল যে, দেহ হতে অনন্তদার আত্মার উৎক্রমণ এখন শুরু হয়েছে। স্মৃতিচিহ্নটি হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল—একটা দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন। ক্রন্দনোদ্বেলিত

হৃদয়ে সেই বংশখণ্ডের উপরিভাগে লিখলুম, "আমার প্রিয় অনন্তদার জন্য, কিন্তু এক্ষণে তিনি পরপারে।"

আমার সঙ্গী সেই ডাক্তারবাবুটি কিন্তু এ সবই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, মুখে বিদ্রূপের হাসি।

তিনি বললেন, "আপনার কান্না এখন থামান দেখি, মিছামিছি কাঁদছেন কেন বলুন ত? যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন যে সত্যিই তিনি মারা গেছেন, ততক্ষণ বৃথা চোখের জল ফেলে আর লাভ কি?"

কলকাতায় এসে জাহাজ ভিড়ল, ডাক্তার মিশ্রও সঙ্গে এলেন। আমার ছোটভাই বিষ্ণু ডকে আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত। কোন কথা বলবার আগেই আমি বিষ্ণুকে বললুম, "আমি জানি যে অনন্তদা চলে গেছেন। আচ্ছা, আমায় আর এই ডাক্তার বাবুকে বল তো, কখন তিনি মারা গেলেন?"

বিষ্ণু একটা তারিখের উল্লেখ করলে, তারিখটা হচ্ছে সাংহাইএ যে দিন সেই বাঁশের জিনিসটা কিনেছিলুম, ঠিক সেইদিন।

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, "দেখুন, এ নিয়ে আর বেশী কথা বলে কাজ নেই। ডাক্তারীশাস্ত্র ত এমনিই বিরাট, তার উপর আবার টেলিপ্যাথি নিয়ে পড়লে ত কূল পাওয়া ভার হবে, আরও এক বছর পড়া বেড়ে যাবে।"

বাড়ীতে প্রবেশ করতে পিতা সস্নেহে আমায় আলিঙ্গন করলেন, স্নেহকোমল স্বরে শুধু দুটি কথা বললেন, "তুমি এসেছ"। দুটি বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সাধারণতঃ তিনি ভাবাবেগবিহীন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর স্নেহের আতিশয্যের এমন বহিঃপ্রকাশ তিনি আর কখনও দেখান নি। পিতা বাইরে কঠিন গম্ভীর প্রকৃতির হলেও, অন্তরে ছিল তাঁর মায়ের মত কোমল স্নেহবিগলিত হৃদয়। পারিবারিক সকল ব্যাপারে তাঁর এই অপূর্বসুন্দর দ্বৈত পিতৃমাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেত।

অনন্তদার মৃত্যুর অতি অল্পকাল পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী দৈবশক্তিবলে মরণের দ্বার হতে ফিরে এসেছিল। ঘটনাটা বলবার পূর্বে এখানে আমাদের বাল্যজীবনের কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শৈশবে নলিনী আর আমার মধ্যে খুব মধুর সম্বন্ধ ছিল না। আমি ছিলুম অতিশয় ক্ষীণ, সে ছিল ক্ষীণতরা। কোন এক অজ্ঞাত কারণে—মনোবিজ্ঞানীরা যা সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন,—আমি প্রায়ই তার অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে উপহাস করতুম। সেও ছেলেমানুষি চাঁচাছোলা সোজা উত্তর দিত। কখনও কখনও মা, (বয়সে বড় বলে) আমারই কান মলে দিয়ে আমাদের ছেলেমানুষি ঝগড়া থামিয়ে দিতেন।

স্কুলের পড়া শেষ হলে ডাঃ পঞ্চানন বসু নামে কলকাতার একটি তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে নলিনীর বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হল।

যথাকালে বিবাহের বিরাট আয়োজন শুরু হল। বিবাহ হল আমাদের কলকাতার বাড়ীতেই। বাসরঘরে একদল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গিয়ে জুটলুম। সোনালীর্জারির কাজকরা প্রকাণ্ড এক তাকিয়ার উপর ভর দিয়ে বর বসে—পাশে নলিনী। কিন্তু হায়, খুব দামী জরির কাজকরা নীল সিল্কের সাড়ীটাও তার অস্থিচর্মসার শুষ্ক দেহের সম্পূর্ণটা ঢেকে একটুকুও লালিত্য আনতে পারে নি। নতুন ভগ্নীপতির তাকিয়ার পিছনে গিয়ে বসে তার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলুম। বর বেচারা বিয়ের আগে নলিনীকে কখনও দেখে নি। সেই রাত্রেই সে প্রথম টের পেলে যে বিয়ের লটারীতে তার ভাগ্যে কি উঠেছে।

আমার সহানুভূতি পেয়ে ডাক্তার বসু ইঙ্গিতে নলিনীকে দেখিয়ে দিয়ে কানে কানে চুপিচুপি বললে, "আচ্ছা বলত, ব্যাপারটা কি!"

আমি বললুম, "কেন ডাক্তারবাবু, একটি তো কঙ্কাল লাভ হল, এনাটমি মনে রাখবার খুব সুবিধে হবে!"

বছর কাটতে লাগল। ডাক্তার বসু বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে; বাড়ীতে অসুখ হলেই তার ডাক পড়ে। ডাক্তারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। প্রায় ঠাট্টাতামাসা চলত আর তা সাধারণতঃ নলিনীকে নিয়েই।

একদিন ভগ্নীপতি বললে, "দেখ, তোমার বোনটি হচ্ছে ডাক্তারী শাস্ত্রের এক গবেষণার বিষয়! তোমার ঐ রোগা বোনটির ওপর আমি সব কিছু বিদ্যাই খাটাবার চেষ্টা করেছি—কডলিভার তেল, মাখন, মল্ট, মধু, মাছ, মাংস, ডিম, টনিক, কি না দিয়েছি বল! কিন্তু তবুও এক ইঞ্চির শতাংশের একাংশও বাড়ল না।"

দিনকতক পরে ভগ্নীপতির বাড়ী গেলুম একটা কাজে, মিনিট কতকের জন্য। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছি, মনে হল নলিনী দেখতে পায় নি। সদর দরজার কাছে পেঁছতেই কিন্তু তার গলা শোনা গেল,—স্বর আন্তরিক কিন্তু দৃঢ়।

"দাদা শোন, এবারে কিন্তু আর পালাতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।"

আবার সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরের দিকে চললুম। অবাক হয়ে গেলুম, তার চোখে জল দেখে।

নলিনী বললে, "দাদা, আমাদের পুরোন কথা সব এখন একদম ভুলে যাও,

বুঝলে। যাক্, এখন দেখছি যে সাধনপথই তুমি পাকাপোক্ত ভাবে বেছে নিয়েছ। আমিও ঐসব বিষয়ে তোমার মতনই হতে চাই।" তারপর সাগ্রহে আশান্বিত হৃদয়ে বললে, "তুমি ত বেশ মোটাসোটা হয়েছ, আমি কি করে হব, বল না? স্বামী কাছে আসেন না, তবুও তাঁকে আমি এত ভালবাসি! কিন্তু কুশ্রী আর রোগা হয়ে থাকলেও আমি ঈশ্বরলাভের পথে উন্নতি করতে চাই। এই হচ্ছে আমার একান্ত ইচ্ছে, তুমি কি আমায় এখন সাহায্য করবে?"

তার এই সকাতর অনুরোধে আমার মন বিগলিত হল। আমাদের নূতন সখ্য ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। একদিন সে আমার শিষ্যা হতে চাইলে।

"যেমন ভাবে তোমার ইচ্ছে তেমনি ভাবে তুমি আমায় গড়ে নাও; তোমার ও সব ওষুধবিষুধের উপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, আমার ভগবানের উপরেই বেশী বিশ্বাস।" বলে একগাদা ওষুধের শিশি সংগ্রহ করে এনে সব জানালার বাইরের নর্দমা দিয়ে ফেলে দিলে। তার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্য আমি প্রথমেই তার খাওয়া থেকে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সব বাদ দিতে বললুম।

মাসকতক পরে—এর মধ্যে নলিনী আমার নির্দিষ্ট নানারকম ব্যবস্থা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে আর নানা অসুবিধার মধ্যেও নিরামিষ আহার বজায় রেখে এসেছে—আমি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললুম, "বোন, তুমি অবশ্য বিধিনিয়মগুলো খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে এসেছ দেখছি, যাক্, তোমার পুরস্কার এবার এসে পড়ল বলে। কি রকম মোটা হতে চাও বল দেখি, আমাদের খুড়ীমার মত, —সোজা হয়ে দাঁড়ালে পায়ে নজর পড়ে না, সেই রকম নাকি, এ্যাঁ?"

"না! তোমার মতন বেশ শক্তসমর্থ হতে চাই।"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলুম, "ভগবানের দয়ায় আমি যেমন সর্বদা সত্য কথা বলে এসেছি, এখন সেই রকম সত্য করেই বলছি,* ঈশ্বরের আশীর্বাদে

---

*হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে যিনি সর্বদা সত্যকথা বলেন, তিনি বাক্-সিদ্ধি লাভের শক্তি সঞ্চয় করেন। মনেপ্রাণে তাঁরা যে অনুজ্ঞাই উচ্চারণ করেন, সত্যসত্যই তা ফলে যেতে বাধ্য। (যোগসূত্র, ২:৩৬)

সত্য হতে যখন বিশ্বসৃষ্টি তখন সকল শাস্ত্রই একে এখন একটা গুণ বলে প্রশংসা করেন যার দ্বারা মানুষ সেই পরম সত্য, সেই অসীমের সঙ্গে একীভূত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলতেন, "সত্যই ঈশ্বর"; তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও প্রচেষ্টা ছিল কায়মনোবাক্যে পরিপূর্ণ সত্য অবলম্বন করা। হিন্দু সমাজে যুগ যুগ ধরে সত্যের আদর্শ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। মার্কো পোলো বলেন যে, "ব্রাহ্মণরা পৃথিবীতে কোন কিছুরই জন্য মিথ্যা কথা

আজ থেকে তোমার শরীর নিশ্চয়ই বদলাতে শুরু করবে। একমাসের মধ্যে আমার মতনই তোমার সমান ওজন হবে, দেখে নিও।"

আমার এই আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। ত্রিশ দিনের মধ্যেই নলিনীর দেহের ওজন আমার সমান হয়। সুস্বাস্থ্য তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল এবং স্বামীও তার প্রতি গভীর আকৃষ্ট হন্। যে অশুভের মধ্য দিয়ে তাদের বিবাহিত জীবন সুরু তা শেষ পর্য্যন্ত আদর্শ সুখেই পরিণত হয়।

জাপান থেকে ফিরে এসে শুনলুম যে আমার অনুপস্থিতির সময় নলিনী টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। গেলুম দৌড়ে তার বাড়ীতে, গিয়ে সব দেখে আমি একেবার হতভম্ব। দেখি একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

ভগ্নীপতি বললে, "অসুখে তার মাথার গোলমাল শুরু হবার আগে সে প্রায়ই বলত, 'মুকুন্দদা যদি এখানে থাকত, তাহলে আজ আমার এ দশা আর হত না।'" তারপর হতাশাকরুণস্বরে বললে, "ডাক্তারেরা আর আমিও কিন্তু কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। টাইফয়েডের সঙ্গে এতদিন যোঝবার পর এখন রক্তামাশয় দেখা দিয়েছে।"

গভীর প্রার্থনা দিয়ে স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করা শুরু করে দিলুম। একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স রাখলুম, সে আমায় সর্বদা সাহায্য করত। রোগ-নিরাময়ের বিবিধ যৌগিকপ্রণালী ভগ্নীর উপর প্রয়োগ করতে লাগলুম। রক্তামাশয় সেরে গেল।

কিন্তু ডাক্তার বসু সখেদে মাথা নেড়ে বললে, "যতই কর না কেন কিন্তু ওর শরীরে ত আর এক ফোঁটাও রক্ত নেই, কি করে যে সেরে উঠবে, সেইটাই ত মহা ভাবনা।"

আমি জোর করে বললুম, "নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই— সাত দিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে যাবে দেখবে।"

এক হপ্তা কেটে গেল। দেখে ভারি আনন্দ হল নলিনী চোখ মেলে চাইছে, আর আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারলে। সেইদিন থেকে তার আরোগ্যলাভ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। তার

বলবেন না।" ভারতে ইংরেজ বিচারক উইলিয়ম স্লীম্যান তাঁর 'জার্ণি থ্রু আউধ্, ১৮৪৯-৫০' নামক পুস্তকে বলেন, "আমার সামনে শত শত মোকদ্দমা এসেছে যাতে মানুষের সম্পত্তি, স্বাধীনতা এবং জীবন কেবল একটিমাত্র মিথ্যাকথা বলার উপর নির্ভর করেছে, কিন্তু তাও সে বলতে অস্বীকার করেছে।"

স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলেও তার এই মারাত্মক রকমের অসুখের একটা সাংঘাতিক চিহ্ন কিন্তু রয়েই গেল—তার পা দুটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে রইল। দেশী বিলাতী সব ডাক্তারেরা বলে গেল যে চিরজন্ম খোঁড়া হয়েই তাকে থাকতে হবে, সারবার আর কোন আশা নাই।

তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য জীবনমরণ যুদ্ধ যা আমি প্রার্থনার বলে শুরু করেছিলুম, তাতে আমায় একেবারে ক্লান্ত আর শক্তিহীন করে তুলেছিল। শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে গেলুম তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে। আমার কাছ থেকে নলিনীর অবস্থার কথা শুনে তাঁর স্নেহকোমল চক্ষুদুটি করুণায় সজল হয়ে উঠল।

শুনে তিনি বললেন, "তোমার ভগ্নীর পা দুটি একমাসের ভিতরেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর দেখ, আংটা দিয়ে আটকান একটা দু'রতি মুক্তো, ছ্যাঁদা যেন না হয়, তাগায় বসিয়ে পরতে বোলো—যেন গায়ে লেগে থাকে।"

আনন্দে একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে আমি গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। বললুম, "আপনি সদ্‌গুরু, আপনার কথাই যথেষ্ট. কি তু আপনি যদি অবিশ্যি জোর করে বলেন. তাহলে আমি তাকে এখুনি একটা মুক্তো পরিয়ে দেব বই কি।"

গুরুদেব ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাই করো।" তার পর তিনি নলিনীর শারীরিক আর মানসিক বৈশিষ্ট্যসকল সঠিকভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন, যদিও জীবনে তিনি তাকে কখনও দেখেন নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "গুরুদেব, এটা কি কোনরকম জ্যোতিষের বিচার? আপনি তো তার জন্মক্ষণ বা তারিখটারিখ কিছুই জানেন না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী হেসে বললেন, "দেখ, এ হচ্ছে এক রকমের গুপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্র, এতে আমাদের দিনক্ষণ পাঁজিপুঁথির কিছুই দরকার করে না। প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টিকর্তার অথবা বিশ্বমানবের এক একটি অংশ; তার একটা জড় আর একটা দৈব বা সূক্ষ্মশরীর আছে। বাইরের চোখ তার জড়শরীরটাকেই দেখে কিন্তু অন্তশ্চক্ষু আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন কি এই বিশ্বলীলার মধ্যেও—যাতে প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে তার একটা স্বতন্ত্র আর অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

কলকাতায় ফিরে এসে আমি নলিনীর জন্য একটা মুক্তা* কিনলুম। একমাস পরেই তার পা দুটি সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল।

---

*মুক্তা এবং অন্যান্য রত্নসকল এবং ধাতু ও মূল প্রভৃতি মানুষের শরীরের সাক্ষাৎ

ভগিনী আমাকে তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা গুরুদেবকে জানাতে বললে। নলিনীর সব কথা তিনি নীরবে শুনলেন। উঠে আসছি যখন, তিনি একটি কথা বললেন যা খুবই অর্থপূর্ণ। তিনি বললেন, "ডাক্তারেরা ত সব বলে গেছে যে তোমার ভগ্নীর কোন ছেলেপুলে হবে না। তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বোলো; বছর কয়েকের মধ্যেই তার দুটি কন্যা লাভ হবে।"

বছরকতক পরে নলিনীর একটি কন্যা হল,—তারপর আরও বছরকয়েক বাদে আর একটি কন্যা পেলে।

সংস্পর্শে এলে তার দেহকোষের উপর এক তড়িচ্চুম্বক প্রভাব বিস্তার করে। মনুষ্যশরীরে অঙ্গার এবং নানাবিধ ধাতুর যে সব মৌলিক উপাদান আছে সে সমস্তই বৃক্ষমূল, ধাতু বা রত্নের মধ্যেও বর্তমান আছে। ঋষিদের এই সব ক্ষেত্রে আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একদিন শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে স্বীকৃতি লাভ করবে। বৈদ্যুতিক প্রাণপ্রবাহবিশিষ্ট মানুষের স্পর্শপ্রবণ দেহ বহু রহস্যের কেন্দ্রস্থল, যার আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নি।

যদিও ধাতু ও রত্নবিশিষ্ট তাগা শরীরের পক্ষে রোগনিরাময়কারী, তবুও তাদের ব্যবহারের জন্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর নির্দেশদানের অন্য একটা কারণ ছিল। প্রকৃত সদ্‌গুরুরা নিজেরা কখনও ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হতে ইচ্ছা করেন না; ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সর্বরোগহর। সেইজন্য প্রকৃত সাধুসন্তরা ঈশ্বরের নিকট হতে যে সব শক্তি সযত্নে লাভ করেছেন, সে সব নানা ছদ্মবেশের আবরণে লুক্কায়িত রাখেন। মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষদর্শনেই বেশী বিশ্বাস করে। রোগমুক্তিকামনায় লোকেরা যখন আমার গুরুদেবের কাছে আসত, তখন তিনি তাদের কোন তাগা বা রত্ন ধারণ করবার উপদেশ দিতেন,—প্রথমতঃ তাঁদের বিশ্বাস উদ্রিক্ত করবার জন্য আর দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রতি মনোযোগ অপসারিত করবার জন্য। এই সকল তাগা বা রত্ন, তাদের অন্তর্নিহিত তড়িৎ-চুম্বকীয় রোগনিরাময়কারক শক্তি ব্যতীত গুরুদেবের গুপ্ত আশীর্বাদপূত ছিল।

২৬শ পরিচ্ছেদ

"ক্রিয়াযোগ" বিজ্ঞান

"ক্রিয়াযোগ" বিজ্ঞান, যা এখানে বারম্বার উল্লিখিত হয়েছে, তা আমার পরমগুরু লাহিড়ী মহাশয়ের কৃতিত্বেই সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্রিয়াশব্দ সংস্কৃত "কৃ" ধাতু হতে উৎপন্ন—মানে কোন কিছু করা, এবং তার প্রতিক্রিয়াও বোঝায় ; কার্যকারণের স্বাভাবিক বিধি "কর্ম" শব্দও "কৃ" ধাতু থেকে এসেছে। সুতরাং "ক্রিয়াযোগ" মানে প্রক্রিয়া বা অনুষ্ঠানবিশেষ দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগস্থাপন বা যোগ। কোন যোগী খুব নিষ্ঠাসহকারে এর প্রণালী অবলম্বন করে প্রক্রিয়াসাধনে যত্ন করলে ক্রমশঃ "কর্মফল" থেকে অথবা কার্যকারণ তত্ত্বের সাম্যবিধির শৃংখল হতে মুক্ত হন।

কতকগুলি প্রাচীন যৌগিক বিধিনিষেধবশতঃ সাধারণের জন্য লিখিত এই পুস্তকে "ক্রিয়াযোগে"র পূর্ণব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রণালী একজন সেলফ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ / যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া হতে প্রাধিকৃত "ক্রিয়াবান্" বা "ক্রিয়াযোগী"র কাছ থেকেই শিক্ষা করতে হয়। এখানে একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হবে।

"ক্রিয়াযোগ" একটি শারীরমনস্তাত্ত্বিক সহজ প্রণালী, যাতে করে মানবদেহের রক্ত অঙ্গারশূন্য হয়ে অম্লজান দ্বারা প্রতিপূরিত হয়। এই অতিরিক্ত অম্লজানের পরমাণু প্রাণধারায় রূপান্তরিত হয়ে মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের কেন্দ্রগুলিকে সঞ্জীবিত করে। কালো দূষিত রক্তসঞ্চয়ন বন্ধ ক'রে যোগী শরীরের তন্তুক্ষয় হ্রাস বা নিবারণ করতে পারেন। যিনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন, তিনি শরীরকোষগুলিকে শক্তিতে রূপান্তর সাধন করতে পারেন। ইলাইজা, যীশুখ্রিস্ট, কবীর এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণ এই "ক্রিয়াযোগ" বা অনুরূপ কোন প্রক্রিয়াসাধনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যাতে ক'রে তাঁরা ইচ্ছামাত্র দেহধারণ করতে বা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন।

"ক্রিয়াযোগ" একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। লাহিড়ীমহাশয় তাঁর মহান্ গুরু বাবাজীমহারাজের কাছ থেকে এ বস্তুটি পেয়েছিলেন। বাবাজীই "ক্রিয়াযোগ"কে বহুযুগের বিস্মৃতির অতলগহ্বর থেকে পুনরুদ্ধার করে এর প্রণালীর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে এর সরল নামকরণ করেন "ক্রিয়াযোগ।"

বাবাজী মহারাজ লাহিড়ীমহাশয়কে বলেছিলেন, "আজকে এই উনবিংশ শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগৎকে যে 'ক্রিয়াযোগ' দান করছি, তা হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, যা শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বছর আগে অর্জুনকে দিয়েছিলেন এবং যা পতঞ্জলি এবং যীশুখ্রিস্ট ও সেণ্ট জন, সেণ্ট পল প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য শিষ্যেরাও পরে অবগত হন।"

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দুইবার এই "ক্রিয়াযোগে"র বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। একটি শ্লোকে আছে ঃ অন্যান্য যোগিগণ অপানবায়ুতে প্রাণের আহুতিপ্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন এবং অন্যান্য কোন কোন সংযতাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতি রোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন।"* এর ব্যাখ্যা হচ্ছে—যোগী ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শান্ত করে অতিরিক্ত প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে শরীরের ক্ষয় নিবারণ করেন এবং শরীরস্থ অপানবায়ু সংযমন করে শরীরের বৃদ্ধির রূপান্তরও নিবারণ করেন। এইরূপে ক্ষয় আর বৃদ্ধির সাম্যাবস্থা এনে প্রাণশক্তির সংযমন শিক্ষা করেন।

গীতার অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,—যিনি রূপ রসাদি বাহ্যবিষয়-বাসনা (চিন্তা) হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া নাসিকামধ্যবাহী প্রাণ ও অপানবায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা সমান (স্থির) করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযম করিয়াছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ এবং বাসনা, ভয় ও ক্রোধপরিশূন্য, তাদৃশ মুনি জীবিত থাকিয়াও সতত মুক্ত।"**

শ্রীকৃষ্ণও বলে গেছেন যে, তিনি তাঁর এক পূর্বতন অবতারকালে এই অমর যোগসাধনপ্রণালী প্রাচীন পরমজ্ঞানী বিবস্বতকে দিয়েছিলেন, বিবস্বত তা মনুকে† দান করেন। মনু আবার তা সূর্যবংশোদ্ভব ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এমনি করে লোকপরম্পরাক্রমে রাজযোগ ঋষিদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে এই জড়যুগ পর্যন্ত।‡ তারপর ব্রাহ্মণদের মন্ত্রগুপ্তি আর মানুষের উদাসীনতার দরুণ এই পরমপবিত্র জ্ঞান ক্রমশঃ দুর্লভই হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীন ঋষি, যোগের সর্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা যোগাচার্য পতঞ্জলি "ক্রিয়াযোগে"র

---

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

**শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—পঞ্চম অধ্যায়, ২৭-২৮ শ্লোক।

†মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার সুপ্রাচীন রচয়িতা। এই সকল মানবধর্মশাস্ত্রানুমোদিত রীতিনীতি বা প্রথা অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত।

‡হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জড়যুগের আরম্ভ ৩১০২ খৃঃ পূর্বাব্দে। ঐ বৎসর ১২,০০০

বিষয় দুইবার উল্লেখ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "ক্রিয়াযোগ হচ্ছে শরীরনিষ্ঠা, মানসিক সংযম আর প্রণবধ্যান।"* পতঞ্জলি ব্রহ্মকে নাদরূপে বর্ণনা করে গেছেন, ধ্যানে যা প্রণবধ্বনি বা ওঙ্কাররূপে শোনা যায়।** এই ওঙ্কারধ্বনিই সৃষ্টির আদিমূল, আর এর ঝঙ্কারই হচ্ছে শক্তিকেন্দ্রের স্পন্দনধ্বনি, ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষ্য।† এমন কি নতুন যারা যোগসাধন শুরু করেছেন, তাঁরাও অন্তরে এই অদ্ভুত প্রণবঝঙ্কার অবিলম্বে শুনতে পান। এইরূপ একটা স্বর্গীয় আনন্দময় আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করে যোগীর স্থির বিশ্বাস হয় যে, তিনি প্রকৃতই স্বর্গরাজ্যের সংস্পর্শে এসেছেন।

পতঞ্জলি প্রাণসংযম বা "ক্রিয়াযোগের" বিষয় দ্বিতীয়বার এই বলে উল্লেখ করেছেন যে, "শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করে যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাতেই মুক্তিলাভ ঘটে।"‡

সেণ্ট পলও "ক্রিয়াযোগ" বা তদনুরূপ কোন প্রণালী জানতেন, যাতে

বর্ষব্যাপী বিষুব চক্রের শেষ অবরোহী দ্বাপরযুগের তখন সূচনা (১৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং বিরাট বিশ্বচক্রের কলিযুগেরও আরম্ভ। ১০,০০০ বৎসর পূর্বে মানবজাতি যে এক বর্বর প্রস্তরযুগের অন্ধতমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল এই কথা বিশ্বাস ক'রে অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদেরা লেমুরিয়া, অ্যাটলাণ্টিস, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, মিশর, মেক্সিকো ও অন্যান্য বহু দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যাদি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্তই "কাল্পনিক" বলে হেসে উড়িয়ে দেন।

*যোগসূত্র, (সাধনপাদ ১ সূত্র)।

"ক্রিয়াযোগ" কথাগুলির ব্যবহারে পতঞ্জলি হয় সেই প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা পরে বাবাজী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়, নয়ত এর নিকটতম কোন প্রক্রিয়া। পতঞ্জলি যে প্রাণ-সংযমনের একটা নির্দিষ্ট প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণ পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদের ৪৯ শ্লোকেই পাওয়া যায়।

**পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ২৭ সূত্র।

†"যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্য সাক্ষ্যস্বরূপ, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই কথা বলেন।" রিভিল্যেশন্ ৩:১৪ (বাইবেল)।

"আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে (সংযুক্ত) ছিলেন এবং বাক্যেই ঈশ্বর ছিলেন—সব কিছুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল (বাক্য, নাদ বা প্রণব); যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।" জন ১ ; ১—৩ (বাইবেল)।

বেদের "ওম্" তিব্বতীদের পবিত্র মন্ত্র "হুঁ"তে পরিণত হয়েছে, মুসলমানদের আমিন আর মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, ইহুদী এবং খৃস্টানদের "আমেন"। হিব্রুতে এর অর্থ হচ্ছে ধ্রুব, বিশ্বস্ত।

‡পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ ৪৯ সূত্র)

করে তিনি ইন্দ্রিয়সমূহতে বা তা হতে প্রাণশক্তি প্রবাহকে চালিত করতে পারতেন। এতে করেই তিনি একথা বলতে পেরেছেন যে, "যীশুখ্রিস্টে যে পরমানন্দ লাভ করি, তাতে আমি নিশ্চয় করে বলছি যে প্রত্যহই আমার মৃত্যু ঘটে।"* প্রক্রিয়াবিশেষে শরীরস্থ সমস্ত প্রাণশক্তিকে (যা সাধারণতঃ বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে পরিচালিত হয়) অন্তরে বশীভূত করে সেণ্ট পল প্রত্যহই খ্রিস্টচৈতন্যে পরমানন্দের সঙ্গে প্রকৃত যোগসাধন করতে পারতেন। সেই পরমানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি সজ্ঞানে বুঝতে পারতেন যে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মায়িক জগতে তিনি বাহ্যতঃ একেবারে মৃত বা ইন্দ্রিয়বিকার রহিত।

সবিকল্পসমাধির প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তের চৈতন্য পরমাত্মার মধ্যে ডুবে যায়; শরীর হতে প্রাণশক্তি প্রত্যাহৃত হয়ে শরীরকে নিশ্চল, কঠিন বা মৃতবৎ দেখায়। যোগী তাঁর শরীরের স্তম্ভিত প্রাণশক্তিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। নির্বিকল্পসমাধির মত উচ্চতর অবস্থা ক্রমশঃ প্রাপ্ত হলে, শরীর স্থির না করেও আর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, এমন কি সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন করবার মধ্যেও, যোগী পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।†

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন, " 'ক্রিয়াযোগ' হচ্ছে এমন একটি উপায় যার দ্বারা মানবজাতির বিবর্তন খুব দ্রুত সাধিত হতে পারে। প্রাচীন যোগীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের রহস্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এ হচ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব আর অমর দান। প্রাণশক্তি—যা সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড পরিচালনায় ব্যয়িত হয়, তা অবিরাম শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্থির করবার প্রণালী দ্বারা উচ্চতর সাধনের জন্য মুক্ত করা আবশ্যক।"

"ক্রিয়াযোগী" মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রাণশক্তিকে তাঁর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রের (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা) মধ্য দিয়ে আরোহণ ও অবরোহণ করান। এই ছয়টি চক্র বিশ্বমানবের প্রতীক দ্বাদশটি রাশির রাশিচক্রের সমান। মানুষের অনুভূতিসম্পন্ন মেরুদণ্ডের উপর চতুর্দিকে

*১ করিন্থিয়ান ১৫:৩১ (বাইবেল)।

†বিকল্প—ভেদ, সংশয়। "সবিকল্প"—সমাধি-বিশেষ; এতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের বোধ লুপ্ত হয় না। "নির্বিকল্প সমাধি"—অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-ভেদরহিত চিত্তসংস্থান। সবিকল্প সমাধি অবস্থায় ভক্ত তখনো অনুভব করেন যে তিনি ঈশ্বরের থেকে সামান্য পৃথক রয়েছেন। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় নিজেকে তাঁর আত্মা রূপে বোধ জন্মায়।

আধমিনিট শক্তিকে আবর্তিত করলে, তার বিবর্তনের সূক্ষ্ম উন্নতি সাধিত হয়। আধমিনিট এইরূপ "ক্রিয়া" একবৎসরের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের সমান।

সর্বদর্শী তৃতীয় নেত্ররূপ সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ছয়টি (মেরুপ্রবণতা দ্বারা দ্বাদশটি) নক্ষত্রমণ্ডলবিশিষ্ট মানুষের সূক্ষ্ম (আতিবাহিক) দেহের সঙ্গে বহির্জগতের সৌরমণ্ডলস্থিত সূর্য ও রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির সহিত একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। সকল মানুষই তাই অন্তঃ আর বহির্বিশ্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, মানুষের পার্থিব আর দিব্য অবচার বা প্রতিবেশ প্রতি বার বৎসরের আবর্তনে তাকে স্বাভাবিক পথে অগ্রসর করে দেয়। শাস্ত্র অবিসংবাদিতরূপে এ সত্য নির্ধারিত করে গেছে যে, মানবমস্তিষ্ককে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যথোচিতভাবে উপযোগী করে তুলতে গেলে মানবের দশলক্ষ বৎসরের স্বাভাবিক আর নীরোগ বিবর্তনের প্রয়োজন।

সাড়ে আটঘণ্টায় এক হাজারবার "ক্রিয়া"যোগের অভ্যাস করলে একদিনে যোগীর একহাজার বছরের স্বাভাবিক বিবর্তনের সমান উন্নতি সাধিত হয়; আর এক বৎসরে ৩,৬৫,০০০ হাজার বৎসরের বিবর্তন, আর তিন বৎসরে "ক্রিয়াযোগী" সুনিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই একই ফললাভ করতে পারেন, যা সম্পন্ন করতে প্রকৃতির লাগে দশ লক্ষ বৎসর! অবশ্য খুব উচ্চস্তরের যোগীরা "ক্রিয়া"সাধনের আরও দ্রুততর আর সুগম পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে এরূপ বহু যোগীরা গভীর সাধনাবলে তাঁদের শরীর আর মস্তিষ্ককে সেই অপরিমেয় শক্তিধারণের উপযোগী করে সযত্নে গড়ে তুলেছেন।

"ক্রিয়াযোগ" সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধক দৈনিক দুইবার, চৌদ্দ হতে আটাশবার সাধনের অভ্যাস করেন। কতকগুলি যোগীর ছয়, বার, চব্বিশ অথবা চুয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যেই মুক্তিলাভ ঘটে। পূর্ণজ্ঞানলাভের পূর্বেই যে যোগীর মৃত্যু ঘটে, তাঁর "ক্রিয়াযোগ" সাধনজনিত শুভ কর্মফল তাঁর সঙ্গেই যায়। আর তা তাঁর নূতন জন্মলাভে সেই অনন্তের লক্ষ্যপথে তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত করে।

সাধারণ মানবদেহ একটা পঞ্চাশওয়াট ইলেকট্রিক বাতির মত, কাজেই তা "ক্রিয়াযোগ"সাধনজনিত দশকোটিওয়াটের মত অত্যধিক শক্তিধারণক্ষম হতে পারে না। "ক্রিয়াযোগে"র নির্ভুল সহজ সাধনপ্রণালীর নিয়মিত আর ক্রমিক অনুশীলন দ্বারা মনুষ্যশরীরে দিন দিন আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধিত হয়; অবশেষে

পরব্রহ্মের সগুণ ও সক্রিয় প্রথম প্রকাশ সেই দেহ অসীম বিশ্বশক্তি প্রকাশের আধার হবার উপযুক্ত হয়ে উঠে।

কতকগুলি ভ্রান্ত "হাতুড়ে" গোছের লোকদের দ্বারা প্রদত্ত অবৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধের প্রণালীর সঙ্গে "ক্রিয়াযোগের" কোনই সামঞ্জস্য নাই। জোর করে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু পুরে রাখবার চেষ্টা শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, অত্যন্ত অস্বস্তিকরও; কিন্তু "ক্রিয়া" সাধনের প্রথম অবস্থা থেকেই সাধকের মনে একটা অভূতপূর্ব শান্তির অনুভূতি আর মেরুদণ্ডে নবশক্তি সঞ্চারজনিত ফললাভের মত একটা অত্যন্ত আরামদায়ক অনুভূতি জন্মে।

এই প্রাচীন যৌগিকপ্রক্রিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসকে মানসসত্তায় রূপান্তরিত করে। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধক শ্বাসপ্রশ্বাসকে মনেরই ক্রিয়া, একটা মানসিক ধারণা বলে জানতে পারেন—যেন স্বপ্নের শ্বাসপ্রশ্বাস।

মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আর তার চেতনা বা বাহ্যজ্ঞানের অবস্থার তারতম্যে যে একটা গাণিতিক সম্বন্ধ আছে, তার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোন মানুষের প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সময়, যেমন কোন কূটবিষয়ের গভীরপান্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক অনুধাবন করবার সময় অথবা কোন কঠিন, দুঃসাধ্য বা বিপজ্জনক শারীরিক ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনের সময়, তার শ্বাসপ্রশ্বাস আপনা-আপনিই অতি ধীরে ধীরে চলে। মনঃসংযোগের প্রগাঢ়ত্ব ধীর শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে। খুব দ্রুত আর অসমান নিশ্বাসপ্রশ্বাস ভয়, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর ভাবাবেগ সূচনা করে। অস্থির বানরের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মিনিটে ৩২ বার আর মানুষের সাধারণতঃ ১৮ বার। হাতী, কচ্ছপ, সাপ প্রভৃতি যাদের আয়ু খুব দীর্ঘ, তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস মানুষের চেয়েও কম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মহাকুর্ম, যারা ৩০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে পারে, মিনিটে কেবলমাত্র ৪ বার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে।

নিদ্রার যে ক্লান্তি অপনোদিনী সঞ্জীবনীশক্তি আছে, তার কারণ মানুষ সাময়িকভাবে তার শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভুলে যায়। নিদ্রাকালে শ্বাসপ্রশ্বাস অনেক ধীর গতিতে এবং সমভাবে প্রবাহিত হয়। ঘুমন্ত মানুষ একজন যোগীই হয়ে যায়; প্রতিরাত্রেই নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজেকে দেহাত্মবোধ হতে মুক্ত করবার যৌগিকপ্রক্রিয়া সাধন করে আর তার প্রাণশক্তি-প্রবাহকে মস্তিষ্কের প্রধানস্থল আর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রস্থিত শক্তি-উৎসের সঙ্গে মিলিত করে। নিদ্রিতমানব এই প্রকারে নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্বশক্তির দ্বারা প্রতিপূরিত হয়, যা সকল জীবন বাঁচিয়ে রাখার আশ্রয়স্থল।

সাধনেচ্ছু যোগী, মন্দগতি নিদ্রিত মানবের মত অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই

একটি সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সাধন করেন। "ক্রিয়া"যোগী তার শরীরকোষগুলি অমর প্রাণের আলোকে পূর্ণ ক'রে তাদের আধ্যাত্মিক চুম্বকধর্মী অবস্থায় রাখবার জন্য প্রক্রিয়ার অনুশীলন করেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় করে তোলেন আর (সাধনকালে) তাঁকে আর নিদ্রা, অজ্ঞান বা মৃত্যুর নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ও প্রবেশ করতে হয় না।

মায়া বা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন মানুষের মধ্যে তার প্রাণশক্তিপ্রবাহ বহির্জগতের দিকে ধাবিত ; এই শক্তিপ্রবাহ ইন্দ্রিয়বিষয় গ্রহণজনিত অপব্যবহারে ও অবক্ষয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়। "ক্রিয়া"সাধন দ্বারা উক্ত প্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়ে মানসিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত হয় এবং মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির সহিত পুনর্মিলিত হয়। প্রাণশক্তির এরূপ সুদৃঢ়ীকরণে যোগীর দেহ এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি আধ্যাত্মিক অমৃতে নবজীবন লাভ করে।

উপযুক্ত আহার, সূর্যালোক আর সুসমঞ্জস চিন্তার মধ্য দিয়ে মানুষ, যা কেবল প্রকৃতি ও তার দৈবী পরিকল্পনার দ্বারাই চালিত হয়—তাতে তার আত্মোপলব্ধি সাধন করতে লাগবে দশলক্ষ বৎসর। মস্তিষ্কের গঠনের ঈষৎ পরিবর্তনও সাধিত করতে হলে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় জীবনযাপন আবশ্যক ; আর ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশের জন্য মস্তিষ্কের স্থান যথোপযুক্তরূপে পরিষ্কার করে নিতে গেলে অন্ততঃ দশলক্ষ বৎসর একান্ত আবশ্যক। "ক্রিয়াযোগী" কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মের সযত্ন-পালনের দীর্ঘ প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেন।

শরীরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনের শ্বাসগ্রন্থিচ্ছেদ ক'রে "ক্রিয়া" জীবনকে সুদীর্ঘ আর জ্ঞানকে অনন্তের দিকে প্রসারিত করে। যোগপ্রণালী মন আর জড়সংবদ্ধ ইন্দ্রিয়দের মধ্যে টানাটানি থামিয়ে দিয়ে সাধককে তার অনন্ত-সাম্রাজ্য পুনরধিকারের জন্য মুক্তি এনে দেয়। তখন সে জানতে পারে যে তার স্বরূপ জড়শরীরে বা শ্বাসপ্রশ্বাসে আবদ্ধ নয়—যেটা মরণশীল মানবের প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নতিস্বীকার—বায়ুর দাসত্বের প্রতীক !

শরীর ও মনের অধীশ্বর হয়ে "ক্রিয়া"যোগী অবশেষে তার "অন্তিম শত্রু"* মৃত্যুর উপর জয়ী হয়।

---

*"শেষ শত্রু যা বিনষ্ট হবে তা হচ্ছে মৃত্যু।"—১ করিন্থীয় ১৫ : ২৬ (বাইবেল)। পরমহংস যোগানন্দর উৎক্রমণের পর তাঁর দেহের অবিকৃতি প্রমাণ করেছে যে, তিনি একজন পূর্ণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত "ক্রিয়াযোগী" ছিলেন। সকল মহান্ গুরুগণই যে মহাপ্রয়াণের পর দেহের অবিকৃতি প্রদর্শন করেন তা নয়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটে কোন

"মরণের 'পরে জয়ী হবে তুমি, মানুষে যে করে জয়,
'মরণ' একবার মরিলে তখন, রবে না মরণভয়।"*

"অন্তর্দর্শন বা মৌনাবলম্বন" প্রাণশক্তিতে আবদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়দের সজোরে পৃথক করার এক অবৈজ্ঞানিক উপায়। চিন্তাশীল মন, ঈশ্বরত্বে ফিরে যাবার প্রচেষ্টায় এই প্রাণশক্তি দ্বারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বারম্বার আকৃষ্ট হয়। প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত করবার জন্য "ক্রিয়া"ই হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা সহজ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পথে মন্থরগতি, অনিশ্চিত, গরুরগাড়ীর মত চলার ব্যবস্থার জায়গায় "ক্রিয়া"কে ঠিকমত বলা যেতে পারে এরোপ্লেনের গতি ।

যোগবিজ্ঞান সর্বপ্রকার মনঃসংযোগ আর ধ্যানধারণার ভূয়োদর্শনের ফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগের দ্বারা সাধক ইচ্ছামাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হতে প্রাণশক্তি প্রত্যাহার বা তাতে সংযোগ করতে পারেন। ইন্দ্রিয়বোধ হতে বিচ্ছিন্ন হবার এই শক্তি পেয়ে যোগী ইচ্ছামাত্র তাঁর মনকে ঈশ্বরভাবে অথবা সাংসারিকভাবে যুক্ত করতে পারেন। আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা আর উন্মত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারবিশিষ্ট এ পার্থিব জগতে ফিরে আসতে হয় না।

উন্নত "ক্রিয়াযোগী"র জীবন, তাঁর প্রাক্তন কর্মফলের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র তাঁর আত্মার নির্দেশ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। সাধক এই প্রকারে সাধারণ জীবনের সদসৎ আত্মপ্রধান কর্মের কুটিল ও শম্বুকগতির বিবর্তন ধারা এড়িয়ে গিয়ে দ্রুতগতি লাভ করেন।

এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী দ্বারা যোগী তাঁর দেহাত্ম-বোধের কারা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বব্যাপিত্বের গভীর মুক্তবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। এর তুলনায় প্রাকৃতিক জীবনযাপন যেন দাসত্বে আবদ্ধ হওয়া, আর তার গতিও অত্যন্ত মন্থর। কেবলমাত্র বিবর্তনের ধারার সাথে জীবন বেঁধে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কোন সুবিধাজনক দ্রুতোন্নতি আদায় করে নিতে পারে না। শরীর আর মনের নিয়ন্ত্রণবিধি লঙ্ঘনের প্রমাদশূন্য হয়ে জীবনযাপন করলেও পরামুক্তিলাভের জন্য তাকে দশলক্ষ বৎসর ধরে জীবনমরণের মিছিলে নানাবিধ রূপ ধরে চলতে হয়।

বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য। পরমহংস যোগানন্দজীর ক্ষেত্রে এই "বিশেষ উদ্দেশ্য"টি ছিল নিঃসন্দেহে প্রতীচ্যকে যোগের মূল্য বিশ্বাস করান। (প্রকাশকের মন্তব্য)।

*শেক্সপিয়ার—সনেট১৪৬।

তাই যারা এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ধারার মধ্যদিয়ে অতিদীর্ঘ অনিশ্চিত সাধনার পথের দিকে ক্লান্তি, ভয় আর বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রোহদৃষ্টিতে তাকায়, তাদের জন্য আত্মোৎকর্ষসাধনের পক্ষে জীবভাব বা দেহাত্মবোধের হাত হতে মুক্ত হবার জন্য যোগীদের এই অতিদ্রুত ফলপ্রসূ প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন পন্থা নাই। সাধারণ মানুষ, যার আত্মার কথা দূরে থাক, কেবলমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেও সামঞ্জস্য বা যোগ রেখে যে চলতে পারে না,—যে প্রকৃতির শান্ত ও স্নিগ্ধ সাম্যভাব অবহেলা করে তার পরিবর্তে অস্বাভাবিক চিত্তবৈকল্যই অনুসরণ করে চলে, তার পক্ষে এই সংখ্যার পরিধি খুবই বর্ধিত হয়। তার জন্য দশলক্ষ বৎসরের দ্বিগুণেও মুক্তিলাভের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি না সন্দেহ।

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ত বা একেবারেই বুঝতে পারে না যে, তার দেহ একটি সাম্রাজ্য বিশেষ আর তা সম্রাট পরমাত্মারই অধীন এবং মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছয়টি চক্র অথবা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সহকারী রাজপ্রতিনিধিদল নিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের সিংহাসনে বসে তিনি তা শাসন করছেন। এই ঈশ্বরতন্ত্র এক বিরাট অনুগত প্রজামণ্ডলীর উপর বিস্তৃত; তার মধ্যে আছে ২৭ লক্ষ কোটি কোষ—(সুনিশ্চিত আর সহজবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, যাতে করে তারা শরীরের বৃদ্ধি, পরিবর্তন এবং তার ক্ষয় এ সব কর্তব্যই পালন করে) আর মানুষের গড়পড়তা আয়ু ষাটবছরের জীবনে পাঁচকোটি অধস্তন স্তরের চিন্তা, ভাবাবেগ এবং তার জ্ঞানরাজ্যের বৈচিত্র্য, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক বিভিন্ন অবস্থাসমূহ।

পরমাত্মাসম্রাটের বিরুদ্ধে কোন আপাতদৃষ্ট শরীর বা মস্তিষ্ককোষের বিদ্রোহ, যা রোগ বা মানসিক বিশৃঙ্খলারূপে প্রকাশিত হয়,—তা ঐসব অনুগত প্রজাদের সম্রাটের প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ নয়,—তা কেবল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের, অতীত বা বর্তমান অপব্যবহার হতে উদ্ভূত—যে স্বাধীন ইচ্ছা ভগবান তার আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন আর তা কখনও ফিরিয়ে নেবার কল্পনাও করেন নি।

একটা সঙ্কীর্ণ অহংভাবে মত্ত হয়ে মানুষ ভাবে যে, একমাত্র সে-ই কেবল চিন্তা করে, ইচ্ছাপ্রকাশ করে, অনুভব করে, অন্ন পরিপাক করে, নিজের চেষ্টাতেই প্রাণ বজায় রাখে—কিন্তু কখনও চিন্তা ক'রে (সামান্যমাত্র হলেই যথেষ্ট হয়।) স্বীকার করে না যে তার সাধারণজীবনে সে কেবলমাত্র তার প্রাক্তন কর্ম আর প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস—তাদের হাতে কাষ্ঠপুত্তলিকামাত্র। প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি, ভাবধারা, মানসিকগতি আর অভ্যাস সবই অতীত কারণে সীমিত—তা সে এজন্মেরই হোক

বা পরজন্মেরই হোক। এসব প্রভাবের বহু বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত তার রাজোচিত আত্মা! নশ্বরসত্য আর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে "ক্রিয়া"যোগী সকল মায়ামোহ পরিহার করে মুক্তাত্মায় পরিণত হন। সকল শাস্ত্রেই বলে যে মানুষ ক্ষণভঙ্গুর দেহমাত্র যে তা নয়, সে জীবন্ত প্রাণবন্ত আত্মা; আর এই "ক্রিয়া"সাধনেই এমন একটি প্রণালী পায়, যাতে সে শাস্ত্রীয় সত্য প্রমাণ করে দেয়।

শঙ্করাচার্য তাঁর সুবিখ্যাত "বৈরাগ্যশতকে" লিখে গেছেন, "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মালে বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞান নাশ করতে পারে না, কেবল আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকার দূর করতে পারে। পরিপ্রশ্ন ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 'আমি কে? নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে? কে এর সৃষ্টিকর্তা? এর আধিভৌতিক কারণ কি?' এইগুলিই হচ্ছে প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়।"

শুধু বুদ্ধিতে এরূপ সব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না—তাই ঋষিরা আধ্যাত্মিক প্রশ্নসমাধানের উপায়ের জন্য যোগ উদ্ভাবন করে গেছেন।

প্রকৃত যোগীরা তাদের সকল প্রকার মনন, ইচ্ছা আর দেহকামনাজাত সকল প্রকার অনুভূতির সঙ্গে মিথ্যা একাত্মবোধ সযত্নে পরিহার করে মেরুদণ্ডস্থিত চক্রসমূহের অতীন্দ্রিয়জ্ঞানশক্তির সহিত মনকে সংযুক্ত করে ঈশ্বরকল্পিত এ জগতে বাস করেন, অতীতের কোন প্রেরণাবশতঃও নয় বা মানব প্রবৃত্তিজাত নূতন কোন প্রজ্ঞাহীনতার জন্যও নয়। এরূপ যোগীরাই তাঁদের চরম আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ করে সেই অসীম অনন্ত ব্রহ্মানন্দের পরম আশ্রয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

সুসম্বন্ধ প্রণালীতে যোগসাধনের নিশ্চিত ফললাভের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে নিষ্ঠাবান্ যোগীর বিষয় নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করে গেছেন,—তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।"*

---

*আধুনিক বিজ্ঞান শরীর আর মনের উপর শ্বাসহীনতার অসাধারণ নিরাময়কারী ও পুনরুজ্জীবক ফলের বিষয় আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। নিউ ইয়র্কস্থিত কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জন্স-এর ডাঃ অ্যালভান এল ব্যারাক একটি স্থানীয় শ্বাসযন্ত্র বিরাম চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছেন যাতে বহু ক্ষয়রোগী স্বাস্থ্য লাভ করেছে। সমপ্রেষ কক্ষের ব্যবহারে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করতে পারে। ১৯৪৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক টাইম্‌সে ডঃ ব্যারাকের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়:—

ক্রিয়াযোগই হচ্ছে সেই আসল "অগ্নিযজ্ঞ", ভগবদ্গীতায় যার বিষয় উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। যোগী সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের অগ্নিযজ্ঞে তার যা কিছু পার্থিব বাসনাকামনা সব আহুতি প্রদান করেন। এই হচ্ছে প্রকৃত যৌগিক অগ্নিযজ্ঞ, যাতে করে অতীত ও বর্তমান কামনাবাসনা সকল ঈশ্বরপ্রেমের অগ্নিতে যজ্ঞোপকরণরূপে ভস্মসাৎ করা হয়। সেই "চরম শিখা" মানবের সকল প্রকার ভ্রান্তিপ্রমাদের আহুতি গ্রহণ করেন—আর মানব সর্বপ্রকার ক্লেদ হতে মুক্ত হয়। তার কর্মের কঙ্কালাস্থিসকল কামনাবাসনার মেদ-মাংসমুক্ত হয়ে জ্ঞানসূর্যের বিশুদ্ধকারী কিরণের তেজে শুচিশুভ্র হয়ে, মানুষ বা তার সৃষ্টিকর্তা উভয়েরই কাছে নির্দোষ থেকে অবশেষে একেবারে পরিশুদ্ধ হয়।

"কেন্দ্রীয় তন্ত্রিকা-তন্ত্রে শ্বাসের বিরতির ফল অতীব আগ্রহোদ্দীপক। হস্তপদাদির ঐচ্ছিক পেশীসকল সঞ্চালনের বেগ অদ্ভুতভাবে কমে যায়। রোগী তার বক্ষে হাত না নেড়ে বা অবস্থানের কোন পরিবর্তন না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুয়ে থাকতে পারে। ঐচ্ছিক শ্বাসপ্রশ্বাস যখন বন্ধ হয় তখন ধূমপানেচ্ছাও অন্তর্হিত হয়,—এমন কি তাদের মধ্যেও, যারা দৈনিক দু'প্যাকেট করে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। বহু উপলক্ষ্যে এই বিরাম এরূপ ধরণের হয় যে তার কোন আমোদপ্রমোদের প্রয়োজন হয় না।" ১৯৫১ সালে ডাঃ ব্যারাক এই চিকিৎসার উপকারিতা প্রকাশ্যে সমর্থন করে বলেছিলেন যে, "শুধু যে ফুসফুসকেই বিশ্রাম দেয় তা নয়, সমস্ত শরীরটাকেও এবং আপাতদৃষ্টিতে মনকেও বিশ্রাম দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হৃৎপিণ্ডেরও কাজ এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। আমাদের রোগীদের উদ্বেগ কমে যায়, কেউই বিরক্তি বোধ করে না।"

এই সব ঘটনা হতে লোক বুঝতে পারে যে, চাঞ্চল্য প্রকাশের কোন মানসিক বা শারীরিক বেগবিহীন হয়ে যোগীরা কি করে দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে। কেবল মাত্র এই রকম শান্ত নীরবতার মধ্য দিয়েই জীবাত্মা পরমাত্মায় প্রত্যাবর্তনের পথের সন্ধান পায়। শ্বাসহীনতার কতকগুলি উপকারিতা লাভ করতে গেলে যদিও সাধারণ লোকেদের সমপ্রেষ কক্ষে অবশ্যই থাকতে হয়, যোগীর কিন্তু শরীর ও মনে এবং আত্মবোধের পুরস্কার লাভ করতে গেলে "ক্রিয়াযোগের" প্রণালী ছাড়া আর কিছুরই দরকার করে না।

২৭শ পরিচ্ছেদ

রাঁচিতে যোগবিদ্যালয় স্থাপন

গুরুদেব একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "সংগঠন কাজে তোমার বিরাগ কেন?" শুনে চমকে উঠলুম। সত্যই সে সময়ে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু "ভীমরুলের চাক।"

বললুম, "এসব কাজে কোন লাভ নেই গুরুদেব। নেতারা কিছু করুক আর নাই করুক—তাদের সমালোচনা হবেই!"

কঠিনদৃষ্টির সঙ্গে গুরুদেব উত্তর করলেন, "স্বর্গের সুধা কি তুমি সবটা একলাই খেতে চাও নাকি? যদি না দয়ার অবতার সদ্‌গুরুগণ অপরকে তাঁদের জ্ঞান বিতরণ করতে ইচ্ছুক হতেন, তা হলে তুমি বা আর কেউ কখন কি যোগের দ্বারা ভগবৎসঙ্গ লাভ করতে পারতে?" তারপর তিনি বললেন, "ভগবান হচ্ছেন মধু, আর তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সব মধুচক্র; অতএব দুটোরই প্রয়োজন আছে। অবশ্য পরমাত্মার সংস্পর্শবিহীন বাহ্যিক কোন আকার নিরর্থক, কিন্তু তুমিই বা অধ্যাত্ম অমৃতপূর্ণ কর্মমুখর মধুচক্র সৃষ্টি করার উদ্যোগ করবে না কেন?"

তাঁর উপদেশ আমার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুললে। বাইরে কোন উত্তর না দিলেও আমার মনে এক দৃঢ়সংকল্পের উদয় হল। গুরুপদতলে বসে যে মুক্ত সত্যের শিক্ষালাভ করেছি—তা আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে উপলব্ধি করব। প্রার্থনা করলুম, "ভগবান্, আমার ভক্তিতীর্থে তোমারই প্রেম যেন চিরউজ্জ্বল থাকে আর আমি যেন তোমার প্রেম সকলের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি।"

সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পূর্বে কোন এক উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটি অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "দেখ, বৃদ্ধ বয়সে তোমার একটি স্ত্রীর সাহচর্যের প্রয়োজন কত বেশী বোধ করতে হবে, তা জান? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে, গৃহস্থব্যক্তি স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণরূপ কর্তব্যে নিরত থেকে ভগবানের চক্ষে পুণ্য কাজই করেন?"

সভয়ে আমি প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলুম, "গুরুদেব, আপনি জানেন যে

এ জীবনে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া, বিয়েটিয়ে করা নয়।"

গুরুদেব এত উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন যে তখন আমি বুঝতে পারলুম যে, তিনি আমার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্যই মন্তব্যটি করেছেন, আর কিছু নয়।

তারপর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "স্মরণ রেখো যে, কেউ যদি তার সাংসারিক কর্তব্য পরিহার করে, তাহলে তার সমর্থনে তাকে আরও বৃহত্তর পরিবারের কোন রকম দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।"

বালকদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আদর্শ আমার মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। সাধারণ শিক্ষা, যার লক্ষ্য কেবল শরীর আর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন, তার বিষময় ফল আমি স্পষ্টই দেখেছিলুম। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য, যার অভাবে কোন লোকই প্রকৃত সুখের কাছে অগ্রসর হতে পারে না, তার প্রয়োজন এখনও রয়েছে। মনে মনে স্থির করলুম যে এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করব, যাতে সুকুমারমতি বালকগণ পূর্ণ মানবত্বের আদর্শে গঠিত হতে পারে। সেই দিকে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হল বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, ডিহিকায়, সাতটিমাত্র ছেলে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা।

বছরখানেক পরে, ১৯১৮ সালে, কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বদান্যতায় আমার দ্রুতবর্ধনশীল ছাত্রদলটিকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হল। কলকাতা হতে প্রায় দুশ মাইল দূরে বিহারের এই সহরটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত। রাঁচিতে কাশিম-বাজারের রাজপ্রাসাদকে নূতন বিদ্যালয়ের প্রধানকেন্দ্রে পরিণত ক'রে নাম দিলুম, "যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য* বিদ্যালয়"।

রাঁচিতে প্রাথমিক আর উচ্চ বিদ্যালয় এই উভয়বিধ ধারা অনুযায়ী শিক্ষা-দানের কার্যক্রম প্রবর্তন করা হল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিদ্যালয়ে পঠিতব্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে। মুনিঋষিদের বিদ্যাদানের আদর্শ (যাঁদের অরণ্য-আশ্রম ছিল ভারতীয় তরুণদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক

* ব্রহ্মচর্য—এই 'ব্রহ্মচর্য' বৈদিক চতুরাশ্রমের একটি আশ্রম; বাকী তিনটি, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনে এই চারটি আশ্রমের আদর্শ যদিও আধুনিক ভারতে বিস্তৃতভাবে অনুসৃত হয় না, তবু এর প্রতি নিষ্ঠাবান্ বহুলোক আছেন। এই চারটি আশ্রমজীবন পালিত হয় ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে জীবনব্যাপী গুরুর নির্দেশে। রাঁচীস্থ যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয় সম্বন্ধে আরো সংবাদ ৪০ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শিক্ষাদানের প্রাচীন স্থান) অনুসরণ করে আমি ব্যবস্থা করেছিলুম যে ক্লাসের অধিকাংশ পড়াশুনো মুক্ত আকাশতলেই হবে।

রাঁচি ছাত্রদের শেখান হয় যোগ ধ্যান আর একটি স্বাস্থ্য আর শারীরিক উন্নতিসাধনের অপূর্ব প্রণালী, "যোগদা", যার সূত্রগুলি আমি ১৯১৬ সালে আবিষ্কার করেছিলুম।

মানুষের শরীর ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতন উপলব্ধি করে মনে মনে যুক্তিবলে স্থির করলুম যে, এতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রত্যক্ষ মাধ্যমে শক্তি পুনঃসঞ্চারিত করা যেতে পারে। "ইচ্ছা" ব্যতীত কোন প্রকার কার্য করাই যখন সম্ভবপর নয়, তখন মানুষ এই "আদ্যাশক্তি" ইচ্ছার সাহায্য নিয়ে, হাঙ্গামাজনক যন্ত্রপাতি বা কোন রকম যান্ত্রিকব্যায়ামের সাহায্য ব্যতিরেকেই শরীরতন্তুগুলিতে আবার নূতন শক্তি সঞ্চার করতে পারে। সরল "যোগদা" প্রণালী দ্বারা মহাশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সজ্ঞানে আর সদ্যসদ্য প্রাণশক্তি (সুষুম্না শীর্ষক কেন্দ্রে অবস্থিত) পুনঃ সঞ্চারিত করে নেওয়া যেতে পারে।

রাঁচির ছেলেদের "যোগদা" প্রণালী শিক্ষার ফল খুবই ভাল হল। তারা প্রাণশক্তিকে শরীরের একস্থান হতে অপরস্থানে চালিত করবার আর অত্যন্ত কঠিন আসনে সম্পূর্ণ ধীরস্থির হয়ে বসে থাকবার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করল। সহ্যগুণ আর শক্তিপ্রদর্শনের নানাবিধ কৌশল তারা যা দেখিয়েছিল, তা অনেক শক্তিমান বয়স্ক ব্যক্তিরাও দেখাতে পারেন কি না সন্দেহ।

আমার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান্ বিষ্ণুচরণ ঘোষ* রাঁচি বিদ্যালয়ে যোগ দেয়, পরে সে একজন প্রথিতযশা শরীরচর্চাতত্ত্ববিশারদ হয়ে দাঁড়ায়। সে এবং তার একটি ছাত্র ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়ে শক্তি ও পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা প্রদর্শন করে। নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকা আর ইউরোপের অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ শরীরের উপর মনের শক্তির প্রভাব দর্শনে চমৎকৃত হন।

রাঁচিতে প্রথম বৎসরের শেষে প্রবেশলাভের জন্য প্রায় দুইহাজার আবেদনপত্র এসেছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে সে সময় কেবলমাত্র আবাসিক ছাত্রদের জন্য বন্দোবস্ত থাকায়, একশতের বেশী আসন ছিল না। দিবাবিভাগ শীঘ্রই খোলা হয়।

বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য আমায় পিতামাতা উভয়েরই স্থান গ্রহণ করতে

---

* বিষ্ণুচরণ ঘোষ ১৯৭০ সালের ৯ই জুলাই কলকাতায় পরলোক গমন করেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

হত আর সংগঠনকাজের জন্য অনেক হাঙ্গামাও পোহাতে হত। যীশুখ্রিস্টের সেই কথাগুলি আমি প্রায়ই স্মরণ করতুম, "আমি নিশ্চয় করে বলছি, আমার জন্যে এবং বাইবেলের সত্যের জন্যে এমন কোন লোক নাই যে বাড়ীঘরদুয়ার, ভ্রাতাভগিনী, পিতামাতা, অথবা স্ত্রীপুত্র বা জমিজমা ছেড়েছে—সে কিন্তু অত্যাচার সহ্য করলে এখন, ইহকালে, ভাইভগিনী, মাতাপুত্র, জমিজমা শতগুণ ফিরে পাবে ; আর জন্মান্তরে অনন্ত জীবন পাবে।"*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কথাগুলির এইরকম ব্যাখ্যা করেন :—"যে ভক্ত বিবাহ আর সংসারে প্রবেশলাভের অভিজ্ঞতা ত্যাগ করে ক্ষুদ্রসংসার আর সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তে সাধারণভাবে সমাজসেবার (ইহজীবনে এখন শতগুণে বাড়ীঘর এবং ভাইভগিনী) বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাতে করে সে এমন একটা কর্মভার গ্রহণ করে, যাতে অবুঝ সংসারের অত্যাচার জড়িত থাকে বটে, কিন্তু এরূপ একটা বৃহত্তর ঔদার্যে সাধকের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়ে তার এক স্বর্গীয় পুরস্কার লাভ হয়।"

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে** চাকরী গ্রহণ না করার দরুণ পিতা মনে আঘাত পেয়েছিলেন বলে অনেক দিন তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি ; একদিন তিনি রাঁচিতে এলেন স্নেহাশীর্বাদ দান করবার জন্য, বললেন, "বাবা, জীবনে তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তা আমি মেনে নিয়েছি। এই সব আনন্দোৎসুক স্বর্গের শিশুদলের মধ্যে তোমায় দেখে আমি খুবই আনন্দিত। রেলের শুষ্ক, প্রাণহীন টাইমটেবল আর হিসাবপত্রের মধ্যে ডুবে থাকার চেয়ে এখানেই তোমায় বেশী মানায় ; এই-ই হচ্ছে তোমার আসল উপযুক্ত স্থান।" ডজনখানেক ছোট ছোট শিশুরদল পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; আনন্দচঞ্চল দৃষ্টিতে তাদের দেখিয়ে পিতা হেসে বললেন, "আমার আটটি ছিল, কিন্তু তোমার—যাক্, আমি বেশ টের পাচ্ছি!"

প্রায় সত্তর বিঘার বিরাট উর্বর জমি আমাদের হাতে। ছাত্র, শিক্ষকগণ ও আমি সকলে মিলে প্রাত্যহিক উদ্যানচাষ ও বাইরের কাজে বহুসময় আনন্দে কাটিয়েছি। আমাদের অনেকগুলি প্রিয় পোষা জীবজন্তু ছিল, তার মধ্যে ছিল একটি হরিণ, ছেলেদের চোখের মণি। হরিণশিশুটিকে আমিও এত ভাল বাসতুম যে সেটিকে আমার ঘরেই রাত্রে ঘুমোতে দিতুম। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণশিশুটি আমার বিছানার কাছে খুটখুট করে আসত, সকালবেলায় একটু আদর পাবার লোভে!

---

*মার্ক ১০: ২৯-৩০ (বাইবেল)।

**বর্তমানে সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

একদিন আমি বাচ্ছাটিকে একটু সকাল-সকালই খাইয়ে দিলুম। একটু তাড়াতাড়ি ছিল রাঁচিশহরের ভিতর একটা কাজে যেতে হবে। যাবার আগে কিন্তু ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে গেলুম যে হরিণশিশুটিকে কেউ যেন আর কোন কিছু না খাওয়ায়। একটা ছেলে ছিল অত্যন্ত অবাধ্য, বাচ্ছাটাকে খুব খানিকটা দুধ খাইয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে শুনলুম, অত্যন্ত দুঃসংবাদ—"অতিরিক্ত খাওয়ানর ফলে হরিণশিশুটি মরমর।"

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে প্রায় জীবন্মৃত হরিণশিশুটিকে সযত্নে কোলে তুলে নিলুম—অবলা জীব, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, নিঝঝুম মেরে পড়ে রয়েছে দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল। ভগবানের কাছে সকাতরে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম—অসহায় জীবটির প্রাণরক্ষার জন্য। ঘণ্টাকতক বাদে, বাচ্ছাটি চোখ খুললে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত দুর্বল ভাবে চলাফেরা করতে আরম্ভ করলে। সারা বিদ্যালয় আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সেই রাত্রে পেলাম এক দারুণ শিক্ষা—যা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। রাত দুটো অবধি হরিণশিশুটিকে নিয়ে বসে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লুম। স্বপ্নে দেখি হরিণশিশুটি আমায় বলছে,—

"তুমি আমায় ধরে রেখেছ কেন? দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও।"

স্বপ্নেই উত্তর দিলুম, "আচ্ছা বেশ।"

তক্ষুণি জেগে উঠেই চেঁচিয়ে উঠলুম, "ওরে ছেলেরা, হরিণবাচ্ছাটি যে মারা গেল!" ছেলের দল দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এল।

ঘরের কোণের দিকে তাড়াতাড়ি গেলুম, সেখানেই হরিণশিশুটিকে শুইয়ে রেখেছিলুম। আমার দিকে তাকিয়ে একবার ওঠবার শেষ চেষ্টা করলে; তারপর মুখ থুবড়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল, তারপরই সব শেষ।

কর্মফল, যা প্রাণীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, সেই অনুসারে হরিণশিশুটির জীবন অতীত হয়েছে এবং সে আরও উচ্চতর রূপ পরিগ্রহের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার গভীর আকর্ষণ, পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলুম যে তা নিঃস্বার্থ নয়, আর আমার ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারাই আমি তাকে এই পশু আকৃতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছিলুম, যা থেকে তার আত্মা মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছিল। হরিণশিশুটির আত্মা স্বপ্নে আমায় তাকে মুক্তি দেবার জন্য অনুনয়বিনয় করছিল, কারণ ভালবেসে অনুমতি না দিলে, হয় সে যাবে না বা যেতে পারবে না। যেইমাত্র রাজী হলুম অমনি সে চলে গেল।

সব শোকদুঃখ দূর হল; নতুন করে জানলুম যে, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের

কাছে এই চান যে তারা যা কিছু সব তাঁরই অংশ বলে যেন ভালবাসে, আর ভ্রান্তিবশতঃ যেন না মনে করে যে মরণেই সব শেষ। অজ্ঞলোকেরা ভাবে যে দুর্লঙ্ঘ্য মৃত্যু-প্রাচীরের অন্তরালেই তাদের প্রিয় পরিজনবর্গ, আপাতদৃষ্টিতে যেন চিরকালের জন্য একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু অনাসক্ত, সংসার-বিরাগী, যে অপরকে ভগবানেরই প্রকাশ বলে ভালবাসে, সে জানে যে মৃত্যুতে তার প্রিয় আত্মীয়স্বজনবর্গ ঐশ্বরিক পরমানন্দে মগ্ন হবার জন্যই ফিরে গেছে।

ক্ষুদ্র এবং সামান্য সূচনা হতে ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে এখন রাঁচি বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বিহার ও বঙ্গদেশে এখন খুবই সুপরিচিত। প্রাচীন মুনিঋষিদের আদর্শে শিক্ষাপ্রদান প্রচলিত রাখায় যাঁদের আনন্দ, তাঁদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্যেই বিদ্যালয়ের বহু বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়নির্বাহ হয়। মেদিনীপুর, লক্ষ্মণপুর, প্রভৃতি স্থানে উন্নতিশীল শাখাবিদ্যালয়সকল স্থাপিত হয়েছে।

রাঁচি আশ্রমে একটি চিকিৎসা বিভাগ আছে যেখান থেকে ঔষধ আর ডাক্তারদের সাহায্য এদেশের দরিদ্রব্যক্তিদিগকে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় বেশ সুনাম অর্জন করেছে, আর শিক্ষাক্ষেত্রেও রাঁচির বহু স্নাতক পরে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে প্রভূত কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে।

গত তিন দশকের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু মনীষী বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে একে সম্মানিত করেছেন। কাশীর সেই "দুই দেহধারী" সাধু স্বামী প্রণবানন্দ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দিন কতকের জন্য রাঁচিতে এসেছিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষতলে ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং সন্ধ্যাকালে যোগসাধনাকালীন ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে ছোট ছোট ছেলেদের বসে থাকতে দেখে মহান্ গুরু প্রণবানন্দজীর অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

তিনি বলেছিলেন, "দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে যে বালকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। আমার গুরুর আশীর্বাদ এর উপর বর্ষিত হোক্।"

একটি ছোট ছেলে আমার পাশেই বসেছিল, ভরসা করে যোগিবরকে একটা প্রশ্নই করে বসলে। বললে,—

"স্বামীজী,—আমি কি সন্ন্যাসী হব ? ভগবানের জন্যই কি আমার জীবন উৎসর্গ করা ?"

স্বামী প্রণবানন্দজী যদিও হাসছিলেন, তবুও তাঁর দৃষ্টি সুদূরে নিবদ্ধ,

যেন কোন কিছু রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "বাছা, তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার একটি টুকটুকে বউ হবে, দেখো!" (ছেলেটি বহুবছর ধরে সন্ন্যাসী হবার মতলব করবার পর শেষ অবধি বিয়েই করে ফেললে।)

স্বামী প্রণবানন্দ রাঁচি থেকে ফিরে গেলে তার কিছুকাল পরে আমি পিতার সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে গেছলুম। স্বামীজী সেখানে কিছুদিনের জন্য ছিলেন। কয়েক বছর আগেকার স্বামী প্রণবানন্দজীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল, "পরে তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

পিতা স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সসম্মানে পিতাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বললেন, "ভগবতীবাবু, আপনি নিজে কি কচ্ছেন? দেখছেন না আপনার ছেলে ভগবানকে পাবার জন্যে কি রকম দ্রুত উন্নতি করছে?" পিতার সামনে প্রশংসার কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলুম। স্বামীজী বলতে লাগলেন, "আপনার মনে আছে তো, আমাদের পূজনীয় গুরুদেব কিরকম প্রায়ই বলতেন, 'বনত, বনত, বন্ যায়।'* তাই 'ক্রিয়া'সাধন অবিরাম করে যান, যাতে করে শীগগিরই ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারেন।"

প্রণবানন্দজীর দেহ, আমার প্রথম কাশীদর্শনের সময় যা স্বাস্থ্যবান্ আর দৃঢ় দেখেছিলুম তা এখন সুস্পষ্টভাবে জরাগ্রস্ত, যদিও তাঁর শরীরদশা এখনও চমৎকার ঋজু, দৃঢ় ও সবল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীজী, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, আপনি শরীরে বার্ধক্যের আবির্ভাব বুঝতে পারছেন না? শরীর দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি আপনার ঈশ্বরানুভূতিও হ্রাস পাচ্ছে না?"

অতি মধুর হেসে তিনি বললেন, "আহা প্রাণের ঠাকুর যে আমার আরও কাছে এগিয়ে এসেছেন, এখন তাঁকে আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি!" তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আমার মনপ্রাণ অভিভূত করে ফেললে। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "আমি এখনও দুটি পেন্সন ভোগ করছি; একটি এখানকার ভগবতীবাবুর দরুণ আর একটি স্বর্গরাজ্যের!" বলে আকাশের দিকে অঙ্গুলি-

---

* লাহিড়ী মহাশয়ের একটি প্রিয় উক্তি, যার দ্বারা তিনি তাঁর শিষ্যদের ধ্যানপ্রচেষ্টায় উৎসাহবর্ধন করতেন। আক্ষরিক অর্থে এতে বোঝায়, "করতে করতে একদিন করা শেষ।" ভাবটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হচ্ছে, "চেষ্টা করতে করতে একদিন দেখবে যে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে গেছ, ঈশ্বরসঙ্গ লাভ করেছ।"

নির্দেশ করে এক গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে পড়লেন, মুখমণ্ডল এক অপূর্ব-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত,—আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলুম।

প্রণবানন্দজীর ঘরে নানাজাতীয় গাছ আর বীজের প্যাকেট দেখে আমি তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠাতে তিনি বললেন, "কাশী আমি চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে এসেছি। এখন আমি হিমালয়ের পথে পা বাড়িয়ে। সেখানে শিষ্যদের জন্যে আমি একটি আশ্রম খুলব। বীজগুলো থেকে শাকপাতা আর গোটাকতক তরিতরকারি হবে। আমার প্রিয়শিষ্যেরা খুব সহজ সরল ভাবেই জীবন যাপন করবে—আনন্দময় ঈশ্বরসঙ্গলাভেই তাদের সময় কাটবে; আর কিছুরই দরকার নাই।"

পিতা তাঁর গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে তিনি কলকাতায় ফিরবেন। সাধুপ্রবর উত্তর দিলেন, "আর কখনও নয়। লাহিড়ীমহাশয় আমায় বলেছিলেন যে এই বছরই আমি আমার প্রিয় কাশী চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে হিমালয়ে যাব, সেখানেই দেহত্যাগ করবার জন্যে!"

তাঁর কথা শুনে আমার চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল, কিন্তু স্বামীজী অতি প্রশান্ত মধুরহাসি হাসলেন। তাঁকে দেখে মনে হল যেন একটি স্বর্গের শিশু জগজ্জননীর অভয়ক্রোড়ে পরম নির্ভরতার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকশক্তিতে পূর্ণশক্তিমান যোগিবরের দেহে বার্ধক্যভাবের কোন রেখাপাতই হয় নি। তিনি অবশ্য শরীরকে ইচ্ছামাত্র নবভাবে গঠিত করে তুলতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি কখন জরার আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন না, বরং তিনি এই জড়ভূমিতে তাঁর কর্মক্ষয় হতে দিয়েই চলেন। শরীরটা তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন, যেন তাঁর এই জরাগ্রস্ত দেহেই সব কর্মক্ষয় হয়ে যায়, যাতে করে নবজন্মে আর তাঁকে যেন দেহে কোন কর্মফল ভোগ করতে না হয়।

মাসকতক বাদে একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, নাম সনন্দন—প্রণবানন্দজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য।

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মাঝে সনন্দন বলতে শুরু করলে, "আমার পূজনীয় গুরুদেব আর নাই, তিনি দেহরক্ষা করেছেন। হৃষীকেশের কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সযত্নে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন আমরা বেশ ভাল করে গুছিয়ে বসে তাঁর সঙ্গলাভে বেশ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করছি, তখন তিনি একদিন প্রস্তাব করলেন যে হৃষীকেশের অনেক লোককে খাওয়াতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম—এত লোককে খাওয়ান কেন? বললেন, 'এই আমার শেষ উৎসবপালন।' তাঁর কথার সম্পূর্ণ অর্থ তখন আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

"প্রণবানন্দজী বিরাট রন্ধনব্যাপারের সব আয়োজনে স্বহস্তে সাহায্য করেছিলেন। প্রায় দুইহাজার লোকের সেবা করান হয়েছিল। ভাণ্ডারার পর তিনি একটা উঁচু পাটাতনের উপর বসে পরমাত্মা সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আর ভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন। সেই উঁচু পাটাতনের উপর তখন আমি তাঁর পাশেই বসেছিলুম। বলা শেষ হলে তিনি হাজার হাজার লোকের সামনে আমার দিকে ফিরে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বললেন, 'সনন্দন প্রস্তুত হও,—আমি দেহত্যাগ করতে যাচ্ছি।'

"বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেল ; কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'গুরুদেব, করবেন না, করবেন না, দোহাই আপনার—আপনি এ কাজ করবেন না।' সমবেত জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক, সাগ্রহে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে,—ভাবতে লাগল আমার কথাগুলির কি অর্থ হতে পারে। গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর ইতিমধ্যেই অনন্তের দিকে নিবদ্ধ!

"তিনি বললেন, 'দেখ, স্বার্থপর হয়ো না আর আমার জন্যে দুঃখও কোরো না। তোমাদের সকলেরই জন্যে তো এতদিন ধরে হাসিমুখে খাটলুম, এখন আনন্দ কর ; আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও যাতে আমি সেই পরমানন্দময় প্রিয়তমের শান্তিময় ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় পাই!' তারপর অর্ধস্ফুটস্বরে প্রণবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'শীগগিরই আবার আমি জন্ম নিচ্ছি। অল্প কিছুকাল পরমানন্দ ভোগ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছি বাবাজীর* সঙ্গে মিলিত হতে। কবে আর কোথায় নতুনদেহে আমার আত্মা এসে জন্মগ্রহণ করছে তা তোমরা শীগগিরই জানতে পারবে।'

"আবার তিনি চিৎকার করে বললেন, 'সনন্দন, এই দেখ, দ্বিতীয় ক্রিয়াবলে আমি এ নশ্বরদেহ ত্যাগ করলুম!'

"তিনি আমাদের সম্মুখে জনসমুদ্রের মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর সকলকে আশীর্বাদ করলেন। এরপর কূটস্থে দৃষ্টিসংলগ্ন করে তিনি স্থির নিশ্চল হয়ে পড়লেন। বিস্মিত জনতা যখন ভাবছিল যে তিনি পরমানন্দময় সমাধিতে মগ্ন হয়েছেন, তখন কিন্তু তাঁর আত্মা এই রক্তমাংসের দেহ পরিত্যাগ করে পরমাত্মার অখণ্ড উদার বিস্তৃতির মাঝে মিলিয়ে গিয়েছে! পদ্মাসনে উপবিষ্ট তাঁর জড়দেহ শিষ্যেরা স্পর্শ করে দেখল যে তাতে আর

*লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু—এখনও তিনি জীবিত আছেন। (৩৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শরীরের উত্তাপ নাই। মরণের অকরুণ স্পর্শে কেবল একটি হিমশীতল কঠিন দেহ সেখানে পড়ে রয়েছে। আর প্রাণপাখী অমৃতের কূলের দিকে পাখা মেলেছে।

সনন্দন তার বর্ণনা শেষ করতে আমি ভাবলুম, " 'দুইদেহধারী সাধু'জীর জীবনেমরণে দুদিকেই নাটকীয় ভাব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "প্রণবানন্দজী আবার কোথায় জন্ম নেবেন?" সনন্দন উত্তর করলে, "সে একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা, বলা বারণ; কাউকে আমি তা এখন বলতে পারব না। আপনি বোধ হয় অন্য কোন উপায়ে তা জানতে পারবেন।"

বহুবৎসর পরে আমি স্বামী কেশবানন্দজী* মহারাজের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলুম যে, প্রণবানন্দজী তাঁর নবকলেবরে জন্মগ্রহণ করবার কয়েক বছর বাদে হিমালয়ে বদরীনারায়ণে গিয়ে মহাযোগী বাবাজীর সাধুসন্তদিগের দলে যোগদান করেছিলেন।

*কেশবানন্দজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ৪২শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

২৮-শ পরিচ্ছেদ

কাশীর পুনর্জন্ম ও আবিষ্কার

তখন আমি রাঁচিতে। মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে এখানে ওখানে প্রমোদভ্রমণে বেরোনো হয়। সেদিন মাইলআষ্টেক দূরে এক পাহাড়ে বেড়াতে গেছি, ছেলেদের দল সঙ্গে। সামনে পুকুরের জলটি টলটল করছে দেখে ভারি লোভ হয়, কিন্তু আমার মনে কি রকম একটা বিতৃষ্ণা এল। আমি বালতি করে জল তুলে তাইতে স্নান করতে লাগলুম। ছেলেদের সাবধান করে দিলুম, "দেখ, তোমরা কেউ জলে নেম না, বালতি করে জল তুলে তাইতে সবাই স্নান কর।"

আমার কাছাকাছি যে দলটা ছিল তারা আমার দেখাদেখি বালতি করেই জল তুলে স্নান করা আরম্ভ করে দিলে; কতকগুলো ছেলে কিন্তু ঠাণ্ডা জলের লোভ আর সামলাতে পারলে না। জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে পা দিতে না দিতেই বড় বড় জলঢোঁড়া সাপ সব তাদের চারধারে কিলবিল করে বেড়াতে লাগল। ছেলেগুলো তো ভয়ে চেঁচিয়েই অস্থির। যে রকম ভাবে হুড়মুড় করে জলছিটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে লাগল, তা দেখে হাসি সামলান দায়।

জায়গাটায় পেঁছে আমাদের চড়িভাতির আয়োজন হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমি একটি গাছতলায় বসলুম, ছেলেরা চারদিকে ঘিরে। আমায় একটু ভাবাবেগগোছের দেখে তারা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজী, বলুন না, আমি এই সন্ন্যাসের পথে তো বরাবর আপনার সঙ্গে থাকতে পারব?" উত্তর দিলুম, "উঁহু, না, তোমায় জোর করে বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাবে, তারপরে তোমার বিয়েও হবে।"

কিছুতেই তার বিশ্বাস হল না। দারুণ আপত্তি জানিয়ে বললে, "মরি যদি তবেই আমায় বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে, তার আগে আর নয়!" (কিন্তু মাসকয়েকের ভিতরেই তার পিতামাতা এসে তার অশ্রুসজল আপত্তিতে কোন কর্ণপাত না করেই তাকে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল আর বছরকতক বাদে তার বিয়েও হল।)

এইরকম নানাপ্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কাশী বলে একটি ছেলে আমার

প্রশ্ন করে বসল। ছেলেটির বয়স বছর বার, ভারি বুদ্ধিমান ছাত্র আর সবাই তাকে ভালবাসে।

জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীজী, আমার কপালে কি হবে ?"

কে যেন জোর করেই উত্তরটা আমার মুখ থেকে বার করালে, "তোমার শীগগিরই মৃত্যু ঘটবে !"

এই হঠাৎ আর অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার আর উপস্থিত সকলেরই মনে গভীর আঘাত আর দুঃখ উপস্থিত হল। মনে মনে নিজেকে ঠোঁটকাটা বলে তিরস্কার করে নীরব হয়ে বসে রইলুম—আর কারও উত্তর দেব না স্থির করলুম।

বিদ্যালয়ে ফিরে আসবার পর কাশী আমার ঘরে দেখা করতে এল। ক্রন্দনবিজড়িতস্বরে বললে, "যদি আমি মরি তা হলে বলুন স্বামীজী যে, আমার পুনর্জন্ম হলে আপনি আমায় খুঁজে বার করবেন আর আবার আমায় আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে আসবেন ?"

এই কঠিন গূঢ় ভবিষ্যৎ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেও কিন্তু মনে কষ্ট হল। তারপর কয়েকহপ্তা ধরে কাশী আমায় অনবরতই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার অত্যন্ত ভয়ত্রস্ত ভাব দেখে কি আর করি, শেষ পর্যন্ত তাকে আমায় আশ্বাসই দিতে হল। প্রতিশ্রুতি দিলুম, "আচ্ছা বেশ, দয়াময় ভগবান যদি তাঁর সাহায্য দেন, তাহলে অবশ্যই তোমায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে অল্প কিছুদিনের জন্য বেরিয়ে পড়লুম। কাশীকে সঙ্গে নিতে পারব না বলে আফশোষ হলে, যাবার আগে তাই আমি তাকে আমার ঘরে ডাকিয়ে বিশেষ করে উপদেশ দিলুম যে যতই পীড়াপীড়ি হোক না কেন, সে যেন বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার ভিতরেই থাকে, বাইরে কোথাও যেন না যায়। কেন জানি না মনে হল যে, যদি সে বাড়ীতে না যায়, তাহলে সে হয়ত আসন্ন বিপদের হাত এড়াতে পারে।

আমি চলে আসতে না আসতেই কাশীর বাবা রাঁচিতে গিয়ে হাজির হলেন। পনরদিন ধরে তাঁর চেষ্টা চলল কাশীর মন ভাঙাতে। কেবলই বোঝাতে লাগলেন যে, কাশী যদি মাত্র দিনচারেকের জন্য তার মাকে একবার দেখতে কলকাতায় যায়, ব্যস্—তাহলেই সে ফিরে আসতে পারবে আর সেখানে তাকে থাকতে হবে না।

কাশীও দৃঢ়ভাবে সব অস্বীকার করে যেতে লাগল, কিছুতেই আর রাজী হয় না। আর কোন উপায় না দেখে কাশীর বাবা শেষে বললেন যে, তিনি

পুলিশের সাহায্যে ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন। এইরকম ভয় দেখানতে কাশী অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ল। এই ভেবে সে ভয় পেলে যে, হয়ত এই রকম ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কোন রকম দুর্নাম হবে আর একটা অযথা অন্যায় হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে, যা হতে দিতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। কাজেই যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায়ই রইল না।

দিনকতক বাদেই রাঁচিতে ফিরলুম। যখন শুনলুম যে কাশীকে কি ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনই ছুটলুম কলকাতার ট্রেন ধরতে। কলকাতায় নেমে একটা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করলুম। গাড়ী যখন হাওড়ার পোলের উপর তখন দেখি যে, কাশীর বাবা আর তার অন্যান্য আত্মীয়েরা অশৌচ ধারণ করে চলেছেন। গাড়োয়ানকে চিৎকার করে গাড়ী থামাতে বলে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। হতভাগ্য পিতার দিকে শুধু কট্‌মট্‌ করে চেয়েই রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর কতকটা যেন অসঙ্গতভাবেই বলে উঠলুম, "খুনী মশাই, আমার বাছাকে আপনিই খুন করে ফেলেছেন, আর কেউ নয়!"

কাশীকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে আসাতে যে কি পরিমাণ অন্যায় করেছিলেন তা তার পিতা ইতিমধ্যে বেশ দারুণই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে সামান্য কয়দিন কাশী সেখানে ছিল, তারই মধ্যে কাশী দূষিত খাদ্য গ্রহণ করে কলেরায় আক্রান্ত হয়, তারপরেই মারা যায়!

কাশীর উপর আমার যে ভালবাসার টান ছিল আর তার মৃত্যুর পর তাকে খুঁজে বার করবার যে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তা দিবারাত্র মনকে তোলপাড় করতে লাগল। যেখানেই যাই না কেন তার মুখটি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আমার পরলোকগতা জননীর জন্য যে রকম খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলুম সেই রকমই খোঁজাখুঁজি শুরু করলুম কাশীর জন্য; এও একটা খুব স্মরণীয় ব্যাপার।

মনে মনে ভাবলুম যে ভগবান আমায় যে বিচারশক্তি দিয়েছেন, তাই আমি এখন কাজে লাগাব আর আমার যা কিছু শক্তি আছে তার চূড়ান্ত প্রয়োগ করব সেই সব সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম আবিষ্কার করতে, যাতে করে আমি জানতে পারি সে তার সূক্ষ্মদেহে কোথায় এখন অবস্থান করছে। আমি জানতে পেরেছিলুম যে তার আত্মা এখনও অপূর্ণ কামনাবাসনায় জড়িত, এখনও তার পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটেনি। কোথায় কোন সূক্ষ্মস্তরে লক্ষকোটি জ্যোতিষ্মান আত্মিকদের মধ্যে একটা জ্যোতিঃপিণ্ডের মত সে আজ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে! ভাবতে লাগলুম কি করে এত অসংখ্য আত্মিক জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝখান থেকে তাকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করব।

একটি গুপ্ত যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আমি দুই ভ্রূমধ্যস্থ কূটস্থের ভিতর দিয়ে কাশীর আত্মার কাছে আমার ভালবাসার আহ্বান প্রেরণ করতে লাগলুম। আকাশে টাঙান বেতারের তারের মত দুটো হাত আর আঙুলগুলো আকাশের দিকে তুলে আমি প্রায়ই চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতুম, যে দিকে সে গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে সে দিক নির্ণয় করা যায় কি না। আশা হল যে অন্তরের রেডিওর ভিতর গভীর মনঃসংযোগবলে আমি তার কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পাব।*

স্বতঃস্ফূর্ত একটা অনুভূতি এল যে কাশী শীগ্গিরই এ পৃথিবীতে ফিরে আসবে আর আমি যদি অবিরত আমার আহ্বান তার কাছে পাঠাই, তাহলে তার আত্মা শীগ্গির তার উত্তর দেবেই। আমি জানতুম যে কাশীর দ্বারা প্রেরিত সামান্যতম কম্পনবেগও আমার আঙুল, হাত, মেরুদণ্ড আর স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা নিশ্চয়ই অনুভূত হবে।

কাশীর মৃত্যুর পর অদম্য উৎসাহে আমি যৌগিকপ্রক্রিয়া মাসছয়েক ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যাস করে যেতে লাগলুম। জনকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বৌবাজারে রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অভ্যাসমত একবার হাত তুললুম। এই প্রথমবার তার উত্তর পেলুম। ঠিক যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার আঙুল আর হাতের তালু বেয়ে নেমে আসছে টের পেয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই তরঙ্গগুলো যেন গাঢ় সংবদ্ধ হয়ে আমার জ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে কেবলমাত্র একটী প্রবল চিন্তারূপেই আমার অন্তরের মধ্যে অবিরত ধ্বনিত হতে লাগল, "আমি কাশী, আমি কাশী, আমার কাছে আসুন।"

আমার হৃদয় রেডিওতে মনঃসংযোগ করাতে ঐ চিন্তাটি যেন তখন প্রায় স্পষ্টরূপেই শোনা যেতে লাগল। বারম্বার আমি কাশীর ডাক শুনতে পেলুম, অদ্ভুত তার সেই ঈষৎ ভাঙ্গাগলায়** চুপিচুপি স্বরে। নাঃ, এ কাশীই ত

---

*যোগীরা অবগত আছেন যে ইচ্ছাশক্তি, দুই ভ্রূর মধ্যস্থিত বিন্দু হতে প্রক্ষেপিত হলে চিন্তাতরঙ্গনিক্ষেপক যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায়। হৃদয়ে যখন কোন ভাব ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয় তখন সে একটা মানসিক রেডিও যন্ত্রেরই মতন কাজ করে আর দূর বা নিকট হতে অপর লোকেদের সংবাদও গ্রহণ করতে পারে। টেলিপ্যাথি বা পরচিত্তজ্ঞানে মানুষের মনের চিন্তাধারার সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলি প্রথমতঃ মহাকাশের ঈথরের সূক্ষ্ম স্পন্দন দ্বারা, তারপর তারা সব আরও স্থূল পার্থিব ঈথরের মধ্য দিয়ে বিদ্যুত তরঙ্গরূপে পরিচালিত হয়, সেগুলি আবার অপরের মানসপটে চিন্তাতরঙ্গরূপে পরিণত হয়।

**জীবাত্মা মাত্রেই শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদর্শী। কাশীর আত্মা, কাশীর পূর্বজন্মের

বটে ! আমার জনৈক সঙ্গীর হাত টেনে ধরে আনন্দে হেসে উঠে বললুম, "মনে হচ্ছে যেন এবার কাশীর খোঁজ পেয়েছি ।"

আমি আবার সেই রকম করে হাত তুলে ধরে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলুম। আমার বন্ধুদের আর পথচারী পথিকদের তা দেখে ত বড়ই মজা লাগল। আমি এধারে ঘুরেই চলেছি। মজা হচ্ছে এই যে, যেই মাত্র আমি কাছেরই একটা গলি "সার্পেণ্টাইন লেনের" দিকে মুখ করি, অমনি সেই বিদ্যুৎস্রোত আমার আঙুল দিয়ে বইতে আরম্ভ করে, আর অন্যদিকে মুখ ফিরালেই সেই সূক্ষ্মতরঙ্গ একেবারে অন্তর্হিত হয় !

তখন আমি বলে উঠলুম, "ওহে, এই গলির ভিতরেই একটা বাড়ীতে কোন মায়ের গর্ভে কাশীর আত্মা এসে বাস করছে, এস ত দেখি !"

সঙ্গীরা আর আমি ত সার্পেণ্টাইন লেনের দিকে এগোতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তোলিত হস্তে বৈদ্যুতিকতরঙ্গের আঘাতও প্রবলতর ও প্রস্ফুটতর হতে লাগল। চলতে চলতে বোধ হল যেন একটা চুম্বক আমায় রাস্তার ডানধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেইধারের একটা বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার পা গেল আটকে ! অবাক হয়ে গেলুম। দারুণ উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ, দরজায় ঘা দিতে লাগলুম। বুঝলুম যে আমার এই সুদীর্ঘ, আর অত্যদ্ভুত সন্ধানের জন্য পরিশ্রম করা আজ সফল ও সার্থক পরিণতি লাভ করেছে।

একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে যে, মনিব তার বাড়ীতেই আছেন। তিনি তেতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন কি চাই ? মুশকিলে পড়ে গেলুম ; কি বলি তা ভেবে পাইনে, আমার প্রশ্ন যে একাধারে সঙ্গত আর অসঙ্গত দুইই !

যাক্, ভরসা করে বলেই ফেললুম, "মশায়, কিছু যদি না মনে করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দয়া করে বলবেন কি—আপনারা কি একটি সন্তান আশা করছেন, এই ধরুন মাস ছয়েক হল, এঁ্যা ?" *

বালকাবস্থার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য স্মরণপথে রেখেছিল, আর সেই জন্যই আমার পরিচয় জ্ঞাপন করবার জন্য তার ভাঙাগলার স্বরের অনুকরণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

*জড়দেহ হতে উৎক্রান্ত হয়ে বহু লোকের আত্মা যদিও ৫০০ হতে ১০০০ বৎসর পর্যন্ত সূক্ষ্মজগতে অবস্থান করে, তবুও দেহ হতে দেহান্তরগ্রহণের মধ্যবর্তীকালের দীর্ঘতার কোন অপরিবর্তনীয় বা নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। (৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জড় অথবা সূক্ষ্ম দেহে অবস্থানের নির্দিষ্ট কাল কর্মানুযায়ী পূর্ব হতেই স্থিরীকৃত হয়ে থাকে।

মৃত্যু আর নিদ্রা, যা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে "ক্ষুদ্র মরণ" ছাড়া আর কিছু নয়, তা মরজগতে অবশ্যম্ভাবী আর তা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবকে ইন্দ্রিয়বোধের মায়াজাল হতে সাময়িক-

আমাকে গেরুয়াপরা একজন সন্ন্যাসী দেখে ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে। কিন্তু দয়া করে বলুন ত, আপনি আমার বাড়ীর খবর সব জানলেন কি করে ?"

তারপর যখন কাশীর ব্যাপার আর আমার প্রতিশ্রুতির কথা সব শুনলেন, তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত ভদ্রলোক সমস্ত কথাই বিশ্বাস করলেন।

আমি তাঁকে বললুম, "আপনার একটি ছেলেই হবে। গৌরবর্ণ, চওড়া মুখ, কপালে উল্টান ঝুঁটি—ধর্মভাব তার খুবই প্রবল হবে।" মনে মনে তখন স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলুম যে, ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হলে কাশীর এইসব লক্ষণের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকবেই।

পরে আবার ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছিলুম। বাপ মা তার পূর্বজন্মের সেই পুরাতন নাম কাশীই রেখেছিলেন। অতি শৈশবেও আমার প্রিয়শিষ্য কাশীর সঙ্গে তার আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল। শিশুটি আমায় দেখেই তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। পূর্বজন্মের যা আকর্ষণ ছিল, তা এবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে ফিরে এসেছে।

বছরকয়েক বাদে, আমি আমেরিকায় থাকতে সে আমায় চিঠি লিখেছিল। তখন সে কিশোর বালক। সন্ন্যাসগ্রহণে তার গভীর আগ্রহের কথা সে আমায় জানিয়েছিল। আমি তাকে হিমালয়ের এক গুরুর সন্ধান দিই যিনি সেই পুনর্জাত কাশীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবে মুক্ত করে। মানুষের পরম সত্তা আত্মা বলে সে নিদ্রা বা মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যুতে তার অশরীরিত্বের কতকগুলি সঞ্জীবনী স্মারক চিহ্ন পায়।

হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে কর্মসূত্রের সাম্যসাধক নিয়ম হচ্ছে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কার্য ও কারণ, আবাদ ও ফসল। বিশ্বব্যাপারের (ঋত) সুনির্দিষ্ট কর্মধারায় মানুষ তার চিন্তা আর কার্যের দ্বারা তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে। যে কোন বিশ্বশক্তিই সে স্বয়ং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সঞ্চালিত করুক না কেন তাদের উৎপত্তিস্থল হিসাবে বৃত্তের অবশ্যম্ভাবী পরিধিরূপে সে সবই তার কাছে ফিরে আসে। "পৃথিবীকে যেন অংকশাস্ত্রের সমীকরণের মতই বোধ হয়। তাকে যেমন করেই ঘোরান যাক না কেন, সে ঠিক তার ভারসাম্য বজায় রাখবে। সকল রহস্যই প্রকাশিত হয়, সমস্ত পাপেরই শাস্তি হয়, সব পুণ্যই পুরস্কৃত হয়, প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবিধান হয়—নীরবে আর নিশ্চিতভাবে।" (ইমার্শনকৃত "কম্পেনসেসন।") জীবনে অসামঞ্জস্যের পিছনে কর্মকে ন্যায়ের বিধানরূপে বর্তমান বিবেচনা করতে পারলে ঈশ্বর আর মানুষের বিরুদ্ধে আক্রোশ বা বিদ্বেষ হতে মানবমন মুক্ত হতে পারবে।

২৯শ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ও আমার মতবাদের আলোচনা

রাঁচি বিদ্যালয়ে ভোলানাথ নামে একটি ভারি বুদ্ধিমান বছর চৌদ্দর ছেলে ছিল,—অতি চমৎকার সে গাইতে পারত। একদিন সকালে সে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইছিল। শুনে ভারি খুশী হয়ে তাকে প্রশংসা করাতে ভোলানাথ বললে, "রবিঠাকুরের গান পাখীর কলকণ্ঠে আনন্দধ্বনির মত ; গাইলে প্রাণের উচ্ছ্বাস আপনা-আপনি স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে পড়ে, এ তো মিষ্টি লাগবেই।" বিনা অনুরোধ-উপরোধেই আবার সে গান আরম্ভ করে সুরের স্রোতে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেললে। ছেলেটি বোলপুরের 'শান্তিনিকেতনে' কিছুদিন ছিল।

ভোলানাথকে বললুম, "ছেলেবেলা থেকে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে আসছি। সারা বাংলা, এমন কি অশিক্ষিত চাষাভূষারাও তাঁর উচ্চভাবের সঙ্গীতে ভারি আনন্দ পায়।"

ভোলাতে আমাতে গোটাকতক রবিবাবুর গান একসঙ্গে গাইলুম। তিনি হাজার হাজার বাংলা কবিতাতে সুর সংযোজনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের মৌলিক কবিতা আর সব প্রাচীন কবিতাও আছে। এসব এক একটি অপূর্ব জিনিষ, এদের তুলনা মেলা ভার।

গানের শেষে আমি বললুম, "রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাবার পরই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম কেন জান ? কারণ তাঁর সাহিত্যিক সমালোচকদের আক্কেল দেবার জন্যে তাঁর সরল সাহসোক্তি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল বলে", বলেই হেসে উঠলুম।

ঘটনাটা শোনবার জন্য ভোলার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

আমি শুরু করলুম, "বাংলা কবিতায় নতুন ধারা প্রবর্তন করাতে সাহিত্যসেবীরা তাঁর যৎপরোনাস্তি নির্মম সমালোচনা আরম্ভ করলে। তাঁর অপরাধ যে তিনি ব্যাকরণনির্দিষ্ট লোহার বাঁধন ভেঙে দিয়ে লেখ্য আর কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। প্রচলিত সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা লঙ্ঘন করলেও তাঁর গানে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব আর কি গভীর ভাবময় আবেগ রয়েছে বল দেখি ?"

"একজন প্রভাবশালী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তাচ্ছিল্য করে

'পায়রা কবির বকবকানি, তাও ছাপালে পদ্য হল—নগদ মূল্য একটাকা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিশোধের সুযোগও তারপরে এসে গেল ; গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ বার হওয়ামাত্রই সারা প্রতীচ্যজগৎ তাঁর পদতলে এসে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলে। দেখেশুনে সব সাহিত্যিক ধুরন্ধরের দল,—তাঁদের মধ্যে তাঁর পূর্বেকার সমালোচকপ্রভুরাও ছিলেন, ট্রেন বোঝাই হয়ে ত শান্তিনিকেতনে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ছুটলেন।

"রবীন্দ্রনাথ একটু ইচ্ছা করেই বিলম্ব করে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তারপর দারুণ গভীর নীরবতার মধ্যে তাদের প্রশংসাবাদ সব শুনে অবশেষে তিনি তাঁদেরই সমালোচনায় ব্যবহৃত আক্রমণাস্ত্র তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এখানে আমার কাছে যে সম্মানের সৌরভ বিতরণ করতে এসেছেন তার সঙ্গে কিন্তু আপনাদের অতীতের ঘৃণার পূতিগন্ধ অত্যন্ত বিসদৃশভাবেই মিশে রয়েছে। আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সঙ্গে আপনাদের এই হঠাৎ আপ্যায়নের প্রবল ইচ্ছার উদয়ের সম্ভাব্য কোন সংযোগ আছে না কি ? বাংলার কাব্য-সরস্বতীর পুণ্যমন্দিরে যখন আমি আমার প্রথম দীন উপচার শ্রদ্ধাকুসুম নিবেদন করে আপনাদের বিরাগভাজন হয়েছিলুম, এখনও ত আমি সেই কবিই রয়েছি।'

"খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের এই দারুণ তিরস্কার খুব বড় বড় করেই ছাপা হল। চাটুবাদের মোহমুক্ত কবিগুরুর এই স্পষ্টোক্তিতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলুম। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সেক্রেটারী মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ*। এণ্ড্রুজ সাহেবের পরিধানে সাদাসিধে ধুতি। রবীন্দ্রনাথকে এণ্ড্রুজ সাহেব সশ্রদ্ধভাবে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন।

"রবীন্দ্রনাথ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁর মধ্য থেকে যেন একটা কৃষ্টি, সৌজন্য আর শান্তিময় মাধুর্যের ছটা বেরিয়ে এসে তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য এবং চতুর্দশ শতকের সাহিত্যে লোকপ্রিয় কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রধান প্রভাব তাঁর সাহিত্যে ছিল"।

মন যখন এই সব স্মৃতির সৌরভে ভরপুর, আমি তখন গাইতে শুরু করলুম, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রূপান্তরিত একটি পুরান বাংলা গান, "আমার এ ঘরে, আপনার করে, গৃহ-দীপখানি জ্বালো।"

---

*ইংরেজ লেখক এবং প্রচারবিদ্ এণ্ড্রুজ সাহেব মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে ভ্রমণের সময় আবার উৎফুল্লহৃদয়ে শুরু করলুম ভোলাতে আর আমাতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে।

রাঁচিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় বছর দুই বাদে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলুম শান্তিনিকেতনে যেতে, আমাদের উভয়ের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতে। খুব খুশী হয়েই গেলুম। আমি যখন প্রবেশ করি, কবি তখন তাঁর পাঠাগারে বসেছিলেন। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় যেমন মনে হয়েছিল, এবারও তেমনি মনে হল যেন সামনে বসে রয়েছে শ্রেষ্ঠ মানবত্বের এক অপূর্ব সুন্দর আদর্শ যা যেকোন চিত্রকরের একান্ত কাম্যবস্তু। দীর্ঘকেশ আর আবক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুজালে শোভিত সুগঠিত প্রশান্ত সৌম্য আনন, দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদুটিতে স্বপ্নময় স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টি, মুখে স্বর্গীয় হাসি ; কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত, সত্যিই যেন প্রাণ কেড়ে নেয়! সুদীর্ঘ, ঋজু সৌম্যদেহে যেন রমণীর কোমলতার সঙ্গে শিশুর আনন্দচঞ্চলতা মিশ্রিত। কোনও কবির আদর্শভাব এই প্রিয়দর্শন প্রশান্তমূর্তির চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত রূপপরিগ্রহ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ও আমি—আমাদের উভয়ের বিদ্যালয়ের তুলনামূলক আলোচনায় শীঘ্রই গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়লুম। উভয় স্কুলই গতানুগতিক ধারার বাইরে। অবশ্য উভয়মতের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট—যেমন মুক্ত আকাশতলে শিক্ষাদান, অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন, শিশুদের সৃজনীশক্তির উন্মেষণে প্রচুর অবকাশ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য ও কবিতার উপরেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন আর দিয়েছেন গীতিবাদ্যের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ, যা আমি ভোলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা সাময়িক-ভাবে মৌনব্রত পালন করত বটে, কিন্তু কোন বিশেষ যোগশিক্ষা তাদের দেওয়া হত না।

"যোগদা" প্রণালীর অভ্যাস এবং যৌগিক উপায়ে মনঃসংযোগের প্রক্রিয়াগুলি যা রাঁচিবিদ্যালয়ের সব ছাত্রদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়, তার বর্ণনা কবি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারেই শুনলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে বিদ্যালাভের কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করে হেসে বললেন, "ফিফ্‌থ্‌ক্লাস থেকেই স্কুলে ইস্তফা দিয়ে পলায়ন করেছিলুম।" আমি তখনই বুঝলুম যে, তাঁর কবিমন বিদ্যালয়ের শুষ্ক নিয়মানুগত শ্বাসরোধী বদ্ধবায়ু পরিত্যাগ করে কেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত কাব্যগগনে কল্পনার পাখা বিস্তার করে উড়তে চেয়েছিল।

"এই জন্যেই আমি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলুম, ছায়াঘন তরুতলে

আকাশের উদার সৌন্দর্যবিস্তারের নীচে", বলেই তিনি সুন্দর একটি উপবন-তলে শিক্ষারত ছোট্ট একটি শিশুর দলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ হচ্ছে ফুল আর পাখীর গানের মধ্যে। এর ভিতর দিয়েই সে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তার অন্তরের গুপ্ত ঐশ্বর্যসম্ভার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। সত্যিকারের শিক্ষা তো বাইরে থেকে কখনও মগজে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না ; বরং এ এমন হওয়া উচিত যে ভিতরের অসীম জ্ঞানরাশিকে বাইরে ফুটিয়ে তুলতে এ যেন স্বতঃই সাহায্য করতে পারে।"

আমি সায় দিয়ে বললুম, "সাল তারিখ আর হিসাবনিকাশের একঘেয়ে পথ্যে ছেলেদের বীরপুজার প্রেরণা আর কল্পনার আদর্শ যেন একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার শুরু হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ; কবি তাই পিতার বিষয় সসম্ভ্রমে উল্লেখ করে বললেন, "বাবামশায়ই আমায় এই উর্বরা জমিটুকু দান করেন ; এখানে অতিথিশালা আর মন্দির ইতিমধ্যেই তিনি তৈরী করে দিয়েছিলেন। আমি এখানে শিক্ষাদানের পরীক্ষা শুরু করি ১৯০১ সালে দশটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে। নোবেল প্রাইজের আটহাজার পাউন্ড টাকাটার সবটাই বিদ্যালয়ের সংরক্ষণের জন্যে ব্যয় করা হয়।"

দেশবিখ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনী পাঠেই জানা যায়। যৌবনে তিনি দুই বৎসর হিমালয়ে ধ্যানে অতিবাহিত করেন। আবার মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর সারা বাংলার মধ্যে লোকহিতৈষণায় তাঁর অপূর্ব বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশ হতে বহু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির এক বৃহৎ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন,—তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই কোন না কোন বিষয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব বা যশঃস্থাপনা করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। কল্পনাবৈচিত্রে, রঙের খেলায়, ভাবসম্পদে এঁদের চিত্রাংকণে এমন একটা নিজস্ব আর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা অনুসরণ করে চিত্রাঙ্কণ-কারিগণ বাংলায় একটা পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ, গভীর তত্ত্বদর্শী দার্শনিক। সৌম্যমূর্তি, শান্ত, সমাহিত চিত্ত, ধীর স্থির দ্বিজেন্দ্রনাথ। সুগভীর প্রশান্তির এক অপূর্ব মহিমা তাঁকে সর্বদা ঘিরে রয়েছে। তাঁর মন এতদূর অহিংসা আর প্রেমে ও করুণায় পূর্ণ ছিল যে, বনের পশুপক্ষীরাও তাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে আসত, বিন্দুমাত্র ভয় পেত না।

রবীন্দ্রনাথ আমায় অতিথিশালায় রাত্রিযাপনের নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যায় বারান্দাতে আলোছায়ায় বোনা মায়াজালে ঘেরা একটি স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট একটি দলে বেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ নীরবে উপবিষ্ট—সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য! কাল যেন বহু যুগ পিছিয়ে গেছে। সম্মুখের দৃশ্যটি যেন কোন প্রাচীন আশ্রমের—আনন্দগীতিরসিক প্রেমিক গায়কের চতুর্দিকে ভক্তদল ঘিরে বসে; সবারই মুখ স্বর্গীয় প্রেমের ছটায় উদ্ভাসিত। একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, ঐক্য ও সঙ্গতির সুষমা স্থানটিতে এনে তিনি তা পরম রমণীয় আর লোভনীয় করে তুলেছেন। আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নয়, একটা স্নিগ্ধপেলব মধুরপরশ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার চৌম্বক আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ আমার হৃদয় যেন জোর করে কেড়ে নিলেন। ভগবৎপ্রেমের উদ্যানে দুর্লভ কবিতাপ্রসূন প্রস্ফুটিত—স্বভাবমধুর গন্ধে চারিদিকে সবাইকে আকৃষ্ট করে তুলেছেন, সৌরভে সব পাগল।

সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মতন তাঁর কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুটিকতক সদ্যরচিত অপূর্ব কবিতা আমাদের সামনে পাঠ করে শোনালেন। ছাত্রদের আনন্দপরিবেশনের জন্য লেখা তাঁর কবিতা আর নাটকের অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে। আমার কাছে তাঁর লেখার সৌন্দর্য হচ্ছে, প্রায় প্রতি ছন্দতে ঈশ্বরের অবতারণা করা আছে কিন্তু কদাচিৎ সেই পুণ্যনামের উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

"সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু বলে ডাকি মোর প্রভুকে।"

তার পরদিন আহারাদির পর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিদায়গ্রহণ করতে হল। আমার আনন্দ এই যে সেই ছোট্ট স্কুলটি আজ আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় "বিশ্বভারতী"তে* পরিণত—যেখানে দেশ-দেশান্তর হতে আগত ছাত্রদের একটি আদর্শ পরিবেশ রচিত হয়েছে।

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে

---

*১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্বভারতী হতে পঁয়ষট্টিজন ছাত্র ও শিক্ষক রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয়ে এসে দশ দিন থেকে গেছেন।

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা— নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"†

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

†গীতাঞ্জলি—বিশ্বভারতী।

৩০শ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক ঘটনার নিয়ম

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক লেভ তলস্তয়* "তিন সন্ন্যাসী" নামে একটি চমৎকার গল্প লিখে গেছেন। তাঁর বন্ধু নিকোলাস রোয়েরিক নিম্নলিখিতভাবে গল্পটি সংক্ষেপিত করেন,—

"একটি দ্বীপে তিনটি প্রবীণ সন্ন্যাসী বাস করতেন। তাঁরা এতদূর সরল ছিলেন যে তাঁরা প্রার্থনাকালে শুধু এই ক'টি কথাই বলতেন, 'আমরা তিনজন, আপনিও ত্রিমূর্তি, আমাদের উপর দয়া করুন'। এই অত্যন্ত সরল নিরহঙ্কার প্রাণের আকুতিতে কিন্তু বড় বড় অলৌকিক ব্যাপার সব প্রকাশ পেতে লাগল।

"স্থানীয় বিশপ† এই তিন সন্ন্যাসী আর তাঁদের অননুমোদিত প্রার্থনার কথা শুনতে পেয়ে ভাবলেন যে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে শাস্ত্রানুযায়ী কেতা-দোরস্ত প্রার্থনা তাঁদের শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এলেন দ্বীপেতে; সন্ন্যাসীদের বললেন—ঈশ্বরের কাছে তাঁদের প্রার্থনা ঠিক যথোপযুক্তভাবে হচ্ছে না, আর নানারকম শাস্ত্রবিধিসঙ্গত প্রার্থনা করতে তাঁদের শিক্ষা আর উপদেশও দিলেন। এরপর বিশপ মহোদয় 'ত একটি নৌকো করে স্থানত্যাগ করলেন। যেতে যেতে দেখলেন যে, একটা উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল নৌকার পিছন পিছন ছুটে আসছে। কাছে এসে পৌঁছতেই তিনি দেখলেন যে, সেই তিনটি সন্ন্যাসী হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন নৌকাটি ধরবার জন্য।

"বিশপের কাছে পৌঁছতেই তাঁরা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি যে প্রার্থনা বলতে শিখিয়েছিলেন তা আমরা ভুলে গেছি, তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে

*মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তলস্তয়ের বহু আদর্শের সামঞ্জস্য ছিল; দুজনেরই অহিংসা বিষয়ে অনুরূপ মত। তলস্তয় বিবেচনা করতেন যে খ্রিস্টের মূল শিক্ষা হচ্ছে "(অন্যায়ের দ্বারা) অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরো না," ম্যাথিউ ৫:৩৯ (বাইবেল)। মন্দের প্রতিকার করা উচিত তার যুক্তিসিদ্ধ ফলদায়ক বিপরীত ব্যবস্থায়, মঙ্গলসাধন বা প্রেম দিয়ে।

†গল্পটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক উপাদান আছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা যায় যে বিশপ মহোদয় যখন আর্কেঞ্জেল থেকে স্লোভেট্স্কি মঠে যাচ্ছিলেন, তখন দ্বিনা নদীর মোহানায় তিন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান্।

জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, সেগুলো আর একবার বলে দিন।' দেখে শুনে তো বিশপপ্রভু একেবারে অবাক। ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে সবিনয়ে বললেন, 'সাধু মহোদয়গণ, আপনারা পুরান প্রার্থনাই বলতে থাকুন ; নূতন কিছুর আর দরকার নাই।' ''

* * * *

আচ্ছা, তাহলে তো মনে এই সব প্রশ্নই স্বাভাবিকভাবে আসে যে, সাধু তিনটি জলের উপর দিয়ে হেঁটে এলেন কি করে ?

যীশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার পর পুনরুত্থান হল কি করে ?

লাহিড়ীমশাই আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতেন কি করে ?

আধুনিক বিজ্ঞানে আজ পর্যন্তও এর কোন সদুত্তর মেলেনি, যদিও আণবিক যুগের আবির্ভাবে বিশ্বমানস হঠাৎ প্রসারতা লাভ করেছে। মানুষের অভিধানে "অসম্ভব" কথাটা ক্রমশঃই অপ্রধান হয়ে আসছে।

প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে বলে যে, এই জড়জগৎ দ্বৈতবাদ আর সাপেক্ষন্যায় বা আপেক্ষিকবাদ যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই একটিমাত্র মূলবিধি মায়াবাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সকল প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ত্ব, ভেদাভেদবিহীন এক অখণ্ড ঐক্য—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ; তিনি একটা মিথ্যা বা অসত্য আবরণে আচ্ছাদিত হন। ভ্রান্তিজনক মোহময় সেই দ্বৈত আবরণই হচ্ছে 'মায়া'। আধুনিক কালের বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই ঋষিদিগের এই সরল সত্য উক্তি আরও দৃঢ়তর করে তুলেছে।

নিউটনের গতি তত্ত্বও হচেছ মায়ার বিধি। "প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বদাই একটা সমান আর বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে ; যে কোন দুইটি বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া সর্বদাই সমান আর বিপরীতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল।" কাজেই ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া অবিকল সমান। "স্বতন্ত্র একটিমাত্র শক্তি তাই অসম্ভব ; সেই জন্য সর্বদাই দুইটি করে শক্তি থাকবে, সমান আর বিপরীত।"

তাই সকল মৌলিক স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থেকেই মায়িক উৎপত্তি প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিদ্যুতের ক্রিয়া হচ্ছে আকর্ষণ আর বিকর্ষণ ; এর ইলেক্ট্রন আর প্রোটন দুই বিপরীত বিদ্যুৎধর্মী। আরেকটা উদাহরণ—পরমাণু অর্থাৎ চরম জড়কণা হচ্ছে একটি পৃথিবীরই মতন, যেন একটি চুম্বক যার ধনাত্মক আর ঋণাত্মক দুইটি মেরু আছে। সমগ্র প্রাতিভাসিক জগৎ অথবা জগৎপ্রপঞ্চ হচ্ছে মেরুপ্রবণতার অদম্য প্রভাবের অধীন ; দেখা গেছে

যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র অথবা অন্য যে কোন বিজ্ঞানই হোক না কেন, তাদের কোন নিয়ম সহজাত বিরুদ্ধ বা বিপরীত নীতিশূন্য নয়।

পদার্থবিজ্ঞান তাই মায়ার অতীত কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে পারে না— বিশ্বসৃষ্টিতে যা ওতপ্রোতঃভাবে বিজড়িত। প্রকৃতি নিজেই হচ্ছে মায়া, কাজেই প্রাকৃতবিজ্ঞানকে অবশ্যই তার অপরিহার্য সারাংশকে নিয়েই কাজ চালাতে হবে। প্রকৃতি তার নিজরাজ্যে অফুরন্ত আর অনন্তরূপিণী। ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা তার অনন্তবৈচিত্র্যের এক রূপ থেকে অন্য রূপের মধ্যে বা আর এক রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর বেশী কিছু করতে পারবেন না। বিজ্ঞান তাই অনন্ত রহস্যস্রোতে ভেসে চলেছে—অন্ত আর খুঁজে পাচ্ছে না। অবশ্য পূর্বে হতে বর্তমান আর ক্রিয়াশীল বিশ্বের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার পক্ষে তা যথেষ্ট বটে, কিন্তু সেই বিধির "বিধি" আর তার একমাত্র যিনি নিয়ন্তা, তাঁকে খুঁজে বার করতে তা একেবারেই শক্তিহীন। মহাকর্ষ আর বিদ্যুতের শক্তির অপূর্ব আর বিরাট ক্রিয়া সব জানা গেছে বটে কিন্তু মহাকর্ষ আর বিদ্যুতের শক্তিটা আসলে যে কি জিনিষ, তা' কোন মানুষই আজ পর্যন্ত জানতে পারে নি।*

প্রাচীন মুনিঋষিরা এই মায়া অতিক্রম করবার ভার মানবজাতির হাতেই সমর্পণ করে গেছেন। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এই দ্বৈতভাব অতিক্রম করে স্রষ্টার সহিত একাত্মবোধই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। মায়াবদ্ধ জীবেরা, যারা এই বিশ্বনাট্যলীলার ছবি আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তারা জোয়ারভাটা, দিবারাত্র, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, উত্থানপতন, জন্মমৃত্যু এই সব মেরুপ্রবণতার দ্বৈতভাবের মূলবিধি মানতে বাধ্য। হাজার হাজার জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই চক্রে ঘুরে এসে মানুষ শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে মায়াতীত কোন বস্তুর সন্ধানে উৎসুক আগ্রহে আশাপূর্ণ হৃদয়ে চেয়ে থাকে।

এই মায়ার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করার মানেই হচ্ছে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করা। যে যোগী এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী, আর সব তো শুধু প্রাণহীন মূর্তিপূজা করেই ক্ষান্ত। মানুষ যতদিন প্রকৃতির এই দ্বৈতভাবের অধীন হয়ে থাকবে, ততদিন এই দ্বিমুখিনী

---

*জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারক মার্কনি চরমতত্ত্বের সম্মুখে বিজ্ঞানের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, "জীবনরহস্য ভেদ করা একেবারেই বিজ্ঞানের ক্ষমতার অতীত। বিশ্বাস জিনিষটি না থাকলে সত্যই এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হত। মানবের চিন্তাধারার সম্মুখে জীবনরহস্য হচ্ছে এক চিরন্তন সমস্যা।"

মায়াই তার উপাস্যা দেবী। সে তখন আর একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে পারবে না।

বিশ্বপ্রকৃতির "মায়া" মানুষের মনের ভিতর প্রকাশিত হয় অবিদ্যারূপে। অবিদ্যা মানে "অ-জ্ঞান," ভ্রান্তি বা মোহ। মায়া বা অবিদ্যা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন বা বিশ্লেষণ দ্বারা কখনও দূর করা যায় না, তা কেবল যায়, 'নির্বিকল্পসমাধি'লব্ধ অন্তরের অনুভবে। ওল্ড টেস্টামেন্টের ধর্মোপদেষ্টারা এবং সকল দেশের সকল যুগেরই সাধুসন্তরা সেই অনুভবলব্ধ অবস্থা থেকেই তা বলে গেছেন। বাইবেলে এজেকিয়েল* বলছেন, "তারপর সে আমাকে একটি দ্বারপ্রান্তে উপনীত করলে, দ্বারটি পূর্বমুখী ; তারপর পূর্বদিকের পথ হতে দেখা গেল ইস্রায়েলের প্রভুর দৈবমহিমা আর শোনা গেল তাঁর স্বর দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মত, আর সারাজগত তাঁর গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।" যোগী ললাটের (পূর্বদিক) তৃতীয় নেত্রের ভিতর দিয়ে তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপিত্বের দিকে প্রসারিত করেন আর ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করতে পান—এই হচ্ছে "সমুদ্রগর্জন" অথবা আলোকের স্পন্দন যা হচ্ছে সৃষ্টির একমাত্র বাস্তবতা।

বিশ্বজগতের লক্ষকোটি রহস্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জিনিষ হচ্ছে আলো। শব্দতরঙ্গ পরিচালিত হয় বায়ুস্তর বা অন্য কোন জড় মাধ্যমের ভিতর দিয়ে, কিন্তু আলোকতরঙ্গ ভান্তঃপ্রদেশ বা তারামধ্যাবকাশ বা মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে অব্যাহতভাবে চলে যেতে পারে, কোন বাধা পায় না। এমন কি প্রমেয় ঈথর, যা তরঙ্গবাদে আলোকের গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বিচ্ছুরিত হবার মাধ্যম বলে স্বীকৃত, তাও আইনষ্টাইনের এই মতানুসারে পরিত্যক্ত হতে পারে যে অবকাশ, আকাশ বা শূন্যের জ্যামিতিক গুণানুসারে ঈথর মতবাদ অনাবশ্যক। যাই হোক, উভয় মতবাদেই আলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বা তন্মাত্র আর স্বাভাবিকভাবে প্রকাশকালে তা কোন জড়পদার্থের উপর আদৌ নির্ভর করে না।

আইনষ্টাইনের বিরাট কল্পনায় সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইল যে আলোর গতি, তা সারা অপেক্ষবাদকে প্রভাবিত করে। তিনি গাণিতিক হিসাবে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের সীমাবদ্ধ মন যতটুকু, সেই হিসাবে আলোই হচ্ছে এই অনিত্য জগৎ অভিবাহের মধ্যে একমাত্র পরম ধ্রুবাঙ্ক। একমাত্র আলোকগতির অনন্যসাপেক্ষতার উপরই মানবজগতের দেশ ও কালের মান নির্ভর করে। দেশ আর কাল, যা আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অনন্ত বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে,

---

*এজেকিয়েল—৪৩ঃ১-২ (বাইবেল)

তারা আসলে তা নয়, তারাও হচ্ছে আপেক্ষিক আর সসীম অংশ আর তাদের প্রতিবন্ধী পরিমাণ-বৈধতা নির্দিষ্ট হয় কেবলমাত্র আলোর গতির মানদণ্ডে।

পরমাকাশকে অপেক্ষবাদের মাত্রা বা আয়তনরূপে বর্ণনা করতে গিয়ে সময়ের প্রকৃতরূপ এখন বেরিয়ে পড়েছে—একটি দ্ব্যর্থ মৌলিক প্রকৃতির সহজ সার আর কি! কলম দিয়ে গোটাকতক সমীকরণের অঙ্কের আঁচড় কেটে আইনস্টাইন বিশ্বজগৎ থেকে এক আলো ছাড়া আর সব ধ্রুবসত্যের বিষয় দূর করে দিয়েছেন।

তারপরে এই তত্ত্বের আরও উন্নতি সাধিত হল তাঁর ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ একটি মাত্র অঙ্কসূত্রে মাধ্যাকর্ষণ আর তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্ব একত্রীত করলেন। বিশ্বসৃষ্টিকে একটিমাত্র নিয়মের অধীনে এনে আইনস্টাইন যুগযুগান্তর পার হয়ে প্রাচীন ঋষিদের কাছে গিয়ে এখন পেঁচেছেন, যাঁরা সৃষ্টির গঠনে যে একমাত্র বহুরূপিণী মায়াই কার্যকর, তা বহুপূর্বেই ঘোষণা করে গিয়েছেন।

এই যুগান্তকারী অপেক্ষবাদে চরম অথবা "পরম" অণুর তত্ত্বানুসন্ধানের গাণিতিক সম্ভাবনার উদয় হয়েছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখন সদর্পে ঘোষণা করছেন যে, পরমাণুকে শুধু জড়ের চেয়ে বরং শক্তিই যে বলা যায় তা নয়, পরমাণবিক শক্তি বস্তুতঃ হচ্ছে চিন্ময়-পদার্থ।

"দি নেচার অফ দি ফিজিক্যাল ওয়ার্লডে"* স্যার আর্থার ষ্ট্যানলি এডিংটন লিখছেন, "পদার্থবিজ্ঞান যে ছায়ার জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই সহজ উপলব্ধি একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি। জড়জগতে আমরা পরিচিত জীবনের নাটক যেন ছায়াবাজির অভিনয়ের ভিতর দিয়েই দেখি। ছায়া কাগজের উপর যখন ছায়া কালির দাগ টেনে চলেছি, তখন আমার ছায়া কনুই ছায়া টেবিলের উপর রয়েছে। এ সবই প্রতিরূপক এবং পদার্থবিদ্ এদের প্রতীকরূপেই ভেবে ক্ষান্ত হন। তারপর আসেন রাসায়নিক মন, যিনি এই সব প্রতীকদের রূপান্তর সাধন করেন......মোটামুটিভাবে এর শেষ কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, এই জগৎ-পদার্থ আসলে হচ্ছে চিন্ময়পদার্থ......"

ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণের অধুনাতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুতত্ত্বের সার যে আলো আর প্রকৃতির অপরিহার্য যে দ্বৈতভাব তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৯৩৭ সালে নিউ ইয়র্ক টাইম্স্ পত্রিকা আমেরিকার 'এসোসিয়েশন

*ম্যাকমিলান কোম্পানী।

ফর দি এডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্সের এক সভায় ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপ প্রদর্শনের নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করেন ঃ—

"টাংস্টেনের কেলাসিক গঠন যা কেবল এক্সরে দ্বারাই এ যাবৎ পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিল, তার রেখাচিত্র একটা প্রতিপ্রভ পর্দার উপর খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল ; তাতে দেখা গেল যে, নয়টি পরমাণু ঘন আয়তনের মত স্থানে জালের আকারে ঠিক তাদের নিজ নিজ জায়গায় রয়েছে—প্রত্যেক কোণে একটি করে আর মধ্যস্থলে একটি। টাংস্টেনের এই যে কেলাস (দানা) গঠনের জালের মধ্যে পরমাণুগুলি, তা প্রতিপ্রভ পর্দার উপর জ্যামিতিক আকৃতিতে সাজান আলোকবিন্দুর মতই প্রতিভাত হল। আর আলোর এই কেলাসের ঘন আয়তনের উপর অবিরাম অভিবেধরত বায়ুর পরমাণুসকল নৃত্যশীল আলোকবিন্দুর মতন দেখা যাচ্ছে—ঠিক যেমন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণগুলি জলের ঢেউয়ের মাথার উপর নাচে……

"ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপের ধারণা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯২৭ সালে, নিউ ইয়র্ক সহরের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর ডাক্তার ক্লিন্টন জে, ডেভিসন আর ডাক্তার লেস্টার এইচ. জারমার, এঁদের দ্বারা। এঁরা দেখতে পেলেন ইলেক্ট্রন এর দ্বৈত অভিব্যক্তি—একটি কণা আর একটি তরঙ্গ*, এই উভয়ভাবেরই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। এই তরঙ্গের গুণেই ইলেক্ট্রনকে আলোকের বিশেষত্ব প্রদান করেছে এবং তারপর গবেষণা শুরু হল প্রতিফলক কাচের দ্বারা আলোকে যেমন কেন্দ্রীভূত করে স্থানবিশেষে ফেলা যায়, তেমনি করে ইলেকক্ট্রনকেও কেন্দ্রীভূত করে কোন স্থানবিশেষে ফেলবার কোন উপায় বার করা যায় কি না।

"ইলেক্ট্রনের দ্বৈতগুণ আবিষ্কারে, যাতে দেখা গেল যে সারা জড়ের রাজত্বে একটা দ্বৈতভাব বর্তমান, ডাঃ ডেভিসন পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন।

সার জেম্‌স্‌ জিন্‌স্‌ তাঁর 'দি মিষ্টিরিয়াস ইউনিভার্স'† গ্রন্থে লিখেছেন, "জ্ঞানের স্রোত ক্রমশঃই যন্ত্রবিহীন সত্যের দিকে এগোচ্ছে ; বিশ্বপ্রকৃতিটাকে এখন একটা বিরাট যন্ত্রের চেয়ে একটা বিরাট চিন্তা বলেই বোধ হতে আরম্ভ হয়েছে।"

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজকের বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে শোনাচ্ছে যেন প্রাচীন বেদের ভিতরকারই একটি পৃষ্ঠা আর কি।

---

*অর্থাৎ জড় এবং শক্তি উভয়ই।

†কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বিজ্ঞান থেকে—যদি অবশ্য তাই হয়, তাহলে মানুষ এই দার্শনিক সত্যই শিক্ষা করুক যে জড়জগৎ বলে কিছুই নেই ; এর টানা পোড়েন হচ্ছে মায়া, অবিদ্যা বা ভ্রান্তি। এর বাস্তবতার মরীচিকা সবই বিশ্লেষণের মুখে একদম মিলিয়ে যায়। মানুষের কাছে যখন জড়বিশ্বের পাকা খুঁটিগুলি একে একে খসে পড়তে থাকে, তখন সে তার মূর্তির উপর নির্ভরতা, তার অতীতে ঈশ্বরাদেশ অমান্যের কথা ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করতে পারে—যেখানে যীশু বলেছেন, "আমি ছাড়া তোমার আর কোন ঈশ্বর নাই।"*

আইনষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে, যেখানে তিনি ভর আর শক্তির তুল্যতা প্রদর্শন করেছেন, সেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কোন জড়কণার মধ্যস্থিত শক্তি হচ্ছে তার ভর ও আলোকগতির বর্গফলের দ্বারা গুণিত সংখ্যার সমান। জড়কণার বিনাশেই আণবিক শক্তির মুক্তি। জড়ের "মৃত্যু"তেই আজ আণবিক যুগের "জন্ম"।

আলোর গতি গণিতশাস্ত্রের যে একটা মান বা ধ্রুবক, তার কারণ এই নয় যে তার এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইলের একটা স্থিরগতি আছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, কোন জড়দেহ যার ভর তার গতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, সে কখনও আলোর সমান গতি লাভ করতে পারে না। আর একভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কেবলমাত্র সেই জড়দেহ যার ভর অসীম, সে-ই আলোর গতি পেতে পারে।

এই ধারণা থেকেই আমরা অলৌকিক ঘটনার নিয়মে পৌঁছতে পারি।

যে সব সিদ্ধপুরুষেরা তাঁদের শরীর অথবা অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তুকে ইচ্ছামত রূপদান অথবা শূন্যে বিলীন করতে পারেন বা আলোর গতির বেগে চলতে পারেন অথবা সৃজনকারী আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করে যে কোন জড় পদার্থের বাহ্যরূপের প্রকাশকে সদ্য সদ্য পরিদৃশ্যমান করে তুলতে পারেন, তাঁরা এই অতি প্রয়োজনীয় শর্তটি পূরণ করতে পারেন যে, তাঁদের ভর হচ্ছে অসীম।

সিদ্ধযোগীর সংবিৎ বা চেতনা বিনা আয়াসেই তাঁর সঙ্কীর্ণ দেহের সঙ্গে নয়, একেবারে নিখিল বিশ্বরচনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ, তা সে নিউটনের "বল"ই হোক অথবা আইনষ্টাইনের "জড়ত্বের প্রকাশ"ই হোক, সকল জড়পদার্থের মহাকর্ষাবস্থার পরিচয় যে গুরুত্ব বা "ভার," তার গুণপ্রকাশে কোন সিদ্ধযোগীকে বাধ্য করতে অপারগ। যিনি নিজেকে জানতে পেরেছেন যে তিনি সর্বব্যাপী পরমাত্মা, তিনি দেশ আর কালের অধীন কোন দেহের

*এক্সোডাস ২০:৩ (বাইবেল)।

সসীমতায় আর আবদ্ধ নন। তাঁর সব সসীম বাধাবন্ধ দূরে হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় তাঁর চরম অবস্থা, আমিই তিনি—"সোঽহং"।

বাইবেলে আছে, "আলো হোক্। তারপরেই আলোর উৎপত্তি হল।"* ঈশ্বর তাঁর সুরচিত বিশ্বসৃষ্টির উপর প্রথম আদেশ প্রচার করাতে সৃষ্টির একমাত্র সার উপাদান প্রকাশিত হল, আলোক। এই জড়বিহীন মাধ্যমের রশ্মির ভিতর দিয়েই সমস্ত অতিপ্রাকৃত দৈবঘটনা প্রকাশিত হয়। সকল যুগের ভক্তসাধুরা ঈশ্বরের আবির্ভাব অগ্নিশিখা বা আলোর রূপে এই কথাই প্রমাণ করেন। সেন্ট জন ভগবদ্দর্শনের বিষয় বর্ণনা করে বলেছেন যে, "তাঁর চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিশিখার মতন……আর তাঁর অবয়ব প্রখর সূর্যের তেজের মত উজ্জ্বল।"†

কোন যোগী যিনি গভীর ও পরিপূর্ণ ধ্যানের দ্বারা তাঁর চৈতন্যকে স্রষ্টার মধ্যে বিলীন করতে পেরেছেন তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, বিশ্বজগতের সার হচ্ছে আলো (জীবনীশক্তির স্পন্দন); তাঁর কাছে জল আর মৃত্তিকা সৃজনকারী দুই বিভিন্ন আলোকরশ্মির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। জড়জ্ঞানশূন্য, আর দেশ বা আকাশের তিনটি মাত্রা আর কালের চতুর্থ মাত্রা শূন্য হয়ে সিদ্ধযোগী ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ইত্যাদির ভৌতিক আলোক রশ্মির উপর দিয়ে তাঁর আলোর শরীর অতি সহজেই পরিচালিত করতে পারেন।

"অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তোমার সর্বশরীরই আলোকদীপ্ত হবে।"‡ জড়তামুক্তিপ্রদায়ক তৃতীয় নেত্রে বহুদিনের অভ্যাসসঞ্জাত গভীর আর প্রগাঢ় মনঃসংযোগবলে যোগী জড়তাপ্রসূত সকল প্রকার ভ্রান্তি আর তার মাধ্যাকর্ষণের ভার বিনষ্ট করতে পারেন; তখন থেকেই তিনি দেখেন যে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক যেমন সৃষ্ট হয়েছিল, তা আসলে হচ্ছে এক নির্বিশেষ আলোকপিণ্ড।

হার্ভার্ডের ডাক্তার এল, টি, ট্রোল্যান্ড আমাদের বলেন, "চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত ছবি সাধারণ হাফটোন এনগ্রেভিংএর মতন একই প্রকার উপায়ে আমাদের চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হয়; অর্থাৎ তারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর দ্বারা তৈরী—এত ক্ষুদ্র যে চোখের দ্বারা ধরাই যায় না……চিত্রপত্র বা অক্ষিপটের স্পর্শপ্রবণতা এতদূর বেশী যে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প পরিমাণের উপযুক্ত আলোও দর্শনানুভূতি জাগিয়ে তোলে।"

---

*জেনেসিস ১:৩ (বাইবেল)।

†রিভিলেশন ১:১৪-১৬ (বাইবেল)।

‡ম্যাথিউ ৬:২২ (বাইবেল)।

অলৌকিক ঘটনার নিয়ম 'যে কোন ব্যক্তিই পরিচালিত করতে পারেন, যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, সৃষ্টির সারবস্তু হচ্ছে আলোক'। সিদ্ধযোগী, আলোকাভিব্যক্তির দৈবজ্ঞানবলে সর্বব্যাপী আলোক রশ্মিকণাগুলিকে সংযোজিত করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে তৎক্ষণাৎ প্রক্ষেপণ করতে পারেন আর এইরূপ প্রক্ষেপণ করার প্রকৃতরূপ (তা সে কোন গাছ বা ওষুধ বা মনুষ্যশরীর যাই হোক না কেন) যোগীর ইচ্ছাশক্তি আর তার প্রত্যক্ষীভূত করে তোলবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

রাত্রিতে মানুষ যখন স্বপ্নাবস্থায় প্রবেশ করে তখন সে তার দৈনন্দিন মিথ্যা দেহাত্মবোধ ভুলে যায়। তখন তার মনের সর্বশক্তিমত্তার প্রদর্শন শুরু হয়। কি দেখা যায় সেখানে? সেখানে স্বপ্নে দেখা যায় বহুকালমৃত বান্ধবদের, দূরতম প্রদেশ, বিস্মৃতির অতলগহ্বর হতে পুনরুত্থিত শৈশবের নানা ঘটনাবলী।

সেই মুক্ত আর অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, যার পরিচয় সকল মানুষই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে স্বল্প পরিমাণে পেয়েছে, তা হচ্ছে ঈশ্বরোপলব্ধ সাধু মনের পরিপূর্ণ আর নিত্য অবস্থা। স্বার্থগন্ধলেশশূন্য হয়ে আর স্রষ্টাপ্রদত্ত সৃজনী ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যোগী ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা পূরণ করতে বিশ্বপ্রকৃতির আলোকরশ্মির পুনঃসংযোজন করতে পারেন।

বাইবেলেও এই কথা বলা আছে, "তারপর ঈশ্বর বললেন, আমাদেরই স্বরূপ আর প্রতিমূর্তির মতন মানুষকে সৃজন করা যাক্। আর তারা সমুদ্রের মৎস্য, আকাশের পক্ষী, পশু এবং সমস্ত পৃথিবীর উপরে ভূমিতে বিচরণশীল সরীসৃপের উপর আধিপত্য করুক।"*

সেই উদ্দেশ্যেই মানুষ এবং জগৎ সৃষ্ট হয়েছে যাতে করে মানুষ নিখিল বিশ্বের ওপর আপন আধিপত্যের কথা জানতে পেরে 'মায়া' কে জয় করতে পারে।

সন্ন্যাসগ্রহণের অল্প কিছুকাল পরেই ১৯১৫ সালে আমার একবার বিষম বৈচিত্র্যপূর্ণ এক অলৌকিক স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল। এতে মানবজ্ঞানের আপেক্ষিকতা খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছিল; তাতে আমি দুঃখক্লেশজনক মায়ার দ্বৈতভাবের পিছনে সেই অনন্ত আলোকের অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। স্বপ্নদর্শনটি ঘটেছিল আমাদের বসত বাটিতে এক সকালবেলায়, যখন আমি আমার ছোট্ট চিলেকোঠাটিতে বসেছিলুম। ইউরোপে তখন প্রথম

*জেনেসিস ১:২৬ (বাইবেল)।

মহাযুদ্ধ মাসকতক ধরে চলছে : অত্যন্ত বিষণ্নহৃদয়ে এই মহাযুদ্ধে মানবজীবনের বিরাট মরণাহুতির কথা সব ভাবছিলুম।

চক্ষু মুদ্রিত করে গভীর ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার সংবিৎ যেন এক যুদ্ধজাহাজ পরিচালনকারী কাপ্তেনের দেহের মধ্যে পরিচালিত হল। জাহাজ আর তীরের উপর থেকে কামানের গোলাগুলি বর্ষণের বজ্রনির্ঘোষ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড শেল পড়ে জাহাজের বারুদঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমার জাহাজটাকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিলে। পড়লুম জলে লাফিয়ে, সঙ্গে ছিল গুটিকতক নাবিক, বিস্ফোরণের হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিল।

বুক তখন ঢিপ ঢিপ করছে, যাই হোক তীরে ত নিরাপদে পৌঁছলুম। কিন্তু হায়! একটা বন্দুকের ছুটন্ত গুলি এসে বিঁধল আমার বুকে। যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করতে করতে মাটির উপর পড়ে গেলুম। সমস্ত শরীরটা একেবারে অসাড় হয়ে গেছে, তবুও দেহটা রয়েছে এটা বেশ টের পাচ্ছি, যেমন একটা পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে লোকে বোধ করে।

ভাবলুম, "শেষ অবধি বুঝি মরণই আমায় ধরে ফেললে!" একটা অন্তিম শ্বাস ছেড়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যেতে গিয়েই দেখলুম যে—আরে বাঃ, আমি যে গড়পার রোডের বাড়ীতে পদ্মাসনে বসে আছি!

তারপর উল্লাসে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল যখন আমি নিঃশঙ্ক আনন্দে টিপেটুপে চিমটি কেটে দেখতে লাগলুম যে, নাঃ, শরীর ঠিক গোটাটাই ফেরৎ পেয়েছি, কই বুকে তো কোন গুলিটুলি ঢুকে ছ্যাঁদা করেনি। এধার ওধার নড়ে চড়ে হেলে দুলে, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস টেনে ফেলে নিশ্চিত হলুম যে হ্যাঁ, সত্যিই তো, আমি পরিপূর্ণভাবেই বেঁচে রয়েছি। মনে মনে যখন এই রকম আত্মশ্লাঘা অনুভব করছি, তখন দেখলুম যে হঠাৎ আমার জ্ঞান আবার সেই রক্তপ্লাবিত তীরে শায়িত কাপ্তেনের মৃতদেহে ফিরে গেছে। মনে এল একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা।

প্রার্থনা করে জানালুম. "বল প্রভু, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি?" সমগ্র দিকচক্রবাল এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃর বিকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা মৃদু স্পন্দনের মর্মরধ্বনি বাণীতে রূপান্তরিত হল, "জ্যোতিঃর সঙ্গে জীবনমরণের কি সম্বন্ধ আছে? আমার জ্যোতিঃর প্রতিমূর্তিতে তোমায় গড়েছি। জীবনমৃত্যুর আপেক্ষিকসম্বন্ধ কেবল জগৎস্বপ্নের। তোমার তুরীয় অবস্থা দেখ! জাগ, বৎস জাগ!"

মানুষের এই রকম জাগরণের উপায়ে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁর সৃষ্টি-

রহস্য, উপযুক্ত স্থান ও কালে, আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করেন। আধুনিক আবিষ্কারের বহুপ্রকার সাহায্যে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই যে বিশ্বজগৎ, তা হচ্ছে একটি মাত্র শক্তির বিভিন্ন আর বিচিত্র প্রকাশ—আলোক ; এই আলোক ঐশ্বরিক জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিসন, রেডার, বা ফটোইলেকট্রিক সেল—যা হচ্ছে সর্বদর্শী বৈদ্যুতিক চক্ষু এবং আণবিক শক্তি, এ সবের আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে আলোরই তড়িৎচুম্বক প্রকাশ।

চলচ্চিত্রকলা যে কোন আশ্চর্য ব্যাপার প্রদর্শন করতে পারে। চিত্তাকর্ষক দর্শনগ্রাহ্য বিষয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফটোগ্রাফির কৌশলের কাছে কোন অলৌকিক ব্যাপারেরই প্রদর্শন আর দুঃসাধ্য থাকে না। দেখা যাবে যে, মানুষ জড়দেহ হতে মুক্ত হয়ে তার স্বচ্ছ সূক্ষ্মদেহ থেকে বেরিয়ে আসছে ; দেখা যাবে যে জলের উপর সে হাঁটতে পারে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, স্বাভাবিক ঘটনার ধারা উলটে দিতে পারে, দেশ ও কাল নিয়ে একেবারে ওলটপালট করে দিতে পারে। একজন সিদ্ধপুরুষ প্রকৃত আলোকরশ্মিদ্বারা যা সংসাধিত করেন, একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফের চিত্রগুলি তার ইচ্ছামত সাজিয়ে ঐ একই রকমের দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের জীবন্ত ছবিতে বিশ্বসৃষ্টির বিষয়ে অনেক সত্যের উদাহরণ মেলে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চের পরিচালক তাঁর নিজের নাটক নিজেই রচনা করেছেন আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রদর্শনের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিরাট সমাবেশ করেছেন। অনন্তের গভীর তমসাচ্ছন্ন যন্ত্রগৃহ হতে পরম্পরাগত যুগসমূহের ফিল্মের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সৃজনকারী আলোকরশ্মি প্রেরণ করেন আর এই মহাকাশের চিত্রপটে ছবির পর ছবি সব জীবন্তরূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের ছবি যেমন প্রকৃত বলেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তারা কেবলমাত্র আলোছায়ার সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যে একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যভাবের উদয় হয়। অসীম প্রাণবৈচিত্র্যে অনন্ত জীবনধারায় পরিপূর্ণ গ্রহজগৎ বিশ্বচলচ্চিত্রের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয় ; কেবল যখন সেই অসীম সৃজনীরশ্মি দ্বারা মানুষের জ্ঞানের পটভূমিতে ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যসবল প্রক্ষেপিত হয়, তখন কেবল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ক্ষণিকের জন্য তা সত্য বলে প্রতিভাত হয়।

সিনেমা দর্শকবৃন্দ উপর দিকে তাকালেই দেখতে পায় যেন পর্দার উপরে প্রতিফলিত ছবিগুলো একটিমাত্র আকারহীন আলোকরশ্মির মাধ্যমে আকৃতি ধারণ করছে। ঠিক সেইরকম রূপ রস আর রঙে সঞ্জীবিত এই বিশ্বনাট্য

মহাব্যোম উৎস হতে নির্গত একটি মাত্র শ্বেত আলোকরশ্মি থেকেই বেরিয়ে আসছে। ভগবান এই সব গ্রহনক্ষত্রের বিশ্বনাট্যশালায় তাঁর মানবসন্তানদের আনন্দবিধানের জন্য তাদের সব একসঙ্গে অভিনেতা আর দর্শক করে কি অভাবনীয় কৌশলেই না এক অতি বিরাট নাট্যলীলা করে চলেছেন!

একদিন আমি একটি চলচ্চিত্রশালায় প্রবেশ করলুম, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের সাংবাদচিত্র দর্শনের জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও পশ্চিমে পূর্ণোদ্যমে চলেছে; সংবাদচিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের হত্যাকান্ড এত বাস্তবরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল যে তা দেখে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে আমি প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ করে চলে এলুম।

সে দিন প্রার্থনা করলুম, "ভগবান, কেন তুমি এত দুঃখক্লেশ ঘটতে দিচ্ছ?"

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে, আমার প্রার্থনারই যেন সদ্যসদ্য উত্তর হিসাবে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের একটি বাস্তবচিত্র আমার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মৃত আর মুমূর্ষুতে পরিপূর্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা আর বীভৎসতা সংবাদচিত্রের প্রদর্শনীর চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

আমার অন্তর্জ্ঞানের মধ্যে একটি অতিমৃদু শান্তস্বর যেন কথা কয়ে উঠল, "খুব ভাল করে মন দিয়ে দেখ! দেখতে পাবে, ফ্রান্সে এখন এই যে সব দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে, তা আলোছায়ার একটা সাদা আর কালো রঙে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা হচ্ছে বিশ্বচলচ্চিত্র, এখনই যে সব সংবাদচিত্র দেখে এলে সেইরকম, একাধারে সত্য আর অসত্য দুইই—নাটকের ভিতর নাটক আর কি!"

অন্তর আমার তবুও শান্ত হল না। সেই দৈববাণী পুনরায় শোনা গেল, "সৃষ্টি হচ্ছে আলোছায়া দুয়েরই সমন্বয়, তা না হলে কোন ছবিই সম্ভবপর হয় না। মায়ার সদসৎ গুণ বরাবরই একটার চেয়ে অপরটা এক একবার প্রবল হয়ে উঠবে। ইহলোকে আনন্দ যদি অবিরাম আর অন্তহীনই হ'ত, তাহলে কি মানুষ আর অন্য কোন লোক চাইত? দুঃখক্লেশ ভোগ বিনা সে কদাচিৎ স্মরণ করতে চাইত যে, সে তার অমৃতধাম পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে। দুঃখ-কষ্টই হচ্ছে তা স্মরণ করাবার অঙ্কুশাঘাত! তাকে এড়ানর উপায় হচ্ছে জ্ঞান। মরণের বিয়োগব্যথা হচ্ছে একেবারেই অসত্য। যারা এতে ভয়ে কেঁপে মরে, তারা হচ্ছে সেই রকম আনাড়ী অভিনেতা যারা থিয়েটারের স্টেজে একটা ফাঁকা গুলির আওয়াজে সত্যিসত্যিই ভয়ে পড়ে মরে যায়! আমার সন্তানেরা আলোকের সন্তান—তারা তো আর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে চিরকাল মোহনিদ্রায় ঘুমোবে না।"

শাস্ত্রে যদিও আমি মায়ার বিষয় আর তার নানা ব্যাখ্যা পড়েছিলুম, কিন্তু সে সব আমার এই প্রত্যক্ষদর্শন আর তার সাথে এই সান্ত্বনাবাণীর সঙ্গে পাওয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এমনভাবে দিতে পারে নি। মানুষের মূল্য বোধ গভীর-ভাবেই পরিবর্তিত হয় যখন তার মনে এই চরম বিশ্বাস দৃঢ় আর বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে, এই সৃষ্টি একটা বিরাট চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এর ভিতরে নয়, বরং বাইরেই আছে তার আসল স্বরূপ।

এই অধ্যায় লেখা শেষ করে আমি বিছানার উপর পদ্মাসনে বসলুম। দুটি ঘেরাটোপ দেওয়া আলোতে ঘরটি* মৃদু আলোকিত। দৃষ্টি উত্তোলন করে দেখলুম যেন ঘরের ছাদ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষাবর্ণের আলোকবিন্দুর দ্বারা আচ্ছাদিত, রেডিয়মের জ্যোতিঃর মত স্পন্দিত হচ্ছে, ঝক্‌মক করছে। লক্ষ-কোটি আলোকরেখা বৃষ্টির ধারার মত একটি স্বচ্ছ আলোকদণ্ডে পরিণত হয়ে আমার উপর এসে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে!

সঙ্গে সঙ্গে আমার এ ভৌতিক দেহের জড়ত্ব নষ্ট হয়ে গিয়ে তা অতি সূক্ষ্ম আর লঘু দেহে পরিণত হল। মনে হল যেন হাওয়ার উপর ভাসছি। বিছানা নামমাত্র ছুঁয়ে ভারশূন্য শরীরটা একবার এদিক, একবার ওদিক পর্যায়ক্রমে ঈষৎ দুলতে লাগল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম—দেওয়াল আসবাবপত্র সবই ঠিক রয়েছে কিন্তু সেই স্বল্প আলোকপিণ্ডই এতদূর বর্ধিত হয়েছে যে ঘরের ছাদ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

"এই হচ্ছে বিশ্বচলচ্চিত্রের কলকব্জা," আলোর ভিতর থেকেই যেন স্বরটা বেরিয়ে এল। "তোমার বিছানার সাদা চাদরের উপর এর আলোক-রশ্মিপাতে এ তোমার শরীরের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। এইবার দেখ, তোমার আকৃতি আলো ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আমি হাতদুটোর দিকে তাকালুম, সামনে পিছনে একবার দুলিয়ে দেখলুম, কিন্তু তাদের কোন ভার আছে বলে বোধ হল না। একটা পরমানন্দময় অনুভূতি আমায় অভিভূত করে ফেললে। এই মহাব্যোমের আলোকস্তম্ভ আমার শরীর রূপে পরিণত হয়ে দেখাচ্ছে যেন কোন সিনেমার যন্ত্রগৃহ হতে প্রক্ষেপিত আলোকরশ্মি প্রবাহে নির্মিত একটি দৈবপ্রতিলিপি, আর তা পর্দার উপর প্রতিফলিত একটি চিত্রের মতই প্রকাশ পাচ্ছে।

ঈষৎ আলোকিত আমার নিজেরই শয়নগৃহের রঙ্গমঞ্চে আমার শরীরের

*এনসিনিটাস, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন্ ফেলোশিপ হার্মিটেজ। (প্রকাশকের মন্তব্য)

চলচ্চিত্র বহুক্ষণ ধরেই উপভোগ করলুম। বহু অপ্রাকৃত ঘটনাদর্শন ভাগ্যে ঘটেছে, কিন্তু এমন অপূর্ব ব্যাপার কখনও ঘটেনি। আমার জড়দেহের ভ্রান্তি যখন সম্পূর্ণরূপেই ঘুচে গেল, আর সকল পদার্থের সার যে আলোক তার যখন পূর্ণ উপলব্ধি ঘটল, আমি তখন উপরের দিকের স্পন্দনশীল "প্রাণ-কণিকা" স্রোতের দিকে তাকিয়ে মিনতিসূচক স্বরে বললুম, "হে স্বর্গের আলো, দয়া করে আমার এই তুচ্ছ দেহপট আপনার মধ্যেই মিলিয়ে দিন—বাইবেলের ইলাইজা যেমন অগ্নিরথের দ্বারা স্বর্গে উত্তোলিত হয়েছিলেন তেমনি।*

এই প্রার্থনাটি অবশ্য নিতান্তই চমকপ্রদ, কাজেই আলোকরশ্মি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার শরীর আবার পূর্বেকার মত স্বাভাবিক ভাবপ্রাপ্ত হয়ে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ল; ছাদের উজ্জ্বল আলোকের ঝাঁক মিটমিট করে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলুম যে এই পৃথিবী ত্যাগের সময় আমার তখনও আসে নি।

একটা দার্শনিক চিন্তাও তখন মনের মধ্যে উদয় হল, "আর তাছাড়া ইলাইজা হয়ত আমার এ ধৃষ্টতায় অসন্তুষ্টও হতে পারেন!"

*II কিংস্—২:১১ (বাইবেল)।

সাধারণতঃ অতিপ্রাকৃত ঘটনাসকল বিধিনিয়মবিহীন বা তার বহির্ভূত কোন ব্যাপার বা কার্যের ফল স্বরূপ বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের এই সুবিন্যস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে সকল ঘটনাই বিধিনিয়মের অধীন হয়ে ঘটে আর বিধিসঙ্গত ভাবে তার ব্যাখ্যাও করা যায়। বড় বড় সিদ্ধ মহাগুরুগণের তথাকথিত অলৌকিক শক্তিসব সংবিতের অন্তর্বিশ্বে যে সব সূক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়াশীল আছে, তাদের সঠিক উপলব্ধির স্বাভাবিক অনুষঙ্গ।

জগতে যা কিছু ঘটে, তা সবই আশ্চর্য ব্যাপার—এই গভীর অর্থ ছাড়া আর কোন কিছুকেই সত্যসত্যই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলা চলে না। আমাদের প্রত্যেকেই যে এক একটি জটিলভাবে সংগঠিত শরীরে আবদ্ধ আর এমন একটা জগতে প্রতিষ্ঠিত, যেটা মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রদের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান—এর চেয়ে অতি সাধারণ ঘটনা বা অধিকতর আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হতে পারে?

যীশুখৃষ্ট বা লাহিড়ী মহাশয়ের মত মহান ধর্মোপদেষ্টাগণই সাধারণতঃ বহু অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারেন। এরূপ ধর্মগুরুগণই মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য কঠিন ও বিরাট আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হন, আর শোকদুঃখপীড়িত নরনারীদের অলৌকিক উপায়ে সাহায্য করা তাঁদের সেই কর্মজীবনের একটা অংশ বলেই বোধ হয়। দুরারোগ্য রোগনিরাময়ে আর মানবজীবনের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য দৈবনির্দেশের প্রয়োজন হয়। কেপারনম নামক স্থানে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক মুমূর্ষু পুত্রটিকে আরোগ্য করবার জন্য অনুরুদ্ধ হলে যীশুখৃষ্ট কিঞ্চিৎ বক্রোক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, "অলৌকিক ঘটনা বা আশ্চর্য ব্যাপার সব না দেখলে তো আর তুমি কিছুই বিশ্বাস করবে

না।" তবুও যীশু বললেন, "যাও, তোমার ছেলে প্রাণ পেয়েছে।" জন ৪:৪৬-৫৪ (বাইবেল)।

এই পরিচ্ছেদে আমি, জড়জগতে যে মায়া অথবা ভ্রান্তির অলৌকিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার বৈদিক ব্যাখ্যা দিয়েছি। আণবিক "জড়" পদার্থের মধ্যে যে অনিত্যতার একটা "ইন্দ্রজাল" লুকায়িত আছে তা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। যাই হোক্, কেবলমাত্র যে প্রকৃতি তা নয়, মানুষও (তার নশ্বরভাবে) মায়া, অর্থাৎ আপেক্ষিকতা, বৈপরীত্য, দ্বৈতভাব, বিলোম ক্রিয়া, বিরুদ্ধাবস্থার অধীন।

এ মনে করলে ভুল করা হবে, মায়ার তত্ত্ববিষয় কেবলমাত্র ঋষিরাই অবগত ছিলেন, তা নয়। ওল্ড টেস্টামেণ্টের ধর্মোপদেষ্টাগণ মায়াকে স্যাটান বা শয়তান (হিব্রু অর্থে শত্রু) বলে অভিহিত করেছেন। গ্রীক টেস্টামেণ্টে শয়তানের প্রতিশব্দ ডায়াবোলাস্ বা ডেভিল বলে ব্যবহৃত হয়েছে। শয়তান বা মায়া হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের যাদুকর, যে এক অখণ্ড, অরূপ, মহাসত্যকে ঢাকবার জন্য নানা রূপের আবরণ সৃষ্টি করে। আর ঈশ্বরের পরিকল্পনা আর লীলায় এই শয়তান বা মায়ার একমাত্র ক্রিয়া হচ্ছে মানুষকে আত্মা থেকে জড়ের, সৎ হতে অসতের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করা।

যীশুখৃষ্ট মায়াকে শয়তান, নরঘাতক ও মিথ্যাবাদী বলে চিত্রিত করেছেন। "ডেভিল (শয়তান)......আদি কাল হতেই নরঘাতক, সত্যে কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকে নি, কারণ তার মধ্যে কোন সত্য নাই। যখন সে কোন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে নিজের কথাই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী, আর সেই তার জনক।" জন ৮:৪৪ (বাইবেল)

"ডেভিল (শয়তান) আদিকাল হতেই পাপ করছে। এই কারণেই ঈশ্বরের পুত্র' আবির্ভূত হলেন, যাতে করে তিনি ডেভিলের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লোপ করতে পারেন।' —১ জন ৩:৮ (বাইবেল)। অর্থাৎ মানবের নিজ অন্তরে খৃস্টচৈতন্যের প্রকাশ অবলীলাক্রমে মায়ার "ক্রিয়া" অথবা ভ্রান্তিসকল লোপ করতে পারে। মায়া অনাদি, কারণ জড়বিশ্বের সৃষ্টিকার্যে এ ওতোপ্রোতঃ ভাবে, বিজড়িত আর সেই দৈব নিত্যতার সতত বিরোধে এ চিরপ্রবাহিত।

৩১শ পরিচ্ছেদ

পুণ্যশীলা মাতা কাশীমণি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনসঙ্গিনী শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা বহুদিন হতেই মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। অল্প কিছুদিনের জন্য কাশীতে গিয়ে আমার সে বাসনা পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে গেলুম।

গরুড়েশ্বর মহল্লায় লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমায় সমাদরে গ্রহণ করলেন। বার্ধক্যসত্ত্বেও তাঁর আকৃতি যেন একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত, অদৃশ্যভাবে আধ্যাত্মিক সৌরভ তা থেকে নির্গত হচ্ছে। তিনি মাধ্যমাকৃতি, ক্ষীণ গ্রীবা, গৌরবর্ণা এবং তাঁর চক্ষু দু'টি অতীব উজ্জ্বল।

প্রণাম করে বললুম, "পূজনীয়া মা, আপনার মহাপুরুষ স্বামীর কাছে আমি শৈশবেই দীক্ষিত হয়েছিলুম। তিনি আমার পিতামাতা আর আমার নিজগুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীরও গুরু ছিলেন। তা হলে আপনার পুণ্য-জীবনের কাহিনী কিছু শোনবার সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পেতে পারি, কি বলেন?"

তিনি আমাকে স্নেহভরে ডেকে বললেন, "এস বাবা, এস—ওপরে চল!"

কাশীমণি মাতা পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন একটি অতিক্ষুদ্র ঘরে যেখানে কিছুদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাস করেছিলেন। এই সেই পবিত্র তীর্থ যেখানে সেই অদ্বিতীয় মহাগুরু মানবজীবনের বিবাহনাটক অভিনয় করবার সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন,—দর্শন করে কৃতার্থ বোধ করলুম। সেই মহিমময়ী নারী তাঁর পাশের একটি গদির উপর আমায় বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, "স্বামীর দৈবপ্রকৃতি জানতে আমার অনেক দিনই লেগেছিল। একরাত্রে, এই ঘরেতেই একটা পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলুম—আমার মাথার উপর স্বর্গদূতেরা কল্পনাতীত মাধুর্যের সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছেন। দৃশ্যটা এতদূর বাস্তব বলে বোধ হল যে আমি তখনই জেগে উঠলুম; ঘরটি তখনও উজ্জ্বল আলোয় অদ্ভুতভাবে ভরে রয়েছে!

"আমার স্বামী পদ্মাসনে বসে, ঘরের মাঝখানে তাঁর দেহ শূন্যে ভাসছে

আর স্বর্গদূতেরা সব করজোড়ে স্তবস্তুতি করছেন। এতদূর আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, আমার বিশ্বাস হল যেন আমি স্বপ্ন দেখছি।

"লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'নারী, এ তোমার স্বপ্ন নয়! তোমার মোহনিদ্রা চিরকাল, চিরকালের জন্য পরিত্যাগ কর!' তারপর ধীরে ধীরে যখন তিনি মাটিতে নেমে এলেন, তখন আমি তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম।

"বললুম, 'গুরু, বার বার আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে স্বামী বলে ভাবাতে আমার যে অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করবেন কি? লজ্জায় মরে যাই এ কথা ভেবে যে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমি কিনা তাঁরই পাশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে এতদিন মোহঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আজ রাত থেকে আর আপনি আমার স্বামী নন, আমার গুরু। এই দীনাহীনা নারীকে আপনার শিষ্যা বলে গ্রহণ করবেন কি?'*

"গুরুদেব আমায় মৃদুস্পর্শ করে বললেন, 'পবিত্র আত্মা, ওঠ, তোমায় গ্রহণ করলুম।' তারপর তিনি দেবদূতদের দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইসকল পুণ্যাত্মা সাধুসন্তদের একে একে প্রণাম কর।'

"যখন আমি নতজানু হয়ে সবাইকে প্রণাম করা শেষ করলুম, তখন সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর সব একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল—যেন কোন প্রাচীন শাস্ত্র হতে উদাত্ত গম্ভীরস্বরে সমবেত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে।

" 'দেবতার সঙ্গিনী, আপনি পুণ্যবতী, আপনাকে আমরা প্রণাম করি।" বলে তাঁরা সব আমার পদতলে প্রণাম করলেন, আর আশ্চর্য!—সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জ্যোতির্ময় মূর্তিসকল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার।

"আমার গুরু ক্রিয়াযোগে আমায় দীক্ষা নিতে বললেন। আমি বললুম, নিশ্চয়ই নেব। হায়রে, আমার এমনই পোড়াকপাল যে ক্রিয়াযোগের আশীর্বাদ অনেকদিন আগেই পাইনি।'

"লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন, 'তখনও সময় হয় নি তাই, বুঝলে? তোমার অনেক কর্মফল আমি নীরবে খণ্ডন করে দিয়েছি, এখন তুমি যোগ্য হয়েছ বলেই তোমার ইচ্ছা হয়েছে।'

"তারপর তিনি আমার ললাট স্পর্শ করলেন। একটা ঘূর্ণায়মান জ্যোতিঃপিণ্ড দেখা দিল। সেই জ্যোতিঃপ্রভা ক্রমশঃ ওপ্যালের মত নীল আধ্যাত্মিক চক্ষুতে পরিণত হল—সোনার বেড়দেওয়া, মাঝখানে একটি পঞ্চকোণ তারকা।

---

* "স্বামী কেবল ঈশ্বরের জন্য, আর স্ত্রী তাঁর মধ্যস্থিত ঈশ্বরের জন্য।"—মিলটন।

" 'তোমার জ্ঞান ঐ তারা ভেদ করে অনন্তরাজ্যের দিকে প্রসারিত কর,' আমার গুরুদেবের কণ্ঠে নতুন স্বর, দূর হতে ভেসে আসা গানের মত মৃদু ও কোমল।

"স্বপ্নের পর স্বপ্ন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আমার আত্মার তটপ্রান্তে এসে আছড়ে পড়তে লাগল, তারপর চতুর্দিককার পরিদৃশ্যমান জগৎ অবশেষে মিলিয়ে গিয়ে আনন্দসমুদ্রে পরিণত হল। সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গে ডুবে গিয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলুম। ঘণ্টাকতক পরে যখন আমার এ জগতের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, গুরুদেব তখন আমায় ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা দিলেন।

"সেই রাত থেকেই লাহিড়ী মহাশয় আমার ঘরে আর কখনও শোন নি। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নীচেকার সামনের ঘরে দিবারাত্র থাকতেন।"

এই কথাগুলি বলে সেই মহিমময়ী নারী চুপ করলেন। সেই মহান যোগীর সঙ্গে তাঁর অপূর্ব সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আমি তাঁর জীবনের আরও গুটিকতক কথা তখন শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম।

"বাবা, তোমার লোভ বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি। যাক্, বেশী কিছু আর বলব না, আর একটিমাত্র ঘটনা তোমায় বলব।" বলে একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে আবার শুরু করলেন, "আমার গুরু-স্বামীর কাছে যে একটি পাপ করেছিলুম আজ তা স্বীকার করব। আমার দীক্ষার মাসকতক পরে আমি নিজেকে তাঁর কাছে পরিত্যক্ত আর অবহেলিত বলে বোধ করতে আরম্ভ করলুম। একদিন লাহিড়ী মহাশয় এই ছোট্ট ঘরটিতে একটি জিনিষ নিতে ঢুকলেন, আমিও তাড়াতাড়ি তাঁর পিছন পিছন এলুম। দারুণ মোহঘোরে অন্ধ হয়ে তাঁকে খোঁটা দিয়ে বললুম, 'আপনার সব সময়টাই শিষ্যদের নিয়ে কাটে। আপনার স্ত্রীপুত্রের জন্য কি কোন কর্তব্য নেই? সংসার চালাবার জন্য আরো যে টাকার দরকার, তা যোগাবার আপনার গরজ নেই, এ বড় দুঃখের কথা।'

"গুরুদেব একটিবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তারপরেই ব্যস, একেবারে অদৃশ্য! ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে শুনলুম একটা মাত্র কণ্ঠস্বর ঘরের চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, 'দেখছ না, এ একেবারে শূন্য! আমার মত একটা শূন্য পদার্থ তোমার জন্য টাকা আনবে কি করে, বল?'

"আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "গুরুদেব, আমি কোটি কোটিবার আপনার কাছ থেকে মাপ চাইছি। আমার পাপচক্ষু আপনাকে তো আর দেখতে পাচ্ছে না। দয়া করে আপনি আপনার পুণ্যদেহে আবার ফিরে আসুন!'

"মাথার উপর শূন্য থেকে উত্তর ভেসে এল, 'এই যে আমি এখানে'। মাথা

তুলে দেখি শূন্যে গুরুদেবের দেহ, মস্তক ঘরের ছাদ স্পর্শ করে রয়েছে। চক্ষু দুটি যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! নিঃশব্দে তিনি মেঝের উপর নেমে এলে ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম।

"তিনি বলতে লাগলেন, 'নারী, সেই পরমধনকে খোঁজ, এ সংসারের তুচ্ছ টাকাকড়ি নয়। অন্তরে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করলে দেখতে পাবে যে, বাইরের সাহায্য সর্বদাই আসছে। তারপর আশ্বাস দিয়ে তিনি আমায় বললেন, 'আমার একটি অধ্যাত্মপুত্র তোমায় সাহায্য করবে দেখো, কিছু ভাবনা নাই!"

"গুরুজীর কথা সত্যিসত্যিই ফলে গেল; একটি শিষ্য আমাদের সংসারের জন্যে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিল।"

তাঁর অপূর্ব সব অভিজ্ঞতার বিষয় শ্রবণ করে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম।* তার পরদিন পুনরায় তাঁদের বাড়ীতে গেলুম। দেখা হল তাঁদের দুই ছেলের সঙ্গে—তিনকড়ি আর দুকড়ি লাহিড়ী। দুজনেরই আকৃতি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট, কণ্ঠস্বর কোমল আর বনিয়াদী ব্যবহারে স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য! ঘণ্টাকতক ধরে তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা চলল। ভারতের শ্রেষ্ঠ গৃহীযোগীর এই সাধুপ্রকৃতি পুত্রদ্বয় তাঁর আদর্শ অতি নিবিড়ভাবেই অনুসরণ করে চলতেন।

তাঁর স্ত্রীই যে লাহিড়ী মহাশয়ের একমাত্র শিষ্যা ছিলেন তা নয়, আরও শত শত শিষ্যা ছিলেন; আমার মা হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন। একটি মহিলাশিষ্যা সেই মহাগুরুর কাছ থেকে একবার তাঁর একটি ফটোগ্রাফ চাইলেন। তিনি তাঁর হাতে ছবিখানি দিয়ে বললেন, "তুমি যদি এটাকে রক্ষাকবচ বলে মনে কর, তবে এ তাইই হবে; আর তা না হলে এটা শুধু কেবল ছবি হয়েই থাকবে।"

দিনকতক পরে উক্ত স্ত্রীলোকটি আর লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রবধূ একদিন একটা টেবিলের উপর গীতা রেখে পড়ছিলেন। টেবিলটার পিছনেই সেই ফটোগ্রাফটি টাঙান ছিল, হঠাৎ তখন প্রচণ্ড জল ঝড় বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল।

ভয়ে স্ত্রীলোকদুটি ছবির সামনে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন, "লাহিড়ী মহাশয়, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন।" দৈবক্রমে হঠাৎ একটা বাজ এসে পড়ল তাঁরা যে বই পড়ছিলেন তার উপর, কিন্তু ভক্তদুটি অক্ষত দেহে রক্ষা পেয়ে গেলেন। সেই শিষ্যাটি পরে বলেছিলেন, "আমার

*পরমারাধ্যা কাশীমণিমাতা ২৫শে মার্চ ১৯৩০ সালে বারাণসীতে পরলোকগমন করেন।

মনে হল যেন একটা বরফের চাঁই আমায় চারধারে ঘিরে রেখেছিল, বাজের আগুনে ঝলসে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।"

অভয়া নামে আর একটি শিষ্যার বেলায়ও লাহিড়ী মহাশয়কে দুটি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতে হয়েছিল। অভয়া আর তার স্বামী, কলকাতার একজন উকীল, গুরুদর্শনের জন্য একদিন কাশী যাত্রা করলেন। রাস্তায় খুব ভিড় থাকাতে ভাড়াটে গাড়ীর হয়ে গেল দেরী। ষ্টেশনে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলেন, কাশীর গাড়ী বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে।

এধারে অভয়া টিকিট ঘরের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মনে মনে নীরবে তার গভীর প্রার্থনা চলেছে, "লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পায়ে পড়ি, গাড়ীটা থামিয়ে দিন, থামিয়ে দিন! আপনার দর্শনলাভে আরও একদিন বিলম্ব হবে, এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

ব্যস্! এধারে ট্রেনের চাকা ঘর্ঘর করে ঘুরেই চলেছে অথচ গাড়ী এক পাও আর এগোচ্ছে না। গাড়ীর ইঞ্জিনচালক, আরোহীরা সবাই প্ল্যাটফরমে নেমে পড়ল এই অদ্ভুতব্যাপার সন্দর্শনের জন্য। একজন সাহেব গার্ড অভয়া আর তাঁর স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল, আর যা কখনও করে না তাই সে করে বসল—বললে, "বাবু, আমায় টাকা দিন, আমি আপনাদের টিকিট কিনে এনে দিচ্ছি আর আপনারা ততক্ষণ গাড়ীতে উঠে বসুন।"

স্বামী-স্ত্রী দুজনে যেমনি গাড়ীতে উঠে বসল আর টিকিটও পেয়ে গেল, ট্রেনও অমনি ধীরগতিতে অগ্রসর হতে লাগল! ইঞ্জিনচালক, গাড়ীর যাত্রীরা তো সব ভয়েময়ে একেবারে হুড়মুড় করে গাড়ীতে ঢুকে পড়ল—জানতেও পারলে না যে, কি করেই বা প্রথমে ট্রেনের গতি বন্ধ হয়েছিল আর কি করেই বা তা ফের চলতে শুরু করল।

কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে পেঁাছে অভয়া তো নীরবে গুরুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গেল। লাহিড়ী মহাশয় বললেন, "একটু স্থির হও অভয়া, একটু ঠাণ্ডা হও, তুমি আমায় কি জ্বালাতনটাই না কর, বল দেখি! তুমি যেন এর পরের ট্রেনটায় আর আমার এখানে আসতে পারতে না"!

আর একটি ব্যাপারে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উক্ত শিষ্যা গিয়ে ধরে পড়েছিল, সেটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা। এবার গুরুদেবের কাছে অভয়ার সাহায্যপ্রার্থনা আর ট্রেনের জন্য নয়, এবার তার সন্তানের জন্য।

অভয়া তো যথারীতি গুরুদেবের পাদবন্দনা শেষ করে তারপর তার অন্তরের বাসনা জানালে, "গুরুদেব, এবার আমার নবম সন্তানটি যেন জন্মে বেঁচে

থাকে। আটটি আমার সন্তান হল ; কিন্তু সব কটি জন্মাবার পরই মারা গেছে, একটিও আর বেঁচে নেই।"

করুণাবিগলিত মধুর হাসিতে প্রসন্নবদন গুরুদেব বললেন, "এবার তোমার সন্তানটি নিশ্চয়ই বাঁচবে, দেখো। আমার উপদেশগুলো কিন্তু বেশ করে মন দিয়ে শোন। এবার হবে তোমার একটি কন্যাসন্তান, রাত্রিতেই ভূমিষ্ঠ হবে। শুধু এইটুকু নজর রেখো যে তোমাদের পিদীমটা যেন ভোর অবধি জ্বলতে থাকে, কিছুতেই যেন না নিভে যায়। ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন, তাহলেই পিদীমটা নিভে যাবে।"

অভয়ার সন্তানটি হল কন্যা, রাত্রেই ভূমিষ্ঠ হল—সর্বদর্শী গুরু যেমনটি বলে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি। প্রসূতি ধাইকে প্রদীপটা তেল ভর্তি করে রাখতে বলেছিলেন। স্ত্রীলোক দুটি সারারাত জেগে শেষরাত অবধি পাহারা দিলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ঘুমিয়েই পড়ল। এধারে প্রদীপের তেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ; আলোটা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে "খাবি" খাচ্ছে।

আঁতুড় ঘরের দরজার খিলটা ঘটাং করে খুলে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ঝন্‌ঝন্‌ করে দুধারে খুলে গেল। স্ত্রীলোকদুটি ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে আশ্চর্য হয়ে দেখে যে লাহিড়ী মহাশয় সামনে দাঁড়িয়ে ; প্রদীপটা দেখিয়ে দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় বললেন, "অভয়া, দেখ দেখ, আলোটা এবার নিভল বলে।" ধাইটা দৌড়ে তেল এনে ভর্তি করে দিলে। আবার যেই আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অমনি গুরুদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর খিলও পড়ে গেল, কিন্তু কে যে দিয়ে দিল তা চোখে দেখা গেল না।

অভয়ার নবম সন্তানটি বেঁচে গেল ; ১৯৩৫ সালে আমি খবর নিয়েছিলুম যে সেটি তখনও জীবিত।

লাহিড়ী মহাশয়ের অপর একটি শিষ্য, শ্রদ্ধেয় কালীকুমার রায় গুরুর সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের বহু কৌতূহলোদ্দীপক মনোরম কাহিনী আমায় বলেছিলেন।

কালীবাবু বললেন, "কাশীর বাড়ীতে আমি প্রায়ই কয়েক হপ্তা ধরে তাঁর অতিথি হয়ে থাকতুম। দেখতুম যে বহু সাধুসন্ত, দণ্ডীস্বামীরা* রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর চরণতলে এসে সমবেত হতেন। কখনও কখনও ধ্যান-ধারণা বা দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা হত। ঊষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই

*দণ্ডীরা মানবশরীরে মানবমেরুদণ্ডের প্রতীক দণ্ড, এই আশ্রমচিহ্ন ধারণ করে চলেন। মেরুদণ্ডে সাতটি চক্র ভেদই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ।

পূজনীয় অতিথিবর্গ সব একে একে প্রস্থান করতেন। আমার থাকবার সময় দেখেছিলুম যে লাহিড়ী মহাশয় ঘুমোবার জন্যে একবারও শুতেন না বা চোখের পাতা বুঁজোতেন না।”

কালীবাবু বলতে লাগলেন, “গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম প্রথম সঙ্গ করবার সময় আমার মনিবের কাছ থেকে বিস্তর বাধাবিপত্তি সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি ওসব ধর্মটর্মের কোন ধার ধারতেন না। টিটকারি দিয়ে শ্লেষপূর্ণস্বরে বলতেন, “আমার কর্মচারীদের ভেতর ধর্ম ধর্ম করে পাগল কোন লোক চাই না—আর, আমি যদি তোমার সেই বুজরুক গুরুটিকে একবার দেখতে পাই তো, তা হলে তাঁকে এমন গুটিকতক কথা শুনিয়ে দেব যে, বহুদিন তাঁর তা মনে থাকবে।”

“কিন্তু এই রকম করে ভয় দেখানতেও আমার রোজকার যাওয়া-আসা কিছুমাত্র কমল না। প্রায় প্রতিসন্ধ্যাই আমি গুরুর সঙ্গে কাটাতুম। একদিন সন্ধ্যায় আমার মনিবটি আমায় অনুসরণ করে এসে লাহিড়ী মহাশয়ের বৈঠকখানায় উদ্ধতভাবে সবেগে ঢুকে পড়লেন। মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন যে, একবার দেখা হলে হয়, তা হলে যেমনটি সেদিন বলেছিলেন তেমনি দারুণ বচন শুনিয়ে দেবেন। ঘরে তখন গুটি বার শিষ্য বসে। যাক, প্রভু যেমনি ঘরের মধ্যে গুছিয়েটুছিয়ে বেশ সুস্থির হয়ে বসলেন, অমনি লাহিড়ী মহাশয়ও শুরু করলেন তাঁর সেই সব শিষ্যদের ডেকে, ‘দেখ, তোমরা সবাই একটা ছবি দেখতে চাও, ত’ বল ?

“আমরা যখন ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, তখন তিনি ঘরটি অন্ধকার করতে বলে বললেন, “আচ্ছা, তোমরা একজনের পিছনে একজন এমনি করে চক্রাকারে গোল হয়ে বস, আর প্রত্যেকেই তার সামনের লোকের চোখের উপর হাত দিয়ে টিপে বন্ধ করে ধর।’

“আশ্চর্য, আমার মনিবটিও, কিন্তু যদিও ঈষৎ অনিচ্ছাক্রমে, তবুও গুরুদেবের নির্দেশ পালন করে গেলেন। মিনিটকতকের মধ্যেই লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি দেখছি তা তাঁকে বলতে।

“আমি বললুম, ‘মহাশয়, একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখা যাচ্ছে, পরণে তার লালপেড়ে শাড়ী, একটা কচুগাছের কাছে দাঁড়িয়ে।’ অন্যান্য শিষ্যেরাও সব একই বর্ণনা দিলে। গুরুদেব আমার মনিবের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘স্ত্রীলোকটি চেন না কি ?’

“লোকটির মনে তখন এক অদ্ভুত ভাবের ঝড় উঠেছে, সামলাতে পারছেন না ; শেষ অবধি বলেই ফেললেন, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বইকি, কি বলব বলুন ;

ঘরে সুন্দরী সাধ্বী-স্ত্রী থাকতেও আমি স্ত্রীলোকটির পিছনে বোকার মত টাকা ঢালছি। যে মতলব করে আমি এখানে এসেছিলুম, তার জন্যে মনে মনে আমি বাস্তবিক বড়ই লজ্জিত ; আপনি আমায় ক্ষমা করে আপনার শিষ্য করে নেবেন কি ?'

" 'যদি তুমি অন্ততঃ মাসছয়েক খুব সৎভাবে জীবন যাপন করতে পার, তবেই তোমায় আমি গ্রহণ করব', তারপর যেন একটু হেঁয়ালিতেই বললেন, 'তা না হলে তোমায় দীক্ষা দেবার কোন প্রয়োজনই হবে না।'

"মাস তিনেক ধরে তো আমার মনিবটি লোভ সংবরণ করে রইলেন, কিন্তু তারপরই আবার সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার পূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হল। মাসদুই পরেই তিনি মারা গেলেন। এইবার বুঝতে পারলুম যে আমার মনিবের দীক্ষার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে কেন গুরুদেব হেঁয়ালিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বরেণ্য বন্ধু ছিলেন—তিনি হচ্ছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। বয়স লোকে বলে তিনশ বছরেরও উপর। মহাযোগিদ্বয় প্রায়ই একত্র ধ্যানে বসতেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী এত বেশী সুপরিচিত আর তাঁর যশ এত সুদূরবিস্তৃত ছিল যে, তাঁর অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্নই উত্থাপন করে না। আজকে যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে নিউইয়র্ক সহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলতে গিয়ে তাঁর দৈবশক্তি প্রদর্শনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করতেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামী বহুবৎসর পূর্বে কাশীর গলি দিয়ে হেঁটে যেতে সেই রকমই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই সব সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে একজন, যাঁরা ভারতবর্ষকে কালের গ্রাস হতে রক্ষা করে এসেছেন।

বহু সময় ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখা যেত—কালকূট বিষ তিনি পান করেছেন, তবু তাতে তাঁর কোনই কুফল হয় নি। হাজার হাজার লোক, তাদের মধ্যে জনকতক এখনও বেঁচে—গঙ্গার জলের উপর ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে ভাসতে দেখেছেন। দিনের পর দিন তিনি জলের উপর বসে অথবা জলের তলায় বহুক্ষণ ধরে লুকিয়ে পড়ে থাকতেন। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে প্রচণ্ড সূর্যকিরণে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর ত্রৈলঙ্গ স্বামী নিস্পন্দভাবে পড়ে রয়েছেন—এ একটা অতি সাধারণ দৃশ্য ছিল। এই সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তিনি মানুষকে এই বলেই শিক্ষা দিতে চাইতেন যে, যোগীর জীবন শুধু অক্সিজেন অথবা কতকগুলি অবস্থাবিশেষ বা কোনপ্রকার সাবধানতার উপর নির্ভর করে না। জলের উপরেই হোক আর নিচেই হোক, কি দারুণ উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর তাঁর নিস্পন্দ উলঙ্গদেহ পড়ে থাকুক, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরচৈতন্যের মধ্যেই সঞ্জীবিত, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

যোগিবর যে শুধু আধ্যাত্মিকতায়ই বিরাট ছিলেন তা নয়, দেহটিও ছিল বিপুল। ওজন ছিল তিনশত পাউন্ড অর্থাৎ আয়ুর প্রত্যেক বছরের দরুণ এক পাউন্ড হিসাবে আর কি। আহার করতেন কচিৎ কদাচিৎ কাজেই দেহ কেমন করে যে এরূপ বিশাল হল, তা বাস্তবিক রহস্যজনক। সিদ্ধযোগীরা স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মকানুন সব উপেক্ষা করে চলতে পারেন, যখন কোন বিশেষ কারণে তা করার দরকার হয়। তা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম, অতি গূঢ়, কেবল তিনি স্বয়ং জানেন। বড় বড় সাধুসন্তরা, যাঁদের মায়াস্বপ্ন টুটে গেছে আর এই বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরের মনের একটা পরিকল্পনা বলেই বোধ হয়েছে, তাঁরা শরীরকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তাঁরা জানেন যে এ আর কিছু নয়, ঘনীভূত শক্তির একটা কার্যসাধক আকার আর কি। যদিও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আজকাল বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে, জড় পদার্থ আসলে ঘনীভূত শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, পূর্ণজ্ঞানী যোগীরা কিন্তু জড়নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে বহুদিন আগে থেকেই শুধু কল্পনার ক্ষেত্র থেকে ব্যবহারের পারদর্শিতায় পৌঁচেছেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী সর্বদাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন আর কাশীর পুলিশকেও তাঁকে নিয়ে এক দারুণ সমস্যায় পড়ে অত্যন্ত বিব্রত থাকতে হত। দিগম্বর স্বামীজী ইডেন উদ্যানে আদিনর আদমের মত তাঁর উলঙ্গ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পুলিশ কিন্তু এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল, আর এ নিয়ে খুবই হাঙ্গামা বাধাত। কথা নাই বার্তা নাই, একদিন জেলেই পুরে দিলে। চারধারে গোলমাল শুরু হল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল যে বিরাটবপু ত্রৈলঙ্গ স্বামী কারাগারের ছাতের উপর পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কুঠুরিতে তখনও মজবুত তালাচাবি ঝুলছে। কি করে যে বেরুলেন তা কেউই বলতে পারে না।

হতাশ হয়ে গিয়ে আবার পুলিশের লোকেরা তাঁকে কুঠুরিতে ঢোকালে, এবার কিন্তু দরজার কাছে একজন প্রহরী রাখা হল। কিন্তু হলে কি হবে? দৈবশক্তির কাছে আইন আবার হেরে গেল। আবার দেখা গেল যে, ত্রৈলঙ্গ স্বামী পরম ঔদাসীন্যের সহিত ছাতের উপর পাদচারণ করে বেড়াচ্ছেন—কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। বিচারের দেবতা অন্ধ, বিভ্রান্ত পুলিশের লোকেরা তাকেই অনুসরণ করতে চাইল।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী সর্বদা মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতেন। তাঁর সুডৌল মুখ আর বিরাট পিপার মতন উদর থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী কদাচিৎ আহার করতেন। হয়ত কয়েক হপ্তা ধরে উপবাসে কাটাবার পর তাঁর ভক্তদের আনা কিছু ঘোল

খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। জনৈক অবিশ্বাসী ব্যক্তি একবার মনে করলে যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একটা ভণ্ড বা বুজরুক বলে প্রমাণ করে দেবে। এই না মতলব করে সে করলে কি, একটা বড় বালতিতে করে একবালতি কলিচূণগোলা এনে স্বামীজীর সামনে রেখে কপট ভক্তিসহকারে নিবেদন করলে, "প্রভু, আপনার জন্যে এই একটু ঘোল এনেছি, দয়া করে পান করুন।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই অবিচলিতভাবে শেষবিন্দুটি পর্যন্ত পান করে ফেললেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই দুষ্টলোকটি মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, "বাঁচান, স্বামীজী বাঁচান! আগুনে জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম! ভেতরে সব জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, এ দুষ্টু পরীক্ষা করে বড় অন্যায় করেছি, মাপ করুন, স্বামীজী, এবারকার মত মাপ করুন।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করে তখন বললেন, "ঠাট্টা করতে এসেছ, বোঝনি তো যে, যখন তুমি আমায় বিষ খেতে দিলে তখন তোমার জীবন আর আমার জীবন এক সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল। দেখ, যদি না আমার এ জ্ঞানটুকু থাকত যে, যেমন সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে ঈশ্বর আছেন তেমনি আমার উদরের মধ্যেও আছেন, এ চূণগোলা জল তো আমায় একেবারে সাবাড় করে দিত। এখন তো ভগবানের সূক্ষ্মবিচারের সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা হল; আবার যেন অন্য কারুর সঙ্গে কোন রকম চালাকি করতে যেও না।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সদুপদেশে চৈতন্যোৎপাদন হতে লোকটা আস্তে আস্তে চুপি চুপি সরে পড়ল।

এই যে যন্ত্রণাভোগের স্থানপরিবর্তন, কোথায় ত্রৈলঙ্গ স্বামী চূণগোলা জল খেয়ে জ্বলে পুড়ে মরে যাবেন—না সে জায়গায় যে দুষ্টলোকটা তাঁকে খেতে দিয়েছিল সেই উল্টে জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল, এটা স্বামীজীর কোন প্রকার ইচ্ছাপ্রসূত যে তা নয়, এ হচ্ছে ভগবানের ন্যায়দণ্ড পরিচালনায় অমোঘ বিচার* যাতে করে সৃষ্টির সুদূরতম গ্রহও পরিচালিত হয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত যাঁদের আত্মজ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁদের জন্য ঈশ্বরের অমোঘ বিধি অবিলম্বে কার্যে পরিণত

*II কিংস ২:১৯-২৪ (বাইবেল)। জেরিকোতে এলিশা, "জলশোধনের অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করবার পর ছেলেদের একটা দল তাঁকে উপহাস করাতে, সেখানে দুটো ভালুকী বন থেকে বেরিয়ে এল আর তাদের মধ্য থেকে বিয়াল্লিশ জন ছেলেদের একেবারে ছিঁড়ে ফেললে।"

হয়। তাঁরা তাঁদের সাধনপথের প্রতিবন্ধক যে অহংভাব, তা বহুদিন আগেই দূরে করতে পেরেছেন।

এই যে স্বয়ংক্রিয় ন্যায়ের বিধান, তার প্রতিফল কোন্ ধার দিয়ে আর কি ভাবে যে আসে তা কেউ বলতে পারে না, (যেমন এই ত্রৈলঙ্গস্বামী আর তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাকারী সেই দুষ্ট লোকটার বেলা ঘটল) তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে মানুষের অন্যায় অবিচারের প্রতি আমাদের সদ্যসদ্য ক্রোধের কতকটা উপশম করে বই কি। যীশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, "প্রতিশোধ লওয়া আমারই কাজ ; প্রতিহিংসা আমার, আমিই প্রতিফল দেব"।* মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতা আর সামান্য উপায়ের আর প্রয়োজন কিসের ? জগৎসংসারই ঠিক এর হিসেব-নিকেশ করে তার নিশ্চয় প্রতিফল দেবে। ভ্রান্তমনে ভগবানের বিচার, প্রেম, সর্বদর্শিতা, অমরত্ব এ সবের সম্ভাবনার কথা অবজ্ঞা করেই উড়িয়ে দেওয়া হয়— "মনে হয় শাস্ত্রের ও সব ফাঁকা আওয়াজ, অমূলক কল্পনা।" এই রকম অবিবেচকের মত যাদের ধারণা, এতবড় বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট ব্যাপারেও যাদের মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করে না, তাদের জীবন ঘটনা পরম্পরায় এমন একটি বিপরীত ঘটনার সৃষ্টি করে যে তাতে করে তাদের শেষ পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণে বাধ্য করে।

জেরুসালেমে যীশুখ্রিস্টের বিজয় অভিযানের সময় ভগবৎবিধির সর্বশক্তি-মত্তার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর শিষ্যবর্গ আর বিরাট জনতা যখন আনন্দে চিৎকার করে বলছিল, "স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত, ভগবানের মহিমা অপার," কতকগুলি ফারিসী তখন একে অগৌরবের দৃশ্য বলে প্রতিবাদ করলে। তারা আপত্তি করে বললে, "প্রভু, আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন।"

যীশুখ্রিস্ট উত্তর দিলেন যে, যদি তাঁর শিষ্যদের চুপ করান হয়, তাহলে "পাথরেরাও তক্ষুণি চিৎকার করে উঠবে।"†

ফারিসীদের প্রতি এইরূপ তিরস্কারে যীশুখ্রিস্ট এই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভগবানের বিচার একটা রূপক কল্পনামাত্র নয়, আর সৎস্বভাবের লোক, যদি তার জিভ উপড়েও ফেলা যায়, তাহলেও সে এই বিশ্ববিধানের মূল, সৃষ্টির আদিশক্তি থেকে সে তার বাকশক্তি আর আত্মরক্ষার শক্তি ফিরে পাবে, তা কেউ রুখতে পারবে না।

যীশুখ্রিস্ট বলতে লাগলেন, "ভগবৎপরায়ণ লোকদের তোমরা চুপ করিয়ে দিতে চাও ? তাহলে তোমরা তো ঈশ্বরের বাণীরও কণ্ঠরোধ করতে পার—

---

*রোম্যান্স ১২:১৯ (বাইবেল)।

†লুক ১৯:৩৭-৪০ (বাইবেল)।

যাঁর মহিমা, যাঁর সর্বব্যাপিত্ব বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর, জলবায়ু, সৃষ্টির প্রতি অনুপরমাণু কীর্তন করে চলেছে। তোমরা কি চাও যে স্বর্গের শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে লোকে সমবেত হয়ে উৎসব করবে না, আর লক্ষ লক্ষ লোক মিলে কেবল তারা পৃথিবীতে যুদ্ধ আনার জন্যই একত্র সমবেত হবে, এই পরামর্শ দেবে? তাহলে ওহে ফারিসীগণ, তোমরা পৃথিবীর ভিত উলটে ফেলার জন্যে সব আয়োজন কর। কারণ কি জান? এই সব সাধুস্বভাব লোকেরাই শুধু নয়, তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যে দৈব সঙ্গীতের সুষমার সাক্ষীস্বরূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, সবই তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অসীম কৃপা একবার আমার সেজমামার উপর বর্ষিত হয়েছিল। সেজমামা একদিন দেখলেন যে স্বামীজী কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন, ভক্তেরা চারধারে ঘিরে। তিনি কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীর পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ে, ভক্তিভরে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠতেই দেখলেন যে, তাঁর বহুদিনের এক পুরাতন ব্যাধি একদম সেরে গেছে।*

জানা গেছে যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর এখন একমাত্র জীবিতা শিষ্যা হচ্ছেন শঙ্করী মায়ী জিউ। ইনি তাঁর একজন শিষ্যের কন্যা, শৈশব হতেই স্বামীজীর কাছ থেকে শিক্ষা পান। হিমালয়প্রদেশে বদরীনাথ, কেদারনাথ, অমরনাথ পশুপতিনাথ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন গুহায় প্রায় চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ব্রহ্মচারিণী শঙ্করীমায়ী ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখন তাঁর বয়স একশত বৎসরের উপর, আকৃতিতে বার্ধক্যের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। চুল কাল, দাঁতগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার আর অদম্য শক্তি ও উৎসাহ এখনও তাঁর বজায় আছে। এখন তিনি মেলা বা ঐ জাতীয় কোন ধর্মোৎসবের জন্যই মাঝে মাঝে তাঁর নির্জনবাস হতে বেরিয়ে আসেন।

শঙ্করী মায়ী জিউ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনি একবার বলেছিলেন যে, একদিন ব্যারাকপুরে যখন তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের

---

*ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনকথায় যীশুখৃস্টের বাণী স্মরণ হয়, "বিশ্বাসীরাই এই সব নিদর্শন দেখতে পাবে; আমার নামে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে) তারা শয়তানকে দূর করতে পারবে (অর্থাৎ পাপ হতে মুক্ত হতে পারবে); তাদের মুখে আসবে নূতন বাণী, তারা সর্পকে (প্রলোভন) জয় করতে পারবে। আর তারা যদি কোন কালকূটও পান করে, তাহলে সে কালকূটও তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হস্তস্পর্শ করলেই তারা আরোগ্য লাভ করবে"। মার্ক ১৬:১৭-১৮ (বাইবেল)।

কাছে বসেছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন।

তিনি স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, "অমর মহাগুরু তখন একটি ভিজে কাপড় পরেছিলেন। মনে হল যেন তিনি এইমাত্র নদী থেকে স্নান করে আসছেন। কতকগুলি উপদেশ দিয়ে তিনি আমায় আশীর্বাদধন্য করেন।"

বারাণসীতে কোন এক উপলক্ষ্যে একবার ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর স্বাভাবিক মৌনব্রত পরিত্যাগ করে প্রকাশ্যে লাহিড়ী মহাশয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর এক শিষ্য এতে আপত্তি জানালেন।

তিনি বললেন, 'মশায়, আপনি সন্ন্যাসী, সংসার ত্যাগ করেছেন, আপনি একজন গৃহীকে এ রকম সম্মান দেখাবেন কেন ?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী উত্তর দিলেন, "বেটা, লাহিড়ী মহাশয় হচ্ছেন মায়ের আদুরে ছেলে ; মা তাঁকে যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবেন। সাংসারিক লোক হিসাবে কর্তব্যপালন করতে করতে তিনি সেই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যা পাবার জন্যে আমি লেংটিটাও অবধি ত্যাগ করে এসেছি, বুঝলে ?"

৩২শ পরিচ্ছেদ

মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন

"তারপর ল্যাজারাস নামে জনৈক লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল……যীশু যখন শুনলেন, তিনি বললেন যে এ অসুখে মৃত্যু হবে না, ভগবানের মহিমা প্রকাশের জন্যেই এ অসুখ, এতে করে ঈশ্বরের পুত্রও মহিমান্বিত হয়ে উঠবেন।"*

শ্রীরামপুরে আশ্রমের বারান্দায় বসে এক রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল প্রভাতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিলেন। গুরুদেব ছাড়া আরও জনকতক শিষ্য সেখানে ছিলেন; আমিও রাঁচির জনকতক ছাত্রকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

গুরুদেব ব্যাখ্যা করলেন, "এই কথাগুলোতে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করলেন। যদিও তিনি আসলে ঈশ্বরের সহিত একাত্মীভূত, তবুও এখানে এইরূপ উল্লেখে তাঁর একটা গভীর নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য আছে। ঈশ্বরের পুত্র হচ্ছেন খ্রিস্ট বা মানুষের ভিতরের ব্রহ্মজ্ঞান। মরজগতের কেউ ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করতে পারে না। মানুষ তাঁর স্রষ্টাকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে একমাত্র তাঁর অনুসন্ধানের দ্বারা; মানুষ কি কোন নিরুপাধিক সত্তাকে মহিমান্বিত করতে পারে যা সে কিছুমাত্র জানে না? সাধুসন্তদিগের মস্তকোপরি যে 'জ্যোতির্মণ্ডল অর্থাৎ ছটা' তা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের ক্ষমতার নিদর্শন।

ল্যাজারাসের পুনরুজ্জীবনের অত্যাশ্চর্য গল্প শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী পড়ে যেতে লাগলেন। পড়া শেষ হলে গুরুদেব গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন, কোলের উপর সেই পবিত্র ধর্মশাস্ত্র খোলাই পড়ে রইল।

গুরুদেব অবশেষে গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন, "আমারও ঐ রকম একটি অলৌকিক ব্যাপার দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ই আমার একটি বন্ধুকে মৃতাবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করেন।"

শোনবার গভীর আগ্রহে ছেলেদের মুখে হাসি দেখা দিল। আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠলুম, কারণ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে শুধু দার্শনিক

---

*জন ১১:১-৪ (বাইবেল)।

আলোচনা নয়,' বিশেষ করে তাঁর গুরুদেবের যেকোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শোনবার মত আমার মধ্যেও যথেষ্ট বালকসুলভ গভীর উৎসাহ আর আগ্রহও বর্তমান ছিল।

গুরুজী শুরু করলেন, "রাম আর আমি ছিলুম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। লাজুক আর লোকজন তেমন পছন্দ করে না বলে রাম গভীররাত্রে আর ভোর-বেলায় আমাদের গুরু লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে আসত। সে সময় দিনের বেলাকার লোকেদের আর ভিড় থাকত না। রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলুম বলে সে আমাকে অনেক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভবের কথা গোপনে বলেছিল। তার আদর্শ সাহচর্যে আমারও প্রেরণা আসত।" কথাগুলি স্মরণ করে গুরুদেবের আনন মধুরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গুরুজী বলতে লাগলেন, "রামের এক দারুণ পরীক্ষা এল। সে এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। গুরুতর অসুখের সময় গুরুদেব অবশ্য ডাক্তার ডাকা বারণ করতেন না, কাজেই দুজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হল। চিকিৎসা খুব জোর চলতে লাগল বটে কিন্তু আমিও এধারে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পড়ে চোখের জলে ভেসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালুম। কিন্তু গুরুদেব আমায় বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে হেসে বললেন, 'আরে ডাক্তারেরা তো রামকে দেখছে তবে আর ভাবনা কি? সে ভাল হয়ে যাবে বই কি।'

"শুনে মনটা একটু হাল্কা হল। বন্ধুর বাড়ী ফিরলুম, গিয়ে দেখি অবস্থা খুবই খারাপ—মরণ শিয়রে।

"হতাশাকরুণ স্বরে একজন ডাক্তার বললেন, 'আর ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর দু'ঘণ্টা!' আবার দৌড়লুম লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে।

"'ডাক্তারেরা তো বিবেচক লোক, তাঁরা ঠিক চিকিৎসাই করছেন। রাম নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে দেখো!' বলেই আমাকে প্রফুল্লভাবে বিদায় দিলেন।

"রামের বাড়ীতে এসে দেখলুম যে ডাক্তার দুজনেই চলে গেছেন। একজন আবার দয়া করে একছত্র লিখেও রেখে গেছেন, 'আমাদের যতদূর করবার সবই করেছি, কিন্তু এর আর কোনো আশা নাই!'

"বন্ধুর চেহারা দেখে বোধ হল যে, সত্যিই মরণ ঘনিয়ে আসছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারলুম না লাহিড়ী মহাশয়ের কথা কেমন করে সত্য না হয়ে যায় অথচ রাম অতিদ্রুত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। দেখে মনে হতে লাগল যে 'এবার সব শেষ'। একবার বিশ্বাস আবার পরক্ষণেই ভীতিমূলক সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে বন্ধুর যতটা পারা যায়, সে সময় ত' তা সব করলুম।

একটু ঘোর কেটে যেতেই সে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'যুক্তেশ্বর, গুরুদেবের কাছে দৌড়ে যাও, বল গিয়ে যে আমি চললুম। আর বোলো যে, আমার শেষ কাজের আগে যেন তিনি আমার দেহকে আশীর্বাদ করেন।' এই কথাগুলি বলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাম মরণের কোলে ঢলে পড়ল।

"তার মৃত্যুশয্যার পাশে তো ঘণ্টাখানিক ধরে খুব খানিকটা কাঁদলুম। নীরবতার চির উপাসক—এখন সে মৃত্যুর গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন। অন্য একজন শিষ্য সেখানে এল। তাকে, যতক্ষণ না ফিরি বাড়ীতে থাকতে বলে অর্ধোন্মত্ত চিত্তে, শ্রান্তক্লান্তপদে চললুম গুরুর বাড়ীর দিকে।

"লাহিড়ী মহাশয় একগাল হেসে বললেন, 'রাম এখন কেমন আছে গো?' আর সামলাতে না পেরে একেবারে সোজাসুজি মুখের উপর বলে দিলুম, 'মশায়, শীগগিরই দেখতে পাবেন সে কেমন আছে। ঘণ্টাকতক বাদেই দেখবেন তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' আর স্থির থাকতে পারলুম না, একেবারে প্রবল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লুম।

" 'যুক্তেশ্বর, যুক্তেশ্বর, ধৈর্য ধর, একটু ঠাণ্ডা হও। এখন শান্ত হয়ে বসে একটু ধ্যান কর ত দেখি।' বলে গুরুদেব সমাধিতে মগ্ন হলেন। সেদিনকার বৈকাল আর রাত এক অখণ্ড নীরবতার মধ্য দিয়েই কাটল। মনকে শান্ত করবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করলুম।

"ভোরের দিকে লাহিড়ী মহাশয় আমার দিকে আশ্বাসসূচক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'এঃ, দেখছি যে তোমার মন এখনও শান্ত হয় নি! আরে কালকে তুমি আমায় কেন বললে না যে, ওষুধবিষুধ ছাড়া গোছের একটা প্রত্যক্ষ কিছু সাহায্য চাই, এঁ্যা?' তারপর রেড়ির তেলের প্রদীপটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা ছোট শিশিতে ঐ প্রদীপটা থেকে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে রামের মুখে সাতটা ফোঁটা ঢেলে দাওগে দেখি?'

"আমি তো একেবারে তীব্র আপত্তি করে উঠলুম, 'মশায়, সে লোকটা কাল দুপুরবেলা মারা গেছে আর এখন কি না আপনি বলছেন যে মুখে তেল ঢেলে দাও—এখন আর তেলের কি দরকার বলুন?'

" 'কুছ পরোয়া নেহি, যা বলি তাই কর দেখি', লাহিড়ী মহাশয়ের স্ফূর্তির কারণ তো কিছু বোধগম্য হল না। শোকের দারুণ যন্ত্রণা তখনও আমার উপশমিত হয়নি। যাক্, কি আর করা যায়, খানিকটা তেল তো ঢেলে নিয়ে রামের বাড়ীর দিকে এগোলুম।

"গিয়ে দেখি রামের শব মৃত্যুকঠিন, হিমশীতল। তার এ বীভৎস অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে, বাঁ হাত

আর ছিপি দিয়ে তার দাঁতিলাগা মুখের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে সেই তেল ঢালতে লাগলুম।

"এক, দুই, তিন,……চার, পাঁচ,……ছয়……সাত, যেমনি সপ্তম ফোঁটাটি তার মরণ-নীল হিমশীতল ওষ্টাধর স্পর্শ করলে, অমনি রামের দেহ ভীষণভাবে থর থর করে কেঁপে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসে রাম আশ্চর্য হয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহের মাংসপেশীগুলো সব সবেগে স্পন্দিত হচ্ছে।

"বেশ পরিষ্কার গলায় সে বললে, 'লাহিড়ী মহাশয়কে দেখলুম এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝখানে, যেন সূর্যের মতন জ্বলছেন। তিনি আমায় আদেশ করলেন, "ওঠ ওঠ, ঘুম ছেড়ে উঠে পড় আর যুক্তেশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার কাছে দেখা করতে এস।" '

"বলে ত রাম বেশ ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়ে, জামাকাপড় পরে আমার সঙ্গে চলল গুরুদর্শনের জন্যে। এই রকম সাংঘাতিক রোগের পর সে হাঁটবার মত বলই বা পেলে কি করে আর বেশ দিব্য সপ্রতিভভাবে গুরুদর্শনেই বা চলল কেমন করে, তা ভেবে তো বুদ্ধি আমার লোপ পাবার উপক্রম। অথচ চোখের সামনে যা দেখছি তা সবই সত্যি। আবার এ ধারে চোখকেও বিশ্বাস করি কেমন করে; ভেবে চিন্তে মাথা গেল একদম গুলিয়ে। রাম সোজাসুজি গুরুর কাছে পেঁছে তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে—চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার আনন্দাশ্রুধারা!

"গুরুদেব উল্লাসে একেবারে আত্মহারা। আমার দিকে চোখ মিট্ মিট্ করে একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বললেন, 'যুক্তেশ্বর, এবার থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটি রেড়ির তেলের শিশি সঙ্গে রাখতে ভুলবে না, কি বল? যখনই কোন মৃতদেহ দেখবে তখনই তার মুখে এই রেড়ির তেলের গোটাকতক ফোঁটা ফেলে দিও আর কি, তা হলেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসবে! আরে এ রেড়ির তেলের সাতটি ফোঁটা তোমার যমকেও নিশ্চয় হার মানাবে, তা দেখে নিও।"

" 'গুরুজী, আমায় আর ঠাট্টা করবেন না। ব্যাপারটা যে কি, তা এ পর্যন্ত তো আদৌ বুঝে উঠতে পারলুম না; কোথায় আমার ভুল হয়েছে বলুন দেখি?'

"লাহিড়ী মহাশয় বোঝাতে লাগলেন, 'দেখ, দু' দুবার আমি তোমায় বললুম যে রাম ভাল হয়ে উঠবে, তবুও তোমার আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল না। অবিশ্যি এ কথা আমি বলিনি যে ডাক্তারেরাই ওকে ভাল করে তুলবে। আমি শুধু এই কথাটি বলতে চেয়েছিলুম যে তারা কাছে রয়েছে তবে আর

ভাবনা কি। আমার দুটো কথার মধ্যে তো কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ডাক্তারদের কাজে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনি ; তাদেরও রোজগারপাতি করে বাঁচতে হবে তো!' তারপর আনন্দোচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'সর্বদা মনে রেখো সেই অক্ষর, অব্যয় পরমাত্মাই যে কোন লোককে আরাম করে তুলতে পারেন, ডাক্তার থাকুক আর নাই থাকুক।'

"অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তেই স্বীকার করলুম, 'এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন আমি জানলুম যে আপনার সামান্য দুটি কথায় সংসার অবধি উল্টে যেতে পারে।' "

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী এই অপূর্ব রোমাঞ্চকর কাহিনী শেষ করতেই স্তম্ভিত শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে একটি ছোট ছেলে প্রশ্ন করে বসল—যার দুটো অর্থ হয়, "মশায় আপনার গুরু রেড়ির তেল খেতে দিলেন কেন?"

"বাবা, তেল দেওয়ার কোন মানেই হয় না—কেবল এইটুকুমাত্র ছাড়া যে আমি প্রত্যক্ষ একটা কিছু চাই। তাই লাহিড়ী মহাশয় হাতের কাছে তেল পেয়ে তাই দিলেন, আমার বিশ্বাস অধিকতর জাগ্রত করবার একটা মূর্ত প্রতীক বলে আর কি। গুরুদেব রামকে মরে যেতে দিলেন কেন জান? আমি খানিকটা সন্দেহ করেছিলুম বলে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভগবান গুরু জানতেন যে, যেহেতু তিনি বলেছেন যে শিষ্যটি ভাল হয়ে যাবে, তাকে আরাম হতেই হবে—এমন কি মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েও—যা সাধারণতঃ একেবারে চরম পরিণাম।"

তারপর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ছোট্ট দলটিকে বিদায় দিয়ে আমাকে তাঁর পায়ের কাছে একটি কম্বল আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, "যোগানন্দ, তোমায় তো লাহিড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা ছেলেবেলা থেকেই ঘিরে আছেন। আমাদের মহাগুরু তাঁর মহিমময় জীবন আংশিক নির্জনতার মধ্যেই কাটিয়েছেন আর তাঁর অনুচরবর্গদের তাঁর শিক্ষা নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বরাবরই নিষেধ করে এসেছেন। যাই হোক, তিনি একটি অর্থপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, বলছি শোন।"

"তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেহত্যাগের পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার জীবন কথা লিখিত হবে, কারণ প্রতীচ্যে যোগ সম্বন্ধে তখন একটা গভীর আগ্রহ দেখা দেবে। এই যোগের বার্তা সে সময় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আর মানবজাতি যে এক পিতার সন্তান, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে তা বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে খুব সাহায্য করবে।'

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "বৎস যোগানন্দ, যোগের বাণী প্রচার

করতে আর তাঁর পবিত্র জীবনকথা লিপিবদ্ধ করতে তুমি অবশ্যই তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।"

লাহিড়ী মহাশয়ের ১৮৯৫ সালের তিরোভাবের তারিখ হতে ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় ১৯৪৫ সালে, এই বছরেই বর্তমান পুস্তক রচনার পরিসমাপ্তি হয়। আর এই ১৯৪৫ সালেই বিপ্লবকারী আণবিক শক্তির যুগ আরম্ভের যোগাযোগ দেখে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই! চিন্তাশীল মনীষীরা শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সমস্যা আশু সমাধানের জন্য আগের চেয়ে এখন বেশী মনঃসংযোগ করছেন, পাছে অবিরত জড়শক্তিপ্রয়োগে এই সব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থারও একেবারে চরম সমাধান হয়ে যায়!

যদি বা মানবজাতি আর তাদের কার্যকলাপ সময়ের প্রভাবে অথবা বোমার প্রসাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়, তাহলেও সূর্যদেব তাঁর পথ ছেড়ে কখনও বিপথে যাবেন না; গ্রহ-নক্ষত্র তো যে যার স্থানে বসে ঠিক নিয়মিত পাহারা দিয়ে যাবে। প্রাকৃতিক নিয়ম তো কখনও স্থগিত বা পরিবর্তিত হয় না, তাই মানুষ এদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চললে ভালই করবে। যদি বিশ্বপ্রকৃতি শক্তি-প্রদর্শনের বিরোধী হয়, সূর্য যদি গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের ক্ষুদ্র অধিকারটুকু ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়, তবে আর আমাদের মুষ্টি আস্ফালনের প্রয়োজন কি? সত্যিই কি কোন শান্তি আসবে এ থেকে? কাটাকাটি হানাহানি নয়, ক্রূরতা নয়, সদিচ্ছা আর প্রেমের শক্তিতেই বিশ্বপ্রকৃতির স্নায়ু শক্তিমান; পরিপূর্ণ শান্তিতেই মানবজাতি জানতে পারবে বিজয়লাভের অনন্ত ফল, আর তা শোণিতসিঞ্চিত মৃত্তিকাজাত বৃক্ষ হতে উৎপন্ন ফলের চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুমধুর।

এই যে এতবড় নামজাদা ইউনাইটেড নেশনস, তা তখন একটা অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিক, নামবিহীন, মানবহৃদয়ের মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর দুঃখনিবারণের জন্য উদার সহানুভূতি আর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের পার্থক্যের কেবলমাত্র একটা খুব বিজ্ঞ বিশ্লেষণ আর বিচার থেকে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে মানুষের একমাত্র গভীর ঐক্যবোধের ভিতর থেকে—ভগবানের সঙ্গে তার আত্মীয়তার মধ্য থেকে। পৃথিবীর চরম আদর্শ উপলব্ধির পথে—বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা—ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগস্থাপনের বিজ্ঞান এই যোগই যেন সকল দেশে সকল লোকের ভিতরই কালক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যদিও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কোন জাতির চেয়ে পুরাতন, তাহলেও অতি অল্প ঐতিহাসিকেরাই খবর রাখেন যে, তার জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার কৃতিত্ব

কোন দিক দিয়েই একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। তার কারণ ভারতবর্ষ যুগে যুগে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাত দিয়ে শাশ্বত সত্যকে যে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করে এসেছে, তারই এ একটা ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। শুধু বাঁচার জন্যেই বেঁচে থাকা, যুগে যুগে কর্মহীনতার পরিচয়ে—(কোন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত গবেষক কি আমাদের সত্যিই বলতে পারেন তা কতগুলি ?) কালের এই করাল আহ্বানে যে কোন জাতির চেয়ে ভারতবর্ষই তার যোগ্যতম উত্তর প্রদান করেছে।

বাইবেলের গল্পে এব্রাহাম যে ভগবানের কাছে আবেদন জানিয়েছিল* যে যদি দশটি সদাচারপরায়ণ লোক পাওয়া যায় তাহলে সোডম নগরী যেন ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পায়, তাতে দৈববাণী হয়েছিল যে, "আচ্ছা আমি ঐ রকম দশটি লোকের জন্যেই এ আর ধ্বংস করব না,"—ভারতবর্ষ যে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হবার হাত এড়িয়ে বেঁচে গেছে—সেই আলোকে এটি বিচার করলে উক্ত কথাগুলিতে নতুন অর্থপ্রদান করে। আজ মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম আর অন্যান্য মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধপটু জাতিসমূহ, যারা এক সময়ে ভারতবর্ষেরই সমসাময়িক ছিল, তারা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ভগবানের উত্তরে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন দেশের অস্তিত্ব বজায় থাকে—তার জড় উন্নতিতে নয়, তার অতিমানবদের কৃতিত্বেরই বলে।

আজকের এই বিংশ শতাব্দী অর্ধাংশ অতীত হবার পূর্বেই দুইটি মহাযুদ্ধের রক্তধারায় রঞ্জিত হয়েছে। আজ যেন আবার সেখানে ঈশ্বরের সেই বাণীই শোনা যায়, যে জাতির মধ্যে অন্ততঃ দশজনও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়—যারা সেই অমোঘ ন্যায় বিচারকের চক্ষে শ্রেষ্ঠ, সে জাতি কখনও ধ্বংসের পথে যেতে পারে না।

এই উপদেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ প্রমাণ করেছে যে, মহাকালের সহস্র চাতুরীর মাঝখানেও সে তার বুদ্ধি হারায় নি—বরাবরই মাথা ঠিক রেখে এসেছে। প্রতি শতাব্দীতেই সিদ্ধগুরুগণ তার মৃত্তিকা পবিত্র করে এসেছেন ; আধুনিক খৃষ্টতুল্য ঋষিগণ, লাহিড়ীমহাশয় বা তাঁর শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আজ এ কথা ঘোষণা করতে দণ্ডায়মান হয়েছেন যে, মানুষের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর জাতির আয়ুবৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরোপলব্ধির বিজ্ঞান, যোগ জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন আর তাঁর সার্বজনীন মতবাদ সম্বন্ধে অতি অল্প

* জেনেসিস ১৮:২৩-৩২ (বাইবেল)।

সংবাদই ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায়।* ভারতবর্ষ, আমেরিকা আর ইউরোপে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে আমি দেখে এসেছি যে মুক্তিবিধায়িনী তাঁর যোগের বাণী সম্বন্ধে লোকেদের কি গভীর আর আন্তরিক আগ্রহ। এখন প্রতীচীতে যেখানে আধুনিক শ্রেষ্ঠযোগীদের সম্বন্ধে লোকে অল্পই জানে সেখানে—তিনি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ঠিক সেই রকম মহাযোগীর একটি লিখিত জীবনচরিতের একান্ত প্রয়োজন।

১৮২৮ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় এক ধর্মনিষ্ঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে ঘুর্ণি নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা পূজ্যপাদ গৌরমোহন লাহিড়ী; লাহিড়ী মহাশয় হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মুক্তকেশীর গর্ভজাত একমাত্র সন্তান (গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তীর্থ ভ্রমণকালে পরলোক গমন করেন)। তাঁর অতি শৈশবেই মাতৃবিয়োগ ঘটে; আর তাঁর মাতাঠাকুরাণী একমাত্র মহাযোগীশ্বর শিবের ভক্ত উপাসক ছিলেন, এ ছাড়া আর বেশী কিছু তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না।

বালকের পিতৃদত্ত নাম হ'ল শ্যামাচরণ; ঘুর্ণিতে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থানেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁর বয়স যখন তিন কি চার, তখন প্রায়ই দেখা যেত যে তিনি বালির তলায় যোগাসনে বসে আছেন, শরীরটি বালির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, কেবল মাথাটি বার করা আছে।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ীদের সম্পত্তি সব বিনষ্ট হয়ে যায় যখন নিকটস্থ জলঙ্গী নদী তার গতি পরিবর্তন করে গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হয়। বাড়ীর ভিটার সঙ্গে লাহিড়ীদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরও গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করে। জনৈক ভক্ত শিবলিঙ্গটি ঘূর্ণয়মান জলস্রোত থেকে উদ্ধার করে একটি নূতন মন্দিরে সেটিকে স্থাপন করেন, এখন তা ঘুর্ণি শিবমণ্ডপ নামে সুপরিচিত।

গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয় পরিবারবর্গসহ নদীয়া পরিত্যাগ করে বারাণসীর অধিবাসী হন। সেখানেও তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি বৈদিক নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতেন ঠিক নিয়মিত পূজা অর্চনা, দানধ্যান, শাস্ত্রাধ্যয়ন ইত্যাদি করে। ন্যায়পরায়ণ ও সংস্কারমুক্ত বলে, তিনি আধুনিক মতের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করতেন না।

---

*শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়—স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র জীবনচরিত। লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয়ে লিখিত পুস্তকের এই অংশে আমি উক্ত পুস্তক হতে কয়েক পংক্তি অনুবাদ করে সংযোজিত করে দিয়েছি।

বালক শ্যামাচরণ কাশীর পাঠাগারে হিন্দী ও উর্দুতে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। জয়নারায়ণ ঘোষাল পরিচালিত বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। বেদাধ্যয়নে গভীর অধ্যবসায় নিয়োজিত করে বালক-যোগী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রবিচার আগ্রহসহকারে শুনতেন। তাঁদের মধ্যে তখন নাগভট্ট নামে একজন মারাঠী পণ্ডিত ছিলেন।

শ্যামাচরণ শান্ত, দয়াশীল আর সাহসী যুবক ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা সকলেই তাঁকে ভালবাসত। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুসমঞ্জস, বলিষ্ঠ দেহ ছিল তাঁর। সন্তরণে আর শারীরিক বিদ্যায় তিনি অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারতেন।

১৮৪৬ সালে শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষালের কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীকে শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বিবাহ করেন। কাশীমণি দেবী ছিলেন আদর্শ পত্নী—অতিথি আর দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং সমস্ত সাংসারিক কর্তব্য হাসিমুখে সম্পন্ন করতেন। বিবাহের ফলে তাঁদের তিনকড়ি আর দু'কড়ি নামে দুটি সাধুপ্রকৃতি পুত্রলাভ আর দুটি কন্যালাভ হয়েছিল।

১৮৫১ সালে তেইশ বৎসর বয়সে, লাহিড়ী মহাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সামরিক পূর্তবিভাগে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কার্যকালে তাঁর বহু পদোন্নতি হয়। ভগবানের কাছে তিনি যে একজন মহাযোগী বলেই প্রতিভাত হয়েছিলেন শুধু তাই নয়, এ সংসার নাট্যমঞ্চে মানবজীবনের নাট্যাভিনয়ে তিনি সামান্য অফিসকর্মচারীর অংশ অভিনয়েও কৃতকার্য হয়েছিলেন।

পূর্তবিভাগ নানা সময় লাহিড়ী মহাশয়কে গাজিপুর, মিরজাপুর, দানাপুর, নৈনিতাল, কাশী ও অন্যান্য স্থানে তাদের অফিসে বদলি করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর, লাহিড়ী মহাশয়ের উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ল। পরিবার-বর্গের জন্য তিনি কাশীতে নিরালা গরুড়েশ্বর মহল্লায় একটি বাড়ী খরিদ করেন।

তাঁর তেত্রিশ বৎসর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পুনর্জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখতে পান। হিমালয়ে রাণীক্ষেতের কাছে মহাগুরু বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয় আর তার দ্বারাই তিনি ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হন।

এই মঙ্গলপ্রসূ ঘটনা শুধু তাঁর একার জন্যই ঘটেনি,—সমগ্র মানবজাতির কাছে এ একটা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ। অবলুপ্ত অথবা বহুকাল বিলুপ্ত উচ্চতম যোগশিক্ষা আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত হল। পুরাণে কথিত ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে আকাশবাহিনী গঙ্গা* যেমন স্বর্গ হতে মর্তে আগমন করেছেন, এই "ক্রিয়াযোগ"ও

*পুণ্যসলিলা গঙ্গার উৎপত্তি হচ্ছে গভীর নিস্তব্ধতা যেথায় সদা বিরাজমান সেই

তেমনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে হিমালয়কন্দর হতে নির্গত হয়ে মানবের সংসারদাবদগ্ধ হৃদয়ে অমিয়ধারার প্লাবন বহাবার জন্যেই ছুটে চলেছে।

চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের একটি বরফগুহার ভিতর থেকে। শত শত বৎসর ধরে সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসী সন্তমহাপুরুষেরা এর তীরে বাস করে আনন্দ লাভ করেছেন—গঙ্গাতীর তাই তাঁদের আশীর্বাদপূত—পুণ্যময় স্থান।

গঙ্গাজলের একটা অসাধারণ আর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অদূষ্যতার। তার অপরিবর্তনীয় বীজাণুশূন্যতায় কোন বীজাণুই বাঁচতে পারে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা এর জল স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করেন—তাতে কোনই ক্ষতি হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। তাঁদের মধ্যে ডাঃ জন হাওয়ার্ড নর্থ্প—১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল প্রাইজের যুগ্ম অধিকারী—সম্প্রতি বলেছেন, "আমরা জানি যে গঙ্গার জল ভীষণভাবে দূষিত, কিন্তু ভারতবাসীরা এর থেকে জল খায়, এতে সাঁতার কাটে, কিন্তু আপাততঃ তাদের কোনই ক্ষতি হয় না।" তারপর আশান্বিত হৃদয়ে বলছেন, "বোধ হয় ব্যাকটীরিয়াফাজ (বীজাণুভুক্) নদী জলকে বীজাণুশূন্য করে।"

বেদে সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতিই ভক্তি প্রদর্শনের প্ররোচনা আছে। ভক্ত হিন্দু আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের এই উক্তি ভালভাবেই অবধান করতে পারেন, "আমাদের ভগিনী প্রবাহিনীর জন্য আমাদের প্রভুর জয় হোক, যার জল এত প্রয়োজনীয়, এত সুলভ, পবিত্র আর অমূল্য।"

৩৩শ পরিচ্ছেদ

বাবাজী—বর্ত্তমান যুগের যোগী ভগবান

বদরীনারায়ণের কাছে উত্তর হিমাচলপ্রদেশের শৈলশিখরে লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ এখনও জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন। নিঃসঙ্গ মহাগুরু তাঁর নশ্বরদেহ শতাব্দী কি, যুগযুগান্ত ধরে রক্ষা করে আসছেন। মরণজয়ী বাবাজী একজন 'অবতার'। এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হোল—'অবতরণ'। 'অব' এবং 'তৃ'—এই ধাতুদ্বয় থেকে শব্দটির উৎপত্তি। হিন্দু শাস্ত্রে অবতার কথার মানে হ'ল—শরীরধারী দেবগণের মর্ত্যে আগমন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একদিন আমায় বললেন, "বাবাজীর আধ্যাত্মিক অবস্থা মানবকল্পনারও অতীত। মানুষের খর্বদৃষ্টি তাঁর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ভেদ করতে পারে না। এই অবতারের যোগৈশ্বর্য কল্পনাই করা যায় না। এ একেবারে ধারণার অতীত।"

উপনিষদে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যেক অবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। "সিদ্ধ" মহাপুরুষের জীবন্মুক্ত অবস্থায় (জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ) উন্নীত হবার পর পরামুক্ত অবস্থা (পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটে, মরণের অতীত হওয়া) লাভ হয়; এই পরামুক্তি যাঁর ঘটেছে, তিনি মায়ার নাগপাশ ছেদন আর তার জন্ম-মৃত্যুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। কাজেই পরামুক্ত যিনি, তিনি কদাচিৎ নশ্বরদেহে প্রত্যাবর্তন করেন; আর যদিই বা করেন, তা অবতার হবার জন্য, সংসারের উপর দেবতার আশীর্বাদের মতন তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ হয়েই এ জগতে আগমন করেন।

অবতার কখনও প্রাকৃতবিধির অধীন হন না। তাঁর শুদ্ধদেহ, যা কেবল আলোকনির্মিত প্রতিমূর্তির মতই পরিদৃশ্যমান, তার উপর প্রকৃতির কোনই আধিপত্য নাই। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবতারের আকৃতিতে কোনই বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু সময়বিশেষে এর কোন ছায়া বা পদচিহ্ন মাটির উপর পড়তে দেখা যায় না। মায়ান্ধকার আর জড়বন্ধনের হাত হতে অন্তর যে মুক্ত, এই সব লক্ষণগুলিই হচ্ছে তাদের বাহ্যিক প্রমাণ-নিদর্শন। এরূপ পরম ভাগবতেরাই কেবল জীবনমৃত্যুর আপেক্ষিক সম্বন্ধের পিছনে সত্যের সন্ধান অবগত আছেন। ওমর খৈয়াম যাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্বন্ধে অনেকেরই

ভ্রান্ত ধারণা, তিনি তাঁর অমর কবিতা "রোবায়াতে", এইরূপে মুক্তপুরুষ সম্বন্ধে বলে গেছেন :—

"অন্তরে মোর আনন্দেরি রাকাশশীর হাসির মাঝ,।
এই গগনের উজলকিরণ চাঁদের উদয় আবার আজ ;
বৃথাই আমার খোঁজের তরে, উদয়পথে চলার কাল,
এই বাগিচার কুঞ্জমাঝে, মেলবে সে তার দৃষ্টিজাল।"

এই "আনন্দের রাকাশশী" হচ্ছেন ঈশ্বর—সেই চিরন্তন ধ্রুবতারা, কালের বুকে যে অটল স্থির, সময়ের যার কখনও ভুল হয় না ; আর "এই গগনের চাঁদ" হচ্ছে বাইরের বিশ্বজগৎ, যা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিয়মাধীন—ভাঙ্গাগড়ার খেলায় যার প্রয়োজন। পারস্যের এই দ্রষ্টাকবি তাঁর আত্মোপলব্ধিবলে "এই বাগিচা" অর্থাৎ এই পৃথিবীতে প্রকৃতি বা মায়ার বশবর্তী হয়ে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসার হাত হতে চিরতরে মুক্তিলাভ করেছেন। "বৃথাই আমার খোঁজার তরে,...... মেলবে সে তার দৃষ্টিজাল"—চিরমুক্তির জন্য উন্মত্ত বিশ্বের কি নিষ্ফল অনুসন্ধান !

যীশুখ্রিস্ট তাঁর মুক্তিসম্বন্ধে আর এক উপায়ে বর্ণনা করে গেছেন :—

"তারপর জনৈক লিপিকর এসে তাঁকে বললে, প্রভু, আপনি যেখানেই যান না কেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করব। তখন যীশু তাকে বললেন, শিয়ালদের বাসস্থানের জন্য গর্ত আছে, আকাশের পাখীদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার ঠাঁই নাই।"*

সর্বব্যাপিত্বের দ্বারা দিকদিগন্তবিস্তৃত যীশুখ্রিস্টকে সত্যই কি কোথাও অনুসরণ করা যায়—কেবল সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার ভিতর ছাড়া ?

শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, পতঞ্জলি প্রভৃতি এঁরাই হচ্ছেন প্রাচীন ভারতীয় অবতার। অগস্ত্য নামে দক্ষিণভারতের এক অবতারের নামে তামিল ভাষায় বহু কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে। খ্রিস্টিয় যুগের পূর্বে এবং পরে বহু শতাব্দী ধরে তিনি নানা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কথিত আছে যে অদ্যাবধি তিনি নশ্বরদেহে বর্তমান।

ভারতবর্ষে বাবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাপুরুষদের বিশেষ বিধান পালনে সহায়তা করা। শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে তিনি 'মহাবতার' পদবাচ্য। তিনি বলেছেন যে, তিনি পরমজ্ঞানী জগৎগুরু শঙ্করাচার্য† আর মধ্যযুগের মহাগুরু

---

* ম্যাথিউ ৮:১৯-২০ (বাইবেল)।

† ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ যতীর শিষ্য শংকরাচার্য কাশীতে বাবাজী মহারাজের কাছ

সন্ত কবীরকে যোগদীক্ষা দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর প্রধান শিষ্য হচ্ছেন, লুপ্ত ক্রিয়াযোগের পুনরুদ্ধারক লাহিড়ী মহাশয়।

মহাবতার সর্বদা খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন; সর্বদাই তাঁরা যুক্তভাবে মুক্তির স্পন্দন প্রেরণ করছেন আর বর্তমান যুগে মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। এই দুই পূর্ণজ্ঞানী মহাগুরুদের একজন শরীরী আর একজন অশরীরী। এঁদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ, জাতিবৈষম্য, ধর্মের গোঁড়ামি আর জড়বাদের অশুভ প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত এ সমস্ত পরিত্যাগ করবার জন্য সকল জাতিদের উদ্বুদ্ধ করা। বাবাজী আধুনিক কালের গতি বেশ ভালরকমই জানেন, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আর তার জটিলতা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আত্মোন্নতিবিধায়ক যোগের সমভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন।

বাবাজীর সম্বন্ধে যে কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় না এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। এর কারণ কোন শতাব্দীতেই মহাগুরু কখনও প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন নি। তাঁর যে যুগযুগান্তব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টা, তাতে প্রচার কার্যের চিত্তবিভ্রমকারী আলোর ধাঁধা লাগাবার কোনই স্থান নাই। একমাত্র নীরব মহাশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টারই ন্যায় বাবাজী দীন আত্মগোপনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখ্রিস্টের ন্যায় বিরাট অবতারেরা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন লীলাপ্রদর্শনের জন্য এবং এক বিশিষ্ট আর লোকলোচনপ্রতিভাত উদ্দেশ্য নিয়ে; আর তা সমাধা হলেই তাঁরা তিরোহিত হন। কিন্তু বাবাজী মহারাজের ন্যায় অন্যান্য অবতারেরা ইতিহাসে কোন একটি বিশেষ আর প্রধান ঘটনা সৃষ্টি করা অপেক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির ধীর উন্নতি সাধিত করবার ব্যাপারে কার্যভার গ্রহণ করেন। এইরূপ মহাগুরুগণ জনতার স্থূলদৃষ্টি থেকে সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকেন, আর ইচ্ছামাত্র তাঁদের অদৃশ্য হওয়ারও ক্ষমতা থাকে। এই সব কারণে আর যেহেতু তাঁরা তাঁদের শিষ্যবর্গকে তাঁদের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করবার উপদেশ দেন, সেইজন্যই, বহু বিরাট বিরাট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষেরা জগতের কাছে অপরিচিতই রয়ে গেছেন। এই কয়েকটি পাতায় আমি বাবাজীর জীবন সম্বন্ধে একটু আভাসমাত্র

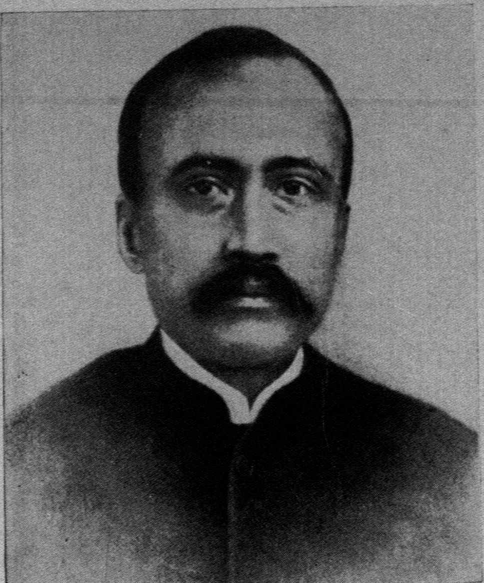
থেকে যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় এবং স্বামী কেবলানন্দজীকে এর কাহিনী বলবার সময় বাবাজী সেই জগদ্বরেণ্য অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের সহিত সাক্ষাতের বহু হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার বর্ণনা করেছিলেন।



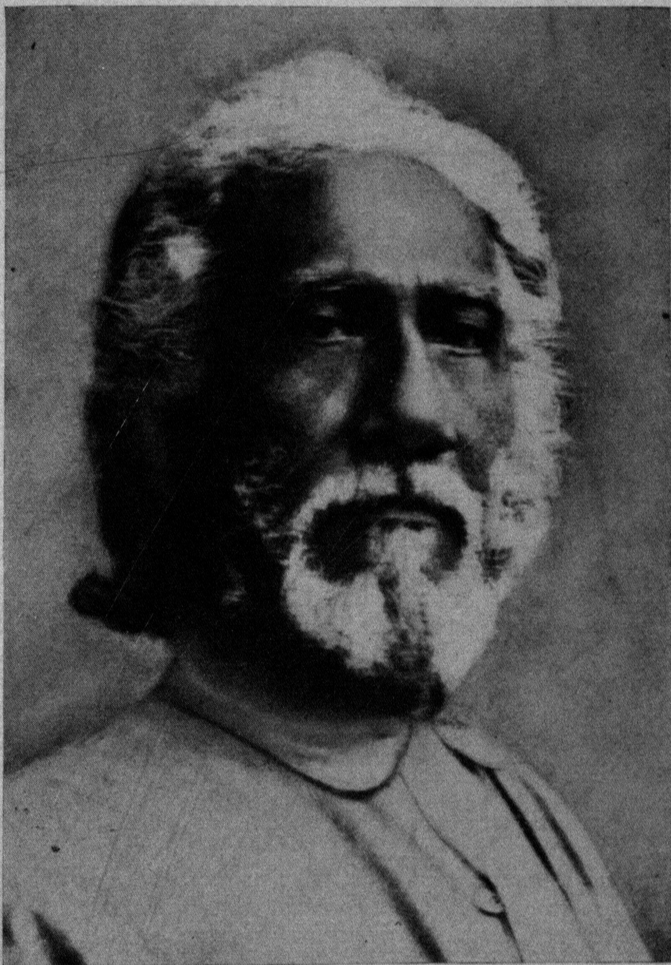
শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি ও শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী
কলিকাতা, ১৯৩৫



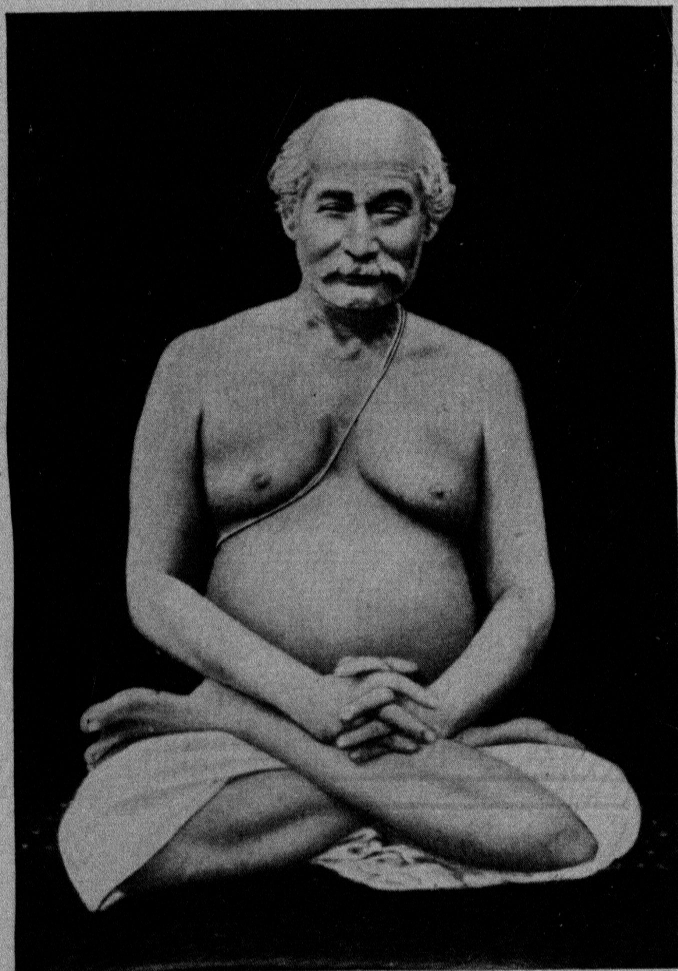
জ্ঞানপ্রভা ঘোষ (১৮৬৮-১৯০৪)
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যা ও
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর মাতৃদেবী
(মাকে পরমহংসজী আদর করে গুরুরু বলে ডাকতেন)



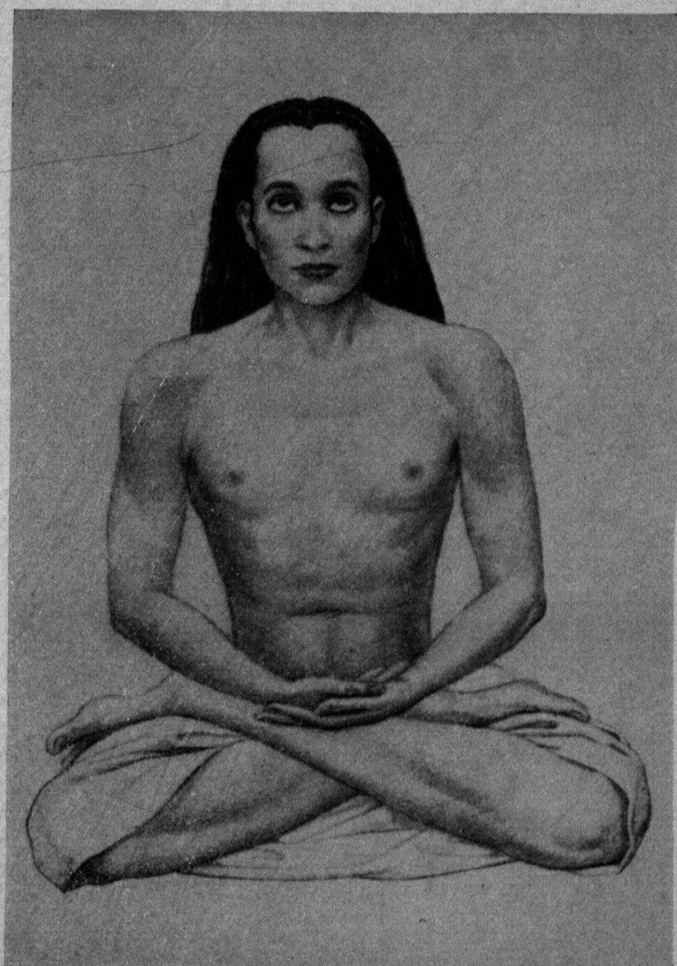
ভগবতী চরণ ঘোষ (১৮৫৩-১৯৪২)
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ও
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর পিতৃদেব



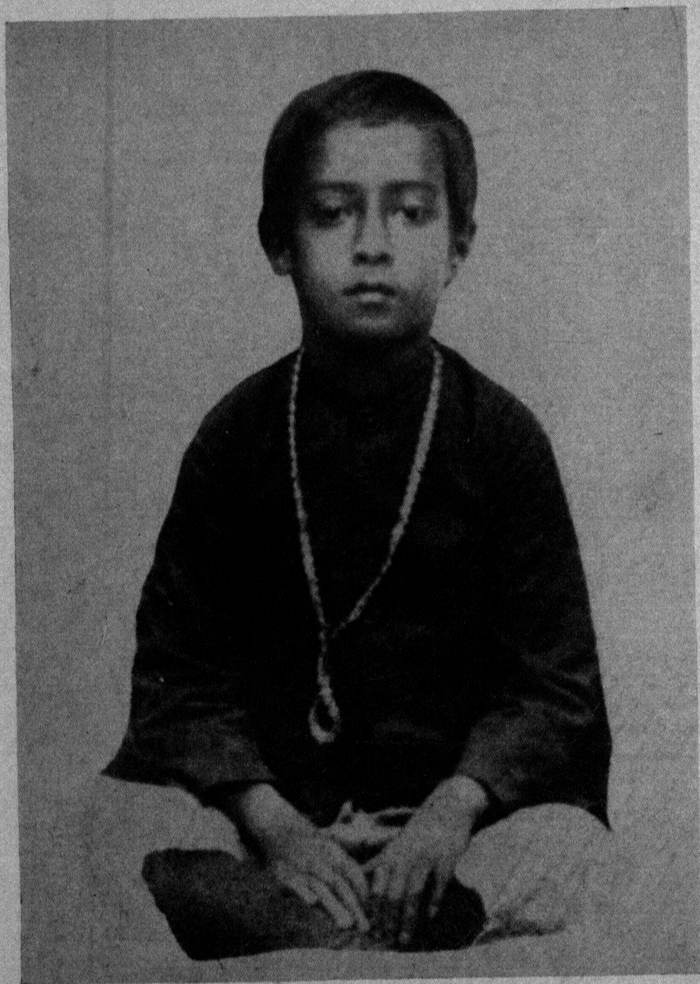
জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি (১৮৫৫-১৯৩৬)
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ও
শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর গুরুদেব



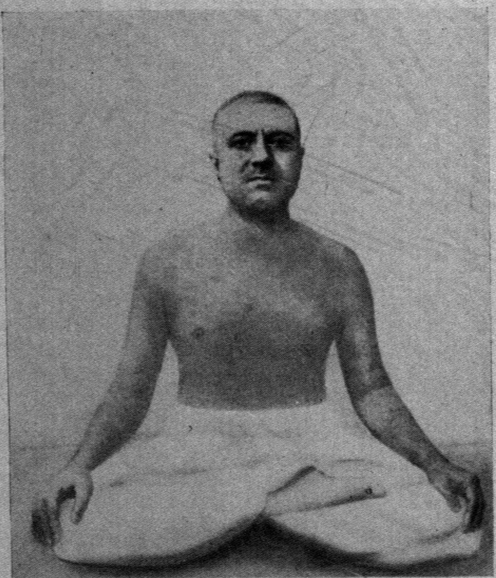
যোগাবতার শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয় (১৮২৮-১৮৯৫)
শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজীর শিষ্য ও
স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর গুরুদেব



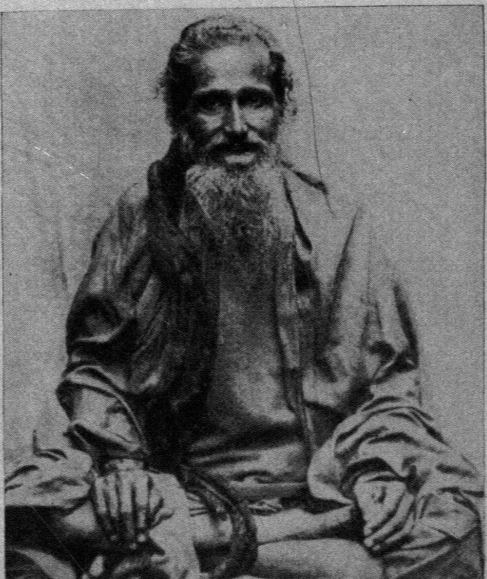
শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজী
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেব



শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ—ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে



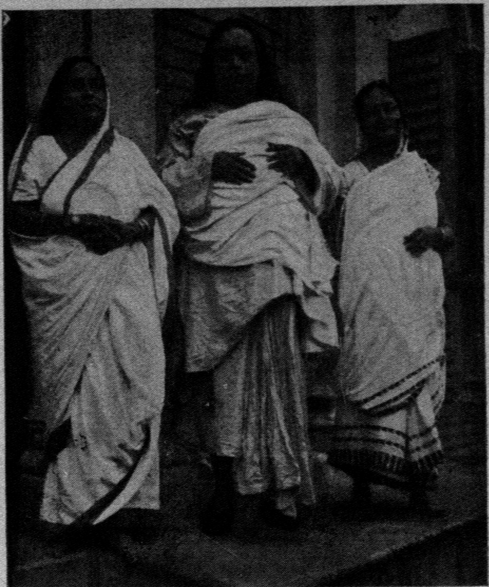
স্বামী প্রণবানন্দ
বেনারসের 'দুই দেহধারী সাধু'



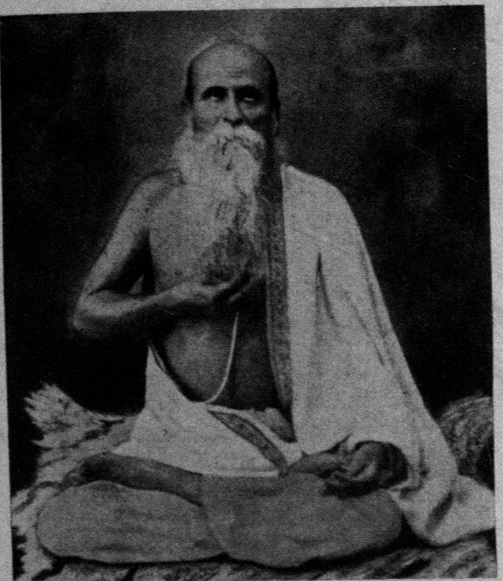
স্বামী কেবলানন্দ
পরমহংস যোগানন্দজীর প্রিয় সংস্কৃত শিক্ষক



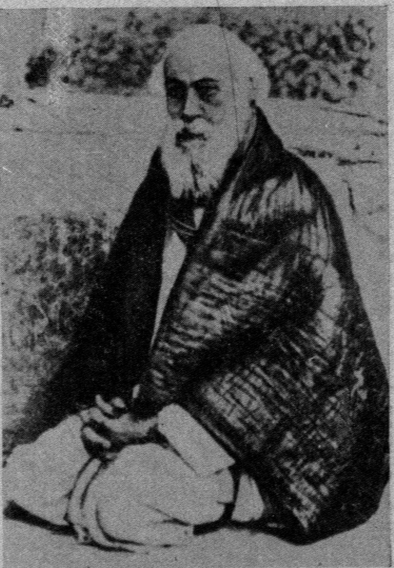
উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তের সঙ্গে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ (দণ্ডায়মান)



কলিকাতায় ১৯৩৫ সালে পরমহংস যোগানন্দজীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা ভগিনী রমা (বাম) ও কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী



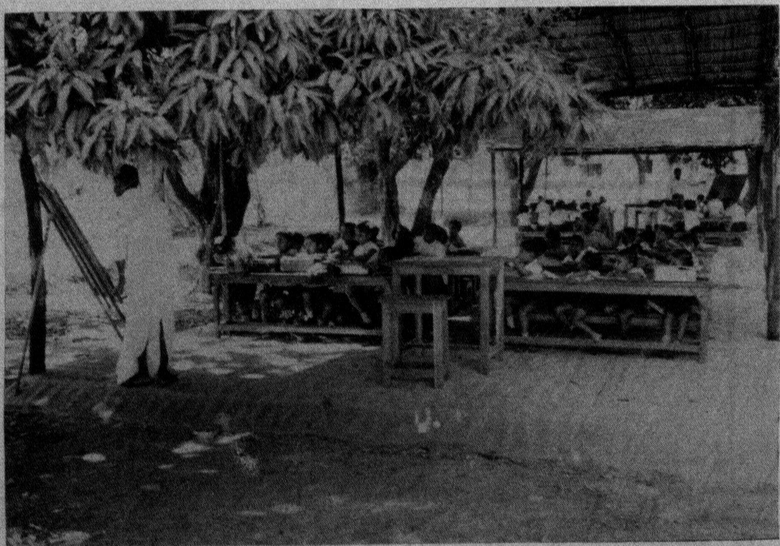
নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
'লঘিমা সিদ্ধ সাধু'



মাস্টার মহাশয়
'পরম কারুণিক ভক্ত'



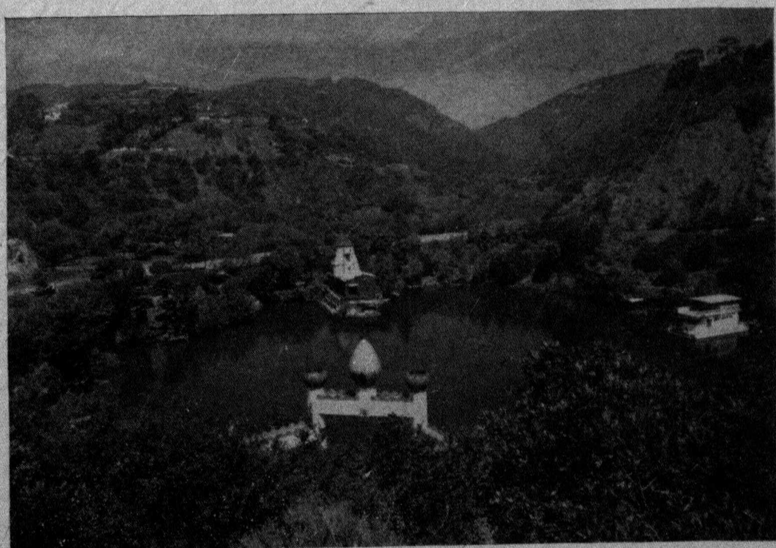
যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া প্রশাসনিক ভবন, শাখা মঠ ও আশ্রম, রাঁচী



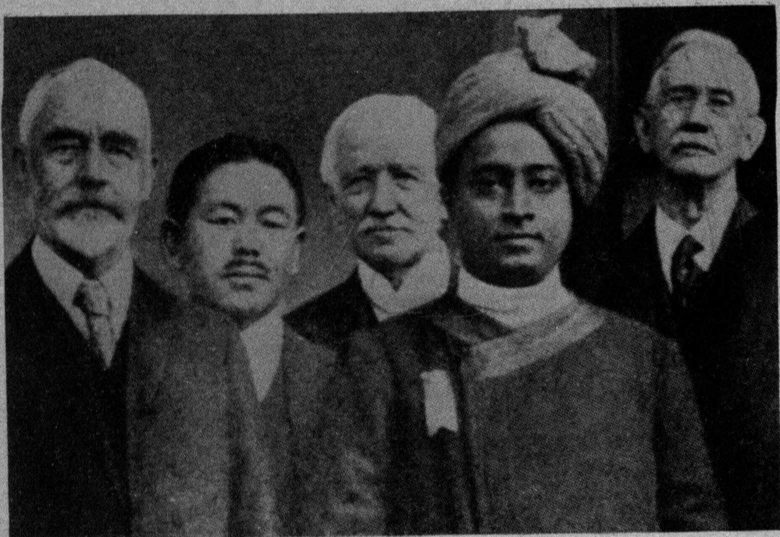
উন্মুক্ত স্থানে পাঠগ্রহণ—যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয়, রাঁচী



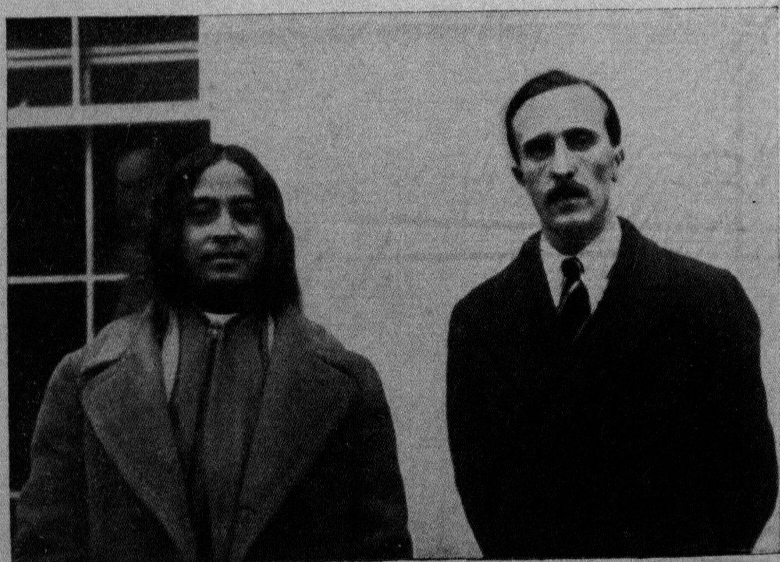
পুরীতে শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সমুদ্র-কূলবর্তী আশ্রম



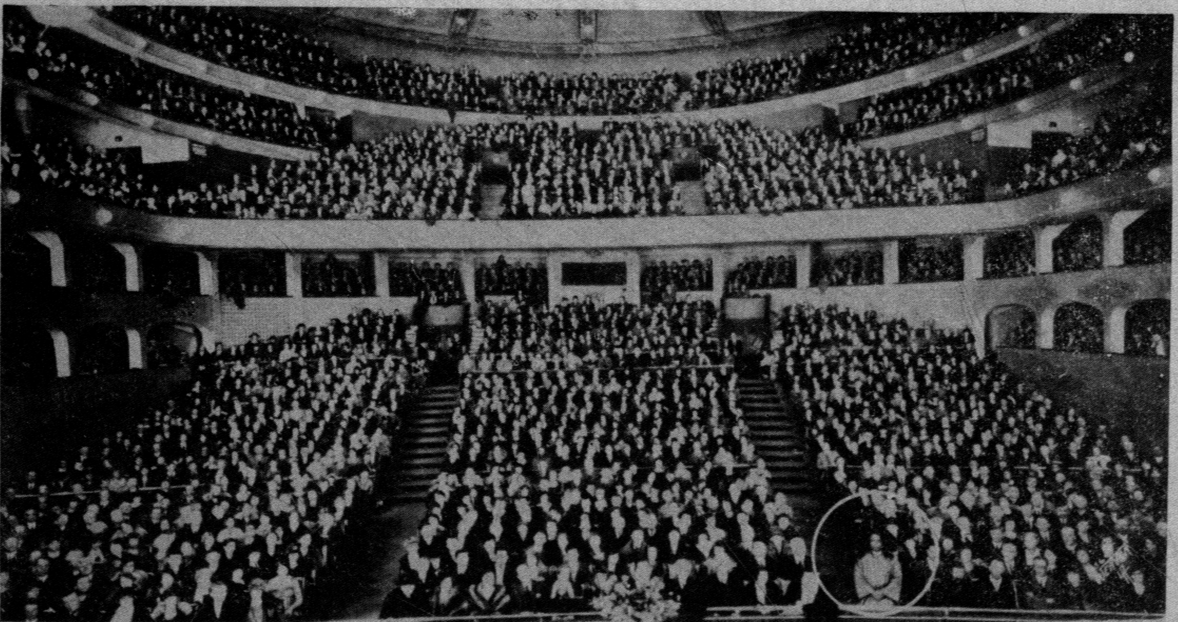
সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ লেক্ স্রাইন ও গান্ধী বিশ্বশান্তি স্মৃতিসৌধ



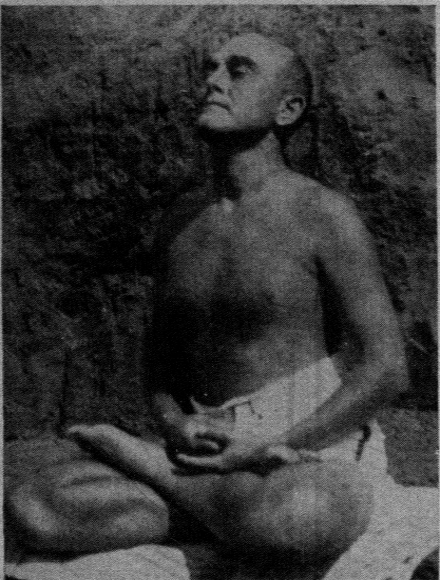
১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টার-ন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলস্-এর প্রতিনিধিগণের সঙ্গে পরমহংস যোগানন্দজী



১৯২৭ সালে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে অবস্থিত হোয়াইট হাউসে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ এবং মিষ্টার জন্ ব্যালফোর। প্রেসিডেন্ট কুলীজ্ এই স্থানে শ্রীশ্রী যোগানন্দজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।



১৯২৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এইন্‌জেলসে, ফিলহারমনিক অডিটোরিয়ামে ভাষণদানরত শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ



শ্রীশ্রী রাজর্ষি জনকানন্দ
(জেমস্ জে, লীন্—১৮৯২-১৯৫৫)
ওয়াই, এস্, এস্/এস, আর, এফের দ্বিতীয় সভাপতি



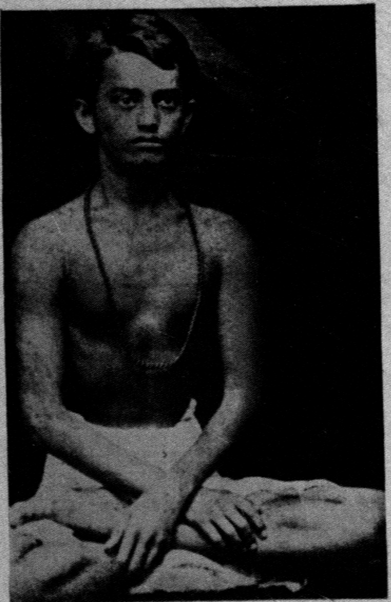
শ্রীশ্রী দয়ামাতা
ওয়াই, এস্, এস্/এস্, আর, এফের তৃতীয় সভানেত্রী



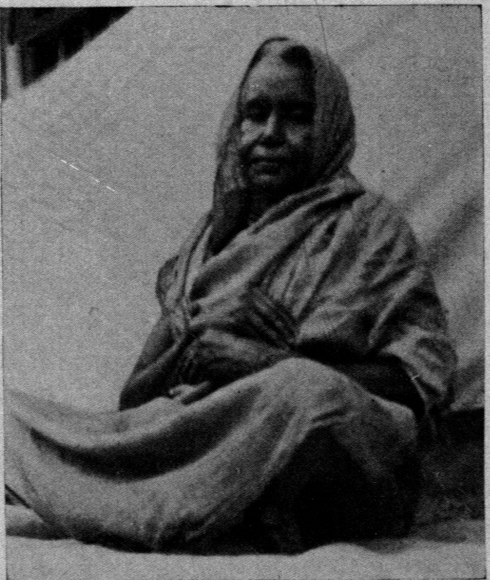
সেলফ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরের প্রশাসনিক ভবন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এইন্‌জেলসে, মাউন্ট ওয়াশিংটনের শিখরদেশে ১৯২৫ সালে শ্রীশ্রী যোগানন্দজী কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেন।



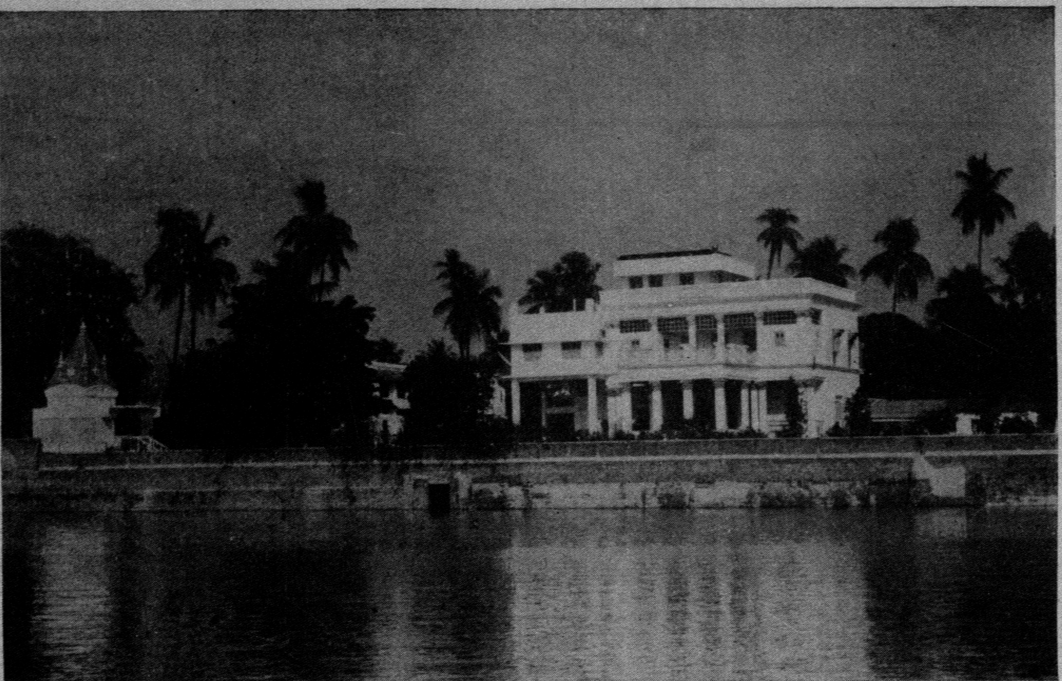
১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি উৎসব। শ্রীরামপুর আশ্রম প্রাঙ্গনে টেবিলের ধারে নিজ গুরুর (মধ্যে) পাশে উপবিষ্ট পরমহংস যোগানন্দজী।



জীতেন্দ্র মজুমদার
শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্গী

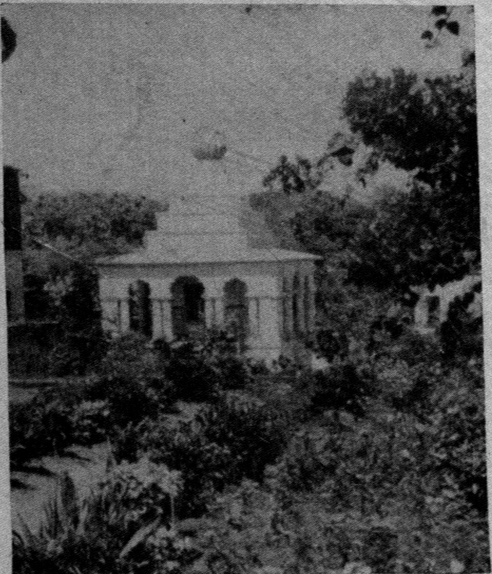


গিরিবালা
নিরাহারা সন্ন্যাসিনী

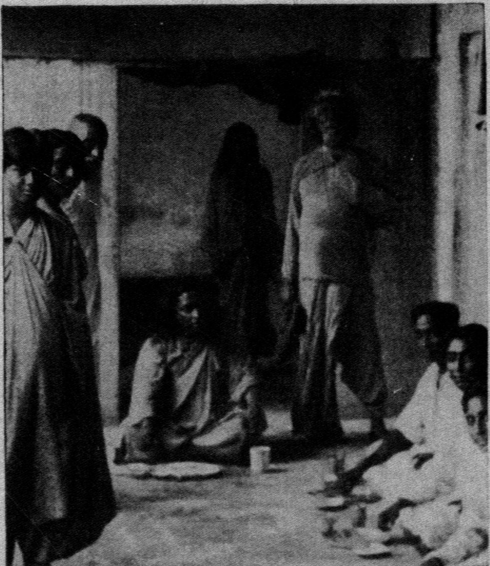


দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার তীরে যোগদা সৎসঙ্গ মঠ

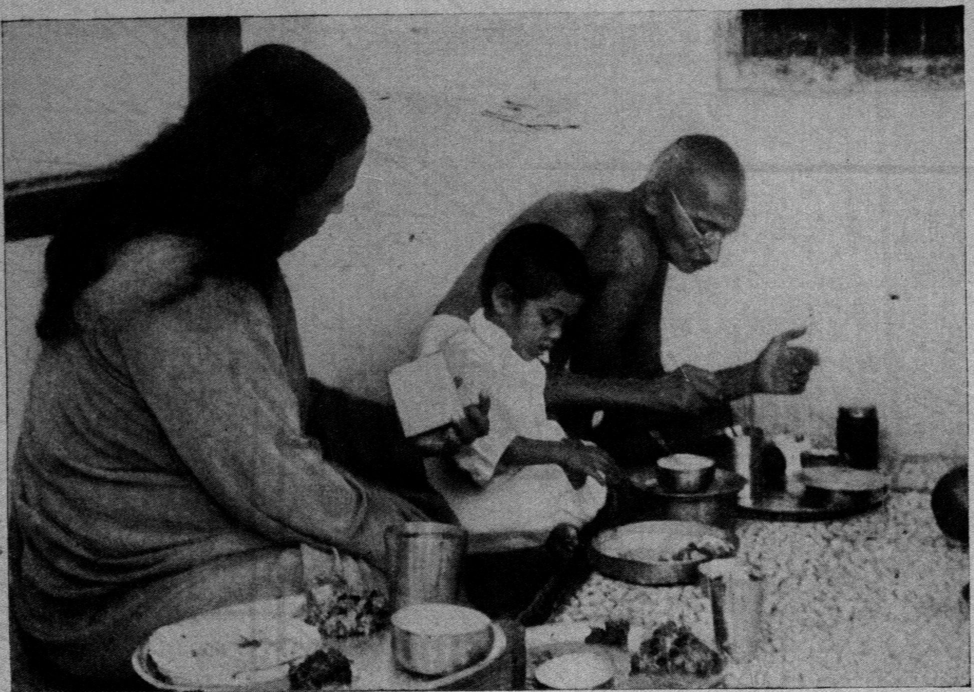
১৯৩৮ সালে পরমহংস যোগানন্দজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার প্রধান কার্যালয়।



পুরীতে শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সমাধি মন্দির

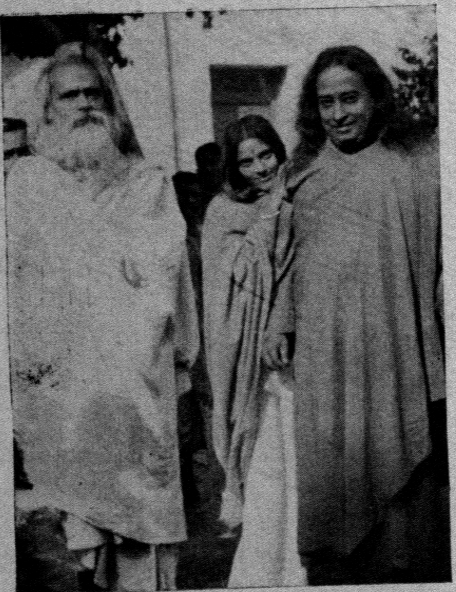


শ্রীরামপুর আশ্রম, ১৯৩৫ সাল
পরমহংস যোগানন্দজী (কেন্দ্রে উপবিষ্ট) ও
স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী (দক্ষিণে দণ্ডায়মান)

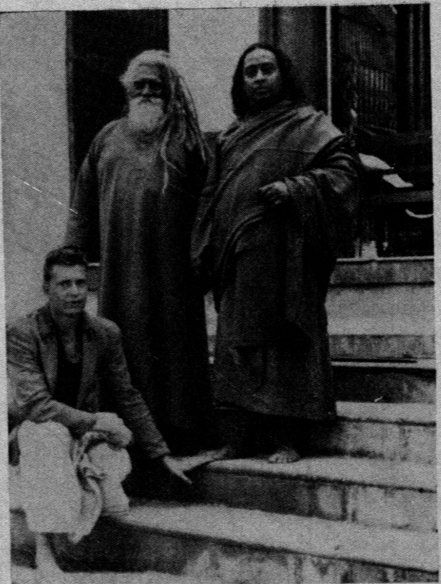


ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম

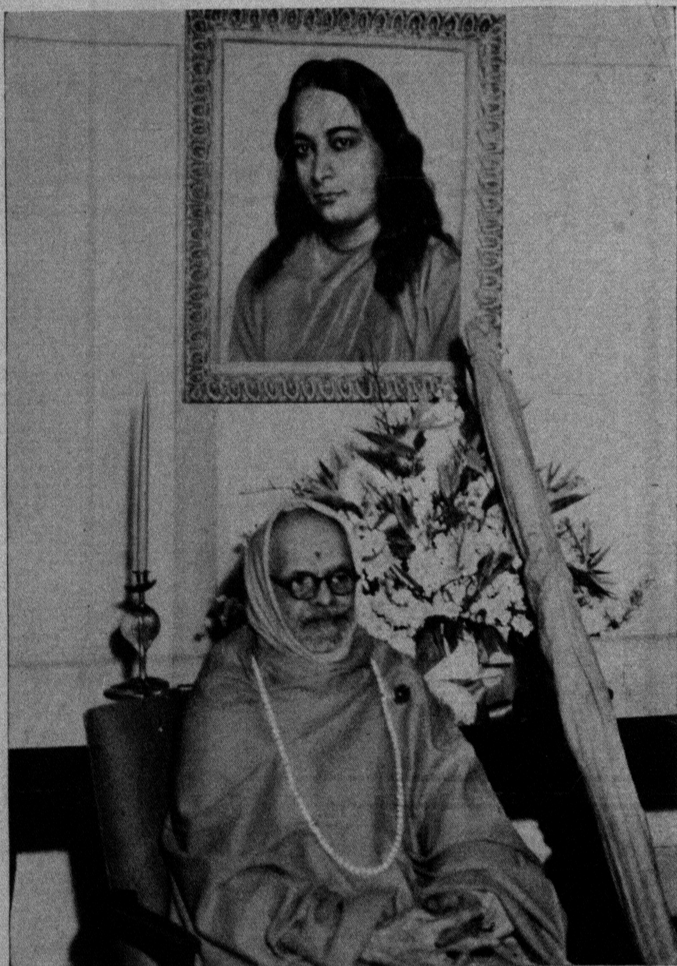
গান্ধীজী কর্তৃক সদ্যলিখিত কিছু মন্তব্য পাঠ করছেন পরমহংস যোগানন্দজী (দিনটি সোমবার, মহাত্মাজীর মৌন দিবস)। ১৯৩৫ সালের ২৭শে অগাস্ট শ্রীশ্রী যোগানন্দজী, গান্ধীজীকে 'ক্রিয়া যোগে' দীক্ষা প্রদান করেন।



ভোলানাথ, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ও পরমহংস
যোগানন্দজী—কলিকাতা, ১৯৩৬ সাল



স্বামী কেশবানন্দ, পরমহংস যোগানন্দজী ও
সি, আর, রাইট—বৃন্দাবন, ১৯৩৬ সাল



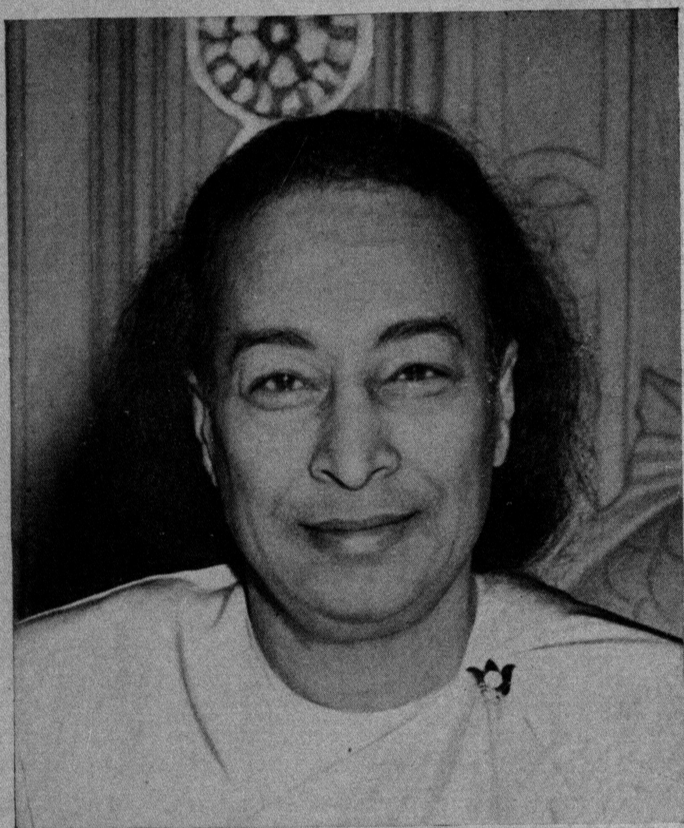
১৯৫৮ সালে লস্ এইন্‌জেলসে, এস, আর, এফ্ আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে, পুরীধামের শ্রী জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ। আমেরিকায় শ্রী শংকরাচার্যের তিন মাস ব্যাপি ভ্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন করেছিল সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ্।



পরমহংস যোগানন্দজী কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সম্বর্ধনা

মহাযোগীর মহাসমাধি লাভের তিন দিন আগে—৪ঠা মার্চ, ১৯৫২ সালে, লস্ এইন্‌জেলসে, সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন।

১১ই মার্চের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত শ্রী সেন বলেন : "আজ যদি সম্মিলিত জাতিসংঘে পরমহংস যোগানন্দজীর মত একজন মানুষ থাকতেন, তাহলে এই পৃথিবী এক সুন্দরতর স্থান হয়ে উঠতে পারত। আমার জানা এমন আর একটিও মানুষ নেই যিনি ভারত ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে বন্ধনকে দৃঢ়তর করার জন্য অধিক শ্রম করেছেন বা অধিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।"



শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ—"শেষ হাসি"

১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ক্যালিফোর্নিয়ার লস্ এইনজেলসে, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় মহাসমাধি লাভের মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে গৃহীত আলোকচিত্র ঃ

আলোকচিত্র শিল্পী এখানে পরমহংস যোগানন্দজীর প্রেমপূর্ণ স্মিত হাসির ছবিটি তুলেছেন—মনে হচ্ছে, শ্রীশ্রী যোগানন্দজী যেন তাঁর অগণিত বন্ধু, ছাত্র ও শিষ্যদের প্রত্যেককে বিদায় আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। অনন্তে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি তখনও মানবিক প্রেমে পরিপূর্ণ।

ঈশ্বরের এই অলোকসামান্য ভক্তের উপর মৃত্যুর কোন করাল রূপের প্রকাশ ঘটেনি; তাঁর দেহ অবিকৃত ছিল, যা বাস্তবিকই এক অলৌকিক ঘটনা।

দেব—কেবলমাত্র সেই ঘটনাগুলি উল্লেখ করে যা তিনি সাধারণের উপকারের জন্য প্রকাশ্যে বিবৃত করবার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন।

বাবাজীর কোন জন্মস্থান বা তাঁর পরিবারবর্গের সন্ধান বা সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের কৌতূহলনিবারক কোনও ক্ষুদ্রতথ্যও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সাধারণতঃ যদিও তিনি হিন্দীতে কথাবার্তা বলেন, তবুও তিনি যে কোন ভাষায় অবলীলাক্রমে আলাপ করতে পারেন। তিনি নিজে "বাবাজী"* এই অত্যন্ত সাদাসিধে নামটি গ্রহণ করেছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যেরা আরও বহু সম্মানজনক উপাধিসংযোগে তাঁকে অভিহিত করেন, যথা—মহামুনি বাবাজী মহারাজ, মহাযোগী, ত্র্যম্বকবাবা, শিববাবা (সবই শিবাবতারের নাম)। পরামুক্ত, জন্মমৃত্যুবন্ধনের অতীত এই মহাগুরুর সংসারজীবনের কোন পৈতৃক নাম নাই—তাতে কি কিছু আসে যায় ?

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন যে, "যখনই কেউ ভক্তিভরে বাবাজীর নাম উচ্চারণ করুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের উপর বাবাজীর আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।"†

অমর মহাগুরুর দেহে বার্ধক্যের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। দেখলে তাঁকে পঁচিশ বছরের একটি যুবক ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। উজ্জ্বলবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, বাবাজীর অনিন্দ্যসুন্দর বলিষ্ঠ দেহ হতে একটা যেন অপূর্ব জ্যোতিঃ বিনির্গত হচ্ছে। চক্ষুদুটি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি। তাঁর সুদীর্ঘ উজ্জ্বল কেশপাশ তাম্রবর্ণ। কখনও কখনও লাহিড়ী মহাশয়ের মুখের সঙ্গে বাবাজীর মুখের নিকট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সময় বিশেষে এই সাদৃশ্য এত অদ্ভুত হয় যে, পরবর্তীকালে লাহিড়ী মহাশয়, যুবকের মতন দেখতে বাবাজী মহারাজের পিতা বলে অনায়াসে পরিচিত হতে পারতেন।

আমার সাধুপ্রকৃতি সংস্কৃতের শিক্ষক মহাশয় স্বামী কেবলানন্দজী, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

কেবলানন্দজী আমায় বলেছিলেন, "সেই অদ্বিতীয় মহাগুরু হিমালয়ের মধ্যে

---

*বাবাজী একটা সাধারণ উপাধি মাত্র। প্রাচীন ও নবীন বহু পুস্তকেই বিভিন্ন ধর্মোপদেষ্টাদের নামের প্রতি প্রযুক্ত এই বাবাজী নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু তাদের কোনটারই সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু "বাবাজী" এই নামের কোন সম্পর্ক নাই। মহাবতার বাবাজীর অস্তিত্বের বিষয় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম "অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী"তে প্রকাশিত হয়।

† উক্তিটির যথার্থতা এই পুস্তকের বহু পাঠক উপলব্ধি করেছেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

তাঁর দলবল নিয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর ছোট্ট দলটির মধ্যে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন দু'জন আমেরিকান শিষ্যও আছেন। কোন স্থানে কিছুকাল থাকবার পরই বাবাজী বলেন, 'ডেরা ডান্ডা উঠাও!' তিনি হচ্ছেন দণ্ডধারী। তাঁর এই কথাগুলোই হচ্ছে দলবল সমেত তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর গমনের ইঙ্গিত। সর্বদাই যে তিনি এইরূপভাবে পরিভ্রমণ করেন তা নয়, কখনও কখনও শিখর হতে শিখরান্তরে তিনি পদব্রজেই গমনাগমন করে থাকেন।

"তিনি ইচ্ছা করলে তবেই কেউ তাঁকে দেখতে বা চিনতে পারে, তা না হলে নয়। জানা গেছে যে, তিনি ঈষৎ পরিবর্তিত বহু বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে তাঁর নানা শিষ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন—কখনও শ্মশ্রুগুম্ফ বিশিষ্ট, কখনও বা শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন। তাঁর অমরদেহ পোষণের জন্য কোন প্রকার আহারের প্রয়োজন হয় না বলে তিনি কদাচিৎ কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন। শিষ্যদের দর্শনদানের সময় লৌকিকতা হিসাবে কখনও কখনও তিনি ফল, পায়েস বা ঘৃতান্ন গ্রহণ করেন।"

কেবলানন্দজী বলতে লাগলেন, "বাবাজীর জীবনের দুটি অতি আশ্চর্য ঘটনা আমার জানা আছে। বৈদিক পুণ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড রচনা করা হয়েছে, তার চারপাশ ঘিরে শিষ্যেরা সব বসে। মহাগুরু হঠাৎ একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্যের স্কন্ধে একটি মৃদু আঘাত করলেন।

"লাহিড়ী মহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত। তিনি প্রতিবাদে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ কি মশায়, কি নিষ্ঠুর আপনি!'

"বাবাজী বললেন, 'ওর প্রাক্তন কর্মফলে ওকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হয়। চোখের সামনে তুমি কি তাই দেখতে চাও?'

"কথাগুলি বলেই তিনি তাঁর পদ্মহস্ত সেই চেলাটির ক্ষতবিক্ষত স্কন্ধের উপর বুলিয়ে দিলেন। ক্ষতচিহ্ন সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তারপর বললেন, 'আজ রাত্রে আমি তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিলুম। এই একটু আগুনে পোড়া থেকেই তোমার কর্মফল খণ্ডে গেছে।'

"আর একবার বাবাজীর সঙ্গেকার সেই সাধুসঙ্ঘকে জনৈক অপরিচিতের আগমনে বিশেষ বিব্রত হতে হয়েছিল। গুরুর আস্তানার কাছে পাহাড়ের একটা দুর্গম পাড় বেয়ে লোকটা সে সময় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই জায়গায় উঠে পড়েছিল।

"অপরিসীম ভক্তিতে উজ্জ্বলবদন আগন্তুক ব্যক্তিটি বাবাজীকে দেখেই বলে

উঠল, 'মশায়, আপনি নিশ্চয়ই সেই মহাগুরু বাবাজী। এই সব দুর্গম পাহাড় পর্বতে কতমাস ধরে যে আমি আপনার জন্যে অবিরাম সন্ধান করে ফিরেছি, তা আর কি বলব। আপনার পায়ে পড়ি, দয়া করে আমায় আপনার শিষ্য করে নিন।"

"গুরুজী কোনই উত্তর দিলেন না; তখন লোকটি পায়ের নীচে এক গভীর পাহাড়ের খাদ দেখিয়ে বললে, 'যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে আমি এই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়লুম বলে। ভগবানকে লাভ করতে গেলে আপনার মতন লোকের কাছ থেকেই যদি উপদেশ না পেলুম তবে আর আমার জীবনের মূল্য রইল কি?"

"বাবাজী ভাবলেশহীন মুখে শুধু মাত্র বললেন, 'পড় তা হলে লাফিয়ে। তোমার এখনকার অবস্থায় আমি তোমায় নিতে পারি না।'

"লোকটা তৎক্ষণাৎ সেই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেখানে উপস্থিত সাধুদের তো ভয়ে বিস্ময়ে বাকশক্তি লোপ পেলে। কি আর করেন, বাবাজী হতবাক তাঁর শিষ্যদের সেই অপরিচিতের দেহটি কুড়িয়ে আনতে বললেন। তাঁরা যখন ক্ষতবিক্ষত, বিকৃতমূর্তি, পিন্ডাকার দেহটি নিয়ে উপরে উঠে এলেন তখন সেই মহাগুরু আবার তাঁর দৈবহস্ত সেই মৃতদেহের উপর বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! লোকটি চক্ষুদুটি খুলে উঠে পড়ে সেই সর্বশক্তিমান গুরুর পদতলে গভীর ভক্তির সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

"বাবাজী মহারাজ তখন তাঁর পুনরুজ্জীবিত চেলাটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'এখন তুমি শিষ্য হবার জন্যে উপযুক্ত হলে। তুমি খুব একটা কঠিন পরীক্ষা অতি সাহসের সঙ্গেই উৎরে গেছ।* মৃত্যু আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না; এখন তুমি আমাদের এই অমর সাধুসঙ্ঘের একজন হলে।' তারপরেই তাঁর সেই সোজা কথা, 'ডেরা ডাণ্ডা উঠাও,' আর সমগ্র দলটিও সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড় থেকে অন্তর্ধান করল।

অবতার সর্বব্যাপী পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন, তাঁর জন্য কোন দূরত্বেরই

*পরীক্ষাটি আনুগত্যের। যখন মহাজ্ঞানী গুরুমহারাজ বললেন, "পড় লাফিয়ে" লোকটি তৎক্ষণাৎ তা পালন করলে। যদি সে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করত তা হলে সে যে বাবাজীর নির্দেশ বিনা তার জীবন বৃথাই বলে মনে করে, তার এই দৃঢ় উক্তি প্রমাণিত হত না। যদি সে ইতস্ততই করত, তাহলে এটাই প্রকাশ পেত যে কখনই গুরুর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস তার নাই। কাজেই ব্যাপারটা অসাধারণ আর অতি কঠিন হলেও এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি একটি আদর্শ পরীক্ষা।

পরিমাপ নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাবাজীর জড়দেহ ধারণ করবার একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে—তা হচ্ছে, মানবজাতিকে তার ভবিষ্যসম্ভাবনার প্রত্যক্ষ উদাহরণ যোগাবারই অভিপ্রায় ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যদি রক্তমাংসের শরীরে দেবত্বের ক্ষণিক আভাসেরও আশা না পায়, তা হলে সে কখনও তার মরণ অতিক্রম করতে পারবে না, মায়ার এই গুরুতর ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েই তাকে চিরকাল থাকতে হবে।

যীশুখ্রিস্ট পূর্ব হতেই তাঁর জীবনধারার বিষয় অবগত ছিলেন। যে সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তার প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের জন্য নয় বা তাঁর কর্মফলের দরুণ নয়—এসেছেন, কেবলমাত্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য। তাঁর বাণীপ্রচারক চারজন শিষ্য ম্যাথ্যু, মার্ক, লুক আর জন তাঁর অমর নাট্যলীলা ভবিষ্যৎ যুগের উপকারের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বাবাজীর জন্যও মহাকালের নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ বলে কোন সাময়িক আপেক্ষিকতার ছেদ নাই ; আদিকাল হতেই তাঁর জীবনের সর্বাবস্থার সঙ্গে তিনি পরিচিত। তবু মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য করে তিনি এক বা একাধিক সাক্ষীর সম্মুখে তাঁর দৈবজীবনের বহুলীলা প্রকটিত করেছেন। এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটেছিল যখন বাবাজী মহারাজ নশ্বর দেহের অমরত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করবার তাঁর পক্ষে তখন সময় উপস্থিত হয়েছে বলে বিবেচনা করলেন। সে সময় লাহিড়ী মহাশয়ের একজন শিষ্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতি রামগোপাল মজুমদারের সমক্ষে করেছিলেন, যাতে করে এ ঘটনাটি অবশেষে সুবিদিত হয়ে অনুসন্ধিৎসু মনে অনুপ্রেরণা জাগায়। বড় বড় মহাজনেরা তাঁদের বাণী প্রদান করেও আপাতদৃশ্য স্বাভাবিক ঘটনার ধারাই অবলম্বন করেন—একমাত্র মানুষের মঙ্গলের কারণে। যীশুখ্রিস্টও ঐরূপ বলেছেন, "পিতঃ…আমি জানি যে তুমি আমার কথা সর্বদাই শুনে থাক কিন্তু এই যে সকল লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্যেই এ কথা বললাম, যাতে করে এরা বিশ্বাস করতে পারে যে তুমিই আমায় প্রেরণ করেছ।"*

রণবাজপুরের সেই "বিনিদ্র সাধু"† রামগোপাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি বাবাজীর প্রথম দর্শনলাভের অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

---

*জন ১১:৪১-৪২ (বাইবেল)।

†সেই সর্বদর্শী যোগী যিনি তারকেশ্বর তীর্থে আমার মাথা না নোয়ানর কথা জানতে পেরেছিলেন। (১৩শ অধ্যায়)

রামগোপালবাবু বলেছিলেন, "কখনও কখনও আমার নির্জন গুহা পরিত্যাগ করে আমি কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হতুম। একদিন গভীর রাত্রে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নীরবে ধ্যানে বসেছি, গুরুদেব আমায় এক অদ্ভুত আদেশ করলেন, 'রামগোপাল, এক্ষণি তুমি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যাও।'

"অতিদ্রুত গিয়ে পৌঁছলুম সেই নির্জন স্থানে। উজ্জ্বল নক্ষত্র আর চন্দ্রালোকে রাত তখন হাসছে। খুব ধৈর্য ধরে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর, আমার পায়ের কাছেই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ধীরে ধীরে পাথরটা উপরে উঠতে লাগল, নীচে দেখা গেল মাটির তলায় একটি গুহা। কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে পাথরটি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর একটি সুসজ্জিতা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী রমণী-মূর্তি সেই গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে উচ্চে শূন্যে এসে দাঁড়াল। মূর্তিটির চতুর্দিক একটি মৃদুস্নিগ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলে বেষ্টিত। ধীরে ধীরে তিনি অবতরণ করে আমার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—অন্তর গভীর ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন। অবশেষে একটু নড়ে চড়ে উঠে আমায় অতি ধীর শান্তস্বরে বললেন, 'আমি মাতাজী,* বাবাজী মহারাজের ভগিনী। আমি তাঁকে আর লাহিড়ী মহাশয়কেও আজ রাত্রে আমার এই গুহায় আসতে বলেছি একটি গুরুতর বিষয় আলোচনা করবার জন্যে।'

"বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকাপুঞ্জের মত যেন একটা আলোকপিণ্ড অতি দ্রুতবেগে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে ভেসে আসছে দেখা গেল। সেই অপূর্ব জ্যোতিঃ গঙ্গার অস্বচ্ছ জলের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে দেখা গেল। ক্রমশঃই সেটা নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল, অবশেষে নয়নান্ধকারী বিদ্যুৎস্ফুরণের মতন একটা জ্যোতির্বিকাশে সেটা মাতাজীর পার্শ্বে এসে উপস্থিত হওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ তা ঘনীভূত হয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের মানবমূর্তিতে পরিণত হল। তিনি সেই মহাযোগিনী সাধ্বীর পদপ্রান্তে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন।

"এই অভূতপূর্ব বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম যে, রহস্যময় একটি চক্রাকার আলোকপিণ্ড আকাশপথে পরিভ্রমণ করছে। সেই ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমাদের দলটির কাছে

---

*মাতাজীও বহুশতাব্দী ধরে জীবিতা আছেন। তিনিও প্রায় তাঁর ভ্রাতার মতই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্না। তিনি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট মাটির নীচে এক গুপ্ত গুহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে অবস্থান করেন

দ্রুতবেগে নেমে এসে একটি সুন্দর যুবকের দেহে পরিণত হল, দেখে তখনিই বুঝতে পারলুম যে ইনিই বাবাজী মহারাজ। দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়েরই মত—একমাত্র পার্থক্য এই যে, বাবাজী মহারাজ দেখতে আরও অল্পবয়স্ক আর তাঁর ছিল উজ্জ্বল, সুদীর্ঘ কেশপাশ।

"লাহিড়ী মহাশয়, মাতাজী ও আমি সেই মহাগুরুর পুণ্য পাদপদ্মে নতজানু হয়ে প্রণাম নিবেদন করলুম। তাঁর সেই দৈবীতনু স্পর্শ করা মাত্র অবর্ণনীয় আনন্দগরিমার একটা স্বর্গীয়ানুভূতি আমার সকল সত্তা পরিপ্লাবিত করে তার প্রতি অণুপরমাণুকে পুলকাঞ্চিত করে তুললো।

"বাবাজী বললেন, 'কল্যাণীয়া ভগিনী, আমি আমার এ দেহ বিসর্জন দিয়ে পরব্রহ্মসাগরে বিলীন হতে মনস্থ করেছি।'

"সেই মহিমময়ী মিনতিভরা নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ, আমি আপনার অভিপ্রায়ের আভাস ইতিমধ্যেই পেয়েছি। সেই জন্যেই আজ রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। দেহত্যাগ করবেন কেন বলুন তো?'

" 'পরব্রহ্মসাগরে আমার আত্মার তরঙ্গ দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক, তাতে প্রভেদ কতটুকু?'

"মাতাজী এবার অপরূপ চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'মরণজয়ী গুরু! যদি কোন প্রভেদ নাই থাকে তবে দয়া করে আপনি আর দেহত্যাগ করবেন না।'*

"বাবাজী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন 'তবে তাই হোক্। আমি কখনও আমার এ জড়দেহ আর পরিত্যাগ করব না। এ সর্বদাই দৃশ্য হয়ে থাকবে এই পৃথিবীতে, অন্ততঃ জনকতকেরও কাছে। পরমেশ্বর তোমার মুখ দিয়েই তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।'

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ এই তিনটি ব্যক্তির কথোপকথন যখন সভয়ভক্তির সঙ্গে শুনছিলুম, সেই মহাগুরু তখন আমার দিকে ফিরে প্রসন্নভাবে বললেন, 'ভয় পেয়ো না রামগোপাল, এই অমর প্রতিজ্ঞার দৃশ্যে সাক্ষী হতে পেরে তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।'

---

* এই ঘটনা থেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জগদ্বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্রবর প্রচার করেছিলেন যে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একজন সমালোচক জিজ্ঞাসা করেছিল, "তা হলে আপনি মরেন না কেন?" তাতে থেলস উত্তর দেন, "কারণ ও একই কথা, তাতেও কোন পার্থক্য নেই।"

"বাবাজীর মধুর কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার শেষ হতে না হতেই তাঁর আর লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি ধীরে ধীরে শূন্যে ভেসে উঠে গঙ্গার উপর দিয়ে আবার পিছু হটে চলল। নৈশাকাশে তাঁদের দেহ অদৃশ্য হবার সময় অত্যুজ্জ্বল আলোকের একটা ছটা তাঁদের সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মাতাজীর দেহও শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে গুহার কাছে গিয়ে তার মধ্যে অবতরণ করলে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটিও নেমে এসে গুহা মুখটি আচ্ছাদন করলে—যেন কোন অদৃশ্য যন্ত্রেরই এ কাজ।

"অপরিসীমভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ধীরে ধীরে ফিরে চললুম। পেঁছলুম যখন, তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে; তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি সমস্তই বুঝে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'রামগোপাল, আমি তোমার জন্যে সুখীই হয়েছি। বাবাজী আর মাতাজীকে দর্শনের অভিলাষ যা তুমি আমার কাছে প্রায়ই ব্যক্ত করতে, অবশেষে তার একটা অদ্ভুত পরিণতি ঘটল।'

"আমার গুরুভাইয়েরা আমায় জানালেন যে, মধ্যরাত্রিতে আমার প্রস্থানের পর হতে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর বেদীর উপর থেকে বিন্দুমাত্রও নড়েন নি।

"একটি চেলা বললেন, 'আপনার দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যাবার পর তিনি অমরত্ব সম্বন্ধে একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করলেন।' শাস্ত্রে লেখা সেই সত্য তখন সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারলুম যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, তিনি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দুই বা ততোধিক শরীরে আবির্ভূত হতে পারেন।

রামগোপাল বাবু তাঁর কাহিনীর সমাপ্তিতে বললেন, "লাহিড়ী মহাশয় পরে এই জগৎসংসার সম্বন্ধে গূঢ় দৈবপরিকল্পনার বহু দার্শনিক তথ্য আমায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমাদের এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতিকাল পর্যন্ত বাবাজী স্বদেহে অবস্থান করবেন, এইটাই ভগবানের অভিপ্রায়। যুগযুগান্তর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে—কিন্তু আমাদের মরণবিজয়ী মহাগুরু* শতাব্দীর পর শতাব্দীর নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য এই সংসার-নাট্যমঞ্চে উপস্থিত থাকবেন।"

---

*"সত্যসত্যই আমি তোমাদিগকে বলছি যে, কেউ যদি আমার বাক্য পালন করে (খ্রিস্টচৈতন্যে অখণ্ডভাবে অবস্থান করে), তা হলে তার কখনও মৃত্যুর সাক্ষাৎকার লাভ হবে না" (জন ৮:৫১ বাইবেল)।

এই কথাগুলিতে যীশুখ্রিস্ট জড়দেহে অমরজীবন লাভের কথা বলছেন না—যে একঘেয়ে জীবনের কারাবাসের শাস্তি পাপীদেরও দেওয়া যায় না, সাধুদের তো দূরের কথা! যীশুখ্রিস্ট

যাঁর কথা বলছেন তিনি হচ্ছেন আত্মোপলব্ধ সেই লোক যিনি অজ্ঞানের মহানিদ্রা হতে অনন্ত জীবনে জাগরিত হয়েছেন। (৪০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মানুষের আসল প্রকৃতি হচ্ছে সর্বব্যাপী অরূপ আত্মা। বাধ্য হয়ে বা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়দেহ ধারণ করা হচ্ছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল। হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, জন্ম ও মৃত্যু মায়ারই লীলা বা প্রকাশ। জন্ম ও মৃত্যুর অর্থ কেবল আপেক্ষিক জগতেই পাওয়া যায়।

বাবাজী কোন জড়শরীর বা এ জগতের কোন বিশেষ রূপে আবদ্ধ নন। তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এ পৃথিবীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে রত আছেন।

প্রণবানন্দজীর মত সদ্গুরুগণ যাঁরা নব্যকলেবর ধারণ করে এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তার কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন, অপর কেউ নয়। এ জগতে তাঁদের আবির্ভাব কর্মফলপ্রসূত নয়। এরূপ স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকে ব্যুত্থান অর্থাৎ মায়াপাশ ছেদ করে পার্থিব জীবনে প্রবেশ করা বোঝায়।

সাধারণ কি অসাধারণ বা অদ্ভুত যেরূপ ভাবেই তাঁর দেহ ত্যাগ হোক না কেন, পূর্ণজ্ঞানী সদ্গুরু নূতনদেহ ধারণ করে জগৎবাসীদের চক্ষের সম্মুখে পুনরায় আবির্ভূত হতে পারেন। মহান সৃষ্টিকর্তা, যাঁর সৌরমণ্ডলীর সংখ্যা গণনা করা যায় না, সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জড়শরীর ধারণে অনুপরমাণুদের আকার দানে তাঁর শক্তির কোন অপচয় ঘটে না।

যীশুখৃষ্ট ঘোষণা করেছেন, "আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যাতে করে পুনরায় আমি তা গ্রহণ করতে পারি। কোন মানুষ আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে না—আমি নিজেই তা' সমর্পণ করি। আমার তা সমর্পণ করবার ক্ষমতা আছে এবং তা পুনরায় গ্রহণ করবারও আমার ক্ষমতা আছে।" (জন ১০:১৭-১৮ বাইবেল)।

৩৪শ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ে প্রাসাদ সৃষ্টি

স্বামী কেবলানন্দজী একবার বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে এক অলৌকিক ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, "বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ—সে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! আর এই সব ঘটনা থেকেই সেই অমর গুরুর বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে পারা যায়।"

প্রথম যখন কেবলানন্দজী এ ঘটনা বিবৃত করেন, তখন তা শুনে তো আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই! এর পরে আরও বহু উপলক্ষ্যে আমি আমার সেই সদাশয় সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে গল্পটি বলতে শুনেছি আর এ ঘটনাটি পরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও মোটামুটি একই ভাষায় আমায় বিবৃত করেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের এই উভয় শিষ্যই তাঁদের গুরুবক্তনিঃসৃত এই লোমহর্ষণ কাহিনী শুনেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন, "বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে যখন আমার বয়স তেত্রিশ বৎসর। ১৮৬১ সালের শরৎকালে সামরিক পূর্তবিভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে দানাপুরে ছিলুম। একদিন সকালে অফিসে যেতে ম্যানেজার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'লাহিড়ী, আমাদের হেড অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে তোমায় রাণীক্ষেতে যেতে হবে, সেখানে সৈনিকদের একটা ঘাঁটি* তৈরী হচ্ছে।'

"একটি চাকর সঙ্গে নিয়ে চললুম রাণীক্ষেতে†—পাঁচশত মাইল রাস্তা। ঘোড়ার গাড়ীতে করে আমাদের হিমালয়প্রদেশে রাণীক্ষেতে পৌঁছতে লাগল পুরো একটি মাস।

"অফিসের কাজ যে বেশী ভারি ছিল তা নয়। সময় বেশ পাওয়া যেত আর আমি সেই হিমালয়ের বিরাট পাহাড়পর্বতে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে

*পরে একটি সামরিক স্বাস্থ্যনিবাস। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতে কয়েকটি টেলিগ্রাফের সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

†যুক্তপ্রদেশের আলমোড়া জেলায় রাণীক্ষেত, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরগুলির অন্যতম নন্দাদেবীর (২৫,৬৬১ ফুট) পাদদেশে অবস্থিত।

বেড়িয়ে বহু সময় কাটাতুম। লোকমুখে শোনা গেল যে জায়গাটিতে খুব বড় বড় সাধুসন্ন্যাসীরা বাস করেন। তাঁদের দেখতে মনে বড়ই বাসনা হল। একদিন বিকেলের দিকে একটা পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শুনতে পেলুম খুব দূরে থেকে আমার নাম ধরে কে ডাকছে। শুনে তো ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলুম। যাই হোক, সেই পাহাড়ে—পাহাড়টার নাম ছিল দ্রোণগিরি—চড়াই ভেঙ্গে তখন খুব তাড়াতাড়ি উঠতে লাগলুম। মনে মনে এই চিন্তায় একটু অস্বস্তিও বোধ হতে লাগল যে, জঙ্গলে যদি অন্ধকার নেমে আসে তা হলে আর আমার ফিরে যাওয়া হবে না!

"যাক্—যা হয় হবে ভেবে অবশেষে উঠেও পড়লুম পাহাড়ের উপর। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা, আর তার চারধারে সব ছোট ছোট গুহা। দেখি, সেই পাহাড়ের একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে একটি সহাস্যবদন যুবক, আমায় সম্ভাষণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, একমাত্র তামাটে রঙের তাঁর ঘন লম্বা চুল ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য রয়েছে!

"সাধুটি সস্নেহে আমায় হিন্দীতে সম্বোধন করে বললেন, 'লাহিড়ী,* তুমি এসেছ! যাক্, এই গুহাতে এখন একটু বিশ্রাম কর, আমিই তোমায় ডাকছিলুম, বুঝলে?'

"একটি পরিষ্কার ছোট্ট গুহাতে প্রবেশ করে দেখলুম যে, কতকগুলো পশমের কম্বল আর কমণ্ডলু সেখানে রয়েছে। একটা কোণে ছিল ভাঁজকরা একটি কম্বল—তা দেখিয়ে যোগীটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাহিড়ী, তুমি ঐ আসনটি চিনতে পার?' বললুম, 'না, মশায়!' তারপর আমার দুঃসাহসিক কাজে কতকটা যেন ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েই বললুম, 'আমায় এখনই যেতে হবে, রাত এসে পড়ল বলে। সকালে অফিসে আমার কাজ আছে যে।'

---

*লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পূর্বজন্মে যে নামে পরিচিত ছিলেন বাবাজী মহারাজ প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সেই 'গঙ্গাধর' নামেই সম্বোধন করেছিলেন। গঙ্গাধর (অর্থাৎ যিনি গঙ্গানদীকে ধারণ করেন) হ'ল প্রভু পরমেশ্বর শিবের একটি নাম। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে —এই পবিত্র গঙ্গানদী স্বর্গ হতে অবতরণ করেছেন।

এই অবতরণের বেগ ধারণ করতে পৃথিবী অসমর্থ হবে—এরূপ চিন্তা করেই শিব গঙ্গার বারিবেগকে স্বীয় জটাজুটের মধ্যে ধারণ করেন এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেন করুণাধারায় মর্ত্যে প্রবাহিত হবার জন্যে। গঙ্গাধর শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছেঃ "মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবহমান 'জীবন নদী'র গতিবেগকে নিয়ন্ত্রিত করার বিষয়ে যিনি সমর্থ।"

"সেই রহস্যময় সাধুটি তখন ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, 'অফিসকেই তোমার ন্যে এখানে আনা হয়েছে, তোমাকে অফিসের জন্যে নয়, বুঝলে ?'

"শুনে অবাক হয়ে গেলুম যে এই অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীটি শুধু ইংরেজিতেই থাবার্তা বলতে পারেন তা নয়, যীশুখ্রিস্টের বাণীর ভাবার্থও করতে ারেন।* তারপর বললেন, 'দেখছি যে আমার টেলিগ্রামের ফল ফলেছে।' াগীটির কথাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকল, তাই এ কথার মানে ঁ জিজ্ঞাসা করলুম।

" 'আমি তোমার সেই টেলিগ্রামের কথা বলছি যা পেয়ে তুমি এই নির্জন দেশে এসেছ। আমিই তোমার উপরওয়ালার মনে নীরবে এই ধারণা জন্মিয়ে লুম যে তোমার এখন রাণীক্ষেতে বদলি হওয়া দরকার। মানবজাতির সঙ্গে র মনের গভীর ঐক্য সংসাধিত হয়েছে, তার কাছে সব মনই যেন সংবাদপ্রেরক ন্ত্রর মত হয়ে দাঁড়ায় আর তার মধ্য দিয়েই সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে রে।' তারপর তিনি শান্তস্বরে বললেন, 'লাহিড়ী, নিশ্চয়ই এই গুহা ামার কাছে পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে ?'

"হতবুদ্ধি হয়ে তখন নিস্তব্ধভাবে বসে রয়েছি, এমন সময় সাধুটি কাছে সে আমার কপালে মৃদুভাবে আঘাত করলেন। তাঁর হস্তের চৌম্বকস্পর্শে মার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রবাহ বয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমার র্বজীবনের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুরস্মৃতি মনের মধ্যে জাগরিত হয়ে উঠল।

"আনন্দের আবেগে অর্ধবরুদ্ধস্বরে বললুম, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, াপনিই আমার গুরু বাবাজী, আহা, চিরজনমেরই আপনি আমার। এখন ন অতীতের সব দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠছে—আমার গতজীবনের সাধনায় ু বছর ধরে এইখানে এই গুহাতেই আমি অতিবাহিত করেছিলুম।' বর্ণনীয় স্মৃতির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে আমি সাশ্রুনয়নে আমার গুরুদেবের যুগল ধারণ করলুম।

"স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিতকণ্ঠে বাবাজী বললেন, 'ত্রিশ বছরেরও বেশী মি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি—অপেক্ষা করছি এই জন্যে যে তুমি আবার মার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে; লিয়ে গিয়ে, মরণের পারে যে নতুন জীবনের উদ্দাম স্রোত বইছে সেই স্রোতের ধ্য তুমি অদৃশ্য হলে। প্রাক্তনকর্মের ঐন্দ্রজালিক দণ্ড তোমায় স্পর্শ করলে,

*যীশুখৃস্ট বলেছিলেন, "বিশ্রামদিবস মানুষের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে—মানুষ তার জন্যে '। মার্ক ২:২৭ (বাইবেল)।

আর তুমি হলে অদৃশ্য। তুমি আমায় দেখতে না পেলেও আমি কিন্তু তোমার উপর বরাবরই নজর রেখে এসেছি। স্বর্গের মহিমময় দেবদূতেরা যে জ্যোতিঃ-সাগর পরিভ্রমণ করেন, সেখানেও তোমায় অনুসরণ করেছি। ঘোর অন্ধকার, দারুণ ঝড়, ভীষণ বিপ্লব, বা অনন্ত আলো—সবারই ভিতর দিয়ে তোমায় অনুসরণ করে আমি তোমার পিছন পিছন ধেয়ে এসেছি—পক্ষিমাতা তার শাবককে রক্ষা করবার জন্যে যেমন করে ছুটে আসে। মাতৃজঠরে অবস্থানকাল কাটিয়ে শিশুরূপে যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে, আমার দৃষ্টি তখন সতত তোমার উপর নিবদ্ধ। ঘূর্ণির বালুভূমিতে পদ্মাসনে বসে যখন ছোট্ট দেহটি বালির মধ্যে ঢাকা দিতে, তখনও আমি অদৃশ্যভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতাম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি এই শুভদিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে তোমার উপর নজর রেখে আসছি; এখন তুমি আমার কাছে এসেছ। এই তোমার গুহা, কতকালের যে পুরান! আমি এ তোমার জন্যে সর্বদাই ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার করে রেখে এসেছি। এই তোমার পবিত্র কম্বলাসন, যার উপর তুমি অন্তরে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য প্রত্যহ ধ্যানে বসতে। দেখ তোমার পাত্র, যাতে করে তুমি আমার তৈরী সুধা পান করতে। দেখ, তোমার পিতলের কমণ্ডলুটি কেমন ঝকঝকে পালিশ করে রেখেছি, যাতে করে আবার তুমি এ থেকে পান করতে পার। বৎস আমার! এখন সব বুঝতে পারছ কি?'

" 'গুরুদেব! আমি আর কি বলব, বলুন?' কোন গতিকে অস্ফুটস্বরে কথা ক'টি বললুম, 'এরূপ অমর স্নেহের কথা কে কোথায় কবে শুনেছে বলুন?' আমার জীবনমরণের গুরু, আমার ইহকাল পরকালের সাধনা, আমার চিরন্তন ধন—চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে অসীম অবর্ণনীয় আনন্দে, অপরিসীম শ্রদ্ধায়!

" 'লাহিড়ী, তোমার শুদ্ধি দরকার। এই বাটি থেকে খানিকটা তেল নিয়ে খেয়ে ফেল। তারপর নদীর ধারে গিয়ে শুয়ে থাক।'

"বাবাজী হচ্ছেন কাজের লোক, সে কথা স্মরণ করে একটু হাসলুম। কাজের কথা তাঁর সবার আগে।

"তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গেলুম। হিমালয়ের তুহিনশীতল রাত্রি যদিও তখন নেমে আসছে, তবুও বেশ আরামদায়ক উষ্ণতার একটা আভ্যন্তরীণ বিচ্ছুরণ যেন আমার শরীরের প্রতি কোষে স্পন্দিত হতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এই অজানা তেলটুকুতে কি কোন প্রকার আকাশের উত্তাপ সঞ্চিত ছিল?

"অন্ধকারের ভিতর থেকে কন্‌কনে ঠান্ডা হাওয়া আমার শরীরের উপর দিয়ে সশব্দে হু হু করে বইতে লাগল। প্রস্তরময় নদীতীরে লম্বমান আমার দেহের উপর দিয়ে গোগশ নদীর হিমশীতল তরঙ্গমালা অবিরতই বয়ে যেতে লাগল। কাছেই কোথাও বাঘের ভীষণ গর্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। মনে আমার কিন্তু তখন একটুমাত্রও ভয় নাই, আমার মধ্যে নবজাত তাপবিকীরণশক্তি মনে দুর্ধর্ষ সাহস এনে দিলে। অতি দ্রুতবেগেই আমার কাছে কয়েকঘণ্টা কেটে গেল; গতজীবনের অস্পষ্টস্মৃতি আর বর্তমানে আমার গুরুদেবতার সঙ্গে পুনর্মিলনের চিন্তা নিয়ে মনে মনে উজ্জ্বল কল্পনার জাল বুনে চললুম।

"আমার নির্জন চিন্তায় বাধা পড়ল—দূরাগত কোন লোকের পদধ্বনি ক্রমশঃই নিকটতর হয়ে আসছে। অন্ধকারে একটি মানুষের হাত বেরিয়ে এসে সযত্নে আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে, তারপর কিছু শুকনো কাপড়-চোপড়ও দিলে; পরলুম।

লোকটি বললে, 'এস ভাই, গুরুদেব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন—চল, চল, শীগগির চল!'

"জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লোকটি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির বুকে কোথাও দূরে একটা স্থির উজ্জ্বলপ্রভা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সূর্য উঠল না কি? কই রাত তো এখনও সব কাটে নি।'

"আমার পথপ্রদর্শক মৃদু হেসে বললে, 'এখন রাত বারটা। ঐ যে দূরের আলো দেখা যাচ্ছে, ও হচ্ছে আমাদের অদ্বিতীয় মহাগুরু বাবাজী মহারাজের দ্বারা এই রাত্রেই তৈরী একটি সোনার রাজপ্রাসাদের আলোর ছটা। খুব সুদূর অতীতে তুমি একবার রাজপ্রাসাদ দেখবার কামনা করেছিলে। আমাদের গুরুদেব তাই তোমার সেই ইচ্ছা আজ পূরণ করছেন—তাতে করে তোমার শেষ কর্মবন্ধন আজ ছিন্ন হল।'* তারপর বললে, 'এই অপূর্ব রাজপ্রাসাদেই আজ রাত্রে তুমি "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষিত হবে। দেখ, তোমার সব গুরুভাইয়েরা আজ তোমার দীর্ঘনির্বাসনের পরিসমাপ্তি বলে জয়গানে আনন্দ প্রকাশ করছে, চেয়ে দেখ!'

"আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল সুবর্ণনির্মিত অসংখ্য মণিমাণিক্যখচিত

---

* কর্মবিধি অনুসারে প্রত্যেক মানবের বাসনাকামনার চরম পরিপূর্ণতা লাভ হওয়া চাই। এই বাসনাকামনাই হচ্ছে পুনর্জন্মগ্রহণচক্রে বন্ধনের শৃংখল।

এক বিরাট রাজপ্রাসাদ, চতুর্দিকে মনোরম উদ্যানবেষ্টিত শান্ত সরোবরে প্রতিবিম্বিত—সে এক অবর্ণনীয় অনুপম সৌন্দর্য। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বিরাট তোরণসমূহ বৃহদাকৃতি ও অত্যুজ্জ্বল হীরা, মুক্তা, নীলা, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। দেবতার মতন রূপবান পুরুষেরা সব দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্মরাগমণির রক্ত আভায় দ্বারসকল রক্তিমবর্ণ।

"সঙ্গীটির সঙ্গে একটি প্রশস্ত অভ্যর্থনাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম। বায়ুতরঙ্গে ধূপধুনা প্রভৃতি আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে, ক্ষীণ প্রদীপগুলি থেকে নানা বিচিত্রবর্ণের মৃদু স্নিগ্ধ আলোর সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তদল কেউ শ্যাম, কেউ বা গৌরবর্ণ, সব মধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ করে চলেছেন অথবা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। সেখানকার আবহমণ্ডলে যেন উচ্ছল আনন্দের আবেগকম্পন!

"দেখে শুনে অবাক হয়ে বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করে উঠছি দেখে আমার পথপ্রদর্শকটি সহানুভূতির সঙ্গে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখ, দেখ, ভাল করে চারদিক বেশ করে চোখ মেলে দেখ। কারণ এ কেবলমাত্র তোমার সম্মানের জন্যেই এখানে এখন তৈরী হয়েছে।' আমি বললুম, 'ভাই, এই রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য মানুষের কল্পনার অতীত। এর তৈরী হবার রহস্যটুকু আমায় বলুন না!'

"সঙ্গীটির কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদুটি জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তিনি বললেন, 'খুব আনন্দের সঙ্গেই তোমায় আজ সব বলব! শোন, বস্তুতঃ এর সৃষ্টির মূলে অবোধ্য বলে কিছুই নেই। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার চিন্তার জড়রূপ। এই যে ভারী, মাটির তৈরী পৃথিবীগ্রহের পিণ্ড শূন্যে ভাসমান, এ ত ঈশ্বরের স্বপ্ন! তিনি তাঁর মন থেকেই এ সব তৈরী করেছেন—মানুষ যেমন তার স্বপ্নবোধ থেকে তার অধিবাসী সমস্ত প্রাণীসমেত একটা স্বপ্নজগৎ তৈরী ক'রে তা প্রত্যক্ষ করে।

"ঈশ্বর প্রথমে এই জগৎ তৈরী করেছিলেন একটা ভাব নিয়ে। তারপর তাতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করলেন, আণবিক শক্তি ও তারপর জড়ের উদ্ভব হল। তারপর সেই পরমাণুগুলি সুসমঞ্জসভাবে সজ্জিত করে এই নিরেট মাটির জগৎ তৈরী হল। এর যা সব অণুপরমাণু, তা সব তাঁরই ইচ্ছাশক্তিবলে পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। এই ইচ্ছা যখন তিনি সংবরণ করে নেবেন, তখন আবার এই পৃথিবীর অণুপরমাণু বিলীন হয়ে গিয়ে শক্তিতে পরিণত হবে—শক্তি আবার তার উৎস চৈতন্যে ফিরে যাবে; তা হলেই এই জগৎপরিকল্পনা দৃশ্য অবস্থা থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

"স্বপ্নের যে সার তার রূপদান, স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তর্জ্ঞান চিন্তা থেকেই উদ্ভূত হয়। জাগ্রত অবস্থায় যখন সেই সংহতিকারক চিন্তা অপসারিত হয়, তখন সেই স্বপ্ন আর তার উপাদানসমূহও বিলীন হয়ে যায়। মানুষ চোখ বন্ধ করে স্বপ্নে কিছু একটা সৃষ্টি করে, যা আবার জেগে উঠে বিনা আয়াসে সেটা সে লোপ করে দেয়। সে ঈশ্বরের আদি দৈব কল্পনাই অনুসরণ করে মাত্র, আর কিছু নয়। তেমনি ঐ রকম যখন ব্রহ্মজ্ঞান তার মধ্যে জাগরিত হয় তখন সে বিনা আয়াসে এই জগৎমায়াস্বপ্ন ঘুচিয়ে দিতে পারে।

"সেই সকল কারণের কারণ আর তাঁর সর্বার্থসাধক অনন্ত ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে বাবাজী সৃষ্টির মূল উপাদান অণুপরমাণুদের সংহত করে যে কোন আকারে প্রকাশিত করতে পারেন। মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত এই স্বর্ণনির্মিত রাজপ্রাসাদ, এ প্রকৃতই সত্য—আমাদের এই বিশ্বজগৎ যতটা বাস্তবসত্য! ঈশ্বর যেমন এই পৃথিবী সৃষ্টি করে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে আছেন, বাবাজীও তেমনি তাঁর মন থেকে এই প্রাসাদ তৈরী করে তাঁর ইচ্ছাশক্তিবলে এর অণুপরমাণুদের সংহতি রক্ষা করে তাকে ধারণ করে আছেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আবার এর কাজ যখন ফুরিয়ে যাবে, বাবাজীর ইচ্ছায় তখন এও অদৃশ্য হয়ে যাবে!'

"ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলুম! আমার পথপ্রদর্শক মহাশয় এক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিসহকারে বললেন, 'এই যে দীপ্তোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদ, নানা বহুমূল্য প্রস্তরে অপরূপ কারুকার্যখচিত, এ কোন মানবপ্রচেষ্টায় নির্মিত হয় নি অথবা বহু পরিশ্রমে খনি থেকে তোলা স্বর্ণ বা হীরকাদিতেও রচিত হয় নি। এ মানবশক্তিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে সগর্বে উন্নতশিরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান!* যে কেউ নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছে… বাবাজী যেমন করেছেন, তেমনি সে তার অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিবলে যে কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। অত্যন্ত সাধারণ একটুকরো পাথরের ভিতর যেমন বিরাট আণবিকশক্তির রহস্য† লুক্কায়িত রয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের ভিতরেও দৈবশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে!'

*"অলৌকিক ঘটনা?—সে যে নিন্দা তিরস্কার,
মানবজাতিকে তীব্র উপহাস আর!"—এডওয়ার্ড ইয়ং প্রণীত 'নাইট থট্স'।

†জড়ের আণবিকগঠনের বিষয় বৈশেষিক আর ন্যায়দর্শনে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। "প্রতি অনুকণার ভিতরকার শূন্যস্থানে বিরাট বিশ্ব সব লুক্কায়িত রয়েছে—সূর্যকিরণের ভিতর যেমন কোটি কোটি ধূলিকণা ভেসে বেড়ায়"—যোগবাশিষ্ঠ।

"তারপর মুনিবর নিকটস্থ একটা টেবিলের উপর থেকে একটি পরম রমণীয় পুষ্পাধার তুলে নিলেন, এটির হাতল হীরায় ঝকমক করছে। তারপর সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদের মহাগুরু কোটি কোটি মুক্ত ব্যোমরশ্মি ঘনীভূত করে এই প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছেন। এই ফুলদানি আর তার হীরকগুলি স্পর্শ করে দেখ—তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সব পরীক্ষা-গুলোতেই উৎরে যাবে।'

"ফুলদানিটি নিয়ে পরীক্ষা করলুম, এর মণিরত্নসকল রাজারাজড়াদের ঐশ্বর্যের উপযুক্ত। তারপর উজ্জ্বল চাকচিক্যশালী স্থূলভাবে স্বর্ণে তৈয়ারী সেই ঘরের মসৃণ দেওয়ালের উপর হাত বুলিয়ে দেখলুম। মনের মধ্যে একটা গভীর সন্তোষ সঞ্চারিত হল। আমার অতীত জীবনের অবচেতনার মধ্যে লুক্কায়িত একটা অবরুদ্ধ কামনা—সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পরিতৃপ্ত হয়ে একেবারে নির্মূল হয়ে গেল।

"আমার সহচর নানাকারুকার্যখচিত খিলান ও লম্বা দালানের ভিতর দিয়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের মত বহুমূল্য উপকরণে সুসজ্জিত কতকগুলি কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এক বিশাল হলঘরে আমরা প্রবেশ করলুম। মধ্যস্থলে একটি স্বর্ণসিংহাসন স্থাপিত, নানা হীরাজহরতাদিতে খচিত, তা থেকে নানাবর্ণের উজ্জ্বল দ্যুতি নির্গত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করে রেখেছে। সেখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট আমাদের গুরুদেব। আমি সেই দীপ্তিময় মেঝের উপর তাঁর পদতলে নতজানু হয়ে বসলুম।

" 'লাহিড়ী, এখনও কি তুমি তোমার সোনার রাজপ্রাসাদের স্বপ্নকামনায় বিভোর হয়ে রয়েছ?' গুরুদেবের চক্ষুদুটি তাঁর তৈরী নীলার মতই—জ্যোতি বিকীরণ করছিল। গুরুদেব বললেন, 'জাগ, বৎস জাগ, তোমার সব পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এখন চিরতরে মিটে যেতে বসেছে!' তারপর তিনি কতকগুলি দুর্বোধ্য মন্ত্রে আশীর্বচন উচ্চারণ করে বললেন, 'বৎস, ওঠ। "ক্রিয়াযোগে"র সাহায্যে ভগবৎ সান্নিধ্যলাভের দীক্ষা নাও।'

"বাবাজী তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন ; চারিদিকে ফলপুষ্পে বেষ্টিত এক হোমকুণ্ডে হোমাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। এই জ্বলন্ত অগ্নিবেদীর সম্মুখে আমি কৈবল্যদায়িনী যোগপ্রণালীর শিক্ষা লাভ করলুম।

"অতি প্রত্যূষেই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল। সেই পরমানন্দময় অবস্থায় আমার ঘুমের আর কোন প্রয়োজনই বোধ হল না ; আমি প্রাসাদের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগলুম। চারিদিকই অমূল্য ধনরত্ন আর অপূর্ব কারুশিল্পের দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। তারপর উদ্যানমধ্যে এসে প্রবেশ করলুম।

লক্ষ্য করলুম যে গতকাল যে সব দেখেছিলুম, অতি নিকটেই সেই সব একই গুহাগুলি আর তরুলতাগুল্মবিহীন পর্বতের পাড়গুলি সব রয়েছে, কিন্তু গতকাল তাদের সংলগ্ন রাজপ্রাসাদ বা পুষ্পবীথির কোন চিহ্নই ছিল না।

"তুষারশীতল হিমালয়পর্বতের সূর্যকিরণে উপকথার রাজপ্রাসাদের মতই দীপ্তিশালী সেই প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করে গুরুদেবের সাক্ষাৎ অন্বেষণ করলুম। তখনও তিনি সিংহাসনে আসীন, চতুর্দিকে বহু শিষ্য তাঁকে বেষ্টন করে নীরবে উপবিষ্ট।

"বাবাজী বললেন, 'লাহিড়ী, তোমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা, চোখ বোঁজ.........'

"চোখ খোলবার পর দেখি যে, সেই মায়াপ্রাসাদ আর তার উদ্যান সবই অদৃশ্য হয়েছে। আমার নিজদেহ আর বাবাজী এবং তাঁর শিষ্যগণের মূর্তিসব এখন ঠিক যে স্থানে প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল—সেখানকার উন্মুক্ত ভূমিতে উপবিষ্ট রয়েছে। জায়গাটা সেই পর্বতগুহার সূর্যালোকিত প্রবেশপথ থেকে বেশী দূরে নয়। মনে পড়ে গেল যে, আমার পথপ্রদর্শক তো আগেই বলেছিলেন যে প্রাসাদটি কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে আর এর সংহত অণুপরমাণুগুলি যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল, সেই সব ভাবরূপেই বিলীন হয়ে যাবে। হতভম্ব হয়ে পড়লেও, আমি পূর্ণবিশ্বাসের সঙ্গেই গুরুর দিকে তাকালুম। কি জানি, আজকের এই ভোজবাজির দিনে আবার যে কি ঘটতে পারে তা তো বলতে পারি না।

"বাবাজী বললেন, 'যে উদ্দেশ্যে প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল তা এখন শেষ হয়ে গেছে। এখন তোমার কিছু খাওয়াটাওয়া দরকার।' বলেই ভুঁই হতে একটা মাটির হাঁড়ি তুলে নিয়ে আমায় বললেন, 'এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ, যা তোমার খেতে ইচ্ছে হবে, তাই-ই পাবে। নাও, শুরু কর।'

"এ আবার কি ব্যাপার! শূন্য মাটির হাঁড়িটা ছুঁতেই গরম গরম গাওয়াঘিয়ে ভাজা লুচি, নানারকম মুখরোচক তরকারী আর বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য মেওয়ামিষ্টান্ন তার ভিতরে এসে গেল। খেতে লাগলুম......দেখি যে হাঁড়িটা আর ফুরোয় না। খাওয়া শেষ হলে জলের জন্যে চারিদিকে তাকালুম। গুরুদেব সামনের সেই হাঁড়িটাই দেখিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! খাবারগুলো তখন সব অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার জায়গায় রয়েছে, নির্মল শীতল জল।

"বাবাজী বললেন, 'অতি অল্পলোকেই জানে যে ভগবানের রাজ্যের ভিতর আমাদের এই সব পার্থিব প্রয়োজনের রাজ্যও আছে। ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের এ জগৎসংসার নিয়েই, এ তো আর তাঁর রাজ্যের বাইরে নয়, সে কথা সকলে

বোঝে না ; কিন্তু এ জগৎসংসার সবই মায়াময় বলে, এতে সত্যের কোন সার নেই, বুঝলে ?'

"বললুম, 'পূজনীয় গুরুদেব, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্যের সংযোগ রয়েছে, তা কাল রাত্রে আপনি আমার জন্য প্রদর্শন করেছেন।' তারপরে সেই অদৃশ্য প্রাসাদের কথা স্মরণ করে মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, এরূপ প্রত্যক্ষ বিলাসিতার মধ্যে আত্মার সুমহান আর গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন সাধারণ যোগী এমনভাবে দীক্ষা পান নি। বর্তমান দৃশ্যের বাস্তব দিকে তেমনি শান্তভাবেই তাকাতে লাগলুম। তৃণশস্পবিহীন ভূমি, উন্মুক্ত আকাশের ছাদ, মানুষের আদিম আশ্রয় পর্বতগুহা—সবই আমার চতুষ্পার্শের দেবদূতেদের মত সাধুসন্তদিগের স্বাভাবিক পরিবেশ বলেই বোধ হল।

'সেই দিন বৈকালে আমি আমার কম্বলাসনে বসে আছি—অতীত জীবনের ঈশ্বরোপলব্ধিপূত। আমার গুরুদেবতা কাছে এসে মাথার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর পুণ্যহস্তস্পর্শে আমি নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় প্রবেশ করলুম। এই অবস্থায় আমি একাদিক্রমে সাতদিন ছিলুম। আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আমি পরমসত্যের মৃত্যুহীনরাজ্যে প্রবেশলাভ করলুম। সব মায়ার বন্ধন, ভেদাভেদজ্ঞান দূর হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মার অনন্তবেদীতে আমার আত্মার পূর্ণ অভিষেক ঘটল। আট দিনের দিন সমাধিভঙ্গ হলে গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণতলে গিয়ে পড়ে সকাতরে অনুরোধ করলুম যে, এই পুণ্যময় বনভূমিতেই তিনি যেন সর্বদা আমায় তাঁর কাছে রাখেন।

"বাবাজী আমায় আলিঙ্গন করে বললেন, 'বৎস, তোমার এ জনমে বাইরের এই সংসার রঙ্গমঞ্চেই তোমায় অভিনয় করে যেতে হবে। তোমার বহুজনমের নির্জন সাধনার আশীর্বাদপূত হলেও এ জীবনে তোমায় এ সংসারের মানুষদের মধ্যেই থাকতে হবে।'

" 'বিয়ে হয়ে গিয়ে তোমার ছোটখাট একটি সংসারের আর তার কর্তব্যের ভার না পাওয়া পর্যন্ত যে এবারে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি, তার মধ্যে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। হিমালয়ে আমাদের এই ছোট্ট দলটিতে তোমার যোগদান করবার ইচ্ছা এখন পরিত্যাগ কর ; একজন আদর্শ গৃহস্থযোগীর উদাহরণ স্বরূপ তোমার জীবন জনবহুল সংসারের ভিতরেই তোমায় কাটাতে হবে।'

"তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'সংসারের বহু বিভ্রান্ত নরনারীর হতাশ ক্রন্দন বৃথাই মহাজনদিগের কর্ণে প্রবেশ করে নি। এই রকম বহু আগ্রহশীল আর অনুসন্ধিৎসু লোকেদের "ক্রিয়াযোগে"র দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি এনে দেবার

জন্যে তুমিই নির্বাচিত হয়েছ। লক্ষ লক্ষ লোক, যারা পারিবারিক বন্ধনে আর সংসারের গুরুভারে বিব্রত—তোমারই মতন যারা গৃহী, তারা তোমাকেই দেখে মনে আবার নতুন আশা পাবে। যোগমার্গের সর্বোচ্চ অবস্থা যে গৃহস্থের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নয়, তার পথ তোমাকেই প্রদর্শন করতে হবে। এই সংসারের ভিতরেই কোন যোগী, যদি তার নিজের ব্যক্তিগত কোন কামনাবাসনা বা আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে তার কর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে, তাহলে সে জ্ঞানের সুনিশ্চিত পন্থাই অবলম্বন করে।'

" 'সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ অন্তরে তোমার কর্মবন্ধন সব ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি এ জগতের লোক না হলেও তবু তোমায় এর ভিতরে থাকতেই হবে। এখনও তোমার বহু বছর বাকী আছে যার ভিতর তোমাকে পারিবারিক, কর্মজীবনের, পৌর অথবা আধ্যাত্মিক কর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন করতে হবে। সাংসারিক লোকেদের শুষ্ক হৃদয়ে একটা নূতন স্বর্গীয় আশার সঞ্চার হবে। তোমার সুসমঞ্জস জীবনের উদাহরণ থেকে তারা বুঝতে পারবে যে—মুক্তি আসে অন্তরের বৈরাগ্য থেকে, বাইরের ত্যাগে নয়।'

"সেই হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে গুরুর কথাগুলি শুনতে শুনতে বোধ হল যেন আমার সংসার, আমার অফিস, এ পৃথিবী কত দূরে সরে গেছে। তবুও তাঁর কথার মধ্যে বজ্রকঠোর সত্যের ভাব ফুটে উঠল। উপায় নাই, সেই স্বর্গীয় শান্তির আনন্দনিলয় নিতান্ত অনুগতভাবেই ত্যাগ করতে সম্মত হলুম। শিষ্যকে যোগসাধনে দীক্ষাদান করবার সব প্রাচীন আর কঠিন নিয়মগুলি বাবাজী আমায় উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

"বাবাজী বললেন, 'যারা উপযুক্ত, যারা পাবার অধিকারী হয়েছে, তাদেরই কেবল "ক্রিয়া" দেবে। ঈশ্বরলাভের জন্যে যে সবকিছু ত্যাগ করবার দৃঢ় পণ করেছে, সে-ই কেবল ধ্যানযোগের মধ্য দিয়ে জীবনের চরমরহস্য ভেদ করবার উপযুক্ত।'

"আমি কাতরনয়নে অনুনয়বিনয় করে বললুম, 'গুরুমহারাজ, দেবতা আমার, এই লুপ্ত "ক্রিয়াযোগ" পুনরুজ্জীবিত করে আপনি মানবজাতির যে কি অশেষ কল্যাণসাধন করলেন তা আর বলা যায় না; কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণের কঠোর বিধিনিষেধগুলি একটু শিথিল করে দিয়ে সে সুযোগ কি আপনি বাড়িয়ে দেবেন না? তাই আমার প্রার্থনা এই যে সবাই যারা "ক্রিয়া" নিতে আন্তরিক ইচ্ছুক—এমন কি তারা প্রথমে অন্তরে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য আনবার প্রতিজ্ঞা না করতে পারলেও তাদের "ক্রিয়া" দেবার জন্যে আমায় যেন অনুমতি দেন।

ত্রিতাপতাপে তাপিত,* দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট এই সংসারের নরনারী, তাদেরই বিশেষ উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন ; আর "ক্রিয়াযোগ" যদি তাদের কাছ থেকে দূরেই সরিয়ে রাখা হয় তা হলে তো তারা মুক্তির পথে এগোবার কোন চেষ্টাই করতে পারবে না !'

" 'তবে তাই হোক্। দেখছি যে ভগবানের ইচ্ছা তোমার মুখ দিয়েই প্রকাশ পেল। যে কেউই ভক্তিভরে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে "ক্রিয়া" নিতে আসবে, অবাধে তাদের সবাইকে "ক্রিয়া" দিয়ে দিও।'†

---

*আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, যথাক্রমে ব্যাধি, মানসিক বিকলন এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপে প্রকাশিত।

† মহাবতার বাবাজী মহারাজ প্রথমে কেবলমাত্র লাহিড়ী মহাশয়কেই অন্যদের 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত করার অধিকার প্রদান করেন। পরে যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় বাবাজী মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে তিনি নিজের কতিপয় শিষ্যকে অন্যদের ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করার অধিকার দিতে পারেন। বাবাজী মহারাজ তাতে সম্মত হন্ এবং নির্দেশ দেন— ভবিষ্যতে কেবলমাত্র তাঁরাই ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দিতে পারবেন যাঁরা নিজেরা ক্রিয়াযোগের পথে অগ্রসর হতে পেরেছেন এবং দীক্ষাদানের অধিকার পেয়েছেন স্বয়ং লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে অথবা তাঁরই গোষ্ঠির কতিপয় দীক্ষাদানের ভারপ্রাপ্ত শিষ্যদের কাছ থেকে। বাবাজী মহারাজ করুণা পরবশ হয়ে সেই সকল অনুগত ও বিশ্বস্ত ক্রিয়াযোগীর জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির ভার গ্রহণ করেছেন যাঁরা অধিকার প্রাপ্ত উপদেষ্টার নিকট হতে দীক্ষালাভ করেছেন।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া / সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপের দীক্ষার্থী ব্যক্তিগণকে এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাক্ষর দিতে হয় যে, তাঁরা এই 'ক্রিয়া' পদ্ধতি অন্যদের নিকট কখনো ব্যক্ত করবেন না। সরল এবং প্রকৃত ক্রিয়া পদ্ধতিকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেই সুরক্ষিত করা হয়েছে যাতে করে তা অনধিকারী উপদেষ্টাদের দ্বারা বিকৃত না হয়ে আদিতে যেমন ছিল, তেমনি অকৃত্রিম অবস্থায় থাকতে পারে।

জনসাধারণকে 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের জন্য যদিও বাবাজী মহারাজ প্রাচীন যুগের সন্ন্যাস ও ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণের রীতি পরিত্যাগ করেন, তথাপি তিনি এই নির্দেশ দেন যেন লাহিড়ী মহাশয় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক পথের অনুগামীগণ (ওয়াই, এস, এস,/এস, আর এফ্ গুরুগণ) দীক্ষাপ্রার্থীদিগকে ক্রিয়াযোগ প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য আবশ্যিক-ভাবে কিছুকাল প্রাথমিক আধ্যাত্মিক অনুশাসন মেনে চলতে বলবেন। ক্রিয়াযোগের ন্যায় একটি উচ্চ যোগ মার্গের আশ্রয় নিতে হলে, নিয়মশৃঙ্খলাহীন জীবনযাপন করা কোনমতেই চলতে পারে না। 'ক্রিয়াযোগ' হচ্ছে সাধারণভাবে ধ্যানাভ্যাসের থেকেও একটি উচ্চস্তরের সাধন। প্রকৃতপক্ষে এই যোগ হচ্ছে একটি অতি উন্নত ধরণের জীবনযাপন পদ্ধতি এবং সেই কারণে এই যোগে দীক্ষিত হতে হলে কতকগুলি নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশাসন মেনে

"খানিকক্ষণ নীরব থেকে বাবাজী আবার বললেন, 'তোমার প্রত্যেক শিষ্যের কাছে ভগবদ্গীতার এই অমর শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শোনাবে, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"*—[অর্থাৎ এ ধর্মের অতি অল্পমাত্র অনুশীলনেও তোমার বিপুল ভয় থেকে পরিত্রাণ হবে]।'

"তার পরদিন সকালবেলা বিদায় নেবার সময়, গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে, তাঁকে ছেড়ে যেতে যে আমার একান্ত অনিচ্ছা তা বুঝতে পেরে সস্নেহে তিনি আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললেন, 'প্রিয় বৎস, আমাদের মধ্যে কখনও কোন বিচ্ছেদ নাই জেনো। যেখানেই তুমি থাক না কেন, আর যখনই তুমি আমায় ডাক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব।'

"তাঁর এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত আর নবলব্ধ ভগবৎজ্ঞানের স্বর্ণখনির সন্ধানলাভে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলুম। আফিসে যেতে সহকর্মীরা সব হৈ হৈ করে উঠল—দশ দিন ধরে দেখা নাই, কোথায় গেল, কি হ'ল হিমালয়ের জঙ্গলে নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছি, এই সব তো তারা ভেবেই অস্থির। যাই হোক, আমাকে ফিরতে দেখে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর শীগগিরই হেড অফিস থেকে একটি চিঠি এল। চিঠিতে লেখা ছিল, 'লাহিড়ী দানাপুরের অফিসে ফিরে আসবে। তার রাণীক্ষেতে বদলী হওয়া ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল। আর একজন লোককে রাণীক্ষেতের কাজের ভার নিতে পাঠান উচিত ছিল।'

"যাক্, সব দেখেশুনে তো মনে মনে খানিকটা হাসলুম এই ভেবে যে কি ধরণের ঘটনার উল্টাস্রোত আমাকে ভারতবর্ষের এই সুদূরতম প্রদেশে টেনে এনে ফেলেছে।

"দানাপুরে ফেরবার আগে মোরাদাবাদে আমি একটি বাঙ্গালী পরিবারে

নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি এবং সেলফ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ নিষ্ঠা সহকারে বাবাজী মহারাজ, লাহিড়ী মহাশয়, স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী এবং পরমহংস যোগানন্দজীর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপরোক্ত নির্দেশ সকল পালন করে চলেছে। "হং-সৌ" এবং "ওঁ" সাধন পদ্ধতি যা ক্রিয়াযোগের প্রাথমিক সাধন হিসাবে ওয়াই, এস্, এস্/এস, আর, এফ্ পাঠমালার মাধ্যমে এবং ওয়াই, এস্, এস্/এস্, আর, একের প্রতিনিধিগণের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ক্রিয়াযোগ মার্গেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সাধন পদ্ধতিগুলি হচ্ছে চেতনাকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটানোর পক্ষে বিশেষভাবে কার্যকরী।

*শ্রীমদ্ভগবদগীতা—২য় অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।

দিনকতক ছিলুম। জনছয়েক বন্ধু মিলে একদিন গল্পগুজব চলছে, কথাবার্তার মোড় ফিরল যখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে, তখন আমাদের গৃহস্বামীটি বিরসবদনে বললে, 'আর বলেন কেন, ভারতে আর আজকাল তেমনগোছের কোন সাধুসন্ন্যাসী নেই !'

" 'আমি সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে বললুম, 'বাবু মশায়, আপনি বলেন কি ? এখনও ভারতভূমিতে খুব বড় বড় যোগীঋষিরা আছেন বই কি !' বলে উৎসাহের আতিশয্যে আমার হিমালয়ের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁদের সামনে বিবৃত করলুম। সেই ক্ষুদ্রদলটি কিন্তু তখন কোন কিছু বিশ্বাস না করেই চুপ করে বসে রইল।

"একটি লোক তার ভেতর থেকে একটু সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'লাহিড়ী, হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ে হাল্কা বাতাসে তোমার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে ! এ যা বর্ণনা করলে, তা সব দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।' সত্যভাষণের উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলে ফেললুম 'দেখুন, আমি যদি এখন ডাকি, তাহলে আমার গুরু এই বাড়ীতে এখনই এসে উপস্থিত হবেন।'

"শুনে তো সকলের চক্ষু উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আর এ রকম অলৌকিক উপায়ে কোন যোগীকে আবির্ভূত হতে দেখবার জন্যে যে দলের সকলেরই আগ্রহ হবে, সেটা বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। যাই হোক, কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি একটি নির্জন ঘর আর খানদুই নূতন কম্বল আসন চাইলুম।

"ঘরে প্রবেশ করে আসনাদি যথাস্থানে সংস্থাপন করে আমি তাদের বললুম, 'যোগিবর শূন্য হতেই আবির্ভূত হবেন। তিনি এলেই আমি আপনাদের ডাকব। এখন আপনারা দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, কোন গোলমাল যেন না হয়।' বলে দরজা বন্ধ করে দিলুম।

"তারপর ধ্যানে বসলুম, বসে সকাতরে গুরুদেবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে লাগলুম। অন্ধকার ঘর শীগগিরই একটা স্নিগ্ধ মৃদু চন্দ্রালোকের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার ভেতর থেকে বাবাজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি বেরিয়ে এল।

" 'লাহিড়ী ! তুমি একটা অতি তুচ্ছ কারণে আমায় ডাকলে।' বাবাজীর দৃষ্টি কঠিন। 'এ ধর্মের সত্য কেবল তাদেরই জন্যে, মনেপ্রাণে যাদের আগ্রহ আছে, কারুর অলস কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে নয়। দেখলে অবিশ্যি বিশ্বাস করা সহজ হয়—তখন আর অস্বীকার করার কিছুই থাকে না। যারা তাদের

স্বাভাবিক জড়বাদী সন্দেহভাব হতে মুক্ত হতে পেরেছে তারাই কেবল এই অতীন্দ্রিয় সত্য আবিষ্কার করতে পারে, আর তা পাবার উপযুক্ত।' তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমায় যেতে দাও!'

"আমি তাঁর চরণতলে পড়ে মিনতি করে বললুম, 'পূজ্যপাদ গুরুদেব, আমার গুরুতর ভুল এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, আপনার চরণতলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ এই সব লোকেদের মনে বিশ্বাস-সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আপনাকে ডাকতে সাহসী হয়েছিলুম। যখন আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দয়া করে এসে উপস্থিতই হয়েছেন, তখন আর আমার বন্ধুদের আশীর্বাদ না করে চলে যাবেন না। অবিশ্বাসী হলেও তারা শুধু আমার অদ্ভুত উক্তির সত্যতার বিষয়ে অনুসন্ধান করতেই ইচ্ছুক হয়েছিল!'

" 'আচ্ছা বেশ, থাকব কিছুক্ষণ; অবিশ্যি আমিও ইচ্ছে করিনে যে তোমার বন্ধুদের সামনে তোমার কথা খেলো হয়ে যায়!' বাবাজীর আনন শান্ত কোমল হয়ে এল। তারপর তিনি স্নিগ্ধমধুর স্বরে বললেন, 'বাবা, এখন থেকে কেবল তোমার সত্যি সত্যিই দরকার পড়লে ডাকলে তবে আসব, সব সময়েই ডাকলে আর আসব না।'*

"দরজা যখন খুললুম, একটা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা সেই ক্ষুদ্র দলটির ভিতর বিরাজ করছিল। বন্ধুবর্গ যেন তাদের চোখকানকে অবিশ্বাস করে সেই কম্বলাসনের উপর উপবিষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল।

"একটা লোক হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'এ হচ্ছে সকলকে একসঙ্গে সম্মোহিত করা, এ ছাড়া আর কিছু নয়! আর তা ছাড়া আমাদের অজান্তে কোন লোকের এ ঘরে ঢোকাই বা সম্ভব হবে কি করে?'

"বাবাজী একটু মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেককেই তাঁর শরীরের উষ্ণ, দৃঢ়মাংস স্পর্শ করতে ইঙ্গিত করলেন। একে একে সকলের সন্দেহভঞ্জন হবার পর সকলেই ভীত ও অনুতপ্তচিত্তে বাবাজীর সম্মুখে মেঝের উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

---

*আত্মোপলব্ধির পথে এমন কি ঈশ্বরোপলব্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের মত গুরুরাও উৎসাহের আতিশয্য প্রদর্শন করেন এবং তা সংযত করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভগবদ্গীতায় ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুনকেও ভগবানগুরু শ্রীকৃষ্ণ এজন্য তিরস্কার করেছিলেন, তা গীতায় বহু পংক্তির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

"বাবাজী তখন বললেন, 'খানিকটা হালুয়া তৈরী করে আন দেখি ; এস, সবাই মিলে খাওয়া যাক, কি বল ?' আমি বুঝতে পারলুম যে তাঁর সশরীরে আবির্ভাবের সত্যতার আরও প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য তিনি এই অনুরোধ করলেন। হালুয়া তৈরী হতে লাগল, এধারে সেই গুরুদেবতাও অতি মধুরভাবে তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করতে লাগলেন। সন্দিগ্ধ টমাসদের ভক্তশ্রেষ্ঠ সেণ্ট পলে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর বাবাজী একে একে প্রত্যেককেই আশীর্বাদ করলেন—তারপর হঠাৎ একটা বিদ্যুৎঝলকের মতন জ্যোতিঃর স্ফুরণ ! আমরা দেখলুম, বাবাজীর পঞ্চভৌতিক দেহের মূল উপাদানের অণুপরমাণুগুলি তৎক্ষণাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যবিসারী আলোক-বাষ্পে পরিণত হল। গুরুদেবের ঈশ্বরানুপ্রাণিত প্রবল ইচ্ছাশক্তি এখন তাঁর শরীররূপে ধৃত অণুপরমাণুগুলির সংহতি শ্লথ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কোটি-কোটি প্রাণকণিকাস্ফুলিঙ্গ সেই অনন্ত আধারে মিলিয়ে গেল।

"সেই দলের ভিতরকার মৈত্র মহাশয়* নামে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমায় একবার বলেছিলেন, 'আমি নিজের চোখে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাগুরুকে দেখেছি। শিশুরা সাবানের ফেনা নিয়ে যেমন খেলে ওড়ায়, আমাদের মহাগুরুও তেমনি দিক্ ও কাল নিয়ে খেলা করেন। আমি এমন এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যার হাতে একসঙ্গে স্বর্গ ও মর্ত্যের চাবিকাঠি রয়েছে !' বলতে বলতে নবলব্ধ জ্ঞানের আনন্দালোকে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"শীগগিরই দানাপুরে ফিরলুম। পরমাত্মায় মন দৃঢ় সংলগ্ন করে আবার নানারকম কাজ আর গৃহস্থের সাংসারিক কর্তব্যভার সব হাতে তুলে নিলুম।"

বাবাজী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "তোমার যখনই আমায় দরকার হবে, তখনই আবার আমি আসব"—যে অবস্থায় পড়ে বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের

*মৈত্র মহাশয় বলে যে লোকটির কথা লাহিড়ী মহাশয় এখানে উল্লেখ করেছেন, পরে তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ হয়েছিল। আমার কলেজে প্রবেশ করবার অল্প কিছুকাল পরেই মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ; কাশীর মহামণ্ডল আশ্রমে আমি যখন ছিলুম, তখন তিনি আশ্রম দর্শনের জন্য সেখানে যান। সে সময় তিনি আমায় মোরাদাবাদের সেই দলটির সামনে বাবাজীর সশরীরে আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, "এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শনের পর হতেই আমি লাহিড়ী মহাশয়ের আজীবন শিষ্য হয়েছিলুম।"

আর একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তার বিবরণ তিনি স্বামী কেবলানন্দ আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে বলেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের কাছে নিম্নলিখিতভাবে ঘটনাটি বিবৃত করেন, "দৃশ্যটা হচ্ছে প্রয়াগে কুম্ভমেলা। আফিসের কাজ থেকে অল্প কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে সেখানে গেছি। কুম্ভমেলায় যোগদানের জন্য বহুদূর দূরান্তর হতে আগত সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসীদের সমাগম হয়েছে, সেখানে তাঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি,—ভিক্ষাপাত্র হাতে একটি ভস্মমাখা সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়ল। মনে হল যেন লোকটা ভণ্ড, বাইরে ত্যাগের বড়াই—মনে কিন্তু তার বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটাও নাই।

"যাক্, সাধুটিকে ছাড়িয়ে যেই এগিয়েছি, অমনি বাবাজীর উপর দৃষ্টি পড়ল। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, তিনি একটি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন—অবাক কাণ্ড!

"তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'গুরুজী, একি! এখানে কি করছেন আপনি?'

"বাবাজী আমার দিকে চেয়ে সরল শিশুর মতন হেসে বললেন, 'আমি এই সন্ন্যাসীটির পা ধুইয়ে দিচ্ছি, তারপর এঁর উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে দেব!' তখন আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি আমায় এই শিক্ষা দিতে চাইছেন যে, আমি যেন কারুর কোন সমালোচনা না করি; আর উচ্চনীচ সকলকার দেহ-মন্দিরেই যে ভগবান সমভাবে অধিষ্ঠান করছেন, সেইটাই যেন আমি মনে রাখি।

"মহাগুরু তারপর বললেন, "জ্ঞানী অজ্ঞানী এই দু'রকম সাধুদেরই সেবা ক'রে আমি সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ, ভগবানের কাছে যা সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাই শিক্ষা করছি—নম্রতা আর বিনয়।' "*

*"তিনি অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন আকাশ ও পৃথিবীতে সকল ব্যাপারের উপর।" গীতসংহিতা (সাম্স্) ১১৩:৬। "যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা হবে, আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ করা হবে।" ম্যাথিউ—২৩:১২ (বাইবেল)।

মিথ্যা স্বরূপ বা অহংকারের নাশেই মানবের অনন্ত সত্তার আবিষ্কার।

৩৫শ পরিচ্ছেদ

লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যময় জীবন

"এইরূপে আমাদের সকল সদাচারই পালন করা উচিত।"* জন দি ব্যাপ্টিষ্টকে এই কথাগুলি বলে আর জনকে তাঁকে দীক্ষিত করতে বলে যীশু তাঁর গুরুর দৈব অধিকার স্বীকার করেছিলেন।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতো বাইবেলের শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ আর অন্তরের অনুভূতিতে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে, অতীতজীবনে জন দি ব্যাপ্টিষ্ট যীশুখ্রিস্টের মহান্ গুরু ছিলেন। বাইবেলে এমন কতকগুলি পংক্তি আছে যাতে করে বোঝা যায় যে, জন আর যীশুখ্রিস্ট তাঁদের গতজন্মে যথাক্রমে ইলাইজা আর তাঁর শিষ্য এলিশা নামে পরিচিত ছিলেন। (এইগুলি ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বানান্। গ্রীক অনুবাদকেরা বানান করেছিলেন এলিয়াস আর এলিসিয়ুস্; নিউ টেষ্টামেণ্টে তাঁরা এইরূপ পরিবর্তিত আকারেই পুনরায় স্থান পেয়েছেন!)

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের শেষ অংশটাই হচ্ছে ইলাইজা আর এলিশার পুনর্জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী। "দেখো, আমি প্রভুর সেই ভয়ঙ্কর দিন আসবার পূর্বেই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ ইলাইজাকে তোমার কাছে পাঠাব।"‡ তাই জন (ইলাইজা) "সেই দিন......আসবার পূর্বেই" প্রেরিত হয়ে খ্রিস্টের অগ্রদূত হিসেবে কিছু আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা জ্যাকেরিয়াসের কাছে একটি দেবদূত আবির্ভূত হয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে তাঁর ভাবীপুত্র 'জন', ইলাইজা (এলিয়াস্) ছাড়া আর কেউ নন।

"কিন্তু সেই দেবদূত তাঁকে বললেন,—ভয় পেয়ো না জ্যাকেরিয়াস, কারণ তোমার প্রার্থনা শ্রুত হয়েছে; তোমার স্ত্রী এলিজাবেথের একটি পুত্রসন্তান হবে, আর তুমি তার নাম রাখবে 'জন'। আর ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে সে তাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর সে এলিয়াসের

* ম্যাথিউ—৩:১৫ (বাইবেল)।

† বাইবেলের বহু পংক্তিতে দেখা যায় যে পুরাতন আর নূতন টেষ্টামেণ্ট যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের দ্বারা পুনর্জন্মবাদ অবগত আর স্বীকৃতও হয়েছে।

‡ মালাকি—৪:৫ (বাইবেল)।

আত্মা ও শক্তির 'বলে' তার আগে* যাবে, পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে, এবং অবাধ্যদের ধর্মশীলের ন্যায়নিষ্ঠার দিকে ফিরাতে, আর প্রভুর জন্যে দেশের লোকেদের তৈরী করতে।"†

যীশুখ্রিস্ট দুইবার স্পষ্টবাক্যে ইলাইজা (এলিয়াস) কে 'জন' বলে নির্দেশ করে গেছেন। "এলিয়াসের ইতিমধ্যে আগমন ঘটেছে—কেউ তাঁকে জানে না··· ···তারপর শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন যে জন দি ব্যাপ্টিস্টের কথাই তিনি তাদের বলেছিলেন।"‡

পুনরায় যীশুখ্রিস্ট বলছেন, "কারণ 'জন' পর্যন্ত সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আর বিধিনিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে। আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তাহলে জেনো যে যাঁর আগমন হবে তিনিই এই ব্যক্তি—এলিয়াস।"§

জন যখন অস্বীকার করলেন যে তিনি এলিয়াস (ইলাইজা)॥ নন, তখন তিনি এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে জনের দীনবেশে তিনি আর মহান্‌গুরু ইলাইজার বাহ্যমহিমা নিয়ে আসেন নি। পূর্বজন্মে তিনি তাঁর মহিমা আর আধ্যাত্মিক সম্পদের "প্রাবরণ" তাঁর শিষ্য এলিশাকে দিয়েছিলেন। "আর এলিশা বললেন, আমি আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি যে আপনার আত্মার দুইটি অংশ আমাতে আসুক ; তারপর তিনি বললেন, তুমি বড় কঠিন জিনিস চেয়েছ ; যাই হোক, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবার সময় যদি তুমি আমায় দেখ তাহলে তোমার এই রকমই হবে···তারপর ইলাইজা পরিত্যক্ত "প্রাবরণ" তিনি তুলে নিলেন**······ইলাইজার আত্মাই এলিশাতে অবস্থান করছে।"

এইবার তাঁদের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেল, কারণ এলিশা-যীশুর এখন পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়াতে আর ইলাইজা-জনের তাঁর প্রকাশ্য গুরু হবার কোন প্রয়োজন রইল না।

পর্বতের উপর খ্রিস্টের রূপান্তরসাধনের*** সময় মুসার সঙ্গে তাঁর গুরু এলিয়াসকে তিনি দেখেছিলেন। আবার ক্রুশের উপর তাঁর অন্তিমসময়ে যীশু ঈশ্বরের নাম ধরে এই বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, "এলী, এলী, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমায় পরিত্যাগ করলেন কেন?···যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল

*তার আগে অর্থাৎ প্রভুর আগে। †লূক ১:১৩-১৭। ‡ম্যাথিউ ১৭:১২-১৩। §ম্যাথিউ ১১:১৩-১৪। ॥জন ১:২১।

**রাজাবলী (কিংস) ২:৯-১৪।

***ম্যাথিউ ১৭:৩ (বাইবেল)।

তাদের মধ্যে জনকতক তা শুনে বললে, এই ব্যক্তি এলিয়াসকে ডাকছে, দেখা যাক, এলিয়াস ওকে বাঁচাতে আসেন কিনা।"*

জন আর যীশুখ্রিস্টের মধ্যে গুরুশিষ্যের যে চিরন্তন সম্বন্ধ ছিল, তা বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয়ের মধ্যেও ছিল। তাঁর শিষ্যের দুইটি অতীত জীবনের মধ্যকার বিস্মৃতিসাগরের অতলস্পর্শ জলরাশি অতিক্রম করে স্নেহব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রথমে শিশু পরে পূর্ণবয়স্ক লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের গতি ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। শিষ্যের তেত্রিশ বছর বয়সে না পেঁছান পর্যন্ত বাবাজী সেই অচ্ছেদ্যবন্ধনের প্রকাশ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে বিবেচনা করেন নি। তারপর রাণীক্ষেতে তাঁদের সেই স্বল্পকালের জন্য সাক্ষাতের পর সেই নিঃস্বার্থ মহাগুরু তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যকে পর্বতের সেই ক্ষুদ্র শিষ্যদল হতে নির্বাসিত করে বাইরের সংসারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, "বাবা, যখনই তোমার দরকার হবে আমি তোমার কাছে এসে হাজির হব।" কোন্ প্রেমিকমানব এমন প্রতিজ্ঞার অসীম অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে পারে?

লোকসমাজে সাধারণভাবে অপরিচিত থাকলেও ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কাশীর এক অখ্যাত সুদূর পল্লীকোণ হতে এক বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ শুরু হল। ফুলের সৌরভ যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি আদর্শগৃহী হিসেবে বাস করেও লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অন্তরগৌরব চেপে রাখতে পারেন নি। ভারতের সকল স্থান থেকে ভক্তমধুকরবৃন্দ সেই জীবন্মুক্ত মহান্‌গুরুর উপদেশমকরন্দ পানের লোভে তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হতে লাগলেন।

অফিসের সাহেব সুপারিন্টেন্ডেন্টই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে তাঁর এই কর্মচারীটির একটা অতীন্দ্রিয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাই তাঁকে আদর করে "ব্রহ্মানন্দ বাবু" বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন।

একদিন সকালে এসে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, আপনাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন তো?"

সাহেব তখন বললেন, "বিলেতে আমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়িতা—মরণাপন্ন অবস্থা। দারুণ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় আমি পাগল হয়ে গেছি।"

"আচ্ছা, তাঁর সম্বন্ধে আমি এখুনিই কিছু খবর এনে দিচ্ছি!" বলে

*ম্যাথিউ ২৭:৪৬-৪৯ (বাইবেল)।

লাহিড়ী মহাশয় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর উঠে এসে আশ্বাসসূচক হাসিতে বললেন, "ভয় নেই, আপনার স্ত্রী সেরে উঠছেন। তিনি আপনাকে এখন একটি চিঠি লিখছেন।" বলে সেই সর্বদর্শী যোগিবর সেই পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত করে শোনালেন।

"ব্রহ্মানন্দ বাবু, আমি জানি যে আপনি কোন সাধারণ মানুষ ন'ন। কিন্তু তবুও আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আপনি ইচ্ছামাত্র সময় আর দূরত্বের বাধা এমন করে অতিক্রম করতে পারেন।"

তাঁর স্ত্রীর লেখা সেই কথিত চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় দেখলেন যে, পত্রে যে শুধু তাঁর স্ত্রীর আরোগ্যলাভের সুসংবাদ আছে তাই নয়, লাহিড়ী মহাশয় হপ্তাকতক আগে যে সব কথাগুলি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলেন, সে সব কথাগুলোও অবিকল তাতে লেখা আছে।

মাসকতক পরে তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষে এলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাকিয়ে বললেন; "মহাশয়, লণ্ডনে আমার রোগশয্যার পাশে স্বর্গীয় আলোর ছটায় ঘেরা আপনারই এই মূর্তি আমি মাসকতক আগে দেখেছিলুম। সেই মুহূর্তেই আমার রোগ একেবারে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল। তারপরে আমি অতি শীঘ্রই ভারতবর্ষের পথে এই সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে সমর্থ হলুম; পথে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি।"

দিনের পর দিন একটি দুটি করে ভক্তেরা সব সেই মহান্ গুরুর কাছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ করতে লাগল। তাঁর এই সব আধ্যাত্মিক, সাংসারিক আর কর্মস্থলের কর্তব্যসম্পাদন ছাড়াও তিনি শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি বহু পাঠচক্র সৃষ্টি করেছিলেন, তা ছাড়া কাশীর বাঙ্গালীটোলা অঞ্চলে একটি বৃহৎ উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। "গীতাসম্মিলনী" নামে অভিহিত এক সাপ্তাহিক ধর্মসভায় তিনি বহু ধর্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করতেন।

সংসারীলোকে যে বলে, "রোজগার আর সংসারের কাজকর্ম করবার পর ধর্মটর্ম করবার আর সময় থাকে কোথায়?" লাহিড়ী মহাশয় এই সব বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তার উত্তর জনসাধারণের সম্মুখে হাজির করেছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ গৃহস্থগুরুর সুসমঞ্জস জীবন সহস্র সহস্র নরনারীদের ভিতর নীরব অনুপ্রেরণা এনে দিত। অল্পবেতন উপার্জন করে মিতব্যয়ী, অনাড়ম্বর আর

সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে, গুরুদেব অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে এবং সুখেতেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন।

পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়েও লাহিড়ী মহাশয় জ্ঞানীমূর্খনির্বিশেষে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁর ভক্তেরা তাঁকে প্রণাম করলে তাদেরও তিনি প্রতিনমস্কার করতেন। শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই অপরের পাদস্পর্শও করতেন, কিন্তু এরূপ ভাবে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পুরাতন প্রাচ্য প্রথা হলেও কদাচিৎ তিনি অপরকে ঐরূপভাবে তাঁকে প্রণাম করতে দিতেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—সকল ধর্মাবলম্বীদেরই ক্রিয়াযোগে দীক্ষাদান। কেবলমাত্র যে হিন্দু তাই নয়, মুসলমান বা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরাও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী বা সকল ধর্মমতের অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ ধর্মমতের নয়, এমন বহু লোকেদেরও বিশ্বগুরু নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর খুব উচ্চাবস্থার শিষ্যদের মধ্যে আবদুল গফুর খাঁ নামে একজন মুসলমান চেলাও ছিলেন। আর তাঁর মত একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর সময়ে জাতিভেদের কঠিন গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেবার যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তাতে করে লাহিড়ী মহাশয়ের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায় বই কি! মহাগুরুর বিশ্বব্যাপী পক্ষপুটের অন্তরালে জীবনের বিভিন্নস্তরের লোক আশ্রয় পেয়েছিল। ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ, পতিতপাবন সকল ধর্মগুরুদের মতন তিনি সমাজনিন্দিত, পতিত, সকল পাপীতাপীদের প্রাণে আশার নবারুণরাগের সঞ্চার করতেন।

তিনি শিষ্যদের বলতেন, "সর্বদা মনে রেখো যে তুমি কারুরই নও আর কেউই তোমার নয়। ভেবে দেখো যে একদিন এ সংসারের সব কিছুই ফেলে রেখে তোমাকে হঠাৎই চলে যেতে হবে—কাজেই এখন থেকেই ভগবানের একটুআধটু খোঁজখবর নেওয়া শুরু কর আর রোজই একটু একটু করে ঈশ্বরানুভূতির বেলুনে চড়ে মরণের শূন্যপথে মহাযাত্রার জন্যে তৈরী হও। মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে তোমার হাড়মাংসের খাঁচাটাকেই তোমার স্ব-রূপ বলে ভাবছ? এ আর কি, বড়জোর একটা জ্বালাযন্ত্রণা দুঃখকষ্টের বাসা বই তো আর কিছু নয়!* ধ্যান কর, ধ্যান কর, অবিরাম ধ্যান করে যাও—যাতে করে

*"আমাদের শরীরে কত রকমের মৃত্যু আছে। মৃত্যু ছাড়া আর সেখানে কিছুই নাই।
মার্টিন লুথার

অতি শীগগিরই তুমি সেই সকল দুঃখক্লেশমুক্ত, সকল বাধাবন্ধহীন অনাদি অনন্ত পরমাত্মার স্বরূপ দেখতে পারো। ক্রিয়াযোগের গুপ্তচাবিকাটি দিয়ে তোমার দেহকারাগারের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার শিক্ষালাভ কর।"

মহান্ গুরু তাঁর বিভিন্ন শিষ্যদের তাঁদের আপন আপন ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত নিষ্ঠাপালনে উৎসাহিত করতেন। ক্রিয়াযোগের সর্বগ্রাহী প্রকৃতি যে মুক্তি-লাভের কার্যকরী উপায়, তার উপর জোর দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের পরিবেশ আর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের নিজ নিজ জীবন ফুটিয়ে তুলতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন, "মুসলমান দিনে পাঁচবার নমাজ* পড়বে আর হিন্দুও দিনে অনেকবার জপতপে বসবে। খ্রিস্টানও রোজ কয়েকবার হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, তারপর বাইবেল পড়বে।"

গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি অনুযায়ী জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম বা রাজযোগের পথে তাদেরকে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত করতেন। ভক্তেরা সন্ন্যাস জীবনযাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি তাদের সহজে অনুমতি দিতেন না—বরঞ্চ সাবধান করে দিয়ে বলতেন, তারা যেন সন্ন্যাস জীবনের কঠিন কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে পূর্বেই চিন্তা করেন।

আদর্শগুরু হিসেবে তিনি শিষ্যদের শুধু শাস্ত্রের শুষ্কতর্ক নিয়ে পড়ে থাকা এড়িয়ে চলতেই পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন, "প্রাচীন শাস্ত্রের সার সত্য শুধু পঠনপাঠনে নয়, অন্তরের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধি করবার জন্য যে সাধন করে সেই বুদ্ধিমান। তোমার যা কিছু সমস্যা তা ধ্যানধারণার ভিতর দিয়ে সমাধানের চেষ্টা কর।† ধর্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন অনিশ্চিত ধারণায় তো লাভ নেই, তার চেয়ে বরং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসঙ্গলাভের চেষ্টা কর। মনের ভিতর থেকে ধর্মের গোঁড়ামির সব জঞ্জাল দূর করে ফেল—সাক্ষাৎ অনুভূতির নির্মল, পূত শান্তিবারিতে মন প্লাবিত কর। অন্তরের যা প্রত্যক্ষ নির্দেশ তাই পালন করতে মনকে তৈরী কর ; আর হৃদয়ের সঙ্গোপনে যে ঈশ্বরের বাণী লুক্কায়িত আছে তা শোনবার জন্যে কান পেতে রাখ, সেখানেই তুমি জীবনের সব জটিল সমস্যার উত্তর খুঁজে পাবে, দেখো। মানুষের নিজ

*নমাজ—মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা।

†"ধ্যানেতেই সত্যের সন্ধান কর—জীর্ণ পুঁথিতে নয়। চাঁদের জন্য আকাশে দৃষ্টিপাত কর—পুষ্করিণীতে নয়।" (পারস্যদেশীয় প্রবাদ)।

কর্মদোষে যেমন দুঃখকষ্টে পড়বার চেষ্টার অন্ত নাই, তেমনি সকল উপায়ের উপায়, সেই পরমদয়ালের করুণারও অন্ত নাই !"

একদিন ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণকালে তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের গুরুদেবের সর্বব্যাপিত্বের এক নিদর্শন পান। লাহিড়ী মহাশয় যখন কূটস্থ-চৈতন্য অর্থাৎ সকল স্পন্দনশীল সৃষ্টির মূলে যে ব্রহ্মজ্ঞান তার অর্থ ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ দম আটকে যাওয়ার মত চিৎকার করে বলে উঠলেন, "জাপানের সমুদ্রতীরে আমি বহুলোকের শরীরে থেকে ডুবে যাচ্ছি।"

তার পরদিন সকালবেলা শিষ্যেরা সংবাদপত্র খুলে পাঠ করে দেখলেন যে, আগের দিন জাপানের কাছে এক জাহাজডুবি হয়ে বহুলোক মারা গেছে।

লাহিড়ী মহাশয়ের দূরের শিষ্যরা তাঁদের নিকট তাঁর সর্বব্যাপী অদৃশ্য উপস্থিতি প্রায়ই অবগত হতেন। যাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে পারতেন না তাঁদের আশ্বস্ত করে তিনি বলতেন, "যারা 'ক্রিয়া' অভ্যাস করে তাদের কাছে আমি সর্বদাই উপস্থিত থাকি। তোমার কোন ভাবনা নাই ; তোমার ক্রমিক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার সেই চির-আশ্রয়স্থলে তোমায় নিয়ে যাব।"

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্ন্যাল মহাশয়—সেই মহান্ গুরুর এক জীবিত শিষ্য*, আর পুরীধামে লাহিড়ী মহাশয়ের ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা—বলেন যে, কৈশোরে তিনি কাশী গমনে অসমর্থ হয়ে গুরুর কাছে আধ্যাত্মিক দীক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। লাহিড়ী মহাশয় ভূপেন্দ্র বাবুর সামনে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে দীক্ষা দান করেন। পরে তিনি কাশীতে গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলে, লাহিড়ী মহাশয় বলেন, "আমি তো তোমায় ইতিমধ্যে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছি।"

সাংসারিক কোন কর্তব্যে অবহেলা করলে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যকে সস্নেহ উপদেশ দিয়ে তার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে তাকে কর্তব্যপালনে অবহিত করে তুলতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একদিন আমায় বলেছিলেন, "লাহিড়ী মহাশয় তাঁর কোন চেলার দোষের বিষয় সর্বসমক্ষে বলতে বাধ্য হলেও তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে মিষ্টভাবে বুঝিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন।" তারপর তিনি সখেদে বললেন, "আমাদের গুরুদেবের খোঁচা খেয়ে এ পর্যন্ত কোন শিষ্যই তাঁর কাছ থেকে পালায় নি।" শুনে হাসি চাপতে পারলুম না ; যাই হোক আমি কিন্তু

*১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহরক্ষা করেন।

সেই কথা শুনে সত্যসত্যই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে বললুম যে কর্কশই হোক আর মিষ্টই হোক, তাঁর প্রত্যেক কথাটিই আমার কানে সঙ্গীতের মতই সুমধুর হয়ে বাজে।

লাহিড়ী মহাশয় "ক্রিয়াযোগের" ক্রমোন্নত দীক্ষার চারটি ধাপ সযত্নে বেছে দিয়েছিলেন।* শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেলে তবে তিনি বাকী তিনটি উচ্চতর প্রণালী তাকে শিক্ষা দিতেন। একদিন তাঁর জনৈক শিষ্য তার মূল্য যথাযথভাবে স্বীকৃত হচ্ছে না ভেবে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "গুরুদেব, এখন আমি দ্বিতীয় ক্রিয়া পাবার নিশ্চয়ই উপযুক্ত হয়েছি, কি বলেন ?"

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ করল তাঁর এক অতি দীন ভক্তশিষ্য—নাম বৃন্দা ভকত। সে ছিল কাশীর একজন ডাকহরকরা।

সস্নেহে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, "এস, এস, বৃন্দা, আমার কাছে এসে বস। আচ্ছা বল তো বৃন্দা, এবার কি তুমি দ্বিতীয় ক্রিয়া নিতে চাও ?"

অতি দীন ও নম্র বিনয়ের সঙ্গে সেই সামান্য পোষ্টপিওন করজোড়ে গুরুদেবকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "গুরুদেব, আর আমার ক্রিয়ার দরকার নেই! আরও উঁচু ক্রিয়া নিয়ে আমি কি করে সাধন করব ? আমি আজ এখানে এসেছি আপনার আশীর্বাদ নিতে, কারণ প্রথম ক্রিয়াতেই আমার মন এমন আনন্দে উম্মত্ত আর আত্মহারা হয়েছে যে আমি চিঠিবিলিই করতে পারি না।"

লাহিড়ী মহাশয় বললেন, "বৃন্দা এখন ব্রহ্মানন্দসাগরে ভাসছে।" অপর শিষ্যটি কথাগুলি শুনে মাথা হেঁট করলেন।

তারপর সেই শিষ্যটি বললেন, "গুরুজী, দেখছি যে আমি একেবারেই আনাড়ী—কেবল 'ক্রিয়া'র দোষই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার গুণগুলো আর নয়!"

সেই অশিক্ষিত, দীন, নম্র ডাকপিওন ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করলে যে বহু পণ্ডিত তার কাছ থেকেই শাস্ত্রের গূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা সময়ে সময়ে শুনতে চাইতেন। লিখনপঠনে অপারগ আর অপাপবিদ্ধ সেই বৃন্দা ভকত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমহলে বহু সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

---

* "ক্রিয়াযোগের বহু শাখাপ্রশাখা আছে বলে লাহিড়ী মহাশয় তার মধ্য থেকে "ক্রিয়াযোগে"র সারস্বরূপ চারটি প্রণালী সুদক্ষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন, যেগুলি হচ্ছে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ানুশীলনে একেবারে অমূল্য।

কাশীর বহুশিষ্য ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু দূরদূরান্তর থেকে শত শত লোক তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্যে আসত। তাঁর দুই ছেলের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া উপলক্ষ্যে তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে কয়েকবার ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতির সুযোগ পেয়ে বাংলার ভিতরে বহুস্থানে ক্রিয়াবানদের ছোট ছোট দল সব গড়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর আর বিষ্ণুপুর এই দুই জেলার ভিতর বহু নীরব ক্রিয়াবান্ আজ পর্যন্ত তাঁর সাধনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে যে সব সাধুসন্তরা "ক্রিয়া" পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাশীর স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী আর দেওঘরের খুব উচ্চাবস্থার সাধু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীনরেশ মহারাজা ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পুত্রের তিনি কিছুকাল গৃহশিক্ষকতাও করেছিলেন। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে মহারাজা আর তাঁর পুত্র উভয়েই তাঁর কাছ হতে ক্রিয়াযোগে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

লাহিড়ী মহাশয়ের কতকগুলি প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী শিষ্য প্রচারকার্যের দ্বারা তাঁর ক্রিয়াযোগের প্রসার ও তার পরিধি বিস্তার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। গুরুজী তাতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর আর একটি শিষ্য, কাশীনরেশের রাজচিকিৎসক, গুরুদেবের নাম "কাশীবাবা"* রূপে প্রচারের জন্য সংগঠনপ্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন—এবারেও তা তিনি নিষেধ করলেন।

তিনি বলতেন, "ক্রিয়াযোগপুষ্পের সৌরভ, প্রচার বিনা স্বাভাবিকভাবে আপনিই বিস্তৃত হবে। অধ্যাত্মভাবের উর্বর হৃদয়ভূমিতে এর বীজ আপনিই অঙ্কুরিত হবে।" যদিও গুরুমহারাজ আধুনিক সংগঠন অথবা ছাপাখানার মাধ্যমে কোন প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করেন নি, তবু তিনি জানতেন যে তাঁর মহাবাণী বন্যার দুর্নিবার স্রোতের মত উথলে উঠে, নিজের শক্তিবেগে মানবহৃদয়ের দুকূল পরিপ্লাবিত করে ছুটে চলবে। ভক্তদের পরিবর্তিত আর পবিত্র জীবনই হচ্ছে ক্রিয়াযোগের অমর অস্তিত্বের একমাত্র প্রত্যাভূতি।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে, রাণীক্ষেতে দীক্ষালাভের পঁচিশবছর পরে লাহিড়ী মহাশয় পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন।‡ এখন তাঁকে দিনের বেলাতেও সহজে

---

*তাঁর শিষ্যরা তাঁকে যোগিবর, যোগিরাজ, মুনিবর প্রভৃতি নামেও ডাকতো। "যোগাবতার" নামটি আমাকর্তৃক সংযোজিত।

‡গভর্ণমেণ্ট অফিসে এক বিভাগে তাঁর কার্যকাল সবশুদ্ধ ৩৫ বৎসর।

পাওয়া যায় দেখে ভক্তের দল ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। মহানগুরু তখন তাঁর অধিকাংশ সময় নীরবে শান্তিময় পদ্মাসনে বসেই কাটিয়ে দিতেন। এমন কি একটু বেড়াবার জন্যে অথবা বাড়ীর অন্যান্য অংশে যাবার জন্যেও তিনি কদাচিৎ বৈঠকখানা ত্যাগ করে আসতেন। গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্যে শিষ্যদের নীরবে যাতায়াত সারাদিন ধরে অবিরামভাবেই চলত।

দর্শনপ্রার্থীরা সভয়ে দেখত যে লাহিড়ী মহাশয়ের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায়—শ্বাসহীনতা, বিনিদ্রতা, ধমনী আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শান্ত নয়ন দু'টিতে স্থির নিষ্পলকদৃষ্টি আর তার সঙ্গে গভীর শান্তির একটা স্নিগ্ধছটার দ্বারা তিনি বেষ্টিত—এইসব দেহাতীত লক্ষণ সকল প্রকাশ পেত। উপস্থিত সকলেই তখন উপলব্ধি করত যে প্রকৃতই একজন ভগবৎ-সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত, পরমপুণ্যবান্ মহাজ্ঞানী গুরুশ্রেষ্ঠের নীরব পূত আশীর্বাদে তাদের মানবজীবন ধন্য হয়ে গেছে।

গুরুদেব এবারে তাঁর শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়কে কলকাতায় "আর্য মিশন ইনস্টিটিউসন" নামে এক যোগকেন্দ্র স্থাপনে অনুমতি দিলেন। এই কেন্দ্র হতে কতকগুলি লতাগুল্মের যৌগিক ঔষধ বিতরণ আর বাংলাদেশে ভগবদ্গীতার প্রথম সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হিন্দী ও বাংলায় 'আর্য মিশন গীতা' সহস্র সহস্র গৃহে পঠিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী লাহিড়ী মহাশয় বহুবিধ রোগ আরামের জন্য একটি নিমের* তেল তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। গুরুদেব তাঁর কোন শিষ্যকে তেলটি চোলাই করতে বললে সে তা অতি সহজেই সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু অপর কেউ যদি তা করতে চেষ্টা করত, তাহলে নানা অদ্ভুত বাধা এসে উপস্থিত হত—তাতে দেখা যেত যে চোলাই করবার সময় সেই

* নিমের ভৈষজ্যগুণাবলী এখন প্রতীচ্যেও স্বীকৃত হয়েছে। এর তিক্তছাল টনিকরূপে ব্যবহৃত হয় আর ফল ও বীজ হতে নিষ্কাশিত তৈল কুষ্ঠ রোগ এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

হিন্দু ভেষজ শাস্ত্রকে 'আয়ুর্বেদ' বলা হয়। বৈদিক যুগের চিকিৎসকগণ শল্য চিকিৎসার উপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানতেন এবং তাঁরা প্লাস্টিক সার্জারীও করতেন। তাছাড়া তাঁরা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবের পরিবর্ত কি জানতেন এবং সিজারিয়ান ও মস্তিষ্কেও শল্য চিকিৎসা করতে পারতেন। এছাড়া ওষুধের দ্রব্যগুণ বৃদ্ধি করাতেও তাঁরা দক্ষ ছিলেন। খৃঃ পূর্ব ৪র্থ শতকের বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটস্ তাঁর 'মেটিরিয়া মেডিকায়' বহু উপকরণ হিন্দু সূত্র থেকে সংগ্রহ করেন।

ওষুধের তেলটির প্রায় সবটাই একেবারে উবে গেছে। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে গুরুদেবের আশীর্বাদও ওষুধটার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল।

অন্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবর্জিতা এষা সা শাম্ভবিমুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা

অর্থাৎ যাহার নিমেষ পড়ে না তাহা শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ—

৫ শ্রাবণ শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্মন—

বাংলা অক্ষরে লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তাক্ষর আর তাঁর স্বাক্ষর উপরে প্রদর্শিত হল। তাঁর শিষ্যকে লিখিত একটি পত্র হতে লাইনগুলি উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে। এতে গুরুদেব একটি সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, "যাহার নিমেষ পড়ে না তাহার শাম্ভবী মুদ্রা* সিদ্ধ।

৫ শ্রাবণ (স্বাঃ) শ্রী শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণ।"

অন্যান্য বহু মহাপুরুষদের মত লাহিড়ী মহাশয় নিজে কোন পুস্তক লেখেন নি বটে, কিন্তু তিনি তাঁর বহু শিষ্যকে গভীর শাস্ত্রব্যাখায় উপদিষ্ট করেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের স্বর্গীয় পৌত্র শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী লিখেছেন ঃ— "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মহাভারতের অন্যান্য অংশে কতকগুলি ব্যাসকুট আছে।

---

* 'শাম্ভবী মুদ্রার' অর্থ হ'ল ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। মানসিক শান্তিলাভের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হলে পর যোগীর অক্ষিপল্লবের আর কম্পন হয় না। তিনি তখন ব্রহ্মানন্দে মগ্ন।

মুদ্রা হচ্ছে সাধারণতঃ কোন ক্রিয়াকাণ্ড বা অনুষ্ঠানে কর বা অঙ্গুলিবিন্যাস। অনেক মুদ্রা কতকগুলি স্নায়ুর উপর এমন ক্রিয়া প্রকাশ করে যে তাতে একটা গভীর মানসিক শান্তির উদয় হয়। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে শরীরস্থ নাড়ীমণ্ডলীর (দেহের ৭২,০০০ তন্ত্রিকা তন্ত্রীর) সঙ্গে মনের সম্বন্ধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ আছে। কাজেই পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান আর যোগাদি প্রক্রিয়াসাধনে মুদ্রার ব্যবহারের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। মুদ্রার ভাবার বিস্তৃত পরিচয় ভারতবর্ষের মূর্তিশিল্প আর পূজাপার্বণ প্রভৃতিতে ও নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়।

এই সব ব্যাসকূটের প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখলেই দেখা যাবে যে তা একটা অদ্ভুত আর সহজেই ভুল বোঝা যেতে পারে এমন গোছের পৌরাণিক গল্পসমষ্টি। আর ঐসব ব্যাসকূটের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদত্ত না হলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা এমন এক বিজ্ঞান হারিয়েছি যা প্রাচ্য হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ পরীক্ষার তত্ত্বানুসন্ধান করে সে সব অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে।* লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রবাক্য আর রূপকের ভিতর সুচতুরভাবে লুক্কায়িত ধর্মবিজ্ঞানকে, তার রূপকের আবরণ মুক্ত করে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বৈদিক যাগযজ্ঞ, পূজার্চনার মন্ত্রতন্ত্র এখন আর কতকগুলি দুর্বোধ্য বাক্যের সমষ্টি বা কসরৎ নয় ; লাহিড়ী মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অর্থ সব নিহিত আছে…।

আমরা জানি যে মানুষ সাধারণতঃ কুপ্রবৃত্তির অদম্যপ্রভাবে এসে অসহায় হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন তার জ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়াযোগের দ্বারা এক উচ্চতর ও শাশ্বত পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে আর মানুষও তাদের প্রশ্রয় দেবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। এখানে নিবৃত্তিতে, নিম্নস্তরের কামনাবাসনা পরিহারের সঙ্গে যুগপৎ পরমানন্দলাভের অনুভব ঘটে। এ পথ ছাড়া, নীতিবাক্য সকল যা কেবল এ কোরো না, ও কোরো না, এই সব বলেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে এসেছে তা আমাদের কাছে একেবারে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

"বহির্জগতের পার্থিব সকল লীলায় যা কিছু প্রকাশ, তার পিছনে রয়েছে সেই অসীম মহাশক্তির সমুদ্র। জাগতিক ব্যাপারে আমাদের আসক্তি আমাদের মনে আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা নষ্ট করে ফেলে। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়

*"সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে সম্প্রতি কতকগুলি সীলমোহর ভূগর্ভ হতে উত্তোলিত হয়েছে। সেগুলি খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। তাতে দেখা যায় যে কতকগুলি মূর্তি অঙ্কিত, আর সে সব আমাদের বর্তমান যোগসাধনপ্রণালীতে ব্যবহৃত ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সে সময়েও যোগের মূলতত্ত্বের কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয় ঘটেছিল। আর হয়ত আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক হবে না যে, প্রক্রিয়ার অনুশীলন দ্বারা নিয়মিত অন্তদর্শনের চর্চা ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে চলে এসেছে।"—ওয়াশিংটন, ডি. সি.র অ্যামেরিকান কাউন্সিল অফ লার্নেড সোসাইটির বুলেটিনে প্রকাশিত প্রফেসর ডব্লু নর্ম্যান ব্রাউনের প্রবন্ধ।

যাই হোক হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ, ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণাতীত কাল হতে যোগবিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় ছিল।

কি করে আমরা প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার করতে পারি—সেই হেতু আমরা সকল নাম আর রূপের পিছনে যে বিরাট প্রাণ—তার ধারণা করতেই ভুলে যাই। প্রকৃতির সঙ্গে অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতা তার চরম রহস্য সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্য এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্যবহারিক। আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যাতে সে বাধ্য হতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য, বলতে গেলে, আমরা তাকে যেন উত্যক্তই করি। তার শক্তিসমূহের ব্যবহার করি বটে কিন্তু তার উৎস আজ পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে উদ্ধত প্রভু ও তার ভৃত্য অথবা দার্শনিকভাবে বলতে গেলে প্রকৃতি যেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় বন্দী। আমরা তাকে জেরা করি, চ্যালেঞ্জ করি, মানুষের তুলাদণ্ডে তার সাক্ষ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ওজন করি, যা তার লুকান ঐশ্বর্যের কখনও পরিমাপ করতে পারে না। অপরপক্ষে আত্মা যখন উচ্চতর শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, প্রকৃতি তখন বিনা প্ররোচনায় বা পীড়নে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষের ইচ্ছা পালন করে। অবোধ জড়বাদীরা প্রকৃতির উপর এই অনায়াস আধিপত্যকে "অলৌকিক" বলে অভিহিত করে।

"লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শজীবনের উদাহরণ, যোগ যে একটা গুপ্তপ্রক্রিয়ামাত্র—এই ভ্রমাত্মক ধারণার একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের বাস্তবতা* সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষই এখন ক্রিয়াযোগের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তার সঠিক সম্বন্ধ কি, তা জানবার পথ খুঁজে নিতে পারে আর সকল জাগতিক ঘটনার জন্য একটা আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধাও অনুভব করতে পারে—তা সে রহস্যময় কোন ঘটনাই হোক্ আর দৈনন্দিন কোন ব্যাপারই হোক্। আমাদের মনে সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হাজার বছর আগে যা রহস্যময় ছিল এখন আর তা নেই—আর আজ যা রহস্যজনক, একশ বছর পরে তা ঠিক বিধিসঙ্গতভাবে সহজবোধ্য হবে।

"ক্রিয়াযোগের বিধি সনাতন। এ গণিতশাস্ত্রের মত একেবারে অভ্রান্ত; যোগবিয়োগের সহজপ্রণালীর মত ক্রিয়াযোগের বিধিও কখনও নষ্ট হতে পারে না। গণিতশাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক অগ্নিতে আহুতি দিলেও যুক্তিবাদী মন

---

*এখানে কার্লাইলের "সার্টর রেজার্টাস" একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ে, "যে মানুষের বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না, যে মানুষের বিস্মিত হবার (এবং শ্রদ্ধা করার) অভ্যাস নাই, সে অসংখ্য রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেও এবং সমস্ত পরীক্ষাগার এবং মানমন্দিরের সারসংগ্রহ তার একটিমাত্র মস্তিষ্কে স্থান পেলেও, সে এক জোড়া চশমারই মতন—যার পিছনে কোন চক্ষু নাই।"

যেমন এর সত্য সব ঠিক পুনরায় আবিষ্কার করে ফেলবে, তেমনি যোগশাস্ত্রের সমস্ত বই নষ্ট করে ফেললেও যদি একজন প্রকৃত যোগী আবির্ভূত হন—যাঁর মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে, তাহলে তিনি এর মূলবিধি সবই পুনরায় আবিষ্কার করে ফেলতে পারবেন।"

বাবাজী যেমন অবতারশ্রেষ্ঠ "মহাবতার," শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যেমন সার্থকভাবে অভিহিত "জ্ঞানাবতার," তেমনি লাহিড়ী মহাশয়ও "যোগাবতার"।* সামাজিক মঙ্গলসাধনে, গুণ ও পরিমাণ এই দুইএর বিচারে তিনি সমাজকে আধ্যাত্মিকতার আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে দিয়েছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্যদের উচ্চতর অবস্থাতে উন্নীত করবার শক্তিতে আর সাধারণ্যে সত্যের বহুল প্রচারে লাহিড়ী মহাশয় মানবজাতির মুক্তিদাতাদের মধ্যে গণ্য।

মহাপুরুষরূপে তাঁর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ক্রিয়াযোগরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালীর উপর ব্যবহারিক গুরুত্ব আরোপ—যাতে করে তিনি সর্বপ্রথম যোগের বদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে তার পথ সুগম করে দিয়েছেন। তাঁর নিজ জীবনের সব অলৌকিক ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার সর্বোচ্চচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন যখন তিনি যোগশাস্ত্রের সব কিছু প্রাচীন জটিলতা দূর করে সাধারণের পক্ষে তা প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজসাধ্য সরল যোগসাধনে পরিণত করেছিলেন।

অলৌকিক ঘটনার উল্লেখে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, "অতি সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম বলে যা সব ঘটে—সাধারণের কাছে যা অজ্ঞাত, তা প্রকাশ্যে আলোচিত বা বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।" এই পাণ্ডুলিপিটিতে যদি আমি কোথাও তাঁর সাবধানবাণী লঙ্ঘন করেছি বলেই বোধ হয়, তা হলেও সেটা তাঁর কাছ থেকে অন্তরে পুনরাশ্বাস পাওয়াতেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আর তা ছাড়া বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রভৃতি গুরুমহারাজগণের জীবন আলেখ্য রচনার সময় আমি বহু সত্য অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ করেছি কারণ সে সব ঘটনা সাধারণের অনধিগম্য। অত্যন্ত দুর্বোধ্য জটিল দর্শনশাস্ত্রের এক বিরাট ব্যাখ্যাপুস্তক না লিখে তা আর প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

*শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁর শিষ্য শ্রীশ্রীপরমহংস যোগানন্দকে দিব্য প্রেমের এক অবতারপুরুষ বলে উল্লেখ করেন। পরমহংসজীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রধান শিষ্য রাজর্ষি জনকানন্দ (মিঃ জেমস্ জে, লীন) যোগানন্দজীকে চরম সার্থক উপাধি "প্রেমাবতার" নামে উপাহিত করেন। (মার্কিন প্রকাশকের মন্তব্য)।

গৃহীযোগী হিসাবে লাহিড়ী মহাশয় আধুনিক ভারতের প্রয়োজনোপযোগী কার্যকরী পন্থার বাণী বহন করে এনেছেন। প্রাচীনভারতের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসকল এখন আর বিদ্যমান নেই। কাজেই ভিক্ষাপাত্রহস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল যোগীর প্রাচীন আদর্শ এই মহান্‌গুরু আর অনুমোদন করেন নি। বরং তিনি স্বোপার্জনরত, অর্থসঙ্কটগ্রস্ত সমাজের উপর নির্ভরতাবিহীন, আর নিজ আবাসে গুপ্তসাধনশীল আধুনিক যোগীর সুযোগসুবিধার প্রতিই অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। উপরোক্ত নীতির অনুসরণের সঙ্গে তিনি প্রাণমনে শক্তিসঞ্চারী নিজের অপূর্ব আদর্শের সংযোগ-সাধন করেছেন। তিনি হচ্ছেন অতি আধুনিক ধরণের, ইংরেজীতে যাকে বলে "স্ট্রীম্‌লাইন্‌ড", অবাধ স্বচ্ছন্দগতি যোগীর আদর্শ। বাবাজী কর্তৃক পরিকল্পিত তাঁর জীবনাদর্শ শুধু যে কেবল প্রাচ্যের পক্ষেই তা নয়, প্রতীচ্যের যোগসাধনেচ্ছুদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরূপে গঠিত।

নূতন মানবজাতির পক্ষে নবীন আশার আনন্দ! যোগাবতার ঘোষণা করে গেছেন, "ভগবৎসঙ্গলাভ নিজ চেষ্টাতেই সম্ভব—আর তা' কোন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস বা কোন জগৎনিয়ন্তার খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করে না।"

আর এই ক্রিয়াযোগের চাবিকাঠি দিয়েই, যে সব লোকেরা কোন মানবের দেবত্বে বিশ্বাস করে না, তাঁরাই আবার শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে যে তাদের নিজেদের মধ্যেই পূর্ণদেবত্বের আবির্ভাবের সম্ভাবনা বর্তমান আছে।

৩৬শ পরিচ্ছেদ

বাবাজীর প্রতীচ্যের প্রতি আকর্ষণ

শান্তমধুর নিদাঘ নিশীথ। মাথার উপর বড় বড় উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো আকাশের বুকে স্নিগ্ধকোমল আলো বিকিরণ করে চারিদিকে একটা স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করেছে। শ্রীরামপুর আশ্রমের দোতলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পাশে আমি বসে। জিজ্ঞাসা করলুম, "গুরুদেব, আপনি বাবাজীর কখনও দর্শন পেয়েছেন?" শুনে তাঁর চোখদুটি ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নে একটু হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, পেয়েছি বই কি! আমার বহু পুণ্যফলে আমি তিন তিনবার এই অমর মহাগুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথমবার আমাদের সাক্ষাৎকার হয় প্রয়াগে কুম্ভমেলায়।"

ভারতবর্ষে কুম্ভমেলার মত মহামেলা বা বিরাট ধর্মসম্মেলন স্মরণাতীত যুগ হতে চলে আসছে। এইসব ধর্মমহাসম্মেলন লক্ষ লক্ষ লোকের চোখের সামনে একটা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সর্বদা ধরে রেখে আসছে। হাজার হাজার সাধুসন্ন্যাসী যোগীঋষিদের দর্শনলাভের জন্য লক্ষ লক্ষ অগণিত ভক্ত প্রতি ছয় অথবা বারবৎসর অন্তর একবার করে মেলায় সমবেত হন। এমন সব সাধু-সন্ন্যাসীরা আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র একবার মেলায় এসে সংসারের নরনারীদের তাঁদের পুণ্য আশীর্বাদ বর্ষণকরা ছাড়া আর কখনও তাঁদের নির্জন স্থান হতে বারই হন না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "বাবাজীর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখনও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে তখন আমার 'ক্রিয়া'যোগে দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদে যে কুম্ভমেলা হয়, তারই উৎসাহে আমি সে মেলাতে যোগদান করি। এই আমার প্রথম কুম্ভমেলা দর্শন। দারুণ ভিড় আর হট্টগোলের মাঝে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। চতুর্দিকে আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে কোন প্রকৃত সদ্‌গুরুর পুণ্যমূর্তির আবির্ভাব ঘটল না। গঙ্গার তীরে একটা পোলের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, চোখে পড়ল একটি পরিচিত মূর্তি—কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষাপাত্রটি বাড়িয়ে দিয়ে।

"ভ্রান্তিবশতঃ ভাবলুম, 'এ মেলাটা একটা ভিখিরীর দলের চেঁচামেচি আর

হট্টগোল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আমার মনে হয় যে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁরা মানবজাতির প্রত্যক্ষ মঙ্গলসাধনের জন্যে জ্ঞানের পরিধি ধৈর্যের সঙ্গে বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁরা কি এইসব, যারা ধর্মের ভণ্ডামি করে অথচ ভিক্ষাই যাদের একমাত্র উপজীবিকা, তাদের চেয়ে ভগবানের কাছে বেশী প্রিয় নন ?'

"সমাজসংস্কারের এই সব ছোটখাট চিন্তাগুলি হঠাৎ বাধা পেল, সামনে এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আমায় বলছেন,—

" 'মশায়, এক সাধুজী আপনাকে ডাকছেন।'

" 'কে তিনি ?'

" 'আসুন, এলে নিজেই দেখতে পাবেন।'

"ইতস্ততঃ করে এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটি পালন করতে গিয়ে এলুম একটি গাছতলায়—তার শাখাপ্রশাখার নিচে একজন গুরু তাঁর বেশ দর্শনযোগ্য দলবল নিয়ে বসে আছেন। গুরুজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি অপূর্বদর্শন, ঘনকৃষ্ণ চক্ষুদুটি অত্যুজ্জ্বল। আমার আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন, 'স্বাগত, স্বামীজী' !"

"আমি সজোরে প্রতিবাদ করে বললুম, 'না মশায়, আমায় স্বামীটামী কিছু বলবেন না ; আমি ওসব কিছু নই।'

" 'দৈবাদেশে যাদের আমি "স্বামী" উপাধি দিই, তারা আর তা পরিত্যাগ করতে পারে না।' সাধুটি নিতান্ত সাধারণভাবে কথাগুলি বললেও কথাগুলির মধ্যে গভীর সত্যের দৃঢ়তা ছিল ; সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন দেবতার আশীষধারায় প্লাবিত হয়ে গেছি। আমার এরূপ হঠাৎ স্বামীপদবীতে* পদোন্নতিলাভ হওয়াতে একটু হেসে, যিনি আমায় এরূপভাবে সম্মানিত করলেন, সেই নরদেহে দেবতারূপী মহান্ গুরুর চরণে আমি প্রণাম নিবেদন করলুম।

"বাবাজী—কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ নন—সেই গাছতলায় তাঁর নিকটে একটি আসনে আমায় বসতে বললেন। শরীর তাঁর বেশ দৃঢ় আর বলিষ্ঠ, দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়ের মত। যদিও আমি এই দুই গুরুর অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা বহুবার শুনেছিলুম তবুও কিন্তু তখন তা আমার চোখে ঠিক ধরা পড়েনি। বাবাজীর এমন একটা শক্তি ছিল যে কারুর মনে কোন বিশেষ চিন্তার উদয় হলে তা তিনি নিবারণ করতে পারতেন। বোধ হয় সেই মহান্ গুরুর এই ইচ্ছা ছিল যে তাঁর সামনে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই

*শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী পরে বুদ্ধগয়ার মোহান্ত মহারাজের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অবস্থান করব—তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আর বেশী কিছু অভিভূত হয়ে পড়ব না।

" 'কুম্ভমেলা দেখে কি মনে হয় ?'

" 'বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছিলুম, মশায়। পরে তাড়াতাড়ি বলে ফেললুম, 'অবশ্য আপনার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত। কেন জানি না—আমার মনে হয় শান্তশিষ্ট সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে এই সব হট্টগোল একেবারেই খাপ খায় না।'

"গুরু মহারাজ বললেন, 'বৎস, (যদিও দেখলে তাঁর দুগুণ আমার বয়স বলে বোধ হবে) বহুর দোষের জন্যে সবাইকেই একসঙ্গে বিচার করে বোসো না। পৃথিবীতে সব জিনিসই ভালমন্দে মিশানো—বালির সঙ্গে চিনি যেমন। চতুর পিপীলিকার মত হও, বালি ফেলে রেখে চিনির দানা খুঁটে নাও। অবিশ্যি যদিও অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে এখনও মায়া আর ভ্রান্তিবশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তবুও মেলাতে এমন কোন কোন লোকও আছেন যাঁদের প্রকৃতই ঈশ্বরলাভ হয়েছে।'

"মেলায় এই মহান্ গুরুর সাথে আমার নিজ দর্শনলাভের কথা স্মরণ করে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কথায় সায় দিলুম।

"আমি বললুম, 'মশায়, আমি পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের কথাই ভাবছিলুম। বুদ্ধিতে তাঁরা আমাদের এখানকার সমবেত অধিকাংশের চেয়েও কত বেশী বড়। কোন্ সুদূরদেশে ইউরোপ বা অ্যামেরিকায় তাঁরা বাস করেন—তাঁদের ধর্মমতও সব বিভিন্ন, আর এই বর্তমান মেলার মত সব মেলার প্রকৃত মূল্য কি, সে বিষয়েও তাঁরা অজ্ঞ। তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মগুরুদের সাক্ষাৎ পেলে খুবই উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে তাঁরা খুব উন্নত হলেও বহু প্রতীচীবাসী একেবারে দারুণ জড়বাদী। অপর সকলে বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও সকল ধর্ম যে মূলতঃ এক, সে কথাটা তাঁরা মানেন না। তাঁদের বিশ্বাসটাই হচ্ছে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, যা আমাদের কাছ থেকে তাঁদেরকে চিরতরেই পৃথক করে রেখেছে।'

"কথাটা শুনে মনোমত হওয়ায় বাবাজীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'দেখছি যে তোমার প্রাচ্য আর প্রতীচ্য এই দুই দেশের জন্যেই বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কি পূর্ব কি পশ্চিম সকল দেশের লোকেদের জন্যেই তোমার উদারহৃদয় যে কেঁদে উঠেছে তা আমি টের পেয়েছি, আর সেইজন্যেই তোমাকে এই জায়গায় ডেকে এনেছি।

"তিনি বলতে লাগলেন, 'পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই দেশের মধ্যে কর্ম

আর ধর্মসাধনার স্বর্ণময় মধ্যপথ রচনা করা উচিত। পশ্চিমের কাছ থেকে পার্থিব উন্নতির জন্যে ভারতবর্ষের যেমনি অনেক কিছু শেখবার আছে, তেমনি তার প্রতিদানে ভারতবর্ষও পশ্চিমকে এমন এক সার্বজনীন প্রণালী শিক্ষা দিতে পারে যাতে করে সে যোগবিজ্ঞানের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর তার ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে।

" 'স্বামীজী, পূর্ব-পশ্চিমের সুসঙ্গতভাবে ভবিষ্যত আদানপ্রদানের কাজে তোমায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। বছরকতক বাদে আমি তোমার কাছে একটি শিষ্য পাঠাব যাকে পশ্চিমে যোগপ্রচারের কাজে তৈরী করে নিতে হবে। সেখানে বহু ধর্মপিপাসু আত্মার আকুল আহ্বান বন্যার মত আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি যে অ্যামেরিকা আর ইউরোপে বহু ভাবী সাধুসন্তরা জাগরিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের নিদ্রাভঙ্গ করা এখন প্রয়োজন।' "

গল্পের এই স্থানে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর পূর্ণদৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করলেন।

স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চারিদিক তখন হাসছে, প্রকৃতির একটা শান্ত মধুরিমা সকলের অন্তরে ছায়াপাত করে একটা স্নিগ্ধপেলব স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে; মন তখন আনন্দে ভরপুর।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটু হেসে শুরু করলেন, "বৎস, তুমিই হচ্ছ সেই শিষ্য, যাকে বাবাজী মহারাজ বহু বছর পূর্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।"

শুনে অবশ্য খুবই খুশী হলুম যে বাবাজীই আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু এও আমি তখন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলুম না যে আমার ভক্তিভাজন গুরুদেব আর তাঁর এই শান্তরসাস্পদ আশ্রম ত্যাগ করে আমি পশ্চিমে গিয়ে থাকব কি করে, আর কি নিয়ে।

যাক্, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তারপর বলতে শুরু করলেন, "বাবাজী তখন ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তাঁর কতকগুলো আমায় প্রশংসার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের আমি যে কিছু ব্যাখ্যা লিখেছি সে খবরও তিনি জানেন।

"তারপর সেই মহান্‌গুরু বললেন, 'স্বামীজী, আমার অনুরোধে আর একটি কাজের ভার তোমায় নিতে হবে। তুমি খ্রিস্ট্রীয় আর হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রের মূলগত ঐক্য প্রদর্শন করে একটি ছোট্ট বই লেখ না কেন? এই দুই শাস্ত্র থেকে সমভাবের উক্তিসকল পাশাপাশি উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দাও যে ঈশ্বরের প্রিয়-

ভক্তেরা সবাই একই সত্য বলে গেছেন—এখন তা মানুষের সাম্প্রদায়িকতার অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন।'

কতকটা সংশয়ের সঙ্গে বললুম, "মহারাজ, এ আপনার কি অদ্ভুত আদেশ! এ কি আমি পালন করতে পারব?"

"বাবাজী মৃদুমধুর হেসে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাবা, সন্দেহ করছ কেন? আরে এ কার কাজ, আর সবকাজ কেই বা করায় বল? ভগবান্ আমায় দিয়ে যা কিছুই বলাচ্ছেন তা সব সত্য হয়ে ফলে যেতে বাধ্য।'

"সাধুমহারাজের আশীর্বাদে মনে নববলের সঞ্চার হল, বই লিখতে সম্মত হলুম। যাবার সময় উপস্থিত দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পর্ণাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালুম।

"গুরুমহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাহিড়ীকে জান? একজন মহাপুরুষ, নয় কি, কি বল? আমাদের যে দেখা হয়েছে তা তাকে বোলো!' বলে লাহিড়ী মহাশয়কে জানাবার জন্য আমায় একটা সংবাদ দিলেন।

"বিদায়গ্রহণকালে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠতেই তিনি মধুর হেসে বললেন, 'তোমার বই লেখা শেষ হলেই আমি তোমায় দর্শন দেব—উপস্থিত এখন বিদায়!'

"তার পরদিনই এলাহাবাদ পরিত্যাগ করে কাশীর ট্রেন ধরলুম। গুরুদেবের বাড়ী পৌঁছেই আমি কুম্ভমেলার সেই অপূর্ব সাধুটির সমস্ত বিবরণ তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলুম।

"শুনে লাহিড়ী মহাশয়ের চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠল, বলে উঠলেন, 'আরে তাঁকে চিনতে পারলে না—ওঃ, দেখছি যে তা তো তুমি পারবে না কারণ তিনি ইচ্ছে করেই ধরা দেন নি। তিনিই হচ্ছেন আমার অদ্বিতীয় গুরুদেব—পরম ভাগবত বাবাজী মহারাজ!'

"স্তম্ভিত হয়ে বললুম—"বাবাজী! বলেন কি গুরুদেব, যোগিশ্রেষ্ঠ বাবাজী, এ্যাঁ, আমাদের পতিতপাবন বাবাজী মহারাজ!—যিনি কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য! হায় হায়, একবার যদি সে দিন আজ ফিরে আসে আর তাঁর দর্শন পাই, তাহলে তাঁর চরণকমলে ভক্তিনিবেদন করে যে একেবারে ধন্য হয়ে যাই!'

"লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যাক্, কিচ্ছু ভেবো না—তিনি তো তোমায় দেখা দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তবে আর ভাবনা কি?'

"তারপর বললুম, 'গুরুদেব, বাবাজী মহারাজ আপনাকে একটি খবর দিতে বলেছেন। তিনি বললেন, "লাহিড়ীকে বোলো যে এ জীবনের সঞ্চিত শক্তি সব ফুরিয়ে আসছে—প্রায় শেষ হয়ে এল আর কি।"

"এই রহস্যময় কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল—যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ স্পর্শ করেছে। মুহূর্ত মধ্যে তাঁর চারদিকে সব কিছু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তাঁর সদাহাস্যময় আনন একেবারে অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন হয়ে উঠল। আসনের উপর কাঠের মূর্তির মত গম্ভীর আর নিশ্চল তাঁর দেহ একেবারে বর্ণহীন হয়ে পড়ল। দেখেশুনে ভয় পেয়ে গিয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব একেবারে লোপ পেলে। এমন সদানন্দময় পুরুষের এমন ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্য আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি। উপস্থিত অন্যান্য শিষ্যেরাও ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

"গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। অতক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব ধারণ করলেন, তারপর প্রত্যেক চেলারই সঙ্গে সস্নেহে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

"গুরুদেবের এই প্রতিক্রিয়াতে আমি বুঝতে পারলুম যে বাবাজী মহারাজের সংবাদে এমন একটা নিশ্চিত ইঙ্গিত ছিল যাতে করে লাহিড়ী মহাশয় টের পেয়েছিলেন যে তাঁকে শীঘ্রই দেহরক্ষা করতে হবে। তাঁর ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যে প্রমাণিত হল যে আমাদের গুরুদেব তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম করে এখানকার পার্থিব আকর্ষণের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন করে সেই পরমপুরুষের অনন্তসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বাবাজীর উক্তিতে তাঁর বলার ধরণই ছিল যে, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই থাকব।'

"যদিও বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয় উভয়েই সর্বদর্শী ছিলেন আর আমার বা অন্য কোনও মধ্যস্থের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করবার তাঁদের কোনও আবশ্যকতা ছিল না, তবুও এই সব বড় বড় মহান্‌গুরুগণ প্রায়ই এই সংসারের নাটকাভিনয়ে সাধারণ মানবচরিত্রের অংশই গ্রহণ করে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা কোন লোক মারফত অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই তাঁদের ভবিষ্যবাণী প্রেরণ করেন, যাতে করে ভবিষ্যতে তাঁদের কথাগুলি ফলে গেলে পর ঘটনাগুলো যারা শুনবে তাদের দৈবে আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মাবে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলে যেতে লাগলেন, "কাশী ছেড়ে শীগগিরই শ্রীরামপুরে ফিরলুম, বাবাজীর অনুরোধে শাস্ত্রসম্বন্ধে লেখা শুরু করবার জন্যে। লেখা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অমরগুরুর নামে উৎসৃষ্ট এক কবিতা আমি রচনা করে ফেললুম। কলমের মুখ দিয়ে বিনাপ্রয়াসেই শ্রুতিমধুর পদগুলি বেরিয়ে এসে একটি সুন্দর কবিতা রচিত হয়ে গেল—

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এর পূর্বে আমি সংস্কৃত কবিতা রচনা করবার জন্যে কখন চেষ্টা পর্যন্তও করি নি।

"এক নীরব নিশীথে, বাইবেল আর সনাতন ধর্মশাস্ত্রের* তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করলুম। প্রভু যীশুখ্রিস্টের বাণী উদ্ধৃত করে দেখালুম যে বেদের অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা মূলতঃ এক। আমার পরমগুরুরা কৃপাতেই আমার বই "দি হোলি সায়েন্স"‡এর রচনা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "লেখা শেষ করবার পরদিন সকালে এখানকার রায়ঘাটে গেলুম গঙ্গাস্নান সারতে। ঘাট ছিল তখন নির্জন, চুপচাপ খানিকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে একটু আরাম উপভোগ করলুম। তারপর জলে গোটাকতক ডুব দিয়ে বাড়ীমুখো ফিরলুম। পথঘাট জনহীন, কোনও সাড়াশব্দ নাই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে আমার গঙ্গানাওয়া ভিজেকাপড়ের শপশপ শব্দ। গঙ্গার তীরে একটা খুব বড় বটগাছ ছিল; সে জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই মনে কেমন যেন একটা প্রবল ইচ্ছার উদয় হল যে পিছন ফিরে একবার তাকাই। ফিরে দেখি যে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় বসে বাবাজী মহারাজ আর তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর গুটিকতক শিষ্য!

" 'স্বাগত, স্বামীজী!' মহান্‌গুরুর মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করতে নিশ্চিন্ত হলুম যে সত্যিসত্যি আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না। বাবাজী বলতে লাগলেন, 'দেখছি যে বইখানি ভালভাবেই লেখা শেষ হয়েছে—যাক, কথা দিয়েছিলুম যে আসব, তাই আজ এসেছি তোমায় ধন্যবাদ দিতে।'

"দ্রুতস্পন্দিতহৃদয়ে, আনন্দে মূক হয়ে গিয়ে তাঁর চরণতলে পড়ে সাষ্টাঙ্গে

*বৈদিকধর্মের শিক্ষাসমষ্টিকেই সনাতন ধর্ম এই নাম প্রদত্ত হয়েছে। সিন্ধুনদের তীরবর্তী বাসিন্দাদের গ্রীকেরা হিন্দু আখ্যা প্রদান করাতে তাদের ধর্ম সনাতনধর্ম নামে অভিহিত হয়েছে।

†গুরুর গুরুকে পরমগুরু বলে। লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ ছিলেন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পরমগুরু। সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ/যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার যে সকল সভ্য ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের সকলের পরমতম গুরু হলেন বাবাজী মহারাজ।

‡ দি হোলি সায়েন্স, (ইংরেজীতে লিখিত); যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি, রাঁচী, বিহার হইতে প্রকাশিত।

প্রণাম করে করজোড়ে নিবেদন করলুম, 'পরমগুরুজী, এই কাছেই আমার বাড়ী; আপনি আর আপনার চেলারা দয়া করে সেখানে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে কি আমায় কৃতার্থ করবেন না ?'

"মহানগুরু মৃদুহাস্যে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'না বাছা। আমাদের এই গাছতলাটুকুই ভাল; কেন, এ জায়গা তো বেশ আরামের—কোনই কষ্ট নেই।' কি আর করি, অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে কাতরনয়নে সানুনয়ে তাঁকে নিবেদন করলুম, 'পরমগুরু মহারাজ, দয়া করে এখানে একটু অপেক্ষা করুন, কিছু ভাল মিষ্টি নিয়ে আমি এখুনিই ফিরে আসছি!'* মিনিটকতক বাদেই আমি কিছু মিষ্টি নিয়ে ফিরে এলুম। এসে দেখি, কি আশ্চর্য! সেই বিরাট গাছতলায় বাবাজী বা তাঁর দলবলের চিহ্নমাত্রও নাই! ঘাটের চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজলুম—নাঃ, কোথাও আর তাঁদের দেখতে পাওয়া গেল না, মনে মনে বুঝলুম যে তাঁরা শূন্যে অদৃশ্য হয়েছেন!

"মনে গভীর আঘাত পেলুম—এ কি! তাঁদের একটু আদরআপ্যায়ন করবার জন্যে বাড়ী থেকে গোটাকতক মিষ্টি আনতে গেছি, এসে দেখি কি তাঁরা আর নাই, একদম অদৃশ্য হয়ে গেছেন আর আমার আসার অপেক্ষাটুকুও সইল না! মনে মনে বললুম, 'যাক্, আবার আমাদের দেখা হলে তাঁর সঙ্গে আর কথাই বলব না! নিতান্তই নিষ্ঠুর তিনি, এমনভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে কি?' এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে মনে একটু রাগও হল—অবিশ্যি এটা অভিমানের, তার বেশী আর কিছু নয়।

"মাসকতক বাদে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে গেলুম। ছোট্ট বৈঠকখানাটিতে ঢুকতেই গুরুদেব একটু হেসে আমায় বললেন,—

" 'এস, এস, যুক্তেশ্বর? আচ্ছা আসবার সময় কি তুমি ঘরের দোরগোড়ায় বাবাজী মহারাজকে দেখতে পেলে?'

"আশ্চর্য হয়ে বললুম 'কই, না তো!'

" 'আচ্ছা, তা হলে এস এখানে', বলে লাহিড়ী মহাশয় আমার কপালের মাঝখানে হাত দিয়ে মৃদুস্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজীর জীবন্তমূর্তি, একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের মত পরমানন্দের অম্লান আলোকে আপনি ঝলমল।

"আমার সেই পুরান আঘাতের কথা মনে পড়ল। প্রণাম করলুম না। লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

---

*ভারতবর্ষে গুরুদর্শনে মিষ্টান্ন নিবেদন না করাটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বলেই বিবেচিত হয়।

"বাবাজী মহারাজ তাঁর গভীর অতল স্নেহকোমল চোখদ্‌ুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'তুমি আমার উপর বড়ই বিরক্ত হয়েছ, না ?'

"আমি বলল্‌ুম, 'কেনই বা হব না বল্‌ুন ! আপনার ভোজবাজির দলবল নিয়ে আপনি শ্‌ূন্য থেকে উড়ে এলেন আবার সেই শ্‌ূন্যেতেই মিলিয়ে গেলেন—না পারল্‌ুম আপনাদের সেবা করতে, না পারল্‌ুম বা দ্‌ুটো কথা কইতে !

"বাবাজী অতি স্নিগ্ধমধ্‌ুর হেসে বললেন, 'আমি শ্‌ুধ্‌ু বলেছিল্‌ুম যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু কতক্ষণ ধরে থাকব, তা' তো আমি কিছ্‌ু বলিনি। তুমি তখন খ্‌ুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। তবে অবিশ্যি আমি একথা বলব যে তোমার চঞ্চলতার দাপটে আমি প্রায় শ্‌ূন্যেই মিলিয়ে গিয়েছিল্‌ুম আর কি !'

"এই সরল উত্তরে আমার মনের সকল ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দ্‌ূর হয়ে গেল। তাঁর চরণতলে নতজান্‌ু হয়ে বসল্‌ুম ; বাবাজী মহারাজ সস্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

"তারপর বাবাজী আমায় বললেন, 'বাবা, আরও ধ্যান কর, আরও ধ্যান কর, তোমার দ্‌ৃষ্টি এখনও বেশ নির্দোষ হয় নি ; স্‌ূর্যের আলোর পিছনে যে আমি ল্‌ুকিয়ে আছি, তা' তো তুমি আমায় দেখে বার করতে পারলে না।' স্বগীয় মধ্‌ুর বংশীধ্বনির মত এই কথাগ্‌ুলি বলেই বাবাজী মহারাজ অনন্ত জ্যোতিঃর মধ্যে অদ্‌ৃশ্য হয়ে গেলেন।

শ্রীয্‌ুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "গ্‌ুর্‌ুদর্শনের জন্যে কাশী যাওয়া সেই বোধ হয় আমার শেষ বা তারপর এক আধবার হয়ত গিয়েছিল্‌ুম। কুম্ভমেলায় বাবাজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন শীঘ্রই শেষ হয়ে আসছে। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর বলিষ্ঠ দেহের প্‌ৃষ্ঠদেশে একটি ক্ষ্‌ুদ্র স্ফোটকের উৎপত্তি হয়। তিনি শস্ত্রপ্রয়োগ করতে বারণ করলেন, কারণ তিনি নিজদেহে তাঁর কতকগ্‌ুলি শিষ্যের কর্মফল ক্ষয় করে নিচ্ছিলেন। শেষে তাঁর কতকগ্‌ুলি শিষ্য খ্‌ুব জোরজবরদস্তি করাতে গ্‌ুর্‌ুদেব রহস্যময়ভাবে উত্তর দিলেন, 'শরীর লয় হওয়ার একটা কারণ তো থাকা চাই ; আচ্ছা তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর, তাতেই আমি রাজী, কোন আপত্তিই আমি আর করব না।'

"অল্প কিছ্‌ুকাল পরেই সেই অদ্বিতীয় গ্‌ুর্‌ুশ্রেষ্ঠ লাহিড়ী মহাশয় কাশীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সেই ছোট্ট বৈঠকখানাটিতে আর আমায় তাঁর দর্শনলাভের জন্য যেতে হয় না। এখন আমার জীবনের প্রতিটি দিনই তাঁর সর্বব্যাপী আবির্ভাবে আশীর্বাদপ্‌ূত !"

বছরকতক বাদে, তাঁর একজন ধ্‌ুব উন্নতশিষ্য স্বামী কেশবানন্দ

মহারাজের* মুখ থেকে লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোধানের বহু আশ্চর্যজনক ঘটনার বিবরণ শুনেছিলুম।

কেশবানন্দজী বলেছিলেন, "আমার গুরুদেব তাঁর দেহরক্ষা করবার অল্প কিছুদিন আগেই হরিদ্বারে আমার আশ্রমে সশরীরে আবির্ভূত হয়ে আমাকে দর্শনদান করেন। 'কাশীতে এক্ষুনিই চলে এস'—বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"কালবিলম্ব না করে তখনই গিয়ে কাশীর গাড়ী ধরলুম। গুরুদেবের বাড়ীতে পেঁছেই দেখলুম যে বহু শিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছেন। সেইদিন‡ ঘণ্টাকতক ধরে তিনি গীতা ব্যাখ্যা করলেন; তারপর তিনি আমাদের শুধু বললেন, 'এবার আমি বাড়ী যাচ্ছি।' শুনে সমবেত শিষ্যমণ্ডলী আসন্ন-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় অদম্য ক্রন্দনের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

" 'তোমরা শান্ত হও, কোন ভয় নেই; আবার আমি তোমাদের দেখা দেব।' এই কথাগুলি বলে তিনি তাঁর দেহটিকে তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তরমুখ হয়ে পদ্মাসনে বসলেন, তারপর পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গরিমার মধ্যে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।§

"ভক্তদের প্রাণপ্রিয় লাহিড়ী মহাশয়ের অনবদ্য দেহ পবিত্র গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহ করা হয়। শেষকৃত্যের সময় গৃহস্থের সমস্ত অনুষ্ঠান যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছিল।" কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, "তার পরদিন—সেদিনও আমি কাশীতে রয়েছি, সকালবেলা প্রায় দশটা নাগাদ আমার ঘরটি হঠাৎ এক অপূর্ব জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য! চেয়ে দেখি যে রক্তমাংসের শরীরে লাহিড়ী মহাশয় আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে! তাঁর মূর্তি ঠিক আগেকারই মত, শুধু এইটুকুমাত্র পরিবর্তন ঘটেছে যে তা যেন আরও বেশী তরুণভাবাপন্ন আর জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল।

*আমার কেশবানন্দজীর আশ্রমদর্শন ৪২শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

‡১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। আর দিনকতক হলেই তাঁর সাতষট্টি বছরের জন্মদিন এসে যেত।

§শরীরকে তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে উত্তরমুখো হয়ে উপবেশন হচ্ছে বৈদিকক্রিয়া-কাণ্ডের একটি অংশ আর তা অনুসৃত হত বড় বড় মহানগুরুদেব দ্বারা, যাঁরা পূর্ব হতেই জানতে পারতেন যে তাঁদের অন্তিমসময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। শেষধ্যানে বসে গুরু যখন পরমসত্তায় বিলীন হন তখন তাকে বলা হয় মহাসমাধি।

"আমার গুরুদেবতা তখন আমার সঙ্গে কথা কইলেন। তিনি বললেন, 'কেশবানন্দ, এ আমি। আমার দাহকরা শরীরের শূন্যে বিলীন অণুপরমাণু হতে পুনর্গঠিত হয়ে আবার আমার মূর্তির পুনরুত্থান হয়েছে। পৃথিবীতে আমার গৃহস্থের কর্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু আমি এ পৃথিবী ছেড়ে একেবারে যাচ্ছি না। এরপর আমি বাবাজীমহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে তারপরে তাঁর সঙ্গে অন্তরীক্ষে বাস করব।'

"কয়েকটি আশীর্বাণী উচ্চারণ করে সেই অদ্বিতীয় মহানগুরু তখন অদৃশ্য হয়ে গেলেন ; আশ্চর্য একটা উদ্দীপনা এসে আমার অন্তর পরিপূর্ণ করে দিলে। যিশুখ্রিস্ট আর কবীরের* জড়দেহের মৃত্যুর পর তাঁদের জীবন্তদেহ দর্শন করে তাঁদের শিষ্যদের মনে যেমন অপূর্বভাবের সঞ্চার হয়েছিল আমার মনে তেমনি একটা উন্নতভাবের উদয় হল।

"কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'হরিদ্বারে নির্জন আশ্রমে ফিরে যাবার সময় আমি আমার গুরুদেবের পবিত্র চিতাভস্ম সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি যে, দেশকালে সীমাবদ্ধ এই দেহপিঞ্জর থেকে তিনি পালিয়ে গেছেন ; তাঁর সর্বব্যাপী প্রাণপাখী আজ মুক্ত! তবুও তাঁর পূণ্য দেহাবশেষ সমাধিস্থ করে হৃদয় কতকটা শান্ত হল!'

আর একটি শিষ্য যিনি মৃত্যুর পর পুনরাবির্ভূত গুরুর মূর্তি দর্শন করে

---

*সন্তকবীর হচ্ছেন ষোড়শ শতাব্দীর একজন মহানগুরু ; তাঁর বহু হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য ছিলেন। দেহরক্ষার সময়ে তাঁর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা নিয়ে এই উভয়বিধ শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মহানগুরু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর মহানিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে উপদেশ দিলেন—তাঁর দেহাবশেষের অর্ধাংশ মুসলমান ধর্মানুযায়ী প্রোথিত করা হবে আর অপরাংশ হিন্দু সংস্কারানুযায়ী দাহ করা হবে। তারপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শিষ্যের দল শবাচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলিত করতেই দেখা গেল, শবের পরিবর্তে সেথায় গুচ্ছগুচ্ছ পুষ্প সজ্জিত রয়েছে। এর অর্ধাংশ মুসলমানেরা মঘর নামক স্থানে তাঁর অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রোথিত করেন। উক্তস্থান অদ্যাবধি তীর্থরূপে পূজা পেয়ে আসছে। অপরাংশ হিন্দুমতে দাহ করা হয়।

যৌবনে কবীরের নিকট দুইটি শিষ্য এসে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য সূক্ষ্মজ্ঞান-মার্গে প্রবেশপথের নির্দেশ অনুসন্ধান করাতে কবীর শুধু বললেন,—

"পথের সন্ধান করলেই দূরত্বের কথা এসে পড়ে ; তিনি যদি তোমার নিকটেই থাকেন, তবে আর পথের খোঁজের দরকার কি? তাই যখন ভাবি যে গভীরজলে মীন পিয়াসী তখন আমার বড় হাসি পায়।

কৃতার্থ হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাধুপ্রকৃতি পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়। পঞ্চানন বাবুর কলকাতার বাড়ীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম ; গুরুর সঙ্গে তাঁর বহু বৎসর অবস্থিতির কাহিনী শুনে বিশেষ আনন্দলাভ করলুম। পঞ্চাননবাবু তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে ঘটনা বলে শেষ করেন, তা হচ্ছে এই—

"লাহিড়ী মহাশয়ের শেষকৃত্যের পরের দিন বেলা ঠিক দশটার সময় এই কলকাতার বাড়ীতে এসে তিনি আমায় জীবন্ত শরীরে দেখা দিয়ে যান।"

স্বামী প্রণবানন্দজীও—সেই "দুই দেহধারী সাধু", তাঁর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছিলেন।

রাঁচি বিদ্যালয়ে যখন প্রণবানন্দজী বেড়াতে আসেন তখন একদিন তিনি আমায় বলেন যে, "লাহিড়ী মহাশয় দেহরক্ষা করবার অল্প কিছুদিন আগে আমি তাঁর কাছ থেকে একখানি পত্র পাই, তাতে আমাকে অবিলম্বে কাশীতে রওনা হবার কথা লেখা ছিল। আমার কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি নি। যাবার উদ্যোগ আয়োজন করছি—বেলা তখন দশটা, হঠাৎ দেখি গুরুদেবের উজ্জ্বল মূর্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লুম।

"লাহিড়ী মহাশয় তখন একটু হেসে বললেন, 'আর এখন তাড়াতাড়ি কাশী গিয়ে কি হবে ? আর তো তুমি সেখানে আমায় দেখতে পাবে না !'

"কথাগুলির অর্থ যখন পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলুম তখন শোকে, দুঃখে, হতাশায় বুক যেন ভেঙে গেল, ক্রন্দনাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম—মনে হতে লাগল যে সামনে যা দেখছি এ তাঁর প্রকৃত মূর্তি নয়, কেবলমাত্র যেন স্বপ্নেই তাঁকে দেখছি।

"গুরুদেব সান্ত্বনা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন 'এই দেখ—আমার শরীর ছুঁয়ে দেখ, বরাবরই যেমন, আজও তেমনি আমি বেঁচে আছি, কই, মরিনি ত। ছিঃ, আমার জন্যে শোক কোরো না ; তোমার সঙ্গে তো আমি চিরদিনই আছি, তবে আর দুঃখ কিসের ?' "

এই তিনটি প্রধান শিষ্যদের মুখ হতে যে আশ্চর্য ঘটনাটি নিঃসৃত হয়েছিল তা থেকে এই সত্যটি পাওয়া যায় যে লাহিড়ী মহাশয়ের দেহরক্ষার পর তাঁর

পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় বিহার প্রদেশে দেওঘরে পঞ্চাশবিঘার উপর এক উদ্যানবাটিকায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে লাহিড়ী মহাশয়ের একটি তৈলচিত্র রক্ষিত আছে।

পূণ্যদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ হবার পরদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ, তিনটি বিভিন্ন শহরে তাঁর তিনটি প্রধানশিষ্যের সম্মুখে প্রকৃতই রক্তমাংসের শরীরে রূপান্তরিত লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

"সুতরাং যখন এই নশ্বরদেহ অক্ষয়ত্ব লাভ করবে আর এই মরজীবন অমরত্ব লাভ করবে তখন যে উক্তি লিখিত আছে তাই ঘটবে। মৃত্যু বিজিত। মরণ, কোথায় তোমার দংশন? সমাধি, তোমারই বা জয় কোথায়?"*

* ১ করিন্থিয়ান্‌স্‌—১৫:৫৪-৫৫ (বাইবেল)। "ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থান করেন, এ চিন্তা তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে কেন?"—অ্যাক্টস্‌ ২৬:৮ (বাইবেল)

৩৭শ পরিচ্ছেদ

আমার আমেরিকা গমন

রাঁচি বিদ্যালয়ের ভাঁড়ারঘরে* কতকগুলো ধুলোমাখা বাক্সর পিছনে বসে আছি, জায়গাটা এমন আড়ালকরা যে ছেলেরা কেউ চট করে তা খুঁজে পাবে না। বসে বসে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছি হঠাৎ আমার অন্তশ্চক্ষুর সামনে পশ্চিমবাসী লোকেদের কতকগুলো মুখের দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠল। দেখেই মনে হল—আরে এ যেন অ্যামেরিকা, আর এ লোকগুলো তো অ্যামেরিকান দেখছি।

স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি। একটা বিরাট জনতা** আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকাতে তাকাতে আমার জ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের মত একে একে চলে যেতে লাগল। একি দেখছি!

ভাঁড়ারঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। যা ভয় করেছিলুম তাই। একটা ছেলে আমার লুকোবার জায়গাটা কিরকম করে খুঁজে বার করে ফেলেছে।

যাই হোক, মনটা ছিল তখন বেশ প্রফুল্ল; একটু স্ফূর্তির সঙ্গেই বললুম, "এস, এস বিমল, একটা সুখবর আছে। ভগবান্ আমায় অ্যামেরিকায় ডাক দিয়েছেন যে!"

"অ্যামেরিকায়? এ্যাঁ বলেন কি—অ্যামেরিকায়?" বিমল আমার কথাগুলোর এমনভাবে প্রতিধ্বনি করলে যে আমি যেন অ্যামেরিকা না বলে "চন্দ্রলোকে" যাবার কথাই তাকে বলেছি।

বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যামেরিকা! কলম্বাসের মত অ্যামেরিকা আবিষ্কার করতেই যাচ্ছি! তিনি তো ভেবেছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষই আবিষ্কার করে

---

* পরমহংসজী যেখানে দিব্যদর্শন লাভ করেন, রাঁচীর পূর্বেকার সেই ভাণ্ডারগৃহের স্থলে ১৯৫৯ সালে যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া / সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোসিপের সভানেত্রী শ্রীশ্রীদয়ামাতা, একটি শ্রীশ্রীযোগানন্দ ধ্যান মন্দিরের উদ্বোধন করেন। (প্রকাশকের মন্তব্য)

**তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আমি পশ্চিমে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলুম আর দেখবামাত্রই চিনতে পেরেছিলুম।

ফেলেছেন, কিন্তু হয়ে গেল অ্যামেরিকা। যাক্, দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কর্মসূত্রের যোগ আছে।"

বিমল তো শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। শীগ্‌গিরই এই দুপেয়ে খবরের কাগজের দ্বারা বিস্তারিত খবরটি সারা স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল। হতভম্ব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করবার সময় বললুম, "আমার এ বিশ্বাস অবশ্য আছে যে শিক্ষাদানবিষয়ে আপনারা লাহিড়ী মহাশয়ের যোগের আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রেখেই অগ্রসর হবেন। প্রায়ই আমি আপনাদের লিখব, কিছু ভাববেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে একদিন আবার ফিরে আসব।"

রাঁচির সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুবিস্তৃত ভূমি আর আমার প্রাণপ্রিয় শিশু-ছাত্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চক্ষুদুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। জানলুম যে আমার জীবনের একটা অধ্যায় এখানেই শেষ হল। এরপর থেকে দূরে, বহু দূরদেশে আমায় বাস করতে হবে। আমার স্বপ্নদর্শনের ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে রাঁচি পরিত্যাগ করে কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম। কলকাতায় গিয়ে তারপরদিনই আমি অ্যামেরিকার উদার ধর্মমতাবলম্বীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস (ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস্ লিবারেলস্ ইন্ অ্যামেরিকা) হতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য একটি নিমন্ত্রণপত্র পাই। অ্যামেরিকান ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের অধীনে সে বছর এর অধিবেশন বোস্টন সহরে হবার কথা ছিল।

মাথা তখন ঘুরছে, বুদ্ধি গুলিয়ে যাবার যোগাড়। কি করি, ছুটলুম শ্রীরামপুরে—গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে পরামর্শ নিতে।

বললুম, "গুরুজী, এইমাত্র আমি অ্যামেরিকা হতে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেলুম, সেখানে এক ধর্মমহাসম্মেলনে আমায় বক্তৃতা দেবার জন্যে ডেকেছে, যাব নাকি?"

গুরুদেব শুধুমাত্র বললেন, "সকল দুয়ারই তো তোমার জন্যে খোলা—এখন না হলে আর কখনও তোমার যাওয়া হবে না, বুঝলে।"

সভয়ে বললুম, "কিন্তু গুরুদেব, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটক্তৃতা দেওয়ার তো আমার কোন অভ্যেস নেই, আর তার কিই বা আমি জানি বলুন। ক্কচিৎ কদাচিৎ দিয়ে থাকলেও ইংরেজীতে তো কখনই নয়।"

"আরে ইংরেজী হোক আর নাই হোক, যোগের বিষয়ে তোমার কথা পশ্চিমের সবাই শুনবে, দেখে নিও।"

আমি হেসে ফেললুম, গুরুজীকে কি বলে বোঝাই। শেষে বললুম,

"গুরুজী, আমার বক্তৃতা শুনতে অ্যামেরিকানরা কি বাংলা শিখবে ভেবেছেন নাকি ? যাই হোক, ইংরেজী ভাষাতে বক্তৃতা দেবার দারুণ পরীক্ষা যাতে উত্তীর্ণ হতে পারি তার জন্যে আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।"

বাড়ীতে ফিরে এলুম। পিতার কাছে মতলবটি খুলে বলতে তিনি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অ্যামেরিকা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য রকমের দূরদেশ ; তাঁর ভয় হল, আমায় আর তিনি দেখতে পাবেন না।

তিনি রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যাবে কি করে ? আর তোমায় টাকাই বা দেবে কে শুনি ?"

যেহেতু তিনি আমার শিক্ষা আর সারাজীবনের ভার সাদরে বহন করে এসেছিলেন, সেহেতু তিনি নিঃসংশয়ে আশা করেছিলেন যে আমার মতলব এই একটিমাত্র প্রশ্নের আঘাতেই কাৎ হয়ে যাবে। বললুম,—

"ভগবানই নিশ্চয় আমায় টাকা জুগিয়ে দেবেন।" এই উত্তর দেবার সময় মনে পড়ল যে ঠিক এইরকমই উত্তর বহুপূর্বে আমি আগ্রায় আমার দাদা অনন্তকে দিয়েছিলুম। আর বেশী কোনরকম চাতুরী না করে সোজাসুজি-ভাবেই বলে ফেললুম, "বাবা, আমায় সাহায্য করতে ভগবানই আপনার মন ঠিক করে দেবেন।"

"না, কখনই নয়।" বলে তিনি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন। যাক, মনে হল ব্যাপারটার এইখানেই ইতি।

কিন্তু তারপরদিন যখন বাবা আমায় ডেকে একটি মোটা টাকার চেক আমার হাতে তুলে দিলেন, তা দেখে তো আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম।

চেকটি দিয়ে তিনি আমায় বললেন, "দেখ, তোমায় যে আমি এই টাকাটা দিচ্ছি, তা তোমার আমি বাবা বলে নয়, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন ভক্ত-শিষ্য বলে। এখন পশ্চিমে যাও, গিয়ে সেখানে ক্রিয়াযোগের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষাদানের কথা প্রচার কর।"

যে নিঃস্বার্থভাব প্রণোদিত হয়ে পিতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিলাষ, স্বার্থচিন্তা সত্বর দমন করে ফেললেন, তা দেখে আমার অন্তর গম্ভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। বিদেশভ্রমণের একটা সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে যে আমার সমুদ্রযাত্রার মতলব নয়, এ সত্য আগের দিন রাত্রিতেই পিতা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পিতার বয়স তখন সাতষট্টি—আর কতদিনই বা থাকবেন ভেবে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে বললেন, "তুমি তো চলে যাচ্ছ, বোধ হয় এ জীবনে আর আমাদের কখনও দেখা হবে না।"

মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে দিলে—উত্তর দিলুম, "নিশ্চয়ই, ভগবান্

অন্ততঃ আর একবারও আমাদের দুজনের দেখা করিয়ে দেবেন বই কি! কিছু ভাববেন না বাবা!"

আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে অ্যামেরিকার কোন্ অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্যে যখন তৈরী হতে লাগলুম—মন যে ভয়ে একটুও কাঁপেনি তা নয়। প্রচন্ড জড়বাদী প্রতীচ্যের আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা নানাবিষয়ের গল্প আমি অনেক শুনেছিলুম—সে সব, সাধুসন্ন্যাসীদের শতশত বৎসরের গভীর-সাধনালব্ধ ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক পটভূমির চিত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন! ভাবলুম, "প্রাচ্যের কোন লোকগুরু, যিনি প্রতীচ্যের জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ করবার সাহস করবেন, তাঁকে হিমালয়ের দারুণ শৈত্যের মধ্যে কঠিন তপস্যার চেয়েও কঠোরতর সাধনার সম্মুখীন হতে হবে।"

অতিপ্রত্যুষে উঠে একদিন প্রার্থনা শুরু করলুম, মনে দৃঢ় সঙ্কল্প যে ঈশ্বরের বাণী শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করেই যাব—মরেও যদি যাই, তা হলে উত্তর না শোনা অবধি আর তা বন্ধ হবে না। আমার প্রার্থনা ছিল, মনে আশ্বাস, দৃঢ়বল ও সাহস আর সর্বোপরি তাঁর আশীর্বাদ, যাতে করে আমি আধুনিক উপযোগবাদের কুজ্ঝটিকার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলি। অবশ্য অ্যামেরিকায় যাবার জন্যে মন পূর্ব হতেই স্থির করে ফেলেছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অনুমতি আর তাঁর আশ্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল।

প্রার্থনা চলতে লাগল—বিরাম নেই। বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণভাবে নিবেদন করতে লাগলুম। কোন উত্তর এল না! আমার নীরব-প্রার্থনা ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল, মনে দারুণ যন্ত্রণা। দুপুর-বেলা নাগাদ মনে হল যেন চরমে পেঁৗছেছি—যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। মনের আকুলআবেগে আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে হচ্ছিল যেন মাথা বুঝি না এখুনিই ফেটে যায়! সেই মুহূর্তে আমাদের বসত বাড়ীর সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম। দরজা খুলে দেখি, কোপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসী। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

হতভম্ব হয়ে গিয়ে ভাবলুম যে, "ইনি নিশ্চয়ই বাবাজী হবেন!"—কারণ আমার সম্মুখে যিনি উপস্থিত, তাঁর আকৃতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের যুবাবয়সের সাদৃশ্যে আছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই বাবাজী।" তারপর অতি মধুর হিন্দীতে বললেন, "আমাদের পরমপিতা

পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে অ্যামেরিকায় যাও, ভয় কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাবাজী পুনরায় বলতে শুরু করলেন, "তোমাকেই আমি পশ্চিমে ক্রিয়াযোগের বাণী প্রচার করবার জন্যে নির্বাচিত করেছি। বহুদিন পূর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি তাঁকে বলেছিলুম যে তোমাকেই আমি তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে পাঠাব।"

তাঁর আবির্ভাবে, আর তিনিই যে আমায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে, পাঠিয়েছিলেন, তাঁর স্বমুখনিঃসৃত এ কথাগুলি শুনে ভয়ে-ভক্তিতে আমি নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমি সেই অমর মহাগুরুর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। ভূমি হতে সযত্নে তিনি আমাকে উঠিয়ে নিয়ে আমার জীবনের নানাকথা তিনি আমাকে শোনালেন, তারপর তিনি আমায় কতকগুলি ব্যক্তিগত উপদেশ দিয়ে গুটিকতক গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

পরিশেষে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন "ঈশ্বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ, তা সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে—আর মানুষের সেই অনন্তকরুণাময় পরমপিতার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অনুভবের মধ্য দিয়েই জাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে।"

তারপর, তাঁর মহিমময় দৃষ্টিশক্তিবলে, সেই মহান্ গুরু তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণে আমাকে যেন বিদ্যুতাপ্লুত করে তুললেন।

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

যদি কখন আকাশে সহস্র সহস্র সূর্যের প্রভা (দীপ্তি) এককালে সমুত্থিত হয়, তবে সেই প্রভার (দীপ্তির) সহিত ঐ মহান্ বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হতে পারে।"*

তারপরেই দরজার দিকে এগিয়ে তিনি বললেন, "আমায় অনুসরণের চেষ্টা কোরো না—তা তুমি পারবে না।" আমি তখন তাঁকে বারম্বার বলতে লাগলুম, "বাবাজী মহারাজ, দয়া করে যাবেন না, যাবেন না—আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।"

পিছন ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এখন নয়, আর এক সময়।"

---

*ভগবদ্গীতা—১১শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

ভাবে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর বারণ অগ্রাহ্য করে এগোতে গিয়েই দেখলুম যে আমার দুটি পা'ই মেঝেতে একেবারে শক্ত হয়ে এঁটে বসে গেছে। দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজী একবার আমার প্রতি শেষ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর আশীর্বাদচ্ছলে একবার হাত তুলেই তিনি প্রস্থান করলেন—আমার দৃষ্টি তখনও তাঁর উপর স্থিরভাবে সংলগ্ন। মিনিট কতকবাদেই আমার পা খুলে গেল। আসনে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলুম ; ভগবানের প্রতি আমার অজস্র ধন্যবাদ যে তিনি শুধু আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন তাই নয়—বাবাজী দর্শনদানে আমাকে আশীর্বাদপূত করেছেন, এই বলেও। আমার সর্বশরীর সেই প্রাচীন অথচ চিরনবীন মহান্‌গুরুর পুণ্যস্পর্শে ধন্য আর পবিত্র হয়ে গেছে। তাঁকে দেখবার জন্যে একটা জ্বলন্ত আগ্রহ বহুদিন থেকেই মনের মধ্যে ছিল, আজ তা মিটল।

বাবাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা এপর্যন্ত আমি কারুরই কাছে কখনও বলিনি। আমার মানবজীবনের এক পবিত্রতম অভিজ্ঞতা বলে মনে করে আমি একথা অন্তরে চিরলুক্কায়িতই রেখেছিলুম। কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে উদয় হল যে এই আত্মজীবনীর পাঠকবর্গ সেই নিঃসঙ্গ বাবাজী আর তাঁর জগতের উন্নতিতে আগ্রহের বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন, যদি আমি বলি যে আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি। আমি একজন চিত্রশিল্পীকে আধুনিক ভারতের মহাযোগিগুরু বাবাজী মহারাজের প্রকৃত আলেখ্য চিত্রিত করতে সাহায্য করেছি ; সে চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অ্যামেরিকা যাবার প্রাক্কালে আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যপদতলে প্রণাম নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করতে গেলুম।

গুরুদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্তস্বরে আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়ে বললেন, "ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছ, আর মার্কিনদেরও জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সব চেয়ে ভাল, তাই গ্রহণ কোরো। অমৃতের পুত্র তুমি—তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হোয়ো আর পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার যে সব ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে যা কিছু সব সদ্‌গুণ তা নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলো।"

তারপর তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "ঈশ্বরের সন্ধানে যারাই তোমার কাছে বিশ্বাস করে আসুক না কেন, সকলেই তারা উপকৃত হবে। তাদের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাতে, তোমার চক্ষু দুটি হতে নির্গত আধ্যাত্মিকশক্তির প্রবাহ তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাদের পার্থিব অভ্যাসের পরিবর্তন সাধিত করে তাদের আরও বেশী ঈশ্বরমুখী করে তুলবে।"

তারপর মৃদু হেসে তিনি বললেন, "প্রকৃত ধর্মপিপাসু লোকেদের আকর্ষণ করবার ভাগ্যও তোমার খুব ভাল। যেখানেই তুমি যাওনা কেন—এমন কি বনেজঙ্গলে গেলেও তুমি বন্ধু খুঁজে পাবে।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর এ উভয় আশীর্বাদই বহুলাংশে ফলে গিয়েছিল। অ্যামেরিকায় এলুম একলা—যেখানে একটিও বন্ধু নেই, কিন্তু এসে দেখলুম যে হাজার হাজার লোক শাশ্বত সনাতন আধ্যাত্মিকশিক্ষার প্রণালী গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছে।

১৯২০ সালে অগ্যাষ্ট মাসে "সিটি অফ্ স্পার্টা" নামক জাহাজে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেইটাই হচ্ছে প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ যা অ্যামেরিকায় যাচ্ছিল। ছাড়পত্র পাবার সরকারী আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির বহু হাঙ্গামাহুজ্জত, বলতে গেলে প্রায় অলৌকিক উপায়ে এড়িয়ে, তবে স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম। এই দুমাস ধরে সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে একজন সহযাত্রী আবিষ্কার করে ফেললেন যে বোস্টন কংগ্রেসে আমি ভারতীয় প্রতিনিধি।

তিনি বললেন, "সোয়ামী ইয়োগানান্দ"—মার্কিনেরা আমায় পরে যে সব অদ্ভুত উচ্চারণের নামে অভিহিত করেছিল তার মধ্যে এইটেই অবিশ্যি সর্বপ্রথম —"এই বৃহস্পতিবার রাত্রে আপনি অনুগ্রহ করে সহযাত্রীদের সামনে একটি বক্তৃতা দেন না কেন? আমার মনে হয় বক্তৃতার বিষয় 'জীবনযুদ্ধ ও তা জয়ের উপায়' হলে সবাইকার শুনতে ভাল লাগবে, কি বলেন?"

হা ভগবান্, সেই বুধবার রাত্রেই আমি আবিষ্কার করলুম যে আমার নিজেরই জীবনযুদ্ধের লড়াইএ এখন আমায় নামতে হবে—তা অন্যকে আমি সে বিষয় আর কি বলব? যাক্, ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবার জন্যে ভাবটাবগুলো একটু আধটু গুছিয়ে নেবার জন্যে খানিকক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করবার পর শেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিলুম। চিন্তাগুলো, ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়মকানুনের সঙ্গে অসহযোগিতা করে তার জালে না পড়ে, ব্যাধদর্শনে পক্ষিদলের মতই কে কোথায় উড়ে পালাল। অবশেষে গুরুদেবের অতীতে আশ্বাসদানের কথা স্মরণ করে স্টিমারের সেলুনে বক্তৃতা দেবার জন্যে শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তো উপস্থিত হলুম। বাগ্মিতা প্রদর্শন করা তো দূরে থাক, সেই জনমণ্ডলীর সম্মুখে বাক্‌শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়েই রইলুম খানিকক্ষণ। এক মিনিট…দু মিনিট……তিন মিনিট………দশ মিনিট কেটে গেল, কথা আর বেরোয় না। শ্রোতারা আমার দুর্দশার কথা অনুধাবন করে হাসাহাসি শুরু করে দিলে।

ব্যাপারটা অবশ্য আমার কাছে তখন আদৌ প্রীতিকর ছিল না—রাগে,

দুঃখে, ক্ষোভে, নীরবে গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিলুম। তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরের মধ্যে তাঁর বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল, "তুমি পারবে! তুমি পারবে! বল, কথা বল!"

সঙ্গে সঙ্গে ভাবগুলি বেশ গুছিয়ে এসে ইংরেজী ব্যাকরণের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াল। পৌনে একঘণ্টা শোনবার পরও শ্রোতৃবৃন্দ আরও শুনতে সমান উৎসুক। সেই বক্তৃতার পর অ্যামেরিকার নানাদল থেকে আমার কাছে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ আসতে লাগল।

বক্তৃতা শেষ হবার পর, কি যে সব বলেছিলুম আর কি যে সব করেছিলুম তার একটা কথাও আর স্মরণ ছিল না। অত্যন্ত গোপন অনুসন্ধানের পর কতকগুলি যাত্রীদের কাছ হতে জানতে পারা গেল যে, "আপনি নির্ভুল ইংরেজীতে উদ্দীপনাময়ী আর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক বক্তৃতা দিয়েছেন।" এই আনন্দসংবাদে আমি ভক্তিনতচিত্তে যথাসময়ে সাহায্য পাঠাবার জন্য আমার গুরুদেবকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলুম। আবার নতুন করে উপলব্ধি করলুম যে তিনি আমার সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, দেশকালের ব্যবধান আর তাঁকে রুখতে পারে না।

সমুদ্রযাত্রার শেষের দিকটায় কিন্তু একবারমাত্র আগামী বোস্টন কংগ্রেসে বক্তৃতার জন্য একটু ভীতিপ্রদভাবের উদয় হয়েছিল।

তাতে আমি ভগবানের কাছে এই বলে প্রার্থনা করলুম যে, "দয়াময়, তুমিই আমায় বক্তৃতার প্রেরণা জোগাও, ভাবের উৎস হও—আমি আর কিছুই ভয় করি না।"

"সিটি অফ্ স্পার্টা" সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বোস্টন শহরের বন্দরে গিয়ে ভিড়ল। ৬ই অক্টোবর তারিখে আমি কংগ্রেসে গিয়ে অ্যামেরিকায় আমার প্রথম বক্তৃতা দিলুম। সকলেই খুশী হয়েছিলেন। যাক্, মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। কংগ্রেসের প্রকাশিত কার্যবিবরণীতে* অ্যামেরিকান ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের উদার-হৃদয় সেক্রেট্যারি মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

"ভারতবর্ষের রাঁচি ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে স্বামী যোগানন্দ কংগ্রেসে তাঁর সমিতির অভিনন্দন নিয়ে এসেছেন। বিশুদ্ধ আর পরিষ্কার ইংরেজীতে ও উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তিনি "ধর্মবিজ্ঞান" সম্বন্ধে দার্শনিকতত্ত্ব পূর্ণ এক বক্তৃতা

---

* নিউ পিলগ্রিমেজেস অফ্ দি স্পিরিট (বোস্টনের বীকন প্রেস হতে প্রকাশিত; ইং ১৯২১)।

দেন। বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে সার্বজনীন আর এক। আমরা অবিশ্যি কোন বিশিষ্ট প্রথা বা বিশ্বাসকে সার্বজনীন রূপ দিতে পারি না, কিন্তু ধর্মের মূলতত্ত্বকে সার্বজনীন করে তোলা যেতে পারে—আর তা আমরা সকলকে অনুসরণ করতে আর মানতেও বলতে পারি।"

পিতার উদার ও মহান দানের ফলে, কংগ্রেস শেষ হয়ে গেলেও আমি অ্যামেরিকায় কিছুকাল থেকে যেতে পারলুম। বোস্টনে অতি সুখে, সরল আর অনাড়ম্বরভাবে তিনটি বৎসর কেটে গেল। বক্তৃতাপ্রদান, যোগসম্বন্ধে ক্লাসে শিক্ষাদান ছাড়াও একটি কবিতার বই লিখেছিলুম—বইটির নাম "সংস অফ দি সোল"; এর মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন, ডাঃ ফ্রেডারিক বি. রবিনসন, সিটি অফ নিউ ইয়র্ক কলেজের প্রেসিডেন্ট।

১৯২৪ সালে সমগ্র মহাদেশাতিক্রম্য যাত্রা শুরু করে প্রধান প্রধান শহরে হাজার হাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। পরমরমণীয় আলাস্কার উত্তরপ্রদেশে অবকাশযাপন করবার জন্য সীয়াটলে জাহাজে চড়ে বসলুম।

উদারহৃদয় ছাত্রদের বদান্যতায় ১৯২৫ সালের শেষের দিকে আমি লস এঞ্জেলিস সহরে, মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসে, অ্যামেরিকার একটি প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। বহুবৎসর পূর্বে কাশ্মীর ভ্রমণের সময় আমি স্বপ্নে এই বাড়ীটির দর্শন পাই। অ্যামেরিকার এই দূরদেশে কার্যকলাপের চিত্রাবলী আমি অবিলম্বে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর নিকট পাঠাই। তাতে তিনি আমায় বাংলায় একটি পোস্টকার্ড লেখেন,—

১১ই অগাস্ট, ১৯২৬

আমার মানসপুত্র যোগানন্দ,

তোমার স্কুল আর ছাত্রদের ফটো দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। নানাশহরে তোমার যোগের ছাত্রদের দেখে মন আনন্দে বিগলিত হয়েছে। স্তোত্রপাঠ, রোগনিবারণে শক্তিসঞ্চার আর দৈব উপায়ে রোগনিরাময়ে প্রার্থনা প্রভৃতির তোমার প্রণালী দেখে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তোমায় না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি না। মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসের গেট, তার ক্রমোন্নত আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথ আর তার নীচের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমার নিজের চোখে সব দেখতে ইচ্ছে করছে।

এখানকার সব মঙ্গল। ভগবৎকৃপায় তুমি চিরসুখী হও।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি

বছরের পর বছর কেটে গেল। এই নূতন মহাদেশের প্রত্যেক অংশেই আমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালুম। শত শত ক্লাব, কলেজ, চার্চ আর নানা দলের সামনে আমায় অনেক কিছুই বলতে হল। ১৯২০-১৯৩০ দশকে সহস্র সহস্র অ্যামেরিকাবাসী আমার যোগের ক্লাসে যোগদান করে। তাদের সকলের নামে "হুইস্পার্স ফ্রম ইটার্নিটি"—"দিব্য বাণী" নামে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি নূতন প্রার্থনা ও কবিতার পুস্তক উৎসর্গ করলুম। বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী অ্যামেলিটা গ্যালি-কার্সি।

কখনও কখনও—(সাধারণতঃ মাসের পয়লা তারিখেই মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেটের এবং সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের অন্যান্য কেন্দ্রসকলের ব্যয়নির্বাহের জন্যে বিল সব এসে হাজির হত)—তখন ভারতবর্ষের সরল অনাড়ম্বর শান্তিময় জীবনের জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা জেগে উঠত। কিন্তু প্রাচী আর প্রতীচীর ভাবের আদানপ্রদানের দৈনন্দিন প্রসার দেখে মন আনন্দে উল্লসিতও হয়ে উঠত।

"তাঁর জাতির পিতা" জর্জ ওয়াশিংটন, যিনি বহু উপলক্ষ্যেই অনুভব করেছিলেন যে তিনি দৈবনির্দেশে পরিচালিত হতেন, অ্যামেরিকার আধ্যাত্মিক অনুপ্রাণনার জন্য (তাঁর বিদায়বাণীতে) নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন,—

"স্বাধীন, শিক্ষিত আর অচিরেই একটা বিরাট জাতিতে পরিণত—এদের পক্ষে সর্বদা উচ্চ ন্যায়বিচার আর লোকহিতৈষণার দ্বারা চালিত জাতির একটা অতি অদ্ভুত আর বিরাট উদাহরণ মানবজাতিকে দেওয়ার সে উপযুক্ত হবেই। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সময় আর ঘটনার পথে এরূপ একটা বিরাট পরিকল্পনার ফল, এ শুধু ধৈর্য ধরে অনুসরণ করবার সাময়িক ক্ষতি বহুগুণেই পূরণ করবে। একি কখন হতে পারে যে, ভগবান একটা জাতির গুণের সঙ্গে তার চিরস্থায়ী সুখ আর সৌভাগ্য সংযুক্ত করে রাখে নি ?"

হুইট্ম্যানের "অ্যামেরিকা প্রশস্তি"

(ওয়াল্ট হুইট্ম্যানের "দাউ মাদার উইথ দাই ইকোয়াল ব্রুড" হতে উদ্ধৃত।)

তোমার ভবিষ্যকালে তুমি,
বুদ্ধিদীপ্ত বৃহত্তর তব নরনারীদলে তোমা' মাঝে—
তোমার সে শক্তিধর, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ;
উত্তর, দক্ষিণ আর প্রাচী ও প্রতীচী।
নৈতিকসম্পদে তব আর সভ্যতায়
(ততদিন জড়সভ্যতার তব বৃথাগর্ব রহিবে কেবল)

সর্বার্থসাধক, তব শ্রদ্ধা সর্বব্যাপী—অথবা যে
কেবল একটিমাত্র বাইবেল, ত্রাণকর্তামাঝে,
আবদ্ধ তুমি তো নও,
মুক্তিদাতারূপে গণ্য তোমা' মাঝে যাঁরা
—সংখ্যা নাই তার,
নিদ্রিত রয়েছে তারা বুকের মাঝারে তব,
যেকোন লোকের সাথে তুলনায় আর দৈবীভাবে,
সমতুল এ সবাই ! এরাই তোমার মাঝে
(নিশ্চয় আসবে দেখো)
ভবিষ্যদ্বাণী আমি করে যাই আজ ।

৩৮-শ পরিচ্ছেদ

লুথার বারব্যাঙ্ক—গোলাপবাগের সাধু

লুথার বারব্যাঙ্ক হচ্ছেন একজন যুগান্তকারী মার্কিন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্—উদ্ভিদরাজ্যের যাদুকর। অসীম ধৈর্য আর অপূর্ব মনীষাবলে ইনি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে নানা নূতন নূতন ফলফুলের সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির হাতে যে ব্যাপার সংঘটিত হতে দশ বৎসর লাগে সেটা তিনি একবৎসরের মধ্যেই ঘটাতে পেরেছেন। তাঁর পরীক্ষাক্ষেত্র ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার শান্তা রোজা উদ্যান। একদিন যখন তাঁর সঙ্গে সেখানে বেড়াচ্ছি, লুথার বারব্যাঙ্ক তখন এই জ্ঞানগর্ভ সত্যটি প্রকাশ করে বললেন, "উন্নত ধরণের উদ্ভিদপ্রজননের গুপ্তরহস্য হচ্ছে অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া—প্রেম!" আমরা আহারযোগ্য একপ্রকার কাঁটাশূন্য মনসাগাছের ঝাড়ের কাছে এসে তখন দাঁড়ালুম।

তিনি বলতে লাগলেন, "যখন আমি মনসাগাছকে কাঁটাশূন্য করবার পরীক্ষা চালাচ্ছিলুম, তখন আমি প্রায়ই তাদের আদর করে ভালবাসার কথা সব বলতুম। আমি তাদের বলতুম, 'তোমাদের কিচ্ছু ভয় নেই। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাদের কাঁটার কি দরকার গো, আমি যে তোমাদের সব রক্ষা করব, বুঝলে?' এই রকম করে নানাকথা বলে আমি যেন তাদের সব ভয় ভাঙাতুম। অবশেষে দেখা গেল যে মরুভূমির সেই দারুণ কাঁটাওয়ালা ফণীমনসার গাছ হতে একেবারে কাঁটাশূন্য অতিপ্রয়োজনীয় এক বিশেষ-শ্রেণীর গাছের উদ্ভব হয়েছে।"

এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনে তো আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বললুম, "প্রিয় লুথারসাহেব, আমাকে কতকগুলো ফণীমনসার পাতা দেবেন তো, মাউন্ট ওয়াশিংটনে আমার বাগানে পুঁতব!"

কাছেই একটা মালী দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি কতকগুলো পাতা ছাঁটতে শুরু করে দিলে। বারব্যাঙ্ক তাকে বারণ করে বললেন, "থাক, থাক, আমি নিজেই স্বামীজীর জন্যে পাতা তুলে দিচ্ছি", বলে আমায় তিনটি পাতা তুলে দিলেন। বাগানে সেগুলি লাগাতে খুব বড় হয়ে উঠল দেখে ভারি আনন্দ হল।

সেই বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ আমায় বলেছিলেন যে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে সুবৃহৎ আলু—তাঁর নিজনামে এখন পরিচিত। বিরাট প্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রম নিয়ে তিনি প্রকৃতিতে নানা বর্ণসংকরজাতির সৃষ্টি করে

পৃথিবীকে বহু নূতন আর উন্নতধরণের ফলফুল উপহার দিয়েছেন। তাঁর নামে পরিচিত—নূতন ধরণের বিলাতীবেগুন, ভুট্টা, স্কোয়াশ, চেরী, কুল, নেক্টারিন, বেরী, পপি, লিলি, গোলাপ ইত্যাদি।

লুথারসাহেব যখন আমায় তাঁর সেই বিখ্যাত বাদামগাছের কাছে নিয়ে গেলেন তখন আমি আমার ক্যামেরার মুখ সেদিকে ফেরালুম। এই বাদামগাছ থেকে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিবর্তন দ্রুততমগতিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

তিনি বললেন, "ষোলবছরে এই বাদামগাছে এমন প্রচুর ফলন ফলেছিল যে, কোন সাহায্য না পেয়ে প্রকৃতিকে তেমনভাবে ফলাতে গেলে অন্ততঃ তার তিরিশ অথবা তারও বেশীবছর সময় লাগত।"

বারব্যাঙ্কের ছোট্ট পালিতাকন্যাটি তার একটি পোষা কুকুর সঙ্গে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাগানে এসে ঢুকল।

লুথার সাহেব সস্নেহে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ও হচ্ছে আমার মানবতরু। সমগ্র মানবজাতিকে আমি একটিমাত্র বিরাট বনস্পতির মতই মনে করি; তাদের পূর্ণবিকাশ আর চরমপরিণতির জন্যে দরকার প্রেম, প্রকৃতির মুক্ত আলোবাতাসের আশীর্বাদ আর সুচতুর নির্বাচন ও মিলন-সংঘটন। আমার এই নিজেরই জীবনকালে বৃক্ষলতার বিবর্তনে এতবড় আশ্চর্য উন্নতি আমি দেখেছি যে, তাতে করে আমার খুবই আশা হয় যদি এর সন্তানসন্ততিদের সরল আর সুসঙ্গতভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে জগৎ সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান্ হয়ে উঠবে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির স্রষ্টা সেই ঈশ্বরেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।"

"লুথারসাহেব, আপনি আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের মুক্ত আকাশতলে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আর সেখানে শান্তির আবহাওয়ায় সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন।"

আমার কথাগুলি বারব্যাঙ্কের হৃদয়তন্ত্রীর এক কোমল পর্দায় গিয়ে আঘাত করলে—সেটি শিশুশিক্ষা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে তিনি আমাকে অস্থির করে তুললেন। তাঁর শান্তগভীর চোখদুটি আগ্রহে উদ্দীপ্ত।

অবশেষে তিনি বললেন, "স্বামীজী, আপনার বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয়ই ভবিষ্যৎযুগের একমাত্র আশা। আমি বর্তমানযুগের শিক্ষাপ্রণালীর উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ—যে শিক্ষা প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন করে, সমস্ত ব্যক্তিত্বের কণ্ঠরোধ করে। আপনার শিক্ষার যে কার্য্যকরী আদর্শ, তার সঙ্গে মনেপ্রাণে আমি এক।"

এই সৌম্যমূর্তি ঋষিটির কাছ হতে বিদায় নিতে যাবার সময় তিনি একটি ছোট বইয়ে স্বাক্ষর* করে সেটি আমায় উপহার দিয়ে বললেন, "এই আমার বই, 'দি ট্রেনিং অফ্ দি হিউম্যান প্ল্যান্ট্'।** এখন চাই নূতন ধরণের শিক্ষা আর চাই নির্ভীক পরীক্ষা। সময়ে সময়ে খুব দুঃসাহসী পরীক্ষার ফলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলফুলের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। শিশুশিক্ষায় নূতনপ্রণালী প্রবর্তনেও তেমনি দুঃসাহসী, তেমনি বহুল পরীক্ষা প্রয়োজন।"

গভীর আগ্রহে তাঁর সেই বইটি আমি রাত্রিতেই পড়ে শেষ করে ফেললুম। জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি লিখেছেন,—

"এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অনমনীয় সজীব বস্তু—পরিবর্তন যার অত্যন্ত কঠিন, সে হচ্ছে একটি গাছ, যার কতকগুলি অভ্যাস একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। স্মরণ রাখবেন যে এই গাছটি যুগযুগান্তর ধরে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেছে; হয়ত এই গাছটির উৎপত্তি অনুসরণ করে কালপ্রবাহের মধ্য দিয়ে গেলে তাকে প্রস্তরের স্তরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই এতবিশাল সময়ের মধ্যে তার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আপনার কি মনে হয় না যে এই যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুর পর গাছটির অপূর্ব দৃঢ়তাসম্পন্ন কোন ইচ্ছা—ইচ্ছা যদি বলতে চান, বলুন,—তার অধিগত হয় নি? বাস্তবিক এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেমন কতকগুলি পামজাতীয় গাছ—তারা এত সংরক্ষণশীল যে কোন মানবশক্তি এপর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। একটা গাছের ইচ্ছার তুলনায় মানুষের ইচ্ছা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু দেখুন, এই সম্পূর্ণ গাছটার জীবনব্যাপী দৃঢ়তা শুধু বর্ণসঙ্করতা ঘটিয়ে নূতন জীবন সংযোগ করে তার জীবনে একটা দৃঢ় আর সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে

---

* লুথার বারব্যাঙ্ক তাঁর স্বাক্ষরিত একটি নিজের ফটোগ্রাফও আমায় দিয়েছিলেন। জনৈক হিন্দুবণিক লিনকনের একটি প্রতিকৃতি একদা যেমন অমূল্য বলে বিবেচনা করতেন, বারব্যাঙ্কের প্রতিকৃতিও আমি সেই রকমই বিবেচনা করি। সিভিলওয়ারের সময় উক্ত হিন্দুবণিকটি অ্যামেরিকায় ছিলেন। তিনি লিনকনের প্রতি এতদূর অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে, তিনি সেই "বিরাট মুক্তিদাতার" একখানি ছবি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না। একদিন লিনকন সাহেবের বাড়ীর দরজা গোড়ায় এসে ভদ্রলোক একেবারে অনড় হয়ে বসেই রইলেন, যতক্ষণ না তিনি বিস্মিত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছ থেকে তাঁর চিত্র অংকিত করবার জন্যে নিউইয়র্কের বিখ্যাত চিত্রকর ড্যানিয়েল হান্টিংটনকে নিযুক্ত করবার অনুমতি পেলেন। চিত্রটি সম্পূর্ণ হতেই হিন্দুভদ্রলোকটি বিজয়গর্বে সেটি বহন করে কলকাতায় ফিরলেন।

** নিউইয়র্ক হতে সেঞ্চুরী কোং কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২২।

কি করে তা ভঙ্গ করে ফেলা যায়। তারপর সেই ভাঙ্গন এলে তাকে বৎসরের পর বৎসর ধরে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সুনির্বাচন আর পর্যবেক্ষণ করে তার অভ্যাস সুদৃঢ় করে তুলুন—দেখবেন, নতুন গাছটি নবজীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আর সে তার পুরান অবস্থায় কখনও ফিরে যাবে না ; তার অনমনীয় ইচ্ছা পরিশেষে একেবারে লুপ্ত আর পরিবর্তিত হয়।

"এইরকম ব্যাপার যখন শিশুপ্রকৃতির মতন একটা ভাবপ্রবণ আর নমনীয় বিষয়ে ঘটে তখন সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ আর সরল হয়ে আসে।"

এই শ্রেষ্ঠ অ্যামেরিকান বৈজ্ঞানিকের মনীষায় চৌম্বকাকৃষ্ট হয়ে আমি বারম্বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। একদিন সকালে গিয়ে পড়েছি, সেই সময়ে ডাকপিয়নও এসে হাজির। বারব্যাংকের পড়বার ঘরে একটা থলে করে তাঁর নামে চিঠি দিয়ে গেল—হাজারখানেক চিঠি। পৃথিবীর সর্বত্র হতে উদ্যানতত্ত্ববিদেরা তাঁকে লিখেছেন।

লুথারসাহেব খুশী হয়ে বললেন, "স্বামীজী, এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে—আপনার দোহাই দিয়ে চলুন বাগানে বেরিয়ে পড়ি।" তারপর একটা প্রকাণ্ড ডেস্ক-ড্রয়ার টেনে তার ভিতর থেকে অনেকগুলো দেশভ্রমণের ছবি বার করে নিয়ে বললেন, "এই দেখুন, আমি কেমন করে দেশভ্রমণ করে বেড়াই। গাছের সেবা আর চিঠিপত্র লেখালিখিতে বাঁধা পড়ে বিদেশ-ভ্রমণের সুখ আমায় মাঝেমাঝে এই সব ছবিগুলো দেখেই মিটাতে হয় আর কি।"

আমার গাড়ী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লুথার সাহেব আর আমি সেই ছোট্ট শহরটির রাস্তায় রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ালুম। শহরটির চারদিকের বাগানগুলি তাঁরই আবিষ্কৃত শাস্তা রোজা, পীচরো, বারব্যাঙ্ক গোলাপে আলো হয়ে রয়েছে।

প্রথম প্রথম তাঁর কাছে আমার যাতায়াতের সময়েই লুথার বারব্যাঙ্ক ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রক্রিয়াটি অভ্যাস করি।" তারপর যোগের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আমাকে বহু সুচিন্তিত প্রশ্ন করবার পর শেষে ধীরে ধীরে বললেন, "সত্যিই প্রাচ্যের এত বড় জ্ঞানভাণ্ডার আছে, যার বিষয় প্রতীচ্য অতি অল্পই অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে।"*

---

* সুবিখ্যাত ইংরেজ জীববিদ্ ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলি সম্প্রতি বলেছেন যে, জড় সমাধিতে প্রবেশ এবং শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের "প্রাচ্য প্রণালী" সব শিক্ষা করা উচিত। "কি হয় ? এ কেমন করে সম্ভব ?" প্রভৃতি তিনি প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের ফলে প্রকৃতি যে তার সযত্নরক্ষিত বহু গুপ্তরহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল—তাতে করে লুথার বারব্যাঙ্ক লাভ করেছিলেন অপরিসীম আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা।

তিনি সসঙ্কোচে একদিন আমায় বললেন, "মাঝে মাঝে আমি সেই অনন্ত-শক্তির স্পর্শ খুব নিকটেই পাই। তাতে করে আমি আশেপাশের রুগ্ন লোকেদের আর অসুস্থ গাছেদেরও সুস্থ করে তুলতে পেরেছি।" স্মৃতির আলোকে তাঁর সুবেদী আর সুন্দর আকৃতির মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাঁর মা ছিলেন একজন খাঁটি খ্রিস্টান। তাঁর কথা উল্লেখ করে বললেন, "মায়ের মৃত্যুর পর বহুবার তিনি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা কয়েছেন।"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা তাঁর বাড়ী ফিরলুম—হাজারখানেক চিঠি তখনও খোলবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

বাড়ী ফিরে লুথারসাহেবের কাছে একটা কথা পাড়লুম। বললুম, "লুথারসাহেব, শীঘ্রই আমি একটি পত্রিকা বার করছি, পূর্ব আর পশ্চিমের যা কিছু সত্যের দান, তা এর ভিতর দিয়েই লোকের হাতে পৌঁছে দেব। পত্রিকটির জন্যে একটি বেশ ভাল নাম নির্বাচিত করবার কাজে আমায় সাহায্য করবেন?"

কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনার পর অবশেষে "ঈস্ট-ওয়েস্ট"* অর্থাৎ প্রাচী ও প্রতীচী এই নামটাই সাব্যস্ত হল। তারপর পুনরায় তাঁর পড়বার ঘরে প্রবেশ করবার পর বারব্যাঙ্ক সাহেব "বিজ্ঞান ও সভ্যতা" এই বিষয়ে তাঁর একটি লেখা আমায় পড়তে দিলেন।

লেখাটি পেয়ে আমি সকৃতজ্ঞভাবে বললুম, "ঈস্ট-ওয়েস্টে'র প্রথম সংখ্যাতেই এই লেখাটি বেরোবে।"

আমাদের অন্তরঙ্গতা গভীর থেকে গভীরতর হতে আমি বারব্যাঙ্ক সাহেবকে "অ্যামেরিকার সাধু" বলে অভিহিত করতে লাগলুম। প্রায়ই আমি বলতুম, "দেখ, ইনি এমন একটি লোক যাঁর মধ্যে কোন খলকপটতা

১৯৪৮ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে লণ্ডন হতে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেসের সরকারী সংবাদে বর্ণিত হয়েছে, "ডাঃ হাক্সলি নূতন ওয়ার্লড ফেডারেশন ফর মেণ্টাল হেল্‌থকে বলেছিলেন যে প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে ভাল হবে। যদি এই জ্ঞানের বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান হয়,' তিনি মানস বিশেষজ্ঞদিগকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "তাহলে আমার মনে হয় যে, আপনাদের কর্মক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হতে পারা যাবে।"

* ১৯৪৮ সালে "সেলফ্‌-রিয়্যালাইজেশন ম্যাগাজিন" নামে পরিবর্তিত।

নেই।* কি সরল আর অমায়িক!" তাঁর হৃদয় ছিল অতলগভীর, সুদীর্ঘ-অভ্যস্ত নম্রতা, ধৈর্য আর ত্যাগে ভরপুর। গোলাপবাগানের মধ্যে তাঁর ছোটবাড়িটি ছিল নিতান্তই সরল আর অনাড়ম্বর; বিলাসিতা আর তুচ্ছ কতকগুলি সম্পদের অসারতার বিষয় তিনি বুঝতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার খ্যাতি যে নম্রতার সঙ্গে তিনি বহন করতেন, তাতে বারম্বার এই কথাই আমার মনে হত যে, গাছ ফলভারাবনত হলে আপনিই নত হয়ে পড়ে; আর ফলহীন বৃক্ষেরাই নিষ্ফলগর্বে মস্তকোত্তলন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

১৯২৬ সালে আমি যখন নিউইয়র্কে, তখন আমার প্রিয় বন্ধুবর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সজলনয়নে আমি ভাবলুম, "আহা, তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। তাঁর একটিবারমাত্র দেখা পাবার জন্যে যে আমি এখান থেকে শান্তা রোজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারি!" আমার সেক্রেটারী আর আগন্তুক অতিথি অভ্যাগতদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখে তারপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমি নির্জনতার মধ্যে কাটিয়েছিলুম।

তার পরের দিন লুথারসাহেবের একটি প্রকাণ্ড ছবির সামনে আমি তাঁর আত্মার মঙ্গলকামনায় পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য একটি বৈদিক অনুষ্ঠান পালন করলুম। হিন্দু অনুষ্ঠানের উপযোগী সাজসজ্জায় সজ্জিত আমার কতকগুলি অ্যামেরিকান শিষ্য, দেহের পাঞ্চভৌতিক উপাদানের প্রতীক—অগ্নি, জল আর পুষ্প প্রদান করে তাদের পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া উপলক্ষ্যে স্তোত্র পাঠ করলে।

যদিও লুথার বারব্যাঙ্কের দেহ আজ তাঁর বাগানে বহুদিন আগে রোপিত এক লেবানন সিডার বৃক্ষতলে শায়িত, কিন্তু আমার কাছে তাঁর আত্মার প্রকাশ চলার পথে রাস্তার ধারে আলোহাসিতে উজ্জ্বল, প্রস্ফুটিত প্রতি ফুলেফুলে। প্রকৃতির বিরাট আত্মার সঙ্গে সাময়িকভাবে মিশে গিয়ে লুথার বারব্যাঙ্কই কি উষার আগমনে জীবনপ্রভাতের সূচনা করে বাতাসের কানেকানে কথা কইছেন না?

তাঁর নাম এখন আর একটা ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তা এখন সাধারণ ভাষার অঙ্গীভূত একটা শব্দরূপে প্রচলিত হয়েছে। ওয়েবস্টারের নিউ ইন্টারন্যাশানাল ডিকসনারীতে "বারব্যাঙ্ক" সকর্মক ক্রিয়ারূপে শব্দের তালিকাভুক্ত হয়েছে, তার মানে দেওয়া হয়েছে, "জোড়বাঁধা বা কলমকরা। সুতরাং রূপক অর্থে তা বোঝায় মন্দলক্ষণগুলি পরিত্যাগপূর্বক উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলি সংযোজিত করে কোন কিছুর উন্নতিসাধন করা।"

বারব্যাঙ্ক কথাটির অভিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা পাঠ করে আমি বলে উঠলুম, "প্রিয়তম বারব্যাঙ্ক, আপনার নামটাই হচ্ছে উৎকর্ষ আর সাধুতার প্রতিশব্দ।"

* জন ১:৪৭ (বাইবেল)।

লুথার বারব্যাঙ্ক
শান্তা রোজা, ক্যালিফোর্নিয়া
ইউ. এস. এ.

২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৪

আমি স্বামী যোগানন্দের যোগদাপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখেছি, আর আমার মতে মানুষের দৈহিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির শিক্ষা আর সামঞ্জস্যবিধানে এ আদর্শস্থানীয়। স্বামীজীর উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী আদর্শ জীবনযাপনপ্রণালীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনেই আবদ্ধ থাকবে, তা নয়—শরীর, ইচ্ছা, অনুভূতি এদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যোগদা-প্রণালীর মাধ্যমে শরীর, মন আর আত্মার উৎকর্ষসাধনে জীবনের অনেক কিছু জটিলসমস্যার সমাধান হতে পারবে, আর পৃথিবীতে শান্তি আর সদিচ্ছা নেমে আসবে। স্বামীজীর মতে প্রকৃতশিক্ষা হবে, সবল প্রকার দুর্জ্ঞেয়তা আর অব্যবহারিকতা হতে মুক্ত সহজ সাধারণজ্ঞান, তা না হলে এ আমার অনুমোদন পেত না।

প্রকৃত জীবনযাপনপ্রণালীর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের জন্য স্বামীজীর আবেদনে অন্তরের সঙ্গে যোগদানের এই সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত, যা প্রতিষ্ঠা হলে স্বর্গরাজ্যসূচনার কাছাকাছি হবে; এর বেশী আর কিছু যে কি আছে তা আর আমার জানা নেই।

লুথার বারব্যাঙ্ক

৩৯শ পরিচ্ছেদ

থেরেসা নোয়মান—খ্রিস্ট ক্ষতাঙ্কধারিণী ক্যাথলিক

মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসের হেডকোয়ার্টারে একদিন ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, "ভারতবর্ষে ফিরে এসো ; তোমার জন্যে আমি পনর বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি। শীঘ্রই আমি দেহত্যাগ করে অনন্তের দিকে পাড়ি জমাব। যোগানন্দ, চলে এস !"

চক্ষের পলকে দশহাজার মাইল অতিক্রম করে তাঁর আহ্বান আমার অন্তরে এসে পৌঁছল—বিদ্যুৎস্ফুরণের মত।

পনর বছর। হ্যাঁ, পনর বছরই তো বটে! দেখলুম, এটা ১৯৩৫ সাল ; এসেছিলুম ১৯২০ সালে। পনর বছর ধরে আমি গুরুর শিক্ষা অ্যামেরিকায় প্রচার করে এসেছি। এখন গুরু আমায় ডাক দিয়েছেন।

অল্পকাল পরেই আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ জেমস জে, লীনকে আমার এই অনুভূতির কথা বলেছিলুম। ক্রিয়াযোগ সাধন করে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি এতদূর সাধিত হয়েছিল যে আমি তাকে প্রায়ই সেণ্ট লীন্ বলে অভিহিত করতুম। বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী যে, পাশ্চাত্যেও এমন সব নরনারী তৈরী হতে পারে যাদের প্রাচীন যোগের পথে সত্যকার ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছে, তা তাঁর এবং অন্যান্য বহু পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিতই হতুম।

মিঃ লীন্ আমার যাত্রার ব্যবস্থার জন্যে অর্থ প্রদান করতে চাইলেন। আর্থিক সমস্যা দূরীভূত হতে আমি ইউরোপ হয়ে ভারতবর্ষে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে আমি সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপকে ক্যালিফোর্ণিয়া স্টেটের আইন অনুসারে চিরস্থায়ী স্বত্বে ধর্ম-নিরপেক্ষ লভ্যহীন প্রতিষ্ঠানরূপে রেজেষ্ট্রী করলুম। সেলফ্-রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপে আমি আমার যাবতীয় অ্যামেরিকান সম্পত্তি, মায় আমার লেখা যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব আমি দান করেছি। সেলফ্-রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপ অন্যান্য অধিকাংশ শিক্ষা ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহের মত সদস্যদের এবং জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে পরিচালিত হয়।

শিক্ষার্থিদের বললুম, "আমি আবার ফিরে আসব। অ্যামেরিকাকে আমি কখনও ভুলব না।"

স্নেহানুগত বন্ধুবর্গ লস্ এঞ্জেলিসে আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এক ভোজ দিলেন। তাঁদের মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে আমি সকৃতজ্ঞমনে ভাবলুম, "ভগবান্, তোমাকেই যে একমাত্র সকল দানের দাতা বলে ভাবতে পারে, মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের মাধুর্য খুঁজে পাবার তার কখনও অভাব হয় না।"

১৯৩৫ সালের ৯ই জুন আমি "ইউরোপা" নামক জাহাজে নিউইয়র্ক ত্যাগ করলুম। দুটি শিষ্য আমার সঙ্গে এল—আমার সেক্রেটারী মিষ্টার সি. রিচার্ড রাইট আর একজন বর্ষিয়সী মহিলা, মিস্ এটি ব্লেচ্। সমুদ্রযাত্রার শান্তিময় দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটল, আগেকার কর্মব্যস্ত সপ্তাহগুলির সঙ্গে তাদের পার্থক্য কত তৃপ্তিদায়ক। আমাদের অবসরবিনোদন কিন্তু বেশীদিন ঘটল না। আধুনিক জলযানের গতির ভিতরেও কিঞ্চিৎ ক্ষোভের বিষয় আছে বই কি!

আর সব উৎসুক ভ্রমণকারীদলের মত আমরাও সেই বিশাল আর প্রাচীন মহানগরী লণ্ডন বেড়িয়ে বেড়ালুম। আমাদের পেঁছবার পরদিন ক্যাক্সটন হলে এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি নিমন্ত্রিত হলুম। সেখানে সার্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড লণ্ডনের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আমায় পরিচিত করে দিলেন। তারপরে আমাদের দলের নিমন্ত্রণ এল সার্ হ্যারি লডারের স্কটল্যাণ্ডে তাঁর এষ্টেটে এক অবসরদিবস যাপন করবার জন্য। দিনটা খুব আনন্দেই কাটল। তারপর শীঘ্রই আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ করলুম, কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল—জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে একটি বিশেষ তীর্থস্থান দর্শন করা। কারণ আমি ভাবলুম যে কোনার্সরয়েথের ক্যাথলিক মরমী থেরেসা নোয়ম্যানকে দর্শন করার এই হবে আমার একমাত্র সুযোগ।

বহুবৎসর আগে আমি থেরেসা নোয়ম্যানের একটি অলৌকিক বিবরণ পাঠ করেছিলুম। তাতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি বিবৃত করা ছিল:—

(১) ১৮৯৮ সালে গুডফ্রাইডে'র দিন থেরেসার জন্ম; বিশবৎসর বয়সে তিনি একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন।

(২) ১৯২৩ সালে লিসিস্কের "দি লিট্ল্ ফ্লাওয়ার", সেণ্ট থেরেসার নিকট প্রার্থনার ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পান। পরে থেরেসা নোয়ম্যানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

(৩) ১৯২৩ সাল হতে থেরেসা দৈনিক একটি ক্ষুদ্র পবিত্ররুটি আহার করা ব্যতীত খাদ্যপানীয় গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত।

(৪) ষ্টিগম্যাটা অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রিস্টের পবিত্র ক্ষতচিহ্নসকল ১৯২৬ সালে থেরেসার মস্তকে, বক্ষে, হস্ত ও পদদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে* তিনি তাঁর নিজশরীরে যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা ও ক্লেশ ভোগ করে আসছেন।

(৫) থেরেসার কেবলমাত্র তাঁর নিজগ্রামের সরল জার্মানভাষা জানা ছিল, কিন্তু প্রতি শুক্রবারে তাঁর "ভর" হবার সময় তিনি এমন সব কথা উচ্চারণ করেন, যা পণ্ডিতেরা প্রাচীন অ্যারামেয়িক বলে নির্ধারিত করেছেন। তাঁর "ভরে"র সময় তিনি হিব্রু বা গ্রীক ভাষাতেও কথা বলেন।

(৬) গির্জার কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে থেরেসাকে বারকতক কঠিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাধীনে রাখা হয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট জার্মান সংবাদপত্রের সম্পাদক, ডাক্তার ফ্রিংস গের্লিক কোনার্সরয়েথে গেলেন ক্যাথলিক বুজরুকি ফাঁসিয়ে দিতে—ফিরে এসে লিখলেন তাঁর এক শ্রদ্ধাপূর্ণ জীবনকাহিনী।†

কি পূর্ব কি পশ্চিম, সাধুদর্শনের জন্যে আমি সর্বদাই লালায়িত। ১৬ই জুলাই তারিখে আমাদের ছোট্টদলটি কোনার্সরয়েথের সেই অদ্ভুত গ্রামটিতে প্রবেশ করতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলুম। ব্যাভেরিয়ার চাষীরা আমাদের ফোর্ড গাড়ী (অ্যামেরিকা হতে আমাদের সঙ্গে আনা) আর তাতে আমাদের এই বিচিত্র দলটি—একটি মার্কিন যুবাপুরুষ, একটি বয়স্কা মহিলা আর একটি শ্যামবর্ণের প্রাচ্যদেশবাসী, যার স্কন্ধবিলম্বিত কেশগুচ্ছ কোটের কলারের ভিতর লুকায়িত—দেখে খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠল।

থেরেসার ছোট্ট কুটিরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুরান ধরণের একটি কুয়োর ধারে জিরেনিয়াম ফুল ফুটে রয়েছে—কিন্তু হায়, নেমে দেখি যে তা বন্ধ, একেবারে নিস্তব্ধ। প্রতিবেশীরা, এমন কি সেইখান দিয়ে তখন ডাকপিওন

* যুদ্ধের বৎসর হতে থেরেসা আর প্রতি শুক্রবারে "প্যাশন" অর্থাৎ উপরোক্ত ঐতিহাসিক মৃত্যুক্লেশ অনুভব করেন নি। কেবল বৎসরের কয়েকটি পুণ্য দিবসে তা সংঘটিত হয়।

† থেরেসার জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য বই হচ্ছে, "থেরেসা নোয়ম্যান"—বর্তমানকালের ষ্টিগম্যাটিষ্ট আর "থেরেসা নোয়ম্যানের আরও গল্প", দুইই ফ্রেডরিক রিটার ফন্ লামা কর্তৃক লিখিত; আর একটি হচ্ছে এ. পি শিম্বার্গ কর্তৃক লিখিত "থেরেসা নোয়ম্যানের গল্প" (১৯৪৭)। মিলওয়াকী হতে ব্রুস পাবলিশিং কোম্পানী এই তিনটি বইই প্রকাশ করেছেন। এছাড়া আর একটি বই হোল—'থেরেসা নোয়ম্যান' লেখক জোহানেস্ ষ্টেনার। প্রকাশক—অ্যালবা হাউস, ষ্ট্যাটেন্ আইল্যাণ্ড, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা।

যে যাচ্ছিল সেও তাঁর বিষয়ে কিছুই খবর দিতে পারলে না। বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। সঙ্গীরা সব বললে—ফেরা যাক্।

আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললুম, "যতক্ষণ না আমি থেরেসার কোন সন্ধান পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব।"

ঘণ্টা দুই কেটে গেল—তখনও আমরা বৃষ্টির মধ্যে সেই গাড়ীর ভিতর বসে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভগবানের কাছে নালিশ জানালুম,—"ভগবান্, থেরেসা যদি অন্তর্ধানই করলেন, তবে তুমি তাঁর কাছে আমায় এনে ফেললে কেন?"

কাছে এসে একটি লোক দাঁড়াল—লোকটা ইংরেজী জানত। জিজ্ঞাসা করলে যে, সে কিছু সাহায্য করতে পারে কি না।

সে বললে, "থেরেসা কোথায় তা অবশ্য আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে প্রফেসর ফ্রানজ্ ওয়াংসের বাড়ী যান—তিনি হচ্ছেন আইখষ্ট্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষার শিক্ষক--জায়গাটা এখান হতে আশী মাইল হবে।" তারপরদিন সকাল বেলা আবার আমাদের দলটি আইখষ্ট্যাটের শান্ত গ্রামটিতে গিয়ে উপস্থিত হল। ডাক্তার ওয়াংস তাঁর বাড়ীতে আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বললেন, "হ্যাঁ, থেরেসা এখন এখানেই আছেন।" বলে তিনি এই সব দর্শনপ্রার্থীদের কথা তাঁকে বলে পাঠালেন। তাঁর উত্তর নিয়ে একটি লোক শীঘ্রই নীচে নেমে এল। তাতে লেখা ছিল, "যদিও বিশপ তাঁর অনুমতি বিনা আমায় কারুর সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন, তবুও আমি ভারতবর্ষের এই সাধুটির সঙ্গে দেখা করব।"

তাঁর কথাগুলিতে মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। ডাক্তার ওয়াংসের সঙ্গে উপরতলায় বসবার ঘরে গেলুম। থেরেসাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পুণ্যদেহ হতে একটা যেন শান্তি আর আনন্দের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। পরিধানে ছিল একটা কাল গাউন আর অতি শুভ্র শ্বেতবর্ণের মস্তকাবরণ। এই সময়ে তাঁর সাইত্রিশবছর বয়স হলেও দেখতে তিনি যেন আরও নবীন, শিশুর সৌকুমার্য আর লাবণ্যে ভরা। সুগঠিত আকৃতি স্বাস্থ্যপূর্ণ—কপোলদেশে রক্তিম আভা, প্রফুল্লবদন এই সেই সাধ্বী যিনি অনাহারে থাকেন।

থেরেসা আমার সঙ্গে অতিমৃদু করমর্দনে আমায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। নীরবে উভয়েই উভয়কে ঈশ্বরপ্রেমিক জেনে আমাদের উভয়েরই মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল।

ডাক্তার ওয়াৎস দয়া করে বললেন যে তিনি আমাদের দোভাষীর কাজ করবেন। সকলে উপবেশন করতে দেখা গেল যে থেরেসা অবিমিশ্র কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছেন—স্পষ্টতঃই বোঝা গেল যে ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে ভারতীয় হিন্দু নিতান্তই দুর্লভদর্শন।

তাঁর নিজের মুখ থেকে উত্তরটা শোনবার আশায় আমি প্রশ্ন করলুম, "আপনি কি কিছুই খান না ?"

"না, কেবলমাত্র একটি হোস্ট* ছাড়া—তাও সকাল ছটার সময় একবার-মাত্র খাই।"

"রুটিটি কত বড় ?"

"কাগজের মতন পাতলা আর একটি ছোট টাকার মত। আমি এটা গ্রহণ করি—পবিত্র অনুষ্ঠানপালনেরই জন্য। যদি এ প্রসাদী না হয়, তাহলে আমি তা আর গিলতে পারি না।"

"তাতে করে তো আপনি আর এই এতদিন বারবছর ধরে বেঁচে থাকতে পারেন না।"

তাঁর উত্তর এল অত্যন্ত সরল আর আইনস্টাইনীয় ভঙ্গিতে—"আমি ঈশ্বরের জ্যোতিঃতেই বেঁচে আছি।"

"তাহলে দেখছি যে আপনি ঈশ্বর, আলো আর বায়ু থেকেই আপনার শরীরের জন্য শক্তি ও পুষ্টি সঞ্চয় করেন।"

তাঁর মুখের উপর একটা মৃদুহাসির ঝিলিক খেলে গেল। বললেন, "কেমন করে বেঁচে আছি তা যে আপনি বুঝতে পেরেছেন জেনে, আমি ভারী খুশী হলুম।"

"যীশুখ্রিস্ট যে মহাসত্য উচ্চারণ করে বলে গেছেন যে, 'মানুষ কেবলমাত্র শুধু অন্নতেই জীবনধারণ করবে তা নয়, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত তাঁর প্রত্যেক বাণীর দ্বারাই সে তার জীবনধারণ করবে।'** এ কথার সত্যতার দৈনন্দিন জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে আপনার পুণ্যময় জীবন।"

---

* ইউক্যারিস্টিক (যীশুর নৈশ ভোজন পর্ব) ময়দায় পাতলা প্রসাদী রুটি।

** ম্যাথিউ—৪:৪ (বাইবেল)। মানুষের দেহরূপ ব্যাটারি যে কেবলমাত্র জড় অন্নেতেই পরিপুষ্টি লাভ করে তা নয়। তা করে স্পন্দনশীল বিশ্বশক্তি বলে (শব্দব্রহ্ম বা প্রণব ওঙ্কার)। মেরুশীর্ষক (সহস্রদল পদ্ম) দ্বারের ভিতর দিয়ে এই অদৃশ্য মহাশক্তি মানবশরীরে সঞ্চারিত হয়। ঘাড়ের পিছনে মেরুদণ্ডস্থিত পাঁচটী চক্রের (জীবনীশক্তি বিকিরণের কেন্দ্র) উপর এই ষষ্ঠচক্রটী অবস্থিত।

আমার ব্যাখ্যায় তিনি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "বাস্তবিকই তাই। এ জগতে আমার বেঁচে থাকার একটি কারণ হচ্ছে যে শুধু অন্নদ্বারা নয়, ঈশ্বরের অদৃশ্য আলোকেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে তা প্রমাণ করা।"

"আচ্ছা, কি করে মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা আপনি তাদের শিখিয়ে দিতে পারেন কি?"

মনে হল একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন—বললেন, "আমি তো তা পারি না, ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়।"

তাঁর বলিষ্ঠ অথচ কমনীয় দু'টি হস্তের উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই থেরেসা তাঁর উভয় করপৃষ্ঠে একটি করে ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ সদ্য আরোগ্যপ্রাপ্ত ক্ষতচিহ্ন প্রদর্শন করলেন। প্রত্যেক করতলে তিনি দেখালেন যে আরও এক ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষতচিহ্ন—সবেমাত্র শুকিয়েছে। প্রত্যেক ক্ষতচিহ্ন হাতের চেটোর মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমার স্পষ্ট মনে পড়ল যে বড় বড় চৌকা লোহার পেরেকের তলাগুলো চাঁদের ফালির মত, এখনও তা পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমি সে সব পশ্চিমে ব্যবহৃত হতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

তারপর থেরেসা নোয়ম্যান তাঁর সাপ্তাহিক "ভরে"র কথা কিছু বলে বললেন, "অসহায় দর্শকের মত আমি যীশুখ্রিস্টের মরণদৃশ্যের সবটাই প্রত্যক্ষ করি।" প্রতি বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্র থেকে শুক্রবার বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর ক্ষতস্থানগুলির মুখ খুলে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সাধারণতঃ তাঁর দেহের ওজন ১২১ পাউন্ড, তা থেকে দশ পাউন্ড তখন কমে যায়। তাঁর এই গভীর ঈশ্বরপ্রেমে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেও থেরেসা তাঁর প্রভু যীশু খ্রিস্টের সাপ্তাহিক দর্শনলাভের আশায় সানন্দে অপেক্ষা করেন।

এই মেরুশীর্ষকই হচ্ছে শরীরের মধ্যে বিশ্বপ্রাণশক্তি (প্রণব) সঞ্চারের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং তা দুই ভ্রূমধ্যস্থ তৃতীয়নেত্রস্থিত খ্রিস্টচৈতন্য কেন্দ্রের (কূটস্থ চৈতন্য), যা মানবের ইচ্ছাশক্তির আধার, তার সঙ্গে মেরুপ্রবণতা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন। অতএব এই মহাব্যোমশক্তি সপ্তম চক্র মস্তিষ্কের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার আধারস্বরূপে সঞ্চিত থাকে—(বেদে এ "ব্রহ্মজ্যোতিঃর সহস্রদলকমল" রূপে উল্লিখিত)। বাইবেলের লেখকগণ যখন "শব্দ" অথবা "আমেন" কিম্বা "পবিত্রাত্মা" বলে উল্লেখ করেন, তখন তা ওংকার অথবা শব্দব্রহ্মকে অদৃশ্য প্রাণশক্তি অর্থেই ব্যবহার করেন, যে ঐশী বলে এ নিখিল সৃষ্টি বিধৃত হয়ে আছে। "কি? তুমি কি জান না যে তোমার দেহ হচ্ছে তোমার মধ্যে অবস্থিত 'পবিত্রাত্মার' মন্দির যা তুমি ঈশ্বরের কাছ হতে লাভ করেছ, আর তুমি তোমার নিজের কিছু নও?"—১ করিন্থিয়ান ৬:১৯ (বাইবেল)।

আমি তখনই বুঝলুম যে তাঁর এ অদ্ভুত জীবনের উদ্দেশ্য সকল খ্রিস্টানদের কাছে নূতন টেস্টামেন্টে বর্ণিত যীশুখ্রিস্টের জীবন ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা, আর সেই গ্যালিলীয় গুরু ও তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধন নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

তারপর প্রফেসর ওয়াংস সেই সাধ্বীমহিলার বিষয়ে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করলেন।

তিনি বললেন, "আমাদের মধ্যে জনকতক—তার মধ্যে থেরেসাও থাকেন, সারা জার্মানীর ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন ধরে নানাস্থান দেখবার জন্যে প্রায়ই বেড়াতে বার হই। তখন এক বিসদৃশ্য ব্যাপার ঘটে। আমরা যখন দিনের মাথায় তিনবার করে বেশ পরিপাটিরূপে ভোজনক্রিয়াটি সম্পন্ন করি—থেরেসা তখন বিন্দুমাত্র জলও গ্রহণ করেন না। দেশ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা যখন ভ্রমণক্লান্ত, শ্রান্ত, বিশ্রাম খুঁজি—থেরেসার সেসময় কিন্তু বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি নাই, তখনও তিনি সদ্যফোটা একটি গোলাপফুলেরই মত তাজা। ক্ষিধেয় পেট জ্বলতে শুরু করলে আমরা যখন রাস্তার ধারে সরাইখানা ঢুঁড়ে মরি, থেরেসা মহা আনন্দে কেবল হাঁসেন।"

প্রফেসর সাহেব তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আরও কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার বললেন। তিনি বললেন, থেরেসা কোনও প্রকার আহার্য গ্রহণ না করাতে, তাঁর পাকস্থলী কুঞ্চিত হয়ে গেছে। তাঁর মলমূত্র ত্যাগ হয় না—কিন্তু তাঁর ঘর্মগ্রন্থির ক্রিয়া সব ঠিকই আছে। চর্ম তাঁর সর্বদাই কোমল অথচ দৃঢ়।

বিদায়গ্রহণকালে আমি থেরেসাকে তাঁর "ভর" হবার সময় উপস্থিত থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম।

তিনি সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন, "তা বেশ, কোনার্সরয়েথে আসুন না কেন—আসছে শুক্রবারে। বিশপের কাছ থেকে অনুমতিপত্র পাবেন। আমায় আইখ্‌ষ্ট্যাটে খুঁজতে গিয়েছিলেন শুনে আমি ভারি খুশী হয়েছি।"

বহুবার মৃদুভাবে করমর্দন করে থেরেসা আমাদের দলটিকে এগিয়ে দিতে গেটের কাছ পর্যন্ত এলেন। রাইটসাহেব মোটরগাড়ীর রেডিওটি খুলে দিতেই থেরেসা সহাস্যকৌতূহলে যন্ত্রটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময় উপস্থিত ছোকরাদের দল এত বেজায় ভারি হয়ে উঠল যে থেরেসাকে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়তে হল। আমরা গাড়ী ছেড়ে দিলুম—দেখি যে থেরেসা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে উঁকি মারছেন আর ছোট শিশুদের মত আমাদের দিকে হাত নাড়ছেন।

থেরেসার দুটি ভাই, ভারি অমায়িক আর তাদের ব্যবহারও অতি মধুর,—তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে জানতে পারলুম যে থেরেসা মাত্র এক বা দুই-ঘণ্টাটাক রাত্রিতে ঘুমান। তাঁর শরীরে বহু ক্ষতচিহ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি বেশ কার্যক্ষম আর উৎসাহদীপ্ত। পাখী খুব ভালবাসেন, মাছের অ্যাকুইরিয়াম আছে—তার দেখাশোনা করেন, আর বাগানে উদ্যানচর্যাতেই তাঁর বহুসময় কাটে ; চিঠিপত্র লেখালিখিও তাঁকে খুব করতে হয়। ক্যাথলিক ভক্তেরা তাঁকে প্রার্থনা আর রোগনিরাময়ের জন্য লেখেন। বহু ভক্ত তাঁর দ্বারা গুরুতর ব্যাধি হতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছেন।

তাঁর এক ভাই ফার্ডিনান্ড—বয়স তেইশবছর, তার সঙ্গে আলাপ হল। আমায় বললেন—প্রার্থনার বলে অপরের রোগের ভোগ নিজশরীরে ক্ষয় করে নেবার শক্তি থেরেসার আছে। থেরেসা আহার ত্যাগ করতে শুরু করলেন যখন তাঁদের গির্জায় একটি যুবক পাদ্রী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ; সেই সময়ে তিনি প্রার্থনা করেন যে সেই যুবকের গলার ব্যাধি যেন তাঁর নিজের গলায় প্রবিষ্ট হয়।

বৃহস্পতিবার বৈকালে আমাদের দলটি বিশপের বাড়ী গিয়ে পেঁছল ; বিশপ মহাশয় তো আমার লম্বা চুল দেখে বেশ বিস্মিত হলেন। যাই হোক্, তিনি সত্বরই অনুমতিপত্রটি লিখে আমাদের হাতে দিলেন। অবশ্য তার জন্যে আমায় কোনরকম ফি দিতে হয় নি। চার্চের এই নিয়মটি হয়েছিল অলস কৌতূহলী পর্যটকদের ভিড়ের হাত থেকে থেরেসাকে বাঁচাবার জন্য। আগের আগের বছরে তারা প্রতি শুক্রবারে হাজারে হাজারে এসে জুটত।

শুক্রবার কোনার্সরয়েথে এসে পেঁছলুম বেলা সাড়ে নটায়। দেখা গেল থেরেসার ক্ষুদ্র কুটিরটির একটা বিশেষ অংশে কাঁচের ছাদ দেওয়া আছে—যাতে প্রচুর আলো আসতে পারে। দেখে আনন্দ হল যে এবার আর দরজাগুলো সব বন্ধ নয়—সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সংপূর্ণভাবে উন্মুক্ত। প্রায় জনকুড়িক দর্শক সেখানে উপস্থিত, সবাইকার হাতে একটি করে পারমিট বা অনুমতিপত্র ; আমরাও সেই দলে ভিড়ে গেলুম। অনেকেই সেই অদ্ভুত "ভক্ত" দেখবার জন্যে বহু দূরদেশ থেকে এসেছেন।

থেরেসা আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সেই প্রফেসরের বাড়ীতে। আমি যে তাঁকে আধ্যাত্মিক কারণে দেখতে এসেছি—কেবলমাত্র অলস কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে নয়, তা তিনি অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

আমার দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়েছিল এই রকম। উপরতলায় তাঁর ঘরে যাবার পূর্বে আমি যোগনিদ্রায় মগ্ন হলুম, উদ্দেশ্য ছিল দূরদর্শন আর দূরশ্রবণবিষয়ে

তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। তাঁর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম, দেখি তা দর্শকে পরিপূর্ণ ; শয্যার উপর একটি শ্বেতবসনে আবৃত হয়ে থেরেসা শয়ন করে আছেন। রাইট সাহেবও পিছনে পিছনে আসছিল। আমি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই একটা অদ্ভুত আর অতি ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

থেরেসার নীচের চোখের পাতা থেকে প্রায় একইঞ্চি পরিমাণ চওড়া একটি রক্তস্রোত পাতলাভাবে অনবরত বইছে। তাঁর ঊর্ধ্বদৃষ্টি ভ্রূমধ্যস্থ তৃতীয়নেত্রের দিকে নিবদ্ধ। তাঁর মাথায় যে কাপড় জড়ান ছিল, তা কাঁটার মুকুটের ক্ষতস্থান হতে নিঃসৃত রক্তে প্লাবিত হয়ে গেছে। তাঁর বুকের উপরকার শ্বেতবস্ত্র তাঁর পাঁজরার ক্ষতস্থান হতে ঝরা রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক যে জায়গায় যীশুখ্রিস্ট বহুযুগপূর্বে সৈনিকের বর্শাফলকের দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই রক্ত ঝরে পড়ছে।

থেরেসার হস্তদুটি জননীর স্নেহকরুণায় প্রসারিত…অনুনয়ে বিন্যস্ত, আননে যুগপৎ যন্ত্রণা ও ক্লেশের ছায়া আর স্বর্গীয় আভা। দেখে বোধ হল শরীরটি পূর্বাপেক্ষা একটু যেন পাতলাগোছের হয়ে গেছে আর অন্তর ও বাহির বহু দিক দিয়েই তাঁর সূক্ষ্ম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আপনমনে বিড়বিড় করে কি একটা বিদেশীভাষায় কথা কইতে কইতে তাঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছে—বোধ হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে যে সব ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদেরই সঙ্গে কথা কইছিলেন।

তাঁর মনের সঙ্গে তখন আমার যোগসূত্র স্থাপন করা হয়ে গেছে। আমিও তাঁর স্বপ্নের সব দৃশ্যই দেখতে পেলুম। যীশুখ্রিস্ট যখন বিদ্রূপকারী জনতার মধ্য দিয়ে ক্রুশের কাঠ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনকার সব দৃশ্য থেরেসা দেখছিলেন।* হঠাৎ তিনি ধড়মড় করে মাথা উঁচু করে তুলে ধরলেন…কাঠের ভারের চাপে যীশুখ্রিস্টের পতন ঘটল, দৃশ্যটিও অন্তর্হিত হল। উদগ্র অনুভূতিতে ক্লান্ত হয়ে থেরেসা বালিশের উপর গভীরভাবে মাথা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

*আমার সেখানে উপস্থিত হবার পূর্বেই মহাপ্রভু যীশুখ্রিস্টের শেষজীবনের কতকগুলি ঘটনার স্বপ্নদর্শন থেরেসার ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। সাধারণতঃ তাঁর "ভর" আরম্ভ হয় যীশুখ্রিস্টের "শেষ সান্ধ্যভোজে"র পরবর্তী কতকগুলি ঘটনার দৃশ্য হতে আর তাঁর স্বপ্নদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুর ক্রুশের উপর-মৃত্যু অথবা কখনও কখনও তাঁর সমাধির সঙ্গে সঙ্গে।

ঠিক এইসময়ে আমি আমার পিছনেই যেন মানুষ পড়ে যাবার মত দড়াম করে একটা ভারি পতনের শব্দ শুনতে পেলুম। মুহূর্তের জন্যে মাথা ফিরিয়ে দেখি যে দুটি লোক একটি শায়িত দেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সময় আমার গভীর যোগনিদ্রার ঘোর তখনও কাটেনি বলে লোকটি যে কে, তা তখুনিই ঠিক চিনতে পারলুম না। আবার থেরেসার মুখের উপর আমার দৃষ্টি স্থাপিত করলুম...রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে বলে সে মুখ মৃত্যু-পাণ্ডুর, বিবর্ণ, কিন্তু তা থেকে একটা পবিত্র স্বর্গীয় আভা বেরুচ্ছে। তারপরে আমি পিছন ফিরে দেখি যে রাইটসাহেব গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গাল দিয়ে রক্ত ঝরছে।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "ডিক, তুমিই কি পড়ে গিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এ ভীষণদৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মূর্চ্ছা গিয়েছিলুম।"

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "যাক্, তোমার সাহস আছে দেখছি—ফিরে এসে আবার এ দৃশ্য দেখতে এসেছ !"

বহু দর্শকেরা তখন নীচে নীরবে অপেক্ষা করছে স্মরণ করে মিষ্টার রাইট আর আমি থেরেসার কাছ থেকে নীরবে বিদায়গ্রহণান্তে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য ত্যাগ করে অগ্রসর হলুম।*

তার পরদিন আমাদের ক্ষুদ্র দলটি মোটরে করে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হল। একটা সুবিধা ছিল যে আমাদের ট্রেনের উপর নির্ভর করতে হয় নি—গ্রামের ধারে যেখানে যখন ইচ্ছা আমাদের ফোর্ডগাড়ী থামিয়ে সব দেখতে শুনতে পেরেছি। জার্মানী, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের আল্‌প্‌স্ প্রভৃতি ভ্রমণের সময় প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি ; ইটালির মধ্যে অ্যাসিসিতে বিনয়ের অবতার সেণ্ট ফ্রান্সিসকে দর্শন করবার জন্যে আমরা যাই। ইউরোপ-ভ্রমণ আমাদের শেষ হল গ্রীসে এসে। এখানে আমরা এথিনিয়ান মন্দির আর

* ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জার্মানী থেকে যুদ্ধোত্তর আই. এন. এস প্রেরিত সংবাদে প্রকাশিত, "এবারে গুডফ্রাইডে'র দিন একটি জার্মান কৃষকরমণীকে দেখা গেল যে, সে তার শয্যায় শায়িতা, তার মাথা, হাত আর কাঁধ দুটিতে রক্তচিহ্ন, যীশুখৃস্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার আর কণ্টকমুকুট ধারণ করবার পর কাঁটার আর পেরেকের যে যে স্থানে ক্ষতচিহ্ন হতে রক্ত ঝরেছিল, ঠিক সেই সেই স্থান হতে রক্ত ঝরছে। ভীতিবিমূঢ় সহস্র সহস্র জার্মান ও অ্যামেরিকান থেরেসা নোয়্যম্যানের কুটিরশয্যার পাশ দিয়ে তাঁকে দর্শন করে একে একে অগ্রসর হচ্ছিল।" (এই বিখ্যাত ক্ষতাংকধারিণী ১৯৬২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কোনার্স-রিউথ-এ পরলোক গমন করেন)।

যে কারাগারে সক্রেটিস* বিষপান করেছিলেন সেই কারাগার দর্শন করলুম। গ্রীকরা যেভাবে দেশের সর্বত্র তাদের কল্পনাকে এ্যালাবাষ্টারে রূপায়িত করে তুলেছে, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়।

তারপর রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল ভূমধ্যসাগরে এসে জাহাজ ধরলুম, নামলুম প্যালেষ্টাইনে। দিনের পর দিন সেই পুণ্যভূমিতে বিচরণ করে মনে বুঝলুম যে তীর্থভ্রমণের মূল্য কি! প্যালেষ্টাইনে যীশুখ্রিস্টের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মনে হল আমি বেথেলহেম, গেথসিমেন, ক্যালভেরি, পবিত্র মাউণ্ট অফ অলিভস্, জর্ডন নদী, গ্যালিলীর সমুদ্র, সবই তাঁর পাশে পাশে ভক্তিপ্লুতহৃদয়ে দেখতে দেখতে বেড়িয়ে চলেছি।

আমাদের ছোট্টদলটি নিয়ে তাঁর জন্মস্থান "অশ্বের ভোজনপাত্র," জোসেফের কাঠের কারখানা, ল্যাজারাসের কবর, মার্থা ও মেরীদের বাড়ী, শেষভোজের হলঘরটি সব দেখে বেড়ালুম। প্রাচীনকালের অন্ধ কারা হতে উদ্ঘাটিত দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখলুম যীশুখ্রিস্ট যুগযুগান্তরের জন্য যে সব স্বর্গীয় নাটক অভিনয় করে গেছেন।

মিশরে প্রবেশ করলুম, দেখলুম এর আধুনিক শহর কাইরো আর তার প্রাচীন পিরামিড। এরপরে লোহিত সমুদ্র দিয়ে আমাদের জাহাজ আরব সমুদ্রে গিয়ে পড়ল, তারপরেই ঐসেই ভারতবর্ষ!

* ইউসেবিয়াসের এক পংক্তিতে সক্রেটিস এবং একটি হিন্দুঋষির মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তর্কযুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে। পংক্তিটিতে লিখিত আছে, "সঙ্গীত-বিশারদ এরিস্টোজেনাস ভারতীয়দের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি বলেন: এঁদের মধ্যে একজন এথেন্স নগরীতে সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর দর্শনের বিষয় কি। সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান।' এই উত্তরে ভারতবাসীটি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে বললেন, 'মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে মানুষ কি করবে যখন সে দৈবব্যাপারের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ।"

গ্রীক আদর্শ, যা পাশ্চাত্যদর্শনে প্রতিবিম্বিত, তা হচ্ছে "মানব, নিজেকে জান।" একজন হিন্দু বলবে, "মানব, তোমার স্ব-রূপকে অবগত হও।" ভারতবাসীর চক্ষে ডেকার্টের বিখ্যাত নীতিসূত্র "আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি," দার্শনিকভাবে তত্ত্বসহ নয়। বিচারশক্তি মানবের চরম অস্তিত্বের উপর আলোকপাত করতে পারে না। মানবমন, বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির মত—যার সঙ্গে এ পরিচিত—চিরপরিবর্তনশীল, তা কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য নয়। ঈশ্বরানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই হচ্ছেন নিত্যসত্যে (বিদ্যা)র প্রকৃত উপাসক; আর সবই অবিদ্যা—আপেক্ষিক জ্ঞান।

৪০শ পরিচ্ছেদ

আমার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন

আমার ভারতবর্ষ। আজ আমি ভারতবর্ষের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। সকৃতজ্ঞভাবে ভারতের পুণ্যবায়ুতে আবার নিঃশ্বাস টেনে নিলুম—বুক যেন ভরে গেল।

১৯৩৫ সালের ২২শে আগষ্ট আমাদের 'রাজপুতানা' নামে বড় জাহাজখানা বোম্বাই শহরের প্রকাণ্ড ডকে এসে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নেমে প্রথমদিনেই টের পেলুম যে সামনের একটি বছর আমায় কি রকম অবিরাম কর্মস্রোতের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। বন্ধুরা সব ফুলের মালা নিয়ে বন্দরে অভ্যর্থনার জন্যে এসেছেন। তাজমহল হোটেলে গিয়ে উঠলুম—শীগগিরই রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারদের ভিড় লেগে গেল।

বোম্বাই শহরটা আমার কাছে নতুনই লাগল; দেখলুম অতি আধুনিক পশ্চিমের অনেক নতুন উন্নতির আমদানি সেখানে হয়েছে। প্রশস্ত রাজপথের দুধারে পামগাছের সারি; বিরাট সৌধশ্রেণী প্রাচীন মন্দিরগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। যাই হোক, শহর দেখার সময় খুব অল্পই পাওয়া গেল; আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধীর আগ্রহে মন তখন ব্যাকুল। ফোর্ড গাড়ীটাকে মালগাড়ীতে চালান করে দিয়ে আমরা কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম।*

হাওড়া ষ্টেশনে পেঁছে দেখি যে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসে এতবড় বিরাট জনতার সৃষ্টি হয়েছে যে, খানিকক্ষণ আমরা ট্রেন থেকে নামতেই পারলুম না। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ থেকে কাশিমবাজারের তরুণ মহারাজা আর আমার ভাই বিষ্ণু অগ্রসর হয়ে এল। অভ্যর্থনার বিরাটত্ব আর আন্তরিকতার জন্যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম।

আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে মিস্ ব্লেচ, মিষ্টার রাইট আর আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলুম। আমাদের গাড়ীর সামনে একটি

* মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীকে দর্শনের জন্য আমরা মধ্যপথে যাত্রাভঙ্গ করি। সেখানকার কথা সব ৪৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

শোভাযাত্রাও ছিল, তাতে ছিল মোটরগাড়ী আর মোটর সাইকেলের সারি ; ঢাক আর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে আনন্দকোলাহল করতে করতে শোভাযাত্রাটি ঠিক আমাদের গাড়ীর পুরোভাগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

বৃদ্ধ পিতা আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে আমায় আলিঙ্গন করলেন, যেন পুনর্জন্ম লাভ করে ফিরে এসেছি। আনন্দে আমরা উভয়েই নির্বাক—পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইলুম ; ভাই, বোন, খুড়ো, খুড়ী, খুড়তুতো ভাইয়েরা, ছাত্র, বহুদিনের বন্ধুরা—সকলেই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালেন, আমাদের ভিতর কারুরই চক্ষু তখন শুষ্ক ছিল না। স্মৃতির মণিকোঠায় লুকিয়ে থাকলেও পুনর্মিলনের সে সব স্নেহের দৃশ্য এখনও মনে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট, তা কি জীবনে কখনও ভুলতে পারি ? শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্য বর্ণনা করতে গেলে আমি ভাষা খুঁজে পাই না ; আমার সেক্রেটারীর লেখা নীচের এই বর্ণনাটি দিলেই যথেষ্ট হবে।

মিস্টার রাইট তাঁর ভ্রমণের দিনলিপিতে লিখেছেন, "কি অসীম আগ্রহ আর আশা নিয়ে আজ আমি যোগানন্দজীকে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে গাড়ীতে নিয়ে গেলুম। রাস্তার দুধারে বিচিত্রবর্ণের দোকানের সারি—তাদের মধ্যে একটি ছিল যোগানন্দজীর কলেজ জীবনের প্রিয় আহারস্থান—তা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলুম একটি সরু গলিতে, তার দুধারে দেওয়াল। হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরতেই গুরুদেবের দোতলা আশ্রমবাড়ীটি চোখে পড়ে গেল—দেখে মনে প্রেরণা জাগে ; এর লোহার জাফরি দেওয়া বারান্দা উপরের দোতলা থেকে রাস্তার দিকে বেরিয়ে এসেছে। মনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় শান্তিময় নির্জনতার ছাপ এসে পড়ল।

"গভীর ভক্তিনতহৃদয়ে আমি যোগানন্দজীর পিছন পিছন গিয়ে আশ্রমের উঠানেতে প্রবেশ করলুম। হৃৎপিণ্ড দ্রুত আলোড়িত হচ্ছে ; আমরা উভয়ে পুরান সিমেণ্টের সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে উঠলুম,—এই সেই সিঁড়ি যে পথে বহু সত্যান্বেষী বহুবারই যাতায়াত করেছেন। উপরে উঠতে উঠতে মনের চাঞ্চল্য ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। আমাদের সামনে সিঁড়ির মাথায় নীরবে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি—প্রশান্তবদন, সৌম্যমূর্তি, প্রাচীন ঋষির দৃপ্ত মহিমায়। তাঁর মহান্ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার অপরিসীম সৌভাগ্যলাভে আমার অন্তঃকরণ ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল—আমি দেখলুম যে যোগানন্দজী নতজানু হয়ে অবনতমস্তকে গুরুর চরণকমল হস্তদ্বারা স্পর্শ করে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাদের বন্দনা করলেন, তারপর তাতে মস্তক স্পর্শ করিয়ে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করলেন। উঠে

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁকে বক্ষের উভয় পার্শ্বে স্নেহভরে ধারণ করে আলিঙ্গন করলেন।

"প্রথমে কোন কথাই বেরোল না, কিন্তু মনের গভীর ভাব অন্তরের নীরব বাণীতেই পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হল। তাঁদের আত্মার পুনর্মিলনের আনন্দের প্রগাঢ়তায় তাঁদের উভয়েরই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই নীরব বারান্দার মধ্যে এক স্নিগ্ধকোমল মধুরভাবের স্পন্দন—সূর্যও তখন হঠাৎ মেঘ থেকে বেরিয়ে পড়ে যেন জ্যোতিঃর প্লাবনে ভাসিয়ে দিলে!

"নতজানু হয়ে তাঁর পুরুষ চরণযুগল স্পর্শ করে আমি পরমগুরুদেবকে আমার অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নীরব ভাষায় নিবেদন করলুম। তিনিও আমায় আশীর্বাদ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলুম, গভীর দুটি সুন্দর কালো চক্ষু অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত, আনন্দে উজ্জ্বল। তারপর তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা বসলুম; এর সারা পশ্চিম ধারটাতেই বারান্দা, যেটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। পরমগুরুদেব একটা পুরান সোফায় ঠেসান দিয়ে সিমেন্টের মেঝের উপর একটা গদির আসনে বসলেন। যোগানন্দজী আর আমি পরমগুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে উপবেশন করলুম! মাদুরের উপর ঠেসান দিয়ে আরামে বসবার জন্যে গেরুয়ারঙের গোটাকতক গির্দাও ছিল।

"দুই স্বামীজীর মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগল বাংলায়, তা অনুধাবনের জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম (কারণ পরে দেখলুম যে যখন তাঁরা একসঙ্গে থাকেন তখন মোটেই ইংরেজী ব্যবহার করেন না, যদিও স্বামীজীমহারাজ—লোকে তাঁকে এই বলেই ডাকে—ইংরেজীতে বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন, আর প্রায়ই তা বলেন)। আমি কিন্তু সেই মহাপুরুষের বিরাট মহিমা উপলব্ধি করলুম—তাঁর মন কেড়েনেওয়া হাসিতে আর আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটিতে। তাঁর গভীর অথবা প্রফুল্ল সদালাপে একটা গুণ অতি সহজেই দেখা যেত যে তাঁর উক্তিতে একটা দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকত—জ্ঞানীব্যক্তির লক্ষণ, যিনি জানেন যে তিনি সত্যকে জানেন, কারণ ভগবানকে তিনি জানতে পেরেছেন। তাঁর গভীর জ্ঞান, উদ্দেশ্যের স্থিরতা আর মতের দৃঢ়তা সব রকমেই প্রকাশ পেত।

"সময়ে সময়ে তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছিলুম যে তাঁর দীর্ঘবপু, বলিষ্ঠদেহ, সংসারের পরীক্ষা আর ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। দৃপ্ত দেহভঙ্গিমা। ক্রমোচ্চ কপাল যেন স্বর্গমুখী, যা তাঁর দেবতুল্য শরীরে সর্বাগ্রেই নজরে পড়ে; নাসিকাটি ঈষৎ দীর্ঘ আর স্থূল—মাঝে মাঝে তা নিয়ে ছোট ছেলেদের মত একটু নেড়েচেড়ে হাসিতামাসা করতেন। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ঘনকৃষ্ণবর্ণ

গভীর চক্ষুদুটিতে আকাশের সুনীল দ্যুতি। মাথার মাঝখানে চেরাসিঁথি; চুল কপালের কাছে সাদা হতে হতে স্বর্ণাভ হয়ে শেষে ধূসরে পরিণত হয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ তাঁর কাঁধের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। শ্মশ্রুগুম্ফ বিরল বা ক্ষীণ হয়ে এসেছে; কিন্তু তাতেই তাঁর মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে—সে যেন তাঁর প্রকৃতির মতই একাধারে গভীর আর কোমল।

"স্ফূর্তিতে, হাঁসির উচ্ছ্বাসে তাঁর সারাশরীর কাঁপে; এই হাঁসি সত্যিই আনন্দোদ্বেলিত আর আন্তরিক, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত। মুখ আর শরীরের গঠন শক্তিমত্তার পরিচায়ক—পেশীবহুল অঙ্গুলিগুলিও দৃঢ়। উন্নতদেহে সুদৃঢ় পদক্ষেপে আভিজাত্যের লক্ষণ প্রকাশিত।

"পরিধানে তাঁর সাধারণ ধুতি আর কামিজ। একসময়ে গেরুয়ারঙে ছোপান ছিল, এখন কিন্তু একটু ফিকে হয়ে গিয়ে কমলালেবুর রঙে দাঁড়িয়েছে।

"ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম যে এই ভগ্নপ্রায় হতশ্রী ঘরের মালিকের সাংসারিক সুখের প্রতি কোন আসক্তিই নেই। সেই লম্বা ঘরটীর সাদা দেওয়ালগুলি জলবায়ুতে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তাতে মাঝে মাঝে ফিকে নীল প্লাষ্টারের দাগ দেখা দিয়েছে। ঘরের একদিকে লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিতে মালা দেওয়া রয়েছে—অনাড়ম্বর সরল ভক্তির পরিচয়। সেখানে যোগানন্দজীরও একখানি ছবি ছিল—ছবিতে তিনি বোষ্টন সহরে প্রথম এসে যখন ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেন তখন অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"দেখলুম, সেখানে আধুনিক আর প্রাচীন ভাবের এক অদ্ভুত সমাবেশ। একটা প্রকাণ্ড বেলোয়ারি কাঁচের বাতির ঝাড়, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে—ব্যবহার নেই বলে; আর দেওয়ালে একটা রঙচঙে নূতন দিনপঞ্জিকা। সারা ঘরটির ভিতর থেকে একটা সুখ ও শান্তির স্নিগ্ধ মধুর সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে। বারান্দার ওধারে দেখলুম যে বড় বড় নারকেল গাছ আশ্রমের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নীরব প্রহরায় রয়েছে।

"পরমগুরুদেব কাউকে ডাকতে হলেই কেবল একটু মৃদু হাততালি দিতেন আর তা শেষ হতে না হতেই, একজন না একজন বালকশিষ্য এসে হাজির হত তাঁর আজ্ঞাপালন করতে। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল—নাম হচ্ছে প্রফুল্ল,* ক্ষীণকায়, মাথায় কাঁধ অবধি লম্বা একরাশ চুল, একজোড়া উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ আর মুখে স্বর্গীয় হাঁসি লেগেই রয়েছে;

---

* প্রফুল্ল হচ্ছে সেই ছেলেটি যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সামনে একটা কেউটে সাপ বেরোবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। (১৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

হাসলে চোখদুটি মিটমিট করে, আর মুখের কোণদুটি একটু উপর দিকে ওঠে—যেন গোধূলিতে এক ফালি চাঁদের হঠাৎ আবির্ভাব।

"তাঁর 'সৃষ্টি' তাঁর কাছে ফিরে এসেছে দেখে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আনন্দ আজ উথলে উঠেছে (আর তাঁর 'সৃষ্টির সৃষ্টি', আমার সম্বন্ধেও তাঁর কিঞ্চিৎ কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছে তাও দেখা গেল)। সে যাই হোক্, দেখলুম যে এই মহাপুরুষের প্রকৃতিতে জ্ঞানভাবের প্রাবল্য তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশকে বাধা দেয়।

"গুরুদর্শনে গেলে শিষ্যকে কিছু ভক্তিঅর্ঘ্য নিয়ে যেতে হয়। যোগানন্দজীও তাঁকে কতকগুলি জিনিষ উপহার দিলেন। তারপর আমরা খেতে কালুম ; রান্না সাদাসিধে হলেও খেতে বেশ চমৎকারই হয়েছিল। সব পদগুলিই নিরামিষ তরকারী আর ভাতের ছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় কতকগুলি ভারতীয় প্রথার ব্যবহার, যেমন কাঁটাচামচের বদলে হাত দিয়ে খেতে দেখে খুশীই হলেন।

"ঘণ্টাকতক ধরে মাঝে মাঝে বাংলায় নানারকম আলাপ-আলোচনা, স্নিগ্ধ-হাসি আর উৎফুল্ল দৃষ্টিবিনিময়ের পর তাঁর চরণে প্রণাম করে আমরা বিদায় গ্রহণ করলুম। এবার কলকাতায় ফেরা। এই পুণ্যদর্শনের পবিত্রস্মৃতি আমার মনে চিরজাগরূক থাকবে। যদিও আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের আমার ধারণাসম্বন্ধে প্রধানতঃ লিখছি কিন্তু তাঁর সাধুজীবনের মূলভিত্তি যে আধ্যাত্মিক গৌরব, সে বিষয়ে আমি সর্বদাই সচেতন ছিলুম। তাঁর অপূর্ব শক্তি আমি অনুভব করে এসেছি, সেটাই আমি দেবতার আশীর্বাদের মত চিরতরে বহন করব।"

অ্যামেরিকা, ইউরোপ, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি নানাদেশ থেকে আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জন্যে বহু উপহার এনেছিলুম। সেগুলি তিনি সহাস্য-বদনে গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। আমার নিজের ব্যবহারের জন্য আমি জার্মানী থেকে একটা লাঠির ভিতরে ছাতা এনেছিলুম, ভারতে এসে সেটি গুরুজীকে উপহার দেবার মনস্থ করলুম।

পেয়ে বললেন, "এ জিনিষটি ভারি পছন্দসই বটে!" বলে আমার দিকে চেয়ে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন। কোনটার জন্যে কখনও কোন কিছু মন্তব্য করেন নি কিন্তু এটার কথা এবারে বিশেষভাবে বললেন। যতগুলি জিনিস দিয়েছিলুম, তার মধ্যে সেই লাঠিটি নিয়েই সকলকে দেখাতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর বাঘছাল একটা ছেঁড়া র‍্যাগের উপর পাতা দেখে বললুম, "গুরুদেব, বৈঠকখানা ঘরের জন্যে একটা নতুন কার্পেট আনাবার আমায় অনুমতি দিন।"

কোন প্রকার উৎসাহপ্রদর্শন না করেই তিনি বললেন, "এনে খুশী হও যদি তো আন গে। কেন, আমার বাঘছালটি তো বেশ পরিষ্কার আর সুন্দর— আমার এ ছোট্ট রাজ্যটুকুতে আমি তো রাজা গো। বাইরে বিশালজগৎ পড়ে রয়েছে, সেখানে বাইরের জিনিসের উপরেই লোকেদের টান থাকে বেশী, তাই সে দিকেই তাদের বেশী নজর।"

তাঁর এই কথাগুলি বলবার সময় মনে হল আবার আমি আগেকার দিনে ফিরে গেছি,—আবার আমি যেন তাঁর সেই ক্ষুদ্র শিষ্যটি, দৈনিক শাসনের ফলে অগ্নিশুদ্ধ হচ্ছি।

শ্রীরামপুর আর কলকাতা হতে কোন রকমে নিজেকে একটু একলা করতে পেরেই মিস্টার রাইটকে সঙ্গে করে রাঁচি যাত্রা করলুম। কি অভ্যর্থনা সেখানে— একটা মর্মস্পর্শী বিজয়োল্লাস। চোখদুটো আমার জলে ভরে এল যখন দেখলুম যে যাঁদের রেখে আমি অ্যামেরিকা যাত্রা করেছিলুম, সেই সব শিক্ষকেরা আমার পনেরো বছরের অনুপস্থিতির মধ্যেও বিদ্যালয়ের পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান রেখেছেন; তাদের সব আলিঙ্গন করলুম। সেখানকার আবাসিক আর দৈনিক ছাত্রদের মুখের হাসি আর আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে মনে হল যে, তাদের সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে আর যোগশিক্ষাদানের উপযোগিতার তারা সব এক একটী জ্বলন্ত উদাহরণ।

তবুও হায়, রাঁচি বিদ্যালয়ে তখন দারুণ অর্থকষ্ট চলছে। বৃদ্ধ মহারাজা, স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তখন পরলোকে। তাঁর কাশিমবাজার প্রাসাদ বিদ্যালয়গৃহে পরিণত করা হয়েছিল—আর তিনি দানও করেছিলেন প্রচুর। জনসাধারণের যথোপযুক্ত সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক বিনামূল্যে জনহিতকর সেবার অনুষ্ঠান এখন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অ্যামেরিকায় থাকতে অবশ্য তাদের কাজ চালাবার উপযোগী কার্যকরী অভিজ্ঞতা, আর বাধাবন্ধের সম্মুখে তাদের অদম্যসাহস সঞ্চয় শিক্ষা না করে আমি বৃথাই এতগুলি বছর সেখানে কাটিয়ে আসিনি। সপ্তাহখানেক ধরে আমি রাঁচিতে রইলুম—নানাজটিল প্রশ্ন, নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে। তারপরে কলকাতায় ফিরে এসে বড় বড় নেতা, আর শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ চলল, কাশিমবাজারের নূতন মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপআলোচনা, পিতার নিকট পুনরায় অর্থসাহায্যের আবেদন, তারপরেই ভগবৎকৃপায় বিদ্যালয়ের পতনোন্মুখ অর্থাবস্থা আবার সুদৃঢ় হয়ে উঠল। আমার অ্যামেরিকান শিষ্যদের কাছ থেকেও অনেক দান ঠিক সময়মত এসে পৌঁছিল।

ভারতবর্ষে আসবার মাসকতকের মধ্যেই রাঁচিবিদ্যালয় আইনতঃ রেজিস্ট্রী

হয়ে গেল দেখে ভারি আনন্দিত হলুম। চিরস্থায়ী বৃত্তির বন্দোবস্তে যোগ-উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থাপনার আমার জীবনব্যাপী স্বপ্ন আজ সার্থক হল। এই উচ্চাশাই ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে মাত্র সাতটি ছেলে নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিম্নশ্রেণীর আর ইংরেজী বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ই পড়ান হয়। সেখানকার আবাসিক আর দৈনিক ছাত্ররা কোন না কোন প্রকারের বৃত্তির শিক্ষালাভ করে।

ছেলেরা স্ব-পরিচালিত কমিটি দ্বারা তাদের অধিকাংশ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। আমার শিক্ষাব্রতী জীবনের গোড়ার দিকে আমি দেখেছিলুম যে, যেসব ছেলেরা দুষ্টুমি করে শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়ে মজা পায়, তারাই আবার তাদের সহপাঠিদের তৈরী নিয়ম মেনে ঠিকমতই চলে—আর ফাঁকিটাঁক তখন আর সেখানে তাদের চলে না। অবশ্য আমিও যে খুব একটা আদর্শ ছাত্র ছিলুম তা নয়, তবুও ছাত্রদের ছেলেমানুষি ফষ্টিনষ্টিতে আর তাদের নানা মুশকিলের ব্যাপারে তারা আমার সহানুভূতিও পেত।

খেলাধূলায় খুব উৎসাহ দেওয়া হয়; মাঠে হকি, ফুটবল প্রভৃতির চর্চা চলে। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছেলেরা প্রায়ই জিতে আসে। ইচ্ছাশক্তিবলে পেশীতে শক্তিসঞ্চালন আর মানসিকশক্তিবলে শরীরের যে কোনও অংশে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করবার যোগদা প্রণালী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের যোগাসন, তরবারি, লাঠিখেলা, জুজুৎসু প্রভৃতি সব শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসায় শিক্ষিত রাঁচির ছাত্ররা বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সঙ্কটকালে আর্তত্রাণ কার্যে প্রশংসাজনক ভাবে ক্লিষ্ট ও পীড়িত জনসাধারণের সেবা করেছে। উদ্যানচর্যায় তারা নিজেদের জন্য শাকসব্জি প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

প্রদেশস্থ আদিম অধিবাসী সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা প্রভৃতিদের হিন্দীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বালিকাদের ক্লাস-সকলও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাঁচি বিদ্যালয়ের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা। বালকেরা প্রত্যহই অধ্যাত্মতত্ত্বের চর্চা, গীতাপাঠ ইত্যাদি করে আর সরলতা, স্বার্থত্যাগ, আত্মসম্মানজ্ঞান, সত্যানুশীলন প্রভৃতির বিষয় সব উদাহরণপ্রদান আর উপদেশ-পালনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে দুঃখকষ্ট আসে সেইটা মন্দ বলে তাদের দেখিয়ে দেওয়া হয়, আর যা প্রকৃত সুখ এনে দেয় সেটাই সৎকাজ বলে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। খারাপ জিনিস, অসৎকার্য, বিষমেশান মধুর সঙ্গে

তুলনা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সব লোভনীয় বটে কিন্তু শেষে তারা মৃত্যু ঘটায়।

গাঢ় মনঃসংযোগের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের চাঞ্চল্যদমনে ছেলেদের মধ্যে খুব আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেছে। ছোট্ট একটি ন'দশ বছরের ছেলে ভ্রূমধ্যে তার দৃষ্টি স্থিরসংলগ্ন রেখে একঘণ্টা কি তারও বেশী একটানা যোগাসনে বসে আছে, এ দৃশ্য বিদ্যালয়ে দুর্লভ বা নতুন নয়।

ফল বাগানে একটি শিবমন্দির—সেখানে যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাগানের আম্রকুঞ্জে দৈনিকপ্রার্থনা আর শাস্ত্রালোচনার ক্লাস বসে।

রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ সেবাশ্রমে সহস্র সহস্র দরিদ্র ভারতীয়কে বিনা মূল্যে অস্ত্রোপচার এবং ঔষধ বিতরণ করে চিকিৎসায় সাহায্য করা হয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে রাঁচি ২000 ফিট উচ্চে; জলবায়ুও নাতিশীতোষ্ণ। প্রায় বিঘে সত্তরের বাগান, তার মধ্যে বড় একটা স্নানের পুষ্করিণী। ভারতের মধ্যে একটি চমৎকার ফলের বাগান—আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, খেজুর প্রভৃতি নিয়ে প্রায় পাঁচশ' ফলের গাছ আছে।

অতিথিদের সুবিধার জন্য অতিথিশালায় আতিথ্যসৎকারের বন্দোবস্ত আছে। রাঁচি লাইব্রেরীতে বহু সাময়িকপত্রিকা আসে আর পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেদের উপহার—প্রায় হাজারখানেক ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকও আছে। পৃথিবীর নানাধর্মশাস্ত্রের সংগ্রহও এখানে আছে। একটি সুসজ্জিত যাদুঘরে ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বিবিধ উপকরণ ও দ্রব্যাদি সাজানো আছে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশালজগতে আমার ভ্রমণের বহু নিদর্শন ও সংগৃহীত দ্রব্যাদিও এখানে বহুল পরিমাণে রক্ষিত আছে।*

শাখা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ, তাতে বসবাসের ব্যবস্থা আর রাঁচির যোগ শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানাস্থানে খোলা হয়েছে—আর সে সকল স্থানে উত্তরোত্তর উন্নতিও দ্রুত সাধিত হচ্ছে। ছেলেদের জন্যে পুরুলিয়া জেলার লক্ষ্মণপুরে যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যাপীঠ আর মেদিনীপুরের এজমালিচকে যোগদা বিদ্যালয় আর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।†

*শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী যে সকল দর্শনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন, তদনুরূপ সামগ্রী দিয়ে পাশ্চাত্য দেশে, ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসিফিক্ প্যালিসেডস্-এর লেক স্রাইনে একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়। (প্রকাশকের মন্তব্য)

† পরবর্তীকালে বালক ও বালিকাদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু যোগদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে দ্রুত উন্নতিলাভ করছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত।

১৯৩৮ সালে দক্ষিণেশ্বরে ঠিক গঙ্গার উপর যোগদা মঠ* নামে একটি প্রকাণ্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার মাইলকয়েক উত্তরে এই নূতন আশ্রমটি সহরবাসীদের পক্ষে একটি পরম রমণীয় শান্তিময় স্থান। এখানে পশ্চিমের অতিথিদের থাকবারও উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে, বিশেষতঃ তাঁদের জন্যে, যাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে জীবন উৎসর্গ করেছেন।*

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি, তার বিদ্যালয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তার কেন্দ্র ও আশ্রম সকলের হেড কোয়ার্টার হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর মঠ। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি, অ্যামেরিকার লস্ এঞ্জেলেস্ স্থিত সেল্‌ফ্-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ—এই আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টারের সহিত আইনতঃ সংযুক্ত। যোগদা সৎসঙ্গ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ইংরেজী ত্রৈমাসিক 'যোগদা ম্যাগাজিন' আর ওয়াই. এস. এস.—এস. আর. এফ.-এর উপদেশ ও পাঠগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শিক্ষার্থীদিগের নিকট পাঠান হয়। এই উপদেশগুলিতে শক্তিবিধায়ক শরীর চর্চা (Energization), মনঃসংযোগ এবং ধ্যান বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আছে। উচ্চতর ক্রিয়াযোগের উপদেশ পাবার আগে ভিত্তি রচনার জন্য এই সাধনাগুলি নিষ্ঠাসহকারে পালিত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত ছাত্রগণ উচ্চতর উপদেশ পরবর্তী পাঠমালায় পেয়ে থাকেন।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির এই সব শিক্ষাবিষয়ক আর জনহিতকর কার্যের জন্য বহু শিক্ষক আর কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে।

---

* যোগদা—যোগ + দা = যা যোগ প্রদান করে। সৎসঙ্গ—সৎ + সঙ্গ = সৎ অনুশীলন।

১৯১৬ সালে পরমহংস যোগানন্দজী যখন বিশ্বশক্তি উৎস হতে মানবশরীরে শক্তি সঞ্চারিত করবার প্রণালী আবিষ্কার করলেন, তখন "যোগদা" কথাটির সৃষ্টি। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর আশ্রম সংস্থাকে "সৎসঙ্গ" নামে অভিহিত করতেন। কাজেই শিষ্য পরমহংসজীর পক্ষে সেই নামটি রাখবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। "যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া"—একটি লভ্যাংশহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিরস্থায়ীরূপে গঠিত। উক্তনামে যোগানন্দজী তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষে সমিতিবদ্ধ করেছেন। এখন বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরের দ্বারা যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর হইতে সুদক্ষভাবে পরিচালিত। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওয়াই. এস্. এস্ ধ্যান কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

পশ্চিমে, সংস্কৃত কথাগুলির হাত এড়াবার জন্য যোগানন্দজী তাঁর আন্তর্জাতিক সংস্থা "সেল্‌ফ্-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ" নামে সমিতিবদ্ধ করেছেন। ১৯৫৫ খৃঃ হতেই শ্রীশ্রীদয়ামাতা যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি ও সেল্‌ফ্-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এই উভয়বিধ সংস্থার সভানেত্রী। (অ্যামেরিকান প্রকাশকের মন্তব্য)

সংখ্যায় তারা বহু বলে এখানে তাদের আর নামের উল্লেখ করলুম না, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমার অন্তরের মণিকোঠায় একটি করে স্নেহের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

মিষ্টার রাইটের রাঁচির ছেলেদের সঙ্গে খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সাদাসিধে একটা ধুতি পরে তিনি কিছুকাল তাদের মধ্যে বাসও করেছিলেন। রাঁচি, কলিকাতা, শ্রীরামপুর, যেখানেই সে যাক্ না কেন, ডায়েরি বার করে তার ভ্রমণের দিনলিপি সে রাখত আর সেসব বর্ণনা করতেও সে বেশ মজবুত ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তাকে একটি প্রশ্ন করে বসলুম,—

"ডিক্, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ?"

একটু চিন্তা করে সে বললে, "শান্তি ; জাতির জীবন শান্তির ছটায় উজ্জ্বল।"

৪১শ পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

"তুমিই হচ্ছ প্রথম সাহেব, ডিক্, যে এ পর্যন্ত এই তীর্থস্থানে ঢুকতে পেরেছে। আর সকলে বৃথাই চেষ্টা করে মরেছে!"

কথাগুলো শুনে মিস্টার রাইট চমকে উঠল তারপর একটু খুশীও হল। দক্ষিণ ভারতের মহীশূররাজ্যে পাহাড়ের উপর পরমরমণীয় চামুণ্ডীদেবীর মন্দির থেকে তখন আমরা বেরিয়ে আসছি। মহারাজার কুলদেবতা চামুণ্ডীদেবীর মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলুম। স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত সিংহাসনের উপর দেবী আসীন; আমরা সকলে প্রণাম করলুম।

কতকগুলি প্রসাদীনির্মাল্য সযত্নে তুলে রেখে রাইটসাহেব বললে, "আমার এই অভূতপূর্ব সম্মানলাভের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুরোহিতের গোলাপজল দেওয়া এই গোলাপ পাপড়ি ক'টি আমি চিরকাল সযত্নে রেখে দেব।"

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসটা আমার সঙ্গী ও আমার* মহীশূরষ্টেটের অতিথি হয়েই কাটল। মহারাজার উত্তরাধিকারী, হিজ্ হাইনেস্ যুবরাজ স্যার শ্রী কৃষ্ণ নরসিংহরাজ ওয়াদিয়ার তাঁর রাজ্যে শিক্ষা ও উন্নতিবিস্তার পরিদর্শনের জন্য আমার সেক্রেটারী ও আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। গত পক্ষকালমধ্যে আমাকে টাউন হল, মহারাজার কলেজ, ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতিতে হাজার হাজার শহরবাসী আর ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশন্যাল হাইস্কুল, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ আর চেট্টি টাউন হলে তিনটে বিরাট সভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। চেট্টি টাউন হলে তিন হাজারের উপর লোকসমাগম হয়।

অ্যামেরিকার যে উজ্জ্বল চিত্র তাঁদের সম্মুখে আমি অঙ্কিত করেছিলুম, তাতে আগ্রহশীল শ্রোতৃবর্গের কোন উৎসাহ ছিল কিনা জানিনা; কিন্তু যখনই উল্লেখ করেছি যে পূর্ব পশ্চিমের যা কিছু সৎ, যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তার পরস্পরের আদানপ্রদানে উভয়েই উপকৃত হবে, তখনই আনন্দধ্বনি হয়ে উঠত প্রবলতম।

রাইটসাহেব আর আমাতে মিলে সেখানে শান্তি আর আরামে দিন কাটাচ্ছি।

* মিস্ ব্লেচ, মিস্টার রাইট আর আমার সঙ্গে দ্রুত পরিভ্রমণের তাল রাখতে না পেরে কলকাতায় আমার আত্মীয়বর্গের সঙ্গেই সানন্দে রয়ে গেল।

রাইটসাহেবের ভ্রমণের দিনলিপি থেকে তার মহীশূরে সম্বন্ধে যা ধারণা, তা এখানে উদ্ধৃত হল ;—

"আকাশের চিরপরিবর্তনশীল বিস্তৃত চিত্রপটের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় অন্যমনস্কভাবে দৃষ্টি সংলগ্ন করে বহু আনন্দোদ্বেল মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে, কেননা ভগবানের তুলির স্পর্শে যে রঙের আবির্ভাব হয়, তাতে থাকে নবীন প্রাণের স্পন্দন। মানুষ যখন কেবলমাত্র পিগমেন্টের রং দিয়ে তার অনুকরণ করতে যায়, তখন সেই রঙের লালিত্য, তার গরিমা সবই হারিয়ে যায়, কারণ ভগবান কাজে লাগান অত্যন্ত সাদাসিধে আর ফলপ্রসূ মাধ্যম—তেলও নয়, রংও নয়, তা হচ্ছে আলোর কিরণ। মানুষের হচ্ছে তেলের রং আর তাঁর হচ্ছে আলোর রং ; মেঘের কোণে একটু আলোর ছোপ লাগিয়ে দিলেন—দাঁড়িয়ে গেল সেটা সিঁদুরের মত, আবার একটু তুলি বুলিয়ে দিলেন—বদলে গেল সেটা কমলা লেবু থেকে সোনালী। ঘনমসীকৃষ্ণবর্ণ মেঘের বুকে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে—যেন মেঘের বুক থেকে এক ঝলক রক্ত তীব্রবেগে বেরিয়ে আসছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর এই খেলা চলছে—চিরনূতন, চিরপরিবর্তনশীল ; এর মধ্যে কোন প্রতিলিপি নেই—নেই কোন দৃশ্যপট বা রঙের পৌনঃপুনিকতা। ভারতের আকাশে দিন যখন রাত্রির কোলে ঢলে পড়ে, অথবা রাত্রিশেষে ঊষাকালে যখন অরুণোদয় হয় সেরকম অপরূপ দৃশ্য অন্যত্র আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। আকাশকে দেখায় যেন ভগবানের হাতে রঙের পাত্র—তাতে স্বর্গের বিচিত্রবর্ণের হোলিখেলা চলছে।

"এবার আমি কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধের* কথা বলব। বাঁধটি প্রকাণ্ড—গোধূলিতে তার দৃশ্য নয়নাভিরাম। যোগানন্দজী আর আমি একটি ছোট ছেলেকে "সরকারী গাইড" হিসেবে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট বাসে চড়ে বাঁধ দেখতে বেরোলুম। মহীশূরে থেকে বার মাইল দূরে বাঁধটি অবস্থিত। মাটির রাস্তা, বেশ সমতল—অস্তগমনোম্মুখ সূর্য তখন তার গাঢ় রক্তিমরাগরঞ্জিত শেষ কিরণলেখা ছড়িয়ে পশ্চিম দিকচক্রবালরেখার দিকে ঢলে পড়েছে।

"আমাদের যাত্রা শুরু হল চারিদিকের চৌকো ধানক্ষেতের পাশেপাশে পত্রবহুল ছায়াসুশীতল বটগাছের সারির ভিতর দিয়ে। দুইপাশে উন্নতশীর্ষ নারিকেলকুঞ্জ ; ঘনজঙ্গলের মত বৃক্ষলতার প্রাচুর্যে সবুজের সমারোহ—তারপরে

* বাঁধটি একটি বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অংশ। এখান থেকে মহীশূর শহর সহ বিভিন্ন রেশম, সাবান ও চন্দন তেল উৎপাদন কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

একটি পাহাড়ের মাথায় উঠেই একেবারে এসে পড়লুম সেই বিরাট কৃত্রিম হ্রদের মুখোমুখি—নক্ষত্র ও তাল আর অন্যান্য সব গাছের ছায়া জলে পড়েছে; চারধারে ধাপে ধাপে বাগান উঠে গিয়ে হ্রদটি ঘিরে রেখেছে—বাঁধের ধারে ধারে বিজলীবাতির আলো।

নীচে বাঁধের পাড়ের ধারে এক অত্যুজ্জ্বল নয়নাভিরাম দৃশ্য! উচ্ছ্বসিত জলস্রোতে আলো পড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। তলায় দেখলুম ফোয়ারার উপর রঙিন আলোর খেলা—লাল, হলদে, সবুজ, নীল রঙের আলোর ঝরণা,—যেন আকাশের কোল থেকে ঝরে পড়ছে। প্রস্তর নির্মিত বিশালকায় হস্তীরা তাদের উত্তোলিত শুণ্ড দিয়ে জল উদ্গীরণ করছে। বাঁধটি (যার আলোর ফোয়ারাগুলি আমায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শিকাগো সহরের বিশ্বমেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল) সেই ধানক্ষেতের প্রাচীনভূমি আর তার সরল লোকদের কাছে একেবারে অত্যাধুনিক। ভারতবাসীরা আমাদের এরূপ বিরাট আর সাদর অভ্যর্থনা করছে যে আমার ভয় হয় যোগানন্দজীকে আবার অ্যামেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব কিনা, তা বোধ হয় আমার শক্তি বা ক্ষমতায় আর কুলোবে না।

"আর একটা অতি দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেল—সেটা আমার প্রথম হাতীতে চড়া। গতকাল যুবরাজ তাঁর একটি হাতীতে চড়বার জন্যে তাঁর গ্রীষ্ম প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন; হাতীটা ছিল বিশালকায়। হাওদায় চড়বার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠলুম। হাওদাটি বাক্সর মত, সিল্কের গদি দেওয়া। তারপর হেলতে দুলতে, সামনে পিছনে টাল খেতে খেতে চললুম—একবার যেন নীচে নেমে তলিয়ে যাচ্ছি আর একবার যেন ঠেলে উপরে উঠছি—সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, জীবনে কখনও তো হাতীতে চড়িনি! সে কি রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর অপূর্ব উল্লাস! মনে স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু ভয় ভয়ও করছে! পৈতৃক প্রাণটা না হারাই সেই ভয়ে প্রাণের দায়ে হাওদাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলুম।"

দাক্ষিণাত্যে বহু ঐতিহাসিক আর পুরাতত্ত্বের মালমশলা, প্রাচীন ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি সব চারদিকে ছড়িয়ে আছে। তাদের সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনা করা যায় না। মহীশূরের উত্তরে ভারতবর্ষের একটি বৃহৎ রাজ্য হচ্ছে হায়দ্রাবাদ। বিরাট গোদাবরী নদীর দ্বারা বেষ্টিত অধিত্যকাভূমি—চারিদিকে প্রশস্ত উর্বর সমতল ভূমি। সুন্দর নীলগিরি পর্বত আর অন্যান্য বহুস্থানে চূণাপাথর বা গ্র্যানিটের অনুর্বর পাহাড়। হায়দ্রাবাদের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও নানা বৈচিত্র্যময়; তিনহাজার বছর আগে অন্ধ্ররাজগণের সময় হতে আরম্ভ হয়ে

১২৯৪ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত হিন্দুরাজগণের অধীনে থাকে, অতঃপর মুসলমান শাসকগণের অধীনে আসে।

হর্ম্যশিল্প, ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্পে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তার হৃদয়-স্তম্ভনকারী আর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক অপূর্ব নিদর্শনের একত্র সমাবেশ একমাত্র প্রাচীন পর্বতখোদিত ইলোরা আর অজন্তা গুহাতেই দেখতে পাওয়া যায়। ইলোরার কৈলাসগুহা একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে খোদিত মন্দির—তাতে নানা দেবদেবী, নরনারী, পশুপক্ষীর মূর্তি—যেন মাইকেল এঞ্জেলোর অপূর্ব সুসমঞ্জস সুঠাম গঠনের অদ্ভুত কারুশিল্পের প্রকাশ। অজন্তায় পাঁচটি অলিন্দশোভিত মন্দির আর পঁচিশটি মঠ আছে। সবই পাথরে খোদা প্রাচীর চিত্রের কাজকরা থামের উপর দাঁড়িয়ে, শিল্পীর শিল্পচাতুর্য আর ভাস্কর্যের প্রতিভা সেখানে অমর হয়ে রয়েছে।

আর হায়দ্রাবাদ শহরে আছে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি এবং মক্কা মসজিদের বিরাট হর্ম্যাবলী; মসজিদে দশহাজার মুসলমান একত্র বসে উপাসনায় যোগদান করতে পারে।

মহীশূরে দৃশ্যবৈচিত্র্যে অপূর্ব; সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে তিন হাজার ফিট উঁচু, চারিদিকে গভীর জঙ্গল—বন্যহস্তী, বাইসন, ভল্লুক, প্যান্থার, ব্যাঘ্র প্রভৃতির আবাসভূমি। এর দুটি প্রধান সহর মহীশূরে আর ব্যাঙ্গালোর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নয়নাভিরাম; বহু সুন্দর সুন্দর পার্ক আর ভ্রমণের উদ্যানে স্থানগুলি বড়ই মনোরম আর চিত্তাকর্ষক।

একাদশ শতাব্দী হতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মহীশূরে হিন্দু স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়। একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন বেলুড়ের মন্দির—রাজা বিষ্ণুবর্ধনের সময় নির্মিত হয়। সূক্ষ্মকারুকার্যে আর প্রতি মূর্তির অপরূপ পরিকল্পনার প্রাচুর্যে জগতে অতুলনীয়।

উত্তর মহীশূরে যে সব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। সেগুলি সম্রাট অশোকের* স্মৃতিকে জাগ্রত করে—যার বিশাল

*সম্রাট অশোক ভারতের নানাস্থানে ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করেন। চতুর্দশটি শিলালিপি ও দশটি শিলাস্তম্ভ অদ্যাবধি বর্তমান। প্রত্যেকটি স্তম্ভ কারিগরী, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সম্রাট অশোক জলাশয়, বাঁধ, জলপ্রণালীর স্রোতস্বার, রাজপথ এবং পথিকদের জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রামগৃহসম্বলিত ছায়াতরুসমাচ্ছন্ন বহু পথ, ভেষজ সংগ্রহের জন্য ভৈষজ্য উদ্যান আর মানব ও পশুদিগের নিমিত্ত বহু আরোগ্যশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান। বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের শিলা অনুশাসনে তৎকালীন বহু বিস্তৃত শিক্ষা-প্রসারের পরিচয় বহন করে। ত্রয়োদশ শিলালিপিতে যুদ্ধের নিন্দা ঘোষিত আছে। "ধর্মের জয় ছাড়া আর কোন কিছুতেই সত্যকার জয় নাই।" দশম শিলালিপিতে লিখিত আছে, "রাজার প্রকৃত গৌরব নির্ভর করে তার প্রজাগণের নৈতিক উন্নতিলাভের পথে সাহায্য দান করার উপর।" একাদশ শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, "সত্যকারের দান" হবে কোন বস্তু নয়,—তা হবে 'শিবম্' অর্থাৎ মঙ্গল—সত্যের প্রচার। ষষ্ঠ শিলালিপিতে সর্বজনপ্রিয় সম্রাট অশোক তাঁর প্রজাবর্গকে সরকারী কার্যের জন্য "দিনরাত্রির মধ্যে যে কোন সময়ে" তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাতে আরও লেখা আছে যে তাঁর রাজকর্তব্য সকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে তিনি এইরূপে "তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে তাঁর ঋণ হতে নিজের মুক্তি লাভ করছেন।"

অশোক ছিলেন সেই দুর্ধর্ষ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র যিনি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট কর্তৃক ভারতে রক্ষিত সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করেন এবং ৩০৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দে সেলুকাস পরিচালিত ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যদের পরাজিত করেন। তারপরে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসকে পাটলিপুত্রের* রাজসভায় সংবর্ধিত করেন। এই মেগাস্থিনিসই সমৃদ্ধিশালী ও উন্নতিশীল ভারতবর্ষের তৎকালীন বিবরণ সুনিপুণভাবে লিখে রেখে গিয়েছেন।

২৯৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার তাঁর পুত্রের হাতে সমর্পণ করেন। দাক্ষিণাত্যে গিয়ে তিনি বর্তমান মহীশূরের একটি তীর্থস্থান—শ্রবণবেলগোলায় কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর মত একটি পর্বত-গুহায় আত্মানুসন্ধানে রত থেকে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন। উক্ত স্থানেই মুনি গোমতেশ্বরের সম্মানে ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে জৈনগণ কর্তৃক একটি বিরাট গ্র্যানিট প্রস্তরখণ্ড হতে খোদিত পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তিটি আছে।

ভারতবর্ষ আক্রমণ অভিযানে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে বা পরে তাঁর অনুসরণে

---

*পাটলিপুত্র শহরের (বর্তমান পাটনা) একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। প্রভু-বুদ্ধ ৬ষ্ঠ খ্রিঃ পূর্বাব্দে স্থানটি পরিদর্শন করেন। তখন সেটি কেবলমাত্র একটি নগণ্য দুর্গ ছিল। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, "আর্যগণের যতদূর পর্যন্ত আশ্রয় (অবস্থান), বণিকগণ যতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে, সকলপ্রকার পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য পাটলিপুত্রই তাদের জন্য প্রধান শহর হয়ে থাকবে।" (মহাপরিনির্বাণ সূত্র)। দুই শতাব্দী পরে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের পাটলিপুত্রই রাজধানীরূপে পরিণত হয়। তাঁর পৌত্র অশোক শহরটিকে অধিকতর সৌন্দর্যময় ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন।

যে সব গ্রীক ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অ্যারিয়ান, ডায়োডোরস, প্লুটার্ক আর ভূগোলজ্ঞ স্ট্র্যাবোর বিবরণ ডাঃ জে. ডব্লিউ. ম্যাকক্রিন্ডল* সাহেব অনুবাদ করেছেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আলোকের রেখাপাত করবার জন্য। আলেকজাণ্ডারের নিষ্ফল আক্রমণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে তাঁর হিন্দু দর্শনশাস্ত্র, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন—যাঁদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ করতেন এবং যাঁদের সঙ্গ তিনি সাগ্রহে কামনা করতেন। উত্তর ভারতে তক্ষশীলার আক্রমণের অব্যবহিত পরেই তিনি ওয়ানসিক্রিটস নামে 'ডায়োজেনিসের হেলেনিক মতাবলম্বী' এক শিষ্যকে দূতস্বরূপে পাঠান তক্ষশীলার সন্ন্যাসীবর দণ্ডামিসকে আনবার জন্য।

ওয়ানসিক্রিটস, দণ্ডামিসকে তাঁর আরণ্যআশ্রমে খুঁজে বার করে বললেন, "নমস্তে হে ব্রাহ্মণগুরু! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জিউসের পুত্র হচ্ছেন আলেক-জাণ্ডার—যিনি পৃথিবীর সকলদেশের একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি আপনাকে তাঁর কাছে যেতে আদেশ করেছেন। আপনি যদি তা পালন করেন তবে তিনি আপনাকে বহু মহার্ঘ উপঢৌকনে পুরস্কৃত করবেন, কিন্তু অস্বীকার করলে তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করবেন।"

যোগিবর এক প্রকার বাধ্যতামূলক এই নিমন্ত্রণ শান্তভাবেই শ্রবণ করলেন, কিন্তু "এমন কি পর্ণশয্যা থেকে মাথাও তুললেন না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "আলেকজাণ্ডার যদি তাই হন, তাহলে আমিও জিউসের পুত্র। আলেকজাণ্ডারের যা কিছু আছে তার কিছুই আমি চাই না, কারণ আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট; আমি দেখছি যে তিনি লোকজন নিয়ে জলেস্থলে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তাতে তাঁর কোনই লাভ হচ্ছে না আর তাঁর ঘোরারও কখনও শেষ হচ্ছে না।"

"যাও, আলেকজাণ্ডারকে বল গিয়ে যে রাজাধিরাজ পরমপিতা পরমেশ্বর কখনও স্পর্ধাজনিত অসৎকার্যের কর্তা নন, পরন্তু তিনি সংসারে আলোক, শান্তি, জীবন, জল, মনুষ্যদেহ ও আত্মার স্রষ্টা; মৃত্যু যখন মানবগণকে মুক্তি দেয় তখন তিনি তাদের সকলকেই গ্রহণ করেন, কোনরূপেই তাদের আর কালব্যাধির অধীন হতে হয় না। একমাত্র তিনিই আমার

---

*প্রাচীন ভারত, ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ (চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৮৭৯, নঃপ্রকাশিতপু ১৯২৭)।

প্রণম্য ঈশ্বর, হত্যাকাণ্ড যাঁর কাছে ঘৃণিত, যুদ্ধে যিনি কখনও প্ররোচনা দেন না।"

তারপর সেই মহাপ্রাণ ঋষিবর শান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বলতে লাগলেন, "আলেকজান্ডার তো ঈশ্বর নন—কারণ তাঁকে তো মৃত্যুর কবলে নিশ্চয়ই পড়তে হবে। তিনি যখন অন্তররাজ্যের সিংহাসনে এখনও অধিষ্ঠিত হন নি, তখন তাঁর মত ব্যক্তি কি করে জগতের প্রভু হতে পারেন? তিনি তো এখনও সশরীরে পরলোকেও প্রবেশ করেন নি, বা এই পৃথিবীর বিরাট অংশের উপর দিয়ে সূর্যের যে গতিপথ তাও তাঁর জানা নেই। আর তার সীমানার চারিদিকে যেসব জাতি আছে, তাদের অধিকাংশ তো বলতে গেলে তাঁর নাম পর্যন্তও শোনে নি।"

"সসাগরা ধরণীর অধিপতি"র কর্ণে বোধ হয় এরূপ কটু তিরস্কারবাক্য আর কখনও প্রবেশ করে নি। যাই হোক, তা শেষ করে বিদ্রূপের সুরে মুনিবর বললেন, "আলেকজান্ডারের বর্তমান রাজত্বসকল যদি তাঁর মন ভরবার মতন প্রশস্ত না হয়, তা হলে তাঁকে গঙ্গাপার হতে বল গিয়ে; সেখানে তাঁর এমন স্থান মিলবে যে তাঁর সব লোক সেখানে ধরে যাবে।*

"তাছাড়া, এটা ঠিক জেনে রেখো যে, আলেকজান্ডার যা প্রস্তাব করেছেন বা যে সব উপহার দিতে চাইছেন তা আমার কাছে একেবারেই নিরর্থক; যে সব জিনিষ আমি সত্যিই চাই আর যা সব আমার পক্ষে বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে এই বৃক্ষতল—যা আমার আশ্রয়, এই সব ফলন্ত গাছ, যা আমার দৈনিক আহার জোগায় আর জল, যা আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে; এ ছাড়া আর সমস্ত জিনিষ যা সব অতি কষ্টে আর দুশ্চিন্তায় সংগ্রহ করতে হয়,—তা যারা করে তাদের পক্ষে তা ধ্বংসেরই কারণ হয়—আর সকল অজ্ঞানীলোকেদের ক্লেশ ও বিপাকের কারণ হয়,—এসব দুঃখ আর অশান্তিই ডেকে আনে।

"আমার জন্যে আর কি দরকার! আমি এই বনের পাতার বিছানায় শয়ন করি, আর পাহারা দেবার জন্যে কোন জিনিষ কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্তে পরমশান্তিতে ঘুমোতে পারি। আর নজর রাখবার মতন মূল্যবান যদি কিছু আমার থাকত, তাহলে ঘুম তো আমার তখনই ছুটে যেত! মা যেমন শিশুকে

* আলেকজান্ডার অথবা তাঁর কোন সৈন্যাধ্যক্ষই কখনও গঙ্গানদী অতিক্রম করেন নি। উত্তরপশ্চিমে দৃঢ় বাধা পেয়ে ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যগণ আরও অধিক অগ্রসর হতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলে, আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি পারস্যজয়ের আরও নানা প্রচেষ্টা করেছিলেন।

দুগ্ধদান করে, তেমনি আমার এই ধরিত্রীমাতা আমায় সব কিছুই দিচ্ছেন। যেখানে খুশী আমি যেতে পারি—কোন বাধা নেই, কোন ভাবনা চিন্তা আমার নেই, যাতে পড়ে আমায় বিব্রত হতে হয়।

"আলেকজাণ্ডার আমার মাথাটা কেটে ফেললেও আমার আত্মার তো সে বিনাশ সাধন করতে পারবে না, আমার মাথাটি তখন কেবল নীরব হয়ে পড়েই থাকবে—একটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডেরই মত আমার শরীরটাও পড়ে থাকবে এই পৃথিবীতে,—যেখান থেকে এর উপাদান সব সংগৃহীত হয়ে এর সৃষ্টি হয়েছিল; তারপর আমি আত্মারূপে আমার ভগবানের কাছে গিয়ে পেঁছিব, যিনি আমাদের সকলকে রক্তমাংসের দেহে বন্দী করে, এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই প্রমাণ করতে যে, আমরা এখানে নেমে এসে তাঁর শাসন মেনে চলতে পারি কি না; আর যিনি আমাদের সকলের কাছ থেকে চান যে, যখন আমরা এখান থেকে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হব, তখন তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের জীবনের সকল কাজেরই কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল গর্বোদ্ধত, সকল প্রকার অন্যায়কাজের একমাত্র বিচারক; তাঁর এমনি বিচার যে অত্যাচারিতের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাই শেষে অত্যাচারীর শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়।

"অতএব আলেকজাণ্ডার কেবল তাদেরকেই এই সব বলে ভয় দেখান যারা ধনসঞ্চয়ের কামনা করে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে—ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তার অস্ত্রশস্ত্রের কোন শক্তিই নেই। আমরা কাঞ্চনের মায়া করি না বা আমাদের মৃত্যু-ভয়ও নেই! তাহলে এবার যাও, গিয়ে আলেকজাণ্ডারকে এই কথা বল যে,—আপনার কোন কিছুতেই দণ্ডামিসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই কাজেই তিনি আপনার কাছে যাবেনও না, আর আপনার যদি কিছু দণ্ডামিসের কাছ থেকে চাইবার থাকে, তাহলে আপনিই তাঁর কাছে যান।"

ওয়ানসিক্রিটস যথাকালে এই বার্তা আলেকজাণ্ডারের কাছে পেঁছিয়ে দিলেন, আর তিনি তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন, এবং "তাঁর দণ্ডামিসকে দেখবার ইচ্ছা আরও প্রবলতর হয়ে উঠল—যিনি বৃদ্ধ আর দিগম্বর হলেও একমাত্র প্রতিযোগী, যাঁর মধ্যে বহুরাজ্যবিজেতা সেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা দেখতে পেয়েছিলেন একজনকে যিনি তাঁর চেয়েও ঢের বেশী শক্তি ধরেন।"

আলেকজাণ্ডার কতকগুলি ব্রাহ্মণ তপস্বীকে তক্ষশিলায় নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরা দার্শনিক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ সমাধানে পারদর্শী ছিলেন। প্লুটার্ক একটি বাকযুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন; আলেকজাণ্ডার নিজে তার সমস্ত প্রশ্ন রচনা করে দিয়েছিলেন।

"জীবিত আর মৃতদের মধ্যে সংখ্যায় কে বেশী?"

"জীবিত, কারণ মৃতেরা তো আর নেই।"

"প্রাণীরা কোথায় বেশী, সমুদ্রে না ভূমিতে?"

"ভূমিতে, কারণ সমুদ্র ভূমিরই একটা অংশ।"

"পশুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুর কোন্‌টি?"

"যার সঙ্গে মানুষের এখনও পরিচয় ঘটে নি।"

(মানুষের অজানাকেই বেশী ভয়)।

"আগে কোন্‌টা ছিল—দিন কি রাত?"

"এক দিন আগে বলেই দিন আগে ছিল।" এই উত্তরে আলেকজান্ডার বিস্ময় প্রকাশ করেন; তাতে ব্রাহ্মণটি বলেন, "অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর।"

"সর্বোৎকৃষ্ট কি উপায়ে একজন মানুষ নিজেকে সকলের প্রিয়পাত্র করে তুলতে পারে?"

"মানুষ সকলের প্রিয়পাত্র হয়, যদি সে বিরাট শক্তি ধারণ করেও কারুরই ভয়ের কারণ না হয়।"

"মানুষ দেবতা হতে পারে কি করে?"*

"মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তাই করে।"

"জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী?"

"জীবন—কারণ এ কত দুঃখকষ্ট, কত অমঙ্গল সহ্য করতে পারে।"

আলেকজান্ডার তাঁর গুরুরূপে একজন প্রকৃত যোগীকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। এই ব্যক্তি কল্যাণ (স্বামী স্ফাইনস্) নামে পরিচিত, গ্রীকরা যাঁকে "কালানস" বলে ডাকত। মুনিবর আলেকজান্ডারের সঙ্গে পারস্যদেশে গমন করেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে, পারস্যদেশের সুসা নামক স্থানে তিনি সমগ্র মাসিডোনিয়ান সৈন্যদের সমক্ষে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে জলন্তচিতায় প্রবেশ করে নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দেন। ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করে গেছেন যে উক্ত যোগিবরের কোনরূপ যন্ত্রণা বা মৃত্যুর ভয় না দেখে সমস্ত সৈন্যেরা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়; তিনি চিতাগ্নিতে দগ্ধ হবার সময় একবারও স্থানচ্যুত হন নি। চিতায় প্রবেশ করবার পূর্বে কালানস তাঁর বহু অন্তরঙ্গ সঙ্গীসাথিদের আলিঙ্গন করেন, কিন্তু আলেকজান্ডারের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণে বিরত থাকেন; তাঁকে সেই হিন্দুঋষি কেবল মাত্র বলেন,—

"আমি শীঘ্রই তোমার সঙ্গে ব্যাবিলনে সাক্ষাৎ করব।"

* এই প্রশ্ন হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে "জিউসের পুত্রে"র যে ইতিমধ্যেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর মাঝে মাঝে সন্দেহ উপস্থিত হত।

আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ পরিত্যাগের এক বৎসর পরে ব্যাবিলনে মারা যান। তাঁর ভারতীয় গুরুর কথাবলার ধরণেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে তিনি আলেকজাণ্ডারের জীবনেমরণে সর্বদা উপস্থিত থাকবেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় সমাজের বিষয়ে বহু প্রত্যক্ষ আর উদ্দীপনাময়ী বর্ণনা দিয়ে গেছেন। অ্যারিয়ান বলেন, হিন্দু আইন জনগণকে রক্ষা করে আর "বিধান দেয় যে তাদের মধ্যে কেউই কোন অবস্থাতেই ক্রীতদাস হবে না; আর নিজেরা যে স্বাধীনতা উপভোগ কর তাতে যে সকলেরই অধিকার আছে সে কথা মানবে।* কারণ তারা ভেবেছিল যে যারা কারুর উপর কর্তৃত্ব করা বা তাদের নিকট অবনত হওয়া শিক্ষা করেনি, তারাই ভাগ্যপরিবর্তনের সকল অবস্থার সর্বাপেক্ষা উপযোগী জীবনলাভ করবে।

আর একটি পুস্তকে লেখা আছে, "ভারতবাসীরা টাকা সুদে খাটাতে অথবা ঋণ কেমন করে করতে হয় তা জানে না। কোন ভারতবাসীর কোন অন্যায় করা বা তা সহ্য করা প্রচলিত প্রথার বিরোধী, কাজে কাজেই তাদের কোন একরারনামা বা জামিন প্রয়োজন হয় না।" কথিত আছে যে রোগনিরাময় সরল আর স্বাভাবিক উপায়েই হত। "ঔষধপ্রদান অপেক্ষা পথ্যনিয়ন্ত্রণেই রোগ-মুক্তির ব্যবস্থা। ঔষধহিসাবে মলম আর প্রলেপেরই আদর ছিল সমধিক। আর সকল খুব বেশী পরিমাণেই অপকারক বলে বিবেচিত হতো।" যুদ্ধ-ব্যবসা ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। "শত্রুরাও ভূমিতে কর্ষণরত কোন কৃষকের উপর আপতিত হয়ে তার কোনও ক্ষতিসাধন করবে না—কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের উপকারী বলে বিবেচিত হয়ে সকল প্রকার ক্ষতি হতে রক্ষিত হয়। ভূমিও এই রকমে অত্যাচারের হাত এড়িয়ে গিয়ে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে—জীবনকে উপভোগ্য করবার সব রকম উপকরণ অধিবাসীবৃন্দকে যোগায়।"

মহীশূরের প্রায় সর্বত্র ছড়ান তীর্থস্থানগুলি থেকে দক্ষিণভারতের বহু

---

* সকল গ্রীক পর্যবেক্ষকগণ ভারতবর্ষে ক্রীতদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অভাবের বিষয়ে বর্ণনা করে গেছেন; এ ব্যাপার গ্রীক সমাজগঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী লক্ষণ।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কৃত "ক্রিয়েটিভ ইণ্ডিয়া"তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক নানা কৃতিত্ব এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের প্রাধান্য-সূচক গুণবিবেচনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। (মতিলাল বেনারসীদাস, লাহোর; প্রকাশক: ১৯৩৭।)

আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে, "ইণ্ডিয়ান কালচার থ্রু দি এজেস" এস. ভি. বেঙ্কটেশ্বর প্রণীত। (নিউইয়র্ক, লংম্যান, গ্রীন এণ্ড কোং)।

সাধুসন্তদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব সাধুসন্তদের মধ্যে থায়ুমনবর নামে একজন এই অপূর্ব উদ্দীপনাময়ী কবিতাটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন :—

"দমন করিতে পার প্রমত্ত বারণ,
আর ঋক্ষ-শার্দুলের বদন ব্যাদান ;
পশুরাজ সিংহোপরি করি আরোহণ,
কালসর্পসাথে ক্রীড়া, তুচ্ছ করি প্রাণ।
রসায়নবলে তব জীবিকা অর্জন,
ছদ্মবেশে ভ্রমিবারে পার পৃথ্বীময় ;
দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধি সর্ব দেবগণ ;
সুচিরযৌবন করি দেহে উপচয় ;
জলের উপর ভ্রমি', অগ্নিমধ্যে বাস ;
মনের দমন কিন্তু কঠিন প্রয়াস।"

ভারতবর্ষের পাদদেশে একেবারে সুদূর দক্ষিণপ্রান্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ; স্থানটি উর্বর ও অতিশয় মনোরম। এখানে অধিকাংশস্থানে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলপথেই লোকেদের যাতায়াত চলে। কবে কোন সুদূর অতীতে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা সংযোজিত করা হয়েছিল বলে তার দরুণ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্তপালনের বাধ্যবাধকতা আজও মহারাজা বংশপরম্পরানুক্রমে প্রতি বৎসরই স্বীকার করে আসেন। বৎসরের মধ্যে ছাপ্পান্নদিন মহারাজা বেদ উচ্চারণ ও স্তোত্রপাঠ শোনবার জন্য দৈনিক তিনবার করে মন্দিরে যান। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় "লক্ষদীপম্"এ অর্থাৎ মন্দিরটিতে একলক্ষ দীপে সজ্জিত আলোক-উৎসব পালন করে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্র-বলয়িত সমতল, প্রশস্ত মাদ্রাজ শহর আর কাঞ্চীপুরম (কাঞ্চনপুরী বা স্বর্ণনগরী)। শেষোক্ত সহরটি পহ্লবরাজবংশের হিন্দুরাজগণের রাজধানী, আর তাঁদের রাজ্যকাল ছিল খ্রিস্টিয় শতাব্দীর প্রথম দিকে। বর্তমানে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি খুবই বিস্তার লাভ করেছে। শ্বেতবর্ণের গান্ধীটুপি প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য বহু মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত আর জাতিভেদেরও বহু সংস্কারসাধন করেন।

জাতিবিভাগের আদি উৎপত্তি, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক মনু কর্তৃক যা প্রবর্তিত, তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, মনুষ্যজাতি স্বাভাবিক বিবর্তনে চারটি প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত ; দৈহিক শ্রমের দ্বারা সমাজকে

সেবা করতে সমর্থ (শূদ্র); যারা মননশক্তি, কার্যদক্ষতা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়বাণিজ্য বা সাধারণ বণিকবৃত্তির দ্বারা সমাজকে সেবা করে (বৈশ্য); যাদের প্রতিভা শাসন, পালন অথবা রক্ষাকার্যে স্ফুরিত অর্থাৎ যারা শাসক বা যোদ্ধৃশ্রেণী (ক্ষত্রিয়); যাদের প্রকৃতি ভগবচ্চিন্তা, পূজাঅর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদিতে রত (ব্রাহ্মণ)। মনু বলে গেছেন, "এই চারি বর্ণের* কর্তব্য হচ্ছে অহিংসা, সত্যবাদিতা, সততা, পরিচ্ছন্নতা ও আত্মসংযম অভ্যাস এবং

* ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় "ঈস্ট-ওয়েস্টে" লিখিত হয়েছে,—"এই চারিটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা আদিতে মানুষের জন্মের উপর নির্ভর করত না, তা করত তার স্বাভাবিক শক্তি বা সামর্থ্যের উপর, যা তার জীবনের পরমপুরুষার্থ বা চরমলক্ষ্য নির্বাচনে প্রদর্শিত হত। এই লক্ষ্য হতে পারত (১) কাম—অর্থাৎ কামনা, ইন্দ্রিয়ভোগসম্পন্ন জীবনের ক্রিয়াশীলতা (শূদ্রাবস্থা), (২) অর্থ—মানে লাভ, অর্থাৎ বাসনাপূরণ তবে সংযতভাবে (বৈশ্যাবস্থা), (৩) ধর্ম—আত্মসংযমশিক্ষা, সৎকার্য ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন (ক্ষত্রিয়াবস্থা), (৪) মোক্ষ বা নির্বাণমুক্তি—আধ্যাত্মিক ও ধর্মশিক্ষার জীবন (ব্রাহ্মণাবস্থা)। এই চারিবর্ণ মনুষ্যজাতির সেবা করে (১) দেহ (২) মন (৩) ইচ্ছাশক্তি আর (৪) ঈশ্বরারাধনার দ্বারা।

"এই চারিটি অবস্থা প্রকৃতির এইসব নিত্য গুণের সঙ্গে সমগুণান্বিত,—তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব,—ব্যাঘাত, ক্রিয়া ও বিস্তার অথবা ভর, শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এই চারিটি জাতি এই চারিটি গুণে গুণান্বিত, যথা, (১) তমঃ (অবিদ্যা) (২) তমঃ-রজঃ, (অবিদ্যা ও ক্রিয়াশীলতার সংমিশ্রণ), রজঃ-সত্ত্ব (সৎকার্য ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ), আর সত্ত্ব (জ্ঞান)। এইরূপে প্রকৃতিদেবী প্রত্যেক মানুষকে এক বা একাধিক গুণের সংমিশ্রণে তার জাতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিনটিগুণই বর্তমান আছে। গুরুই প্রকৃতপক্ষে মানুষের বর্ণ সঠিকভাবে নির্ধারণ বা নিরূপিত করতে পারেন।

সকল দেশের আর সকল জাতির লোকেরা মতবাদহেতু না হলেও কার্যতঃ অন্ততঃ খানিকটাও জাতিভেদের লক্ষণ মেনে চলে বইকি! যেখানে অবাধ অধিকার অথবা তথাকথিত স্বাধীনতা আছে, বিশেষতঃ স্বাভাবিক জাতিদের ভিতর দুই বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহে, সেখানে জাতিটির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। পুরাণসংহিতাতে এরূপ সংযোগের সৃষ্ট সন্তানকে অশ্বতরের মতন বর্ণসংকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এদের নিজেদের জাতের বংশবৃদ্ধি ঘটে না। কৃত্রিম জাতিসকল পরিণামে নির্মূল হয়ে যায়। অসংখ্য বড় বড় জাতি যাদের জীবিত বংশধরদের আর কোন চিহ্নই মেলে না, এমন বহু বহু উদাহরণ আজকাল ইতিহাসে মেলে। ভারতবর্ষের বহু চিন্তাশীল মনীষীরা বলেন যে, ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম নির্বিচার স্ত্রীগ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়ে জাতির বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করে একে যুগযুগান্তের মধ্যে নানা উত্থানপতনের হাত হতে বাঁচিয়ে আজকে নিরাপদ স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে—আর সেই জায়গায় অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা বিস্মৃতির অতলগহ্বরে সব একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।"

পালন।" "জন্ম বা দশবিধ সংস্কারপালন, বিদ্যার্জন বা বংশগৌরব মানবকে দ্বিজাতিত্বে (ব্রাহ্মণত্বে) উন্নীত করতে পারে না"। মহাভারতে লিখিত আছে যে, "কেবল চরিত্র ও শীলতাই পারে"। মনু সমাজকে তার লোকেদের জ্ঞান, প্রাচীনত্ব, আত্মীয়তা এবং সর্বশেষ ঐশ্বর্য অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে বলে গেছেন। বৈদিকভারতে ধন সঞ্চিত বা দাতব্যকার্যের জন্য অপ্রাপ্য হলে সেরূপ ধনকে ঘৃণাই করা হত। প্রভূত অর্থশালী কৃপণ অথবা অনুদার ব্যক্তিকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দান করা হত।

গুরুতর অমঙ্গল দেখা দিল, যখন জাতিভেদ শতাব্দীর পর শতাব্দী বংশপরম্পরানুক্রমে পালিত হয়ে সমাজের গলায় ফাঁসির দড়ির মতই শক্ত হয়ে চেপে বসল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে ভারত জাতিভেদের প্রাচীন অর্থ—যা জন্মের উপর নয়, একমাত্র স্বাভাবিক গুণকর্মবিভাগের উপরেই যা প্রতিষ্ঠিত, তা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই সুনির্দিষ্ট দুঃখজনক কর্মফল আছে, আর তাদের তা সযত্নে দূর করবার ব্যবস্থাও করতে হয়। ভারতবর্ষও তার অদম্য উৎসাহ আর বহুমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা জাতিভেদ সংস্কারের কার্যে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে।

দক্ষিণভারত এতদূর চিত্তাকর্ষক যে রাইট সাহেব আর আমি আমাদের ভ্রমণ আরও দীর্ঘতর করবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠলুম। কিন্তু সময়ের অল্পতা-বশতঃ আমাদের আতিথ্যগ্রহণ আর বেশীদিন বিলম্বিত করতে পারা গেল না। শীঘ্রই আমার কলিকাতায় ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দেবার জন্য ডাক পড়ল। মহীশূরে ভ্রমণের শেষে ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ্ সায়েন্সের সভাপতি স্যার সি, ভি, রমনের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। এই জগদ্বিখ্যাত হিন্দু পদার্থতত্ত্ববিদ্ তাঁর অপূর্ব মনীষাবলে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত আলোকবিচ্ছুরণ—"রমন এফেক্ট" নামে এখন সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু ও ছাত্রদের কাছ থেকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় গ্রহণ করে আমরা কলকাতার দিকে ফিরে চললুম। মধ্যপথে আমরা সদাশিব-ব্রাহ্মণের* স্মৃতিপূত একটি ক্ষুদ্রতীর্থে নামলুম, দর্শনের জন্য। অষ্টাদশ

---

* তাঁর পূর্ণ উপাধি ছিল স্বামী শ্রীসদাশিবেন্দ্র সরস্বতী। এই নামেই তিনি তাঁর বইগুলি রচনা করেছেন ('ব্রহ্মসূত্র' এবং পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র ভাষ্য)। মহীশূরের শৃঙ্গেরি মঠের পরলোকগত শঙ্করাচার্য হিজ হোলিনেস্ শ্রীচন্দ্রশেখর স্বামীনাথ ভারতী সদাশিব সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময়ী প্রশস্তিগাথা রচনা করেছেন।

শতাব্দীতে এঁর জীবনকথা নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। নেরূর নামক স্থানে আর একটি বৃহত্তর সদাশিব তীর্থ আছে। পুদুকোট্টাই-এর রাজা এটি নির্মাণ করিয়ে দেন—এখানে দৈবশক্তিবলে রোগমুক্তির জন্য বহু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। বংশপরম্পরাক্রমে পুদুকোট্টাইরাজগণ শাসনকার্যে রত রাজার জন্যে রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সদাশিব কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ধর্মোপদেশ আজও পরম পবিত্র বলে সযত্নে পালন করে থাকেন।

দক্ষিণভারতে গ্রামবাসীদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞানী পরমপ্রিয় সদাশিব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব এখনও প্রচলিত আছে। কাবেরীনদীর তীরে একদিন তাঁকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় হঠাৎ বন্যার জলে ভেসে যেতে দেখা যায়। হপ্তাকতক বাদে দেখা গেল যে তিনি কোইম্বাটুর জেলায় কোডুমুডি নামক স্থানে মাটির ঢিপির তলায় গভীরভাবে চাপা পড়ে রয়েছেন। গ্রামবাসীরা খুঁড়ে বার করবার সময় কোদালের আঘাত তাঁর গায়ে লাগাতে তাঁর সমাধিভঙ্গ হয়, তখনই তিনি উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি সেস্থান পরিত্যাগ করে চলে যান।

জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করাতে সদাশিবের গুরু সদাশিবকে এই বলে তিরস্কার করেন, "তুমি একটি বালকমাত্র, তোমার এত বাক্যব্যয় কেন, কবে তোমার রসনা সংযত হবে ?" তাতে সদাশিব উত্তর দেন, "আপনার আশীর্বাদে, এই মুহূর্ত হতেই।" তদবধি সদাশিব মৌনব্রতাবলম্বন করেন এবং তারপর মুনি বলে খ্যাত হন।

সদাশিবের গুরু ছিলেন স্বামী শ্রীপরমশিবেন্দ্র সরস্বতী ; ইনি 'দহরবিদ্যা-প্রকাশিকার' রচয়িতা এবং 'উত্তরগীতা'র একটি অপূর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাও রচনা করে গেছেন। কতকগুলি সাংসারিক ব্যক্তি, ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত সদাশিবের রাস্তার উপর যাকে বলে "লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে" উন্মাদের মত নৃত্যে মর্মাহত হয়ে তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করে বলেন, "মশায়, আপনাদের সদাশিব একটি বদ্ধ পাগল।"

কিন্তু পরমশিবেন্দ্র তা শুনে হাস্যোৎফুল্ল বদনে বললেন, "আহা, এমনি পাগল যদি সবাই হতে পারত !"

সদাশিবের জীবনে ভগবানের বহু অদ্ভুত আর অপূর্ব লীলাসকল প্রকটিত হয়েছে। এ জগতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছু অবিচারই দেখা যায় ; কিন্তু ঈশ্বরভক্তের নিকট তাঁর অমোঘ ন্যায়ের সদ্য প্রতিবিধানের বহু উদাহরণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এক রাত্রিতে সমাধিমগ্ন অবস্থায় সদাশিব এক সম্পন্ন গৃহস্থের শস্যের গোলার কাছে উপস্থিত হলে, প্রহরারত তিনটি ভৃত্য সাধুবরকে প্রহারের জন্য মস্তকোপরি যষ্ঠি উত্তোলন করাতে দেখা গেল যে তাদের হাতগুলো সব

একেবারে আটকে গেছে। সদাশিবের প্রত্যুষে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার সময় পর্যন্ত উক্ত তিনটি ভৃত্যবরকে ঐরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত তুলে পাথরের মূর্তির মতই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

আর একটি উপলক্ষ্যে সদাশিবকে জোর করে এক সর্দার তার কুলির দলে জ্বালানি বইবার কাজে লাগিয়ে দেয়। মৌনী সদাশিব নীরবে বোঝাটি মাথায় করে নির্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হয়ে একটা প্রকান্ড স্তূপের উপর সেটিকে রাখতেই জ্বালানির সেই বিরাট স্তূপটিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়।

সদাশিব, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। একদিন সকালবেলা সেই নগ্ন যোগী অন্যমনস্কভাবে একটি মুসলমান সর্দারের তাঁবুতে প্রবেশ করে ফেলেন। দুটি মহিলা ভয়ে চিৎকার শুরু করে দেন: সৈনিকপ্রবর তো তরবারির প্রবল আঘাতে তাঁর একটি হস্ত দেহ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। যোগিবর নির্লিপ্তভাবে সে স্থান হতে প্রস্থান করলেন। ভয় আর অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সেই মুসলমান সর্দার ছিন্নহস্তটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন। সদাশিব নীরবে ছিন্নহস্তটি তার কাছ থেকে নিয়ে রক্তস্রাবী ক্ষতস্থানে সংযুক্ত করে দিলেন। আঘাতের আর কোন চিহ্নই রইল না। মুসলমান যোদ্ধাটি যখন সশ্রদ্ধচিত্তে ও ভক্তিনত হৃদয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ চাইলেন, সদাশিব তখন বালুকার উপর অঙ্গুলিদ্বারা নিম্নলিখিত কথাকয়টি লিখে দেন,—

"তুমি যা চাও তা কোরো না, তা হলে তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই তখন করতে পারবে!"

মুসলমান সর্দারের এই বাণী লাভ করে মনে এক অপূর্ব পবিত্রভাবের উদয় হলো। সে সেই সাধুটির অদ্ভুতভাবের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে বুঝলে যে অহংভাবের দমনেই আত্মার মুক্তি। সেই সামান্য কথাকয়টিতে এতদূর আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত ছিল যে, তার বলেই সেই সর্দারটি ক্রমে তাঁর একজন উপযুক্ত শিষ্যে পরিণত হয়েছিল; পূর্বজীবনের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই রইল না।

গ্রামের ছেলেরা একদিন সদাশিবের কাছে গিয়ে জানালে যে তাদের বড়ই ইচ্ছে যে মাদুরায় তখন কি একটা ধর্মোৎসব আর তার মেলা চলছে তা গিয়ে তারা দেখে আসে; মাদুরা সেখান থেকে ১৫০ মাইল দূরে। যোগিবর সদাশিব তখন সেই সব ছোট ছোট ছেলেদের ইঙ্গিত করলেন যে তারা যেন তাঁর গা স্পর্শ করে থাকে। আশ্চর্য! মুহূর্তমধ্যে সেই সমগ্র দলটি মাদুরায় গিয়ে হাজির। ছেলেগুলো ভারি স্ফূর্তিতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে খুব আমোদেই খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালো। তারপরে ঘন্টাকতক বাদে তিনি আবার সেই

রকম করে অতি সহজেই তাদের বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন। বিস্ময়ে স্তম্ভিত সেই সব ছেলেপুলেদের পিতামাতারা সেখানকার প্রতিমার শোভাযাত্রা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা তাদের কাছ থেকে শুনল, আর তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে কতকগুলো ছেলের হাতে তখনও মাদুরার নানারকম মিষ্টি রয়েছে।

একটা অবিশ্বাসী ছোকরার কিন্তু সাধুটি আর তাঁর এই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা কোন কিছুতেই বিশ্বাস হল না। উল্টে সে ঠাট্টামস্করা আরম্ভ করলে। এর পরের বারের শ্রীরঙ্গমে অনুষ্ঠিত উৎসবে সে সদাশিবের কাছে হাজির হয়ে বেশ একটু টিট্‌কিরি দিয়ে বললে, "প্রভু, সেবারে যেমন ছোঁড়াদের মাদুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আমায়ও আজ তেমনি করে শ্রীরঙ্গমের মেলায় নিয়ে চলুন না?"

সদাশিব কি আর করেন, তেমনি করে সেই ছোকরাটিকে শ্রীরঙ্গম নিয়ে গিয়ে ফেললেন। ছোকরাটি সেই মুহূর্তে দেখলে যে, সে শ্রীরঙ্গমে পেঁছে গেছে। চারিদিকে সহরের লোকজনেরা ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। যাক্, পেঁছে তো সে গেল, কিন্তু তার একটু শিক্ষা হওয়াও যে দরকার। তাই ফেরবার যখন তার সময় হল তখন সে আর সদাশিবকে খুঁজেই পেল না—এখন উপায়? এখন বাড়ী ফেরে কি করে? আর কি করে! যাই হোক্, সারা রাস্তাটি হেঁটে আধমরা হয়ে তবে বাছাধনকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছিল।

দক্ষিণভারত ত্যাগ করার আগে শ্রীরমন মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রাইট সাহেব এবং আমি, তিরুভান্নামালাইয়ের কাছে অরুণাচলের পুণ্যময় পর্বতে তীর্থযাত্রা করি। সেই মহান্ তপস্বী তাঁর আশ্রমে আমাদের সস্নেহে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিকটে রক্ষিত 'ঈস্ট-ওয়েণ্ট' পত্রিকার স্তূপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যে কয়েকঘণ্টা আমরা কাটিয়েছিলাম তার অধিকাংশ সময় তিনি নীরবেই ছিলেন—কিন্তু তাঁর বদনমণ্ডল ছিল দিব্য প্রেম ও প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাষিত।

নিপীড়িত মানবাত্মা যাতে করে তার বিস্মৃত পূর্বতন বিশুদ্ধতা ফিরে পায়, তারজন্য শ্রীরমন মহর্ষি প্রত্যেককে 'আমি কে?'—এই আত্মজিজ্ঞাসা করতে উপদেশ দিতেন। অন্য সকল চিন্তাকে কঠিন হাতে নিবৃত্ত করার ফলে ভক্ত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রকৃত আত্মা বিষয়ে গভীর থেকে গভীরতর চেতনায় তিনি নিমজ্জিত হচ্ছেন। এই অবস্থায় মনচঞ্চলকারী অন্য সমস্ত চিন্তার উদয় রহিত হয়। দাক্ষিণাত্যের এই ভগবৎ জ্ঞানী ঋষি লিখেছেন ঃ— 'দ্বৈতবাদ ও ত্রিত্ববাদ পরের উপর স্থিতিশীল; সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের দর্শন মেলে না। যারা সেই সাহায্যের সন্ধানী, তারাই বিচ্যুত হয়ে পতিত হয়। ইহাই সত্য। যারা এই সত্য দর্শন করেছেন, তারা কদাপি বিচলিত হয়েন না।"

৪২শ পরিচ্ছেদ

গুরুর সহিত শেষ কয়দিন

শ্রীরামপুরে আশ্রমে এলুম সঙ্গে কিছু গোলাপফুল আর ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে। প্রণাম সেরে বললুম, "গুরুজী, আজ আমার ভাগ্য ভাল, আজ সকালে আপনাকে একলা পেয়েছি!" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অত্যন্ত নিরীহভাবে আমার দিকে তাকালেন।

"তোমার মতলব কি বল তো?" বলে ঘরের চারদিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যে, দেখে বোধ হল যেন পালাবার সুযোগ খুঁজছেন।

"গুরুজী, আপনার সঙ্গে আমার যখন প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হয় তখন আমি স্কুলে পড়ি; আর আমি এখন বড় হয়ে উঠেছি এমন কি দু'একটা চুলও হয়ত এখন মাথায় পেকেছে। যদিও প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণ থেকেই আপনি আমায় নীরবে স্নেহ করে আসছেন, কিন্তু আপনার মনে আছে কি যে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি থেকে কেবল একটিবার মাত্র আপনি আমায় বলেছিলেন যে, আমি তোমায় ভালবাসি?" বলে তাঁর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলুম।

গুরুদেব দৃষ্টি অবনত করে বললেন, "যোগানন্দ, আমার ভাষাহীন অন্তরের মধ্যে যে প্রগাঢ় স্নেহ লুকিয়ে রয়েছে, তাকে কি ভাষার রূঢ়তাতেই প্রকাশ করতে হবে?"

"গুরুজী, আমি জানি যে আপনি আমায় ভালই বাসেন, কিন্তু তবু একটু তা শুনতে বড্ড ইচ্ছে হয়।"

"আচ্ছা বেশ, তবে শোন। আমার বিবাহিতজীবনে আমি একটি পুত্রসন্তান চেয়েছিলুম, তাকে যোগের পথে শিক্ষা দেব বলে মনে বড় আশা ছিল; কিন্তু তা হল না। তারপর তুমি এলে আমার জীবনে, আমি সুখীই হলুম; কারণ তোমাকে পেয়েই আমার পুত্রের সাধ মিটল।" দুটি বড় বড় অশ্রুর ধারা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর চক্ষু হতে গড়িয়ে এল, শুধু বললেন, "যোগানন্দ, আমি তো তোমায় সর্বদাই ভালবাসি।"

তাঁর স্নেহমাখা কথাগুলিতে আমার হৃদয় বিগলিত হল, বুক থেকে একখানা যেন পাথর সরে গেল, বললুম, "আপনার উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম যে স্বর্গের দুয়ার আমার জন্যে খোলাই রইল।" তিনি যে ভাবোচ্ছ্বাসহীন আর

আগ্রহ এ আমি জানতুম, কিন্তু তবুও তাঁর নীরবতায় আমি প্রায়ই আশ্চর্য হয়ে ভাবতুম যে তাঁর মনে কি আছে? মাঝে মাঝে মনে ভয় হত যে, হয়ত আমি গুরুর উপযুক্ত সেবা করে তাঁর পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে পারি নি। তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত, তার পুরোপুরি পরিচয় কেউ পেত না। সে প্রকৃতি ছিল স্থির, গভীর, বাইরের জগতের কাছে দুরধিগম্য, সেই জগৎ—যার সব আকর্ষণ, সব আসক্তি বহুপূর্বে তিনি অতিক্রম করেছেন।

দিনকতক পরে কলকাতার এলবার্ট হলে আমায় যখন এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয় তখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, সন্তোষের মহারাজা আর কলকাতার মেয়রের সঙ্গে বক্তৃতা মঞ্চে বসতে সম্মত হন্। যদিও গুরুদেব আমায় তখন কোন কথাই বলেন নি, তবুও বক্তৃতা দেবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলুম; মনে হল যেন তাঁর চোখ দুটি আনন্দে হাসছে।

তারপর আমাদের শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সামনে কথাবার্তা হল। আমার পুরান সহপাঠীদের দিকে যখন চাইলুম আর তারাও যখন তাদের "পাগলা সন্ন্যাসী"র দিকে তাকালে, লজ্জা সংকোচ দূরে ফেলে চোখের কোণে আনন্দাশ্রু এসে জমে দাঁড়াল*। আমাদের দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষাল আমায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন—কালের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের সকল পুরান মতান্তরই তখন তিরোহিত হয়েছে।

শ্রীরামপুর আশ্রমে ডিসেম্বর মাসের শেষে দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তির উৎসব হত। নিকট, দূর, বহুস্থান হতেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিষ্যেরা সব এসে তাতে যোগদান করতেন। মধুর নামসংকীর্তন, কেষ্টদার অমিয়মধুর গলার গান, আশ্রমের ছেলেদের তৈরী প্রসাদগ্রহণ, তারপর গুরুদেবের আশ্রমের উঠানে মুক্ত আকাশতলে জনসভায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা! আহা, সে সব কি সুখের স্মৃতি, কি আনন্দের দিনই গিয়েছে—বহুদিন আগেকার সব আনন্দোৎসব। আজকের দিনে হয়তবা কিছু একটু নূতনত্ব থাকতে পারে।

গুরুদেব বললেন, "যোগানন্দ, আজকের সভায় বক্তৃতা দাও—ইংরেজীতেই।" এই রকম দু'টি অস্বাভাবিক অনুরোধ করে গুরুদেবের চোখে কৌতুকের হাসি দেখা গেল; জাহাজে আমার প্রথম ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবার

* পরমহংসজীর মহাসমাধির পর শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সি. ই. এব্রাহাম সেল্ফ্-রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপকে লিখিত পত্রে জানিয়েছেন, "আমি জানি যে হিজ্ হোলিনেসের শ্রীরামপুর কলেজের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল—আর "যোগানন্দ স্কলারশিপ" এই তথ্যের উপযুক্ত স্মারক হয়ে থাকবে"। (মার্কিন প্রকাশকের নিবেদন)।

অব্যবহিত পূর্বেকার দূরবস্থার কথা তিনি তখন ভাবছিলেন না কি? আমি সে গল্প আমার গুরুভাইদের শুনিয়ে গুরুদেবের আশীর্বাদের জোরে আমার কি পরিমাণ কৃতকার্যতা লাভ হয়েছিল, তার কথাও আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে নিবেদন করে শেষ করলুম।

আমি বললুম, "গুরুদেবের অমোঘ সাহায্য শুধু যে কেবল সেই সমুদ্রের মাঝে জাহাজেই আমার কাছে এসে পৌঁচেছিল তাই নয়, অ্যামেরিকার মতন বিরাট মহাদেশে আজ এই পনর বছর ধরে প্রত্যহই তা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।"

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নিলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমাকে সেই ঘরে ডাক দিলেন, যেখানে (ঐরকম একটা উৎসবের পর কেবল একটিবারমাত্র) আমি তাঁর কাঠের তক্তপোষে শোবার অনুমতি পেয়েছিলুম। আজকে দেখি গুরুদেব সেখানে নীরবে বসে আছেন, শিষ্যরা সব তাঁকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে তাঁর চরণতলে উপবিষ্ট। ঘরে প্রবেশ করতেই একটু হেসে তিনি বললেন, "যোগানন্দ, তুমি কি এখন কলকাতায় ফিরছ নাকি? আচ্ছা, কাল একবার এখানে এসো, তোমায় আমার গোটাকতক কথা বলবার আছে।"

তার পরদিন বৈকালে, কতকগুলি আশীর্বাণী উচ্চারণ করে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় পরমহংস* উপাধি দান করলেন।

আমি নতজানু হয়ে তাঁর সামনে বসতে তিনি বললেন, "এখন তোমার পূর্বেকার 'স্বামী' উপাধির জায়গায় 'পরমহংস' উপাধি হল।" এই 'পরমহংসজী'† কথাটা উচ্চারণ করতে আমার পশ্চিমী শিষ্যরা যে কিরূপ গলদ্ঘর্ম হবে, তা ভেবে তখন মনে মনে একটু হাসলুম।

গুরুদেবের চক্ষু দুটি স্থির, স্নিগ্ধ। শান্তস্বরে বললেন, "পৃথিবীতে কাজ আমার এখন ফুরিয়েছে; তোমায়ই এখন এবার সব চালাতে হবে।" শুনে তো ভয়ে বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "পুরীতে আমাদের আশ্রমের ভার

---

* পরমহংস—শাস্ত্রকাহিনীতে রাজহংস ব্রহ্মার বাহন বলে উল্লিখিত আছে; সদসৎ বিচারের প্রতীকস্বরূপ শ্বেত রাজহংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হতে 'সোম' অমৃত পৃথক্ করতে সমর্থ বলে বিবেচিত। হং-স শব্দটির মন্ত্রোচ্চারণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগের শব্দের অনুরূপ। অহম্-সঃ—অর্থাৎ হংসঃ মানে "আমিই তিনি"। এই দুটি শক্তিশালী মন্ত্রের শব্দের সঙ্গে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের স্পন্দন সংযোগ আছে। কাজেই প্রতি শ্বাসগ্রহণে মানুষ তার নিজের অজ্ঞাতসারে তার অস্তিত্বের সত্য, "আমিই তিনি" তা প্রমাণিত করে।

† আমায় 'স্যার' বলে সম্বোধন করে তারা 'পরমহংসজী' শব্দ উচ্চারণের দুরূহতা এড়িয়ে গেছেন।

নেবার জন্যে কাকেও পাঠিয়ে দাও। তোমার হাতে আমি সবই দিয়ে যাচ্ছি। তুমি তোমার জীবন আর এই প্রতিষ্ঠানের তরী ঠিকই সাফল্যের সঙ্গে স্বর্গের বেলাভূমিতে ভিড়োতে পারবে।"

অশ্রুপ্লাবিত নয়নে আমি তাঁর পা দু'টি জড়িয়ে ধরলুম; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন।

তার পরদিন রাঁচি থেকে স্বামী সেবানন্দ নামে একটি শিষ্যকে ডাকিয়ে এনে তাকে আশ্রমের ভার দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দিলুম। তারপরে আমার গুরুদেব তাঁর বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি আইনের খুঁটিনাটি ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন—কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুইটি আশ্রম আর অন্যান্য সম্পত্তি সব দখলের জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মামলামোকদ্দমা জুড়ে দেবার সম্ভাবনা আছে, সেটা নিবারণ করা প্রয়োজন—কাজেই তাঁর ইচ্ছা হল যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব একমাত্র জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে দান করে যান।

একদিন বৈকালে অমূল্যবাবু নামে এক গুরুভাই আমায় বললেন, "গুরুদেবের সম্প্রতি খিদিরপুরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যেতে পারেন নি।" শুনে কি একটা অজ্ঞাত আশংকার শীতল শিহরণ সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে গেল। বার বার পীড়াপীড়ি করাতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী শুধু এইটুকুমাত্র বললেন, "খিদিরপুরে আর আমার যাওয়া হবে না!" মুহূর্তেই জন্য গুরুদেব যেন সন্ত্রস্ত শিশুর মত কেঁপে উঠলেন!

(পতঞ্জলি লিখেছেন,* "দেহের প্রতি স্বভাবজ আসক্তি, খুব বড় বড় সাধুদের মধ্যেও ঈষৎ পরিমাণে বর্তমান।" মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, "বহুদিন খাঁচায় বন্ধ পাখী যেমন দরজা খুলে দিলেও উড়ে যেতে ইতস্ততঃ করে।")

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আমি মিনতি করে বললুম, "গুরুজী, ও কথা বলবেন না। আমার সামনে ওসব কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মুখ প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। একাশী বছরে পড়বেন, তবুও তাঁকে দেখতে স্বাস্থ্যবান্ আর বলিষ্ঠ!

দিনের পর দিন গুরুদেবের নীরব অথচ অনুভাব্য স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে তাঁর ভাবী তিরোভাবের নানা ইঙ্গিত সব একে একে মন থেকে মুছে ফেললুম।

---

* স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢোঽভিনিবেশঃ ॥ (পাতঞ্জলদর্শনম্, সাধনপাদঃ—৯ শ্লোক।)

পাঁজিতে তারিখ দেখিয়ে বললুম, "গুরুদেব, এবারে কুম্ভমেলা এই মাসে প্রয়াগে হচ্ছে।"*

"তুমি কি সত্যিই কুম্ভমেলায় যেতে চাও নাকি ?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর যে আমায় ছাড়তে ইচ্ছে নয়, তা ঠিকমত বুঝতে না পেরে আমি বলে চললুম, "প্রয়াগে একবার কুম্ভমেলায় বাবাজীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎলাভের যে ভাগ্য হয়েছিল—বোধ হয় এবারে আমারও সেই রকম সৌভাগ্য লাভ হয়ে যেতে পারে।"

"আমার তো মনে হয় না যে এবার তুমি সেখানে তাঁর দেখা পাবে।" বলে তিনি নীরব হয়েই রইলেন—আমার মতলবে বাধা দেওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না।

তার পরদিন সকালে যখন ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে আমি যাত্রার উদ্যোগ করলুম—গুরুদেব আমায় তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আশীর্বাদ করলেন। গুরুদেবের আচরণের অর্থ কি, তা ঠিক স্পষ্টতঃ আমি তখন অনুমান করে উঠতে পারি নি। তার কারণ বোধ হয় আমার গুরুর মহাপ্রস্থান আমায় নিতান্ত নিরুপায় আর অসহায় ভাবে দেখতে হবে, এটা হয়ত ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তার হাত থেকে রেহাই দেওয়াই বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল। আর আমার জীবনে এটা সর্বদাই ঘটেছে যে আমার অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় ভগবান দয়া করে আমায় সে সব করুণদৃশ্য থেকে বরাবরই দূরে সরিয়ে রেখে এসেছেন।†

---

* প্রাচীন মহাভারতে ধর্মমেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৪৪ খৃস্টাব্দে প্রয়াগে যে বিরাট কুম্ভমেলা হয় তার একটি বিবরণ রেখে গেছেন। কুম্ভমেলা প্রতি তিন বৎসর অন্তর ক্রমান্বয়ে হরিদ্বার, এলাহাবাদ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত হয়ে দ্বাদশ বৎসরের মাথায় চক্রাকারে ঘুরে এসে আবার হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শহরগুলিতে প্রতি ছয় বৎসরে একবার অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মোটের ওপর শহরগুলিতে প্রতি তিন বৎসরে কুম্ভ ও অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হিউয়েন সাং বলেন যে উত্তর ভারতের অধিপতি রাজা হর্ষ কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসী পরিব্রাজক প্রভৃতিদের মধ্যে তাঁর রাজকোষ উন্মুক্ত করে তাঁর সম্পূর্ণ ধন (পাঁচবৎসরের সঞ্চিত) নিঃশেষে দান করেন। হিউয়েন সাং চীন দেশে প্রত্যাবর্তন করবার সময় রাজা হর্ষের বিদায় উপহার স্বর্ণ ও রত্নরাজি গ্রহণে অস্বীকার করে ৬৫৭ খানি হস্তলিখিত ধর্ম-গ্রন্থের পুঁথি অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করে স্বদেশে বহন করে নিয়ে যান।

† আমার মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনন্তদা, জ্যেষ্ঠাভগিনী রমাদিদি, গুরুদেব, পিতৃদেব এবং আমার জনকয়েক অন্তরঙ্গ প্রিয়জনদের কারুরই মৃত্যুসময়ে আমি উপস্থিত ছিলুম না। (পিতা ১৯৪২ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় উননব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।)

১৯৩৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী আমাদের দলটি কুম্ভমেলায় গিয়ে পেঁছিল। প্রায় বিশলক্ষ লোকের জনতা, সে এক বিরাট ও অভাবনীয় দৃশ্য। ভারতবাসীদের, এমন কি দীনতম কৃষকদের মধ্যেও ঠাকুরদেবতা আর সব সাধুসন্ন্যাসী, যাঁরা ভগবানলাভের জন্যে সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে, সব কিছু ত্যাগ করে এসেছেন, তাঁদের উপর একটা স্বাভাবিক ভক্তি আছে। অবশ্য ভন্ড আর বুজরুকও সেখানে যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবুও মুষ্টিমেয় কতকগুলি প্রকৃত সাধুসন্ত, যাঁদের আবির্ভাবে সারাদেশ দেবতার আশীর্বাদপূত হয়ে ধন্য হয়ে গেছে, কেবল তাঁদেরই জন্য নির্বিচারে সকলকেই ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। প্রতীচ্যবাসীরা যাঁরা এ বিরাট দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁরা দেশের নাড়ীর স্পন্দন আর কালের গতির সম্মুখে ভারত তার আধ্যাত্মিক উৎসাহবলে যে অদম্য প্রাণশক্তি পেয়েছে, তা দেখবার একটা অপূর্ব সুযোগ পেলেন।

প্রথম দিন আমাদের শুধু চারদিক ঘুরেফিরে সব দেখেশুনে বেড়িয়ে বেড়াতেই কেটে গেল। হাজার হাজার লোক পাপক্ষালনের জন্য জাহ্নবীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করছে, কোথাওবা ব্রাহ্মণেরা পূজো হোম বা যাগযজ্ঞ করছেন। মৌনী সাধুসন্ন্যাসীদের চরণে লোকজন নানা উপকরণ নিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করছে। সারি সারি হাতীর দল, নানা আভরণে সজ্জিত অশ্বদল, মন্থরগতি উষ্ট্রের দল সব ধীরে ধীরে চলেছে। তাদের সঙ্গে চলেছে সিল্ক বা ভেলভেটের নিশান বা ঝান্ডা, আর স্বর্ণ বা রৌপ্যের দন্ড নিয়ে নাগা-সন্ন্যাসীদের এক বিচিত্র মিছিল।

কৌপীনধারী সন্ন্যাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন; তাঁদের শরীর শীতাতপ নিবারণের জন্য ভস্মানুলিপ্ত, কপালে একটিমাত্র চন্দনের ফোঁটা—তৃতীয় নেত্রের প্রতীক। গৈরিকবসন, মুন্ডিতমস্তক, দন্ডকমন্ডলুধারী সন্ন্যাসীর দল হাজারে হাজারে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কি শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনায়, কি ভ্রমণকালে, তাঁদের মুখে ত্যাগের শান্তমহিমার একটা অনির্বাণ জ্যোতিঃ।

এখানে ওখানে গাছতলায় বড় বড় ধুনি জ্বালিয়ে সাধুরা* সব বসে

* লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সাধুগণ ভারতের সাতটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সাতজন মন্ডলেশ্বর কর্তৃক গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হন। আমার মহামন্ডলেশ্বর অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট শ্রীশ্রীজয়েন্দ্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়। এই মহাপ্রাণ সাধু অত্যন্ত স্বল্পবাক্—তিনটি মাত্র বাক্যে তাঁর আলাপ সমাপ্ত—সত্য, প্রেম ও কর্ম। এই-ই হচ্ছে তাঁর প্রচুর আলাপ-আলোচনা।

রয়েছেন, মাথার উপর জটা বিড়ে করে পাকান। কয়েকজনের আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়ি, কয়েকফুট করে লম্বা, তার আবার ডগায় একটা করে গাঁট বাঁধা। তাঁরা নীরবে ধ্যানে বসে আছেন অথবা চলমান জনতাকে হস্তোত্তোলনে আশীর্বাদ বিতরণ করছেন—ভিক্ষুক, হস্তীপৃষ্ঠে রাজামহারাজা, বিচিত্রবর্ণের শাড়ীপরিহিতা নারীর দল—হাতে তাদের কারুকার্যশোভিত কঙ্কণ, পায়ে তাদের মল, ঝঙ্কার তুলছে রিণিঝিনিঝিনি; কোথাও বা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী অদ্ভুতভাবে হস্তোত্তোলন করে বসে রয়েছেন; ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে রয়েছে আশা; উপবিষ্ট সাধুদের অসাধারণত্ব বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না—তাদের গাম্ভীর্য তাদের অন্তরের পরমানন্দকে লুকিয়ে রেখেছে। হট্টগোল ছাপিয়ে উঠছে মন্দিরের অবিরত ঘণ্টাধ্বনি।

মেলার দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীদের নিয়ে আমি নানা আশ্রম আর কুটির বা ঝোপড়াতে সাধুসন্ন্যাসীদের দর্শন আর প্রণাম করে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। গিরিসম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলুম; ক্ষীণদেহ, চক্ষুদুটি তপঃপ্রভাবে স্নিগ্ধোজ্জ্বল। তারপরে আমরা একটি আশ্রমে গেলুম, সেখানকার গুরুমহারাজ নয়বৎসর ধরে মৌনব্রত পালন করছেন, একমাত্র ফলই আহার করে থাকেন। আশ্রম হলের মাঝখানের বেদীতে প্রজ্ঞাচক্ষু* নামে একটি অন্ধ সাধু বসে—গভীর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর; সর্বসম্প্রদায় কর্তৃক বহুল সম্মানিত।

হিন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে অল্পকিছু বলবার পর আমি সঙ্গীদের নিয়ে সেই শান্তিময় আশ্রমকুঞ্জ পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী আর একটি সাধুর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সাধুটির নাম কৃষ্ণানন্দ, সুন্দর আকৃতি, রক্তিম গণ্ড, সুদৃঢ় স্কন্ধদেশ। তাঁর পাশেই লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে একটি পোষা সিংহী। সাধুটির আধ্যাত্মিক প্রভাবে—অবিশ্যি তার বলিষ্ঠ দেহের শক্তির জন্যে নয়, এটা আমি ঠিক জানি—জঙ্গলের এই হিংস্র মাংসাশী পশুটি সব রকম মাংসাহার পরিত্যাগ করে শুধু ভাত আর দুধ খেয়েই প্রাণধারণ করে। স্বামীজী সেই পিঙ্গলদেহ সিংহীকে 'ওম্' উচ্চারণ করতে শিখিয়েছেন—আর তা বেরোয় বেশ একটা শ্রুতিসুখকর গম্ভীর গর্জনে—বিড়ালের জাত তো, বিড়াল তপস্বী আর কি!

---

* এই নামেই সাধুটি অভিহিত—অর্থাৎ যিনি (জড়চক্ষুর অভাবে) জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন।

তারপর দর্শন হল একটি শিক্ষিত তরুণসাধুর সঙ্গে। রাইট সাহেবের চমকপ্রদ মনোরম ভ্রমণের দিনলিপি হতে তার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হল,—

"আমরা ফোর্ডগাড়ীতে গঙ্গা পার হলুম। গঙ্গা এখানে নিতান্ত অগভীর। নৌকোর উপর পোল পার হতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে। তারপরে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তার ভিতর দিয়ে সর্পিলগতিতে চললুম গড়িয়ে গড়িয়ে। পথে যেতে যেতে যোগানন্দজী, নদীতীরে যেখানে বাবাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই জায়গাটি আমায় দেখালেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা গাড়ী থেকে নেমে কিছুদূর হেঁটে চললুম। রাস্তায় বালিতে পা বসে যায়, তার উপর ধুনির আগুনের গাঢ়ধোঁয়া! তারপর গিয়ে পোঁছলুম খড়মাটি দেওয়া ছোট ছোট কতকগুলি কুঁড়েঘরের কাছে। এদেরই মধ্যে একটার সামনে এসে দাঁড়ালুম, একটি অস্থায়ী কুটির, প্রবেশপথ অতি ক্ষুদ্র, কোন দরজা নাই— এই-ই হচ্ছে করপাত্রীজীর আশ্রয়। করপাত্রীজী নবীন পরিব্রাজক সাধু। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে তিনি একগাদা খড়ের উপর পদ্মাসনে বসে আছেন; তাঁর একমাত্র আচ্ছাদন—আর বোধ হয় তাঁর ঐ একমাত্রই সম্পত্তি—একটি গৈরিকবর্ণের বস্ত্রখণ্ড, স্কন্ধের উপর আলম্বিত।

"কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঝোপড়ার ভিতর ঢুকে প্রণাম সারতেই দেখলুম, মুখে তাঁর কি অপরূপ হাসি—বাস্তবিকই স্বর্গীয় সুষমায় ভরা, পরমশান্তি বিকিরণ করছে; দুয়ারের কাছে কেরোসিন লণ্ঠনের আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে দেওয়ালের উপর নানারকম অদ্ভুতমূর্তির ছায়া রচনা করছে। তাঁর মুখটি, বিশেষতঃ তাঁর চক্ষুদুটি আর সুন্দর দন্তপংক্তি হাসিতে উজ্জ্বল। তাঁর হিন্দীভাষণ ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও তাঁর মুখের ভাব সহজেই বোধগম্য ছিল; প্রেম, আধ্যাত্মিক গৌরব ও উদ্দীপনায় পূর্ণ তিনি। তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে কারুরই মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

"কল্পনা করুন—সাংসারিক আসক্তিবিহীন, পরমনিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ও সুখী জীবন; অশনবসনের কোন ভাবনা নাই, আহারের বৈচিত্র্যের জন্য কোনও লালসা নাই। একদিন অন্তর পক্কান্ন গ্রহণ করেন—হস্তে ভিক্ষাপাত্র নাই; সর্বপ্রকার অর্থচিন্তার জটিলতা হতে মুক্ত, টাকাকড়ি স্পর্শও করেন না, কোন সঞ্চয় নাই, ভগবানে তাঁর সদা গভীর বিশ্বাস; যাতায়াতের কোন হাঙ্গামা পোহাতে হয় না, গাড়ীতে কখনও চড়েন না; কিন্তু স্থানান্তরে যেতে হলে সর্বদা নদীর ধার দিয়েই যাতায়াত করেন; কোথাও একহপ্তার বেশী থাকেন না, পাছে সেখানে মন বসে যায়!

"আর কি বিনয়নম্র ভাব! বেদে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বেনারস হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও শাস্ত্রী উপাধিধারী। তাঁর চরণতলে উপবেশন করতে একটা মহান উদারভাব আমার মনে উদয় হল; বুঝলুম যে, আমি যে সত্যকারের প্রাচীন ভারতের সন্ধানে বেরিয়েছি এখানে তার উত্তর পেলুম—কারণ আমার কাছে বোধ হল যে এইসব বিরাট বিরাট সাধুসন্ন্যাসী, মুনিঋষি, যোগীতপস্বীদের দেশের ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত প্রতিনিধি।"

করপাত্রীজীকে তাঁর পরিব্রাজকজীবনের কথা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "শীতের জন্যে বেশী কাপড়চোপড় রাখেন না?"

"না, এই-ই যথেষ্ট।"

"বই সঙ্গে রাখেন কি?"

"না, যাঁরা আমার কাছ থেকে শুনতে চান, তাঁদের আমি স্মৃতির সাহায্যে শিক্ষা দি।"

"আর কি করেন?"

"গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই!"

কি চমৎকার সরল ও সুন্দর জীবন! তাঁর জীবনের মধুর সারল্য, নিরুদ্বেগ শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা আমার মনকে সবলে আকর্ষণ করলে। অ্যামেরিকায় আমার স্কন্ধে ন্যস্ত নানাকাজের দায়িত্বভারের কথা মনে পড়ল। ক্ষুণ্ণ মনে মুহূর্তেক ভাবলুম, "না যোগানন্দ, এ জীবনে গঙ্গারধারে ঘুরে বেড়ান তোমার চলবে না—অনেক কাজ তোমার এখনও বাকী।"

সাধুটি তাঁর গুটিকতক আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমার কাছে বিবৃত করবার পর আমি হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলুম, "আপনি কি এ সব বর্ণনা শাস্ত্রকথা থেকে বলছেন, না অন্তরের উপলব্ধি থেকে?"

সরল হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "অর্ধেক বই থেকে আর বাকী অর্ধেকটা অনুভব।"

আমরা বসে রইলুম খানিকক্ষণ সেখানে নীরব ধ্যানের শান্তিতে, উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাঁর পবিত্রসান্নিধ্য ত্যাগ করে বাইরে এসে রাইট সাহেবকে বললুম, "রাইট, রাজাকে দেখলে,—সোনার খড়ের সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট?"

রাত্রে সেই মেলাক্ষেত্রে ভূমির উপর বসেই মুক্ত আকাশের তলায় নক্ষত্রালোকে আহারপর্ব শেষ করলুম। কাঠি দিয়ে গাঁথা শালপাতায় খাওয়া, বাসনকোসন মাজার কোন হাঙ্গামার বালাই নাই।

কুম্ভমেলায় আরও দুদিন কেটে গেল তারপরে যমুনার তীর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে আগ্রানগরীতে গিয়ে পৌঁছলুম। তাজমহলের দিকে চাইতে

স্মৃতিতে উদয় হল, জিতেন্দ্র মর্মরস্বপ্নের অপূর্বসৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে !

তারপর চললুম বৃন্দাবনে স্বামী কেশবানন্দজীর আশ্রমে।

কেশবানন্দজীকে খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্য ছিল এই পুস্তকসংক্রান্ত ব্যাপারে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অনুরোধ ছিল যেন আমি লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী লিখি, সেকথা আমি কখনও ভুলিনি। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন আর তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের প্রত্যেকটি সুযোগ আমি গ্রহণ করছিলুম। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বিস্তারিতভাবে লিপিবন্ধ করে আমি প্রত্যেকটি ঘটনা সন তারিখ মিলিয়ে নিয়েছি, আর ফটোগ্রাফ, পুরান চিঠি ও অন্যান্য দলিলপত্রাদিও সংগ্রহ করেছি। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীর উপকরণের কাগজ-পত্রাদি দিন দিন সংগ্রহ করে বেশ বেড়ে উঠল। তারপর একটু ভয়ও হল যে, এবার আমার সামনে গুরুতর শ্রমসাধ্য পুস্তকপ্রণয়নের যে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে—তা সম্পন্ন করি কি করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালুম যে এই মহাগুরুর জীবনীলেখক হিসাবে আমার কর্তব্য যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও মনে আশঙ্কা হল যে তাঁদের গুরুর বিষয়ে লিখিত বিবরণে হয়ত তাঁদের গুরুকে ক্ষুদ্র করে ফেলা হবে অথবা তাঁর ভুল বর্ণনা দেওয়া হবে।

তাঁর এক প্রধান শিষ্য শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় একবার আমায় বলে-ছিলেন, "দেবতার যিনি অবতার, তাঁর জীবনী শুধু দুটো নীরস কথায় সাজিয়ে লিখলে তাঁর প্রতি অতি অল্পই বিচার করা হবে।"

অন্যান্য শিষ্যরাও তেমনি চেয়েছিলেন যে, তাঁদের অমরগুরু তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলেই লুকোন থাকুন—তাঁর কথা আর বাইরে প্রকাশ করে কাজ নেই। যাই হোক, তাঁর জীবনী সম্বন্ধে লাহিড়ী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে আমি তাঁর বাহ্যজীবনের ঘটনাসকল সংগ্রহ আর তাদের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি।

বৃন্দাবনে কেশবানন্দজী আমাদের দলটিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন তাঁর কাত্যায়নী পীঠ আশ্রমে। বাড়ীটি ইঁটের, বড় বড় কালো থাম দেওয়া—চারিদিকে সুন্দর বাগান। তিনি তখুনিই আমাদের একটি বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন, লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বড় প্রতিকৃতি ঘরের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। স্বামীজীর বয়স নব্বুই-এর কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর পেশীবহুল দেহ হতে শক্তি আর স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দীর্ঘকেশ, তুষারশুভ্র

শ্মশ্রু, চক্ষুদুটি আনন্দে উজ্জ্বল—প্রাচীন ঋষিদের মতই সৌম্যদর্শন। আমি তাঁকে বললুম যে ভারতের গুরুদের সম্বন্ধে আমার পুস্তকে তাঁর বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই।

বড় বড় যোগীরা সাধারণতঃ কোন কিছু প্রকাশ করতে চান না। তবুও আমি একটু বিনীত অনুনয়ের হাসি হেসে বললুম, "দয়া করে আপনার বাল্য-জীবনের কথা কিছু বলুন না, শুনি?"

কেশবানন্দজীর ভাবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেল। বললেন, "আমার জীবনে বলবার আর বিশেষ কি আছে? বলতে গেলে আমার সারা জীবনটাই হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ে, এক নীরব গুহা থেকে আর এক গুহায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়াতেই কেটে গেছে। কিছু দিনের জন্যে আমি হরিদ্বারের বাইরে একটা আশ্রম করেছিলুম—চারদিকে বড় বড় বৃক্ষকুঞ্জে ঘেরা। জায়গাটি খুব শান্তিপূর্ণ, যাত্রীরা বড় কেউ একটা সেখানে ঘেঁসত না—কারণ জায়গাটাতে অনেক কেউটে সাপের বাসা ছিল।" বলে কেশবানন্দজী একটু হেসে আবার শুরু করলেন, "তারপর একদিন গঙ্গায় বান এসে আশ্রমটির সঙ্গে সঙ্গে কেউটেসাপগুলোকেও কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল তা কে জানে। তারপর আমার শিষ্যদের সাহায্যে বৃন্দাবনে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছে।"

আমাদের দলের মধ্যে একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করে বসল যে তিনি হিমালয়ের বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেন কি করে?

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হিমালয়ের মতন অত উঁচু একটা আধ্যাত্মিক ভূমিতে বন্যপশুরা কদাচিৎ যোগীঋষিদের উপর অত্যাচার করতে আসে। একবার আমি জঙ্গলের ভিতর বাঘের মুখে পড়েছিলুম। আমার হঠাৎ চিৎকারে বাঘটা যেন জমে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।" স্বামীজী স্মৃতির রোমন্থনে আবার একটু হাসলেন।*

* ব্যাঘ্রকে ভীতিপ্রদর্শনের নানা উপায় আছে বলে বোধ হয়। ফ্রান্সিস বার্টলস নামে জনৈক অস্ট্রেলিয়ান অভিযাত্রী বর্ণনা করেছেন যে তিনি ভারতের জঙ্গলপ্রদেশকে "বিচিত্র, সুন্দর ও নিরাপদ" বলেই দেখতে পেয়েছেন। তাঁর আপদুদ্ধার কবচ ছিল—মাছি আটকাবার কাগজ; তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "প্রতি রাত্রে আমি বহুল পরিমাণে মাছিধরা কাগজ আমার তাঁবুর চারধারে ছড়িয়ে রাখতুম, তার ফলে কোন উপদ্রব হত না। তার কারণটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক। ব্যাঘ্র হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যার বেশ টনটনে জ্ঞানের মর্যাদা আছে। অতি সন্তর্পণে সে ঘুরে বেড়ায় মানুষকে আক্রমণের জন্য, তারপর যেই সে মাছিধরা কাগজের কাছে এসে পৌঁছয়, অমনি সে চুপিসাড়ে সরে পড়ে! কোন আত্মমর্যাদা

"মাঝে মাঝে এই নির্জনবাস ছেড়ে আমি গুরুদর্শনের জন্য কাশী যেতুম। হিমালয়ের জঙ্গলে অনবরত ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তিনি আমায় খুব ঠাট্টা করতেন।

"একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, 'তোমার ভবঘুরে বৃত্তি আর ঘুচল না দেখছি। অনবরতই তো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও। যাক্, রক্ষে যে হিমালয় পাহাড়ের মতন বিরাট জায়গা পেয়েছ, খুব ঘুরে বেড়াতে পারবে।' "

কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, "লাহিড়ীমহাশয়ের তিরোধানের পূর্বে আর পরে বহুবার তিনি আমার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। হিমালয়ের উচ্চতাও তাঁর মতন লোকের কাছে তো অনধিগম্য নয়।"

ঘণ্টাদুই পরে তিনি আমাদের একটি খাবার দালানে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমি সভয়ে একটি নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেললুম—হায়রে, এখানেও দেখি যে সেই ষোড়শোপচারে আহারের ব্যবস্থা! ভারতে এসেছি—এখনও বছর পূর্ণ হয় নি, এরই মধ্যে ওজনে পঞ্চাশ পাউন্ড বেড়ে গেছি। তা হলেও আমার সম্মানে প্রদত্ত অন্তহীন ভোজে সযত্নে প্রস্তুত এইসব নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটাও অভদ্রতার চূড়ান্তই হবে বলে মনে হল। ভারতবর্ষে (হায়রে, আর কোথাও নয়!) বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধরদেহ সাধু একটি মনোরম দৃশ্যই বটে।

ভোজনের পর কেশবানন্দজী একটি নির্জন জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনার আসা আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, আপনার জন্যে একটা খবর আছে।"

আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলুম। কেশবানন্দজীকে দর্শন করার মতলব আর কেউ তো জানত না, তবে ইনি জানতে পারলেন কি করে?

তিনি বলতে লাগলেন, "গত বৎসর হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে বদরীনারায়ণের কাছে বেড়াতে বেড়াতে আমি পথ হারিয়ে ফেলি। ঘুরতে ঘুরতে দেখি যে বেশ প্রশস্ত একটি গুহা, একেবারে খালি, আশ্রয় নিলুম; ভিতরে দেখি যে পাথরের মেঝেতে একটা গর্তে ধুনির আগুন জ্বলছে। এই নির্জনস্থানে কে বাস করেন? কার এ ধুনি? মনে মনে এই সব তোলপাড় করতে করতে চারদিকে ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু কিছুই সেখানে দেখতে পেলুম না। ধুনির পাশে গিয়ে বসে পড়লুম, দৃষ্টি স্থির রাখলুম গুহার সূর্যালোকিত প্রবেশ পথের মুখে।

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাঘ্রপ্রবর একবার চটচটে মাছিধরা কাগজের উপর বসবার মজা টের পেয়ে আর কখনও মানুষের সামনে আসতে সাহস করে না।"

"পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'কেশবানন্দ, তুমি যে এখানে এসে পড়েছ তাতে আমি খুশী হয়েছি।' চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বাবাজী মহারাজ। সেই পর্বতকন্দরে মহাগুরু তখন সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। বহুবৎসর বাদে পুনরায় তাঁর দর্শন লাভ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁর পবিত্র চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

"বাবাজী বলতে লাগলেন, 'আমিই তোমায় এখানে এনেছি। সেই জন্যেই তুমি পথ হারিয়ে আমার এই সাময়িক গুহার বাসায় এসে হাজির হয়েছ। আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল বহুদিন আগে; যাক্, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব খুশী হয়েছি।"

"তারপর সেই মহামহিমময় অমর মহাগুরু কতকগুলি আধ্যাত্মিক উপদেশের কথা বলে আমায় আশীর্বাদান্তে বললেন, 'যোগানন্দকে বলার জন্যে তোমায় একটা কথা বলছি। ভারতে ফিরে এসে সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তার গুরু আর লাহিড়ীর জীবিত শিষ্যদের সংক্রান্ত বহুব্যাপারে সে নানাকাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকবে। তাকে বোলো যে, খুবই আগ্রহের সঙ্গে আশা করলেও এবার আর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না; আর এক সময় তাকে দেখা দেব।' "

বাবাজীর মধুর আশ্বাস কেশবানন্দজীর মুখ থেকে শুনে আমার অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। মনের গোপন কোণে একটু ক্ষোভের যে সঞ্চার হয়েছিল—তাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আগেই যা ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়াল—কুম্ভমেলাতে বাবাজীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, তার জন্যে আর দুঃখও রইল না।

আশ্রমে একরাত্রি আতিথ্যলাভ করে তার পরদিন বৈকালে কলকাতার দিকে আমাদের দল রওনা হল। যমুনার পোলের উপর দিয়ে গাড়ী চলল, বৃন্দাবনের দিক্‌চক্রবালরেখার অপূর্ব মহিমময় সৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে উঠল—সূর্যদেব তখন সারা আকাশে আগুনের হোলি খেলে পাটে বসেছেন; যমুনার স্থিরজলে সে রঙের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়ে নদীর জল রক্তরাঙা করে তুলেছে।

শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলার পুণ্যস্মৃতিতে যমুনাতীর পবিত্র। গোপিনীদের সঙ্গে এখানে তিনি বাল্যকালে সরল মধুর লীলা প্রদর্শন করেন—ঈশ্বরের অবতার আর তাঁর ভক্তজনের মধ্যে যে চিরন্তন ভগবৎপ্রেম বর্ত্তমান, তাঁর লীলায় তাই-ই প্রকটিত। বহু পাশ্চাত্য টীকাকার শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি—অনেকেই ভুল বুঝেছেন। শাস্ত্রের রূপক শুধু আক্ষরিক অর্থগ্রাহী লোকেদের মনের ধারণার অতীত। জনৈক অনুবাদকের একটি

হাস্যকর ভুল এখানে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গল্পটি মধ্যযুগের এক উচ্চস্তরের সাধক চর্মকার রবিদাস সম্বন্ধে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক মহিমা লুকিয়ে, তা তিনি নিজ বৃত্তির ভাষায় সরল প্রাণে গেয়েছিলেন,—

"বিশাল নীল গগন মাঝে,
চর্মে ঢাকা দেবতা রাজে।"

একজন পাশ্চাত্য লেখকের রবিদাসের কবিতার একটা নেহাৎই কল্পনাবিহীন ও গ্রাম্য এই ব্যাখ্যা শুনে কেউ আর হাস্য সম্বরণ করতে পারবেন না। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এই,—

"তিনি তারপর একটি কুটির নির্মাণ করে তাতে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। মূর্তিটি চর্মে নির্মিত। তারপর সেটি পূজো করা শুরু করলেন।"

রবিদাস ছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ কবীরের গুরুভ্রাতা। রবিদাসের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন চিতোরের রাণী। তিনি গুরুর সম্মানে একবার এক বিরাট ভোজে বহু ব্রাহ্মণকে চিতোরে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ্যগর্বে গর্বিত নিমন্ত্রিতের দল নীচজাতীয় মুচির সঙ্গে একত্র আহার করতে সম্মত হলেন না। তাঁরা বসলেন এক স্বতন্ত্র ঠাঁইয়ে—নিজেদের মর্যাদা ও শুচিতা সযত্নে রক্ষা করে, জাত বাঁচিয়ে। তখন হল এক ভারি মজা। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবটুরা দেখলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে এক একজন করে রবিদাস বসে। কারুরই পাশ খালি নেই। ব্যাপার দেখে তো সকলেই অবাক্। যাক্, তার ফলে হল এই যে, এই ব্যাপারের পর গোঁড়ামি আর ততটা বজায় রইল না। চিতোরে একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ সাধিত হল।

আমাদের ছোট দলটি অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই কলকাতায় গিয়ে পৌঁছল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ নিয়ে এসে শুনে হতাশ হলুম যে তিনি শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে পুরী চলে গেছেন। পুরী কলকাতার প্রায় তিনশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

৮ই মার্চ তারিখে এক গুরুভ্রাতা, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে গুরুদেবের একজন কলকাতার শিষ্যকে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন, "পুরী আশ্রমে এখুনিই চলে আসুন।" টেলিগ্রামের সংবাদ কানে পৌঁছতেই এর অর্থ কি বুঝতে আর দেরী হল না—পা দুটো ভেঙ্গে পড়ল—নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, গুরুদেবের জীবন যেন এ যাত্রা তিনি রক্ষা করে দেন।

ট্রেন ধরবার জন্যে বাড়ী থেকে বেরোতেই অন্তরের মধ্যে এক দৈববাণী শুনেতে পেলুম,—

"পুরীতে আজ রাত্রে যেও না। তোমার প্রার্থনা সফল হবার নয়।"

দুঃখে যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে বললুম, "প্রভু, পুরীতে গেলে যে তোমার আমার মধ্যে জীবনমৃত্যুর টানাটানি চলবে, সে তো তোমার ইচ্ছা নয় দেখছি; সেখানে গেলে তো গুরুদেবের জীবন বাঁচাবার জন্যে আমার অবিরত প্রার্থনা তোমায় সবই বিফল করে দিতে হবে। তবে কি আরও উচ্চতর কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে তোমার কাছে ফিরে যেতেই হবে?"

আমার অন্তরের বাণী শিরোধার্য করে সে রাত্রি তো আমি পুরী যাত্রা স্থগিত রাখলুম। তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা ট্রেন ধরার জন্য যাত্রা করলুম। তখন প্রায় সাতটা বাজে। একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে এসে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেললে।* তারপরে দেখলুম আমাদের ট্রেন যখন পুরীর দিকে ছুটে চলেছে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মূর্তি তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হল। তাঁকে দেখলুম আসনে উপবিষ্ট, অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি, তাঁর দুইধারে দুইটি আলো।

করজোড়ে অনুনয় করে বললুম,—"সব কি শেষ হয়ে গেছে?"

তিনি একটু মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তার পরদিন পুরী প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে, তখনও ক্ষীণতম আশা, এমন সময় একটি অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বললে, "শুনেছেন কি, আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন?" বলেই আর একটিমাত্র কথা না কয়েই লোকটা চলে গেল; লোকটা যে কে আর আমাকে এখানেই বা কি করে খুঁজে পাবে তা সে জানলে কি করে, তা কখনো জানতে পারিনি।

চলৎশক্তি লোপ পেয়েছে, পা টলছে, হতভম্ব হয়ে প্ল্যাটফরমের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম—বুঝলুম যে নানা উপায়ে আমার গুরুদেব আমায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা জানাতে চাচ্ছেন। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড়, অন্তর অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত। পুরী আশ্রমে পৌঁছবার সময় আমার তো একেবারে সঙ্গীন অবস্থা। অন্তরের বাণী তখন স্নিগ্ধস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে,—

"ধৈর্য ধর, শান্ত হও, স্থির হও।"

আশ্রমের ঘরে প্রবেশ করলুম, গুরুদেবের দেহ কল্পনাতীতভাবে জীবন্তের

* এই সময় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দেহত্যাগ করেন—সন্ধ্যা ৭টা, ৯ই মার্চ ১৯৩৬।

মত, পদ্মাসনে উপবিষ্ট—তখনও স্বাস্থ্য আর কমনীয়তায় অঙ্গ সমুজ্জ্বল, মহাসমাধিতে মগ্ন হয়েছেন। তাঁর তিরোধানের অল্প কিছুদিন আগে তাঁর একটুমাত্র জ্বর হয়েছিল; তারপর তাঁর স্বর্গারোহণের পূর্বদিবসে তাঁর দেহ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। যতবারই তাঁর প্রিয়মূর্তির দিকে আমি তাকাচ্ছি, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, প্রাণ তাঁর দেহ ত্যাগ করে চলে গেছে। তখনও তাঁর গাত্রচর্ম মসৃণ আর কোমল; আননে তাঁর একটা স্বর্গীয় পরমানন্দময় শান্তির ভাব প্রকটিত। রহস্যময় অন্তিম আহ্বানের শেষমুহূর্তে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন।

অভিভূতের মত চিৎকার করে বলে উঠলুম, "বাংলার সিংহ আজ চলে গেল।"

১০ই মার্চ তারিখে আমি তাঁর পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করলুম। পুরী আশ্রমের বাগানের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাচীন শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যদেহের সমাধি* দেওয়া হল। পরে এক মহাবিষুব সংক্রান্তিতে তাঁর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য দূরদূরান্তর হতে তাঁর বহুশিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর চিত্রসম্বলিত নিম্নলিখিত এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়,—

"২১শে মার্চ তারিখে পুরীধামে, শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ ৮১ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। তিরোভাব উপলক্ষ্যে ভান্ডারা দেওয়া হয়, এজন্য তাঁর বহু শিষ্য পুরীধামে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"স্বামী মহারাজ কাশীধামের যোগিরাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার ও ব্যাখ্যাতা। স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষে যোগদা সৎসঙ্গের (সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ) কয়েকটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা—আর যোগপ্রচারের প্রধান উৎসাহস্থল ছিলেন। এই যোগপ্রচারকার্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানন্দ পশ্চিমে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আর তাঁর গভীর উপলব্ধি স্বামী যোগানন্দকে সমুদ্রযাত্রা করে অ্যামেরিকায় গিয়ে ভারতের ধর্মগুরুদের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে।

* হিন্দুমতে শেষকৃত্যাদিতে গৃহীদের পক্ষেই দাহের ব্যবস্থা আছে। সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতিদের দাহ না করে সমাধি দেওয়া হয় (অবশ্য মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও হয়)। সাধু প্রভৃতি দের দেহ সন্ন্যাসগ্রহণের সময় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

"তাঁর গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে, আর তা প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের ঐক্যসাধনে সকলের কাছে পথপ্রদর্শকস্বরূপ হয়ে আছে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সকল ধর্মবিশ্বাসের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস করতেন বলে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাহায্যে 'সাধুসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন, ধর্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবসঞ্চারের জন্য। তাঁর মৃত্যুকালে তিনি 'সাধুসভা'র সভাপতি হিসাবে স্বামী যোগানন্দ গিরিজীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

"ভারত আজ এরূপ একজন মহৎ ব্যক্তিকে হারিয়ে বাস্তবিকই অধিকতর দীন হয়ে পড়ল। তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মধ্যে যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তা তাদের মধ্যে প্রসারিত হোক।"

কলিকাতায় ফিরলুম। তাঁর সহস্র পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত শ্রীরামপুর আশ্রমে ফিরবার মতন মন আমার এখনও ঠিক হয় নি দেখে তাঁর সেই প্রফুল্ল নামে ছোট শিষ্যটিকে শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে ডেকে আনিয়ে রাঁচি বিদ্যালয়ে ভর্তি করবার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিলুম।

প্রফুল্ল আমাকে বলেছিল, "যেদিন সকালে আপনি এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন, গুরুজী সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ে বলতে লাগলেন, 'যোগানন্দ চলে গেল, এ্যাঁ, যোগানন্দ চলে গেল! তাহলে তাকে তো দেখছি অন্য কোন উপায়ে বলতে হবে।' তারপর ঘন্টাকতক ধরে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন।"

তারপর আমার দিনগুলো কাটতে লাগল বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, দেখাসাক্ষাৎ করা আর পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে। শুকনো হাসির তলায় চাপা আর অবিরল কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে একটা ঘন অন্ধতমিস্র বিষাদের স্রোত যা বয়ে চলেছিল, তা আমার সকল অনুভূতির বালুতটের মধ্য দিয়ে দুকূল পরিপ্লাবিত করে যে আনন্দের নদী এতদিন ধরে অবিরামগতিতে বয়ে চলেছিল, তাকে একেবার পঙ্কিল করে তুললে।

শোকদগ্ধ বিষাদখিন্ন অন্তর থেকে একটা নীরব ক্রন্দন অবিরাম ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল, "দেবতা আমার, গুরুজী আমার, কোথায় গেলেন?"

কোন উত্তর এল না।

মন শুধু এই আশ্বাস দিলে, মাত্র এইটুকু সান্ত্বনা পেলুম যে, "ভালই

হয়েছে—গুরুদেবের সেই পরমানন্দময়ের সাথে পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে। তিনি সেই অনন্তস্বর্গে, সেই অমরলোকে আজ চিরবিরাজমান।"

মন ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, "আর তো তুমি কখনও তাঁকে শ্রীরামপুরের বাড়ীতে দেখতে পাবে না। আর তো তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে তাঁকে দেখিয়ে সগর্বে বলতে পারবে না, 'তোমরা দেখ গো সব দেখ, ঐ ভারতের জ্ঞানাবতার বসে রয়েছেন।' "

জুন মাসের গোড়ার দিকে রাইট সাহেব বোম্বাই থেকে জাহাজে আমাদের সবাইকার যাবার ব্যবস্থা করে ফেললে। মে মাসের দিন চৌদ্দ বিদায় অভিনন্দন বক্তৃতা-দিতে কলকাতায় কাটাবার পর, মিস্ ব্লেচ, মিষ্টার রাইট আর আমি ফোর্ডগাড়ীতে করে বোম্বাইএর পথে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের এসে পেঁছিবার পর জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখবার জন্যে বললে, কারণ ফোর্ডগাড়ীটির সে জাহাজে স্থান হবার কোন উপায় ছিল না, অথচ ইউরোপে আবার সেটিকে নিতান্তই দরকার।

মুখ অন্ধকার করে রাইট সাহেবকে আমি বললুম, "কুছ্ পরোয়া নেই, আমি আবার পুরীতেই ফিরে যাব।" মনে মনে বললুম, "গুরুজীর সমাধি আবার আমার দুটি নয়নের জলে সিক্ত হয়ে উঠুক।"

৪৩শ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুনরুত্থান

বোম্বাই-এর রিজেন্ট হোটেলে আমার ঘরের ভিতর বসে আছি। রাস্তার ওপারে একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ী। তিনতলার ঘরের খোলা বড় জানালার ভিতর দিয়ে তার ছাতের দিকে চেয়ে আছি—হঠাৎ চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল। একটা বিরাট অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যবর্তী ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব পুণ্যমূর্তির আবির্ভাব ঘটল। কি অপরূপ সে রূপের মাধুরী!

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দর্শনদানে কৃতার্থ করে আজ আমায় মৃদুহাসিতে মাথা নেড়ে ডেকে কি ইঙ্গিত করলেন। তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম সম্যক অবগত হতে না পারাতে তিনি আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন; জীবন ধন্য হল, মন অনাবিল গভীর আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—বুঝলুম কোন ভবিষ্য আধ্যাত্মিক ঘটনার এ একটা পূর্বাভাস।

আমার পশ্চিমগমন তখন সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। কলকাতা ও পুরীতে ফিরে আসবার পূর্বে বোম্বাইয়ে আমার গোটাকতক বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের ১৯শে জুন তারিখে বেলা ৩টা নাগাদ বোম্বাইয়ের হোটেলে আমার বিছানার উপর বসে আছি—সেটা আমার শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দর্শনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে—হঠাৎ একটা অপরূপ সুন্দর স্বর্গীয় জ্যোতিঃস্ফুরণে আমার ধ্যান টুটে গেল। আমার উন্মুক্ত আর বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল—সারা ঘরটা যেন একটা অপরূপ জগতে রূপান্তরিত হল। সূর্যালোক পরিবর্তিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক স্বর্গীয় আলোর দীপ্তি!

চোখের সামনে দেখলুম, রক্তমাংসের শরীরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড আনন্দের স্রোত আমার সর্বশরীর দিয়ে বয়ে গেল।

গুরুদেবের মুখে অমিয়নিষ্যন্দী দেবদুর্লভ সুমধুর হাসি। স্নিগ্ধকোমল কণ্ঠে বললেন, 'বৎস যোগানন্দ!'

জীবনে এই প্রথম গুরুর চরণতলে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে ভুলে

গেলুম, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বাহুযুগলে আঁকড়িয়ে ধরে আমার তৃষিত ক্ষুধার্ত হৃদয়ে আকর্ষণ করবার জন্যে মন উদ্দাম হয়ে উঠল। সে এক অপূর্ব মুহূর্ত! গত কয়েকমাসের বিরহযন্ত্রণাক্লিষ্ট মনের গুরুভার লঘু হয়ে গিয়ে আজকের এই আনন্দের পাগলাঝোরার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল, তা কে জানে?

"গুরুজী আমার, অন্তরের ধন, কেন আপনি আমায় ছেড়ে গেলেন—কেন, কেন?" আনন্দে উন্মত্ত হয়ে অসংলগ্ন সব কি যে তখন বলতে লাগলুম কিছুই তা মনে নেই। "কেন আপনি আমায় কুম্ভমেলায় যেতে দিলেন? আপনাকে ছেড়ে চলে আসার ভুলের জন্য নিজেকে যে কত গুরুতর দোষ দিয়েছি, তা আর কি বলব।"

"বাবাজীর সঙ্গে আমি প্রথম যেখানে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলুম, সেই তীর্থস্থান দর্শন করবার তোমার আনন্দের আশায় তো আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি নি। তোমাকে ছেড়ে এসেছি এই তো অল্প কিছু সময়ের জন্য; আবার 'ত তোমার কাছে ফিরে এসেছি।"

"কিন্তু, কিন্তু গুরুদেব, একি সত্যিই আপনি, সেই ঈশ্বরের সিংহ, আমাদের মহাগুরু জ্ঞানাবতার? পুরীর নিষ্ঠুর মাটির তলায় যে দেহ সমাধি দিয়ে এসেছি, আপনি কি সেই রকম একটা দেহ ধারণ করে এসেছেন বলুন! বলুন!"

"হ্যাঁ, বৎস; আমিই সেই! এটা রক্তমাংসেরই শরীর জেনো। যদিও আমার দৃষ্টিতে এটা সূক্ষ্ম কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে এটা জড়দেহ। তোমার স্বপ্নজগতের পুরীধামে স্বপ্নবালুকার নীচে বিশ্বস্বপ্নে গড়া যে জড়দেহ সমাধি দিয়ে এসেছ, ঠিক তারই মত একটি সম্পূর্ণ নূতন দেহ আমি মহাব্যোমপরমাণু থেকে সৃষ্টি করে নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে গেলে মৃতাবস্থা থেকে আমি পুনরুত্থিত হয়েছি—এ পৃথিবীতে নয়—সূক্ষ্ম জগতে। পৃথিবীর লোকেদের চেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা আমার উচ্চাবস্থার সম্মুখীন হতে বেশী সমর্থ। সেখানে তুমি আর তোমার অতি আদরের প্রিয়তম আত্মীয়বান্ধবেরা এককালে সকলেই আমার কাছে আসবে।"

"মরণজয়ী গুরুদেব, বলুন বলুন, আরও কিছু আমায় বলুন!"

গুরুজী একটু দ্রুত উচ্চহাস্য করে বললেন, "আরে বাপু, ছাড়, ছাড়, একটু ঢিলে করে ধর!"

"আচ্ছা, কেবল একটুখানি!" অষ্টপদ অক্টোপাসের মত দৃঢ়বন্ধনে আমি তাঁকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছিলুম—যে বাঁধুনি কষে আমি তাঁকে ধরে

রেখেছিলুম তাতে তিনি তা বলবেন বই কি! তা যাক্—তাঁর কথায় আমার দৃঢ়সম্বন্ধ আলিঙ্গন কিঞ্চিৎ শিথিল করে দিতে হল। পূর্বে তাঁর পার্থিব শরীরের যে বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক সেই একই রকম মৃদু সুরভির স্বাভাবিক গন্ধই টের পেলুম। যখন সেই আনন্দোজ্জ্বল গৌরবময় পরম মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়ে, তখন তাঁর সেই দিব্যশরীরের প্রাণোন্মাদনাকারী স্পর্শ আজও আমার দুইবাহু ও করতলের মধ্যে অনুভব করি।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "জড়জগতে মানুষকে কর্মক্ষয়ের জন্য সাহায্য করতে মহাপুরুষেরা যেমন প্রেরিত হন—আমিও তেমনি এক সূক্ষ্মজগতে মুক্তিদাতারূপে কাজ করবার জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। আমি যেখানে এসেছি সে জায়গাটার নাম হচ্ছে 'হিরণ্যলোক'। সেখানে আমি উচ্চস্তরের জীবদের তাঁদের সূক্ষ্মজগতের কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে সূক্ষ্মজগতে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সাহায্য করছি। হিরণ্যলোকবাসীরা আধ্যাত্মিকতায় খুব উচ্চাবস্থা লাভ করেছেন; তাঁদের মধ্যে সকলেই তাঁদের শেষ পার্থিবজন্মে মৃত্যুকালে সমাধিমগ্ন হয়ে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করবার ক্ষমতা ধ্যানবলে লাভ করেছেন। আর পৃথিবীতে যাঁরা সবিকল্প সমাধির অবস্থা অতিক্রম করে নির্বিকল্প সমাধির উচ্চাবস্থায় না পৌঁচেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউই হিরণ্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন না।*

"হিরণ্যলাকের অধিবাসীরা প্রেতলোকের সাধারণ স্তরগুলি অতিক্রম করে এসেছেন যেখানে মৃত্যুর পর পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষকে অবশ্যই যেতে হবে; সেই সব প্রেতলোকে তাঁরা তাঁদের সূক্ষ্মজগতের বহু প্রাক্তনকর্মের বীজের বিনাশ সাধন করে এসেছেন। খুব অগ্রসর আর উচ্চস্তরের জীব ছাড়া পরলোকে এ রকম মুক্তিসাধক কাজ আর কেউ কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে না।† তারপর তাদের সূক্ষ্মজগতের সকল প্রকার কর্মবন্ধনের লেশমাত্র

* সবিকল্প সমাধিতে সাধক ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন বটে কিন্তু তাঁর এই সমাধিতে তিনি নিশ্চল তন্দ্রাবস্থা ভিন্ন অবস্থান করতে পারেন না। সুদীর্ঘ ও গভীর ধ্যানের সাহায্যে তিনি আরও উচ্চতর অবস্থা, নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় আরোহণ করতে পারেন, যেখানে থেকে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধিচ্যুত না হয়ে সংসারে ইচ্ছামত বিচরণ করেন, এবং সাংসারিক কর্তব্যসকলও পালন করেন।

নির্বিকল্প সমাধিতে যোগি তাঁর পার্থিব কর্মের শেষ নিদর্শনটুকুও ক্ষয় করে ফেলেন। তথাপি তাঁকে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কারণজগতের কর্ম ক্ষয় করতে হয়, কাজেই তাঁকে আরও উচ্চতর স্তরের সূক্ষ্ম ও কারণদেহ পুনরায় ধারণ করতে হয়।

† কারণ বহুলোকেই সূক্ষ্মজগতের আনন্দ ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কৃচ্ছ্রসাধনের কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না।

পরিণাম হতে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভের জন্যে বিশ্ববিধানে পরিচালিত হয়ে এই সব উচ্চস্তরের জীব হিরণ্যলোকে নূতন দেহ ধারণ করে আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যলোক হচ্ছে পরলোকের সূর্য বা পারলৌকিক স্বর্গ, যেখানে তাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি উপস্থিত হয়েছি। অবশ্য প্রায় পূর্ণ জীবেরাও হিরণ্যলোকে বাস করেন—তাঁরা উচ্চ কারণজগৎ হতে এসেছেন।"

গুরুদেবের মনের সঙ্গে আমার মনের তখন এমন পরিপূর্ণ ঐক্য সংসাধিত হয়েছিল যে, তিনি আংশিক বাক্যের দ্বারা আর আংশিক চিন্তাপরিচালনার দ্বারা আমার মনে একটি সম্পূর্ণ শব্দচিত্র অঙ্কিত করে দিচ্ছিলেন। তাই তাঁর মূর্ত ভাবসবল আমি অতি শীঘ্রই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলুম।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "তুমি তো শাস্ত্রে পড়েছ যে ঈশ্বর মানবাত্মাকে পর্যায়ক্রমে তিনটি শরীরে আবদ্ধ করে রেখেছেন—ভাব অথবা কারণশরীর, সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ—মানবের মানসিক আর ভাবপ্রকৃতির স্থান; তারপর এই পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ। মানুষ পৃথিবীতে এসে তার জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি লাভ করে। কিন্তু একজন আত্মিক তার চেতনজ্ঞান, অনুভূতি আর "প্রাণ-কণিকা"* সংগঠিত দেহ নিয়ে কাজ করে। কারণশরীরধারী জীব আনন্দময় ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। আমার কাজ হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে, যাঁরা কারণজগতে প্রবেশ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।"

"পূজ্যপাদ গুরুদেব, বলুন বলুন, পরজগৎ সম্বন্ধে আরও কিছু আমায় বলুন।" তখনও কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে আমি তেমনি আঁকড়ে ধরে রয়েছি। যদিও তাঁর অনুরোধে একটু আলগা করে আমি তাঁকে ধরেছিলুম কিন্তু একেবারে ছাড়িনি, তখনও দু'হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। আর ছাড়বই বা কি করে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, আমার হারান রতন আজ ফিরে পেয়েছি—আর পেয়েছিই বা কি রকম করে—আমার গুরুদেব আজ মৃত্যুকে দলিত, মথিত, পর্যুদস্ত করে আমার কাছে এসে যখন পৌঁচেছেন, তখন তাঁকে কি আজ আর ছাড়তে পারি?

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী "প্রাণ" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; আমি একে "লাইফট্রন" অথবা "প্রাণকণিকা" বলে উল্লেখ করেছি। হিন্দুশাস্ত্রে যে কেবল শুধু "অণু" এবং "পরমাণু" অথবা সূক্ষ্মতর পরমাণবিক শক্তির উল্লেখ আছে তাই নয়; "প্রাণ" অর্থাৎ "সৃজনক্ষম প্রাণকণিকাশক্তি"রও উল্লেখ আছে। অণুপরমাণু বা বিদ্যুতিনসকল অন্ধশক্তি; "প্রাণ" স্বতঃই চৈতন্যময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শুক্রকীট এবং স্ত্রীডিম্বে "জীবনীশক্তিবিশিষ্ট প্রাণকণিকা" সকল কর্মবন্ধানুসারে ভ্রূণবৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "এমন সব সূক্ষ্মজগৎ আছে যেখানে বহু বহু আত্মিকের বাস। সেই সব আত্মিকেরা সূক্ষ্মবাহন অথবা আলোকপিণ্ডের সাহায্যে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করেন—বিদ্যুৎ আর তেজস্ক্রিয়শক্তি সকলের চাইতেও দ্রুততর।

"আত্মিক বা পারলৌকিক জগৎ আলোক আর বর্ণের বিভিন্ন সূক্ষ্মস্পন্দনে গঠিত, আর তা হচ্ছে এই জড়বিশ্ব হতে শত শত গুণ বড়! এই সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিটা একটা ছোট্ট কঠিন ঝুড়ির মত পরলোকের স্তরের প্রকাণ্ড আলোর বেলুনের তলায় ঝুলছে। মহাশূন্যে যেমন আমাদের জড়জগতের বহু সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্ররা সব পরিভ্রমণ করে, তেমনি সূক্ষ্মজগতে অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ আছে সূক্ষ্মজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডল আমাদের পৃথিবীর মেরুচ্ছটার ন্যায় দেখতে সূক্ষ্ম-জগতের সূর্যমেরুচ্ছটা স্নিগ্ধকিরণ চন্দ্রমেরুচ্ছটার চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল। সূক্ষ্মজগতের দিনরাত পৃথিবীর দিনরাতের অপেক্ষা দীর্ঘতর।"

"সূক্ষ্মজগৎ এখানকার চেয়ে অপরিসীম সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র আর সুশৃঙ্খল। সেখানে কোন নির্জীব গ্রহ বা অনুর্বর ভূমি নাই। আমাদের এই পৃথিবীর অভিশাপগুলো—আগাছা, জীবাণু, পোকামাকড়, সাপ প্রভৃতি—সেখানে একেবারেই নাই; পৃথিবীর মত সেখানে পরিবর্তনশীল জলবায়ু বা ঋতু নাই; সেই সব প্রদেশে আছে চিরবসন্তের নাতিশীতোষ্ণ বায়ু আর মাঝে মাঝে আলোকোজ্জ্বল শুভ্র তুষারপাত আর বিচিত্রবর্ণের আলোক-বৃষ্টি। সূক্ষ্মজগতে আছে বিচিত্রবর্ণের হ্রদ, উজ্জ্বল সমুদ্র আর রামধনু-রঙের নদী।

"সাধারণ যে প্রেতলোক—যা হিরণ্যলোকের মত সূক্ষ্মতর পরলোকের স্বর্গ নয়—সে স্থান পৃথিবী হতে সদ্য বা কিছুপূর্বে আগত কোটি কোটি আত্মিকের দ্বারা পূর্ণ; আর আছে সেখানে অসংখ্য পরী, মৎস্যকন্যা, মৎস্যকুল, জীবজন্তু, অপদেবতা, বামন, উপদেবতা আর প্রেতাত্মাসকল—এরা বিভিন্ন প্রেতলোকে তাদের নিজ নিজ কর্মের গুণাগুণ অনুযায়ী স্থান পেয়েছে। নানাবিধ স্তরের আবাস অথবা স্পন্দনভূমি, মুক্ত বা দুষ্ট আত্মিকদের জন্য ব্যবস্থা করা আছে। মুক্তাত্মারা সর্বত্র অবাধে বিচরণ করতে পারেন, কিন্তু দুষ্ট আত্মাদের গতিবিধি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে যেমন মানুষ ধরাপৃষ্ঠে বাস করে, মাটিতে কীটপতঙ্গ, জলেতে মৎস্যকুল, আকাশে পক্ষী, তেমনি বিভিন্ন স্তরের উপযুক্ত স্পন্দনবিশিষ্ট স্থান তাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে।

"যে সব পতিত দেবদূতেরা অন্য জগৎ হতে বিতাড়িত হয়ে এসে পড়েন,

তাদের মধ্যে "প্রাণ" পরমাণবিক বোমা অথবা মানসিক মন্ত্রশক্তির সাহায্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধ বাধে।* তারা প্রেতলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিম্নস্তরে বাস করে তাদের দুষ্ট কর্মক্ষয় করে।"

"এই যে প্রেতলোকের অন্ধকার কারাগার, তার উপরে যে সকল বিরাট-ভূমি রয়েছে সেখানে যা কিছু আছে সবই উজ্জ্বল, সবই সুন্দর। পরজগৎ স্বভাবতঃই ঈশ্বরের অভিপ্রায় আর পূর্ণতালাভের পরিকল্পনায় পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। সূক্ষ্মজগতের প্রত্যেক বস্তুই প্রধানতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর আংশিকভাবে আত্মিকগণের ইচ্ছার আহ্বানে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট যে কোন বস্তুর আকৃতি বা কমনীয়তার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করবার ক্ষমতা এইসব আত্মিকগণের আছে। ঈশ্বর তাঁর পরলোকের সন্তানদের পরজগতে সূক্ষ্মবস্তুর ইচ্ছামাত্র পরিবর্তন বা পুনঃসংযোজনের স্বাধীনতা আর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পৃথিবীতে কোন কঠিন বস্তুকে তরল বা অন্য কোন আকারে পরিবর্তিত করতে হলে স্বাভাবিক কিম্বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক, কিন্তু সূক্ষ্মজগতের কোন কঠিনবস্তু তৎক্ষণাৎ সেখানকার তরল বা বায়বীয় অথবা আণবিক শক্তিতে পরিণত হয়, সেখানকার অধিবাসীদের একমাত্র ইচ্ছাশক্তি

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "পৃথিবী আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্বত্র যুদ্ধবিগ্রহ আর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত, কিন্তু পরলোকের রাজ্যে একটা সুখময় সাম্য আর সুসঙ্গতির শান্তি চিরবিরাজমান। সূক্ষ্মশরীরিগণ ইচ্ছামাত্র রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন বা অদৃশ্য হতে পারেন। সেখানকার ফুল, মাছ বা জীবজন্তু, সাময়িকভাবে তাদের নিজেদেরকে পরলোকবাসীদের মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। সকল সূক্ষ্মদেহীদেরই যে কোন আকৃতি ধারণ করবার স্বাধীনতা আছে, আর তারা অতি সহজে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। কোনরকম স্থির, নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের বেঁধে রাখেনি—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পরলোকের একটা গাছ থেকে সেখানকার আম, কিম্বা অন্য কোন ফল, ফুল বা যে কোন ঈপ্সিত বস্তু

* এইসব মন্ত্র হচ্ছে উচ্চারিত শব্দবীজ, যা মনে মনে গভীর ধ্যানসংযোগে কামানের মত সব নিক্ষিপ্ত হয়। পুরাণে দেবাসুরের মধ্যে এইরূপ মন্ত্রযুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা আছে। একবার এক অসুর একটি দেবতাকে শক্তিশালী মন্ত্রপ্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভুল উচ্চারণবশতঃ মন্ত্র সব প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে বিপরীত ক্রিয়াপ্রকাশে অবশেষে সেই অসুরকেই হত্যা করে।

সফলতার সঙ্গে উৎপন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য কর্মজনিত কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে বই কি, কিন্তু পরলোকে বিভিন্ন প্রকারের আকৃতিধারণে ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সেখানকার সবই ভগবানের সৃষ্টির আলোকে দেদীপ্যমান!

"নারীগর্ভে সেখানে কারুর জন্ম হয় না; সন্তান আবির্ভূত হয় পরলোকের মূর্তপ্রকাশে বিশিষ্ট রূপধারণ করে, সেখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সদ্য জড়দেহমুক্ত জীব পরলোকের পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে তাদের আহ্বানে—একই রকম মানসিক আর আধ্যাত্মিক বৃত্তির আকর্ষণে।

"সূক্ষ্মদেহ শীতোষ্ণ বা অন্য কোনপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার বশীভূত নয়। সূক্ষ্ম শরীরসংস্থানে আছে সূক্ষ্মমস্তিষ্ক, যাতে সর্বদর্শী সহস্রদল কমল আংশিকভাবে সক্রিয় আর সুষুম্না নাড়ীতে ছয়টি প্রস্ফুটিত পদ্ম বা সূক্ষ্মমস্তিষ্ক-কশেরুচক্র। হৃৎপিণ্ড সূক্ষ্মমস্তিষ্ক থেকে মহাজাগতিক শক্তি আর আলোক গ্রহণ করে সূক্ষ্মতান্ত্রিকা আর শরীরকোষের ভিতরে পরিচালিত করে। পরলোকবাসীরা "প্রাণকণিকা" শক্তি অথবা পূত মন্ত্রশক্তিবলে তাদের আকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

"সূক্ষ্মশরীর হচ্ছে শেষ জড়দেহের অবিকল প্রতিলিপি। আত্মিকদের মুখ আর দেহ তাদের পূর্বজন্মের যৌবনকালীন পার্থিবদেহের সাদৃশ্য বহন করে; কখনও কখনও তারা ইচ্ছা করলে, এই আমার মত, তাদের বৃদ্ধবয়সের মূর্তিও ধারণ করতে পারে।" বলেই গুরুদেব যৌবনসুলভ উল্লাসের সঙ্গে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

তারপর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "সূক্ষ্মজগৎ তিন আয়তনের বিস্তৃতিবিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের মতন নয়; সেখানকার বিভিন্নস্তর, আর একটি ইন্দ্রিয়, সর্বগ্রাহী ষষ্ঠেন্দ্রিয়—যাকে স্বজ্ঞা বলে, তার দ্বারা সব কিছু দেখা যায়। কেবলমাত্র স্বজ্ঞাত অনুভূতি দ্বারা সকল সূক্ষ্মশরীরীরা দেখা, শোনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণকরা, সব কাজই চালাতে পারে। তাদের তিনটি নয়ন, দুটি সাধারণতঃ অর্ধনিমীলিত থাকে। আর তৃতীয়টি—যেটি প্রধান, সেটি কপালের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে থাকে, সেটি উন্মুক্ত। আত্মিকদের সকল প্রকার বহিরিন্দ্রিয়ই আছে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,—কিন্তু তারা শরীরের যে কোন অংশ দিয়েই স্বজ্ঞাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সব রকম সংবেদনেরই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে; কর্ণ, নাসিকা, এমন কি চর্মের সাহায্যেও তারা সব কিছু দেখতে পারে। জিহ্বা বা চক্ষুর সাহায্যে তারা শ্রবণ

করতে পারে কিম্বা কর্ণ বা ত্বকের সাহায্যে তারা আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে, এমনি সব আর কি।*

"মানুষের জড়দেহ অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন, আর তা সহজেই আঘাত-প্রাপ্ত বা অঙ্গহীন হতে পারে ; কিন্তু অতিসূক্ষ্ম আত্মিকদেহ কখনও কখনও হয় তো বা কেটে যেতে বা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামাত্র তা আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।"

"গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কি সবাই দেখতে সুন্দর ?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী উত্তর দিলেন, 'সূক্ষ্মজগতে সৌন্দর্য একটা আধ্যাত্মিক গুণ বলেই বিবেচিত, সেটা কোন বাহ্যিক সৌষ্ঠব নয়। কাজে কাজেই পরলোকবাসীরা মুখের সৌন্দর্য বাড়ানর দিকে আর বেশী নজর দেয় না। কিন্তু তাদের আর একটা বিশেষ সুবিধা আছে এই যে, তারা ইচ্ছামাত্র বর্ণোজ্জ্বল নব আত্মিকদেহ গঠন করে নিতে পারে। উৎসব উপলক্ষ্যে পৃথিবীর মানুষেরা যেমন নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হয়, আত্মিকেরাও তেমনি সেইরকম কোন উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন রূপ ধারণ করে নিজেদের সুসজ্জিত করবার সুযোগ লাভ করে।

"হিরণ্যলোকের মত পরলোকের উচ্চতর সূক্ষ্মস্তরে পারলৌকিক আনন্দোৎসব শুরু হয়, যখন কোন জীব আধ্যাত্মিক উন্নতিবলে আত্মিক জগৎ হতে মুক্তিলাভ করে কারণজগতের স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। এইসব উপলক্ষ্যে আমাদের নয়নের অগোচর পরমপিতা পরমেশ্বর, আর যে সব সাধুসন্তরা তাঁর কোলে আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত রূপধারণ করে পারলৌকিক উৎসবে যোগদান করেন। তাঁর প্রিয় সন্তানকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ভগবান তার যে কোন ঈপ্সিত রূপ ধারণ করেন। শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধন করলে ভক্ত তাঁকে জগজ্জননী-মূর্তিতে দর্শন পায়। যীশুখ্রীষ্টের কাছে ভগবানের পিতৃভাবই অন্যান্য ভাবের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টজীবদের প্রত্যেককে যে স্বাতন্ত্র্য, যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাতে করে ভগবানের অনন্তরূপের মধ্যে, যতরকম সম্ভাব্য আর অসম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষা আছে তারা তার প্রার্থনা করে, কাজেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে তাঁকেও সেইপ্রকার রূপ ধারণ করে তাদের তৃপ্ত করতে হয়।" গুরুদেব আর আমি দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলুম।

বাঁশীর মতন মনোহর সুমধুরস্বরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে শুরু

---

* এমন কি এই পৃথিবীতেও হেলেন কেলার এবং অনন্যসাধারণ বিরলজনের মধ্যে এরূপ শক্তির উদাহরণের অভাব নাই।

করলেন, "পরলোকে অন্যান্য জন্মের বন্ধুরা পরস্পর পরস্পরকে অতি সহজেই চিনতে পারে। দুঃখ আর মোহময় পার্থিবজীবনের অবসানকালে প্রেমের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, আবার তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আর অক্ষয় বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ করে, সেই প্রেমের অমরত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

"সূক্ষ্মশরীরীদের স্বচ্ছ অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে পৃথিবীর মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ পরলোকের কিছুই দেখতে পায় না—যতক্ষণ না তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় অন্ততঃ কতকটাও পরিপুষ্টি লাভ করে। অবশ্য এটাও সত্যি যে হাজার হাজার পৃথিবীর লোকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যেও পরলোক বা সেখানকার অধিবাসীদের দেখা পেয়েছে।*

"হিরণ্যলোকের উন্নত আত্মিকেরা পরলোকের দীর্ঘ রাত্রি বা দিবস নির্বিকল্প সমাধির পরমানন্দময় জাগ্রত অবস্থায় যাপন করে আর তাদের কাজ হচ্ছে বিশ্বপরিচালন ব্যাপারে জটিল সমস্যার সমাধান, ও পৃথ্বীবদ্ধ আত্মা, সংসারবদ্ধ জীবের মুক্তিসাধনে সাহায্য করা। হিরণ্যলোকের অধিবাসীরা নিদ্রা গেলে মাঝে মাঝে তাদের স্বপ্নের মত আত্মিকদর্শনলাভ হয়।

"কিন্তু তা হলে কি হয়, পরলোকের সকল অংশের অধিবাসীরা তবুও মানসিক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাভোগের অধীন থাকে, তা থেকে তাদের একেবারে পূর্ণ মুক্তিলাভ তখনও ঘটেনা। হিরণ্যলোকের মত গ্রহের উচ্চতর জীবেদের সংবেদনশীল মনে কোন সদাচরণ অথবা সত্যোপলব্ধি বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি উপস্থিত হলে তারা দারুণ যন্ত্রণাই ভোগ করে। এইসব উচ্চাবস্থার জীবের, তাদের প্রত্যেক কার্য বা চিন্তা আধ্যাত্মিকবিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

"পরলোকবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা সম্পূর্ণভাবে পারলৌকিক দূরদর্শন বা দূরশ্রবণ ব্যাপারের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়; লেখা আর কথ্য ভাষার মধ্যে যে ভুল বোঝাপড়া পৃথিবীর লোকেদের মধ্যে হতে বাধ্য, সেরকম কোন গোলমাল বা ভুলভ্রান্তি কখনও সেখানে হয় না। সিনেমার পর্দায়

* পৃথিবীতে নির্মলমন শিশুরা কখনও কখনও পরী প্রভৃতির সূক্ষ্মদেহের দর্শনলাভে সমর্থ হয়েছে।

ঔষধ অথবা মাদক পানীয়ের সাহায্যে—যাদের ব্যবহার সকল শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ- কোন লোক তার মনের এমন বিকৃতিসাধন করতে পারে যে, তাতে সে পরলোকের নরকের বীভৎস আকৃতি বা দৃশ্য উপলব্ধি করতে পারে।

যেমন কতকগুলি আলোর ছবির সাহায্যে লোকেরা চলাফেরা করছে, কাজকর্ম করছে বা হাত পা নাড়ছে দেখে বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কোন শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না, তেমনি পরলোকবাসীরাও সুপরিচালিত আর সুবিন্যস্ত আলোর ছবিদের মতই চলাফেরা করে, কাজকর্ম করে, তার জন্যে তাদের অম্লজান থেকে শক্তিসংগ্রহের কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষকে জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থসমূহ আর শক্তির উপর আর পরলোকবাসীরা প্রাণধারণ করে থাকে প্রধানতঃ মহাকাশের আলোক বা বিশ্বজ্যোতির উপর।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কিছু খায় কি?" গুরুদেবের পরলোকতত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা আর সেখানকার বিশদ বিবরণ আমি আমার সকল গ্রহণক্ষম মনোবৃত্তি—আমার সমস্ত মন, হৃদয় আর আত্মা দিয়ে যেন পান করছিলুম। সত্যের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি শাশ্বত, ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর মনের মধ্যে তার যে ছাপ, তা সাময়িক বা আপেক্ষিকভাবে সত্য বলে বোধ হওয়া ছাড়া আর বেশী কিছু হয় না। আর স্মৃতির মধ্যে তাদের স্পষ্টতা অতি শীঘ্রই ম্লান হয়ে যায়। আমার গুরুদেবের কথাগুলি আমার মানসপটে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে যে, আমার মনকে সেই অবস্থায় উপনীত করে আমি সেই দিব্য অভিজ্ঞতা যে কোন সময়ে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি।

তিনি উত্তর করলেন, "আত্মিক ভূমিতে উজ্জ্বল আলোর রশ্মির মত তরিতরকারি জন্মে। পরলোকবাসীরা এইসব তরিতরকারি আহার করে আর পরলোকের নদী, স্রোতস্বিনী আর উজ্জ্বল আলোকের উৎস হতে প্রবাহিত অমৃতোপম সুমধুর ধারা পান করে। পৃথিবীতে যেমন সাধারণতঃ অদৃশ্য লোকেদের মূর্তিসকল ঈথর তরঙ্গের মধ্য থেকে টেলিভিসন (দূরদর্শন) যন্ত্রসাহায্যে ধরে দৃষ্টিগোচর করা যায় আবার তা মহাশূন্যে মিলিয়ে দিতে পারা যায়, সেইরকম ঈশ্বরসৃষ্ট, ঈথার ভাসমান শাকসব্জি, বৃক্ষলতাদির অদৃশ্য পারলৌকিক রেখাচিত্রাঙ্কন সব সেখানকার গ্রহের অধিবাসীদের আদেশমাত্রই মূর্ত করে উৎপন্ন করা যায়। ঐরকম একই উপায়ে এইসব আত্মিকদের উদ্দাম কল্পনানুযায়ী বিরাট উদ্যানসকলকে রূপায়িত করে পরে আবার ঈথরের অদৃশ্যতার মধ্যে বিলীন করে দেওয়া যায়। যদিও হিরণ্যলোকের মত আকাশের গ্রহবাসীদের পান ভোজনের প্রায় কিছুরই দরকার হয় না কিন্তু কারণজগতের প্রায় পূর্ণমুক্ত আত্মাদের বন্ধনহীন জীবন আরও উচ্চস্তরের; তাদের পরমানন্দের অমিয়ধারা পান ছাড়া আর কিছুরই দরকার লাগে না।

"পৃথিবী হতে মুক্ত আত্মা এখানে এসে পৃথিবীতে তার নানা জন্মের* পরিচিত পিতামাতা, ভাইভগ্নী, স্বামীস্ত্রী, পুত্রপরিবার প্রভৃতি অসংখ্য আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবাদি প্রিয়জনসমূহের সাক্ষাৎ পায়; সময় সময় পরলোকের রাজ্যে নানা অংশে এসে তারা দেখা দেয়। তাতে করে সে বেচারা বড় মুশকিলেই পড়ে যায়—কারণ কাকে যে সে বেশী করে ভালবাসবে তা সে ঠিক করে উঠতে পারে না; কাজেকাজেই তাকে এইরকম করে সবাইকে ঈশ্বরের সন্তান আর তাঁর ব্যক্তিগত মূর্ত প্রকাশ বলে সকলের প্রতি সমানভাবে দিব্যপ্রেম বিতরণ করতে শিক্ষা করতে হয়।

যদিও বা কোন প্রিয়জনের বাহ্যিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটে (অল্পবিস্তর তাদের পূর্বজন্মের কোন নূতন গুণের উন্নতির ফলে) তবুও পরলোকবাসী তার সহজ ও নির্ভুল স্বজ্ঞার সাহায্যে অন্যগ্রহে বা স্তরে, এককালে যারা তার অতিশয় প্রিয় ছিল, তাদের তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে নতুন পরলোকের গৃহে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। সৃষ্টির প্রতি অনুপরমাণুর মধ্যে অষ্টবিধা প্রকৃতির† ভাবগত বৈশিষ্ট্য চিরবর্তমান থাকাতে—কোন আত্মিকবন্ধুকে অতি সহজেই চেনা যায়, তা সে যে রকমই রূপধারণ করুক না কেন। কি রকম জান, অভিনেতার সাজসজ্জা বা ছদ্মবেশ যতই ভাল হোক না কেন তার আসলরূপ একটু খুঁটিনাটি করে দেখলেই ধরা পড়ে যায়, তেমনি আর কি।

"পরলোকে প্রবিষ্ট জীবের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ। পরলোকে জীবের বাসকালীন সময় তার পার্থিব কর্মফলানুযায়ী নির্ধারিত হয়, যা অতীত হলে কর্মফল আবার তাকে পার্থিব স্তরে টেনে আনে। কতক জীব তাদের জড়জগতে মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে, সাধারণতঃ তাদের প্রবল আকর্ষণ বা বাসনাকামনার দরুণই এরূপ ঘটে। কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের সূক্ষ্মদেহ ধারণের গড়পড়তা সময় হচ্ছে পাঁচ শত থেকে এক হাজার বৎসর (পৃথিবীর সময়ের পরিমাপে)। যেমন আমেরিকার সিকোয়া (রেডউড) গাছ সকল অন্যান্য গাছেদের চেয়ে শতশত

* ভগবান বুদ্ধদেবকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মানুষ সবাইকে সমানভাবে ভালবাসবে কেন? তাতে সেই মহান ধর্মপ্রবর্তক উত্তর দিয়েছিলেন, "কারণ প্রত্যেক মানবের অগণিত আর বিচিত্র জীবনধারার মধ্যে অপর প্রত্যেকেই (কোন না কোনকালে আর মানুষ অথবা পশু, কোন না কোন আকৃতিতে) তার প্রিয় ছিল।"

† অনুপরমাণু হতে মানুষ পর্যন্ত সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে অষ্টবিধা প্রকৃতির গুণ বর্তমান—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৭ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক।)

বৎসর বেশী বাঁচে অথবা যেমন অধিকাংশ লোকের ষাট বছরের আগে মৃত্যু ঘটলেও অনেক যোগী কয়েক শত বৎসর ধরে বাঁচেন, তেমনি বিশিষ্ট জীবেরা পরলোকে প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত বাঁচেন।

"পরলোকবাসীদের আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে তাদের জ্যোতির্ময় দেহ ত্যাগ করবার সময় মরণের সঙ্গে আর ক্লেশকর যুদ্ধ করতে হয় না। কিন্তু তাহলে কি হয়, তবুও তাদের মধ্যে অনেকেই পারলৌকিক দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মতর কারণশরীর ধারণ করবার চিন্তায় একটু ভীত হয়ে পড়ে বই কি। পরলোক কিন্তু অনভীপ্সিত মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি থেকে মুক্ত। এই তিনটি ভয়ই হচ্ছে পৃথিবীর অভিশাপ, যেখানে মানুষের আত্মজ্ঞান তার নশ্বর জড়দেহের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জড়িয়ে গিয়ে তার দেহটাকেই তার একমাত্র অস্তিত্ব বলে কল্পনা করে, আর তার সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহটার অস্তিত্ব আদৌ বজায় রাখতে গিয়ে তাকে সর্বদাই বায়ু, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

"জড়দেহের মৃত্যু হলে, শ্বাসলোপ পেয়ে শরীরকোষগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। আর সূক্ষ্মদেহের মৃত্যু ঘটলে তার "প্রাণকণিকা"গুলির বিক্ষেপণ ঘটে। প্রাণশক্তির প্রকাশ এই "কণিকা"সমূহের এককগুলি হতেই সূক্ষ্ম-দেহীদের প্রাণ সংগঠিত। জড়দেহের মৃত্যুতে জীব তার অস্থিমাংসের দেহজ্ঞান হারিয়ে পরলোকের সূক্ষ্মদেহের বিষয় অবগত হয়। যথাকালে পরজগতে সূক্ষ্মদেহের মৃত্যুর আস্বাদন লাভ করে জীব এই প্রকারে পরলোকের জন্ম ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে ফিরে গিয়ে আবার জড়জন্ম ও মৃত্যুর জ্ঞান লাভ করে। এইরকম পরলোক আর পার্থিব জন্মমৃত্যুর আবর্তনচক্রসকল অজ্ঞানী লোকেদের অপরিহার্য বিধিলিপি। স্বর্গ আর নরকের শাস্ত্রের বর্ণনাতে কখনও কখনও মানুষের পরলোকের সুখময় আর পার্থিব জগতের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসমূহ তার মগ্নচৈতন্যের-চেয়ে-গভীরতর স্মৃতিকে আলোড়িত করে তোলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "পূজ্যপাদ গুরুদেব, আপনি পৃথিবীতে আর সূক্ষ্ম এবং কারণজগতে পুনর্জন্মের বিবরণ একটু বিশদভাবে বলবেন কি?"

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তখন বুঝিয়ে বললেন, "মানুষ জীবাত্মারূপে মূলতঃ হচ্ছে কারণশরীরবিশিষ্ট। সেই শরীর হচ্ছে ঈশ্বরের পঁয়ত্রিশটি কল্পনা বা ভাবের আকর বা আশ্রয়, আর এই ভাবসকল হচ্ছে মূল অথবা কারণ চিন্তাশক্তিসমূহ,—যা তিনি পরে বিভাগ করে উনবিংশতি তত্ত্ববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ এবং ষোড়শ তত্ত্ববিশিষ্ট স্থূল জড়দেহ নির্মাণ করেন।

"আতিবাহিকদের উনবিংশতিতত্ত্বসকল হচ্ছে মনোময়, ভাবময়, আর প্রাণময়। এই উনিশটি উপাদান হচ্ছে বুদ্ধি; অহংকার; সংবেদন; মন (ইন্দ্রিয়জ্ঞান); চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আর ত্বক, এদের জ্ঞানের সূক্ষ্ম প্রতিকল্প হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; প্রজনন, নিঃসারণ, বাক্যালাপ, ভ্রমণ এবং হস্তসম্পাদ্য ক্রিয়াসাধনের মানস প্রতিরূপ হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। আর হচ্ছে পঞ্চপ্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—এরা শরীরের মধ্যে কোষসগঠন, দেহসাংকরণ, নিঃসারণ, পুষ্টিগ্রহণ এবং সঞ্চালন ক্রিয়াসকলের শক্তিবিশিষ্ট। ষোলটি স্থূল রাসায়নিক মূল উপাদানে গঠিত জড়দেহের মৃত্যুর পরও উনবিংশতিতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম অবয়ব বর্তমান থাকে।

"ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা স্বয়ং চিন্তাশ্বারা সমাধান করে স্বপ্নে তা প্রক্ষেপিত করেছেন। বিশ্বস্বপ্নের মায়াসুন্দরী এইরূপে অপেক্ষবাদের সংখ্যাতীত অলঙ্কারে বিরাটরূপে ভূষিতা হয়ে বেরিয়ে এলেন।

"কারণশরীরের পঁয়ত্রিশটি ভাবপর্যায়ের মধ্যে ভগবান মানুষের উনিশটি সূক্ষ্ম আর ষোলটি জড় প্রতিরূপের সকল বৈষম্যের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। স্পন্দনশক্তিকে ঘনীভূত করে, প্রথমতঃ সূক্ষ্ম পরে জড়রূপে তিনি মানুষের সূক্ষ্মশরীর, পরে তার জড়দেহ তৈরী করলেন। অপেক্ষবাদের নিয়মানুসারে—যাতে করে আদি কৈবল্যভাব বহু জটিল বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে,—যেমন কারণজগৎ আর কারণশরীর, সূক্ষ্মজগৎ আর সূক্ষ্মদেহ থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি এই জড়জগৎ আর স্থূলদেহ সৃষ্টির বিভিন্নরূপ থেকে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র।

"জড়দেহ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের নির্দিষ্ট বস্তুরূপ। পৃথিবীতে দ্বৈতভাব চিরবিরাজমান; স্বাস্থ্য আর ব্যাধি, সুখদুঃখ, লাভক্ষতি। মানুষ দেখে যে ত্রি-মাত্রিক জড়রূপই তার সীমা আর প্রতিবন্ধক। ব্যাধি বা অন্য কোন কারণে মানুষের বাঁচার অভিপ্রায় যখন গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়, তখনই তার মৃত্যু আসে; আর আত্মার অস্থিমাংসের স্থূল আবরণ তখন সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। তখনও আত্মা কিন্তু সূক্ষ্ম কিম্বা কারণশরীরে আবদ্ধ থাকে।* আর যে সংহতিবলে এই তিনটি অবয়ব একত্র সংলগ্ন থাকে সেটা হচ্ছে বাসনা বা কামনা। আর এই অতৃপ্ত কামনা বা বাসনার সক্রিয় চালক শক্তিই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ বন্ধন বা দাসত্বের মূল।

"অহঙ্কার আর ইন্দ্রিয়সুখই হচ্ছে পার্থিব বাসনা বা কামনার মূল।

* দেহ মানেই কোষবদ্ধ আত্মা, তা সে জড়ই হোক আর সূক্ষ্মই হোক্। এই তিনটি শরীর হচ্ছে "নন্দন পক্ষীর" পিঞ্জর।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির তাড়না বা প্রলোভন সূক্ষ্মশরীরের আসক্তি বা কারণ অবস্থার অনুভূতিসংশ্লিষ্ট বাসনাশক্তির চেয়েও প্রবলতর।

"সূক্ষ্মজগতের কামনা-বাসনাসকল স্পন্দনভাবের উপভোগেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। সূক্ষ্মজগতের জীবেরা মহাব্যোমের বিশ্বসঙ্গীত (প্রণবধ্বনি) শ্রবণ করে আর সকল সৃষ্টিই যে পরিবর্তনশীল আলোর অফুরন্ত প্রকাশ, সে দৃশ্য দেখে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। সূক্ষ্মদেহীরা আবার আলোর গন্ধ, স্বাদ আর স্পর্শও পায়। এইরূপে সূক্ষ্মজগতের কামনা-বাসনাসকল সূক্ষ্ম-শরীরীর সকল বস্তু আর জ্ঞানকে আলোর রূপে অথবা প্রগাঢ় চিন্তা বা স্বপ্নে পরিণত করার শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

"কারণজগতের কামনাবাসনা সব, কেবল অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণ হয়। প্রায়মুক্ত জীবেরা, যারা কেবল কারণদেহে আবদ্ধ থাকে, তারা এই সারা বিশ্বটাকে ভগবানের স্বপ্নভাবের মূর্ত প্রকাশ বলেই দেখতে পায়; কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই তারা যে কোন জিনিসের রূপদান করতে পারে। আর সেই জন্যেই কারণশরীরীরা পার্থিব অনুভূতি কিম্বা সূক্ষ্ম-জগতের আনন্দও তাদের আত্মার সূক্ষ্মতর বোধশক্তির পক্ষে নিতান্ত স্থূল আর শ্বাসরোধী বলে মনে করে। কারণশরীরীরা তাদের বাসনার ক্ষয় করে তাদের তৎক্ষণাৎ রূপ দান করে।* যারা কেবলমাত্র কারণজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবয়বে আবদ্ধ, তাঁরা এমন কি সৃষ্টিকর্তারই মত বিশ্বরচনা প্রকাশ করতে পারেন। যেহেতু সকল সৃষ্টিই যখন বিশ্বস্বপ্নজালে তৈরী তখন অতিসূক্ষ্ম কারণশরীরে আবদ্ধ আত্মারও শক্তির বিরাট প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়।

"আত্মা স্বভাবতঃই একেবারে অদৃশ্য বলে কেবল এর শরীর বা অবয়বগুলির দ্বারাই একে চিনতে পারা যায়। কেবলমাত্র কোন শরীর দেখলেই বোঝা যায় যে এর অস্তিত্ব অতৃপ্ত বাসনার ফলেই সৃষ্ট হয়েছে।†

* এমন কি বাবাজী মহারাজও লাহিড়ীমহাশয়কে তাঁর কোন অতীত জীবনের অবচেতন মনে এক রাজপ্রাসাদের বাসনা থেকে মুক্ত হবার জন্যে সাহায্য করেছিলেন, সে ঘটনা ৩৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

† "এবং তিনি তাদের বললেন শব যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই শকুনপক্ষীরা সব সমবেত হবে।" লূক ১৭; ৩৭ (বাইবেল)।

যেখানেই কোন আত্মা, স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা কারণশরীরে আবদ্ধ হোক না কেন, সেখানেই বাসনা-কামনার শকুনপক্ষীসকল—যারা মানুষের ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যকে অথবা কোন সূক্ষ্ম বা কারণ-জগতের আসক্তির উপর আক্রমণ করে—আত্মাকে বন্দী করে রাখবার জন্য সমবেত হয়।

"যতদিন পর্যন্ত মানুষের আত্মা অবিদ্যা ও বাসনার ছিপি দ্বারা একটি, দু'টি বা তিনটি দেহাধারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে যেতে পারে না। মৃত্যুর কঠিন আঘাতে যখন তার স্থূল জড়দেহ বা আধার চূর্ণ হয়, অপর দুটো আবরণ—সূক্ষ্ম আর কারণ—তখনও সর্বব্যাপী প্রাণসাগরে আত্মার সজ্ঞান প্রবেশ করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। জ্ঞানের সাহায্যে যখন বাসনাশূন্য হতে পারা যায় তখন তার সেই জ্ঞানশক্তি বাকী দুটো আধারকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলে। অবশেষে সেই ক্ষুদ্র মানবাত্মা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে অনাদি অনন্ত বিস্তৃতি নিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়।"

গুরুদেবকে তখন আমি উচ্চ আর রহস্যময় কারণজগৎ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবার জন্যে অনুরোধ করাতে তিনি বললেন,—

"কারণজগৎ এত সূক্ষ্ম যে তা বর্ণনা করা যায় না; এ বুঝতে গেলে, জীবের গভীর ধারণার এরূপ বিরাট শক্তি থাকা দরকার যে, সে চোখ বন্ধ করেই সূক্ষ্মজগৎ আর এই বিরাট জড়বিশ্ব—যেন একটা আলোর বেলুনের সঙ্গে একটা কঠিন ঝুড়ি—তা' কেবল ভাবরূপেই আছে বলে দেখতে পায়। যদি কেউ এই অতিমানবিক গভীর ধারণাবলে তাদের সব কিছু বৈচিত্র্যসমেত এই দুটি বিশ্বকে কেবলমাত্র ভাবরূপে পরিণত বা পর্যবসিত করতে কৃতকার্য হয়, তাহলে সে কারণজগতে পৌঁছে মনোজগৎ আর জড়জগতের মিলনের সীমারেখায় উপস্থিত হতে পারে। সেখানে গিয়ে তার এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় যে—সকল সৃষ্ট-বস্তু,, কঠিন, তরল, বায়বীয়পদার্থ, বিদ্যুৎ, শক্তি, সকলপ্রাণী, দেবতা, মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি, বীজাণু—জ্ঞানেরই সব এক একটা রূপ, যেমন মানুষ চক্ষু মুদেও অনুভব করে যে সে আছে, সে বর্তমান—তার অস্তিত্ব সে বেশ টের পাচ্ছে, যদিও তার জড়দৃষ্টির সামনে তার দেহ অদৃশ্যই হয়ে থাকে আর তার কাছে সেটা কেবল ভাবরূপেই বর্তমান।

"মানুষ যা কল্পনায় করে, কারণশরীরী তা বাস্তবভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অতিবিরাট আর প্রচণ্ড কল্পনাপ্রবণ মানববুদ্ধি কেবল মনের ভিতরেই এক চিন্তার শেষ সীমা থেকে অপর এক চিন্তার শেষ সীমায় উপনীত হতে পারে, মনে মনেই সে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করতে পারে, অতল গভীর অনন্ত গহ্বরের সীমাহীন তলদেশে সে যেতে পারে অথবা ধধুপের মত তারকাখচিত নীল নভোদেশে অতিবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হতে পারে কিম্বা ছায়াপথে অথবা নক্ষত্রপুঞ্জশোভিত মহাব্যোমে সে সন্ধানীআলোর মত দীপ্তির চমক প্রকাশ করে সে চলতে পারে। কিন্তু কারণজগতের জীবেদের এর চেয়েও

বেশী স্বাধীনতা আছে—তারা বিনা আয়াসে তাদের চিন্তাকে তৎক্ষণাৎ বস্তুর রূপদান করতে পারে—তাতে কোনরূপ জড় বা সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধক বা কর্মের সীমাবদ্ধতা কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না।

"কারণশরীরীরা উপলব্ধি করতে পারে যে জড়বিশ্ব মূলতঃ ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতিন্ দ্বারা সৃষ্ট নয় বা সূক্ষ্মজগৎ "প্রাণকণিকা"র মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এ দুটোই বস্তুতঃ হচ্ছে ঈশ্বরের অতি সূক্ষ্ম চিন্তাকণিকার দ্বারাই সৃষ্ট—মায়া বা অপেক্ষবাদের দ্বারা খণ্ডিত আর বিভক্ত, যাতে করে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে পৃথক করে রাখার জন্য আপাতদৃষ্টিতে ভেদ রচনা করে।

"কারণজগতে আত্মারা পরস্পর পরস্পরকে সেই আনন্দময় পরমাত্মার ব্যষ্টিগত প্রকাশ বলেই জানে, তাদের চিন্তাবিষয়সকলই কেবল একমাত্র বস্তু যা তাদের চারধার ঘিরে থাকে। কারণশরীরীরা তাদের দেহ আর চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য, তা কেবলমাত্র ভাবরূপেই দেখতে পায়। মানুষ চোখ বুঁজে যেমন অতি উজ্জ্বল সাদা আলো কিম্বা ক্ষীণ নীল আলোর আভাস দেখতে পায়, কারণশরীরীরাও তেমনি কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সবই অনুভব করতে পারে; বিশ্বমানসশক্তির দ্বারা তারা যে কোন জিনিসের সৃষ্টি বা বিলোপসাধন করতে পারে।

"কারণজগতে মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এ দুটোই কেবলমাত্র চিন্তাতেই আছে; কারণশরীরীরা কেবলমাত্র চিরনূতন জ্ঞানানন্দের অমৃত ভোজন করে। তারা শান্তির নির্ঝরিণী থেকে পান করে, দৈব অনুভূতির পথহীন ভূমির উপর ভ্রমণ করে আর পরমানন্দের অনন্ত সাগরের সীমাহীনতার মধ্যে সন্তরণ করে বেড়ায়। আহা দেখ! তাদের উজ্জ্বল চিন্তাশরীর সব. ঈশ্বরসৃষ্ট কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ, নবজাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসকল, অসীম নীলাকাশের বুকে ভাসমান স্বর্ণ নীহারিকার অপার্থিব আলোকস্বপ্ন—তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করছে।

"কারণজগতে বহু জীব হাজার হাজার বছর ধরে অবস্থান করে। গভীরতর পরমানন্দ লাভ করে মুক্তাত্মা ক্ষুদ্র কারণশরীর থেকে নিজেকে প্রত্যাহৃত করে নিয়ে কারণবিশ্বের বিরাটরূপ ধারণ করে। সকলপ্রকার ভাবধারার বিভিন্ন আবর্তসমূহ, শক্তি, প্রেম, ইচ্ছা, আনন্দ, শান্তি, স্বজ্ঞা, স্থৈর্য, আত্মসংযম আর ধারণার নানা তরঙ্গরূপ সব, পরমানন্দসাগরেই গিয়ে লয় হয়। তখন আত্মা তার আনন্দকে জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট তরঙ্গরূপ বলে আর মনে করে না—তার অনন্ত হাসি, উত্তেজনা, পুলক, কম্পন, একের মধ্যে বহুবাঞ্ছিত বৈচিত্র্যের তরঙ্গসব নিয়ে সেই এক অখণ্ড মহাব্যোমে বিলীন হয়ে যায়।

"যখন কোন আত্মা প্রজাপতির মত এই তিনটি অবয়বের গুটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে তখন সে চিরতরে অপেক্ষবাদ থেকে মুক্ত হয়ে অনির্বচনীয়া শাশ্বতী স্থিতি লাভ করে।* সেই সর্বব্যাপিত্বের প্রজাপতিকে লক্ষ্য কর, দেখ তার পক্ষদ্বয়ে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা সব ঝলমল করছে। আত্মা পরমাত্মায় বিস্তার লাভ করে আলোকহীন আলো, তমিস্রাহীন অন্ধকার, চিন্তাহীন চিন্তার রাজ্যে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির স্বপ্নের পরমানন্দে মত্ত হয়ে একলাই থাকে।"

সভয় বিস্ময়ে বলে উঠলুম, "মুক্ত আত্মা ?"

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "যখন কোন আত্মা এই তিনটি শরীরকোষের মায়া থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে,—তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায় কিন্তু তবুও তার ব্যক্তিত্বের কোন লোপ বা হ্রাস হয় না। খ্রিস্টের এমন কি যীশুরূপে জন্মগ্রহণ করবার পূর্বেই এরূপ চরম মুক্তিলাভ ঘটেছিল! তাঁর অতীত জীবনের তিনটি অবস্থায়—যা তাঁর পার্থিবজীবনে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের তিনদিনের অভিজ্ঞতায় মূর্ত হয়ে রয়েছে, তাতে তিনি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করবার পূর্ণশক্তি অর্জন করেছিলেন।

"এই তিনটি শরীর থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে অপরিণত মানবকে তার অসংখ্য পার্থিব, সূক্ষ্ম আর কারণশরীরের মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে হয়। যখন তিনি এইরূপ চরম মুক্তিলাভ করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করলে ধর্মোপদেষ্টারূপে অন্যান্য মানবদের ঈশ্বরসান্নিধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেন অথবা আমার মত তিনি সূক্ষ্মজগতে বাস করতে পারেন! সেখানে কোন মুক্তিদাতা সেখানকার অধিবাসীদের কিছু কর্মফল গ্রহণ করে‡ এইরূপে সূক্ষ্মজগতে তাদের বারম্বার যাতায়াতের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে কারণজগতে চিরতরে বাস করার জন্য তাদের সাহায্য করেন। অথবা কোন

* "যে জয় করে, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করব আর সে কখনও সেখান হতে বাইরে যাবে না (অর্থাৎ তার আর কখনও পুনর্জন্ম হবে না)······আমি যেমন জয় করেছি আর আমার পিতার সঙ্গে সিংহাসনে বসেছি, তেমনি যে জয় করে, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসতে দেব।" রিভিলেশন—৩ ; ১২, ২১ (বাইবেল)।

‡ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কথার অর্থ এই ছিল যে, তাঁর পার্থিব জীবনে তিনি যেমন মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যদের কর্মক্ষয়ের উদ্দেশ্যে তাদের রোগভার নিজশরীরে গ্রহণ করতেন, তেমনি সূক্ষ্মজগতেও মুক্তিসাধকরূপে তাঁর জীবনের কর্তব্য হচ্ছে হিরণ্যলোকবাসীদের কোন কোন সূক্ষ্ম কর্মফল গ্রহণ করে তাদের উচ্চতর কারণজগতে দ্রুত উন্নীত হতে সাহায্য করা।

মুক্তাত্মা কারণজগতে প্রবেশ করে সেখানকার অধিবাসীদের কারণশরীরে অবস্থানকাল সংক্ষেপিত করে তাদের কৈবল্যপ্রাপ্তিতে সাহায্য করেন।"

"অমরদেবতা, যে কর্মফলের প্রভাবে আত্মারা এই তিনটি জগতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তার বিষয়ে আরও কিছু বলুন, শুনতে বড়ই ইচ্ছে হয়!" মনে হল আমার সর্বদর্শী গুরুদেবের কথা যেন চিরকাল ধরেই আমি শুনে যেতে পারি। তাঁর পার্থিবজীবনে আমি তাঁর কাছ থেকে একদিনে তো এত সব জ্ঞানের বিষয় কখনও উপলব্ধি করতে পারি নি। আজ আমি এই প্রথম জীবনমৃত্যুর গভীর রহস্যময় অন্তঃপ্রদেশে সুস্পষ্ট আর প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করছি।

গুরুদেব পুলকোচ্ছ্বলস্বরে ব্যাখ্যা শুরু করে বললেন, "সূক্ষ্মজগৎসমূহে মানুষের বাস চিরস্থায়ী হবার সম্ভাবনার পূর্বেই তাকে অতি অবশ্য পার্থিব কর্মফল বা বাসনা সব সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় করে ফেলতে হবে। সূক্ষ্মজগতে দুরকমের জীব বাস করে; চিরস্থায়ী বাসিন্দা আর স্বল্পকালীন বাসিন্দা, যাদের পার্থিব কর্মক্ষয় করা এখনও বাকী, আর সেই জন্যে তাদের কর্মের ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে জড় পার্থিবদেহে পুনরায় তাদেরকে বাস করতেই হবে—জড়দেহের অবসান না ঘটলে তারা সূক্ষ্ম জগতে এলে তাদের চিরস্থায়ী বাসিন্দা অপেক্ষা দুদিনেরই অতিথিই বলা যায়।

"যাদের পার্থিব কর্মক্ষয় হয় নি সেইসব জীবেদের সূক্ষ্মজগতে মৃত্যু ঘটলেও বিশ্বপরিকল্পনার উচ্চতর কারণস্তরে তারা প্রবেশ লাভ করতে পারে না; তারা কেবল জড় আর সূক্ষ্মজগতে যাতায়াত করে আর পর্যায়ক্রমে তারা ষোড়শ জড়তত্ত্ববিশিষ্ট স্থূলদেহ আর উনবিংশতি সূক্ষ্মতত্ত্ববিশিষ্ট আতিবাহিক দেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। উপরন্তু প্রত্যেক জড়দেহ নাশের পর পৃথিবীর অপরিগত জীব অধিকাংশকালই মরণনিদ্রার ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, আর মনোরম সূক্ষ্মজগতের বিষয়ে তার কদাচিৎ জ্ঞানলাভ ঘটে। সূক্ষ্মজগতে কিছুকাল বিশ্রামের পর এরূপ মানবাত্মা আবার জড়জগতে ফিরে আসে আরও শিক্ষা, আরও সাধনার জন্যে। আর বার বার যাতায়াতের ফলে ক্রমশঃ সে সূক্ষ্মস্তরের জগতে থাকতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে।

"উপরন্তু সূক্ষ্মজগতের সাধারণ অথবা বহুদিনের বাসিন্দারা, যারা সকলরকম জড়বাসনা হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছে, তাদের আর কখনও পার্থিব জড়ভূমিতে ফিরে আসবার প্রয়োজন হয় না। এইসব জীবদের কেবলমাত্র সূক্ষ্ম আর কারণজগতের কর্ম সকল ক্ষয় করতে হয়। সূক্ষ্মজগতে তাদের মৃত্যু ঘটলে তারা অপরিসীম সুন্দরতর আর সূক্ষ্মতর কারণজগতে প্রবেশ করে।

বিশ্ববিধানে নির্দিষ্ট সময় অন্তে, কারণশরীরের ভাবরূপ পরিত্যাগ করে এই সব উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্ত জীবেরা হিরণ্যলোক অথবা সেইরকম কোন উচ্চ সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম নবকলেবরে পুনর্জাত হয়ে তাদের সূক্ষ্মজগতের বাকী কর্ম সব ক্ষয় করে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "বৎস, এখন তুমি আরও বেশীই বুঝতে পারবে যে আমি বিধির বিধানেই মৃত্যু হতে পুনর্জীবন লাভ করেছি—কেন জান? পৃথিবী থেকে যে সব আত্মা সূক্ষ্মজগতে এসে প্রবেশ করছে, তাদের চেয়ে বিশেষভাবে কারণজগৎ থেকে যেসব আত্মা সূক্ষ্ম জগতে নেমে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে, তাদের মুক্তিসাধনের সহায়তার জন্যে। পৃথিবী থেকে যারা আসছে তাদের যদি বিন্দুমাত্র জড়জগতের কর্ম বাকী থাকে, তা হলে তারা আর হিরণ্যলোকের মত অতি উচ্চস্তরে কখনও আরোহণ করতে পারে না।

"পৃথিবীতে যেমন অধিকাংশ লোকই ধ্যানলব্ধ আত্মিকদর্শনের সাহায্যে সূক্ষ্মজগতের উচ্চতর সুখকর অবস্থা আর তার পরমানন্দ উপলব্ধি করতে শেখেনি, আর সেই জন্যেই মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সসীম আর অপূর্ণ আনন্দেই আবার ফিরে যেতে চায়, তেমনি বহু সূক্ষ্মশরীরীরা তাদের সূক্ষ্মদেহের স্বাভাবিক বিঘটনের সময় সূক্ষ্মজগতের অধিকতর স্থূল আর উচ্ছল আনন্দের চিন্তা মনের মধ্যে লালন করে আবার সূক্ষ্মজগতের স্বর্গেই পুনরায় ফিরে আসতে চায়। সূক্ষ্মজগতের গুরু কর্মফল এই সবল জীবেদের সূক্ষ্মজগতে মৃত্যু ঘটবার আগেই তা সব ক্ষয় করে নিতে হয়, তা না হলে তারা কারণ ভাবজগতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হতে পারে না—এই কারণে যে, ভাবজগৎ আর স্রষ্টার মধ্যে বিভেদ খুব অল্পই।

"কেবল যে জীবের যখন আর নয়নাভিরাম সূক্ষ্মজগতের অভিজ্ঞতালাভের কোন ইচ্ছা থাকে না, আর কোন প্রলোভনই তাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, তখনই কেবল সে কারণজগতে থাকতে পারে। সেখানে থেকে কারণজগতের সমস্ত কর্ম অথবা অতীত জীবনের সমস্ত বাসনার বীজ নাশ করবার সাধনা শেষ করে, বদ্ধজীব তিনটি অজ্ঞান আবরণের শেষ কারণঅবয়ব ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে সেই অনন্তপুরুষের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হয়।"

গুরুদেব অতি স্নিগ্ধমধুর হেসে বললেন, "এখন সব বুঝতে পারছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কৃপায় পারছি বটে। কৃতজ্ঞতায় আর আনন্দে আমি আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

কোনো সঙ্গীতে, কোনো আখ্যায়িকায় আমি এমন উদ্দীপনাময় আর উচ্চভাবের জ্ঞানের কথা কখনও শুনি নি। শাস্ত্রে যদিও এই সব কারণ এবং

সূক্ষ্মজগৎ আর মানুষের এই তিনটি অবয়বের কথার উল্লেখ আছে, তবুও আমার এই পুনরুত্থিত গুরুদেবের এ রকম অপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যার তুলনায় তাদের কতই না দুর্বোধগম্য. অসংলগ্ন বা অর্থহীন মনে হয়। তাঁর কাছে বাস্তবিকই এমন কোন—

"অচিন দেশের কথা জানা নাই তার,
কভু নাহি ফিরে পান্থ, সীমা হতে যার" ।*

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "মানুষের এই তিনটি শরীরের অন্তর্ব্যাপ্তি তার ত্রিবিধা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ তার জাগ্রত অবস্থায় তার এই তিনটি অবয়বের বিষয় অল্পবিস্তর সচেতন। যখন তার মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তখন সে প্রধানতঃ তার জড়শরীর দিয়ে কাজ করে। দর্শনক্রিয়া বা ইচ্ছাপ্রকাশের সময় সে প্রধানতঃ তার সূক্ষ্মশরীরের ভিতর দিয়ে কাজ করে। আর মানুষ যখন কোন চিন্তা বা গভীর অন্তর্দর্শন অথবা ধ্যানের মধ্যে গভীরভাবে ডুবে যায় তখন তার কারণশরীরের মাধ্যমে প্রকাশ পায়; আর যে মানবের নিয়মিতভাবে কারণশরীরের সংস্পর্শ ঘটে, দিব্যভাবের সূক্ষ্মচিন্তাসকল তার কাছে উদয় হয়। এই অর্থে কোন ব্যক্তিকে 'জড়ভাবাপন্ন', 'প্রাণবন্ত' অথবা 'বুদ্ধিজীবী' এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।

"মানুষ দৈনিক প্রায় ষোলঘণ্টা ধরে তার জড় অবয়বটিকেই নিজেকে বলে মনে করে—তারপর সে নিদ্রা যায়; যখন সে স্বপ্ন দেখে তখন সে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে, আর সে সময় সে বিনা আয়াসে সূক্ষ্মশরীরীদের মতই যে কোন জিনিষ সৃষ্টি করতে পারে। আর মানুষের সুষুপ্তি যদি গভীর আর স্বপ্নবিহীন হয়, তা হলে ঘণ্টাকতক ধরে সে তার চেতনা অথবা আমিত্ব-জ্ঞানকে তার কারণশরীরে পরিচালিত করতে পারে; এরূপ নিদ্রা পুনরুজ্জীবক। যে স্বপ্নদ্রষ্টা, কারণশরীরে নয় সূক্ষ্মশরীরের সংস্পর্শে আসে, তার নিদ্রা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে শ্রান্তি অপনোদনকারী হয় না।" গুরুদেবের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদানকালে আমি তাঁকে ভক্তিবিনত চিত্তে দেখতে দেখতে বললুম, "গুরুদেবতা, আপনার শরীর কিন্তু পুরী আশ্রমে আপনার দেহরক্ষার সময় যা দেখেছিলুম, ঠিক অবিকল তেমনটিই দেখতে।"

"হ্যাঁ, তা বটে, আমার এ নতুন শরীর সেই পুরান শরীরটার অবিকল প্রতিরূপ। পৃথিবীতে থাকতে আমি যত না করতুম, তার চেয়েও ঢের

* হ্যামলেট (৩য় অংক, ১ম দৃশ্য)।

বেশীবার আমি ইচ্ছামত যেকোন সময় আমার এই মূর্তি ধারণ করি বা অদৃশ্য করে ফেলি। মুহূর্তমধ্যে শরীর অদৃশ্য করে ফেলে এখন আমি আলোর গতিতে চোখের পলকে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাই, অথবা বস্তুতঃই সূক্ষ্ম থেকে কারণ কিম্বা জড়জগতে ফিরে যাই।" তারপর গুরুদেব একটু হেসে বললেন, "যদিও তোমরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পার, আমার কিন্তু তোমায় বোম্বাইয়ে খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্রও দেরী হয়নি!"

"গুরুদেব, আপনার মৃত্যুতে আমার যে কি গভীর দুঃখ হচ্ছিল।"

"আহাহা, আমি মরলুমই বা কোথায়? তোমার কথার মধ্যে কিছু বিপরীত উক্তি আছে নয় কি?" বলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সস্নেহ কৌতুকের হাসি হাসলেন।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "যোগানন্দ, তুমি কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে স্বপ্ন দেখছিলে; আর সেই স্বপ্নপৃথিবীর উপর তুমি আমার স্বপ্নদেহই দেখেছিলে। পরে সেই স্বপ্নেগড়া মূর্তিকেই তোমরা সমাধি দিয়েছিলে। এখনকার আমার এই আরও সূক্ষ্মতর মর্ত্যদেহ—যা তুমি এখন দেখছ আর শুধু দেখছই বা বলি কেন, এমন শক্ত করে এখন জড়িয়ে ধরে আছ—তা ঈশ্বরের আর একটা সূক্ষ্মতর স্বপ্নজগতে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। কোন দিন হয়তো বা সেই সূক্ষ্মতর স্বপ্নদেহ আর সূক্ষ্মতর স্বপ্নজগৎ সবই মিলিয়ে যাবে; তারাও সব আর কিছু চিরকালের জন্যে নয়। পরমজাগরণের চরম-স্পর্শে এই সব স্বপ্নবুদ্বুদ অবশেষে সকলই ফাটবে। যোগানন্দ, পুত্র আমার, স্বপ্ন আর সত্যের মধ্যে পার্থক্য বোধ কর, বুঝে নাও কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা সত্য!"

বৈদান্তিক* পুনরুত্থানের এই ভাব আমায় বিস্ময়ে অভিভূত করলে। পুরীতে গুরুদেবের প্রাণহীন দেহ দেখে যে শোকাকুল হয়ে পড়েছিলুম তা মনে পড়াতে লজ্জাই বোধ হল। অবশেষে আমি এই উপলব্ধি করলুম যে, পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং তাঁর আজকের এই পুনরুত্থান, এসব বিশ্বস্বপ্নে দৈব কল্পনার মধ্যে একটা আপেক্ষিকসম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ভেবে আমার গুরুদেব সর্বদাই ঈশ্বরভাবে নিমগ্ন থাকতেন।

"যোগানন্দ, তোমায় আজ আমি আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার

* জীবন আর মৃত্যু হচ্ছে চিন্তার কেবলমাত্র আপেক্ষিকভাব। বেদান্ত প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সৎবস্তু—পদার্থ আর সব কিছু হচ্ছে অ-পদার্থ, অবিদ্যা বা মায়া। এই অদ্বৈতবাদ শংকরাচার্যের উপনিষদের ভাষ্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে।

পুনরুত্থানের সব সত্যই এখন বললুম। আমার জন্যে আর শোক কোরো না, বরং ঈশ্বরের স্বপ্নেগড়া মানুষের পৃথিবী থেকে আরেকটি ঈশ্বরস্বপ্নরচিত সূক্ষ্মশরীরীদের লোকে আমার পুনর্জন্মের কথা তুমি সর্বত্র প্রচার কর গিয়ে। দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত, মরণভয়ে ভীত, পৃথিবীর স্বপ্নদর্শীদের অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার হবে।”

বললুম—“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলব বই কি।” ভাবলুম, তাঁর পুনরুত্থানে সবাইকার সঙ্গে আমারও কি আনন্দই না লাভ হবে।

তিনি স্নিগ্ধকোমলস্বরে বলতে লাগলেন, “পৃথিবীতে আমার প্রকৃতি অত্যন্ত অস্বস্তিকরগোছের কড়া ছিল, অনেকেরই পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন ছিল,—ঠিক খাপ খেত না। তোমায় হয়ত আমি প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী ভর্ৎসনা করেছি। কিন্তু তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ; আমার সকল তিরস্কার, সকল কঠিনশাসনের মেঘের মধ্য দিয়ে তোমার ভক্তির উজ্জ্বল রশ্মির ছটা প্রকাশ পেয়েছে।” তারপর স্নেহকোমল স্বরে বলতে লাগলেন, “আজ আমি তোমায় বলতে এসেছি যে আর তুমি সে কঠিন তিরস্কারের রুদ্রদৃষ্টি আমার কাছে দেখতে পাবে না; আর তোমায় আমি কখনও তিরস্কার করব না।”

হায়রে—আমার পরমদয়াল গুরুদেবের সেই সস্নেহ তিরস্কারকে হারিয়ে আজ আমার মন কি দারুণ বিষাদে আচ্ছন্ন! তারা যে সব চলার পথের অন্ধকারে এক একটি দেবদূতের মত আমায় রক্ষা করে আমায় সাবধানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলত। তাই রা সে সব আজ কোথায়?

“পরমারাধ্য গুরুদেব, আমায় হাজারবার বকুন,—এখনই আপনি আমায় ভর্ৎসনা করে আবার আগেকার মত আমায় শাসন করুন।”

“না যোগানন্দ, আর তোমায় আমি কখনও বকব না।” তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাতে হাসির গুপ্তধারা প্রবাহিত। “ঈশ্বরের মায়াস্বপ্নে আমাদের এই দুটো মূর্তি যতদিন আলাদা হয়ে থাকবে ততদিন আমরা দুজনেই একসঙ্গে আনন্দের হাসি হাসব। শেষে আমরা দুজনে এক হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মায় মিশে যাব—আমাদের হাসি হবে তাঁরই হাসি, আমাদের দুজনের মিলিত আনন্দসঙ্গীত ঈশ্বরভাবে ভাবিত আত্মাদের কাছে ধ্বনিত হবে অনন্তকাল ধরে।”

তারপর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কতকগুলি বিষয়ে আমায় কিছু উপদেশ দিলেন, যা আমি এখানে এখন প্রকাশ করে বলতে পারি না। সেই বোম্বাইয়ের হোটেলঘরে যে দুঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন সেই সময়

তিনি আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেই ১৯৩৬ সালের জুন মাসে তিনি যেসব পার্থিব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করে গিয়েছিলেন—তা সব ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে।

"প্রিয় বৎস আমার, এবার আমি তা হলে চলি।" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলুম যে আমার দৃঢ়সংবদ্ধ আলিঙ্গনের মধ্য থেকে তাঁর দিব্যদেহ যেন বিগলিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমার আত্মাকাশে তাঁর সেই অপূর্ব কণ্ঠধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, "বৎস, যখনই তুমি নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ করে আমায় ডাক দেবে, তখনই আমি তোমার কাছে এই রকম রক্তমাংসের শরীরে এসে হাজির হব,—আজ যেমন এসেছি।"

তাঁর এই দিব্যপ্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার দৃষ্টির গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মধুরসঙ্গীতের মূর্ছনায় তাঁর কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্রধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, "সকলকে বোলো যোগানন্দ! বোলো যে যিনিই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে জানতে পেরেছেন যে এই পৃথিবী ঈশ্বরের একটা স্বপ্ন বই আর কিছু নয়, তিনি স্বপ্নসৃষ্ট সূক্ষ্মতর হিরণ্যলোকে আসতে পারবেন—আর সেখানে আমার ঠিক পার্থিব শরীরের মতই সূক্ষ্মশরীরে পুনরুত্থিত দেখতে পাবেন; যোগানন্দ বোলো সকলকে এ কথা!"

আজ বিচ্ছেদের আমার সকল ব্যথা দূর হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য বেদনা আর শোক—যা এতদিন ধরে আমার সকল শান্তি হরণ করে আসছিল, তা আজ যেন লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাল। আত্মার নবউন্মুক্ত অনন্ত রুদ্ধপথে পরমানন্দের অমৃতধারা যেন এক বিরাট উৎস হতে সহস্রধারে উৎসারিত হয়ে প্রবেশ করতে লাগল। বহুদিনের অব্যবহৃত রুদ্ধমুখ আজ পূণ্য আনন্দের এক প্রবল বন্যার বিতাড়নে উদার, উন্মুক্ত হল। অন্তর পবিত্রতায় ভরে গিয়ে আজ পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল। আমার অতীত জন্মের ছায়াছবি সব চলচ্চিত্রের মত একে একে আমার অন্তশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল। আমার গুরুদেবের দিব্য আবির্ভাবের ফলে আমায় ঘেরা স্বর্গীয় আলোকের মধ্যে আমার অতীতজীবনের সদসৎ সবকর্মই যেন মিলিয়ে গেল।

আমার আত্মজীবনীর এই অধ্যায়ে আমি গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য করে সেই আনন্দসংবাদ প্রচার করেছি, যদিও তা বুঝতে অনুসন্ধিৎসু লোকেদের বুদ্ধি একটু বিপর্যস্ত হবেই। ক্ষুদ্রতা, নীচতা মানুষের ভালরকমই জানা আছে; হতাশাও তার নিতান্ত অপরিচিত নয়—তবু এরা সব মনোবৈকল্যের ভাব, মানুষের আসল স্বরূপের কোন অংশই নয়। যে দিন সে মনে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করবে, সেই দিন থেকেই সে মুক্তির পথে পা বাড়াবে। "ধুলোর তুমি

ধুলোয় মিশবে,"—দুঃখবাদীদের এই চিন্তাবসাদক উপদেশই বহুদিন ধরে সে মেনে এসেছে, শাশ্বত আত্মার চিরন্তন বাণীতে কখনও সে কর্ণপাত করে নি।

পুনরুত্থিত মদীয় গুরুদেবকে যে কেবল একমাত্র আমারই দেখবার বিশেষ সৌভাগ্য হয়েছিল তা নয়; আর একজনেরও সে সৌভাগ্য ঘটেছিল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিষ্যাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন, সকলে আদর করে তাঁকে "মা" বলে ডাকত। পুরী আশ্রমের কাছেই তাঁর বাড়ী। প্রাতর্ভ্রমণের সময় গুরুদেব প্রায়ই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ১৯৩৬ সালের ষোলই মার্চ তারিখে, "মা" আশ্রমে এসে তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

পুরী আশ্রমের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত স্বামী সেবানন্দ তখন সেখানে,—বিষাদকরুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললে, "সেকি, গুরুদেব যে এক হপ্তা হল দেহরক্ষা করেছেন!"

প্রতিবাদের সুরে তিনি মৃদু হেসে বললেন, "তা কি হয় গো বাবা! সে যে একেবারেই অসম্ভব।

বিব্রত সেবানন্দ তখন তাঁর সমাধির সব বিবরণ দিয়ে "মা"কে ডেকে বললে, "আচ্ছা আসুন, এই সামনের বাগানে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সমাধি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"ওসব কথা আমি কিছুই শুনতে চাইনে বাবা।" "মা" প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, "আরে না, না, এ সব কি কথা। তাঁর কোন সমাধিটমাধি হতেই পারে না। এই আজ সকালে যেমন তিনি বেড়াতে বেরোন, ঠিক তেমনি বেড়িয়ে বেলা দশটা নাগাদ আমার দুয়োরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন,—দেখলুম। দিনের বেলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল খানিকক্ষণ ধরে। কি সব বলছেন আপনি! তিনি এমন কি আমায় বললেন পর্যন্ত যে, 'আজ সন্ধেবেলা আমার আশ্রমে একবার এসো!' "

"তাই আমি এখন এখানে এসেছি বাবা! আমার ওপর তাঁর যে অনেকদিনের আশীর্বাদ! ভগবানের আশীর্বাদে গুরুদেব আমার চিরজীবী হোন! গুরুদেব আমার অমর, তাঁর কি কখনও মৃত্যু ঘটতে পারে? তাই আমার অমর গুরু আমায় জানিয়ে গেলেন যে কি দিব্যদেহে তিনি আজ সকালে আমায় দর্শন দিলেন!"

বিস্ময়ে হতবাক সেবানন্দ তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললে, "মা, আমার মন থেকে যে কি গুরু শোকের পাষাণভার আজ আপনি তুলে নিলেন, তা আর কি বলব। ঠিকই ত, তাঁর তিরোভাব তো কখনও ঘটেনি, তাই তিনি পুনরুত্থিত হয়ে আবার দেখা দিয়ে গেলেন!"

৪৪শ পরিচ্ছেদ

ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

অগাস্ট মাসের ভোরবেলা। ট্রেনের ধুলো আর গরমের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মিস্ ব্লেচ, মিঃ রাইট আর আমি ওয়ার্ধা স্টেশনে নেমে পড়লুম। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই আমাদের সম্বর্ধনার জন্য সেখানে উপস্থিত।

"ওয়ার্ধায় স্বাগত!" বলে খদ্দরের মালা দিয়ে শ্রীযুক্ত দেশাই আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। মালপত্র একটা গরুর গাড়ীতে চালান করে দিয়ে আমরা একটা খোলা মোটর গাড়ীতে উঠে পড়লুম। সঙ্গে চললেন শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই আর তাঁর সঙ্গীগণ, বাবাসাহেব দেশমুখ ও ডাক্তার পিঙ্গেল। কর্দমাক্ত গ্রাম্যপথের উপর দিয়ে গাড়ী চলল। অল্পক্ষণ পরেই "মগনবাদী" পৌঁছলুম—ভারতের রাষ্ট্রগুরুর আশ্রমে।

শ্রীযুক্ত দেশাই আমাদের সরাসরি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। মহাত্মা গান্ধী সেখানে মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছেন, একহাতে কলম আর একহাতে কাগজ,—প্রশান্তবদনে উদার মধুর প্রাণখোলা হাসি!

সেদিন ছিল সোমবার, মহাত্মাজীর মৌনব্রত পালনের দিন। কথা বলবার উপায় নেই। কাজেই তিনি লিখে জানালেন—অবশ্য হিন্দিতে, "স্বাগত!"

যদিও আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ, তবুও মনে হল যেন আমাদের কতকালের পরিচয়। দুইজনেই হাসলুম। ১৯২৫ সালে গান্ধীজী রাঁচি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তাকে সম্মানিত করেন আর সেখানকার পরিদর্শকদের খাতায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্যই লিখে দিয়ে আসেন।

মাত্র একশত পাউন্ডের এই ক্ষুদ্রকায় মহামানবটি থেকে যেন দৈহিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক একটা স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। স্নিগ্ধ ধূসর চক্ষুদুটি আন্তরিকতা, জ্ঞান আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজী হাজার রকমের আইনসংক্রান্ত, সামাজিক আর রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। গান্ধীজী ভারতের কোটিকোটি মূক

জনসাধারণের হৃদয়ে যে সুনির্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করেছেন, পৃথিবীতে আর কোন নেতা তেমনটি পারেন নি। তাদের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা তাঁর বিশ্ববিশ্রুত "মহাত্মা" নামেই প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের উপেক্ষিত, পদদলিত জনসাধারণ—যাদের এর চেয়ে আর বেশী কিছু জোটে না, কেবল তাদেরই সঙ্গে এক হয়ে গান্ধীজী প্রভৃতভাবে ব্যঙ্গচিত্রিত কটিবাসের অতিরিক্ত আর কিছুই পরিধান করেন না।

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর লেখবার ঘর থেকে আমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাবার সময় মহাত্মাজী তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যের সঙ্গে এই কটি কথা তাড়াতাড়ি লিখে আমার হাতে দিলেন: "আশ্রমবাসীরা সকলেই আপনাদের সেবার জন্য প্রস্তুত; কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই দয়া করে তাদের সব জানাবেন।"

শ্রীযুক্ত দেশাই আশ্রমের ফলফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন একটা টালি দিয়ে ছাওয়া বাড়ীতে—জানালাগুলো সব জাফরি দেওয়া। সামনের উঠানে একটা কুয়া, প্রায় পঁচিশফুট চওড়া। শ্রীযুক্ত দেশাই বললেন গবাদি পশুর জলপানের জন্য ব্যবহৃত হয়; ধানভানার জন্যে কাছেই একটা ঘোরাবার সিমেন্টের চাকা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট শোবার ঘরে—একেবারে যা না হলে আর চলে না—সেই একটিমাত্র করে হাতে তৈরী দড়ির খাটিয়া। চূণকামকরা রান্নাঘরের এক কোণে একটি জলের কল আর আরেক কোণে রাঁধবার জন্যে আগুনের আখা। সরল গ্রাম্যপরিবেশের মধ্যে যে সব শব্দ কানে আসতে লাগল—তা হচ্ছে কাক-চড়াইএর ডাক, গরুবাছুরের হাম্বারব আর পাথরকাটার দরুন বাটালির শব্দ!

রাইট সাহেবের ভ্রমণ ডায়েরী দেখে শ্রীযুক্ত দেশাই একটি পাতা খুলে সত্যাগ্রহীদের সত্যাগ্রহের* প্রতিজ্ঞাগুলি সব একে একে লিখে দিলেন, যথা:— "অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, কৌমার্য, অপরিগ্রহ, কায়িক পরিশ্রম, রসনাসংযম, নির্ভীকতা, সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আর অস্পৃশ্যতা পরিহার। এই এগারটি নিতান্ত অনুগতভাবে ব্রতস্বরূপ পালন করতে হবে।"

(মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই পাতাটি তার পরেরদিন স্বাক্ষর করেছিলেন, তারিখ দিয়েছিলেন—২৭শে অগাষ্ট, ১৯৩৫।)

আমাদের পৌঁছবার ঘণ্টাদুই পরে আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে খেতে যাবার

* সত্যাগ্রহ—মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত অহিংস সংগ্রাম।

ডাক পড়ল। তাঁর পড়াশোনার ঘর থেকে একটু তফাতে উঠানের ওপারে আশ্রমের ছাওয়া বারান্দা, তার তলায় মহাত্মাজী ইতিমধ্যে বসে গেছেন ; প্রায় পঁচিশটি নগ্নপদ সত্যাগ্রহীও সেই সঙ্গে বসেছেন, সামনে পিতলের থালাবাটি। আহারের পূর্বে সমবেত প্রার্থনা। তারপর একটা প্রকাণ্ড পিতলের পাত্র হতে ঘি মাখান চাপাটি দেওয়া হল। তার সঙ্গে তালসরি (টুকরো টুকরো শাক-সবজি সিদ্ধ) আর একটু লেবুর আচার।

মহাত্মাজী খেলেন চাপাটি, বীটসিদ্ধ, কিছু কাঁচা শাকসবজি আর কমলা-লেবু। তাঁর থালার একধারে বড় একতাল নিমপাতা বাটা—রক্ত পরিশোধক গুণের জন্যে প্রসিদ্ধ। তাই থেকে খানিকটা চামচে দিয়ে ভেঙে নিয়ে আমার পাতে দিলেন। আমি আর কি করি, খানিকটা জল দিয়ে সেটা ঢোঁক করে গিলে ফেললুম। মনে পড়ল ছেলেবেলাকার কথা,—মা যখন আমায় এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বস্তুটির গলাধঃকরণে বাধ্য করতেন। গান্ধীজী কিন্তু বেশ টুকটুক করে সেই নিমবাটাটি খেয়ে ফেললেন।

ঘটনাটা অবশ্য নিতান্তই তুচ্ছ আর সাধারণ, কিন্তু তাতেই আমি লক্ষ্য করলুম যে, ইন্দ্রিয়বোধ থেকে ইচ্ছামাত্র মনকে বিযুক্ত করবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। মনে পড়ল বছরকতক আগে তাঁর উপাঙ্গে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, সে সময় অ্যানাস্থেটিক্স প্রয়োগ উপেক্ষা করে গান্ধীজী সারা অস্ত্রোপচারের সময় তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেশ প্রফুল্লচিত্তেই গল্প করেছিলেন। তাঁর হাসির উচ্ছ্বাসে টেরই পাওয়া গেল না যে তিনি কোন কষ্টবোধ করছেন।

সেই সময় গান্ধীজীর এক বিখ্যাত শিষ্যা, এক ইংরেজ নৌসেনাপতির কন্যা, মিস্ ম্যাডেলিন স্লেড,—বর্তমানে মীরাবেন* নামে পরিচিতা, সেখানে বাস করছিলেন ; বৈকালে তাঁর সঙ্গে আলাপের খানিক সুযোগ পাওয়া গেল।

* মহাত্মা কর্তৃক তাঁকে লেখা কতকগুলি পত্র তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, যাতে তাঁর গুরু কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে। (গান্ধীস লেটার্স টু এ ডিসাইপল, হার্পার এন্ড ব্রাদার্স, নিউ ইয়র্ক ; ১৯৫০)।

পরবর্তীকালে অন্য একটি বইতে (দি স্পিরিটস্ পিলগ্রিমেজ, কাওয়ার্ড-ম্যাক্ ক্যান, নিউ ইয়র্ক ১৯৬০), ওয়ার্ধা আশ্রমে মহাত্মাজীর সাক্ষাতপ্রার্থী বহু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে মীরাবেন লিখেছেন : আজ এতদিন পরে আমার সকলকার কথা পরিষ্কারভাবে মনে পড়ছে না। কিন্তু দুজনের কথা এখনও বেশ মনে আছে—তুরস্কের খ্যাতনামা মহিলা লেখিকা হ্যালিডে এডিব হানুম এবং আমেরিকার সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ।" (প্রকাশকের মন্তব্য)

কথাবার্তা কইলেন নির্ভুল হিন্দীতে ; তাঁর দৈনন্দিন কার্যের বিবরণ দিতে দিতে তাঁর দৃঢ় ও শান্ত বদন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"গ্রাম পুনঃসংগঠনের কাজে পুরস্কার আছে! রোজ ভোর পাঁচটার সময় আমাদের একটি দল কাছাকাছি গ্রামের লোকেদের মধ্যে কাজ করতে যায় এবং তাদের সরল স্বাস্থ্যবিধিগুলি শিখিয়ে দেয়। কাজের মধ্যে আমাদের একটা নিয়ম থাকে, তাদের আঁস্তাকুড়, পায়খানা প্রভৃতি আর মাটির কুঁড়েঘরগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া। গাঁয়ের লোকেরা নিরক্ষর, কাজেই উদাহরণ না দেখালে তো আর তারা শিখতে পারবে না!" বলে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন!

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম এই উচ্চকুলসম্ভূতা সদ্বংশজাতা ইংরেজরমণীটির দিকে, যাঁর প্রকৃত খ্রিস্টানুগত্য—কেবলমাত্র "অস্পৃশ্য"দের দ্বারাই যে কাজ হয়—সেই ময়লাপরিষ্কারের কাজ করবার সামর্থ্য দিয়েছে!

তিনি আমাকে বললেন, "১৯২৫ সালে আমি ভারতে আসি ; এদেশে এসে দেখলুম যে আমি আমার 'নিজের ঘরে ফিরে এসেছি!' এখন আমি আর আমার পুরান জীবন বা পুরান কাজে ফিরে যাচ্ছিনে।"

অ্যামেরিকা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তিনি বললেন, "ভারতে বেড়াতে এসে বহু অ্যামেরিকান যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, তা দেখে আমি বাস্তবিকই খুব খুশী আর আশ্চর্য্যও বটে!"*

মীরাবেন সঙ্গে সঙ্গে চরকাঘোরান শুরু করলেন। মহাত্মাজীর প্রভাবে ভারতের গ্রামে গ্রামে আজ সর্বত্রই চরকা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কুটিরশিল্প পুনঃপ্রবর্তনের জন্য গান্ধীজীর অবশ্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক আর সংস্কৃতিগত কারণ আছে, কিন্তু তা হলেও তিনি গোঁড়ামি করে বর্তমান যুগের প্রগতিমূলক সবকিছু পরিহার করে চলতে বলেন না। যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ সবই তো তাঁর বিরাট কর্মজীবনে খুব বড় বড় অংশই গ্রহণ করেছে। পঞ্চাশবছরের জনসাধারণের সেবায়, কি কারাগারে, কি বাইরে থেকে, রাজনৈতিক জগতের কঠিন বাস্তবতা আর নানা খুঁটিনাটি সক্রিয়

* মিস স্লেডের সঙ্গে আমায় আর একটি বিশিষ্টা পাশ্চাত্য মহিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনি হচ্ছেন মিস মার্গারেট উডরো উইলসন ; অ্যামেরিকায় স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসনের জ্যেষ্ঠা কন্যা। নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ দেখা গেল। পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে গমন করে তাঁর জীবনের শেষ পাঁচবৎসর শ্রীঅরবিন্দের পদতলে সাধনায় অতিবাহিত করেন।

ব্যাপারের দৈনন্দিন সংঘর্ষে এসে, তাঁর মানসিক স্থৈর্য, ঋজুতা, স্থিরবুদ্ধি আর এই অপরূপ মানবপ্রদর্শনী, তাঁর সরস গুণবিবেচনাকেই কেবল বর্ধিত করে তুলেছে।

বাবাসাহেব দেশমুখ আমাদের তিনজনকে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন, সন্ধ্যা ৬টার সময়। সন্ধ্যা ৭টায় মগনবাদী আশ্রমে ফিরে এলুম ; আশ্রমের ছাদে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে রয়েছেন প্রায় জনত্রিশেক সত্যাগ্রহী। একটা মাদুরের উপর তিনি বসে। একটি পুরান ট্যাঁকঘড়ি তাঁর ঝুলান রয়েছে। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষকিরণলেখা অশ্বত্থ, তাল প্রভৃতি গাছের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় উচ্চিংড়ের একঘেয়ে সুর ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। আকাশে বাতাসে একটা গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে। মন গভীর আনন্দে ভরে উঠল।

শ্রীযুক্ত দেশাই একটি স্তোত্র গম্ভীরভাবে আবৃত্তি শুরু করলেন, দলের অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন ; তারপরে গীতাপাঠ। মহাত্মাজী আমায় শেষ প্রার্থনাটি করতে ইঙ্গিত করলেন। ভাব আর আশার কি দৈবসম্মিলন। সন্ধ্যাতারার বিরাট চন্দ্রাতপতলে ওয়ার্ধার আশ্রমের ছাদে ভগবৎ আরাধনা—এ আমার চিরদিনের স্মৃতি হয়ে রইল।

ঠিক রাত আটটার সময় গান্ধীজী তাঁর মৌন ভঙ্গ করলেন। তাঁর জীবনের যে বিরাট কাজ, তাতে তাঁর সময় খুব হিসেব করেই ভাগ করে নিয়ে তাঁকে চলতে হয়।

"স্বাগত, স্বামীজী!" এবার আর তাঁর বাণী কাগজের মারফতে আমার কাছে এসে পৌঁছল না। এখন আমরা ছাদ থেকে নেমে এসে তাঁর লেখবার ঘরে প্রবেশ করলুম,—মেঝেতে মাদুরপাতা (চেয়ার নাই), একটা নীচু ডেস্ক তাতে বই, কাগজ আর গোটাকতক সাধারণ কলম (ফাউণ্টেন পেন নয়) ; একটি অখ্যাত ও অজ্ঞাতকুলশীল ঘড়ি ঘরের এককোণে অবস্থিতি করে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। সর্বব্যাপী একটা গভীর প্রশান্তি আর নিষ্ঠারভাব বিদ্যমান। গান্ধীজীর প্রায় দন্তবিহীন মুখগহ্বরবিগলিত প্রাণখোলা হাসি পরম উপভোগ্য!

গান্ধীজী বললেন, "বছরকতক আগে আমি সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকা আরম্ভ করলুম—আমার চিঠিপত্র দেখাশোনা করবার জন্যে। কিন্তু এখন সে চব্বিশঘণ্টা আমার একটা দারুণ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে। সাময়িক মৌনব্রতপালন, শাস্তি নয়—আশীর্বাদ!"

সর্বান্তঃকরণে আমি তাতে সায় দিলুম।* অ্যামেরিকা ইউরোপ সম্বন্ধে

* আমার সেক্রেটারী ও অতিথিঅভ্যাগতদিগের নানা অসুবিধাসত্ত্বেও অ্যামেরিকায় আমি বহু বৎসর ধরেই মৌনব্রত পালন করে আসছি।

গান্ধীজী আমায় প্রশ্ন করলেন ; তারপর আমাদের ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা চলল।

শ্রীযুক্ত দেশাই ঘরে ঢুকতেই গান্ধীজী বললেন, "মহাদেব, কালরাত্রে টাউন হলে স্বামীজীর যোগসম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা কর।"

তারপর রাত্রে শয়নের পূর্বে বিদায় নেবার সময় গান্ধীজী অত্যন্ত বিবেচনা-সহকারে আমায় এক শিশি লেবুর তেল দিয়ে এক গাল হেসে বললেন, "ওয়ার্ধার মশারা কিন্তু আপনার ওসব অহিংসাটহিংসা* কিছুই মানে না, বুঝলেন স্বামীজী—একটু সাবধান হয়ে শোবেন।"

তারপরদিন সকালে আমরা সবাই দুধ আর গুড়ের সঙ্গে সুস্বাদু গমের ছাতুর মণ্ড দিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করলুম। বেলা প্রায় সাড়েদশটার সময় আমাদের সকলের খাবার ডাক পড়ল। গান্ধীজী এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীরাও সব বসেছেন। আজকের খাবারের ফর্দ হচ্ছে রাঙাচালের ভাত,-নতুনধরণের তরকারী আর এলাচ দানা।

দুপুরে আশ্রমের জমিতে কিছুক্ষণ বেড়ালুম। মাঝে মাঝে কয়েকটি শান্ত নিরীহ গাভীর গোচারণের মাঠ। গোরক্ষায় গান্ধীজীর একটা বিশেষ ঝোঁক।

মহাত্মাজী বলেছেন, "আমার কাছে গোজাতি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবেতর পৃথিবী, যার উপর মানুষের নিজের জাতি ছাড়াও তার সহানুভূতি বিস্তৃত। এই গোজাতির মধ্য দিয়েই মানুষ সকল প্রাণীর সঙ্গে তার ঐক্য অনুভব করতে পারে। প্রাচীন ঋষিরা কেন যে দেবত্বারোপে গোজাতিকে পূজার জন্যে নির্বাচিত করেছিলেন তা আমার কাছে বেশ সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের গোজাতিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ; প্রাচুর্যের দাত্রী সে। কেবলমাত্র সে যে দুগ্ধপ্রদানই করে এসেছে তা নয়, কৃষিকার্যও সে সম্ভবপর করে তুলেছে। শান্ত প্রাণীদের কাছেই অনুকম্পা দেখতে পাওয়া যায়। গাভী হচ্ছে অনুকম্পার কাব্যরূপ। মনুষ্যজাতির মধ্যে কোটি কোটি লোকেদের কাছে সে আর একটি মা! গো-সংরক্ষণ মানে ভগবানের রাজ্যে সমগ্র মূক প্রাণীজাতির সংরক্ষণ। সৃষ্টির

---

* অহিংসা—গান্ধীমতবাদের মূলভিত্তি। তিনি জৈনভাবের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জৈনেরা অহিংসাকেই ধর্মের মূল বলে মানে। হিন্দুধর্মের এক শাখা জৈন-ধর্মের বিপুল প্রচার হয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাবীর কর্তৃক খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। মহাবীর—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবীর ; আজ তিনি এই শতাব্দীসমূহের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে তাঁর এই বীরপুত্রের প্রতি সস্নেহ নেত্রপাত করুন।

নিম্নস্তরের জীবেদের আবেদন সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী, কারণ তারা হচ্ছে মূক আর অসহায় জীব।”

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর অবশ্যপালনীয় তিনটি আহ্নিকক্রিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে ‘ভূতযজ্ঞ’—পশুপক্ষীদের মধ্যে আহারবিতরণ। এই আচার পালন হচ্ছে সৃষ্টির নিম্নস্তরের প্রাণীদের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধির প্রতীক; এরা সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে দেহবোধে আবদ্ধ, যা মানবজীবনকেও ক্ষয় করে, কিন্তু মানবজাতির যে বৈশিষ্ট্য—মুক্তিপ্রদায়িনী যে বিচার ও যুক্তি, তা এদের মধ্যে নাই। ভূতযজ্ঞ এইরূপে দুর্বল প্রাণীদের পুষ্টিদানের জন্য মানুষের তৎপরতাকে দৃঢ় করে তোলে। সেও আবার আর একদিক দিয়ে উচ্চতর অদৃশ্যজীবদের অগণিত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করে। ভূমি, সমুদ্র, আর আকাশে প্রকৃতির যে অফুরন্ত সঞ্জীবন দান ছড়ান রয়েছে তার কাছেও মানুষ ঋণী। এই যে মূকপ্রকৃতি, প্রাণী, মানুষ আর পরলোকের দূতেদের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের যে বিবর্তনের বাধা রয়েছে, তা এইরকম নীরব ভালবাসার কর্তব্যের দ্বারাই অতিক্রম করা যায়।

আর দুটি দৈনিক যজ্ঞ হচ্ছে ‘পিতৃ’ আর ‘নৃ’। পিতৃযজ্ঞ হচ্ছে পিতৃপুরুষদের তর্পণ—তাঁদের কাছে ঋণের কৃতজ্ঞতাস্বীকারের চিহ্ন, যাঁদের জ্ঞানের উৎকর্ষে আজ এ মানবজাতি আলোকিত। আর নৃযজ্ঞ হচ্ছে অপরিচিত অথবা দরিদ্রদের মধ্যে আহার্যবিতরণ; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বর্তমান দায়িত্ব—তার সমসাময়িকদের প্রতি কর্তব্যপালন।

বিকালবেলা গান্ধী আশ্রমে ছোট ছোট মেয়েদের দেখতে গিয়ে আমি স্থানীয় পল্লীর মধ্যে নৃযজ্ঞ পালন করলুম। রাইট সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিল, যেতে মিনিট দশেক লাগল। রঙবেরঙের শাড়ীর উপর মেয়েদের ছোট ছোট মুখগুলি যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দীতেই কথাবার্তা চলছিল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল; কি আর করি, হেসে রাইট সাহেব আর আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী চেপে মগনবাদীতে ফিরে এলুম। সারা পথে দারুণ বৃষ্টি!

অতিথিশালায় প্রবেশ করে সর্বত্র অনাড়ম্বর সরলতা আর আত্মত্যাগের নিদর্শন দেখে যেন আবার নতুন করে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। অপরিগ্রহ গান্ধীব্রত তাঁর বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকেই শুরু হয়। মহাত্মাজী তাঁর বিরাট আইনের প্র্যাকটিস, যাতে করে তাঁর বাৎসরিক প্রায় ৬০,০০০ টাকা আয় ছিল, তা পরিত্যাগ করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

ত্যাগের সাধারণ ও প্রচলিত ধারণাসম্বন্ধে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী উপহাস করে বলতেন,—

"ভিখারী তো তার ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে পারে না। কেউ যদি আক্ষেপ করে বলে…'আমার ব্যবসা দেউলে হয়েছে, আমার স্ত্রী আমায় ত্যাগ করেছে, আমি সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেব'—তাতে করে পৃথিবীতে তার ত্যাগের মহিমা আর থাকে কোথায়? সে তো আর ধনসম্পত্তি, স্নেহ, ভালবাসা সব ত্যাগ করেনি—তারাই সব তাকে ত্যাগ করেছে।"

গান্ধীজীর মত মহাপুরুষেরা যে শুধু সাক্ষাৎ কোন বিশেষ ত্যাগ করেই মহীয়ান তা নয়, তাঁদের ত্যাগ আরও কঠিন, আরও উচ্চ; তাঁরা তাঁদের সকল-প্রকার স্বার্থচিন্তা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সব ত্যাগ করে তাঁদের অন্তরতম আত্মাকে অখণ্ড মানবজীবনস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

যখন গান্ধীজী তাঁর স্ত্রী আর তাঁর সন্তানসন্ততিদের জন্য তাঁর নিজ সম্পত্তির কোনও অংশ স্বতন্ত্র করে রাখতে অসমর্থ হলেন, তখনও গান্ধীজীর স্বনামধন্যা স্ত্রী কস্তুরাবাই কোন আপত্তি করেন নি। প্রথম-যৌবনে গান্ধীজী বিবাহিত হয়েছিলেন—তারপর গুটিচারেক সন্তানসন্ততিলাভের পর* গান্ধীজী ও তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মচর্যপালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এই গভীর নাটকে, যাতে তাঁদের উভয়ের জীবন অভিনীত, তাতে কস্তুরাবাই হচ্ছেন একজন ধীর স্থির নায়িকা, যিনি কোন বিপদেই বিচলিত হন নি—অকম্পিতপদে স্বামীর সঙ্গে কারাবাসে গেছেন, তাঁর তিনসপ্তাহব্যাপী উপবাসে অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং গান্ধীজীর অগণিত দায়িত্বসমূহে তাঁর অংশ তিনি পরিপূর্ণভাবেই বহন করেছেন। তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন :—

"তোমার জীবনসঙ্গিনী আর সহকর্মিনী হবার সৌভাগ্যলাভে আমি নিজেকে

---

* "দি স্টোরী অফ মাই এক্সপেরিমেণ্টস উইথ ট্রুথ" (আমেদাবাদে, নবজীবন প্রেস) নামক পুস্তকে গান্ধীজী তাঁর জীবনের সকল তথ্যই অকপটে উদ্ঘাটিত করেছেন।

বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের নাম আর নানা বিচিত্র ঘটনার বিবরণপূর্ণ বহু আত্মজীবনীই কিন্তু লেখকের আত্মবিশ্লেষণ অথবা আত্মবিকাশের কোন ধারার সম্বন্ধে প্রায় একেবারেই নীরব থাকে। এইগুলি পড়ে পাঠককে কতকটা অতৃপ্তির সঙ্গেই বইটি নামিয়ে রেখে যেন বলতে হয়,—"জীবনী যাঁর পড়লুম, তিনি তো অনেক বড় বড় লোকেদেরই পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু এতে দেখছি যে তিনি নিজের পরিচয় কখনও পান নি"; গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়ে এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব; তিনি তাঁর নিজের দোষত্রুটি, ছলকপটতা প্রভৃতি, সত্যের প্রতি তাঁর এমন অবিচল শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কোন যুগের ইতিহাসে তেমন লেখা আর কোথাও দেখা যায় নি।

ধন্যবাদ দেই। আর ধন্যবাদ দিই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আদর্শ বিবাহের জন্যে যা ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—যৌনলিপ্সার উপর নয়। ধন্যবাদ দিই ভারতের জন্য তোমার জীবনের কাজে তোমার সমান ভেবে আমায় গ্রহণ করেছ বলে। আর তুমি যে সেইসব স্বামীদের মতন, যারা জুয়া, ঘোড়দৌড়, সুরা, নারী আর গানবাজনাতেই সময় কাটিয়ে দেয়, আর ছোটছোট ছেলেদের যেমন শীঘ্রই তাদের খেলার উপর বিতৃষ্ণা এসে পড়ে তেমনি তাদের স্ত্রীপুত্রের উপরও বিরাগ দেখা দেয়—সেরকমটি নও বলে, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই। আর, তুমি পরের শ্রম অপহরণ করে বড়লোক হবার জন্যে যারা সময় ব্যয় করে, তাদের মতন স্বামী নও বলে আমি যে কত কৃতজ্ঞ!

"আর ধন্যবাদ দিই তুমি ঈশ্বর আর দেশকে অর্থলিপ্সার চেয়ে উঁচুতে স্থান দিয়েছ, তোমার আত্মবিশ্বাস, সাহস আর ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ অখণ্ড আর অবিচলিত বিশ্বাস আছে। আমার এমন স্বামীকে ধন্যবাদ দিই যেহেতু তিনি ভগবান আর তাঁর দেশকে আমার কাছে আদর্শের স্থান দিতে পেরেছেন। আর আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে তোমার অপরিসীম সহ্যগুণের জন্যে, আমার যৌবনের দোষ, ত্রুটি সব মার্জনা করে নেওয়াতে—তখন অত প্রাচুর্যের মধ্য থেকে অত অস্বচ্ছলতার মধ্যে গিয়ে পড়ে আমাদের জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করাতে কত না আক্ষেপ, কত না বিদ্রোহ তোমার বিরুদ্ধে করেছি!

"শৈশবে তোমাদের বাড়ীতেই আমি মানুষ হই; তোমার মা ছিলেন উচ্চমনা আর মহীয়সী নারী। তিনিই আমায় গড়ে তোলেন। তিনি আমায় শিক্ষা দেন কি করে সাহসী, দৃঢ়চেতা আর উপযুক্তা স্ত্রী হতে পারা যায়, কি করে তাঁর পুত্র—আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর, ভালবাসা আর সম্মান অর্জন করতে পারি। বছরের পর বছর কাটতে লাগল—তুমিও ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় জননায়ক হলে, তখন আমার কিন্তু এ ভয় আর রইল না যে স্বামী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলে স্ত্রী যেমন দূরে পড়ে থাকে, আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে—যা সচরাচর অন্যান্য দেশে ঘটে থাকে। আমি জানি যে মরণেও আমরা সেই স্বামী-স্ত্রী দুজনে এক হয়েই থাকব।"

সর্বজনপ্রিয় গান্ধীজী যে কোটিকোটি টাকা সংগ্রহ করেন, সেই ধন-ভাণ্ডারের ধনরক্ষকের কর্তব্য কস্তুরাবাই বহুদিন ধরে সুচারুরূপে পালন করেছিলেন। এসম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে যে গয়নাটয়না পরে স্ত্রীরা যদি কোন গান্ধীমিটিং শুনতে যায় তাহলে স্বামী বেচারাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—কারণ মিটিংএ মূক, অসহায়, দরিদ্র ও পদদলিত জনসাধারণের জন্যে গান্ধীজীর চিত্তদ্রবকারী আবেদনে ধনী স্ত্রীরা গলা থেকে হীরার

নেকলেস আর হাত থেকে সোনার ব্রেসলেট খুলে সোজাসুজি ভিক্ষার ঝুলিতে দিয়ে না বসে !

একদিন জনতা ধনভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ কস্তুরাবাই মাত্র চারিটি টাকার খরচের আর হিসেব মেলাতে পারলেন না। গান্ধীজী হিসেব-নিকেশের রিপোর্ট যথাযথরূপে প্রকাশিত করলেন—দেখা গেল তাতে তাঁর স্ত্রীর হিসেবের গরমিল বেশ সুস্পষ্ট তিরস্কারের সঙ্গে দেখান আছে।

আমার অ্যামেরিকান শিষ্যদের ক্লাসে আমি প্রায়ই এই গল্পটি করতুম। একদিন সন্ধ্যেবেলা একটি মহিলা রাগে চিৎকার করে বলে উঠল,—

"মশায়, তিনি মহাত্মাই হোন আর যাই-ই হোন না কেন, তিনি যদি আমার স্বামী হতেন, তাহলে আমায় সাধারণের সামনে এরকম অযথা অপমানের জন্যে ঠেঙিয়ে তাঁর চোখে কালশিরে পড়িয়ে দিতুম।"

যাই হোক্, মার্কিন আর হিন্দুস্ত্রী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কতকগুলি সরস বাদানুবাদের পর আমি তখন আর একটু বিস্তারিতভাবে বললুম,—

"শ্রীমতী গান্ধী মহাত্মাজীকে শুধু তাঁর স্বামী বলেই বিবেচনা করেন না, তাঁর গুরু বলেই মনে করেন, তাঁর সামান্যতম ভুলেরও যাঁর সংশোধন করে দেবার অধিকার আছে। কস্তুরাবাইয়ের সর্বসাধারণের সম্মুখে ভর্ৎসিত হবার পর রাজনৈতিক অপরাধে গান্ধীজী জেলে যান। তিনি যখন শান্তভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছিলেন, তখন কস্তুরাবাই তাঁর পদতলে পতিত হয়ে অতি দীনভাবে বললেন, 'প্রভু, আমি যদি কখনও আপনার চরণে অপরাধ করে থাকি, তাহলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন।' "

ওয়ার্ধায় সেদিন বৈকালে বেলা তিনটার সময়, পূর্ববন্দোবস্ত অনুযায়ী আমি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে গিয়ে হাজির হলুম,—গান্ধীজী, যিনি নিজের স্ত্রীকে একজন একনিষ্ঠা শিষ্যা তৈরী করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা একটা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার—তিনি মুখ তুলে চাইলেন—মুখে সেই হাসি, যা কখনও ভোলবার নয়।

খোলা মাদুরের উপর তাঁর পাশে বসে পড়ে আমি বললুম, "মহাত্মাজী, আপনার 'অহিংসা'র মানে কি ?

"চিন্তায় বা কাজে কোন প্রাণীর প্রতি ক্ষতির ভাব পরিহার করা।"

"চমৎকার আদর্শ ! কিন্তু সকলেই তো বলবে যে, একটা শিশুকে অথবা নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে কেউ কি একটা কেউটে সাপও মারতে পারবে না ?"

"কেউটে সাপ মারতে গেলে আমার দুটো প্রতিজ্ঞা,—নির্ভীকতা আর

অহিংসা এ দুটো ভাঙতে হয়। তার চেয়ে তাকে বরং মনে মনে আমি ভালবাসার অনুভূতি দ্বারা জয় করবার চেষ্টা কোরবো। অবস্থার প্রয়োজনে আমার আদর্শ আমি নীচু নাও করতে পারি।" তারপর তাঁর অপূর্ব সারল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "অবশ্য এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে কেউটে সাপের সামনে পড়লে আমি যে এরকম ভাবে কথাবার্তা কইতে পারতুম না, সে কথাও ঠিক।"

ডেস্কের উপরে খাদ্যসম্বন্ধে লেখা অতি আধুনিক কতকগুলি বিলাতী বই পড়েছিল—তাদের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করাতে তিনি একটু হেসে বললেন, "সব জায়গায় যেমনি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তেমনি খাদ্য বিচারও একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সত্যাগ্রহীদের জন্যে পরিপূর্ণ সংযম প্রচার করি বলে অবিবাহিতদের জন্যে আমি সব চেয়ে উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করবার সর্বদা চেষ্টা করছি। ইন্দ্রিয়সংযমের আগে রসনাসংযম প্রয়োজন। অর্ধাহার বা অসম খাদ্যগ্রহণ এর উত্তর নয়। আগে অন্তরে খাদ্যের লোভ সংবরণ করে তবে সত্যাগ্রহী প্রয়োজনীয় সব খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন), খনিজপদার্থ, ক্যালোরি ইত্যাদি সমেত উপযুক্ত নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা সব অনুসরণ করে চলবে। খাদ্যসম্বন্ধে অন্তঃ ও বহির্জ্ঞানের দ্বারা সত্যাগ্রহীর শুক্র তার শরীরে প্রাণশক্তি-রূপে সহজেই পরিণত হয়।"

মহাত্মাজী ও আমাতে মিলে মাংসের পরিবর্তে কি ভাল প্রতিকল্প ব্যবহার করা যায় তার বিষয় আলোচনা করলুম। আমি বললুম, "এভোকেডোই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল, আমার ক্যালিফোর্ণিয়া আশ্রমের কাছে অসংখ্য এভোকেডো কুঞ্জ আছে।"

গান্ধীজীর আনন আগ্রহ ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আমি ভাবছি যে সে সব কি ওয়ার্ধায় জন্মাবে? তা হলে সত্যাগ্রহীরা একটা নতুন খাদ্য পেয়ে খুশীই হবে।"

আমি বললুম, "লস্ এঞ্জেলিসে ফিরে গিয়ে ওয়ার্ধায় আমি নিশ্চয়ই এভোকেডো গাছ পাঠাব। ডিম হচ্ছে প্রোটিনবহুল একটি খাদ্য, কিন্তু তা কি সত্যাগ্রহীদের পক্ষে গ্রহণ করা বারণ?"

গান্ধীজী অতীতের কথা স্মরণ করে একটু হেসে বললেন, "বাওয়া ডিম অবিশ্যি নয়। কিন্তু তা হলেও বহুবছর ধরেই আমি তাদের তা ব্যবহার করতে দিই নি—এমন কি এখনও পর্যন্ত আমি নিজে তা খাই না। আমার একটি পুত্রবধূ একবার পুষ্টিহীনতার জন্যে ভুগছিল—তার ডাক্তার তাকে ডিম খাওয়াবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল; আমি রাজী না হয়ে তাকে ডিমের বদলে অন্য কিছু ব্যবস্থা করবার উপদেশ দিলুম।

"ডাক্তার বললেন, 'গান্ধীজী, খাওয়া ডিমে কোন প্রাণের বীজ নেই ; এতে প্রাণীহত্যার আশঙ্কা নেই, আপনি অনায়াসে ডিম খেতে দিতে পারেন।'

"তখন আমি খুশী হয়ে পুত্রবধূটিকে ডিম খেতে অনুমতি দিলুম ; শীঘ্রই সে স্বাস্থ্য ফিরে পেল।"

আগের দিন রাত্রে, গান্ধীজী লাহিড়ীমহাশয়ের ক্রিয়াযোগ দীক্ষা গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মহাত্মাজীর খোলা মন আর অনুসন্ধিৎসার আগ্রহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধান ছিল শিশুদেরই মত সরল, যে সারল্য শিশুদের হৃদয়কে পবিত্র আধারস্বরূপে প্রকাশিত করে দেখে যীশুখ্রিস্ট প্রশংসা করে বলেছেন, "এর ভিতরেই স্বর্গরাজ্য আছে।"

আমার প্রতিশ্রুত উপদেশ দেবার নির্ধারিত সময় এল। জনকয়েক সত্যাগ্রহী তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন,—শ্রীযুক্ত দেশাই, ডাক্তার পিঙ্গেল, এবং আরও জনকতক, যাঁরা "ক্রিয়া" নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

প্রথমে আমি সেই ছোট্ট ক্লাসটিতে যোগদার শারীরিক ব্যায়াম কৌশলগুলি শিখিয়ে দিলুম। শরীরকে বিশটি অংশে বিভক্ত বলে দেখতে হয়। মন পরম্পরাক্রমে তাদের প্রত্যেক অংশে শক্তি প্রেরণ করে। ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে শীঘ্রই প্রত্যেকে আমার সামনে একটি করে মানবমোটররূপে স্পন্দিত হতে লাগলেন। গান্ধীজীর বিশটি দেহাংশে ঢেউ খেলানর মত যোগাভ্যাসের ক্রিয়ার ফল সহজেই প্রত্যক্ষ হল···সব সময়েই তা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর। খুব রোগা হলেও তাঁকে দেখতে একেবারে বেমানান নয়, শরীরের ত্বক তাঁর মসৃণ আর বলিহীন।*

তারপরে তাঁদের আমি সব "ক্রিয়াযোগে"র মুক্তিদায়িনী প্রক্রিয়াতে দীক্ষিত করলুম।

মহাত্মাজী পৃথিবীর সকল ধর্মের বিষয়ই শ্রদ্ধাসহকারে পড়াশুনা করেছেন। গান্ধীজীর অহিংসা-সত্যের মূলে জৈনশাস্ত্র, বাইবেলের নূতন টেস্টামেন্ট আর টলস্টয়েরা সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে লেখা—এই তিনটি প্রধান উপাদান। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজী এই কথা বলেছেন ঃ—

* গান্ধীজী বহু স্বল্পকালের ও দীর্ঘ উপবাস করেছেন। অসাধারণ ভাল তাঁর স্বাস্থ্য। তাঁর বই সব—ডায়েট এণ্ড ডায়েট রিফর্ম, নেচার কিওর, আর কী টু হেলথ আহমদাবাদে নবজীবন পাবলিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য।

† প্রতীচ্যের আরও তিনটি লেখক—থোরো, রাস্কিন ও ম্যাজিনির সমাজনীতিসম্বন্ধীয় মতবাদও গান্ধীজী সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন।

"বেদের মতনই আমি বাইবেল, কোরাণ আর জেন্দাবেস্তাকে* দৈবানুপ্রাণিত বাণী বলেই মনে করি। আমি গুরুবাদে বিশ্বাস করি, কিন্তু এ যুগে সাধারণ লোকদের কোনরকম গুরু না করেই চলা উচিত, কারণ পূর্ণজ্ঞান আর পরিপূর্ণ পবিত্রতার সমাবেশ একত্র দেখতে পাওয়া নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু নিজ ধর্মের সত্য কখনও জানতে পারবেনা বলে কারুর হতাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সকল প্রধান প্রধান ধর্মমতেরই মত হিন্দুধর্মের মূলসত্য অপরিবর্তনীয় আর সহজে বোধগম্য।

"প্রত্যেক হিন্দুর মত আমিও ঈশ্বর এবং একেশ্বরবাদ, আর পুনর্জন্ম ও মুক্তিতে বিশ্বাস করি। হিন্দুধর্মসম্বন্ধে আমার মনোভাব আমার নিজ স্ত্রীর প্রতি যা, তার চেয়ে বেশী বর্ণনা করতে পারি না। তিনি আমায় যেরকম ভাবে পরিচালিত করেন—পৃথিবীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক তেমন পারে না। তাঁর যে কোন দোষ নেই তা নয়; আমি জোর করেই বলতে পারি যে তাঁর এমন অনেক কিছু দোষ আছে যা আমি নিজে দেখতে পাই না। কিন্তু তবুও সেখানে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ভাব বিদ্যমান। সেইরকম আমি হিন্দুধর্মকে তার সব দোষ আর সংকীর্ণতা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করি। গীতার শ্লোক আর তুলসীদাসের রামায়ণের চেয়ে আর কিছু আমায় বেশী আনন্দ দেয় না। যখন মনে হবে আমার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে আসছে, গীতাই তখন আমার একমাত্র শান্তির স্থল হয়ে দাঁড়াবে।

"হিন্দুধর্ম কোন বিশিষ্ট ধর্ম নয়। এ ধর্মের মধ্যে পৃথিবীর সকল মহাপুরুষদের শ্রদ্ধার ও পূজার স্থান আছে।† সাধারণ ভাষায় যাকে বলে প্রচারকদের ধর্ম, এ তা নয়। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে হিন্দুধর্ম বহুজাতিকে আপন অঙ্কে স্থান দিয়েছে, কিন্তু এই গ্রহণ বিবর্তনপ্রসূত, আর তা অজানিত-ভাবেই ঘটেছে। হিন্দুধর্ম প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম‡

---

* ১০০০ খৃস্টপূর্বাব্দে জরথুস্ত্র কর্তৃক রচিত পারস্যদেশের ধর্মশাস্ত্র।

† পৃথিবীর ধর্মসকলের মধ্যে হিন্দুধর্মের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একজনমাত্র কোন বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা যে এ প্রতিষ্ঠিত তা নয়, এর উৎপত্তি হচ্ছে অপৌরুষেয় বৈদিক শাস্ত্রসকল হতে। তাই হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে সকল যুগ আর সকল দেশের ধর্মোপদেষ্টাদের পূজা ও শ্রদ্ধার স্থান পাবার সুযোগ আছে। বৈদিকশাস্ত্রসকল, মানবের প্রত্যেক কার্য দৈববিধি অনুযায়ী পরিচালিত করবার প্রচেষ্টায় যে শুধু পূজার্চনা তাই নয়, তার অতি প্রয়োজনীয় সামাজিকবিধি ও প্রথাসকলও নিয়ন্ত্রিত করে।

‡ ধর্ম—ধৃ (ধারণ করা)+ম। বিধির ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত শব্দ। ন্যায়বিধি বা স্বাভাবিক ধর্মভাবের অনুসরণ। অবস্থা বিশেষে নির্দিষ্ট মানুষের তৎকালীন কর্তব্যপালন।

অনুসারে ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলে—আর তাইতে অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে এর কোনই বিরোধ নেই।"

যীশুখ্রিস্ট সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছেন, "আমার স্থির বিশ্বাস যে যদি তিনি এ সময়ে এখনকার লোকেদের মধ্যে বাস করতেন, তা হলে তিনি অনেকের জীবনকেই আশীর্বাদপূত করতেন, যারা তাঁর নাম পর্যন্তও কখন শোনে নি—যেমন তাঁর বাণীতে আছে, 'যারা কেবল আমায় শুধু হে প্রভু, হে প্রভু বলেই ডেকেছে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তা নয়, কিন্তু কেবল সেই—যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করেছে'।* যীশু তাঁর নিজের জীবনের আদর্শে মানবজাতিকে যে বিরাট উদ্দেশ্য আর একমাত্র লক্ষ্য প্রদর্শন করেছিলেন তার অনুসরণেই আমাদের সকলের প্রয়াস করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে কেবলমাত্র খ্রিস্টানদেরই যে তিনি তা নয়—তিনি সকল দেশ, সকল জাতি, সমগ্র পৃথিবীর তিনি।"

ওয়ার্ধা অবস্থানের শেষের দিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দেশাই কর্তৃক টাউন হলে আহূত একটি সভায় আমায় বক্তৃতা দিতে হল। যোগসম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার জন্যে প্রায় চারশ লোকের জনতায় ঘরটি জানালার পাড় পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে হিন্দীতে পরে ইংরেজিতে বলতে হল। আমাদের ছোট্ট-দলটি ঠিক সময়মত আশ্রমে ফিরতে পেরেছিল। শুভরাত্রি জ্ঞাপন করতে এসে দেখলুম গান্ধীজী পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে লেখাপড়ায় ব্যস্ত।

ভোর পাঁচটায় উঠলুম—রাত তখনও রয়েছে। গ্রামের মধ্যে জীবনের স্পন্দন শুরু হয়েছে। প্রথমে আশ্রমদ্বারের সামনে দিয়ে একটি গরুর গাড়ী গেল, তারপর একটি কৃষক একটা প্রকাণ্ড মোট বিপজ্জনকভাবে মাথার উপর বসিয়ে চলেছে দেখা গেল। প্রাতরাশের পর আমরা তিনজন বিদায়প্রণাম সেরে নেবার জন্যে গান্ধীজীর সন্ধানে গেলুম। গান্ধীজী উষাকালীন প্রার্থনার জন্যে আরও ভোরে ওঠেন—ভোর ৪টায়।

নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ করে বললুম, "মহাত্মাজী প্রণাম, এবার বিদায় দিন। আপনার পরিচালনায় ভারত আজ নিরাপদ।"

ওয়ার্ধা ভ্রমণের পর বহুবৎসর অতীত হয়ে গেছে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ পৃথিবীর মহাযুদ্ধে ঘনমসীলিপ্ত। পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের মধ্যে

শাস্ত্রসমূহে ধর্মের সংজ্ঞা স্বাভাবিক এইরূপ দেওয়া আছে যে, "বিশ্ববিধান যার পালনে মানুষ নিজেকে অধোগতি আর দুঃখভোগের হাত হতে রক্ষা করতে পারে।"

* ম্যাথিউ ৭ ; ২১—(বাইবেল)।

একমাত্র গান্ধীজীই কেবল সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধক বার করেছেন। সকল অত্যাচার, অবিচারের প্রতিকারে মহাত্মাজী অহিংসপন্থা অবলম্বনেরই ব্যবস্থা করেছেন আর বারম্বার তার ফলপ্রসূতাই প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতবাদ তিনি নিম্নলিখিত কটি কথায় ব্যক্ত করেছেন :—

"আমি দেখেছি, ধ্বংসের মধ্যেও জীবনের প্রবহমানতা। সুতরাং মৃত্যু বা ধ্বংসের চেয়েও কোন উচ্চতর বিশ্ববিধান নিশ্চয়ই আছে। কেবলমাত্র সেই নিয়মের অধীনেই সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত সমাজ সহজগ্রাহ্য হবে আর জীবনও উপভোগ্য হবে।

"জীবনের যদি এই-ই বিধি হয়, তাহলে আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও অবশ্যই তা পালন করে যাব। যেখানেই যুদ্ধ হোক না কেন, যেখানেই আমরা কোন বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হই না কেন, আমরা ভালবাসা দিয়েই তাকে জয় করব। আমি দেখেছি যে ভালবাসার কতকগুলি ধারা আমার জীবনে বহু প্রশ্নের সমাধান করেছে, যা ধ্বংসবিধি কখনও করতে পারেনি।

"ভারতে এই বিধির বিরাট পরিমাণ ফলের চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা লাভ করেছি। আমি অবশ্য একথা বলিনে যে ভারতের ছত্রিশকোটি লোকের ভিতরেই অহিংসামন্ত্র প্রবেশ লাভ করেছে, কিন্তু এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, অন্য যেকোন মতের চেয়ে এ অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত সময়ের মধ্যে লোকের অন্তরে খুব গভীরতর ভাবেই প্রবেশ করেছে।

"মনে অহিংসভাব আনবার চেষ্টা রীতিমত পরিশ্রম আর শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার। সৈনিকের মতন ঠিক নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করা চাই। পরিপূর্ণ অবস্থা তখনই লাভ হয়, যখন বাক্য, দেহ, মন এসবের উপযুক্ত সমন্বয় সাধিত হয়। সত্য আর অহিংসভাবই যদি আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়, তাহলে প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান মেলে।"

পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বীভৎসতা নির্মমভাবে এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবে মানুষের ধ্বংসই পরিণতি। ধর্ম না হলেও বিজ্ঞানই মানবজাতির মনে নিরাপত্তার অভাববোধের ক্ষীণ আভাস আর এমনকি সমস্ত পার্থিব বস্তুর একটা অনিত্যতাবোধের ভাব জাগিয়ে তুলেছে। সত্যই মানুষ এখন তার আদিকারণ ও তার অন্তরস্থিত সেই পরমাত্মার কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে পারে?

ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে কেউ ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারে যে মানবজাতির সমস্যা পশুশক্তির সাহায্যে কখনও সমাধান হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পৃথিবীব্যাপী ক্রমবর্ধমান অমঙ্গলজনক কর্মফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

উৎপত্তি হয়। কেবল একমাত্র বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেমমন্দাকিনীধারাই এই যুদ্ধের রক্তপাতজনিত কর্মফলের হিমালয়প্রমাণ বিরাট তুষারস্তূপ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ধুয়েমুছে দিতে পারে, তা না হলে তা থেকে আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের উৎপত্তি হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর অমঙ্গলত্রয়ী! বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার জন্যে মানবীয় যুক্তির বদলে পাশবিক যুক্তি প্রয়োগ করলে পৃথিবী জঙ্গলেই পরিণত হবে। নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিময় জীবনধারার মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন না হলে তাদের মিলন হবে সর্বগ্রাসী ভীষণ মৃত্যুর কোলে গিয়ে। এইরূপ ভাবের ঘৃণ্য হীনতার জন্য ভগবান মানুষকে স্নেহবশে আণবিকশক্তির রহস্য আবিষ্কারে অনুমোদন দান করেন নি।

যুদ্ধ আর পাপ শেষ পর্যন্ত কখনও সুফল আনে না। কোটিকোটি টাকা, যা সব বিস্ফোরকের ধোঁয়ার শূন্যতায় মিলিয়ে গেল, তা দিয়ে আর একটা নতুন পৃথিবী গড়া যেতে পারত—যে পৃথিবী হত প্রায় আধিব্যাধিশূন্য, আর দারিদ্র্যের কবল হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ভয়, বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির প্রলয়নাচনের এ পৃথিবী নয়—এ পৃথিবী হচ্ছে শান্তি, সুখ, সৌভাগ্য আর জ্ঞানপ্রসারের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

মানুষের সর্বোচ্চ বিবেকে গান্ধীজীর অহিংস বাণীর আবেদন পেঁছবেই। আজ পৃথিবীর সকল জাতিই একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হোক: মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নয়—জীবনের ভিতর দিয়ে, ধ্বংসের মধ্যে নয়—গঠনের ভিতর দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে নয়, প্রেমের অলৌকিক সৃষ্টির মধ্যদিয়ে।

মহাভারতে আছে যে, "মানুষের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, তার জন্যে তার ক্ষমা করা উচিত। বলা হয় যে মানুষ ক্ষমাশীল হওয়ার জন্যই জীবনধারা অব্যাহত। ক্ষমা পুণ্য; ক্ষমার দ্বারাই জগৎ ধৃত। ক্ষমাই হচ্ছে শক্তিমানের শক্তি। ক্ষমা হচ্ছে ত্যাগ, ক্ষমাতেই মনের শান্তি। আত্মসংযমী যারা, তাদের গুণই হচ্ছে ক্ষমা আর সৌজন্য। এরা অনন্তগুণেরই পরিচয় দেয়।"

অহিংসা হচ্ছে ক্ষমা আর প্রেমের ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। গান্ধীজী বলেন, "ধর্মযুদ্ধে যদি প্রাণসংহার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে লোকে যীশুখ্রিস্টের মত, যেন তার নিজের রক্তই দান করতে প্রস্তুত হয়, অপর কারুর নয়। পরিণামে পৃথিবীতে রক্তক্ষয় একেবারে কমে আসবে।"

ভারতের সত্যাগ্রহীদের বিষয়ে হয়ত কোন দিন কোন মহাকাব্য লিখিত হবে—যারা ঘৃণাকে ভালবাসা দিয়ে, হিংসাকে অহিংসা দিয়ে জয় করেছে, যারা অস্ত্রধারণের পরিবর্তে নিজেদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দিয়েছে। ফলে

এই হয়েছে যে, কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনায় সশস্ত্র বিপক্ষদল তাদের হাতের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দারুণ লজ্জায় পালিয়েছে ; যারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে পরের জন্যে আত্মদান করতে প্রস্তুত, সে সব লোকেদের দেখে তাদের অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজী বলেন, "যদি দরকার হয় তো আমি যুগযুগান্ত ধরেও অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু রক্তপাতের পন্থায় আমি কখনও দেশের স্বাধীনতা চাইব না।" বাইবেলও আমাদের এই বলে সাবধান করে দেয় যে, "যারা তরবারি ধারণ করে, তাদের তরবারিতেই মৃত্যু ঘটবে।"* গান্ধীজী লিখেছেন,—

"আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলি—কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বিশ্বের মত উদার। এর কোলে পৃথিবীর সকল জাতির ঠাঁই।† আমার জাতীয়তাবাদ সারা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে। এ আমি চাইনা যে, আমার ভারত অন্যান্য জাতির ভস্মাবশেষের উপর গড়ে উঠুক। আমি চাই না ভারত একটিমাত্র লোককেও শোষণ করে। আমি চাই যে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠুক, যাতে করে সে অপর জাতিদের মধ্যেও তার শক্তি সঞ্চারিত করতে পারে। আজকে ইউরোপে একটা জাতিরও মধ্যে তা নেই ; তারা আর অপরাপর জাতিদের কোন শক্তিই দান করতে পারে না।

"প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর চমৎকার চতুর্দশটি ধারা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বলেছেন, 'পরিশেষে শান্তিলাভের জন্য যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা বিফল হয়, তাহলে আমাদের অস্ত্রের উপরই নির্ভর করতে হবে।' আমি সে ব্যবস্থাটা উল্টে দিয়ে বলতে চাই, 'আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যেই বিফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন নতুন একটা কিছু খুঁজে বার করা যাক ; এখন আমাদের প্রেমের শক্তি আর ঈশ্বর যিনি পরম সত্য, এই দুটি জিনিষের পরীক্ষা করে দেখা যাক।' আমরা যখন সেটা পাব তখন আর আমাদের কিছু চাইবার বাকী থাকবে না।"

* ম্যাথিউ, ২৬ : ৫২—(বাইবেল)। বাইবেলে এই রকম অসংখ্য পংক্তি আছে যাতে মানুষের জন্মান্তরবাদের সুস্পষ্ট অর্থ সূচিত করে। (১৬শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কর্ম্মফলের ন্যায়ের বিধি জানা থাকলে জীবনের বহু জটিল ব্যাপারের অর্থ সহজবোধ্য আর সরল হয়ে আসে।

† "মানুষ যেন না গৌরব করে, বিস্তারিয়া প্রেম দেশে,
সে যেন বরং গর্বিত হয়, স্বজাতিরে ভালবেসে।"

• পারসিক প্রবাদ।

মহাত্মাজীর দ্বারা শিক্ষিত হাজার হাজার খাঁটি সত্যাগ্রহীরা (যাঁরা এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বর্ণিত এগারটি কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন), তাঁরা আবার নিজেরা সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন,—অহিংসার আধ্যাত্মিক এবং পরিশেষে পার্থিব উপকার উপলব্ধি করবার জন্যে ভারতের জনসাধারণকে ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দেন। অবিচারের সঙ্গে অসহযোগ, অস্ত্রগ্রহণ অপেক্ষা অপমান, কারাবাস এমন কি মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছা, এই সব অহিংস অস্ত্রে তাঁর বাহিনী সজ্জিত করে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বীরজনোচিত অগণিত আত্মোৎসর্গের উদাহরণের মধ্য দিয়ে জগতের লোকেদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, গান্ধীজী যুদ্ধ ব্যতিরেকে বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করবার জন্যে অহিংসার সক্রিয়ভাবের মহান্ শক্তি নাটকীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন।

বন্দুকের গুলিচালনা ব্যতীতই কোন দেশের কোন নেতা তাঁর দেশের জন্য এ পর্যন্ত যতটা করতে পেরেছেন, গান্ধীজী অহিংস উপায়ে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী রাজনৈতিক সুবিধা ইতিমধ্যে আদায় করে নিতে পেরেছেন। সকল অন্যায়, অমঙ্গল, সকল দুঃখ, অহিংস উপায়ে উন্মূলিত করবার প্রণালী শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে আদর্শভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নয়, ভারতের সমাজসংস্কারের সূক্ষ্ম আর জটিল ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের বহুদিনের বহু বিবাদবিসম্বাদ গান্ধীজী আর তাঁর অনুগামীরা দূর করতে পেরেছেন ; লক্ষ লক্ষ মুসলমান গান্ধীজীকেই তাঁদের নেতা বলে মনে করেন। অস্পৃশ্যরা গান্ধীজীকে তাদের নির্ভীক আর অজেয় নেতা বলে মনে করে। গান্ধীজী লিখেছেন, "আমার কপালে যদি পুনর্জন্ম লেখা থাকে, তাহলে আমি পতিতদের মধ্যে একজন পতিত হয়েই জন্মাতে চাই—কারণ তা হলে তাদের জন্যে আরও বেশী কাজ করতে পারব।"

মহাত্মা বাস্তবিকইএর মহান্ আত্মা ; ভারতের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের অন্তর হতে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে এ উপাধিটি তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে। এই শান্ত মহাপুরুষটি তাঁর স্বদেশের জনসাধারণের অন্তরে এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসন অধিকার করে রয়েছেন। গান্ধীজীর উচ্চ আশা নিম্নতম কৃষকদের মধ্যেও ফলবতী হয়ে উঠেছে। মানুষের অন্তরে যে একটা সহজাত ঔদার্য আর মহত্ত্ব আছে, তা গান্ধীজী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতাও গান্ধীজীকে কখনও নিরুৎসাহিত করে নি। তিনি লিখছেন, "কোন প্রতিকূলাচারী যদি কোন সত্যাগ্রহীর সঙ্গে বিশবার মিথ্যাচরণ বা প্রবঞ্চনা করে, তাহলে সেই সত্যাগ্রহী একুশবারের বারও তাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, কারণ মানবপ্রকৃতিতে

অবিচলিত ও অখণ্ড বিশ্বাসস্থাপনই হচ্ছে তার অনুসৃত মতের সার পদার্থ !"*

একজন সমালোচক একবার এই মন্তব্যটি করেছিল—"মহাত্মাজী, আপনি একজন অসাধারণ লোক। আপনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না যে আপনি যেমনটি করবেন, বিশ্বসংসারও ঠিক তেমনিটি করে চলবে।"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "শরীরের অবশ্য উন্নতিসাধন করা যেতে পারে বটে কিন্তু আত্মার সুপ্তশক্তি জাগ্রত করা অসম্ভব—এই কল্পনা করে আমরা নিজেদের কি অদ্ভুত ভাবেই না ঠকাই। আমি দেখাতে চেষ্টা করি যে আমার মধ্যে যদি তেমন কোন শক্তি থাকে, তাহলেও আমি আর পাঁচজনেরই মত নশ্বর দেহধারী; আর আমার নিজের মধ্যে কোন অসাধারণত্ব কখনও ছিল না, আর এখনও নাই। আমি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি, অন্যান্য যে কোন লোকের মত আমারও ভুলভ্রান্তি হতে পারে, তবে আমি একথা বলতে পারি যে আমার নিজের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে তা শুধরে নেবার মত যথেষ্ট নম্রতা আমার আছে। আমি একথা জোর করেই বলব যে ঈশ্বর আর তাঁর মঙ্গলময় ভাবের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস আর সত্য এবং প্রেমের প্রতি গভীর অনুরাগ আমার আছে। কিন্তু সে জিনিষটা কি সকলের অন্তরে সুপ্ত নেই ?" তারপর তিনি বললেন, "যদি আমরা জড়জগতে নতুন আবিষ্কার করতে পারি, তা হলে কি আধ্যাত্মিক জগতে গিয়ে আমাদের একেবারে দেউলে হয়ে যেতে হবে ? ব্যতিক্রমের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের নিয়মে পরিণত করাটা কি এতই অসম্ভব ? মানুষ কি কেবল সর্বদাই আগে পশু তার পরে মানুষ হবে—যদি আদৌ হয় ?"‡

* "তখন পীটার তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার কাছে কতবার অপরাধ করলে তাকে আমি ক্ষমা করব ? সাতবার পর্যন্ত ?' যীশু তাকে বললেন, তোমাকে বলছিনা যে কেবল সাতবার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।" ম্যাথিউ—১৮ ; ২১-২২ (বাইবেল)। এরূপ একটা অসম্ভব উপদেশ বোঝবার জন্যে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলুম। প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলুম, "প্রভু, এ কি সম্ভব ?" তখন তাতে একটা জ্যোতিঃপ্লাবন সারাহৃদয় শান্ত করে দৈববাণীতে ঝংকৃত হল, "হে মানব, তোমাদের প্রত্যেককে আমি দিনের মধ্যে কতবার না ক্ষমা করি ?"

‡ সুবিখ্যাত ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, চার্লস সি, ষ্টাইনমেৎজকে, রজার ভ্যাব্রিউ ব্যাবসন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কিসের গবেষণায় সর্বোচ্চ উন্নতির সূচনা হবে ?" ষ্টাইনমেৎজ উত্তর দিলেন, "আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক পথেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হবে। ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে শিক্ষা দেয় যে এখানে এমন

পেনসিলভ্যানিয়ায় উইলিয়াম পেনের সপ্তদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপনের সফল অহিংস পরীক্ষার কথা অ্যামেরিকাবাসী আজও সগর্বে খুব ভাল ভাবেই স্মরণ করে থাকেন। সেখানে "কোন দুর্গ, কোন সৈন্য, কোন যোদ্ধৃদল এমন কি কোন অস্ত্রশস্ত্র" পর্যন্তও ছিল না। রেড ইন্ডিয়ান আর নূতন বসতকারীদের মধ্যে যে হিংস্র সীমান্তযুদ্ধ আর নৃশংস হত্যাকান্ড চলছিল, একমাত্র পেনসিলভেনিয়ার কোয়েকারেরাই সে সব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত ছিল। "অপর লোকেদের মধ্যে কতক বা হত, কতক বা দলবদ্ধ-ভাবে বিরাট হত্যাকান্ডে নিহত হয়েছিল ; কিন্তু একটি মাত্রও কোয়েকার রমণী অত্যাচারিত হয় নি, একটিমাত্র কোয়েকার শিশু হত বা একটিমাত্রও কোয়েকার পুরুষ উৎপীড়িত হয় নি।" শেষ পর্যন্ত যখন কোয়েকারদের প্রদেশের শাসনভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হল, তখন "যুদ্ধ বেধে গেল আর বহুসংখ্যক পেনসিলভ্যানিয়ানরাও নিহত হল। কিন্তু কোয়েকারেরা নিহত হল মাত্র তিনজন, আর কেবল সেই তিনজন—যারা আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রবহন না করার বিশ্বাস হতে চ্যুত হয়েছিল।"

ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট বলেছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ শান্তি আনতে পারে নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় সমানই অফলপ্রসূ। এ শিক্ষা পৃথিবীর গ্রহণ করা উচিত ছিল।"

লাওৎ সু শিক্ষা দিয়েছেন,—"যতই বেশী হিংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সব বেরোবে, মানবজাতির দুঃখ ততই বাড়বে। অত্যাচারের বিজয়গর্বের পরিণতি ঘটে শোকের উৎসবেই!"

গান্ধীজী বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী শান্তি ছাড়া আর কিছুর জন্যে আমার লড়াই নয়। অহিংস সত্যাগ্রহের ভিত্তিতে যদি ভারতীয় আন্দোলন চালিয়ে সাফল্যলাভ করা যায় তাহলে এ দেশপ্রেমিকতার, আর যদি

একটি শক্তি আছে যা মানবজাতির অভ্যুদয়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। তবুও আমরা যেন এর সঙ্গে ছেলেখেলাই করে চলেছি, কারণ জড়শক্তি সম্বন্ধে আমরা যেমন করেছি তেমন গুরুতরভাবে আমরা এর আলোচনা বা চর্চা কখনও করি নি। একদিন না একদিন লোকেরা বুঝতে পারবে যে পার্থিব কোন বস্তু সুখ এনে দেয় না, আর তা নরনারীকে সৃজনক্ষম আর শক্তিশালী করে তুলতে অতি অল্পই কাজে আসে। তখন এ পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকমন্ডলী তাঁদের পরীক্ষাগারে ঈশ্বর, প্রার্থনা আর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা কার্য শুরু করে দেবেন, যার সামান্য মাত্র সূচনা এখনও পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে। সেইদিন যখন আসবে, পৃথিবীতে এক যুগের মধ্যে যতটা উন্নতি দেখা দেবে, গত চার যুগের মধ্যে তা দেখা যায় নি।"

সবিনয়ে নিবেদন করে বলা যায়, তাহলে জীবনেও একটা নতুন মানে এনে দেবে।"

প্রতীচ্য গান্ধীজীর কর্মপন্থা স্বপ্নবিলাসীর স্বপ্ন বলে পরিত্যাগ করবার পূর্বে সে একবার গ্যালিলীর প্রভু যীশুখ্রীস্টের সত্যাগ্রহের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে আগে বিবেচনা করুক :—

"তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে—চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত চাই ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি যে তোমরা অনিষ্ট দিয়ে অনিষ্টের প্রতিরোধ কোরো না। কিন্তু যদি কেউ তোমাদের দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহলে তার দিকে তোমরা অপর গণ্ডটাও ফিরিয়ে দিও।"

বিশ্বনিয়ন্তার কালের বিধানে গান্ধীজীর যুগ নিখুঁত সুন্দরভাবে বেড়ে গিয়েছে সেই শতাব্দীতে—যা দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধে ইতিমধ্যেই একেবারে উৎসন্ন আর বিধ্বস্ত হয়েছে। ঈশ্বরের যে হস্তলিপি তাঁর জীবনের মর্মর বেদীতে লিখিত হয়েছে তা হ'ল পুনরায় ভায়ে ভায়ে রক্তপাতের বিরুদ্ধে তার অমর সাবধানবাণী।

মহাত্মা গান্ধীর হস্তলিপি

(হিন্দিতে)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

মহাত্মা গান্ধী রাঁচিতে যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। রাঁচির পরিদর্শকদের মন্তব্যপুস্তকে তিনি অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত পংক্তিগুলি লিখে দিয়েছেন ; এর অনুবাদ হচ্ছে,—"এই বিদ্যালয় আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমি মনে এই উচ্চ আশা পোষণ করি যে এই বিদ্যালয় চরকার অধিকতর প্রচলনে উৎসাহ দান করবে।

(স্বাঃ) মোহন দাস গান্ধী।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি তর্পণ

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী নূতন দিল্লীতে নিহত হলে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেন,—

"তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা আর এক উন্মত্ত মানব তাঁকে হত্যা করেছে। কোটিকোটি নরনারী আজ তাঁর জন্য গভীর শোক করছে কারণ দীপ আজ নির্বাপিত……যে আলোক এই দেশেতে দীপ্তি প্রকাশ করছিল, তা সাধারণ আলো ছিল না। সেই অনির্বাণ আলোক-শিখা সহস্র বৎসর ধরে এই দেশে বিকশিত হয়ে থাকবে আর সমগ্র জগৎও তা দেখবে।"

মাত্র পাঁচমাস আগে ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ৭৮ বৎসর বয়স্ক গান্ধীজীর জীবনের কাজের পরিসমাপ্তি; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। দুর্ঘটনার দিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁর নাতনীকে ডেকে বললেন, "আভা, জরুরী কাগজপত্র সব এখুনি নিয়ে এস, আমাকে আজকেই সব উত্তর দিতে হবে। কালকের দিন হয় তো কখন নাও আসতে পারে"। তাঁর লেখা বহু পংক্তির মধ্যে গান্ধীজী তাঁর চরম ভাগ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন।

উপবাসক্লিষ্ট দুর্বলদেহে উপর্যুপরি তিনবার গুলি বিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুখ মহাত্মা গান্ধী যখন ধীরে ধীরে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন, তখন অন্তিমশয়নে শায়িত হয়ে প্রচলিত হিন্দুপ্রথানুযায়ী হাত তুলে তিনি আততায়ীকে ক্ষমা করেই চলে গেলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ জীবনের সকল-প্রকার আত্মত্যাগই তাঁর চরম মুহূর্তে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি সম্ভবপর করে তুলেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এলবার্ট আইনষ্টাইন্ লিখেছেন, "হতে পারে যে, ভবিষ্যতে বহুযুগ ধরে লোকেরা হয়ত কদাচিৎ একথা বিশ্বাস করবে যে এরূপ একজন লোক রক্তমাংসের শরীর ধারণ ক'রে এই পৃথিবীর মাটির উপরই বিচরণ করত।" রোমে পোপের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ হতে প্রেরিত সংবাদে উল্লিখিত, "এই ঘৃণ্য গুপ্তহত্যা এখানে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে ; খ্রিস্টিয় গুণাবলীর মূর্ত প্রকাশের দেবতাহিসাবে গান্ধীর জন্য লোকে শোক প্রকাশ করছে।"

কোন বিশিষ্ট সদুদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল মহৎ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁদের সকলেরই জীবন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ। ভারতীয় ঐক্যসাধনে গান্ধীজীর নাটকীয় মৃত্যু দ্বন্দ্বনিরোধ, বিবাদবিসম্বাদবিচ্ছিন্ন পৃথিবীর সকল দেশের চক্ষে তাঁর বাণী উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে। সেই বাণী তিনি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতময় নিম্নলিখিত কথাগুলিতে প্রকাশিত করেছেন :

"জনসাধারণের মধ্যে অহিংসনীতি বিস্তার লাভ করেছে আর এ স্থায়িত্ব লাভ করবে। পৃথিবীতে শান্তি আনবার এ হচ্ছে অগ্রদূত।"

৪৫শ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার "আনন্দময়ী মা"

আমার ভাইঝি অমিয়া বসু একদিন আমায় বললে, "নির্মলা দেবীকে না দেখে আপনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন না। তাঁর ভগবদ্ভক্তি অতীব গভীর আর 'আনন্দময়ী মা' বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিতা।" চোখে মুখে ফুটে উঠল তার গভীর আকুতি।

বললুম, "নিশ্চয়ই, সেই সন্ন্যাসিনীকে দেখে যাব বই কি। তাঁর ঈশ্বর-ভাবের উচ্চাবস্থার কথা সব আমি পড়েছি। আমারও তাঁকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে আছে। বছরকতক আগে ঈস্ট-ওয়েস্ট পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধও বেরিয়েছিল।"

অমিয়া বলতে লাগল, "আমি তাঁকে দর্শন করেছি। আমরা যেখানে থাকি, সেই জামসেদপুর সহরে সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন। একবার এক শিষ্যের অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়ীতে যান। তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটির কপালে হাত বুলিয়ে দিতেই তার মৃত্যুযন্ত্রণা সব থেমে গেল। রোগও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল; আনন্দে, বিস্ময়ে লোকটি দেখলে যে সে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে।"

দিনকতক বাদে শুনতে পেলাম, আনন্দময়ী মা কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। রাইট সাহেব আর আমি, দুজনে মিলে আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। ভবানীপুরের সেই বাড়ীটির কাছে আমাদের ফোর্ডগাড়ী পৌঁছতে রাইট সাহেব আর আমি রাস্তার উপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম।

আনন্দময়ী মা একটা হুডখোলা মোটর গাড়ীতে দাঁড়িয়ে, প্রায় শতখানেক শিষ্য তাঁকে ঘিরে রয়েছে—দেখে বোধ হল কোথাও যাবার জন্যে হয়ত বেরোচ্ছেন। রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ীটাকে কিছু দূরে রেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে সেই নীরব জনতার দিকে এগিয়ে চলল। আনন্দময়ী মা আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্রই গাড়ী থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

"বাবা, আপনি এসেছেন!" আবেগভরে এই কথাটি বলে এক হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে তিনি আমার কাঁধের ওপর তাঁর মাথাটি রাখলেন। রাইট

সাহেবকে একটু আগেই বলেছি—আমি এই সাধ্বীটিকে বিশেষ চিনি না—কাজেই এই রকম অসাধারণ অভ্যর্থনার দৃশ্য দেখে সে বেচারা অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল। আর সেই শতখানেক চেলা—তারাও অবাক বিস্ময়ে এই স্নেহসিক্ত দৃশ্যাবলী স্থির হয়ে দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলুম যে তখন তিনি সমাধির খুব উচ্চাবস্থায় রয়েছেন। বাইরে নারীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি শাশ্বত আত্মা; সেই স্তর থেকে তিনি আর একজন ঈশ্বরভক্তকে সানন্দে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন করছেন। হাত ধরে তিনি তাঁর গাড়ীর কাছে আমায় নিয়ে গেলেন।

আমি একটু প্রতিবাদের সুরে বললুম, "আনন্দময়ী মা, আমি আপনার বেরোন তো দেরী করিয়ে দিচ্ছি!"

তিনি বললেন, "বাবা, এ জীবনে আজ আমি আপনাকে এই প্রথম দেখছি—কত যুগযুগান্তর পরে। এখুনি আর চলে যাবেন না।"

গাড়ীর পিছন দিকের আসনে আমরা দুজনে বসলুম। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ী মা সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন,—শরীর স্থির, নিশ্চল, মূর্তিবৎ। সুন্দর দুটি চক্ষু তাঁর আকাশের দিকে অর্ধোন্মীলিত, দৃষ্টি স্থির হয়ে এসে নিবদ্ধ হল নিকট-সুদূর অন্তরের স্বর্গরাজ্যে। শিষ্যবর্গ শান্ত ও মৃদুস্বরে বলে উঠল—"আনন্দময়ী মাঈ কি জয়!"

ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থায় সাধিকার দর্শনলাভ আমার আগে কখনও ঘটে নি। তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল, তাতে করেই তাঁর নাম হয়েছে "আনন্দময়ী মা"। সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণকেশপাশ অবগুণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে লুটিয়ে পড়েছে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা—তৃতীয় নেত্রের প্রতীক, তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে তাঁর সদা জাগ্রত। ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট দুটি হাত আর ছোট্ট দুটি পা—তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য।

আনন্দময়ী মা সমাধিস্থ থাকাকালীন আমি নিকটস্থ একটি শিষ্যাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম।

শিষ্যাটি বললেন, "আনন্দময়ী মা ভারতের বহুস্থানেই ভ্রমণ করেন; নানা জায়গায় তাঁর শতশত শিষ্য আছে। তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলে নানা প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি কোন প্রকার জাতিভেদ মানেন না। ওনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবার জন্যে আমাদের একটি দল সর্বদাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। মায়ের মত যত্ন নিয়ে ওঁকে

আমাদের সর্বদা দেখাশোনা করতে হয়, কারণ উনি দেহের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। কেউ যদি না ওঁকে খেতে দেয় তো খানই না, বা তার কোন খোঁজও করেন না। খাবার সামনে ধরে দিলেও, তা পর্যন্ত উনি ছোঁন না। এই রকম না খেয়ে খেয়ে শেষপর্যন্ত উনি যদি দেহত্যাগই করে বসেন, সেই ভয়ে আমরা, ওঁর শিষ্যরা, ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেই। দিনের পর দিন ধরে উনি সমাধি অবস্থায় থাকেন, নিশ্বাস পড়ে কি না সন্দেহ, দৃষ্টি তখন থাকে একেবারে নিষ্পলক, স্থির। ওঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ওঁর স্বামী। বহুবছর আগে ওঁদের বিবাহ হবার অল্পকাল পরেই তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন।"

শিষ্যাটি একটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন ; বেশ চওড়া কাঁধ, আকৃতিও বেশ সুন্দর, লম্বা চুল আর শাদা দাড়ি। ভদ্রলোকটি নীরবে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন করযোড়ে—শিষ্যের ভক্তিনত ভাবে।

ব্রহ্মানন্দসাগরে অবগাহন করে আনন্দময়ী মা এখন যেন জড়জগতে ফিরে এলেন।

"বাবা, বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন ?" তাঁর স্বর অতি পরিষ্কার, যেন সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার।

"বর্তমানে কলকাতা কিম্বা রাঁচি, কিন্তু শীগগিরই অ্যামেরিকায় ফিরে যাচ্ছি।"

"অ্যামেরিকা ?"

"হ্যাঁ ; সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মত ভারতীয় সাধিকাকে দেখলে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে—যাবেন আপনি ?"

"বাবা নিয়ে গেলেই যাব !"

উত্তর শুনে তো সেখানকার শিষ্যের দল সব সভয়ে চমকে উঠলেন।

একজন তার মধ্যে এগিয়ে এসে আমাকে দৃঢ়স্বরে বললেন, "শুনুন মশায়, আমাদের মধ্যে এই জনকুড়ি কি তারও বেশী আমরা আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ভ্রমণ করি। ওঁকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারব না। উনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব, বুঝলেন ?"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মতলবটি ছাড়তে হল,—দেখলুম যে এ একেবারে অসম্ভব, কারণ শুধু শুধু দল বেজায় ভারি হয়ে যায়।

বিদায় নিয়ে বললুম, "অন্ততঃ রাঁচিতে তো আসুন, আপনার শিষ্যদের নিয়ে। আপনি নিজে একজন ঈশ্বরের 'শিশু', আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও ভারি আনন্দ পাবেন।'

"বাবা আমায় যখনই নিয়ে যাবেন, তখনই খুশী হয়ে যাব।"

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময়ী মা'র রাঁচি বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনের কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়বাটি ও প্রাঙ্গণ উৎসবের বেশে সুসজ্জিত করে তুললে। তাদের আনন্দ তখন দেখে কে, কত কি হবে। তারা তো যে কোন উপলক্ষ্যে একটা উৎসবের দিন চায়, পড়াশোনার হাঙ্গামা নেই, গান, সর্বোপরি ভুরিভোজন,—স্ফূর্তির চূড়ান্ত!

যে দিন তিনি এসে পৌঁছলেন, গেটের কাছে ছেলেরা চিৎকার করে অভ্যর্থনা জানালে,—"জয়! আনন্দময়ী মাই কি জয়!" করতাল, শঙ্খধ্বনি আর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদাফুলের বৃষ্টি! আনন্দময়ী মা রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাস্যমুখে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন—যেন স্বর্গের একটি সচল দেবী প্রতিমা।

প্রধানগৃহ যেটি সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময়ী মা সানন্দে বলে উঠলেন, "এ জায়গাটি তো ভারি সুন্দর!" শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সর্বব্যাপিত্বের একি রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য!

বললুম, "আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

"বাবা তো সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন?" হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তা আবার বলবে কি!

একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলুম। কি আর করেন, সুন্দর সুঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত করে বললেন, "বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। আমার চৈতন্য কখনও এই নশ্বর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয় নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, 'আমি* সেই একই ছিলুম'। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও 'আমি সেই', নারীত্বে পৌঁছে তখনও 'আমি সেই'। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলুম—তাঁরা যখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইলে তখনও 'আমি সেই'। আর বাবা এখন

---

* আনন্দময়ী মা নিজের বিষয়ে "আমি" বলে উল্লেখ করেন না। তিনি বিনয়সূচক পরোক্ষ উক্তি করেন, যেমন,—"এই দেহটা", "এই ছোট মেয়েটি", "আপনার কন্যা" ইত্যাদি। কাকেও তাঁর "শিষ্য" বলেও উল্লেখ করেন না। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তিনি সকল ব্যক্তিরই উপর জগজ্জননীর প্রেম বিতরণ করেন।

আপনার সামনেও 'আমি সেই একই আছি।' আর এই অনন্তের কোলে আমায় ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্যে 'আমি সেই একই থাকব।' ”

তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। দেহ তাঁর মর্মর প্রতিমার মত নিথর, নিস্পন্দ। মন যেন কার ডাকে কোন সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে ; গভীর কালো চোখদুটি যেন কাঁচের মত প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব দেখা যায়। সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত। ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলুম—আনন্দময়ী মার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

বললুম, "আনন্দময়ী মা, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন। রাইট সাহেব গোটাকতক ছবি নেবেন।

"আচ্ছা বেশ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।" অনেকগুলো ছবি তোলা হল—ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নযুগলে তখনও সেই দিব্যজ্যোতিঃ অপরিবর্তিত!

তারপর এল ভোজের পালা। আনন্দময়ী মা কম্বলাসনে বসলেন একজন শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। শিষ্যাটি আনন্দময়ী মার মুখে খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট শিশুটিরই মত শান্তভাবে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল যে খেয়েই যাচ্ছেন—তরকারী আর মিষ্টিতে যে স্বাদের কোন পার্থক্য আছে, আনন্দময়ী মার কাছে তার কোন প্রকার বোধ কিছুমাত্র নেই!

সন্ধ্যা হয়ে এল—আনন্দময়ী মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন ; যাবার সময় আর একদফা তাঁদের উপর সেই রকম গোলাপফুলের পাপড়িবৃষ্টি ; তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। স্বতঃউৎসারিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল। তাদের সে এক কী আনন্দের দিন!

যীশুখ্রিস্ট ঘোষণা করেছেন, "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে তোমার সকল অন্তঃকরণ, সকল আত্মা, সকল মন আর সকল শক্তি দিয়ে ; এই হচ্ছে আমার প্রথম আজ্ঞা।"*

---

* মার্ক ১২ : ৩০ (বাইবেল)।

সকলপ্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পরিহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্তভাবে ও পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পন্ডিতদের চুলচেরা বিচারে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধ্রুবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মত সরল সাধিকা মানব জীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন—সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযুজ্য লাভ। লক্ষকোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে; এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতিসকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে। অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিও সৎ,—কারণ তারা মানুষের মন সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু যীশুখ্রিস্ট তাঁর "প্রথম আজ্ঞা"য় যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকে তা আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য, তা তার একমাত্র দাতার* মুক্তহস্তের দান—প্রথম শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

রাঁচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; শ্রীরামপুর ষ্টেশনে শিষ্যদলের সঙ্গে গাড়ীর জন্যে তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন, "বাবা, আমি হিমালয়ে যাচ্ছি; সহৃদয় জনকয়েক লোক মিলে আমাদের জন্যে দেরাদুনে একটি আশ্রম তৈরী করে দিয়েছেন।"

গাড়ীতে চড়লেন…দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে কি ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে—কোন উপলক্ষ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি,—

"দেখুন, এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আমি চিরকাল সেই একই আছি।'"

* "অনেকেই একটি নূতন এবং উন্নততর জগৎ সৃষ্টি করার জন্য মনে মনে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এরূপ চিন্তার জাল রচনা করার পরিবর্তে তোমরা তাঁরই ধ্যানে নিয়োজিত হয়ো যাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণ শান্তিলাভের প্রত্যাশা করা যায়। মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের বা সত্যের সন্ধানে রত হওয়া।"—আনন্দময়ী মা।

৪৬শ পরিচ্ছেদ

"নিরাহারা যোগিনী"

রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ী চালাচ্ছিল—জিজ্ঞাসা করলে, "গুরুদেব, আজ সকালে কোথায় যাওয়া হবে?" বলে রাস্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কারণ দিনের পর দিন তাকে যে রকমভাবে বেরিয়ে পড়তে হ'ত, তাতে বেচারা জানতেই পারত না যে আগামীকাল তাকে বাংলাদেশের কোন অংশ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করতে হবে।

সোৎসাহে উত্তর দিলুম, "ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, তা হলে আজ আমরা বেরোচ্ছি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখতে—একটি সাধ্বী মহিলা, যিনি মাত্র বায়ু সেবন করেই থাকেন।"

রাইট সাহেব সমান আগ্রহে হেসে বললে, "থেরেসা নোয়ম্যানের পর এ যে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার!" আর উৎসাহের চোটে গাড়ীর গতিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিলে। তার ভ্রমণ ডায়েরির মধ্যে এ একটা অত্যাশ্চর্য বিবরণ আর সেটা কোন সাধারণ পর্যটকের পক্ষে সহজ লভ্যও নয়!

রাঁচি বিদ্যালয় সবে মাত্র আমরা পিছনে ছেড়ে এলুম; সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা সব উঠেছি। দলের মধ্যে আমার সেক্রেটারী আর আমি ছাড়া আরও তিনটি বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন। ভোরের বাতাস শরীরে একটা অপূর্ব পুলকশিহরণ এনে দিচ্ছিল। আমাদের গাড়ীর চালককে তখন অতি সন্তর্পণে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। ভোরবেলায় কৃষকেরা সব বেরিয়েছে জোয়ালকাঁধে উচ্চককুদ্ বলদটানা দুচাকার গাড়ী নিয়ে—তাদের রাজ্যে ভঁক্ ভঁক্ করে মোটর গাড়ীর অনধিকার প্রবেশ তারা সহজে বরদাস্ত করবে কেন? তাই প্রতিবাদস্বরূপ ধীর মন্থরগতিতে সর্বপ্রকার সতর্কতার চেষ্টাকেই উপেক্ষা করে তারা আপন মনের খেয়াল খুশীতেই চলল।

রাইট সাহেব বললে, "গুরুদেব, এঁর সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন না, শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

আমি শুরু করলুম, "এঁর নাম হচ্ছে গিরিবালা। বহুবছর আগে স্থিতি লাল নন্দী নামে একটি পন্ডিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে এঁর বিষয় আমি প্রথম

শুনি। তিনি আমার ভাই বিষ্ণুকে পড়াতে আমাদের গড়পারের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন।

"স্থিতিবাবু আমাকে বলেছিলেন 'আমি গিরিবালাকে বেশ ভাল করেই জানি ; তিনি এমন একটা বিশেষ যোগপ্রক্রিয়া অভ্যাস করেন, যাতে করে তিনি আহার বিনা জীবন ধারণ করতে পারেন। ইছাপুরের* কাছে নবাবগঞ্জে তাঁর বাড়ী ; তিনি আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশিনী ছিলেন। তাঁর উপর খুব ভালভাবে লক্ষ্য রেখে অনেক দিন ধরে দেখলুম, কিন্তু তাঁর পানভোজনের প্রমাণ একটা দিনের জন্যেও বার করতে পারলুম না। আমার আগ্রহ তখন এতদূর বেড়ে উঠল যে শেষপর্যন্ত আমি বর্ধমানের মহারাজার† কাছে গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটার একটা তদন্ত করবার জন্যে অনুরোধ করলুম। ব্যাপারটা শুনে ত অবাক হয়ে মহারাজা গিরিবালাকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। গিরিবালা মহারাজার পরীক্ষায় সম্মত হয়ে তাঁর প্রাসাদের এক অংশে মাস দুই অতিবাহিত করেন—সে অংশটা চাবি দেওয়া থাকত। পরে তিনি একবার রাজপ্রাসাদে এসে দিনকুড়ি আর তৃতীয় বার এসে দিনপনের থেকে যান। মহারাজা নিজে আমাকে বলেছেন যে, এই তিনটে খুব কঠিন পরীক্ষায় নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বাস্তবিকই তিনি নিরম্বু উপবাস করে থাকেন—কিছুই খান না।'

তারপর বললুম, "স্থিতিবাবুর এই গল্পটি পঁচিশ বছরেরও উপর আমার মনের মধ্যে রয়েছে। অ্যামেরিকায় বসে কখনও কখনও আমি ভাবতুম যে এই অপূর্ব যোগিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার পূর্বে কালস্রোত তাঁকে গ্রাস করে ফেলবে না ত ? এখন অবশ্য তিনি বেশ বৃদ্ধাই হবেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা জানিনা, আর যদিই বা থাকেন, তাহলে কোথায় থাকেন, তাও আমি জানি না। যাক্, আর ঘণ্টাকতক বাদেই পুরুলিয়ায় গিয়ে পৌঁছব ; সেখানে তাঁর ভাইয়ের বাড়ী আছে।

সাড়েদশটার সময় আমরা পৌঁছলুম পুরুলিয়ায় শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বাড়ীতে—পুরুলিয়ার তিনি একজন উকীল। কথাবার্তা শুরু হল।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লম্বোদর বাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ভগ্নী এখনও বর্তমান। কখনও কখনও তিনি এখানে আমার কাছে এসে কিছুদিন

* উত্তর বঙ্গ

† অধুনা পরলোকগত হিজ হাইনেস সার বিজয়চাঁদ মহতাব। মহারাজের গিরিবালাকে তিনবার পরীক্ষা করার ফল নিঃসন্দেহে তাঁর রাজপরিবারের কাছে রক্ষিত আছে।

থাকেন,—কিন্তু এখন তিনি বিউরে আমাদের দেশের বাড়ীতেই আছেন।” তারপর লম্বোদর বাবু ফোর্ডগাড়ীটার প্রতি একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, “স্বামীজী, আমার ত মনে হয় না যে কোন মোটরগাড়ী এপর্যন্ত বিউর অবধি গিয়ে ঢুকতে পেরেছে। এখন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানির হাতে আপনাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই দেখছি।”

ডেট্রয়েটের গৌরব আমাদের ফোর্ডগাড়ীটির প্রতি দলের সকলেই সমস্বরে আনুগত্য জানালে।

আমি বললুম, “ফোর্ডগাড়ীটি অ্যামেরিকা থেকে এসেছে—এ বেচারাকে যদি গ্রাম বাংলার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা হলে সেটা তার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা আর বড় লজ্জার বিষয় হবে!” কি আর করেন, অবশেষে লম্বোদর বাবু একটু হেসে বললেন, “সিদ্ধিদাতা গণেশ* আপনাদের সহায় হোন্!” তারপর সৌজন্য সহকারে বললেন, “যদি একবার সেখানে পৌঁছতে পারেন, তা হলে গিরিবালা যে আপনাদের দেখে খুব খুশীই হবেন এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। বয়স তাঁর প্রায় সত্তর হয়ে এল; কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর এখনও খুব চমৎকারই আছে।”

মনের দর্পণ হচ্ছে মানুষের দুটি চোখ; সোজাসুজি তাঁর সেই মনের গবাক্ষ, চোখদুটির উপর দৃষ্টি স্থাপন করে জিজ্ঞাসা করলুম, “মশায়, আচ্ছা দয়া করে আমায় বলুন ত, তিনি যে একদম কিছুই খান না, এটা কি খাঁটি সত্যি?”

“খাঁটি সত্যি মশায়।” দৃষ্টি তাঁর সরল ও অকপট। তারপর তিনি বললেন, “পঞ্চাশ বছরেরও উপর আমি তো তাঁকে কখন একগ্রাসও খেতে দেখিনি। আজ যদি পৃথিবী হঠাৎ প্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে আমি যত না আশ্চর্য হব, তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হব আমার ভগ্নীকে খেতে দেখলে!”

এ দুটো মহাজাগতিক ঘটনার অসম্ভাব্যতার বিষয় স্মরণ করে আমরা দুজনেই হেসে উঠলুম।

লম্বোদরবাবু বলতে লাগলেন, “গিরিবালা দেবী তাঁর যোগসাধনে কখনও এমন নির্জনতা খোঁজেন নি যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সারা জীবনটাই তাঁর সংসার আর আত্মীয়পরিজনের সাহচর্যেই কেটেছে। তাঁর এইরকম অদ্ভুত অবস্থা এখন তাদের কাছে সব সয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এমন একজন কেউ নেই যে গিরিবালা দেবীকে খাদ্যগ্রহণ করতে দেখলে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে যাবে। স্বভাবতঃই ভগিনী একটু গম্ভীর, চাপা

* সকল বিঘ্নত্রাতা, সৌভাগ্যের দেবতা

স্বভাবের লোক—হিন্দু বিধবারা যেমন হয়, কিন্তু পুরুলিয়া আর বিউরে আমাদের ছোট পরিবারের সকলেই জানে যে, বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে উনি। একজন 'অসাধারণ' স্ত্রীলোক।"

ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার অগাধ বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হল। আমরা সকলে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিউরের দিকে যাত্রা করলুম। রাস্তার ধারে এক খাবারের দোকানের কাছে দাঁড়ান গেল, কিছু খেয়ে নেবার জন্যে, লুচি আর তরকারী; সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ছোঁড়াদের বেশ ভিড় লেগে গেল—তারা, রাইট সাহেব বিনা কাঁটাচামচেতে হিন্দুদের মতন* হাতের আঙুল দিয়ে লুচি ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখে তো তাজ্জব বনে গেল; যাক্, আমাদের সবাইকার তখন ক্ষিধেও পেয়েছিল বেশ, বিকেলে কি জুটবে না জুটবে ভেবে সকাল সকাল সব সেরে নেওয়া গেল; কেন না এরপর আবার অনেক ঘোরাঘুরি আছে।

গাড়ী দৌড়ল বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়ে পূর্বদিকে—চারধারে রোদেপোড়া ধানের ক্ষেত, রাস্তার দুধারে ছায়াঘন গাছপালার সারি; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার মত গাছের ডাল হতে সব ময়না, গলায় ডোরাকাটা বুলবুলের গান ভেসে আসছে। লোহার হালবাঁধান চাকার গ্রাম্য গরুরগাড়ীর রিনি ঝিনি, রিনি মঞ্জু মঞ্জু শব্দের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করতে লাগলুম সহরের অভিজাত পিচবাঁধান রাস্তায় মোটর টায়ারের সর্ র্ র্ শব্দ।

গাড়ী উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "ডিক, থাম, থাম! দেখ দেখি, আমগাছটা যেন ফলে ভেঙে পড়েছে। এ সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে বৃক্ষরাজের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হবে, কি বল?"

আমার হঠাৎ অনুরোধে ফোর্ড গাড়ীটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

পাঁচজনে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ছোট ছোট ছেলেদের মতন ছুটলুম সেই আমতলায়; রাশি রাশি পাকা আম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

আমি একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতার অনুকৃতি করে বললুম,—

"বহু সুরসাল রসাল ফলেছে চোখের অন্তরালে,
হারাতে তাদের মধুর স্বাদ পাথুরে জমির পরে··· ···

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতেন, 'ভগবান্ পৃথিবীতে আমাদের উপভোগের জন্য নানা ফলমূল দিয়েছেন। আমরা আমাদের ভোজ্য দেখতে চাই, তাদের গন্ধ বা স্বাদ নিতে চাই —হিন্দুরা আবার তা' স্পর্শও করতে চায়; খাবার সময় কেউ হাজির না থাকলে, "শোনা" ব্যাপারটাও মন্দ লাগে না!"

শৈলেশ মজুমদার নামে আমার একটি ছাত্র একগাল হেসে বললে, "অ্যামেরিকায় আর এমনটি হতে হয় না, কি বলেন স্বামীজী, এ্যাঁ ?"

অত্যন্ত পরিতৃপ্তিসহকারে আম্ররস আস্বাদন ও তজ্জনিত সন্তোষলাভের আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়ে অকপটেই স্বীকার করতে হল যে, "নাঃ, এমনটি নয় বটে। অ্যামেরিকায় থাকতে আম না পেয়ে কত দুঃখ হ'ত। আম ছাড়া হিন্দুর স্বর্গ প্রায় কল্পনাই করা যায় না!"

খুব উঁচু ডালে একটা বেশ বড় আর পাকা আম ঝুলছিল ; একটা ইঁটের ঘায়ে সেটাকে পেড়ে ফেললুম। দেখা গেল রোদে সেটা গরম হয়ে রয়েছে। তারপর সেই অমৃতফল আস্বাদনের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করলুম, "ডিক, আমাদের সব ক্যামেরাগুলোই কি গাড়ীতে আছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব, ব্যাগেজ কম্পার্টমেণ্টে!"

"দেখ, যদি গিরিবালা সত্যিকারেরই একজন খুব উঁচুদরের সাধিকা হন, তা হলে অ্যামেরিকায় গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু লিখব। এমন অপূর্ব-শক্তির আধার এই হিন্দু যোগিনী যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করে যাবেন সে হতে পারে না, বেশীরভাগই এই আমগুলোর যা দশা হচ্ছিল আর কি! কি বল ?"

আরও আধঘণ্টা কাটল, তখনও আমরা ছায়াসুনিবিড় স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে আনন্দে পরিভ্রমণ করছি।

রাইট সাহেব বললে, "গুরুদেব, গিরিবালা দেবীর বাড়ী আমাদের সূর্যাস্তের আগেই পৌছান দরকার, যাতে করে ফটো নেবার জন্যে যথেষ্ট আলো তখনও পাওয়া যেতে পারে।" তারপর একটু হেসে বললে, "মুশকিল হচ্ছে অ্যামেরিকানরা একটু সন্দিগ্ধপ্রকৃতির কিনা, তাই এঁর সম্বন্ধে কিছু বিশ্বাস করাতে হলে ফটো বিনা তো আর চলবে না!"

এ কথা যথার্থ বটে, তর্ক করা চলে না ; কাজেই লোভ সম্বরণ করে গাড়ীতে পুনঃপ্রবেশ করা গেল।

যেতে যেতে সখেদে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বললুম, "ডিক, তোমার কথাই ঠিক। অ্যামেরিকার বস্তুতন্ত্রতার বেদীতে আজ আমের স্বর্গ আমি বলি দিলুম। যাক্, ফটোগ্রাফ কিন্তু আমাদের নিতেই হবে!"

রাস্তা ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ, শক্ত মাটির ঢেলা—যেন বার্ধক্যের জরাজীর্ণ অবস্থা! আমাদের চারজনের দল মাঝে মাঝে গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীটাকে পিছন দিক দিয়ে ঠেলে

ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল যাতে করে রাইট সাহেব ফোর্ডগাড়ীটাকে আরও একটু সহজে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শৈলেশকে স্বীকার করতে হল, "লম্বোদর বাবু ঠিকই বলেছিলেন, এখন দেখছি যে গাড়ী আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, আমরাই গাড়ীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি!"

গাড়ীতে আমাদের অনবরত ওঠা আর নামার একঘেয়েমি দূর হচ্ছিল মাঝে মাঝে যখন একটা গ্রাম এসে পড়ছিল—অপরূপ সুন্দর সরল গ্রাম্যদৃশ্য! মনটা তবুও একটু হাল্কা হয়।

এবার রাইট সাহেবের ডায়েরি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি; তারিখ হচ্ছে, ১৯৩৬ সালের ৫ই মে,—"সভ্যতার কৃত্রিমতা সংস্পর্শশূন্য প্রাচীন গ্রামগুলি বনের ছায়ার কোলে বাসা বেঁধেছে, তার ভিতরে তালবনের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ী এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে চলল। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কুঁড়ে-ঘরগুলো দেখতে ভারি চমৎকার। দরজায় এক একটা ঠাকুরের নাম লেখা। ছোট ছোট উলঙ্গ শিশুরদল নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করছে। গাড়ী যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছে কেউবা তখন দাঁড়িয়ে হাঁ করে তা দেখছে আর কেউবা তা দেখেই প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। এ কিরকম গাড়ী? প্রকাণ্ড কালোরঙের—তাতে বলদ জোতা নেই, আপনিই দৌড়চ্ছে! গ্রাম্যনারীরা আড়াল থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আর পুরুষেরা রাস্তার ধারে গাছের তলায় অলসভাবে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে—অবজ্ঞার মধ্যেও যেন একটা কৌতূহলের ভাব। এক জায়গায় সব গ্রামবাসীরা একটা বড় পুকুরে নেমে খুব স্ফূর্তিতে স্নান করছে দেখা গেল (গায়ে শুকনো কাপড় জড়িয়ে ভিজে কাপড় তখন ছেড়ে ফেলছে)। মেয়েরা বড় বড় পিতলের ঘড়া করে জল নিয়ে যাচ্ছে।

"রাস্তায় চড়াই উৎরাই। গাড়ীতে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে সামলাতে লাফাতে লাফাতে, ছোট ছোট খানা খন্দ পার হয়ে, একটা অসমাপ্ত বাঁধ ঘুরে, একটা শুকনো বালিভরা নদীগর্ভ দিয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে অবশেষে বেলা ৫টা নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থল বিউরের নিকটস্থ হলুম। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছোট এই গ্রামটি, চারিদিকে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকোন; বর্ষায় জলের স্রোত যখন উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয় আর সর্পিল রাস্তা কাদায় ভরা থাকে তখন পথিকদের গ্রামে পৌঁছবার আর কোন উপায় থাকে না।

"একটা নির্জন মাঠের মাঝে এক মন্দির থেকে পুজো সেরে একটা দল তখন ফিরছিল; তাদের মধ্যে একজনকে পথ দেখিয়ে দেবার কথা বলাতে ভজনখানেক

প্রায় নেংটিপরা ছোঁড়ার দল তড়াক করে দুধারের ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠে পড়ল—সবাই বলে যে, গিরিবালা দেবীর কাছে আমাদের নিয়ে যাবে।

"রাস্তাটা একটা খেজুরঝোপে ঘেরা কতকগুলো মাটির কুঁড়ের দিকে গিয়েছে, সেখানটায় পেঁাছবার আগেই হঠাৎ ফোর্ড গাড়ীটা একটা বিপজ্জনক কোণে হেলে পড়ে বারকতক লাফিয়ে উঠল। সরু রাস্তাটা গেছে—গাছের সারি, পুকুরধার, উঁচুপাড়, গভীর গর্ত আর খাদের মাঝখান দিয়ে। গাড়ীটা গিয়ে আটকাল একটা ঝোপের ধারে, তারপরে একটা উঁচু টিলার কাছে গিয়ে মাটিতে বসে গেল। কতকগুলো মাটির চাঙড়া না সরিয়ে আর উপায় রইল না। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে আমরা তখন এগিয়ে চললুম। হঠাৎ রাস্তাটা গিয়ে থামল গরুর গাড়ীর চাকার দাগের মাঝখানে একটা নলখাগড়ার ঝোপের মতন জায়গায়; আবার ঘুরতে হল খাড়া পাড় বেয়ে নেমে একটা মজাপুকুরের ভিতর দিয়ে। সেখান থেকে শাবলকোদাল বাইস দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে কেটে বার করে তবে উদ্ধার। বারম্বারই দেখা গেল যে রাস্তায় আর চলা যায় না; কিন্তু কি করা যায়, যাত্রা তো আর স্থগিত রাখা যায় না, এগোতেই হবে। অনুগত ছোকরারদল, কোদালটোদাল এনে রাস্তার মাঝখানের সব বাধাবন্ধ সাফ করে পথ বানিয়ে দিলে (সিদ্ধিদাতা গণেশের সব চেলা আর কি!) আর শতশত গাঁয়ের লোক আর ছেলে-ছোকরারদল সব হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমরা এগোতে লাগলুম পুরানো গরুর গাড়ির চাকার দাগ ধরে; একধারে মেয়েরা তাদের কুঁড়েঘরের দরজা থেকে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে, আর একধারে পুরুষেরা সব পাশেপাশে আর পিছনপিছন আসতে লাগল, ছোঁড়াগুলো সব লাফাতে লাফাতে এসে শোভাযাত্রাটির কলেবরের বৃদ্ধিসাধনে তৎপর হল—সে এক অপরূপ দৃশ্য! আমাদের গাড়ীটিই বোধ হয় এ রাস্তায় প্রথম মোটর যান! গরুর গাড়ীর একাধিপত্য যেখানে, সেখানে এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার বই কি! কি যে চাঞ্চল্য তখন সৃষ্টি করেছিলুম আমরা সেখানে—একজন অ্যামেরিকান এক গর্জনশীল মোটর-গাড়ীতে একটা দল চাপিয়ে তাদের গ্রাম্য-দুর্গের একেবারে দুয়ারের গোড়ায় এসে হাজির—এতদিনের পুরোন আবরু এইবার বুঝি গেল!

"গাড়ী গিয়ে থামল একটা সরু গলির মুখে, সেখান থেকে গিরিবালা দেবীর বাপের বাড়ী এবশত ফুট হবে। রাস্তার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে অবশেষে গন্তব্যস্থলে পেঁাছে আমাদের মন তখন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চারদিকে সব মাটির কুঁড়েঘরের মাঝে একটা বড় দোতলা

পাকাবাড়ী—তখন মেরামত চলছে, কারণ তখনও বাড়ীটার চারদিকে বাঁশের ভারা বাঁধা।

"অন্তরের চাপা উল্লাসে আর আগ্রহে উন্মত্ত হয়ে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম তাঁর বাড়ীতে—ভগবান যাঁকে ক্ষুধার ক্লেশ থেকে মুক্তি দিয়ে অপার করুণা প্রদর্শন করেছেন। গ্রামবাসীরা—ছেলে বুড়ো ন্যাংটা, কাপড়পরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে। মেয়েরা একটু দূরে দূরে বটে কিন্তু তাদেরও কৌতূহলের আর সীমা নেই—ছেলেবুড়ো সবাই এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে অসংকোচে আমাদের পিছু পিছু আসতে লাগল।

"তারপরেই দ্বারপথে দেখা গেল একটি ক্ষুদ্রমূর্তি, গিরিবালা দেবী স্বয়ং, তসরের কাপড়পরা। ঘোমটার তলা থেকে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এগিয়ে এলেন। ঘোমটার ছায়াতলে চোখ দুটি হতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। স্নিগ্ধ, শান্ত সৌম্যমূর্তি, পার্থিব আকর্ষণমুক্ত ঈশ্বরোপলব্ধিজাত এক মহিমময় প্রশান্তিতে মুখখানি উদ্ভাসিত।

"ধীর শান্তপদে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর নীরব সম্মতি পেয়ে আমরা তাঁর 'স্থির' আর 'চলচ্চিত্র' তুলে নিলুম।* আমাদের ক্যামেরা ঠিক করে নেওয়া, আলোর ব্যবস্থা করা আর ঠিক হয়ে বসা প্রভৃতি ব্যাপারের হাঙ্গামা তিনি ধৈর্যসহকারে সহ্য করে সলজ্জভাবে অপেক্ষা করে বসে রইলেন। অবশেষে তাঁর অনেকগুলি ফটো গ্রহণ করা গেল—ভবিষ্যতে সাক্ষী রাখবার জন্যে যে তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র নারী যিনি গত পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর নিরম্বু উপবাস করে আছেন (থেরেসা নোয়ম্যান অবশ্য ১৯২৩ সাল থেকে উপবাস করে আছেন)। গিরিবালা দেবী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—আননে তাঁর অপূর্ব মাতৃভাব, দেহ সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রাবৃত ; ছোট্ট দুটি পা, আর মুখটি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, দৃষ্টি অবনত। মুখে অপূর্ব সারল্যের ভাব ও প্রশান্তির ছাপ, নাসিকাটি সুডোল, শিশুদের মত ওষ্ঠাধর, উজ্জ্বল দুটি চোখ আর মুখে অপরূপ হাসি।"

গিরিবালা দেবী সম্বন্ধে রাইট সাহেবের যা ধারণা আমারও তাই। তাঁর স্নিগ্ধোজ্জ্বল অবগুণ্ঠনের মত আধ্যাত্মিক ভাবের একটা অপরূপ জ্যোতিঃ তাঁকে ঘিরে রয়েছে। প্রণাম করলেন আমাকে—গৃহস্থ যেমন সাধুসন্ন্যাসী দেখে করে। তাঁর সরল মধুরভাব আর নীরব স্নিগ্ধহাসি, মধুমাখা অভ্যর্থনাবাণীর চেয়েও

---

* শ্রীরামপুরে তাঁর শেষ জলবিষুবসংক্রান্তির উৎসবে রাইট সাহেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীরও চলচ্চিত্র তুলে নিয়েছিল।

বেশী আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালে। ধুলোমাখা পথের কন্টকর ভ্রমণের সব ব্যথা একনিমেষে দূর হয়ে গেল।

গিরিবালা দেবী বারান্দায় গিয়ে ভূমিতে উপবেশন করলেন; বার্ধক্যের চিহ্ন দেখা গেলেও তিনি ক্ষীণদেহ ছিলেন না। বর্ণ ছিল তাঁর গৌর, পরিষ্কার আর স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল।

আমি তাঁকে বললুম,—অবশ্য বাংলাতে, "মা, পঁচিশবছরের উপর আমি আপনার দর্শন কামনা করে আসছি। আপনার এ পুণ্যজীবনের কথা স্থিতিলাল নন্দী বাবুর কাছ থেকেই শুনেছিলুম।"

তিনি মাথা নেড়ে বলেন, "হ্যাঁ, তিনি নবাবগঞ্জে আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতেন।"

"এই সময়ের মধ্যে আমি সমুদ্রযাত্রা করে বিদেশে গেছি কিন্তু একদিন এসে আপনার দর্শনলাভ করতে হবে, পূর্বেকার এ আকাঙ্ক্ষার কথা আমি কখনও ভুলিনি। মানুষের অন্তরে ভগবানের অনন্ত করুণাধারার কথা সংসার বহুদিন ভুলে গেছে। আপনি নীরবে নিভৃতে ভগবানের যে মহিমা এখানে প্রদর্শন করছেন, তার কথা সারা পৃথিবীতে প্রচার হওয়া উচিত।"

মিনিটখানেক এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মুখের হাসিতে গভীর আগ্রহ। তারপর বিনম্রস্বরে বললেন, "বাবাই সব জানেন।"

তিনি যে কোন অপরাধ নিলেন না—তাতে আমি খুব খুশীই হলুম। প্রচার হবার কথায় যোগী বা যোগিনীরা যে কে কি রকম ব্যবহার করবেন, তা কেউ বলতে পারে না। সাধারণতঃ তাঁরা এ সব পরিহার করে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা নীরবেই করে যেতে ইচ্ছা করেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের উপকারের জন্য তাঁদের জীবনলীলা প্রকাশ্য প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলেই তাঁরা অন্তরের মধ্যে সাড়া পান।

আমি বলতে লাগলুম, "মা, তা হলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন যদি বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে বিরক্ত করি। যেটা খুশী হয় সেটাই উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না—আপনি চুপ করে থাকলেও আমি তা সব বুঝে নিতে পারব।"

প্রসন্ন মধুর ভঙ্গীতে হস্তদুটি প্রসারিত করে তিনি বললেন, "নিশ্চয়, খুশী হয়েই উত্তর দেব আমি, তবে বাবা আমার মত অকিঞ্চন ব্যক্তি যতটা ভাল করে উত্তর দিতে পারে সেই অবধি, তার বেশী আর কি পারব?"

অন্তরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললুম, "না, না মা, অকিঞ্চন কি বলছেন! আপনি কত উচ্চ, কত মহান্।"

"কি যে বলেন বাবা, দীনাতিদীনা আমি, সকলের অনুগতা দাসী," তারপর তিনি অপূর্ব সারল্যের সহিত বললেন, "তবে লোককে রেঁধে খাওয়াতে আমি বড্ড ভালবাসি।"

ভাবলুম এ তো ভারি অদ্ভুত শখ—বিশেষতঃ এই নিরাহারা সাধ্বীর পক্ষে।

"আচ্ছা মা, আপনি নিজমুখে বলুন তো—আপনি কি সত্যিই একেবারে অনাহারে থাকেন?"

"হ্যাঁ বাবা, সত্যি।" মিনিটকতক চুপ করে বসে রইলেন; তাঁর পরের কথাতে বোঝা গেল যে মনেমনে তিনি হিসেব কষছিলেন। তারপর তিনি বললেন, "বারবছর চারমাস বয়স থেকে আজকে এই আটষট্টিবছর বয়স পর্যন্ত ছাপান্নবছরের উপর আমি খাবার কি জল, কিছুই খাই নি।"

"খেতে কখনও লোভ হয় না?"

"খাবার ইচ্ছে হলে, আমায় খেতে হত বইকি বাবা।"

সরল হলেও এই মহিমাদীপ্ত উত্তরদানে তিনি এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রকাশ করলেন, যা দিনে অন্ততঃ তিনবার করে ভোজনক্রিয়ায় রত পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত।

"কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি কিছু খান বই কি!" একটু প্রতিবাদের সুরেই বললুম।

চট করে বুঝে নিয়ে একটু হেসে তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই!"

"সূর্যের আলো আর বাতাসের সূক্ষ্মতর শক্তি* আর যে ব্যোমশক্তি

---

* ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে তারিখে মেমফিস সহরে ক্লেভল্যাণ্ডের ডাঃ জর্জ ডব্লিউ ক্রাইল এক চিকিৎসক সম্মেলনে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন,—

"আমরা যা আহার করি তা হচ্ছে তাপবিকিরণ; আমাদের খাদ্য হচ্ছে ততটা শক্তির পরিমাণ। এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাপবিকিরণ, যা তন্ত্রিকাজাল বা শরীরস্থ বিদ্যুৎ-বর্তনীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করে, তা সূর্যকিরণই খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত করে"। ডাঃ ক্রাইল বলেন, "অণুপরমাণুরা সব যেন সৌরমণ্ডল। কুঞ্চিত স্প্রিংএর মত সৌরদীপ্তিপূর্ণ অণু পরমাণুরাই শক্তির বাহক। এই সব অসংখ্য অণুপরমাণুপূর্ণ শক্তিই খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই সব তনু বাহক অতি ক্ষুদ্রাকার অণুপরমাণুসকল একবার মানবশরীরে জীবাকারে প্রবেশ করেই শরীরের তাপবিকিরণকারী নূতন রাসায়নিক শক্তি ও নূতন বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন করে। ডাঃ ক্রাইল বলেছেন, 'তোমার শরীর এই রকম অণুপরমাণুতে সংগঠিত। তারাই চক্ষুকর্ণের মত তোমার পেশী, মস্তিষ্ক, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম।' "

বিজ্ঞানীরা হয়ত কোনদিন আবিষ্কার করবেন যে মানুষ সাক্ষাৎ সৌরশক্তির উপর নির্ভর

সূর্যশাশীর্ষকের মধ্য দিয়ে আপনার শরীরে শক্তি সঞ্চার করে, তা থেকেই আপনি পুষ্টি গ্রহণ করেন, কি বলেন ?"

"বাবাই তো সব জানেন।" বলে আবার তিনি নীরব হয়ে পড়লেন, তাঁর ভাব শান্তস্নিগ্ধ ও অপ্রগল্‌ভ।

"মা, আপনার ছেলেবেলাকার কথা সব বলুন। ভারতের সবাইকার কাছে এ একটা গভীর আগ্রহের বিষয়—এমন কি সমুদ্রপারে আমাদের যে সব ভাইবোনেরা আছে, তাদের কাছেও।"

গিরিবালা দেবী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য পরিহার করে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়ে বললেন,—স্বর তাঁর মৃদু অথচ দৃঢ়, "আচ্ছা তবে বলি, আমার জন্ম এই জঙ্গলের দেশেই। আমার ছেলেবেলাকার কাহিনীতে বিশেষত্ব কিছুই নেই, কেবল একটামাত্র কথা ছাড়া—তা হ'ল, আমার ক্ষিধে ছিল রাক্ষুসে। ন বছর বয়সেই আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়।

"মা আমাকে প্রায়ই বকতেন, 'বাছা ক্ষিধে চাপ্‌তে চেষ্টা করো। শ্বশুরঘরে গিয়ে যখন অজানা লোকেদের মাঝখানে তোমায় বাস করতে হবে, তখন সারাদিন তোমার খাইখাই করা দেখে তারা সব কি ভাববে বল দেখি ?'

"তিনি যে বিপদের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন অবশেষে তাইই ঘট্‌ল। নবাবগঞ্জে যখন শ্বশুরঘর করতে গেলুম, তখন আমার বয়স মাত্র বার বছর। আমার সর্বদা খাইখাই স্বভাব দেখে শ্বাশুড়ী ঠাকরুন দিনেদুপুরে রাতবিরাতে অনবরত বকেঝকে লজ্জা দিয়ে অনর্থ বাধাতে লাগলেন। যাই হোক তাঁর বকুনি ছিল শাপে বর। তা আমার মধ্যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তি ক্রমশঃ জাগিয়ে তুললে। একদিন তিনি যে টিটকারি আর বকুনি দিলেন, তা যাকে বলে একেবারে নির্মম, হৃদয়হীন।

"অন্তরের অন্তঃস্থলে দারুণ মর্মবেদনা পেয়ে আমি বলে ফেললুম, 'আমি

করে কিরূপে বেঁচে থাকতে পারে। নিউইয়র্ক টাইমসে উইলিয়াম এল, লরেন্স লিখছেন, "ক্লোরোফিল হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞাত একমাত্র পদার্থ যা সূর্যকিরণ ধরা ফাঁদের মত কাজ করবার এক প্রকার শক্তি ধারণ করে। এ সূর্যকিরণের শক্তি 'ধরে' উদ্ভিদ মধ্যে তা সঞ্চয় করে রাখে। এ ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হ'ত না। আমাদের বাঁচবার জন্যে যে শক্তির দরকার, তা আমরা পাই সৌরশক্তি হতে—আর তা সঞ্চিত থাকে আমাদের উদ্ভিজ্জখাদ্যে অথবা উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণীদের মাংসের মধ্যে। কয়লা অথবা তেলের মধ্যে আমরা যে শক্তি পাই তা হচ্ছে সেই সৌরশক্তি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে উদ্ভিদ্‌জীবনে ক্লোরোফিল্‌ যা ফাঁদ পেতে ধরে রেখেছিল। ক্লোরোফিল্‌ এর মাধ্যমেই আমরা সূর্যদেবের কৃপায় বেঁচে আছি।"

আপনাদের কাছে শীগ্গিরই প্রমাণ করে দেব যে, যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন আমি আর কোন খাবারই ছোঁব না।'

"শ্বাশুড়ীঠাকরুণ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'বটে? ওমা তাই নাকি গো? বলি, ও বৌমা, যখন তুমি একবার খাওয়ার উপর আবার না খেয়ে থাকতে পার না, তখন একেবারে না খেয়ে থাকতে পারবে কি করে গো, এ্যাঁ, বল কি বৌমা?"

"এ মন্তব্যে আর কোন জবাব চলে না। কিন্তু তবুও মনে জেগে উঠল এক লৌহকঠিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। একটু নিরালা জায়গায় গিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনবরত প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ভগবান, দয়া করে আমায় এমন গুরু পাঠিয়ে দাও যিনি তোমারই আলোয় বেঁচে থাকতে আমায় শিখিয়ে দিতে পারবেন—খাওয়াতে নয়!'

"মনে এল একটা স্বর্গীয় আনন্দ! কি একটা অপরূপ আনন্দের ঘোরে নবাবগঞ্জের গঙ্গার ঘাটের দিকে চললুম। রাস্তায় দেখা হল আমার শ্বশুর-বাড়ীর পুরুতঠাকুরের সঙ্গে।

"তাঁর উপর ভরসা করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঠাকুরমশাই, দয়া করে বলুন না, না খেয়ে কি করে বেঁচে থাকা যায়?'

"ঠাকুরমশাই তো প্রশ্ন শুনে অবাক্। মুখে তাঁর কোন উত্তর যোগাল না, শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। অবশেষে যেন একটু আশ্বাস দেবার জন্যে বললেন, 'বাছা, আজ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এস, তোমার জন্যে একটা বিশেষ বৈদিক প্রক্রিয়া করব।'

"এই অস্পষ্টগোছের উত্তরে আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারলুম না; এ উত্তর তো আমি চাই নি। আবার ঘাটের দিকে এগোতে লাগলুম। সকালবেলা সূর্যের আলো গঙ্গার জলে ছড়িয়ে পড়েছে। স্নান সেরে নিয়ে পবিত্র হলুম, যেন আমার তখন পুণ্য দীক্ষা হবে। ঘাট ছেড়ে ভিজেকাপড়ে যখন এগিয়ে আসছি, তখন সেই দিনের আলোর মাঝখানে আমার গুরুদেব আমার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হলেন!

"স্নেহকোমল স্বরে তিনি বললেন, 'মালক্ষ্মী, আমি তোমার গুরু, ভগবান্ আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তোমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করবার জন্যে। এরকম অদ্ভুত প্রার্থনার ভাবে তিনিও গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছেন। আজ হতে তুমি সূক্ষ্মশক্তির বলে জীবন ধারণ করবে—তোমার শরীরের অণুপরমাণু সেই অনন্ত শক্তির সাহায্যেই পুষ্ট হবে।' "

গিরিবালা দেবী নীরব হলেন। রাইট সাহেবের কাছ থেকে আমি প্যাড

আর পেন্সিল নিয়ে কতকগুলো জিনিষ তার বুঝবার জন্যে ইংরেজিতে লিখে দিলুম।

আবার তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, তাঁর শান্তস্বর এত মৃদু যে তা প্রায় শ্রুতিগোচর হয় না, "ঘাট তখন নির্জন, কিন্তু আমার গুরুদেব তখন আমাদের চারধারে এমন একটা আলোর ছটা সৃষ্টি করলেন যাতে হঠাৎ কেউ স্নান করতে এসে পড়ে আমাদের না বিরক্ত করে। তিনি তখন আমায় এমন একটি ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করলেন যাতে করে মনুষ্যজীবনে প্রয়োজনীয় কোন জড় খাদ্যের উপরই শরীরকে নির্ভর করতে হয় না। প্রণালীটির ভিতর প্রধানতঃ একটি মন্ত্রের* ব্যবহার আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম আছে, যা সাধারণ কোন লোকের পক্ষে করা অত্যন্ত কঠিন। এতে কোন ওষুধবিষুধও নেই, আর কোন ভোজবাজিও নেই, 'ক্রিয়া' ছাড়া এতে আর কিছুই নেই!"

অ্যামেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কেরামতি তারা আমাকে তাদের অজ্ঞাতসারেই শিখিয়েছিল; তা দিয়ে আমি গিরিবালা দেবীকে বহুবিষয়ে প্রশ্ন করলুম এই ভেবে যে, তাতে জগতের উপকার হবে। একটু একটু করে তিনি এইসব সংবাদ দিলেন,……

"ছেলেপুলে আমার কখনও হয় নি; বহুবছর আগে বিধবা হই। ঘুমাই খুবই কম, কারণ জাগা আর ঘুমান—ও দুটোই আমার কাছে সমান। দিনে ঘরসংসারের কাজকর্ম সব করি, রাত্রে একটু জপতপ, ধ্যানধারণায় বসি। ঋতুপরিবর্তন অবশ্য সামান্যই বোধ করি। জীবনে কখনও অসুস্থ হইনি বা রোগভোগও কোনদিন করিনি। হঠাৎ কোথাও আঘাত লেগে গেলে সেখানে কেবলমাত্র ঈষৎ বেদনা অনুভব করি। মলমূত্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না। হৃৎপিণ্ডের গতি আর শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করতে পারি। স্বপ্নে প্রায়ই আমার গুরুদেব আর অন্যান্য মহাপুরুষদের দর্শনলাভ হয়।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা মা, আর কাউকে না খেয়ে বেঁচে থাকবার উপায়টা শিখিয়ে দেন না কেন?"

হায়, হায়, পৃথিবীর কোটি কোটি ক্ষুধার্ত জনসাধারণের মুক্তির উচ্চ আশা আমার তখন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল!

---

* মন্ত্র শব্দ মন্ ধাতু হ'তে উৎপন্ন। মন্ ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। ব্রহ্মে লীন হবার এও একটি পথ বলে বর্ণিত হয়েছে। যার মনন দ্বারাই মুক্তি হয়, তারই নাম মন্ত্র।

শব্দই ব্রহ্ম। মন্ত্র শব্দব্রহ্মের প্রকাশক, মতান্তরে শক্তির প্রকাশক। শব্দের সূচনায় প্রথমে অনাহত ধ্বনি, প্রণব বা "ওঁ"কার শব্দ ধ্বনিত হয়। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে ব্রহ্ম সকল পদার্থেই বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই হচ্ছে এই প্রণব।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন "না, তা হয় না ; গুরুদেব এ রহস্য প্রকাশ করা বিশেষভাবেই নিষেধ করেছেন। তাঁর এ ইচ্ছা নয় যে ভগবানের সৃষ্টিনাটকে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। বহু লোককে আমি যদি না খেয়ে বেঁচে থাকবার উপায় শিখিয়ে দিই, তাহলে চাষীরা তো আগে আমায় তেড়ে আসবে। এমন সুরসাল ফলমূল সব মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। দুঃখ, অনাহার আর ব্যাধি, এসব তো কর্মেরই ফল বলে বোধ হয় ; এরাই শেষ পর্যন্ত জীবনের সত্যিকারের অর্থ খোঁজবার জন্যে আমাদের পরিচালিত করে।"

আমি ধীরে ধীরে বললুম, "আচ্ছা মা, আপনিই যে একলা না খেয়ে বেঁচে আছেন, এটার মানে কি ?"

জ্ঞানালোকদীপ্ত আননে স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষ যে আত্মা তা প্রমাণ করবার জন্যে ! আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে মানুষ যে শুধু অন্নেই নয় – ঈশ্বরের জ্যোতিঃতে বেঁচে থাকতে ক্রমশঃ শিক্ষা করতে পারে, তা প্রদর্শন করবার জন্যে।"*

তারপর গিরিবালা দেবী গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। দৃষ্টি অন্তর্মুখী। চোখের গভীর শান্তভাব, ক্রমশঃ ভাবলেশবিহীন হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—শ্বাসবিহীন আনন্দময় সমাধির পূর্বাভাস !

* গিরিবালার লব্ধ নিরাহার অবস্থা হচ্ছে একপ্রকার যোগশক্তি, যা পতঞ্জলির যোগসূত্রের বিভূতিপাদে ৩১ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এমন একটি শ্বাসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন যা মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্মশক্তির কেন্দ্র পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধাখ্যকে প্রভাবিত করে। কণ্ঠের বিপরীত দিকে অবস্থিত এই বিশুদ্ধচক্র, পঞ্চভূত— আকাশ অথবা ঈথারকে প্রভাবিত করে। এই ঈথার আবার জড়কোষসমূহের অণুপরমাণুদের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান ব্যেপে রয়েছে। এই চক্রে মনঃসংযোগ করলে সাধক ঈথারের শক্তিবলে প্রাণধারণ করতে সমর্থ হন।

থেরেসা নোয়ম্যান কিন্তু জড়খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ অথবা অনাহারে অবস্থান করবার জন্য কোন প্রকার যৌগিকপ্রক্রিয়া বা কিছুই সাধন করেন না। এর ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কর্মফলের জটিলতার মধ্যে লুক্কায়িত। থেরেসা নোয়ম্যান অথবা গিরিবালা ছাড়াও এ জীবনের অন্তরালে বহু ঈশ্বরার্পিত জীবন আছে, কিন্তু তাদের বহিঃপ্রকাশের পথই স্বতন্ত্র। খ্রীস্টীয় সাধুগণের মধ্যে যাঁরা অনাহারে জীবনধারণ করতেন (তাঁরা খ্রীস্টক্ষতাঙ্কধারীও ছিলেন) তাঁরা হলেন : শীডামের সেন্ট লিডউইনা, রেন্টের পুণ্যশীলা এলিজাবেথ, সিয়েনার সেন্ট ক্যাথেরিন, ডোমিনিকা ল্যাজারি, ফলিনো'র পুণ্যাত্মা এঞ্জেলা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর লুইস লেটো। ফ্লুউয়ের সেন্ট নিকোলাসও (ব্রাদার ক্লস— পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী, ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য যাঁর ব্যাকুল আহবান সুইস কনফেডারেশনকে রক্ষা করেছিল) বিশ বৎসর অনাহারে বেঁচে ছিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভেসে চললেন সেই আনন্দস্রোতে, যা তাঁকে তাঁর অন্তরেই পরমানন্দের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেয়।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। অনেকগুলি গাঁয়ের লোক অন্ধকারে চুপচাপ বসে। একটা ছোট কেরোসিনের আলো তাদের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রির কালো মখমলের চন্দ্রাতপতলে দূরের লণ্ঠনের আলো আর জোনাকির দীপ্তি যেন চুমকি ফুটিয়ে তুলছে। বিদায়কাল ঘনিয়ে এল; মনটা বিচ্ছেদবেদনায় ভারী হয়ে উঠল, সামনে সুদীর্ঘপথ—একঘেয়ে, মন্থর, কষ্টকর যাত্রা!

গিরিবালা দেবী চক্ষু উন্মীলন করতেই আমি বললুম, "মা, আপনার একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আমায় দিন—আপনার শাড়ীর একটা ফালি!"

তিনি অবিলম্বে বেনারসী কাপড়ের একটা টুকরা হাতে করে নিয়ে এসে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করলেন।

আমি ভক্তিভরে তখন বলে উঠলুম, "মা, আমাকে আবার প্রণাম করা কেন—বরং আমায় আপনার পুণ্য পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে দিন!"

৪৭শ পরিচ্ছেদ

অ্যামেরিকায় প্রত্যাবর্তন

লণ্ডনে যোগসম্বন্ধে ক্লাস হচ্ছিল, সেখানে বললুম,—"ভারতে আর অ্যামেরিকায় আমি যোগসম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু একজন হিন্দু হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ ছাত্রদের ক্লাস করতে পেয়ে আমি ভারি খুশী।"

শুনে সেখানকার ক্লাসে যোগদানকারীরা বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে হাসলেন ; রাজনৈতিক কোন গণ্ডগোল আমাদের যোগালোচনায় কোন রকম শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি।

ভারতবর্ষ এখন পুণ্যস্মৃতিতে পর্যবসিত। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস —আবার ইংলণ্ডে ফিরে এসেছি ; ষোলমাস পূর্বে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলুম যে আবার লণ্ডনে এসে বক্তৃতা দেব।

অনাদিকালের যোগের কথা শুনতে ইংলণ্ডও সমুৎসুক। গ্রাভ্‌নার হাউসে আমার কোয়ার্টারে রিপোর্টার, সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যান প্রভৃতির ভিড় লেগে গেল। ওয়ার্লড ফেলোশিপ অফ ফেথের ব্রিটিশ ন্যাশন্যাশ কাউন্সিল ২৯শে সেপ্টেম্বর একটা সভার আয়োজন করলেন হোয়াইটফিল্ডের কংগ্রিগেশনাল চার্চে—সেখানে বক্তৃতা দিতে হল। বিষয়টি গুরুতর, "সৎসঙ্গে বিশ্বাস—সভ্যতা রক্ষার উপায়"। ক্যাক্সটন হলে রাত আটটার বক্তৃতায় এত লোকসমাগম হয়েছিল যে দু'রাত ধরে অতিরিক্ত জনতাকে উইণ্ডসর হাউস প্রেক্ষাগারে রাত সাড়ে ন'টায় আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার পরের সপ্তাহগুলিতে যোগের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা এমন বেড়ে গেল যে রাইট সাহেবকে আর একটা হলের বন্দোবস্ত করতে হল।

আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয়ে ইংরেজ সংসক্তির একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমার প্রস্থানের পর লণ্ডনে যোগের ক্লাসের ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে একটা সেলফ্‌ রিঅ্যালাইজেশন্‌ ফেলোশিপ্‌ কেন্দ্র গঠন করে অমন সব দারুণ যুদ্ধের সারা বছরগুলির মধ্যেও নিয়মিত সাপ্তাহিক ধ্যানের অধিবেশন সম্পন্ন করত।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন সপ্তাহগুলি অবিস্মরণীয় ; লণ্ডনে সহর পরিদর্শন,

তারপর সুন্দর গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ। সেখানকার বড় বড় কবি আর ব্রিটিশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশপূজ্য ও বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্মস্থান আর সমাধি ইত্যাদি রাইটসাহেব ও আমাতে মিলে আমাদের বিশ্বস্ত ফোর্ডগাড়ীতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে সব দেখলুম।

অক্টোবরের শেষের দিকে আমাদের ক্ষুদ্রদলটি সাদাম্পটন থেকে 'ব্রিমেন' জাহাজে আমেরিকায় যাত্রা করলে। নিউইয়র্ক বন্দরে স্ট্যাচু অব্ লিবার্টি দেখে আনন্দের ভাবাবেগে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

ফোর্ডগাড়ীটা যদিও প্রাচ্যদেশে নানা দুর্গমপথ পরিভ্রমণ করে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনও সেটা বেশ মজবুত। যাই হোক্ অ্যামেরিকার মাটিতে নেমে সে নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত এক মহাদেশাতিক্রম্য পাড়ি জমালে। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি মাউন্ট ওয়াশিংটন।

বৎসরান্তের বড়দিনের উৎসব লস এঞ্জেলিস কেন্দ্রে পালিত হয়—প্রতিবৎসরই ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। আট ঘণ্টা সৎসঙ্গের অধিবেশনের (আধ্যাত্মিক খ্রিস্টমাস)* উৎসব, তারপরদিন খাওয়াদাওয়ার (সামাজিক খ্রিস্টমাস) উৎসব। এ বছরের উৎসব দেখছি খুব জোর হবে, কারণ দূর শহর থেকে বহু ছাত্র, শিষ্য, প্রিয়বন্ধুরা সব এসেছেন এই ভূপর্যটকত্রয়কে গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে।

খ্রিস্টমাসদিবস পালন উপলক্ষ্যে আনন্দভোজে যে সব উপাদেয় আহার্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা সব এসেছে পনরহাজার মাইল দূর থেকে ; কাশ্মীর থেকে "গুচ্ছি" ব্যাঙের ছাতা, টিনের কৌটায় রসগোল্লা, আমসত্ত্ব, পাঁপড়, কেওড়ানির্যাস—আইসক্রীম সুগন্ধি করবার জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটা প্রকাণ্ড খ্রিস্টমাস বৃক্ষের চতুর্দিকে ঘিরে বসলুম—নিকটস্থ অগ্নিকুণ্ডে সুগন্ধি সাইপ্রেস গাছের কাঠ জ্বলছে।

---

* ১৯৫০ সাল থেকে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সারাদিবস ব্যাপি ধ্যানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সভ্যগণও নিজ নিজ আবাসে অথবা সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ মন্দিরে বা কেন্দ্রে উপরোক্তভাবে খৃস্টমাস পর্ব্ব উদ্‌যাপিত করে থাকেন। এতদ্বারা তাঁরা নিজেদের ধ্যানকে, প্রধানকেন্দ্রে সমবেত ভক্তদের ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত করে গভীর আধ্যাত্মিক সহায়তা ও মঙ্গললাভ করে থাকেন। এই সহায়তা তাঁরা অন্য সময়েও পেতে পারবেন যদি তাঁরা প্রধান কেন্দ্রে সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন প্রেয়ার কাউন্সিল কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক ধ্যানের সঙ্গে নিজেদের ধ্যানকে যুক্ত করেন। যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানান তাঁদের কল্যাণের জন্য সেখানে প্রত্যহ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারিত হয়।॰ (আমেরিকান প্রকাশকের মন্তব্য)

এইবার সব উপহার বিতরণের পালা। পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে কত দূরদূরান্তরের দেশ হতে নানাবিধ উপহারের জিনিষ সব আনা হয়েছে,—প্যালেস্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি। বিদেশে কোন জংশনে পৌঁছলেই রাইট সাহেব যে কত যত্নে আর কত হুঁসিয়ারির সঙ্গে লাগেজগুলো সব গুণে তুলতো—পাছে আমাদের এই অ্যামেরিকায় প্রিয়জনেদের জন্যে আনা মূল্যবান উপহার দ্রব্যগুলি সব পথের মাঝেই চুরি হয়ে না যায়। পুণ্যভূমির (প্যালেস্টাইনের) পবিত্র জলপাইগাছের প্রাচীরচিত্র, হল্যাণ্ড আর বেলজিয়মের সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা সব লেস্ আর চিকনের কাজ, পারস্যদেশের কার্পেট, সূক্ষ্ম বোনা কাশ্মীরী শাল, মহীশূরের সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠের বারকোশ, মধ্যপ্রদেশের মূল্যবান পাথর, বহুকাললুপ্ত রাজত্বকালের সব প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, রত্নখচিত ফুলদানি ও কাপ, মিনিয়েচার আর কাপড়েতোলা ছবি, ধূপ, অগুরু, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি পূজার সুগন্ধি, স্বদেশী ছাপাকাপড়, কাঠের উপর গালার কাজ, মহীশূরের গজদন্তের কারুকার্য, লম্বা শুঁড়ওয়ালা পারস্যদেশের চটিজুতো—সচিত্র প্রাচীন হস্তলিপি, মখমল, কিংখাব; গান্ধীটুপি, মাটির জিনিষ, টালি, পিতলের বাসনপত্র, প্রার্থনা করবার রাগ্ (আসন)—তিনটে মহাদেশ লুট করে সব আনা হয়েছে!

গাছের তলায় বিরাট স্তূপ থেকে সুন্দর সুন্দর রঙীন কাগজে মোড়া পুলিন্দা একে একে বার করে নিয়ে সবাইকে বিতরণ করলুম।

"সিস্টার জ্ঞানমাতা"……একটা লম্বা বাক্সে ছিল সোনার জরি দেওয়া সোনালী রঙের বেনারসী সাড়ী, এঁর জন্যেই এনেছিলুম। মার্কিন মহিলা সাধনপথে বেশ অগ্রসর হয়েছেন; মধুর, শান্তমূর্তি। আমার অনুপস্থিতির সময় মাউন্ট ওয়াশিংটনের সব ভার গ্রহণ করেছিলেন। উপহারটি পেয়ে খুব খুশী—বললেন, "ধন্যবাদ গুরুদেব, সাড়ী পেয়ে মনে হল আমি ভারতবর্ষের দৃশ্য সব চোখের সামনে দেখছি!"

"মিস্টার ডিকিনসন"—এর উপহারটি কিনেছিলুম কলকাতার বাজার থেকে। সে সময় ভেবেছিলুম "মিস্টার ডিকিনসন এটা পেয়ে খুব খুশীই হবে।" মিস্টার ই. ই. ডিকিনসন আমার একটি প্রিয়শিষ্য, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মাউন্ট ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রতি বৎসরই খ্রিস্টমাস উৎসবের সময় উপস্থিত থাকে।

আজ এই একাদশ বার্ষিক উৎসবের দিনে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার লম্বা চৌকোনা উপহারের বাক্সটির ফিতে খুলেই অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল… "রুপোর কাপ!"

মনে তখন তার কি ভাবের ঝড় উঠেছিল তা জানি না, তবে বোধ হল যে বেচারা তার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে—উপহারটির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়েই রইল ; উপহারটি বেশী কিছুই নয়, একটা লম্বা পানপাত্র, "রুপোর কাপ"। খানিকক্ষণ পরে একটু দূরে গিয়ে সে বসে রইল—যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। পুনরায় সাণ্টা ক্লসের ভূমিকা অভিনয় করবার পূর্বে আমি সস্নেহে তার দিকে চেয়ে একটু হাসলুম।

আনন্দকলরবে মুখরিত সান্ধ্যউৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল—সকল দানের যিনি দাতা, তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করে। তারপরে হ'ল দলবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টমাস ক্যারলের গান।

কিছুদিন বাদে আমাদের দুজনের কথাবার্তা হচ্ছিল। ডিকিনসন বললে, "গুরুদেব, রুপোর কাপের জন্যে এখন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। খ্রিস্টমাস রাতে আমি তখন আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষাই খুঁজে পাই নি। আমার অন্তর তখন এক অপরূপ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল।"

"আমি তোমার জন্যেই বিশেষ করে এ উপহারটি বেছে এনেছি। পছন্দ হয়েছে তো?"

সলজ্জভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ডিকিনসন বলতে লাগল, "আজ তেতাল্লিশ বছর ধরে আমি এই রুপোর কাপটির প্রত্যাশা করে আসছি। সে অনেক কথা ; আজ পর্যন্ত আমি সে সব কথা কাউকে বলি নি। আরম্ভটা হয়েছিল নাটকীয় ধরণে। আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলুম। আমরা তখন নেব্রাস্কার একটা ছোট শহরে থাকি। খেলা করতে করতে আমার বড় ভাই আমায় পনেরফুট গভীর একটা ডোবার ভিতর ঠেলে ফেলে দিলে। আমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের। দ্বিতীয়বার ভেসে উঠে আবার যখন ডুবতে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ একটা রামধনুরঙের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে আমার চোখ যেন ঝলসে দিলে। আলোয় চারিদিক ছেয়ে গেল, তার মাঝখানে দেখা গেল একটি লোকের মূর্তি— প্রশান্ত দৃষ্টি, মুখে অভয় হাসি। তৃতীয়বারের বার যখন আমার শরীর আবার ডুবে যাবার উপক্রম হল, আমার ভাইয়ের এক সঙ্গী একটা লম্বা আর সরু উইলোগাছের ডাল নুইয়ে জলের ধারে এমন ভাবে ধরলে যে আমি সেটার নাগাল পেয়ে প্রাণপণশক্তিতে সেটা ধরে ফেলে কোন ক্রমে ভেসে রইলুম—তারপর পাড়ের উপর ছেলেগুলো আমায় তাড়াতাড়ি ধরে জল থেকে টেনে তুলে ফেললে, এবং প্রাথমিক সাহায্য দিয়ে তারা আমায় সুস্থ করে তোলে।

"বার বছর বাদে—বয়স তখন আমার সতের, মায়ের সঙ্গে শিকাগো শহরে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেটা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। ওয়ার্ল্ড পার্লামেণ্ট

অফ রিলিজনের অধিবেশন তখন সেখানে চলছে। মা আর আমি একটা বড় রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় সেখানে দেখলুম সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃর স্ফুরণ! কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল যে সেই একই ব্যক্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন—যাঁকে আমি বহুবছর আগে স্বপ্নে দর্শন করেছিলুম। একটা প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারের কাছে এসে তিনি দরজার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'মা, মা, ঐ সেই লোকটি, যিনি আমার ডুবে যাবার সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

"মা আর আমি তাড়াতাড়ি চললুম সেই বাড়ীর দিকে; লোকটি বক্তৃতা দেওয়ার মঞ্চের উপর বসেছিলেন। তখনিই জানতে পারলুম যে তিনি আর কেউ নন, স্বামী বিবেকানন্দ*—ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। তাঁর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শেষ হবার পর আমি তাঁর সাক্ষাতের জন্য এগোলুম। আমাকে দেখে তিনি মধুরভাবে হাসলেন, যেন আমরা দুজন পুরান বন্ধু—কতকালের পরিচয়। আমি তখন এত ছোট যে মনের ভাব কি করে প্রকাশ করতে হয় তা জানিনে, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে আমি এ আশা পোষণ করছিলুম যে তিনি আমার গুরু হতে সম্মত হবেন। তিনি আমার মনের কথা সব বুঝতে পারলেন।

"স্বামী বিবেকানন্দজী তখন আমার দুই চক্ষুর উপর তাঁর দুটি সুন্দর চক্ষুর গভীরদৃষ্টি স্থাপিত করে আমায় বললেন, 'না বাছা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার যিনি গুরু তিনি পরে আসবেন, আর তিনি তোমায় একটি রুপোর কাপ দেবেন।' তারপর একটু থেমে তিনি হেসে বললেন, 'তুমি এখন যা বহন করতে সমর্থ, তার চেয়েও বেশী আশীর্বাদ তিনি তোমার উপর বর্ষণ করবেন।' "

মিষ্টার ডিকিনসন বলতে লাগল, "দুচারদিনের মধ্যেই আমি শিকাগো ছেড়ে চলে এলুম—কিন্তু সেই মহাপুরুষ বিবেকানন্দজীর আর দর্শন পেলুম না। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত প্রত্যেক কথাটি আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরতরে খোদিত হয়ে রইল। বছরের পর বছর কাটতে লাগল, কিন্তু আমার আর কোন গুরু এলেন না। ১৯২৫ সালে একদিন রাত্রে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করলুম—'প্রভু, আমার কাছে আমার গুরু পাঠিয়ে দাও। ঘণ্টাকতক বাদে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলুম অতি সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে। দেখলুম স্বর্গের কতকগুলি দেবদূত বাঁশী আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সব নিয়ে আমার সম্মুখে

* খ্রিস্টসম জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য।

আবির্ভূত হয়েছেন। দিব্যসঙ্গীতে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দেবদূতেরা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"তার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় লস এঞ্জেলিসে আমি সর্বপ্রথম আপনার বক্তৃতায় যোগদান করলুম এবং তখনই টের পেলুম যে আমার অন্তরের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।"

নীরবে আমরা উভয়ে হাস্য বিনিময় করলুম।

মিস্টার ডিকিনসন বলতে লাগল, "আজ এগার বছর ধরে আমি আপনার ক্রিয়াযোগের শিষ্য। কখনও কখনও আমি রুপোর কাপের কথা ভেবে আশ্চর্য হতুম; তখন আমার প্রায় এই বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিবেকানন্দজীর কথাগুলি রূপকমাত্র।

কিন্তু সেই রাত্রে আপনি যখন খ্রিস্টমাসের গাছের কাছে সেই ছোট বাক্সটি আমার হাতে দিলেন, তখন জীবনে তৃতীয়বার আমি সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃর স্ফুরণ দেখতে পেলুম। তারপরেই আমার হাতে এল আমার গুরুর উপহার, যা বিবেকানন্দজী তেতাল্লিশ বছর আগে* আমার জন্য দেখতে পেয়েছিলেন— একটি রুপোর কাপ।"

---

* মিস্টার ডিকিনসনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আর ঐ একই বৎসরে ৫ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন পরমহংস যোগানন্দ। মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ জানতে পেরেছিলেন যে যোগানন্দ আবার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভারতের চিরন্তন বাণী শিক্ষাদানের জন্য অ্যামেরিকায় গমন করবেন।

১৯৬৫ সালে মিস্টার ডিকিনসনের ৮৯ বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম ছিলেন। ঐ বৎসরে লস্ এইনজেলসে, সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ প্রধান কেন্দ্রে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে যোগাচার্য উপাধি প্রদান করা হয়।

তিনি প্রায়ই পরমহংসজীর সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের ধ্যান সাধনায় যোগ দিতেন এবং দৈনিক তিনবার করে ক্রিয়াযোগ সাধনা করা থেকে কখনো বিরত হতেন না।

যোগাচার্য ডিকিনসন ১৯৬৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে তিনি সেলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের সন্ন্যাসীদের কাছে একটি ভাষণ দেন। তিনি তাঁদের কাছে এমন একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেন যা তিনি পরমহংসজীকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। যোগাচার্য ডিকিনসন সন্ন্যাসীদের বলেছিলেনঃ 'আমি যখন শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কথা বলার জন্য বক্তৃতা মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন তিনি আমার অভিবাদন জানানোর আগেই বলে উঠলেনঃ

"যুবক, আমি তোমাকে জলাশয় থেকে সাবধান হতে পরামর্শ দিচ্ছি!" (প্রকাশকের মন্তব্য)

৪৮-শ পরিচ্ছেদ

ক্যালিফোর্ণিয়ার 'এনসিনিটাসে'

"আপনাকে অবাক করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে গুরুদেব। বিদেশে যখন আপনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তখন আমরা এনসিনিটাসে এই আশ্রমটি তৈরী করে ফেলেছি—আপনার 'স্বাগত প্রত্যাগমনে'র এটি একটী উপহার!" বলে মিস্টার লীন, সিস্টার জ্ঞানমাতা, দুর্গা মাতা ও কতিপয় আরো শিষ্য-শিষ্যা একটী গেটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে ছায়াঢাকা পথ দিয়ে অগ্রসর হলেন।

দেখলুম বাড়ীটি নীল সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে—যেন প্রকাণ্ড একটী শ্বেত যাত্রীবাহী জাহাজ। প্রথমটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে তারপর ওঃ, আহা ইত্যাদি বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণে, তারপরে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় বাক্যহারা হয়ে অবশেষে আশ্রমটী ঘুরে-ফিরে বেড়িয়ে দেখতে লাগলুম। বাড়ীটীর মধ্যে ষোলটি খুব বড় বড় ঘর আছে, প্রত্যেকটাই সুন্দর করে সাজান।

বাড়ীটীর মাঝখানের হলঘরটির জানালাগুলি সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে—তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, সমুদ্র আর নীল আকাশ, প্রকৃতিরাণীর বসনাঞ্চলে যেন পান্না, উপলমণি আর নীলা বসান! হলের মাঝখানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ম্যাণ্টেলের উপর যীশুখ্রীষ্ট, বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয় আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ছবি। মনে হল, এই শান্ত স্নিগ্ধ পাশ্চাত্য আশ্রমের উপর তাঁরা তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন।

হলের ঠিক নীচেই, সমুদ্রতীরের ঢালু জমিটার উপরেই দুটি নির্জন গুহা তৈরী হয়েছে, ধ্যানধারণার জন্য—সামনেই দিগন্তবিস্তৃত অনন্ত মহাসমুদ্র, আর মাথার উপরে অসীম নীলাকাশ। জমির উপরে সূর্যস্নানের নিরালা কোণ। নিভৃত কুঞ্জ অবধি বিস্তৃত পাথর বাঁধান রাস্তা, গোলাপ বাগান, ইউক্যালিপটাস কুঞ্জ, আর বিঘার পর বিঘা ফলের বাগান।

(আশ্রমের একটী দ্বারে সংলগ্ন "জেন্দাবেস্তা" থেকে এই "আবাসের জন্য প্রার্থনাটী" উধৃত করা হয়েছে),—'শুদ্ধচেতা আর বীর্যবান্ পুণ্যাত্মগণ যেন এখানে আসেন, এবং তাঁদের সঙ্গদানে আর শুভ আশীর্বাদ বিতরণে তাঁরা যেন

আমাদের মঙ্গল সাধন করেন—যা হবে পৃথিবীর মত বিস্তৃত, আকাশের ন্যায় উচ্চ।'

ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশস্থ এনসিনিটাসের বিস্তৃত ভূমি মিঃ জেমস জে, লীন সাহেবের সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপকে উপহার। লীন সাহেব ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষিত হন এবং তদবধি ভক্তিভরে সাধনা করে আসছেন। মিঃ লীন একজন মার্কিন ব্যবসায়ী, অগণিত তাঁর দায়িত্ব ও কর্মভার (বিরাট তৈল প্রতিষ্ঠানসমূহ আর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিনিময়যোগ্য অগ্নিবীমা প্রভৃতির কর্ণধার স্বরূপে) তবুও তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ ও গভীর "ক্রিয়াযোগ" সাধন, ধ্যান প্রভৃতির জন্য সময় করে নেন। এইরূপে একটি সুসমঞ্জস জীবন যাপন করে তিনি 'সমাধি'তে অখণ্ড পরমানন্দ লাভ করেছেন।

ভারতবর্ষে আর ইউরোপে আমার থাকবার সময় (জুন ১৯৩৫ হতে অক্টোবর ১৯৩৬) মিঃ লীন* ক্যালিফোর্ণিয়ায় আমার সংবাদদাতাগণের সঙ্গে সপ্রেম চক্রান্ত করেছিলেন যাতে করে এনসিনিটাসের আশ্রম তৈরীর কথা বিন্দুবিসর্গও আমার কানে না পেঁছায়। তাই বিস্ময় আর আনন্দ আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

অ্যামেরিকায় থাকার গোড়ার দিকে আমি ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে খোঁজ করে বেড়িয়েছিলুম একটা ছোট্ট জায়গা,—সমুদ্রতীরে একটা আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে। যখনই একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাই তখনই একটা না একটা বাধা উপস্থিত হয়ে কাজে ব্যাঘাত জন্মায়। আজ এনসিনিটাসের রৌদ্র কিরণোজ্জ্বল ভূমিতে ভক্তিবিনত চিত্তে দাঁড়িয়ে দেখলুম যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীরা বহুদিন পূর্বেকার ভবিষ্যদ্বাণী, "সমুদ্রতীরে আশ্রম", তা আজ বিনা আয়াসেই পূর্ণ হয়েছে।

মাস কতক পরে, ১৯৩৭ সালে ঈস্টারে, আমি এনসিনিটাসের তৃণাচ্ছাদিত মসৃণভূমিতে প্রথম উষাপ্রার্থনা শুরু করলুম। কয়েকশত ছাত্র সে

---

* মিঃ লীন (রাজর্ষি জনকানন্দ) পরমহংস যোগানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পর সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। তদীয় গুরু সম্বন্ধে মিঃ লীনের উক্তি, "প্রকৃত সাধুসন্তের সঙ্গ কি অপূর্ব, কি স্বর্গীয়! আমার জীবনে যা কিছু এসেছে তার মধ্যে পরমহংসজীর আশীর্বাদই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ!"

মিস্টার লীন ১৯৫৫ সালে 'মহাসমাধি' লাভ করেন। (প্রকাশকের নিবেদন)।

† ১২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

প্রার্থনাসভায় যোগদান করেছিল। তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম। পূর্বগগনে নব অরুণোদয়—পুরাকালের ম্যাজিদের মত সকলে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তার দিকে তাকিয়ে, পশ্চিমে অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর তার ঊর্মিনৃত্যে গভীর বন্দনা গান করছে। দূরে ছোট্ট একটী সাদা পালতোলা নৌকা; একটী সিন্ধুশকুন পক্ষী একাকীই নীল আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'যীশুখ্রীষ্ট, আজ তুমি জাগ্রত!" কেবলমাত্র গ্রীষ্মের সূর্যের সঙ্গে নয়—আত্মার জাগরণের অনন্ত উষার মধ্যে!

মাস কতক সুখেই কাটল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে আশ্রমে বসে আমি। বহুদিনের মনের মধ্যে পোষিত একটা কাজ শেষ করে ফেললুম—সেটা "অনন্তের সঙ্গীত" রচনা। অনেক ভারতীয় গানে ইংরাজী শব্দ ও পাশ্চাত্য সুরসংযোজন করেছি। এর মধ্যে ছিল আচার্য শঙ্করের "ন মৃত্যুর্নশঙ্কা", সংস্কৃত—"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং," রবিঠাকুরের—"মন্দিরে মম কে আসিল হে" আর বাকী সব আমার রচনা: "আমি সদা তোমারই", "স্বপন পারের দেশে", "নীরব গগন হতে নেমে এস", "শোন মোর অন্তরের ডাক," "শান্তি মন্দিরে," "তুমিই আমার জীবন।"*

এই সঙ্গীতগ্রন্থের মুখবন্ধে প্রাচ্যের ভক্তিভাবের সুর প্রতীচ্যের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলুম। উপলক্ষ্যটা ছিল একটা জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা, কাল ১৯২৬ সালের ১৮ই এপ্রিল, স্থান নিউইয়র্কের কার্নেগী হল।

১৭ই এপ্রিল তারিখে আমার একটি অ্যামেরিকান ছাত্র "মিষ্টার হানসিকারকে আড়ালে বললুম, "আমি মনে করছি, শ্রোতৃবৃন্দকে একটি প্রাচীন হিন্দু ভজনগান গাইতে বলব, 'এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর'।"†

---

* পরমহংস যোগানন্দজী "অনন্তের সঙ্গীত" (কসমিক চ্যাণ্ট) হতে কয়েকটি গান রেকর্ড করেন। রেকর্ডগুলি এস আর এফ, লস এঞ্জেলিস হতে প্রাপ্তব্য। (প্রকাশকের নিবেদন)।

†এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর, মস্তক নমি তব চরণ পরে।
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল, পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত;
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে;
সেবকজনের সেবায় সেবায়, প্রেমিকজনের প্রেমমহিমায়,
দুঃখীজনের বেদনে বেদনে, সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ পরে॥
—গুরু নানক

মিষ্টার হানসিকার প্রতিবাদ করে বললে যে অ্যামেরিকানরা সব প্রাচ্য দেশীয় গানবাজনা সহজে বোঝেটোঝে না।

আমি উত্তরে বললুম, "সঙ্গীত হচ্ছে সার্বজনীন ভাষা—অ্যামেরিকানরাও এ রকম মনপ্রাণমাতান গানের উচ্চভাব গ্রহণ করতে কখনও অসমর্থ হবে না।"

তার পরদিন রাত্রে শ্রোতৃবৃন্দের তিনসহস্রকণ্ঠের সমবেতসঙ্গীতে একঘণ্টার উপর অবিরতভাবে সেই ভজন গান চলল "এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর"। আনন্দের আর বিরাম নাই, ক্লান্তি নাই। সে এক অপূর্ব উন্মাদনা, এক অভিনব দৃশ্য! নিউইয়র্ক বাসিগণ! তোমাদের সকলের অন্তর ভগবানের মহিমাকীর্তনের আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আজ কোথায় উধাও হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে! সেই সন্ধ্যায় গানের মাঝখানে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের পুণ্যনামগানে ভক্তদের মধ্যে দৈবশক্তিবলে কত রোগনিরাময়ও সাধিত হয়েছিল।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আমি বোস্টন সহরের সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ কেন্দ্র পরিদর্শন করি। বোস্টন কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এম, ডব্লিউ, লিউইস আমার জন্য একটি সুরুচিসম্মতভাবে সজ্জিত সুইটে বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন। ডাঃ লিউইস একটু হেসে বললেন, "গুরুদেব, আপনি অ্যামেরিকা আসবার গোড়ায় দিকে এই শহরে বাস করেছিলেন একটি মাত্র ঘরে, তাতে আবার কোন স্নানের ঘরও ছিল না। এখন দেখুন বোস্টন শহরে কেমন আরামদায়ক আর সাজান সব ঘর আছে!"

ক্যালিফোর্ণিয়ার পূর্ণ কর্মোদ্যমে বছরগুলি সুখেই কাটল। এনসিনিটাসের সেলফ-রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপ কলোনি* ক্যালিফোর্ণিয়ায় ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলোনির কার্যাবলীর মধ্যে এস. আর. এফ-এর আদর্শে শিষ্যদের বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এনসিনিটাস ও লস এঞ্জেলিস কেন্দ্রের এস. আর. এফ আবাসিকদের তাজা শাকসব্জি সরবরাহের জন্য একটি বিরাট কৃষিকার্যের পরিকল্পনার উন্নতিসাধনও অন্তর্গত।

---

* এখন এটি একটি বিরাট আশ্রম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কেন্দ্রের পরিধির মধ্যে রয়েছে আদি মুখ্য সাধন কুটীর, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের থাকার জন্য আশ্রম গৃহ, ভোজনালয় এবং সংঘের সভ্য ও সুহৃদ্‌বর্গের নির্জনে সাধনা করার উপযুক্ত সুন্দর বাসগৃহ। প্রধান সড়ক পথের দিকে মুখোমুখি সুপ্রশস্ত জমিগুলির উপর পাশাপাশি দন্ডায়মান রয়েছে অনেকগুলি শ্বেতবর্ণের স্তম্ভ ও তার ওপর শোভা পাচ্ছে স্বর্ণবর্ণের ধাতু নির্মিত পদ্মফুল। ভারতীয় চারুকলায় পদ্মফুলকে বলা হয় আমাদের মস্তিষ্কের কেন্দ্রে (সহস্রার) অবস্থিত মহাজাগতিক চৈতন্যের কেন্দ্র—'সহস্রদলযুক্ত আলোকের পদ্মফুল।'

"তিনি সকল মানবজাতিকে এক রক্তেতেই সৃষ্টি করেছেন।"* এই যুদ্ধবিসম্বাদে শতধাদীর্ণ ছিন্নভিন্ন পৃথিবীতে, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গঠিত অগণিত বিশ্বভ্রাতৃসঙ্ঘের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা হওয়া অবিলম্বেই প্রয়োজন। "বিশ্ব ভ্রাতৃসঙ্ঘ" একটা খুব বড় কথা, কিন্তু যে মানুষ নিজেকে বিশ্ববাসী বলে মনে ক'রে অবশ্যই তার প্রতি সহানুভূতি বর্ধিত করা উচিত। যদি কেউ সত্যসত্যই বুঝতে পারে যে, এ "আমারই অ্যামেরিকা, আমারই ভারতবর্ষ, আমারই ফিলিপিনস্, আমারই ইউরোপ, আমারই আফ্রিকা" ইত্যাদি, তা'হলে তার সার্থক আর সুখময় জীবনযাপনের সুযোগের অভাব হবে না।

যদিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দেহ ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কোন মাটির উপর বিচরণ করে নি, তবুও তিনি বিশ্বভ্রাতৃমন্ত্রের এই মহাসত্যটি জানতেন, "সারা জগৎটাই আমার আপন ঘর।"

* এক্টস্, ১৭ : ২৬—(বাইবেল)।

৪৯শ পরিচ্ছেদ

১৯৪০—১৯৫১

"ধ্যানের প্রকৃত মূল্য কি তা আজ আমরা সত্যই বুঝতে পেরেছি। আর এও জানি যে পৃথিবীতে কোন কিছুই আমাদের অন্তরের শান্তি নষ্ট করতে পারবে না। গত কয়েক সপ্তাহের অধিবেশনের সময় আমরা বিমান আক্রমণের সতর্কধ্বনি শুনেছিলুম আর বিলম্বিত-ক্রিয়ার বোমার বিস্ফোরণের শব্দও আমাদের কানে এসেছিল; কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীরা তবুও একত্র সমবেত হয়ে আমাদের সৎসঙ্গে সাগ্রহে যোগদান করে পরিপূর্ণ আনন্দই লাভ করেছিল।"

অ্যামেরিকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংলণ্ড থেকে ও ইউরোপ থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে আসে। সেই সকল চিঠিপত্রের মধ্যে এই পরম নির্ভরতার সংবাদটি লণ্ডন সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপ্ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। "দি উইজ্ডম অফ দি ঈষ্ট" সিরিজের বিখ্যাত সম্পাদক ডাক্তার ক্র্যানমার-বিঙ আমায় ১৯৪২ সালে লিখেছিলেন, "যখন আমি 'ঈষ্ট-ওয়েষ্ট' পড়লুম, মনে হল যে আমরা কত দূরদূরান্তরে রয়েছি—যেন আমরা দুটো স্বতন্ত্র জগতে বাস করি। লস এঞ্জেলিস থেকে সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, স্বস্তি ও শান্তি আমার কাছে আসে, যেন একটা অবরুদ্ধ নগরীতে প্রেরিত 'হোলি গ্রেলে'র আশীর্বাদ আর স্বাচ্ছন্দ্য বোঝাই হয়ে জাহাজের বন্দরে প্রবেশ করার মত। আমি যেন স্বপ্নে দেখি, আপনাদের তালকুঞ্জ আর এনসিনিটাসের মন্দির, তার সামনে অনন্তবিস্তৃত মহাসাগর—পার্বত্যদৃশ্য; আর সবার উপরে আধ্যাত্মিক ভাবানুপ্রাণিত নরনারীর সৎসঙ্গ—যে গোষ্ঠি একতায় বদ্ধ, সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্টচিত্ত, ধ্যানে পরিপুষ্ট। সকল সৎসঙ্গীদের কাছে একজন সাধারণ সৈনিকের অভিনন্দন পাঠালুম—ওয়াচ টাওয়ারের উপর বসে লেখা, উষার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখন……"

ক্যালিফোর্ণিয়ার হলিউড শহরে একটি সর্বধর্মসমন্বয় মন্দির এস. আর. এফের কর্মিবৃন্দদ্বারা নির্মিত হয়ে উৎসর্গীত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। এক বছর বাদেই আর একটি এস. আর. এফ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার

স্যান ডিয়েগো শহরে এবং আর একটি ক্যালিফোর্ণিয়ারই লং বীচ শহরে* ১৯৪৭ সালে।

লস এঞ্জেলিস শহরের প্যাসিফিক প্যালিসেডস অঞ্চলে, লতাপুষ্পের মোহন-কুঞ্জ শোভিত পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর ভূমিখণ্ড সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপকে প্রদত্ত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। ছত্রিশ বিঘা পরিমিত ভূখণ্ডটির স্বাভাবিক আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকার, হরিৎবর্ণের শৈলমালা বেষ্টিত। একটি সুবৃহৎ স্বাভাবিক হ্রদ, পার্বত্য মুকুটমাঝে যেন নীলকান্তমণি, তারই জন্য এই মনোরম ভূমির নাম হয়েছে এস. আর. এফ হ্রদতীর্থ। জমির মাঝখানে একটি অপূর্ব ওলন্দাজ হাওয়া-যাঁতাকলের মত বাড়ীতে একটি শান্ত শ্রীমণ্ডিত চ্যাপেল আছে। একটি নিম্নভূমি উদ্যানের কাছে একটি বিরাট জলচক্র জলপ্রবাহের মন্থরগীতি গেয়ে চলেছে। চীনদেশের দুইটী মর্মর মূর্তি স্থানটির শোভা বর্ধন করছে—একটি হচ্ছে প্রভু বুদ্ধদেবের, আর একটি হচ্ছে কোয়ান্ ইন্ (জগজ্জননীর চীনা প্রতিরূপ) এর। একটি জলপ্রপাতের উপর পাহাড়ে যীশুখ্রিস্টের পূর্ণাবয়ব মূর্তি দণ্ডায়মান। এর মুখমণ্ডল আর আলম্বিত বস্ত্রাবরণ সব রাত্রিতে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা হয়। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্লড পীস মেমোরিয়াল (মহাত্মা গান্ধী বিশ্বশান্তি স্মৃতিমন্দির) হ্রদতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বৎসরই অ্যামেরিকার সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের ত্রিংশ বার্ষিক উৎসব† পালিত হয়। ভারতবর্ষ হতে প্রেরিত মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চিতাভস্মের কিয়দংশ সহস্র বৎসরের প্রাচীন একটী প্রস্তর পেটীকায় সযত্নে রক্ষিত হয়ে তথায় স্থাপিত হয়।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে হলিউডে একটী এস. আর. এফ ভারত কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর মিঃ গুডউইন জে, নাইট, এবং মিঃ এম, আর, আহুজা, ভারতের কন্সাল জেনারেল উৎসর্গ সভায় আমার সঙ্গে যোগদান

* লং বীচ্ চ্যাপেলে স্থান অসংকুলান হওয়ায় ১৯৬৭ সালে সংঘকে স্থানান্তরিত করা হয় ফুলারটন্, ক্যালিফোর্ণিয়ার সুপ্রশস্থ সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপ মন্দিরে। (প্রকাশকের মন্তব্য)

† এই উৎসব উপলক্ষ্যে লস এঞ্জেলিসে ১৯৫০ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে গোলাপ ও বর্তিকার একটি পুণ্য অনুষ্ঠানে পাঁচশত দীক্ষার্থিগণকে আমি ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দিই।

করেন। ওখানে আছে সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপের ইন্ডিয়া হল্ ও একটি আড়াইশত আসন সমন্বিত প্রেক্ষাগৃহ।

বিভিন্ন এস. আর. এফ কেন্দ্রে নবাগত বহুজনেই যোগ সম্বন্ধে অধিকতর আলোকপাত চান। কখনও কখনও আমি এই জাতীয় প্রশ্ন শুনতে পাই, "আচ্ছা এটা কি সত্যি, যেমন কোন কোন প্রতিষ্ঠান বলে থাকে যে, ছাপা বই পড়ে যোগের সকল প্রকার অনুশীলন সম্ভবপর নয়, তা করতে গেলে একমাত্র আচার্যের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা প্রয়োজন।"

আণবিক যুগে সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ উপদেশাবলী বা পাঠক্রমের মত ব্যবস্থা দ্বারাই যোগশিক্ষা প্রধান কর্তব্য, অন্যথা এই মুক্তিসাধক বিজ্ঞান আবার কয়েকটী মুষ্টিমেয় লোকেদেরই করায়ত্ত হয়ে থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি তার কাছে কোন সিদ্ধ গুরুকে রাখতে পারেন তাহলে ত সেটা তার পক্ষে একটা অমূল্য আশীর্বাদ, কিন্তু জগতে তো "পাপীতাপী"দেরই সংখ্যা বেশী, সাধুসন্তরা আর কয়জন? তা হলে জনসাধারণই বা কিভাবে যোগের সাহায্য পাবে, যদি না তারা বাড়ীতে বসেই প্রকৃত যোগিদের লিখিত সাধন প্রণালীর অনুধ্যান করতে পারে?

একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে "সাধারণ লোকের" আর যোগের জ্ঞান না হলেও চলবে, কিন্তু নতুন যুগে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয়। বাবাজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সকল খাঁটি ক্রিয়াযোগিদের তিনি রক্ষা করে তাদের ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করবেন।* মানুষ যে অমৃতের পুত্র সে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যখন সে করবে, তখন তাদের জন্য যে শান্তি ও প্রাচুর্যের জগৎ অপেক্ষা করে আছে, তা প্রকাশ করার জন্য, মাত্র কয়েক ডজন নয়, শত সহস্র ক্রিয়াযোগীর প্রয়োজন।

প্রতীচ্যে একটী সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠান, একটী "আধ্যাত্মিক মধুর মধুচক্র" স্থাপনার ভার আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ও আমার পরম পরমগুরুদেব বাবাজী মহারাজ কর্তৃক আমার উপর

---

* যোগানন্দজীও বহু উপলক্ষ্যে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যদের বলেছেন যে ইহলোক পরিত্যাগ করে যাবার পরও তিনি সকল ক্রিয়াযোগীর (ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত সেলফ্ রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ / যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার 'লেশন' ছাত্রগণ) আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সতত দৃষ্টি রেখে চলবেন। তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মহাসমাধির পর এস আর এফ / ওয়াই এস এস এর সদস্যদের লিখিত পত্র হতে—যাঁরা তাঁর সর্বব্যাপী নির্দেশের বিষয় অবগত হতে পেরেছেন।

(প্রকাশকের নিবেদন)।

অর্পিত হয়। যেমন সব বড় বড় কাজেই হয়, তেমনি এই পবিত্র কর্তব্য-পালনেও নানাবিধ বাধাবিঘ্নের আবির্ভাবের অভাব ঘটে নি।

এস আর এফ মন্দিরের সান ডিয়েগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাক্তার লয়েড কেনেল এক সন্ধ্যায় আমায় একটি প্রশ্ন করে বসলেন, "আচ্ছা পরমহংসজী, ঠিক করে বলুন ত, সত্যিই কি এসব সার্থক হয়েছে?" আমি তাঁর প্রশ্নের ভাবে বুঝলুম যে তিনি বলতে চান, "আপনি কি অ্যামেরিকায় এসে সুখী? যোগ প্রচারে বাধা দিতে যারা সমুৎসুক, সেইসব ভ্রান্ত লোকেদের মিথ্যা প্রচারের বিষয়ে কি বলেন? এই যে মতপরিবর্তন, অন্তর্দাহ, কেন্দ্রের অধ্যক্ষ—যাঁরা ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন না, ছাত্ররা—যাদের উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করতে পারা যায় না, তাদের কথা কি সব ভেবেছেন?"

বললুম, "ঈশ্বর যাকে পরীক্ষা করেন সেই তো ভাগ্যবান্; আমার উপর পরীক্ষাভার চাপাতেই তো তিনি আমায় সর্বদা স্মরণ করছেন।" ভাবলুম তখন সেইসব বিশ্বস্ত লোক, আর অ্যামেরিকার অন্তরে যে ভালবাসা, ভক্তি, যাতে অ্যামেরিকার হৃদয় উজ্জ্বল—তার সব কথা। ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে আমি বলতে শুরু করলুম, "কিন্তু আমার উত্তর এই :—হাঁ, হাজারবার আমি বলব, হাঁ, এ সত্যিই সার্থক হয়েছে; পূর্ব আর পশ্চিমকে একমাত্র শাশ্বত আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা—এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।"

ভারতের ধর্ম মহাগুরুগণ যাঁরা প্রতীচ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা আধুনিক অবস্থা খুব ভালভাবেই বুঝেছেন। তাঁরা জানেন যে যতদিন পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রধান গুণগুলি সকল জাতির মধ্যে উত্তমরূপে আয়ত্তীকৃত না হয়, ততদিন পর্যন্ত আর পৃথিবীর অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। দুই গোলার্ধের মধ্যে পরস্পরের সর্বোৎকৃষ্ট গুণগুলির অনুশীলন ও আদানপ্রদান একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবী পরিভ্রমণকালে আমি নানাস্থানে বহু দুঃখদুর্দশা সব দর্শন করে মর্মাহতই হয়েছি। প্রাচ্য দুঃখক্লেশ প্রভৃতি জড়বিষয়ে আবদ্ধ আর প্রতীচ্য প্রধানতঃ আবদ্ধ মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্লেশে। পৃথিবীর সকল জাতি এখন অসমঞ্জস সভ্যতার ক্লেশকর পরিণাম উপলব্ধি করছে।* ভারতবর্ষ এবং

---

* আমারে ঘেরিয়া গরজে সে বাণী ক্ষুব্ধ সিন্ধুসম :—

"তোমার ধরা কি এত আশাহত,
চূর্ণ হয়েছে ধূলিকণামত ?
হারিয়েছ আজ সবকিছু হায়, ছাড়ি' আশ্রয় মম।

অন্যান্য প্রাচ্যদেশসকল অ্যামেরিকার মত প্রতীচ্যজাতিসমূহের পার্থিব ব্যাপারে ব্যবহারিক জ্ঞানাৰ্জন—ঐহিক কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টার অনুসরণ থেকে বহুলপরিমাণে উপকৃত হতে পারবে। আবার প্রতীচ্যবাসীদেরও জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তির বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষতঃ মানুষের সচেতন ঈশ্বরোপলব্ধিকল্পে ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করেছিল, সে বিষয়ে।

সভ্যতার সুপরিকল্পিত আদর্শ একেবারে অলীক কল্পনা নয়। সহস্র-সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিরাট পার্থিব ঐশ্বর্যের রঙ্গভূমি ছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, গত দুইশত বৎসরের দারিদ্র্য তার কর্মফলের একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে "ভারতের ঐশ্বর্যে"র* প্রবাদ পৃথিবীতে সুপ্রচলিত ছিল। বিশ্ববিধান অথবা ঐহিক

যা' কিছু তোমার নিয়েছিনু কেড়ে, শুধু এইটুকু তরে,
তোমা' ক্ষতি তরে নয়,
আবার সে সব খুঁজে নেবে তুমি, প্রসারিত মম করে।
হারান যা' কিছু ভয়,
সকলি তোমার শিশুর ভ্রান্তি ; সবি আছে মোর ঘরে।
তোমা' তরে সব সঞ্চয় করি, রেখেছি ঘরের মাঝে,
ওঠ এবে তুমি, ধর মোর হাত এস আজ মোর কাছে।"

—ফ্রান্সিস টম্পসনকৃত "দি হাউন্ড অফ হেভেন"।

* ঐতিহাসিক বিবরণে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী জাতি ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মতবাদ—আর্যজাতির আদি-পুরুষেরা সব এসিয়ার অপর কোন অংশ অথবা ইউরোপ থেকে এসে ভারত "আক্রমণ" করে ছিলেন, তা কি হিন্দুসাহিত্য, কি কিম্বদন্তী, কোন কিছুতেই সমর্থিত হয় না। পণ্ডিতগণ এই কাল্পনিক অভিযানের উৎস নির্ধারণে স্পষ্টতঃই অসমর্থ। স্মরণাতীত কাল হতে ভারতবর্ষই যে হিন্দুদের আবাসভূমি তা বেদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণাদিতে প্রমাণিত হয়, আর তা ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস লিখিত "ঋগ্বেদের যুগে ভারত" নামক একটি অপূর্ব আর অতি সুখপাঠ্য মৌলিক গ্রন্থে অতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অধ্যাপক দাস বলেন যে ভারতবর্ষ হতে যাঁরা প্রবাসে গমন করেছিলেন তাঁরা ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বসবাস করেছিলেন, তা'তে ভারতীয় ভাষণ এবং লোকগাথার বিস্তৃতি ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—সংস্কৃতের সঙ্গে লিথুয়ানিয়ান ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। দার্শনিক কান্ট যিনি সংস্কৃত ভাষার কিছুই জানতেন না, তিনি লিথুয়ানিয়ান ভাষার বৈজ্ঞানিক গঠন দেখে চমৎকৃত হন। তিনি

পুণ্য বা "ঋতে"র ভাবদ্যোতক হচ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্য। ঈশ্বরের প্রসাদ অথবা তাঁর লীলারূপিনী প্রাচুর্যসম্পন্না প্রকৃতিদেবীর নিকট কোন বিষয়ে কিছুরই কার্পণ্য নাই।

বলেছিলেন, "এর কাছে এমন একটি চাবি আছে যা, কেবলমাত্র শব্দতত্ত্ব নয়, ইতিহাসেরও বহু রহস্য উদ্ঘাটিত করবে।"

বাইবেলে (২য় ক্রনিকেল ৯:২১,১০) উল্লেখ আছে যে, "টারশিশের জাহাজ সকল" রাজা সলোমনের জন্য ওফির (বোম্বাই উপকূলের সোপারা) হতে "স্বর্ণ ও রৌপ্য, গজদন্ত, বানর, এবং ময়ূর" আর "সুপ্রচুর এলমাগ (এলগাম—বলুক, চন্দন) বৃক্ষ এবং মহামূল্য প্রস্তরসমূহ" এনেছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) হিন্দুস্থানের বিরাট ঐশ্বর্যের বিষয়ে এক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্লিনি (১ম খৃষ্টাব্দ) বলেন যে রোমানরা ভারতবর্ষ হতে বাৎসরিক পাঁচকোটি সেস্টার্সের (রোমান মুদ্রা—প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার) পণ্যদ্রব্য আমদানী করত—আর সে সময়ে ভারতের একটা বিরাট নৌশক্তিও ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যগরিমামণ্ডিত সভ্যতা, এর বিস্তৃত শিক্ষাদান ব্যবস্থা আর অপূর্ব রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। চীনা পুরোহিত ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দী) আমাদের বলেন যে ভারতের জনসাধারণ সুখী, সৎ ও সমৃদ্ধশালী ছিল। লন্ডন হতে ট্রাবনার কর্তৃক প্রকাশিত স্যামুয়েল বীল লিখিত Buddhist Records of the Western World (চীনাদের নিকট ভারতবর্ষই ছিল 'পাশ্চাত্য জগৎ'!), আর রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি হতে প্রকাশিত টমাস ওয়াটার্সের On Yuan Chwang's Travels in India A. D. 629—45 দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাস নূতন মহাদ্বীপ অর্থাৎ অ্যামেরিকা আবিষ্কার করবার সময় প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জন্য হ্রস্বতর বাণিজ্যপথের অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। বহু শতাব্দী ধরেই ইউরোপ ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যগুলি সংগ্রহে চেষ্টিত ছিল, যথা—রেশম, সূক্ষ্মবস্ত্র (এত সূক্ষ্ম যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পবন বয়ন, অদৃশ্য কুহেলী প্রভৃতি) ছাপা ছিট, কিংখাব, চিকণের কাজ, র‍্যাগ, ছুরি, কাঁচি, অস্ত্রশস্ত্র, হাতির দাঁত এবং হাতির দাঁতের কাজ, সুগন্ধি, ধূপ, চন্দন, মৃৎপাত্র, ঔষধাবলী, প্রলেপ, নীল, চাউল, মসলা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, চুনি, পান্না ও হীরা প্রভৃতি।

পর্তুগীজ ও ইটালীয় বণিকেরা বিজয়নগর রাজ্যের (১৩৩৬-১৫৬৫ খ্রিঃ অঃ) সর্বত্র বিশাল ঐশ্বর্য্য ও বিরাট সমৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাদের বিপুল বিস্ময় লিপিবদ্ধ করে গেছে। এর রাজধানীর গৌরব বর্ণনাকালে আরব দূত আবদুর রাজাক বলেন যে, "তা এমন বিরাট যে পৃথিবীতে তার সমকক্ষ যে কোন জায়গা আছে, তা চোখেও দেখা যায়নি আর কানেও শোনা যায় নি।"

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ষোড়শ শতাব্দীতে ভারত অখণ্ডভাবে প্রথম অহিন্দুরাজের অধীনে আসে; ১৫২৪ খ্রিঃ অব্দে তুর্কী সুলতান বাবর ভারত আক্রমণ

হিন্দুশাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথিবীতে আকৃষ্ট হয়ে আসে, তার পরম্পরাগত প্রত্যেক জীবনে সকল পার্থিব অবস্থার মধ্যে যে ভগবানের

ক'রে মুসলমান রাজবংশের পত্তন করেন। এই প্রাচীন ভূমিতে বাসস্থাপন করেও কিন্তু নূতন সম্রাটেরা এর ঐশ্বর্য্যসম্ভার নিঃশেষিত করেন নি। অতঃপর আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদে দুর্ব্বল, ঐশ্বর্য্যশালী ভারতবর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি ইউরোপীয় জাতির কুক্ষিগত হয়; ইংলণ্ডই অবশেষে শাসকশক্তিরূপে পরিণত হয়। পরিশেষে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

বহু ভারতবাসীর মত, আমারও একটি এখন-বলা-যেতে-পারে-গোছের কাহিনী আছে। কোন একটি যুবকদল যাদের সঙ্গে কলেজে আমার পরিচয় ছিল, তারা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একদিন আমার কাছে এসে একটি বিদ্রোহীদল পরিচালনা করবার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি শুরু করে। আমি তাদের এই বলে অসম্মতি জানাই যে "ইংরেজ ভ্রাতাদের হত্যা করে ভারতের কোন মঙ্গল সাধিত হবে না, তার মুক্তি আসবে গোলাগুলির দ্বারা নয়, তা আসবে আধ্যাত্মিক শক্তির ভিতর দিয়ে।" আমি তারপর তাদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলুম যে, অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই জার্ম্মান জাহাজ যার উপর তাদের একান্ত নির্ভর ছিল, তা ডায়মণ্ড হারবারের কাছে বৃটিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। যুবকদল কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে তাদের মতলব অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে শেষে দেখলে যে আমার পূর্ব্বকথিত আশংকানুযায়ী তাদের সকল চেষ্টাই বিফল হল। আমার বন্ধুগণ অবশেষে কারাগার হতে মুক্তিলাভ করে বেরোল। উগ্র মত পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করলেন। পরিশেষে অবশ্য তারা দেখতে পেলে যে ভারতের অপূর্ব "যুদ্ধ" জয় শান্তিপূর্ণ উপায়েই সম্ভবপর হয়েছে।

ভারতভূমিকে ইণ্ডিয়া ও পাকিস্তানে খণ্ডিত হওয়ার মর্ম্মন্তুদ ঘটনা, আর দেশের কোন কোন স্থানে সাময়িক রক্তস্রাবী দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণসম্ভূত, তা মূলতঃ ধর্মোন্মাদনাপ্রসূত নয়, (একটা গৌণকারণ—যেটাকে প্রায়ই মুখ্যকারণ বলে প্রদর্শিত হয়)। কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান, অতীতে যেমন, বর্ত্তমানেও তেমনি পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবের সঙ্গেই পাশাপাশি বাস করে এসেছে। এই উভয়মতাবলম্বী বহুসংখ্যক লোকেরাই "মতহীন" গুরু কবীরের (১৪৫০—১৫১৮ খৃঃ অঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল এবং আজ পর্য্যন্তও তাঁর অনুগামী লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা কবীরপন্থী নামে অভিহিত। মুসলমান রাজত্বে আকবর শাহের সময় ভারতের সর্ব্বত্র লোকেদের নিজ নিজ ধর্ম্মমতের অনুশীলনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আজও ভারতের সরল নরনারীদের শতকরা ৯৫ জনের মধ্যে কোন গুরুতর ধর্ম্মগত বিরোধ নাই। প্রকৃত ভারত, যে ভারত মহাত্মা গান্ধীর মতন লোককে বুঝে, তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে চলে তা, ভারতের কর্মচঞ্চল সুবৃহৎ নগরনগরীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা যাবে "ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়" ভারতের সাতলক্ষ গ্রামগুলির ভিতরে, যেখানে স্মরণাতীত কাল হতে স্বায়ত্বশাসনের সরল ন্যায়রূপ পঞ্চায়েতের বৈশিষ্ট্য চলে আসছে। নবস্বাধীনতালব্ধ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা সকলের

অনন্তলীলার প্রকাশ, সে বিষয়ে পূর্ণশিক্ষা লাভের জন্য। পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষালাভ করছে, আর তাদের এইসব আবিষ্কার সানন্দে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া উচিত। ভগবান তাঁর এ'জগতের সন্তানদের দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত এক আদর্শ সভ্যতা পৃথিবীতে বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা দেখে যে নিশ্চয়ই খুশী হবেন এ কথা বলাই বাহুল্য। মানুষের তার দৈব সম্পদের বিষয়ে বিস্মরণ (যা তার স্বাধীন ইচ্ছার* অপব্যবহারজনিত ফল)—তা হচ্ছে তার সকল রকম দুঃখদুর্দশার মূল কারণ।

"সমাজ" নামে মানবরূপী ভগবানের শূন্যগর্ভ কল্পনাতে আরোপিত যে সব কুফল তা বস্তুতঃ প্রত্যেক মানবেরই প্রতি আরোপিত হতে পারে।† রামরাজ্যের কল্পনা পৌরগুণাবলীর মধ্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠবার আগে তা ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে উদয় হওয়া প্রয়োজন; অন্তরের শুদ্ধির দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বাইরের সংস্কার সাধন হয়। যে মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে পেরেছে, সে হাজার হাজার লোকের সংস্কারসাধন করতে পারে।

নিশ্চিত সমাধান এক সময়ে সেইসব মহাপুরুষদের দ্বারা সাধিত হবে,—ভারতের বুকে যাঁদের আবির্ভাবের অভাব কখনও ঘটে নি।

*কার্যতে স্বাধীন মোরা
কারণ মোদের স্বাধীন প্রেম—
ভালবাসা বা না বাসা শুধু ইচ্ছামাত্র হয়।
ইহাতেই আমাদের জয় পরাজয়।
কাহারও পতন ঘটে অবাধ্যতা তরে,
এইরূপে স্বর্গ হতে গভীর নরকে।
হায়রে পতন ঘটে কি আনন্দের
উচ্চাবস্থা হতে পরে কি গভীর দুখে।"

মিলটন—প্যারাডাইস লস্ট।

†ঈশ্বরের দিব্যলীলার পরিকল্পনা—যাতে করে প্রাতিভাসিক জগৎসমূহের আবির্ভাব, তা হচ্ছে স্রষ্টা আর সৃষ্ট জীবের মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়ী ভাব। মানুষ ভগবানকে একমাত্র যা দান করতে পারে, তা হচ্ছে প্রেম; এই-ই তাঁর উচ্ছলিত করুণাধারা আকর্ষণ করবার পক্ষে প্রচুর। "তোমরা, এমন কি এই সমস্ত জাতি আমাকেই ঠকাইতেছ। তোমাদের প্রাপ্য ফসলের দশমাংশ সমস্তই ভাণ্ডারে আন যাতে করে আমার গৃহে খাদ্য থাকে; তারপর বাহিনীদের প্রভু বললেন, এখনই এই দিয়ে আমার পরীক্ষা কর যে আমি তোমাদের কাছে স্বর্গের বাতায়ন উন্মুক্ত করি কি না, আর তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না, যা ধারণ করবার মত স্থান থাকবে না।"—মালাকি ৩:৯-১০ (বাইবেল)।

কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রই মূলতঃ এক, যা মানবকে তার ঊর্ধ্বগতির পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যোগায়। আমার জীবনের একটি সর্বাপেক্ষা সুখময় কাল অতিবাহিত হয়েছে সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ম্যাগাজিনের জন্য বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের কতকাংশের ব্যাখ্যার শ্রুতলিখন দেবার সময়। খ্রিস্টের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা করেছিলুম এই বলে যে তাঁর বাণীর প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন করতে তিনি যেন আমায় পথপ্রদর্শন করেন—যে সব বাক্যের অধিকাংশেরই অর্থ আজ এই দুহাজার বৎসর ধরেই মারাত্মক রকমের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ রয়েছে।

এনসিনিটাস আশ্রমে একরাত্রে আমি নীরবধ্যানে বসে, আমার বসবার ঘরটি হঠাৎ এক অপূর্ব ওপ্যাল রঙের নীল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হল প্রভু যীশুখ্রিস্টের জ্যোতির্ময় মূর্তি। যুবা আকৃতি, বয়স অনুমান পঁচিশ, স্বল্প শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত মুখমণ্ডল; তাঁর সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশপাশ মধ্যস্থলে দ্বিধাবিভক্ত, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের ছটায় বেষ্টিত।

অসীম রহস্যময় অতল গভীর তাঁর দুটি চোখ, তার দিকে চেয়েই রইলুম—চোখের ভাব অনন্ত, গভীর ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাদের ভেতর প্রত্যেক দিব্যভাবের পরিবর্তনের অভিব্যক্তির সঙ্গে যে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছিল তা অন্তরে অনুভব করলুম। তাঁর মহিমাদীপ্ত নয়নযুগলে সেই শক্তি, যা লক্ষকোটী জগৎ ধারণ করে রয়েছে। তাঁর মুখে দেখা গেল সেই পবিত্র পানপাত্র (হোলি গ্রেল) —তা আমার ওষ্ঠপ্রান্ত স্পর্শ করে আবার যীশুখ্রিস্টের নিকট ফিরে গেল। কয়েকমুহূর্ত পরে তিনি আমায় মধুর বাণীতে কতকগুলি কথা বললেন, কিন্তু সেগুলি এতই ব্যক্তিগত যে, সে সব প্রকাশে বিরত হয়ে আমি তা অন্তরেই নিবদ্ধ রাখলুম।

১৯৫০—৫১ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার মোজাভে মরুভূমির কাছে সেলফ-রিঅ্যালাইজেশন্ ফেলোশিপ-এর এক আশ্রমে অবস্থানকালে আমার আর একটী পুস্তকরচনা শেষ হয়, সেটী হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশদ টীকাটীপ্পনী সম্বলিত অনুবাদ।* এতে যোগের নানা পথের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

---

* লস্ এইনজেলস্ থেকে সেলফ্-রিয়্যালাইজেশন ম্যাগাজিনে এবং ২১ ইউ. এন. মুখার্জী রোড, দক্ষিণেশ্বর, কলি-৭৬ থেকে যোগদা ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতায় শিষ্য অর্জুনকে প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাণী সকল সত্যানুসন্ধিৎসুগণের আধ্যাত্মিক নির্দেশনার জন্য সর্ব কালেই প্রযোজ্য।

যোগপ্রণালী সম্বন্ধে দুইবার* বিশেষভাবে উল্লেখে, (গীতায় যার একমাত্র উল্লেখ আছে আর সেই একই প্রণালী, যা বাবাজী মহারাজ শুধুমাত্র দুটী কথায় উল্লেখ করেছেন—ক্রিয়াযোগ) ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত্র কার্যকরী এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছে। আমাদের স্বপ্নজগতের মহাসাগরে শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে মায়ার বাত্যাবিশেষ, যা ব্যষ্টিগত তরঙ্গের জ্ঞান উৎপাদন করে। মানুষের আকৃতি ও অন্যান্য সব জড়পদার্থসমূহ—মানুষের ব্যষ্টিগত প্রকাশের দুঃস্বপ্ন হতে জাগরিত করবার পক্ষে মাত্র দার্শনিক আর নৈতিক জ্ঞানই যে যথেষ্ট নয়, তা বুঝে শ্রীকৃষ্ণ সেই পুণ্যগ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, যোগী তাঁর শরীরের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে ইচ্ছামত তাকে বিশুদ্ধশক্তিতে পরিণত করতে পারেন আণবিক যুগের পথিকৃৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই প্রকার যোগসাধন অন্ততঃ কোন বিষয়গত তথ্য উপলব্ধির অতীত নয়। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত জড়বস্তুকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

হিন্দুশাস্ত্র যে যোগবিজ্ঞানের প্রশংসা করে, তার কারণ এটি সর্বসাধারণের দ্বারা সাধনযোগ্য। অবশ্য একথা সত্য যে শ্বাস-প্রশ্বাস রহস্য কখনও কখনও আনুষ্ঠানিক যোগপ্রক্রিয়া ছাড়াই উদ্ঘাটিত হয়েছে—যেমন কতকগুলি অহিন্দু মরমিয়াদের ক্ষেত্রে, যাঁরা ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির বলে অলৌকিক শক্তিসমূহের অধিকারী। এরূপ খ্রিস্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য সাধুসন্তদেরও প্রকৃত শ্বাসপ্রশ্বাসবিহীন এবং নিশ্চল অবস্থায় দেখা গিয়েছে (সবিকল্প সমাধি),† যার অভাবে কোন মানুষই ঈশ্বরানুভূতির প্রথম অবস্থায় পৌঁছতে পারে না। (কোন সাধুর নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্বোচ্চ সমাধির অবস্থায় পৌঁছবার পর তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় আর সে স্থান হতে কখনও তিনি চ্যুত হন না—তা তিনি বিগতশ্বাস বা শ্বাসপ্রশ্বাসসম্পন্ন অথবা সক্রিয় কিম্বা নিশ্চল যাইই হোন না কেন।)

সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রিস্টানসাধু ব্রাদার লরেন্স বলেন যে, তাঁর ঈশ্বরানুভূতির প্রথম আভাস আসে একটী বৃক্ষদর্শন থেকে। প্রায় সকল মানুষই তো বৃক্ষ দর্শন করেছে ; কিন্তু হায় অতি অল্পলোকেই সেই বৃক্ষদর্শন থেকে বৃক্ষের

---

*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায় ২৯ শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক।

†২৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। খ্রিস্টীয়ান সাধুদের মধ্যে যাঁদের সবিকল্প সমাধির অবস্থায় দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে আভিলার সেন্ট থেরেসার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁর শরীর এত দৃঢ়ভাবে নিশ্চল হয়ে যেত যে, তাঁর কনভেন্টের বিস্ময়স্তম্ভিত সন্ন্যাসিনীগণ তাঁর অবস্থার পরিবর্তন বা তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে একেবারেই অসমর্থ হতেন।

স্রষ্টার দর্শন লাভ করতে পেরেছে। কি পূর্ব কি পশ্চিম সকল ধর্মপথেই যে সব "একান্তী" সাধুদের দর্শন মেলে সেই সব "একমনা" সাধুদের যে দুর্বার ভক্তিবল তা অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ করতে একেবারে অসমর্থ। তবুও সাধারণ লোক* সে জন্য ভগবৎসঙ্গলাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত নয়। আত্মচিন্তার জন্য তার ক্রিয়াযোগের প্রণালীর নৈতিক উপদেশসমূহ দৈনিক পালন আর ভগবানকে প্রাণ খুলে ডাকা "প্রভু, তোমার অদর্শন আর সহ্য করতে পারছি না, দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও!" এ ছাড়া কিছুই আর তার প্রয়োজন হয় না।

এইভাবে ভক্তির প্রাবল্য, যা সাধারণ মানুষের ভাবানুভূতির গণ্ডির বাইরে, তা অপেক্ষা দৈনিক সাধনযোগ্য বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বনে, ভগবৎ সান্নিধ্যলাভ করবার জন্য যোগের সার্বজনীন উপযোগিতা আছে।

ভারতের বিভিন্ন জৈন ধর্মগুরুগণ "তীর্থঙ্কর" বলে অভিহিত হয়েছেন, কারণ তাঁরা সেই পথের সন্ধান দিয়েছেন, যে পথ অবলম্বন করে পথভ্রান্ত মানবজাতি ঘোর বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্র (অর্থাৎ কর্মচক্র—জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন) অতিক্রম ক'রে তীরে পৌঁছতে পারে। সংসার (সম্যক্‌রূপে চলে যে—মায়া প্রভাবে) মানুষকে সবচেয়ে কম পরিশ্রমের পথ অবলম্বন করতেই প্ররোচিত করে। "তা হলে যে কেউই জগতের বন্ধু হবে, সেইই হবে ভগবানের শত্রু।"† ভগবানের সখ্যলাভ করতে গেলে মানুষকে তার নিজ কর্মফল, যা তাকে পৃথিবীর মায়ামোহের হস্তে নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, তার কুফলতাকে অবশ্যই এড়াতে হবে। কর্মফলের লৌহবিধির বিষয়ে জ্ঞান প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে তাদের বন্ধন হতে চরম মুক্তিলাভের উপায় বার করতে উৎসাহিত করে। মানুষের কর্মফলের দাসত্বের মূল হচ্ছে যখন অবিদ্যাজাত অন্তরে কামনাবাসনা তখন যোগী কেবলমাত্র মনঃসংযমের বিষয়ই

*"সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু করতে হবে কোন স্থানে কোন না কোন সময়ে। লাও-ৎসু বলেছেন, "হাজার মাইলের ভ্রমণ শুরু হয় একটী মাত্র পদবিক্ষেপে।" বুদ্ধদেবও বলেছেন, "পরম মঙ্গলের বিষয় কেউ যেন তুচ্ছভাবে মনে মনে এই বলে চিন্তা করে না যে 'এ আর আমার কাছে আসবে না।' বিন্দু বিন্দু বারিপাতে জলপাত্র পূর্ণ হয়; অতি অল্প অল্প করে সঞ্চয় করলেও জ্ঞানী ব্যক্তি পরিশেষে পূর্ণ মঙ্গল লাভ করেন।'"

†জেমস, ৪ : ৪—(বাইবেল)।

অবলম্বন করেন।* কর্মজ অবিদ্যার নানা আবরণ যখন অপসারিত হয়, তখন মানুষ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

জীবনমৃত্যু রহস্য, যা সমাধানের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের এই পৃথিবীতে আগমন, তা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্বাসহীনতা মানেই মৃত্যুহীনতা। এই সত্য উপলব্ধি করে প্রাচীন ভারতের যোগীঋষিগণ একমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সূত্র অবলম্বনে বিগতশ্বাস হবার এক সঠিক এবং যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান উদ্ভাবন করলেন।

জগতে ভারতের আর কোন দানই যদি না থাকত, তা হলে এই একমাত্র "ক্রিয়াযোগ"ই তার রাজোচিত দান বলে বিবেচিত হত।

বাইবেলে এমন কতকগুলি পংক্তি আছে যাতে বোঝা যায়, ঈশ্বর যে শ্বাস-প্রশ্বাসকেই দেহ ও আত্মার মধ্যে সূক্ষ্মসংযোগসূত্র বলে তৈরী করেছেন—সে সম্বন্ধে হিব্রু ধর্মোপদেষ্টাগণ সুপরিচিতই ছিলেন। বাইবেলের জেনেসিসে আছে, "প্রভু ভগবান মানুষকে ভূমির মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করলেন আর তার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রদান করলেন, আর মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হল।"†

---

*নির্বাত স্থানের দীপ টলে না যেমন,
সংযমী যোগীর চিত্তে স্থিরতা তেমন।
অভ্যাসে যখন চিত্তে স্থিরতা উদয়,
আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয়,
জ্ঞানগম্য চিদানন্দ উদয় যখন,
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় সুখে মগ্ন মন,
আত্ম-দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
অপূর্ব অবস্থা সেই যোগ বলে তাকে।
মধুময় যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
মহাদুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
অপূর্ব অবস্থা সেই যোগ নাম তার।
কষ্টসাধ্য বলি' যেন অযত্ন না হয়,
কাতরতাশূন্য চিত্ত করি' ধনঞ্জয়,
যোগের ব্যাঘাতকারী কামনা ছাড়িয়া,
ইন্দ্রিয় সংযত করি' মনোবল দিয়া,
গুরু-উপদেশে বুদ্ধি করিয়া নিশ্চয়,
করিবে সে যোগাভ্যাস পাণ্ডুর তনয়
সুধাকরকৃত—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ ঃ ১৯-২৪।

†জেনেসিস্—২ঃ৭ (বাইবেল)।

মানবশরীর রাসায়নিক আর ধাতব উপাদানে গঠিত, যা "ভূমিতলের মৃত্তিকা"-তেও পাওয়া যায়। মানবদেহের এই জড়মাংস, কোন ক্রিয়াশীলতা অথবা শক্তি বা গতি প্রকাশ করতে পারে না, যদি না আত্মা কর্তৃক দেহের মধ্যে—অজ্ঞানী লোকেদের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের (বায়ব্যশক্তির) মাধ্যমে, প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে বলে বোধ হত। মানবশরীরের ক্রিয়াশীল পঞ্চপ্রাণ, সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত। প্রাণস্রোত হচ্ছে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রণবঝঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ।

আত্মকারণ হতে উদ্ভূত প্রাণের যে আলোক বা তার প্রতিফলক প্রতি কোষকে আলোকিত করছে, তার আপাত সত্যতাই মানবের দেহাসক্তির একমাত্র কারণ। অবশ্য একথা ঠিক যে সে এই একটা মৃত্তিকাপিণ্ডরূপ মানবদেহের প্রতি কখনও প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করবে না। মানুষ জড়মূর্তির সঙ্গে তার একাত্মবোধ মিথ্যা করেই অনুভব করে, কারণ আত্মা হতে প্রাণস্রোত, অস্থিমাংসের দেহে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় যে মানুষ কার্যটাকেই কারণ বলে ভুল করে,—দেহের নিজেরই প্রাণ আছে কল্পনা করে দেহটাকেই পূজা করে।

মানুষের চৈতন্যাবস্থা হচ্ছে তার দেহ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতা। নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়াশীল তার মগ্নচৈতন্য, তার মানসিক এবং শরীর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সাময়িক বিচ্ছেদের সঙ্গে সংযুক্ত। তার তুরীয়াবস্থা হচ্ছে শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর যে মানুষের "অস্তিত্ব" নির্ভর করে, সেই ভ্রান্তি হতে মুক্তি।* ঈশ্বর তো শ্বাসপ্রশ্বাস বিনাই রয়েছেন, তাঁর প্রতিরূপে নির্মিত জীবাত্মা প্রথমে বিগতশ্বাস হলে পর তবে নিজস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

বিবর্তনপ্রসূ কর্মের দ্বারা আত্মা ও দেহের যখন শ্বাসগ্রন্থি ছিন্ন হয়, তখন "মৃত্যু" নামে অভিহিত হঠাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; জড়কোষগুলি তাদের

*"এ পৃথিবী তোমার সম্যক্ উপভোগ করা কখনই ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার শিরাউপশিরার মধ্যে সাগরের বিশালতা প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দিব্যভূষণে সজ্জিত হয়ে শিরে নক্ষত্রের মুকুট ধারণ ক'রে উপলব্ধি কর যে এই নিখিল জগতের তুমিই হচ্ছ একমাত্র উত্তরাধিকারী বা তার চেয়েও বেশী, কারণ এখানে এমন লোকেরা সব আছে যারা প্রত্যেকেই তোমারই মতন একমাত্র উত্তরাধিকারী; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি রাজার রাজদণ্ড ধারণ অথবা কৃপণের ধনসঞ্চয়ের আনন্দের মত ভগবানের গুণগানে আনন্দ লাভ কর,......যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার অভ্যস্ত চলাফেরা, আহার বিহারের মত, ভগবানের সকল যুগের লীলার সঙ্গে পরিচিত হও; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সেই রহস্যময় শূন্যতা, যা থেকে এই পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল তার গভীর পরিচিতি লাভ কর।" টমাস্ ট্র্যাহার্ন—সেঞ্চুরীস্ অফ্ মেডিটেশন্স্।

স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যায়। ক্রিয়াযোগীর পক্ষে কিন্তু শ্বাস-গ্রন্থিচ্ছেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাবলেই সংসাধিত হয়, সেখানে কর্মফলের সবল ও অনধিকার প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিবলে যোগী তাঁর অশরীরী মূল অবস্থার কথা ইতিমধ্যে জ্ঞাত হন, আর মৃত্যুর কতকটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে মানুষের জড়শরীরের উপর নির্ভর করা নিরতিশয় ভ্রম, সে বিষয়ে তার আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহণকালে প্রত্যেক মানুষই (তার নিজগতিবলে, তা সে যতই অনির্দিষ্ট হোক না কেন) নিজেকে দেবত্বে উন্নীত করবার পথে অগ্রসর হয়। মৃত্যু এই অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ না হয়ে কেবলমাত্র সূক্ষ্মজগতের অধিকতর উপযুক্ত অবস্থাপ্রাপ্তির সুযোগ দান করে, যেখানে থেকে সে তার সবকিছুরই মালিন্য হতে মুক্ত হয়ে শুচিশুভ্র হয়। "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়……আমার পিতার বাটীতে বহু বাসস্থান আছে।"* ভগবান এই বিশ্বরচনাতে তাঁর সবকিছু কৃতিত্ব শেষ করে ফেলেছেন অথবা পরলোকে এক বীণাবাদন ছাড়া আর বেশী কিছু আগ্রহোদ্দীপক আমাদের জন্যে রাখেন নি, এ বাস্তবিকই অসম্ভব।

মৃত্যু একেবারে অস্তিত্বের বিলোপ অথবা জীবন থেকে চরম মুক্তি নয়; মৃত্যু অমরত্বেরও প্রবেশদ্বার নয়। পার্থিব সুখের মধ্যে যে আত্মাকে ত্যাগ করে তাকে ভুলে গেছে, সে পরলোকের সূক্ষ্মসৌন্দর্যের মধ্যে তাকে আর পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না। সেখানে সে কেবলমাত্র সূক্ষ্মতর অনুভব আর 'শিবম্ সুন্দরম্,' যা মূলতঃ এক, তার সূক্ষ্মতর প্রতিবেদন সঞ্চয় করে। পৃথিবীর এই স্থূলভূমির নেহাইয়ের উপরেই দ্বন্দ্বশীল মানবকে তার আধ্যাত্মিক স্বরূপের অক্ষয় স্বর্ণকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হবে। সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দান কষ্টার্জিত সেই স্বর্ণপিণ্ড হাতে দিয়ে মানব পরিণামে জড়দেহের পুনর্জন্ম গ্রহণের হাত হতে চরম মুক্তিলাভ করে।

কয়েক বছর ধরে আমি এনসিনিটাসে ও লস এঞ্জেলিসে পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং অন্যান্য গভীর তত্ত্ববিষয়ক হিন্দু দর্শনের ক্লাস পরিচালনা করেছিলুম।

একদিন সন্ধ্যাকালে ক্লাসে একটি ছাত্র প্রশ্ন করে বসল, "ঈশ্বর, দেহ ও আত্মার সংযোগ সাধন করলেন কেন?—সৃষ্টির এই বিবর্তনশীল বিশ্বনাট্যে প্রথম গতিসংযোগ ও তার পরিচালনায় তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল?" এরূপ ধরণের প্রশ্ন

---

*জন ১৪: ১-২ (বাইবেল)।

অসংখ্য লোকেই করেছে ; দার্শনিকেরা কিন্তু বৃথাই তাদের পূর্ণ উত্তরদানের চেষ্টা করেছেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী হেসে বলতেন, "ও গোটাকতক রহস্যের সমাধান অনন্তের জন্যই থাক্। মানুষের সসীম যুক্তিবল কি সেই 'অবাঙ্‌মনসগোচর' অজ, স্বয়ম্ভূ, পরম সত্তার দুরধিগম্য অভিপ্রায় বুঝতে পারে?* মানুষের যুক্তি যা এই জড়জগতে কার্যকারণবিধির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, তা অনাদি, কারণাতীত ঈশ্বরের রহস্যের কাছে একেবারেই নিষ্ফল হয়ে যায়। যদিও মানবমনের যুক্তি সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে পারে না, তবুও ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং পরিণামে সকল রহস্যেরই সমাধান করে দেন।"

যাঁর জ্ঞানলাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে, তিনি জীবনের "আইনস্টাইন্ থিয়োরী"র (অপেক্ষবাদের) নির্ভুল গাণিতিক রেখাচিত্র আগে হতেই দাবী না ক'রে, সেই দিব্য আদর্শের কতকগুলি সরল নীতির অ, আ, ক, খ, শিক্ষা করেই তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধানে উদ্যোগী থাকেন।

"কোন মানুষ কোন সময়েই ঈশ্বরের দর্শন পায় নি (মায়ার আপেক্ষিকতা,‡ 'কালে'র অধীন কোন মানবই অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না); একমাত্র

---

*প্রভু বলেছেন,—"কারণ আমার চিন্তাসকল তোমাদের চিন্তা নয়, তোমাদের পথ আমার পথ নয়। স্বর্গ যেমন পৃথিবীর চেয়েও উঁচু, তেমনই আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে আর আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়েও উঁচু।"—ঈশাইয়া ৫৫ ঃ ৮-৯ (বাইবেল)। দান্তে "দি ডিভাইন কমিডি"তে বর্ণনা করে গেছেন,—

"তাঁহারি আলোকে সুদীপ্ত সেই স্বর্গভূমির মাঝে
গিয়েছিনু আর দেখেছিনু আমি যে সব ব্যাপার সেথা,
সেথা হতে যেবা ফিরে আসে, তার কোন কৌশলজ্ঞান
নাহিক কিছুই ; কিছু নাই তাঁর কহিতে সে বারতা ;
কারণ তাহার লক্ষ্যভূমিতে হ'লে ক্রমে আগুয়ান
বুদ্ধি মোদের অভিভূত হয় এতই গভীর ভাবে,—
আবার সে আর ফিরিতে পারে না—একদা যে পথ ধরে
চলেছিল যবে পুনরায় সেই পথে।
মনের গহনে সঞ্চিত মোর যাহা কিছু স্মৃতিবলে,
সেই হবে মোর বিষয়বস্তু পুণ্যদেশের কথা ;
কণ্ঠেতে মোর ধ্বনিবে সদাই, এ গান না শেষ হলে।"

‡পৃথিবীর আহ্নিকগতিতে আলো থেকে অন্ধকার আর অন্ধকার থেকে আলো হচ্ছে মানুষের কাছে সৃষ্টির মায়াধীনতা বা বিপরীতাবস্থার নিতাস্মারক। (সুতরাং প্রদোষ ও ঊষা, দিবসের এই পরিবর্তন অথবা সমগুণী কালসমূহ ধ্যানের পক্ষে অতি প্রশস্ত বলেই

তাঁর জাত পুত্র যিনি পিতার বক্ষে আশ্রয় পেয়েছেন (প্রতিফলিত খ্রিস্টচৈতন্য অথবা বহিঃপ্রক্ষেপিত শব্দজ্ঞান যা প্রণবঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে, সকল সৃষ্টির ব্যাপারকে পরিচালিত করে, তা বক্ষঃ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু দিব্যভাবের গভীর অন্তঃস্থল থেকে একের মধ্যে বহুর বৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছে), তিনি তাকে ঘোষণা (রূপায়িত অথবা প্রকাশিত) করেছেন।"*

যীশু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলছি, পুত্র নিজ হতে কোন কিছুই করতে পারেন না, কেবল পিতাকে যা করতে দেখেন, তাই-ই করেন ; কারণ যা কিছু তিনি করেন, সে সকলই পুত্রও তদ্রূপভাবে করেন।"**

ঈশ্বরের ত্রিবিধা প্রকৃতি, যাতে তিনি নিজেকে বাহ্যজগতে প্রকাশিত করেন, তা হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে বর্ণিত হয়েছে। সারা সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁদের এই ত্রিবিধা প্রকৃতির কার্যস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মানুষের ধারণাশক্তির অতীত, ভক্ত হিন্দু তখন তাঁকে এই মহান্ ত্রিমূর্তিরূপেই পূজা করে।†

যাই হোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভাব, তা ঈশ্বরের চরম, এমন কি তাঁর মূলা প্রকৃতিও নয় (কারণ বিশ্বসৃষ্টি তাঁর লীলা)।‡ এমন কি তাঁর ত্রিমূর্তির সকল রহস্য ভেদ করেও তার অন্তর্গূঢ় ভাব আবিষ্কার করা যাবে না, কারণ তাঁর বহিঃপ্রকৃতি, যা বিধিবদ্ধ আণবিক প্রবাহে প্রকাশিত, তা তাঁকে প্রকাশিত না ক'রে কেবল তাঁর আভাসমাত্র প্রদান করে। ঈশ্বরের চরম প্রকৃতি কেবল তখনই জ্ঞাত হওয়া যায়, যখন "পুত্র পিতার নিকট গমন করেন"।§ মুক্তমানব তখন সৃষ্টিরাজ্য অতিক্রম করে আদিসত্তায় ফিরে যায়।

বিবেচিত হয়।) মায়ার দ্বৈতগুণের অবগুণ্ঠন ভেদ করে যোগী অতীন্দ্রিয় ঐক্যের উপলব্ধি করতে পারে।

*জন ১ : ১৮ (বাইবেল)।

**জন ৫ : ১৯ (বাইবেল)।

†সৎ, তৎ, ওঁ অথবা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই ত্রয়ীবাদের সত্য হতে এ স্বতন্ত্র ধারণা। তৎ অর্থাৎ পুত্র সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে খ্রিস্টচৈতন্য, তা পরব্রহ্মের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রয়ী ভাবেরই প্রকাশ। এই ত্রিমূর্তির যে সব শক্তি, তা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ও বা পবিত্রাত্মা বা কারণশক্তি বা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে তারই প্রতীক।

‡"হে প্রভু......তুমিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমারই ইচ্ছাক্রমে তাদের অস্তিত্ব আর তারা সৃষ্ট হয়েছিল।"—রিভিলেশান্ ৪:১১ (বাইবেল)।

§জন ১৪:১২ (বাইবেল)।

চরমরহস্যের সমাধানের প্রশ্নে সকল ধর্মোপদেষ্টাগণই নিরুত্তর রয়ে গেছেন। পিলেত যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্য কি?" যীশুখ্রিস্ট কোনই উত্তর দিলেন না। পিলেতের মতন বুদ্ধিজীবিদের সব আড়ম্বরপূর্ণ বড় বড় প্রশ্ন কদাচিৎ জ্বলন্ত অনুসন্ধিৎসার ভাব হতে উদয় হয়। এরূপ ব্যক্তিরা বৃথা দম্ভভরেই কথা বলেন, যাতে করে "ঋজুতার" পরিচয় যে তার আধ্যাত্মিক মূল্য,* তার বিশ্বাসের অভাবই সূচিত হয়।

"এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর এই কারণেই আমি পৃথিবীতে এসেছি, যাতে করে আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করতে পারি; যে কেহ সত্যের পক্ষে, সেই আমার বাণী শুনতে পায়।"§ এই সামান্য কয়টি কথায় যীশুখ্রিস্ট অনেক কিছুই বলেছেন। ঈশ্বরের সন্তান যিনি, তিনি তাঁর জীবনাদর্শে তার "সাক্ষ্য বহন" করেন। মূর্তিমান সত্য তিনি; তিনি তার ব্যাখ্যা করলেও সেটা তার উদার পুনরাবৃত্তিই হবে।

সত্য কোন অনুমান বা ঔপপত্তিক বিষয় বা কাল্পনিক নীতি নয়, অথবা দর্শনশাস্ত্রের কোন অনুমানের প্রণালীও নয় বা কোন বুদ্ধিজাত অন্তদৃষ্টিও নয়। সত্য হচ্ছে বাস্তবসত্তা বা সদ্‌বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ। মানুষের পক্ষে সত্য হচ্ছে তার আসল প্রকৃতি, আত্মারূপে তার স্ব-রূপের অখণ্ড জ্ঞান। যীশুখ্রিস্ট তাঁর প্রত্যেক কার্য এবং বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, ঈশ্বর হতে যে তাঁর উৎপত্তি—তাঁর জীবনের সেই সত্যের বিষয় তিনি অবগত। সর্বব্যাপী খ্রিস্টচৈতন্য বা কূটস্থ চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবে শুধু একথা বলতে পেরেছেন; "যারা সত্যের, তারা সকলেই আমার বাণী শ্রবণ করে।"

বুদ্ধদেবও পরমতত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে অস্বীকারই করেছিলেন; নীরসভাবে শুধু এই কথাগুলি বলেছেন—পৃথিবীতে মানুষের দুদিনের বাস, তাতে তার নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধনেই ভালভাবে ব্যয় করা যায়। চৈনিক

* "প্রেম ধর্ম; মুক্ত একা বাধাবন্ধহীন,—
কেবল সেইই পারে শিখাইতে তোমা',
কিরূপে করিতে হয় আরোহণ সেথা,
স্বরগ মণ্ডল হতে উচ্চতর স্থানে;
অথবা সে ধর্ম যদি কভু হয় ক্ষীণ,
মর্ত্যে নেমে আসে স্বর্গ প্রেমধর্ম কাছে।"
—মিল্টন, কোমাস্।

§ জন ১৮ : ৩৭ (বাইবেল)।

মরমিয়া সাধক লাও-ৎসু ঠিকই বলেছেন যে, "যে জানে সে বলে না, আর যে বলে সে জানে না।" ঈশ্বরতত্ত্বের চরমরহস্য "তর্কের বিষয়ীভূত" নয়। তাঁর গূঢ়গুহ্যরহস্য ভেদ করা হচ্ছে এমন একটা বিদ্যাকৌশল যা মানুষ মানুষকে দিতে পারে না ; এখানে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র শিক্ষাদাতা গুরু।

"স্থির হও আর উপলব্ধি কর যে আমিই ঈশ্বর।"* ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের জন্য সাড়ম্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন হয় না, তাঁর পরিস্ফুটবাণী নির্মল অন্তরের গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায়। নিখিল বিশ্বমাঝে প্রতিধ্বনিত প্রণবঝঙ্কাররূপে নাদব্রহ্ম ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে মুহূর্তমধ্যে সুস্পষ্ট বাণীরূপে প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি—তা মানববুদ্ধির পক্ষে বা যুক্তিতে যতটা বোধগম্য, তা বেদেতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঋষিরা এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে প্রত্যেক মানবই ঈশ্বর কর্তৃক একটী আত্মা (জীব) রূপে সৃষ্ট হয়েছে, যাতে সে তার নির্গুণ অভেদত্বে ফিরে যাবার পূর্বে সেই অসীম সত্তার কতকগুলি বিশেষগুণ অপূর্বভাবে প্রদর্শন করতে পারে। সকল মানবই—যাঁরা এই দিব্য বৈশিষ্ট্যের কান্তি দ্বারা ভূষিত, তাঁরা সকলেই ভগবানের কাছে সমানভাবে প্রিয়।

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অগ্রজপ্রতীম ভারতবর্ষ কর্তৃক সঞ্চিত জ্ঞানেতেও সমগ্র মানবজাতির সমান উত্তরাধিকার। সকল সত্যের মত, বৈদিক সত্যও ঈশ্বরেরই, একা ভারতবর্ষের নয়। মহাঋষিগণ, যাঁদের মন বৈদিক দিব্যজ্ঞানের গভীরভাব ধারণ করবার নির্মল ও পবিত্র আধার, তাঁরা সমগ্র মানবজাতির সেবার জন্য—অন্য কোন জগতে নয়, এই পৃথিবীতেই জাত মানবজাতির এক অংশ ছিলেন। সত্যের রাজ্যে জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদজ্ঞান একেবারেই নিরর্থক ; সেখানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গুণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপযোগিতা।

ঈশ্বরই প্রেম,—তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনাকে মূলীভূত করা যেতে পারে একমাত্র প্রেমে। এই অত্যন্ত সরলভাব,—পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির চেয়ে কি মানবহৃদয়ে বেশী আশ্বাস প্রদান করে না ? প্রত্যেক সাধকই, যিনি সৎবস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে পেরেছেন—তিনিই এই মহাসত্য প্রচার করে গেছেন যে, একটি দৈব বিশ্বপরিকল্পনা বর্তমান, আর তা হচ্ছে পরম সুন্দর আর অসীম আনন্দময়।

---

*সাম্স্ ৪৬:১০ (বাইবেল)

ধর্মোপদেষ্টা ঈশাইয়াকে ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় এই কয়টি কথায় ব্যক্ত করেছিলেন,—*

"আমার মুখ হতে নির্গত আমার বাণী (সৃষ্টির মূল—প্রণবঝঙ্কার) এইরূপই হবে, এ নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না, কিন্তু আমি যা ইচ্ছা করি সে তাই সম্পন্ন করবে—আর আমি তা যে উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করে থাকি না কেন, তার উন্নতিই হবে। কারণ তুমি আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে। পাহাড়পর্বত হতে তোমার উদ্দেশে গীতধ্বনি হবে এবং প্রান্তরের বৃক্ষসকল করতালি দেবে।"

"আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে।" এই বিংশ শতাব্দীতে দুঃখ যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মানব এই অপূর্ব প্রতিজ্ঞা কত না আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করে। তবুও এর অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ সত্য সেই সব ঈশ্বর-ভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরা তাঁদের দৈব উত্তরাধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করেন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত "ক্রিয়াযোগের" কার্য পূর্ব ও পশ্চিমে সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। সকল লোকেই জানুক যে মানবজাতির সকল দুঃখদুর্দশা মোচন করবার জন্যে আত্মোপলব্ধির এক সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা বর্ত্তমান আছে।

উজ্জ্বল মণিমুক্তার মত পৃথিবীর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র ক্রিয়া-যোগিদের নিকট প্রেমের ভাবতরঙ্গ প্রেরণ করবার সময় আমি প্রায়ই সকৃতজ্ঞচিত্তে ভাবি,—

"প্রভু, তুমি এই সন্ন্যাসীটিকে কত বড় সংসারই না দিয়েছ!"

*ঈশাইয়া ৫৫ : ১১-১২ (বাইবেল)।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

আ

ঋ

এ

ও

ক

ফ

য

র